গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
পৌষ ১৩৭২, JANUARY 1966

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণাঙ্গন

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

শ্বেতদ্বীপের ধ্বনিকা কম্পমান

গুপ্তচর কাহিনী

সারা বার্নার্ড

চিত্রনাট্য

অশান্ত পৃথিবী

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

সম্পাদক কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা—ডাকসহ পনের টাকা

গল্পভারতীর পরবর্ত্তী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—

মহাজীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী পর্য্যায়ক্রমে গল্প-ভারতীতে লিখছেন জীবনী-সাহিত্যের নূতন পথের দিশারী **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**।

পুণ্যজীবনস্মরণী—

পুণ্যশ্লোক লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ আত্মভোলা জীবনের বহু অপ্রকাশিত অধ্যায়) ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ চরিত্রের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন। একটি প্রেরণাময় রচনা।

খবর, খবর, জোর খবর—

আজকালকার জীবনযাত্রা প্রতিদিন আরম্ভ হয় সংবাদপত্র দিয়ে। জন-জীবনে উন্মাদনা জাগাবার এই অমোঘ অস্ত্র খবরের কাগজ সম্পর্কে পরিসংখ্যান-সমৃদ্ধ মূল্যবান রচনা। ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র পত্রিকার সংখ্যা কত, কোন রাজ্যে কতগুলি পত্র পত্রিকা এবং কী তাদের প্রচার সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গের পত্র পত্রিকার সংখ্যা এবং তাদের প্রচার-পরিসংখ্যান। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু।

কাশ্মীর রণরঙ্গ : দ্বিতীয় অধ্যায়

চলচ্চিত্রের মতো ঘটনার পর ঘটনা। পড়তে পড়তে পাঠক বিস্মিত বিহ্বল হবেন। অনেক নেপথ্য-কাহিনী, যা আর কখনো এবং আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অনন্য সাধারণ কীর্তি—কাশ্মীর রণরঙ্গ।

একটি বিচিত্র রচনা : উমাপদ মুখোপাধ্যায়।

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের স্বপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

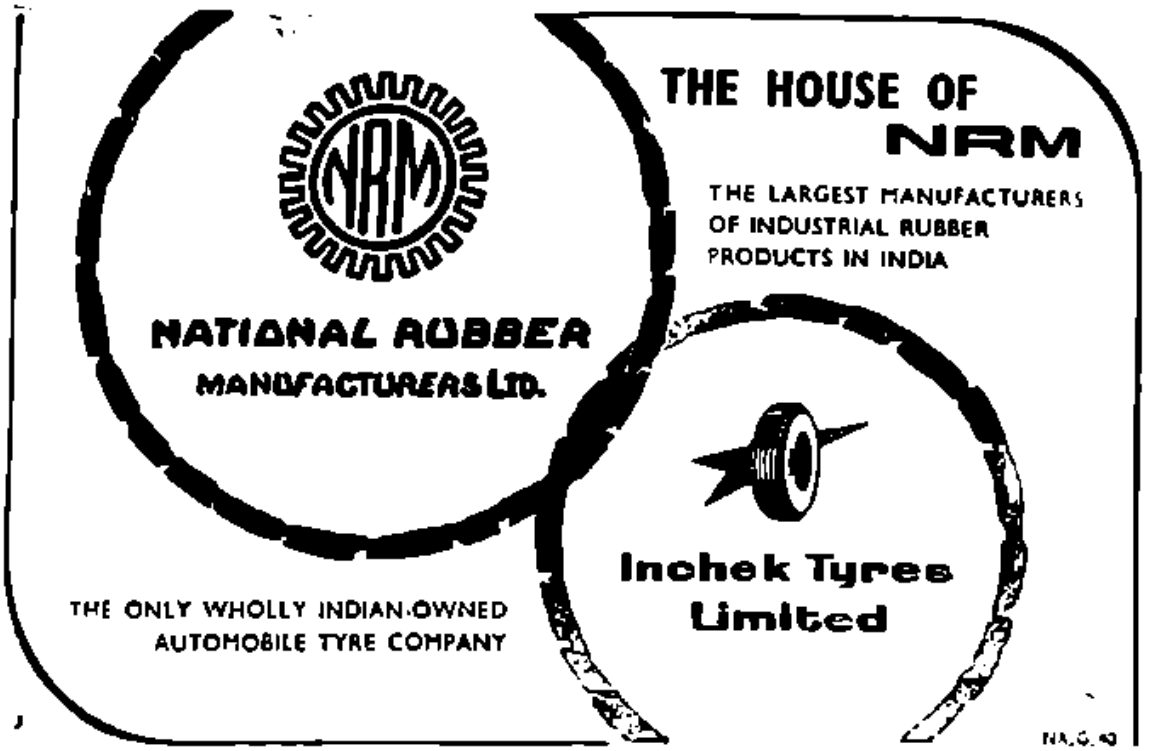

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

রচনাবলী সিরিজ

মধুসূদন রচনাবলী

মধুসূদনের সমগ্র রচনা ইংরেজীসহ একত্রে। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত। সদ্য প্রকাশিত। [১৪·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি) একত্রে, প্রথম খণ্ড (১১·৫০)

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে, দ্বিতীয় খণ্ড [১৫·০০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। ১ম খণ্ড [১২·৫০] ২য় খণ্ড [১৫·০০]

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি) একত্রে [৯·০০]। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবন ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সেই

স্নিগ্ধ

পরশ

গ্রীষ্মের জন্য
বিশেষ ভাবে
তৈরী শাড়ী

খাটাউ ভয়েল

শো রুম :

১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

১৫ এল, পার্ক ষ্ট্রীট,
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

প্রবেশ পথ : মিডলটন রো
কলিকাতা

বি না মূ ল্যে

উ প হা র

সো ভি য়ে ত দে শ

রুশ-ভারত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা পড়ুন ও গ্রাহক হোন।

তিন বৎসরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সনের একখানা সাত পৃষ্ঠার সচিত্র সুদৃশ্য রঙিন ক্যালেণ্ডার ও একখানা পুস্তিকা দেওয়া হইবে।

আজই তিন বৎসরের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠান। চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে একখানা ক্যালেণ্ডার ও পুস্তিকা উপহার পাঠান হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন ৩১-৫-৬৬ (ইংরেজী) পর্যন্ত কনসেশন হার চালু থাকিবে।

এক বছরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সালের একখানা ক্যালেণ্ডার পাঠান হইবে।

চাঁদার হার	এক বছর	তিন বছর
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়	টাঃ ৫-০০	টাঃ ১০-০০
ইংরাজী ভাষায়	টাঃ ৬-০০	টাঃ ১২-০০

: নীচের ঠিকানায় মনিঅর্ডার পাঠাইবেন :

॥ সোভিয়েতদেশ ॥

১।১৮ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	৫৭৯
সোভিয়েতের শিশুরা—কানাই পাকড়াশী	৬০৯
জগদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেন	।৹
বিচিত্রা	।৶৹
চিত্রনাট্য—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	॥৶৹
ছন্দ পতন—শান্তি দাশগুপ্তা	৬১১
এক অসমসাহসিক অভিযান—বরুচি	৬২৪

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য
প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়।
সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের
ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায়
রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর
হিমসার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ
পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

হিমসার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

এই প্রথম

একটি সৈনিকের কাহিনী—উৎপল চক্রবর্ত্তী ৬১৯

গুপ্তচর কাহিনী

বন্দী না বীর ?—গৌরীশঙ্কর দে ৬৩৭

সারা বিশ্বের সেরা অভিনেত্রী

সারা বার্ণাড—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৫৩

শ্বেতদ্বীপের যবনিকা কম্পমান—নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায় ৬৫৯

লেখনী সুধের খনি—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ ৬৬২

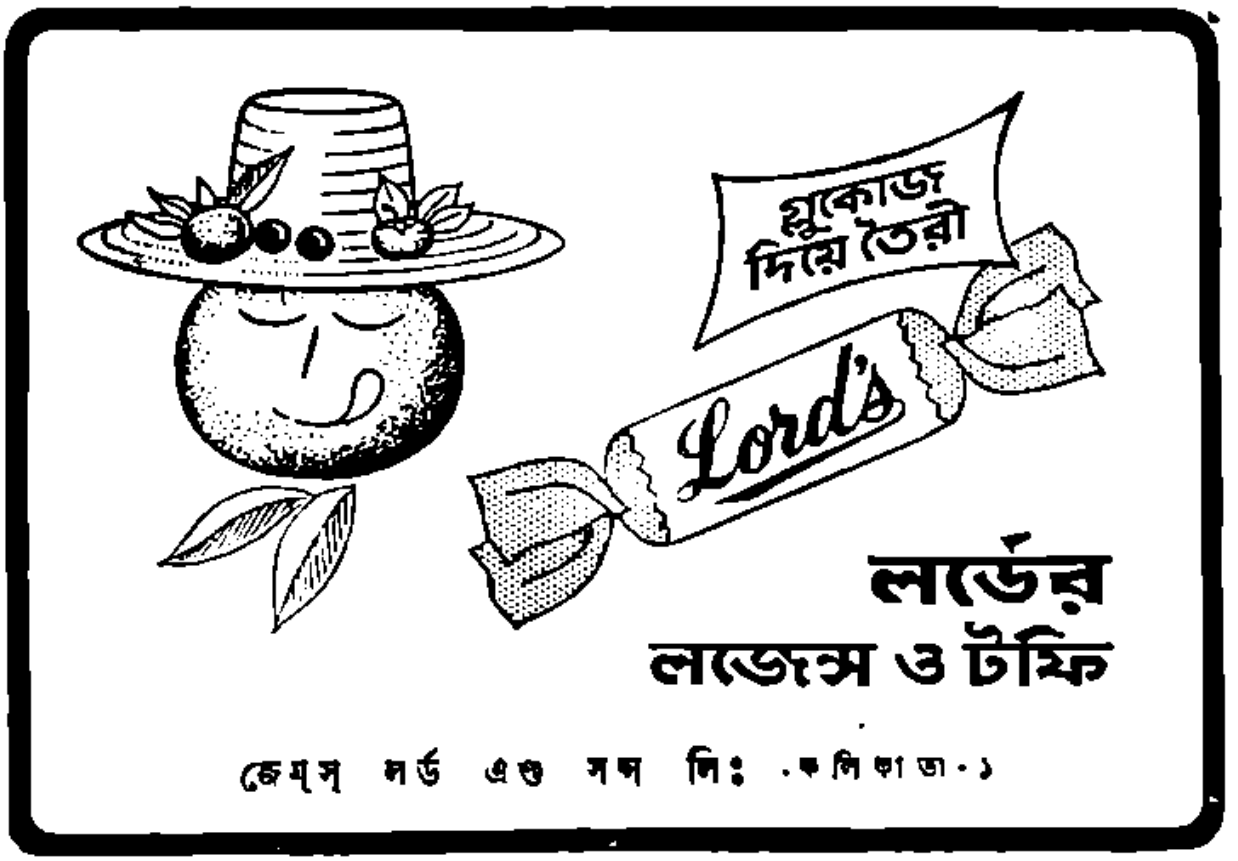

SO BRIGHT, SO WHITE!

It is a real pleasure to wear clean and white clothes. Always wash your clothes with CHANDNI Washing Soap and feel the difference

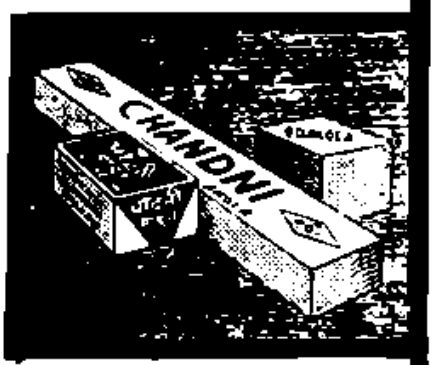

CHANDNI

Washing Soap

BERAR OIL INDUSTRIES,
Akola-Maharastra

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া ৬৬৫

অশান্ত পৃথিবী—নলিনী রঞ্জন মিত্র ৬৬৯

মেয়ে মজলিশ

শীতের সময় গরম পোষাক—আভা পাকড়াশী ৬৭৩

নামমাত্র খরচায় রূপ ও শ্রী—সুরঞ্জনা সেন ৬৭৬

ঘর না ফুলের বাগান—প্রতিমা চক্রবর্তী ৬৭৮

আপার যা চলছে—চক্রপাণি ৬৮০

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ৬৯০

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

শাখা

২৮;যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

৫,৬ হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন ২৩-১৮৯৯

১৪,হেয়ার ষ্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

একটা দিনের তরেও কাগজ ছাড়া ! ভাবতে পারেন ? ... না !

ইস্কুলের ছোট্ট ছেলে, মা, বাবা, শিক্ষক, গবেষণা-কর্মী, দেশনেতা, ইঞ্জিনীয়ার—সকলেরই কাগজের দরকার।
তাছাড়া শিল্পদ্রব্যের প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্যে কাগজের নিত্য নতুন কত কী প্রয়োজন।

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ খরিদ্দারদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে—সবচেয়ে পাতলা কাগজ থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে পুরু বোর্ড পর্যন্ত—বহু বিচিত্র ধরনের কাগজ আর বোর্ড তৈরি ক'রে থাকে।

ROHTAS

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ডালমিয়ানগর (বিহার)

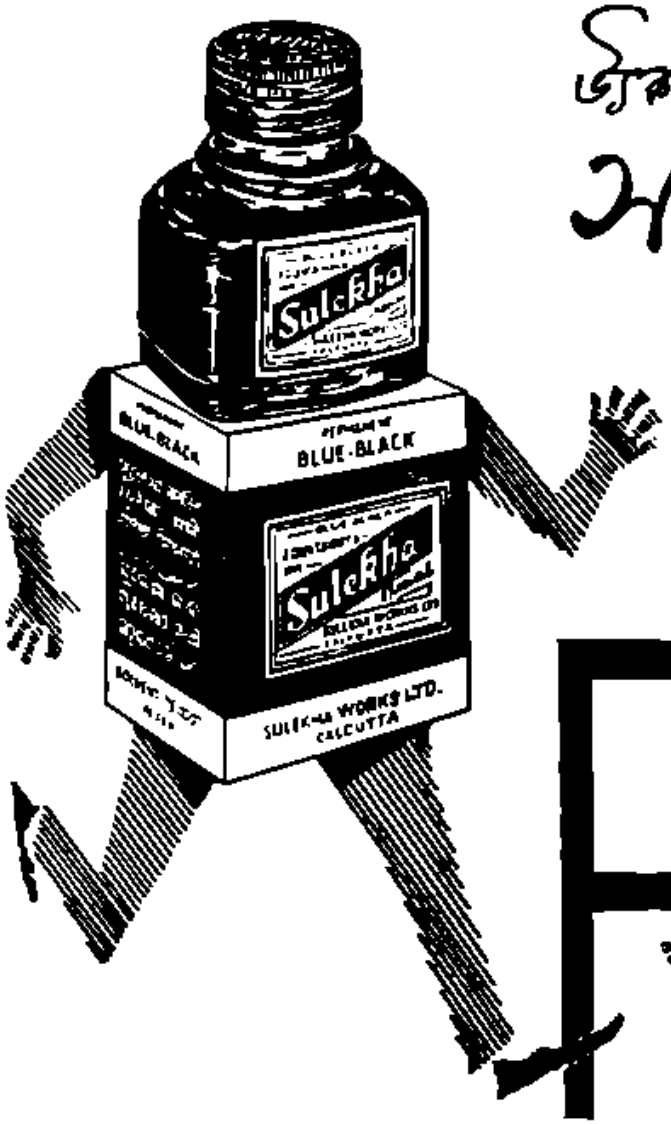

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম. এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

ক্যাস্টরল

ক্যাস্টর ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যালকেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

CF-1 65 BEN

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মারোয়াড় রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু···।' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাদি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর সময় পাব হবে না।" চিতায় আরোহণ করে পতিদেব শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরোজনদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস··· লেলিহান হ'ল চিতার আগুন···

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও বিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভারতদর্শন ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-683 A BEN

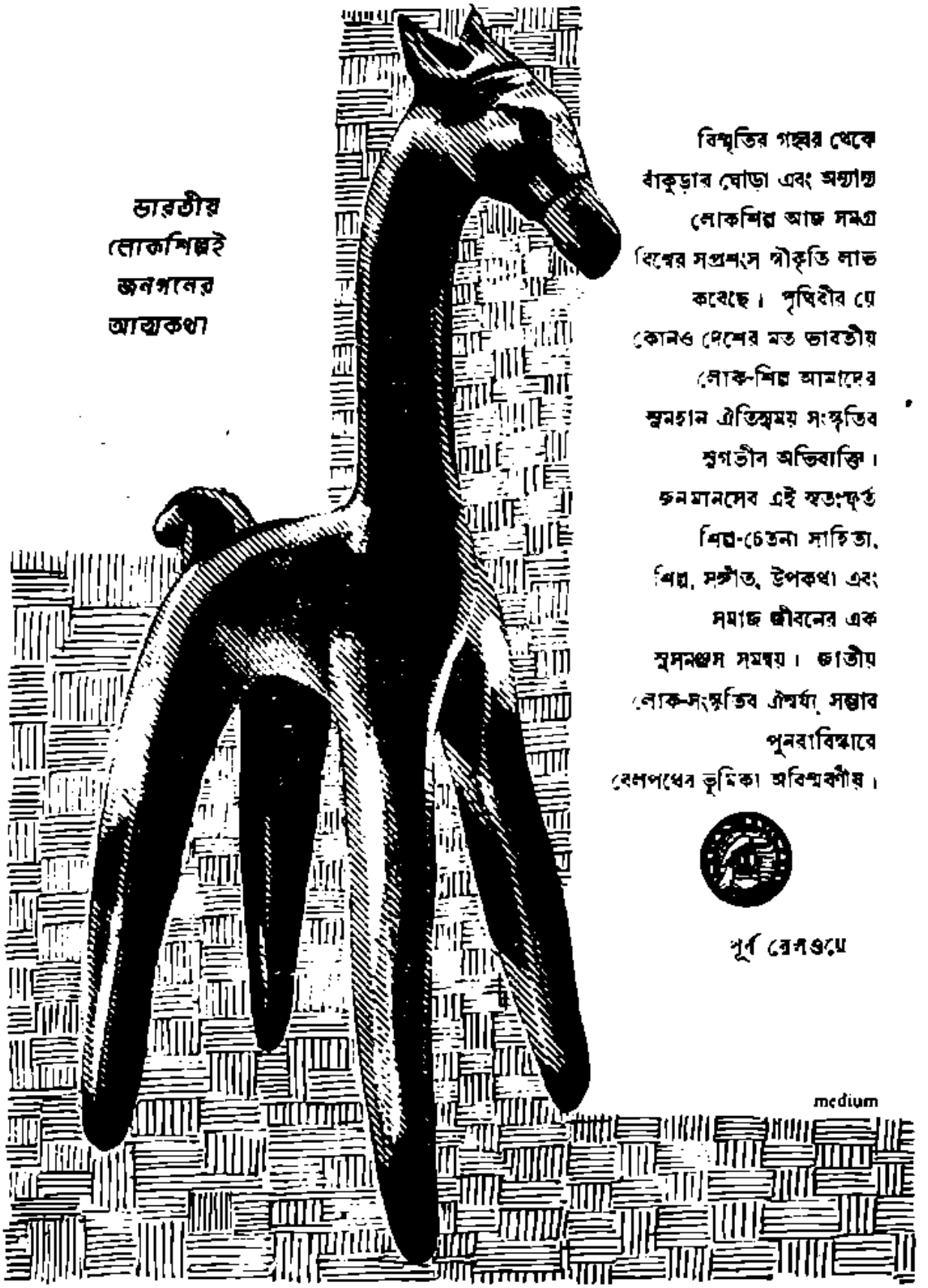

ভারতীয়
লোকশিল্পই
জনগণের
আত্মকথা

বিস্মৃতির গহ্বর থেকে
বাঁকুড়ার ঘোড়া এবং অন্যান্য
লোকশিল্প আজ সমগ্র
বিশ্বের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ
করেছে। পৃথিবীর যে
কোনও দেশের মত ভারতীয়
লোক-শিল্প আমাদের
সুমহান ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির
সুগভীর অভিব্যক্তি।
জনমানসের এই স্বতঃস্ফূর্ত
শিল্প-চেতনা সাহিত্য,
শিল্প, সঙ্গীত, উপকথা এবং
সমাজ জীবনের এক
সুসমঞ্জস সমন্বয়। জাতীয়
লোক-সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্য সম্ভার
পুনরাবিষ্কারে
রেলপথের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

সমঝদার লোকে জানেন
যে নতুন সাজে সিজার্সের স্বাদও নতুন

ইদানীং আপনি যদি
সিজার্স না খেয়ে থাকেন, একবার
ধরালেই বুঝবেন সিজার্সের তৃপ্তি এখন
অপূর্ব—টেনে সত্যিই আরাম।

সিজার্স নতুন সাজে, নতুন স্বাদে

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম. এ. ডি. লিট্ বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (কলি) ডি. লিট্ (লণ্ডন) বলেন :—শ্রীআয়ুর্বেদম্ কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

চ্যবনপ্রাশ :—সর্দ্দি, কাশি, শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ, জ্বরোগ দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রের ন্যায় কার্য করে। শক্তিহীন, ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য বলাবন। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, মেধা ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সকলের পক্ষে, সকল ঋতুতে সমান উপযোগী। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

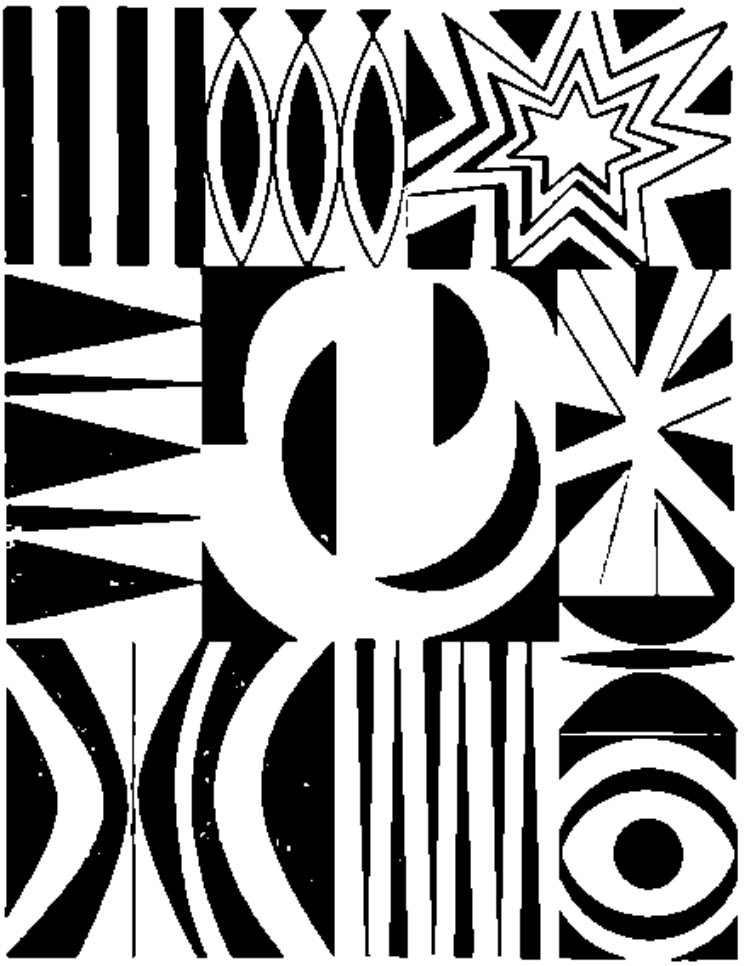

বেলজিয়াম ১৯৬৫ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ৯২,২৫০ জোড়া
জুতো কিনেছেন

Bata

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা এবং শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সম্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আপনি কি---

আপনার ছেলেমেয়েদের সত্যিই ভালোবাসেন

ছেলেমেয়েদের প্রতি মা বাবার ভালোবাসা শুধুমাত্র ভাবাবেগ নয়। চিন্তায়, কাজে এবং কথাবার্তায় ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়। ছেলেমেয়েদের ভালো খাওয়ানো পরানোর জন্য, তাদের সুস্থ রাখার জন্য, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মা বাবা অবিরামভাবে চেষ্টা করেন।

সুখের জন্য পরিকল্পনা করুন

সকলেই পারিবারিক সুখ ও আনন্দ চান। কাজেই উপযুক্ত আদর যত্নে যদি সন্তানকে বড় করে তুলতে পারেন তাহলেই শুধু সন্তান কামনা করা উচিত।

ভালো থাকার জন্য পরিকল্পনা করুন

সন্তান সংখ্যা যদি কম থাকে তাহ'লে যে আয়ই হোকনা কেন তাতে পরিবারের সকলেই অপেক্ষাকৃত ভালো খেতে পারে, পরতে পারে, শিক্ষা দিতে পারে। আপনার নিজের পক্ষে, আপনার দেশের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ নিন

এখানকার চিকিৎসক আপনার বন্ধু ও পরামর্শদাতা; সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখতে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

আপনার পরিবার যদি সুস্থ পরিবার হয় তাহলে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

DA 15/331 (Bengali)

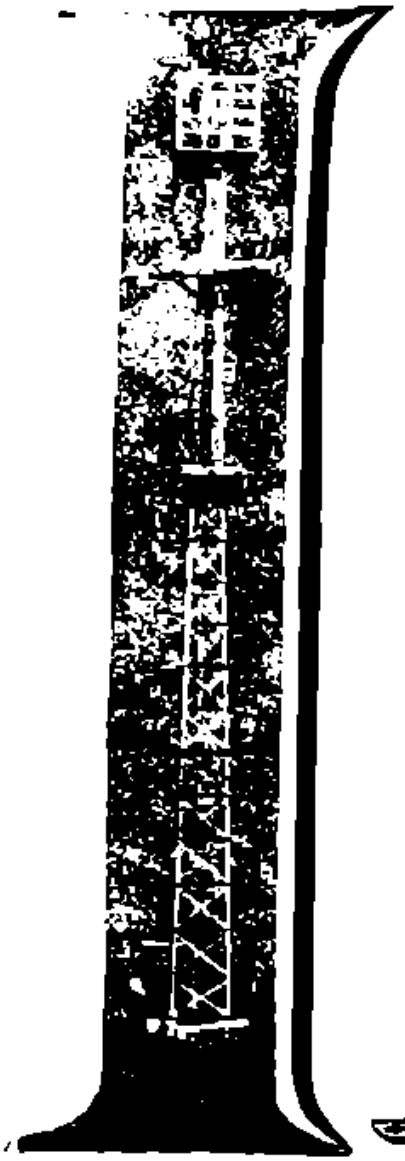

রাঁচি

আপনার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য রেলস্টেশনে অথবা জন-বহুল পথ ও সহরের উপরে আলোক-স্তম্ভে প্রস্তুত নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়ের আলোকপ্রদ আলোচনার সুযোগ আপনিও নিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন স্থানগুলি পাওয়া যেতে পারে:—

আলোকস্তম্ভ

খড়্গপুর • বার্ণপুর • টাটানগর • হাতিয়া (রাঁচি) • কটক • রাউরকেল্লা • ভিলাই • বিলাসপুর • ভিজিয়ানাগ্রাম ইত্যাদি।

পুরী

আলোকপ্রদ আলোচনা

রেলস্টেশন

খড়্গপুর • বার্ণপুর • টাটানগর • রাঁচি • ভুবনেশ্বর পুরী • কটক • রাউরকেল্লা • ডুংরি • ওয়ালটেয়ার।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিয়ন বিজ্ঞাপন স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব সমেত ভাড়ায় (বিদ্যুৎ ব্যয় সহ বা বিনা) প্রদত্ত হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য লিখুন :—
কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার
দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে,
গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩
ফোন: ৪৪-২২৩২

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেম সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে মেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

সারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম শ্রেণীর বিক্রয়কেন্দ্রে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই খোঁজ নিন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীকম্বিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাওয়ারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যামকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ভাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম ক্ষেত্রী; জয়কৃষ্ণ অবোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টালাবাজার—যে ব্রাদার্স, পরমেশ্বর দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৩-২৯৮০

"আলোর উৎসব দীপালি। আলোর বন্যায় রাতের আঁধার উদ্ভাসিত করে তোলার এই তো সময়।"—বলেন **ওস্তাদ অসরাম**

অসরাম ল্যাম্প ও টিউব যেমন চোঁকে বেশীদিন, তেমনি উজ্জ্বল আলোও দেয় বেশীদিন।

Osram

ল্যাম্প ও টিউব

আঁধারে আলোর উৎস

একটি **GEC** উৎপাদন

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড একটি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অবসাদ কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়াতে, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান – সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

২তের কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশতৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে গিয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে এক পল্লী-কবির জীবনের তথ্যচিত্র তোলার কাজে। সেখানে তিনি সমগ্র কাশ্মীর-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে লেখা তাঁর সেই কাহিনীর প্রথম অধ্যায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

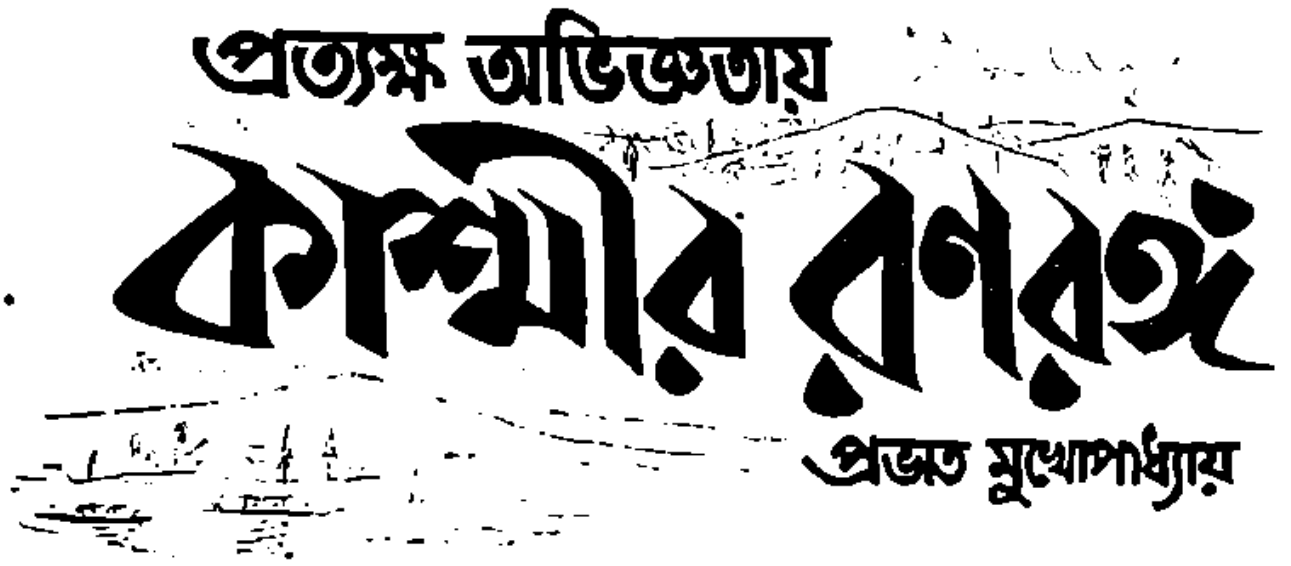

প্রথম অধ্যায়

● সেদিন ●

"তা'পর?"

"একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকে দিল ওকে যীশুর মতন। সারারাত ও নীচে কাঁপল, সারাদিন রোদ্দুরে পুড়ল। পরদিন সন্ধ্যায় ও যখন খাবার চাইল তখন নিচের গ্রাম থেকে ধ'রে আনা হল দুদিনের বাচ্চা সমেত ওর অসুস্থ স্ত্রীকে আর ওরই চোখের সামনে ফুটন্ত গরম জলে ওর ছেলেকে সেদ্ধ ক'রে থালাভায় তুলে ধ'রে বললে, 'নাও খাও!'

বাধা দিয়ে বলি—

"থাক রুকায়া, আর বলতে হবে না।" আমি উঠে দাঁড়ালাম। দুই হাঁটুর ওপর মুখখানা রেখে ও ব'সে যাচ্ছিল, দূর পাহাড়ের ওপারে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে। আমার কথা শুনে চোখ দিয়ে যেন ওর আগুন ঠিকরে পড়ল, বললে—"ফকীর মহম্মদ আটদিন ধ'রে সইতে পারল ওদের অত্যাচার আর তুমি শুনতেও চাও না? বস।"

"শুনে কি হবে?"

"তোমার দেশের মানুষকে জানাবে সে কাশ্মীরি ছুন খেয়েছে, নেমকহারামি করেনি।"

বাধ্য হ'য়ে বসে পড়ি। ও বলে চলে, "ফকীর মহম্মদ দেখেছে; দয়া চায়নি, কাঁদেনি, কথাও বলেনি। ওরা প্রতি চাবুকে হুকুম করেছে, বল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। ও প্রতি নিঃশ্বাসে জবাব দিয়েছে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!' রাগে অন্ধ হ'য়ে ওরা ওর শরীরের জায়গায় জায়গায় ব্লেড দিয়ে

কেটে তরতে আরম্ভ করল দুন আর লঙ্কা। এমনি ক'রে তিনদিন কাটার পর ওরা আরম্ভ করল অত্যাচারের নতুন পদ্ধতি।"

"কি?"

"সাঁড়াশি গরম ক'রে ওর চামড়া টেনে তুলতে লাগল। তাও তিনদিন প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায়। হিন্দুস্থানী কৌজ এসে দেখল, মানুষ নেই, আধপোড়া কালো একটা কঙ্কাল ঝুলছে।"

• • • •

পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে পা দুটো যেন আর চলতেই চায় না। কোন রকমে সামনের বড় পাথরটার ওপর এক লাফে উঠে নিচে হাত বাড়িয়ে আমি রুকায়াকে টেনে তুললাম। পাখীর ওজন ব'লে পালকের মতন উঠে এলো। এক পলক নিঃশ্বাস নিয়ে ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করলাম—"আর কতদূর?" রুকায়া দুফোঁটা সোনালী চুল ওর ঘর্মাক্ত মুখ থেকে আলতো সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চারিদিক ভালো ক'রে দেখে, এ পাহাড় ও পাহাড়ের কি একটা হিসেব ক'রে বললে, "আধ কোশ।" বলতে বলতে ও পাথরটার শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেল, আমিও দু পা সামনে সরলাম। এমন তন্ময় হ'য়ে ও তাকিয়েছিল যে, ওর ঠিক পেছনে এসে আমার দাঁড়ানোটা বুঝতেই পারেনি। ইচ্ছে করছিল পেছন থেকে ওর কাঁধ দুটো আলতো ভাবে ধ'রে, ওকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওর ভুলে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক এই দুর্গম ময়দানের অসীম সৌন্দর্য্যকে সার্থক করি। কাশ্মীরের দুর্গম ময়দান হল প্রেয়সীর সেই পরিপূর্ণতা যা প্রেমের শেষ স্তরকে পৌঁছে তবেই পাওয়া যায়, অনেক বিধার পর, অনেক আনন্দ পেরিয়ে, অনন্তকে পাওয়ার অসম্ভব সাধনার পর, একেবারে অতর্কিতে।

হঠাৎ ঘুরতে গিয়ে আমার গায়ে হালকা ধাক্কা লাগল। আমার বোধহয় মনে হল ও টলে পড়ছে, তাই চট ক'রে ধ'রে ফেললাম। ও যেন একটু শিউরে উঠে বললে, "শীতের হাওয়া। চল, যাওয়া যাক।"

দুপুরটা শেষ হয়ে আসছে। সেই ভোরে শুলমার্গের ওপর আবদুল হামিদের বাড়ীতে এক পেয়ালা কাবা আর দুখানা ক'রে রাখরখানি খাওয়ার পর সেই যে আমাদের পাহাড় ভাঙা শুরু হয়েছিল, পথে একবারও থামিনি। কথাও থামাইনি। রুকায়া একবার আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমাদের একটা প্রবাদ আছে, চড়াই উঠবার সময় কথা বললে ভুতে পায়!"

আমি হেসে বললাম, "আমায় আজ কথায় ভুতে পেয়েছে, কাশ্মীরি ভুতকে ভয় নেই!" অনেক কথা হ'য়েছে ওর সঙ্গে; এলোমেলো, নিজেদের একদম বাদ দিয়ে; শান্ত মনে শুদ্ধ আবেশে অসীম বেদনার কথা যার মধ্যে এখন আর কোন ব্যথা নেই, বেদন মকবুল শেরওয়ানি, বেদন রুকীয় মহম্মদ আর তার ছেলে, বেদন আগামী কাল আমার মেশে ফেরা, বেদন আর কখন ওর সঙ্গে এইভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে না ঘোরা, বেদন আপন আপন জগতে নিজেদের হারিয়ে ফেলা। ও কখন শুনেছে, কখন ছোটখাটো জবাবও দিয়েছে। আমাদের মনের ইচ্ছে আর মুখের প্রতিজ্ঞা যাই থাক, গলার স্বর ছিল মিলন-রাতের শেষ প্রহরের মতন শান্ত, ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত।

বড় পাথরটার ওপর ঐ ছোঁওয়াটুকুর পর, দুজনেই কথা হারালাম, একেবারে নিঃশেষে যে ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই গড়েছিলাম সেটাও বোধহয় একটু ফাটল ধরল বলেই। ছোট বড় পাথরের পাশ দিয়ে এক ফালি পথ। পাশাপাশি চলেছি দুজনে নিবিড় নিস্তব্ধতায়। রুকায়ার পায়ে নাগরা,

চলার শব্দ নেই। আমার পায়ে হবার দেওয়া জামাটি, তারও কোন শব্দ নেই, তবুও যেন প্রতিশব্দ শোনা যায়। পায়ে পায়ে পথ হাঁটছি আর মনে মনে হিসেব করছি। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। ওর ধবধবে পা দুটোর গড়ন একেবারে মিটোল। চার মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট। চারিদিকের গভীর নীরবতায় আমাদের নিকটত্ব নতুন ক'রে নিবিড় হচ্ছে, মনটা আর একবার মুখর হ'তে চাইছে। আমাদের ছোট্ট চলার শব্দে অনেকখানি মাধুর্য, টানাটানা নিঃশ্বাসের শব্দে অসীম আনন্দ, কাঁধে কাঁধ না লাগা আর হাতে হাত না ছোঁওয়ার মধ্যে অনেকখানি কাছে আসা। বুঝতে পারছি, বেশী নয়, আর এক পলক তারপর এই নিস্তব্ধতাই হয়ে উঠবে ওকে আমার অনেকখানি কাছে পাওয়ার ঐকান্তিক আবেদন। ও হঠাৎ বলল, "তুমি কি আমায় নিয়ে বই লিখবে?"

"হয়ত। কোন একদিন।"

"কি লিখবে?"

"তুমি যা।"

"সব লিখবে? সব?"

"হাঁ, সব। সব।"

"আর আমার স্বামীর কথা?"

"তাও লিখব।"

"কি লিখবে?"

"তিনি ভগবানের ঈর্ষা।"

রুকায়া থেমে গেল। এক পলক দেখল আমায়। অনেকখানি দেখা, বেশ খানিকটা অবিশ্বাসের, অন্ধকারে তারপর আবার চলতে চলতে বললে, "তাই কি?" মনে হল ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। না করারই কথা। কামালের সঙ্গে আমার আলাপ দুদিনের, কথা এক রাত্রের। অনেকটা ঠিক মাঝরাতে দেখা আর শেষ রাতে ফুরিয়ে যাওয়া ছোট্ট স্বপ্নের মতন। অন্ধ, আবছায়া, বেশীটাই আজ যেন অস্পষ্ট। কামালকে আমি কতটা বুঝেছি আর কতটা বুঝিনি সেই বোঝাপড়ায় ব্যস্ত হ'য়ে মনটা দুই ময়দানের পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল অসহায়ের মতন। এবার শুনলাম কাছে কোথাও অজানা পাখী ডাকছে, ঘুরে কোথাও অ-দেখা ঝর্ণা ঝ'রে যাচ্ছে, চারিদিকে অচেনা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। কামালের কথা মনটাকে আবার বে-সামাল ক'রে তুলল। আর একবার দেখা হবেনা ওর সঙ্গে? আর একবার ওর শেষ কথাগুলো শোনা যায় না—শুনতে শুনতে রুকায়ার সঙ্গে ওর ভাঙা জীবনের কথা না ভেবে, ওদের দৈহিক মিলনে রুকায়ার বিকৃতা কল্পনা না ক'রে? সেটা আর সম্ভব নয়। কাশ্মীরে আমার থাকার মেয়াদ নেই, ওর সঠিক কোন ঠিকানা নেই, বন্ধুক, কাঁধে ও ছুটে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, পাকিস্তানি হানাদারদের ধাওয়া করে। আঠারো বছর ধ'রে এই ওর জীবনের ধারা।

দেশের সেবা করতে করতে হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়িয়ে ও নিজের দিকে তাকিয়ে রুকায়াকে কাছে টেনেছিল, বিয়েও করেছিল, কিন্তু ঘর বাঁধেনি। সামাজিক নিয়মে সংসার পেতেছিল কিন্তু সন্তানকে কাছে পাওয়ার অবকাশ পায়নি। রুকায়া ওর ঘরে ছিল কিন্তু মনে ছিলো না, আর যখন মনে পেতে চাইল তখন রুকায়া মনে মনে মরে গেছে। নিজেকে ও বোঝেনি, বোঝাতেও পারেনি। আজ

তাই ওরা ঘরের জগতে দুই আলাদা মানুষ, বাইরে ওরা একই জগতের দুই অভিন্ন মানুষ, একজন দেশের দোর আগলায় আর অন্যজন ঘর সামলায়। মাঝে মাঝে ওদের দেখা হয় পাহাড়ের বাজারে আর কথা হয় হাটের মাঝখানে। ওদের পারস্পরিক চাওয়ার চাহিদা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বহুদিন আগে বিনিবিনি হয়ে গেছে। আজ ওদের মধ্যে সামাজিক বাঁধনের শৃঙ্খলটা-ই শুধু বাধার সুরে বাজে।

দালওয়ালটা আলতো ভাবে একটু দুলে, ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে রুকায়া আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ সেই গাছ, তুমি যাকে বলেছ স্বাধীনতার তীর্থ।"

"কিম্বা, পাকিস্তানের কবর!" ওরই মতন আমিও জুতো পরা পা দুটো জলে ডুবিয়ে বরফে দাঁড়ালাম। বরফের ওড়না গায়ে দেওয়া পাহাড়টার ঠিক পায়ের তলায় প্রকাণ্ড ঘন সবুজ মাঠের শেষ প্রান্তে একটা মাত্র ভূত গাছ। আর তার মাথার ওপর মনে হল একটা ফ্ল্যাগ উড়ছে।

জায়গাটার নাম তুষ ময়দান বলেই এ অঞ্চলের ভেড়াদের লোমে যে আলোয়ান তৈরি হয় তাকে বলা হয় তুষ। সামনের পাহাড়টার মাঝখানে যে খাঁজটা আছে তার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে মাইল পাঁচেক নামলেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের এলাকা। ও পারে আমাদের পাহারা আছে কিন্তু কাজে মন নেই। থাকলে, পাঁচ হাজার হানাদার এই পথে এসে ময়দানে ঘাঁটি গাড়তে কখনই পারত না।

এইটাই এখানে ভেড়া চরাবার সময়, কিন্তু জনমানব নেই। আমাদের বাঁ দিকে খাড়াই ভাবে পাহাড় নেমে গেছে দু আড়াই হাজার ফুট। তার নিচে গ্রাম। সারা শীত ওরা ঐখানে থাকে আর বসন্তের প্রথম বাতাসের ইশারা পেলেই হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে এইখানে উঠে আসে চার মাসের জন্যে। এক হাতে বাঁশী আর অন্য হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে ওরা প্রকৃতির অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। রুকায়া বললে, ওরা গরীব কিন্তু গর্বের সীমা নেই। হাজার হাজার বছর ধ'রে এই ভাবে ওরা জীবন কাটায়; সত্যভাকে জানেও না, মানেও না। ওরা বলে, খুদা ওদের পাঠিয়েছেন এইখানকার রাজা ক'রে, নিচের মানুষদের কৃতদাস হবে কোন দুঃখে? আজও ওদের ধনী দরিদ্রের মাপ হল বাঁশের চাটাই আর তুষের কম্বল। যার বাড়ীতে তিনটে চাটাই আর দুটো কম্বল সে হল রীতিমত বড়লোক।

ঝর্ণা পেরিয়ে একটু নামলেই মাঠের শুরু। মাঠে নেমেই মনে হল ঘাস নয়, মখমল। জুতোটা খুলে হাতে নিলাম। ভিজে পা দুটো যেন জমে বরফ হ'য়ে যাওয়ার জোগাড়। রুকায়া বললে, "কলকাতার বাবু, এ কাজ তোর না, শরীর তোমার সইবে না।" ও কিন্তু জুতোটা খুলল না, পা দুটো ফেলেই দিল টান মেরে, বললে, "এখানকার বাতাসে বরফের যাদু আছে। বয়সটা হাজার বছর কমিয়ে ফেলে!" বলে ও দুই দিল বছর বারো বয়স কমিয়ে ছেলেমানুষের মতন।

সত্যিই বোধহয় তাই। ওর ছোটার পেছনে মন ছুটিয়ে দেখি আমাদের পনেরো দিনের একসঙ্গে পথ চলা পেছিয়ে ফেলে পৌঁছে গেছি কলেজের ক্যাম্পাসে। শোভা কেমন আছে কে জানে? ওর স্বামী তো শুনেছি রাজদূত, আছে বোধহয় আমেরিকা কি আরব দেশে। চাকায় নয়ত? আর রেডিওর রেবা? হঠাৎ মিলিয়ে দেখতে মন চাইল। রেবা আর রুকায়া কি একই মানুষ? চেহারার কথা বলতে পারি, মনটাকে বুঝিনা, রেবারও না আজ আর রুকায়ারও না। সংসার পাতার বংশ রেবার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলাম, ধরা দেয়নি। সংসার থেকে পালিয়ে এসেছি ব'লেই রুকায়া আমার জীবন জুড়ে বসেছে। চক্রাকারে যে মানুষটা আমাদের এই ভাবে চালিয়ে নিয়ে যোরায়, সে কে? ভাগ্য না ভগবান?

"শয়তান!" গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ফকায়া আবার আকাশ, ছোঁওয়া চিৎকার ক'রে উঠল, "শয়তান!" পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি হল।

"শয়তান! শয়তান! শয়তান!"

গাছের গুঁড়িতে পেরেকগুলো এখনও আছে। দু'পায়ের জন্যে দুটো, গলার দুধারে দুটো। আর আছে রক্তের কালো কালো দাগ আর সেপাইয়ের কিছু চিহ্ন। তারা স্যাকিং কেসের ডালাটা গাছটার ডানদিকে গজ দশেক দূরে ফেলেছিল। তার ওপর কাঠকয়লা দিয়ে উর্দুতে কিছু লেখা। অস্পষ্ট কিন্তু পড়া যায়। তুলে এনে বললাম, "কি লেখা আছে?" ফকায়া আস্তে মুখ ঘোরালো। দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁটের কোণটা চাপা, চোখে জলের ধারা। সেপাইটি ওর পাশে দুটো ধনুকের মতন কাঁপছে। পড়ার একটু চেষ্টা করেই ও আমার কাঁধের ওপর টলে পড়ল, ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে কাঁদতে।

সমবেদনার সীমা ভালোবাসার অসীমে মিলিয়ে থাকে আর ভালোবাসার একটা বড় ভাষা হল দেহ। ওর স্পর্শ পাওয়ার শিহরণে আমার আদর্শ-আফিংয়ের নেশাটা যেন কেটে গেল, আবার ওকে কাছে পাওয়াটা দৈহিক সীমানায় দেখা দিল। আমার বুকে মুখ গুঁজে ও কাঁদল। ওর চুলের গন্ধে আমি কামালের শেষ কথাগুলো আবার শুনলাম, এবার স্পষ্ট, ঠিক যেমন ভাবে ও বলেছিল:

"ওকে আপনি নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। সে ঋণ কোনদিন আমি ভুলবোনা। তাই ভেবেছিলাম বলব বলে। সে আপনাকে ভালোবেসে মুগ্ধ হ'য়েছে বলেই হয়ত আমার প্রতীক্ষা সফল হবে। আপনার ভালোবাসাতেই আছে আমার মুক্তি।"

কামালের এই কথাগুলো আমি ফকায়াকে বলিনি, বোধহয় কামালের ঈর্ষায়। আমার জীবনেও এই ধরণের একটা দিন এসেছিল কিন্তু তার ঋণ আমার শোধ হয়নি। কামালের মতন এমন সহজ মনে আর স্থির বিশ্বাসে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিসেব চোকাতে পারিনি। স্বার্থের অহংকারে কিছুটা হারিয়েছিলাম। সে কথাটা আবার নতুন ক'রে মনে পড়তেই বাহু বন্ধনের নিবিড়তা যেন খানিকটা শিথিল হল। ফকায়ারও নিশ্চয় অমনি ধারা কিছু একটা মনে হল, হয়ত আমারই কিছু কথা। ও স'রে গিয়ে চোখটা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল:

"সাবধান। আমাদের আসার খবর ভারতীয় কাফেরদের যে জানাবে তারই এই অবস্থা হবে।"

গাছটা থেকে গজ কয়েক দূরে যে ছোট্ট টিলাটা আছে, তারই ঠিক পাশে হিন্দুস্থানী ফৌজ ওদের—ওর আর ওর ছেলের কবর খুঁড়েছিল। গিয়ে দেখলাম সেখানে অল্প অল্প ঘাস গজিয়েছে। মোমবাতি ও একটা এনেছিল ফোলার ভ'য়ে এই খবরটার আলোয় বসে। সময়ে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে ফকায়া বলল, "স্মৃতির পুজোয় আমরা নমাজ পড়ি। তোমরা কি কর?"

ভাববার কথা। সত্যিই তো, কি করি? ভেবেই পেলাম না, তাই কাষা ক'রে বললাম, "অতীতকে মনে মনে সেলাম ঠুকে, ভবিষ্যতকে সামলাবার জন্যে হাতের মুঠো শক্ত করি।" কেন এরকমটা বললাম ভাবতে থাকি ওকে ভেবে, না ওর স্বামীর কথা ভেবে? কে জানে। ও একটু হেসে বললে, "তার আগে হাতটা একটু ছড়াও, আর বাতিটাকে বাতাসের হাত থেকে সামলাও। আমি নমাজ সারি।"

আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম হাতটা বাড়িয়ে। মনটা কবরের কিনারায় ছোট্ট লাল

ঘাসফুলটার গায়ে গিয়ে পড়ল। পঁচিশ বছর আগে এমনি একটা লাল ফুল রেবা আমায় দিয়েছিল তার ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। মুখে বলতে পারেনি তাই ফুলের ভাষা ধার করেছিল। তারপর অনেক পরিবর্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে জগতে এবং জীবনে, কিন্তু আমার প্রথম জীবনের সে সৌরভ, শেষ যৌবনের পরিণতিতে আজ আমার তার পরিপূর্ণ সত্তায় ফুলে ওঠে। ফকায়ার প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক কিন্তু ঐ ছোট্ট লালফুলের গায়ে কোথায় যেন আজ সেটা একটু হোঁচট খেলো। এটাই কি আমি যাকে বলি 'সেন্টিমেন্ট'? না, ফকায়ার আত্মিক আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এটা আর এক আদর্শের আড়াল? যাই হক আমার সেই অতীতকে সেলাম ঠুকে সামনের ভিক্টরকে সামলাবার জন্যে মনের মুঠো শক্ত ক'রে ধরি। সমাজের নানান ভঙ্গিমার ওকে আরও যে অনেকখানি ভালো লাগছে তাতো বুঝতেই পারছি। আত্মসঙ্গের আড়াল থেকে স্বার্থ উঁকি মারছে আবার আদর্শের আচ্ছাদনও আছে।

স্মৃতির পুজো শেষ করে ফকায়া শুয়ে পড়ল ওর লাল চাদরটার ওপর। আমি ছোট্ট টিপিটাতে ঠেসান দিয়ে বসলাম ওর মাথার কাছে। দমকা বাতাসে বাতিটা নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল।

"কি হল?"

"পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ!" তাকিয়ে দেখি গাছের ওপর সেটা আধ-ছেঁড়া হ'য়ে উড়ছে। ও ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট তেরঙা ফ্ল্যাগ বের ক'রে বলল, "এটা উড়িয়ে ওটা নিয়ে এসো!"

"এই সেরেছে!" আমি একবার ওপর দিকে তাকিয়ে বললাম, "কলকাতার মানুষ, অহংকারের উচ্চতম শিখরে উঠতে পারি, খোসামোদের কথা শুনলে সবার ওপরে উঠতে পারি আর পকেটে যদি ট্যাকসির পয়সা না থাকে তাহ'লে বড় জোর দোতালা বাসে, কিন্তু? পারব না!"

ও দাঁড়িয়ে বললে, "এই যে সবাই বলে বাংলাদেশ হল বীরের দেশ?"

"আমি হেসে বলি, "ছিল। এখন ওখানে আছে তিন জাতের পুরুষ হয় বর, নয় বার আর না হয় বর্বর!"

"ইয়া আল্লাহ!" ও গায়ের চুমকিটা কোমরে জড়িয়ে চট ক'রে চলে গেল। আর দেখতে না দেখতে একেবারে মগডালে। চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্ল্যাগটা সটাং নিচে ফেলতে ফেলতে বললে, "দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দাও!" আর আমাদের ছোট্ট তেরঙাটা উড়িয়ে দিয়ে বললে,

"হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ!" সিনেমা হলে জনগণমন শুনে দাঁড়িয়েছি আর লাল কেল্লায় জহরলালের প্রথম পতাকা উত্তোলনও দেখেছি কিন্তু আজকে ঐ তেরঙা দেখে এমন তড়িৎ শিহরণ আগে কখন অনুভব করিনি। আজ মনে হল, আমি সৈনিক হলে ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়াতে পারতাম, প্রয়োজন হলে প্রাণও দিতে পারতাম, জীবনের কোন প্রতীক্ষাকেই বাসাই রাখতাম না। ফকায়া ওর চুমকিটা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে দাঁড়াল আর আমি আমার দেশলাইটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা চেপে ধরল তারপর বড় বড় চোখ তুলে বলল, "থাক্। পোড়াবোনা।" তারপর এসে ও চিপিটার আধাআধি জুড়ে দিয়ে এলিয়ে বসল, প্রথম দিনের জ্যোৎস্না জোয়ারে যেমন নৌকায় বসেছিল নারীত্বের নীরব প্রতীক্ষায় ভরা ইশারা দিয়ে। আমাদের এতো কথা, বলার একটা ভঙ্গিতে ও যেন বাতিল ক'রে দিল। মনে হল ও হঠাৎ বদলে গেছে। কিন্তু

হালকা, কিন্তু সচকিত। চুলির আঁচলটা কিছু বেশীই বোধহয় সরিয়ে নিয়ে মুখটা মুছল, বললে, "সেদিন তোমায় কামাল কি বলেছে?"

"অনেক কথা।"

"আমার বিষয় ঠিক কি কি বলেছে।"

হাসলাম। আমি ঠিকই জানতাম কোন এক অবসরে এ কথাটা ও জানতে চাইবেই। এতোদিন কেন যে চায়নি সেইটাই আশ্চর্য। মেয়েদের পেটে কথা থাকেনা, অন্তকে আবার রাখতেও দেয় না। তবু ছিল সারাদিন পথ চলার পায়ে পায়ে আর নানান কথার ফাঁকে ফাঁকে ও ঐ প্রসঙ্গটা না আবার তুলে বসে। ওর কৌতূহলকে আমি ভয় পাই না, কারণ ওর কাছে আমার কিছুই গোপন নেই কিন্তু ওর স্বামীর কথা উঠলেই আমার মনটায় কোথায় যেন আঘাত লাগে। কথাটা তাই এড়িয়ে যাওয়ার জন্তে বলি: "তার আগে তুমি বল, ওকে আমার কথা তুমি কি বলেছিলে?"

"সব। যা কিছু ঘটেছে।

"সাহস পেলে কি ক'রে?"

ও হাসল, একটা পাথর কুচি নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "সত্যিটাই তো আমার জীবনের সম্বল।"

ছোট্ট ক'রে এবার ওর প্রশ্নের জবাব দিলাম, "সেইটাই ও আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।"

"আর কিছু? যা বলেছে সব বল।"

"তার আগে তুমি কিছু বল।"

"কি?"

"এমন সুন্দর মানুষটাকে তুমি বোঝনি কেন? তোমার এতো বুদ্ধি।"

পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটাকে এতোক্ষণ ও পা দিয়ে নাড়ছিল, এইবার হাত বাড়িয়ে ও মুঠো ক'রে তুলে নিল। বুঝলাম ঐটাই বোধহয় ওর বেদনার প্রতীক। ও বললে, "বুঝিনি কারণ ও কখন আমায় বোঝেনি। পোনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম বোর্খার অন্ধকারে, সংসারের আশায়, গরীব ঘরের অশিক্ষিত মেয়ে। শেখ আবদুল্লাহ যেদিন আমাদের আকাশে নয়া কাশ্মীরের লাল পতাকা তুলে দিলেন ও আর জায়নাল বেরম আমায় সেদিন ঘর থেকে বের ক'রে আনলো দেশের কাজে ডাক দিয়ে। আমি দেশ চাইনি, ওকে চেয়েছিলাম। তাই মার কান্না আমার কানে আসেনি, বাবার কথা বুঝিনি, কাশ্মীরি মুসলমান সমাজের আস্ফালন আমার পথ আটকায় নি। আমি নির্মুক্ত মনে বোর্খা ফেলে বেরিয়ে এসেছিলাম আর সঙ্গে এনেছিলাম কাশ্মীরি মেয়েদের নব-জাগরণ। কেন? কি ক'রে? আমি তার কিছুই জানিনা। শুধু জানি, দেশের জন্তে নয়। ও চেয়েছিল ব'লে। পাড়ায় পাড়ায় আমি বোর্খা পুড়িয়েছি ও ব'লেছিল ব'লে। যেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ইংরেজ জানবের ওপর পাশবিক অত্যাচার ক'রেছিল প্রকাশ্য রাজপথের ওপর তাদের ধর্ষণ ক'রে, সেদিন অবিবাহিত, অশিক্ষিত মেয়ে আমি কামালের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা ক'রেছিলাম, ওর কাছে থাকতে পাবো ব'লে আর সেদিন গামপোরের আস্তরাণ ক্ষেতে লক্ষ ফুলের মধ্যে আমার যৌবনের প্রথম ফুল আমি ওকে দিয়েছিলাম তাও ওরই কথায়, ঐকান্তিক বিশ্বাসে পরিপূর্ণ আনন্দে।"

"জানি।"

"আমি সাধু চাইনি, আমি সন্ন্যাসী চাইনি, সৈন্য চাইনি, আমি স্বামী চেয়েছিলাম। আমি ধ্বংসের কাজ চাইনি, সৃষ্টির আনন্দ চেয়েছিলাম। আমি শুধু সন্তান চাইনি, সঙ্গে সংসারও চেয়েছিলাম। এক পলকের আনন্দ ভিক্ষা দিয়ে ও আমার একমুঠো ধুলোর মতন চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি বিলেত আমেরিকা ঘুরে ডিগ্রি আনতে চাইনি, আমি দোকান থেকে চাল কিনে এনে চুলা ধরাতে চেয়েছিলাম।" এক পলক থেমে সেল ফকারা। কোথাও আবার পাখী ডাকল, কোথাও ঝিঁঝিঁ ডাকল, গাছের ওপর ছোট্ট ফ্ল্যাগটা দমকা বাতাসের দোলায় আমার মনে আর এক ঝলক মুক্তির আস্বাদ এনে দিল। ফকারা পায়ের কাছে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা ছড়িয়ে বললে, "তুমি সেদিন পঁয়তাল্লিশ কোটির দোহাই দিয়ে বললে, আমরা ভালোবাসা বলতে যা বুঝি ও দেশ বলতে তাই বোঝে। তাই যদি হত তাহ'লে যেদিন শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীর বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করল সেদিন ও মদ খেয়ে মাতাল হত না, তাকে গুলি ক'রে মারত; পারল? যেদিন বক্সি গুলাম মহম্মদ ভারতের কোটি কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরে, লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরিকে অনাহারে মারল সেদিন পুরুষের মতন তাকে গুলি না ক'রে মেয়েদের মতন গালিয়ে সেল সেকচার দিতে। হানাদার দেশের শত্রু নয়, আসল শত্রু কামালরা যারা অন্যায় সহ্য করে।" থেমে সেল ফকারা, ক্ষুব্ধ অভিমানে মনটা ওর কত বিক্ষত। প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করাই উচিত ছিল। ও আবার বললে:

"তোমায় আমি কথা দিয়েছি কামালকে জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার। সে কথা আমি ঠিকই রাখবো। কিন্তু কেন জানো?"

"দেশের জন্যে?'

"না।"

"আমার জন্যে?"

"তাও না।"

"তাহ'লে?"

"জীবনের বিরুদ্ধে ওটাই হবে আমার জেহাদ।" ক্লান্ত হ'য়ে আমার হাঁটুতে মাথা দিয়ে ও এলিয়ে পড়ল। ওর জন্যে মায়া হল। ও বেদনায় সিক্ত, ও নিরাশার হাহাকারে ভিমিত, ও অসহায় রিক্ত। মাথায় সান্ত্বনার স্পর্শ দিয়ে বলি, "এ জেহাদ শেষ হবে কবে? আর কেমন করে?" ও তাকায় আমার দিকে। কিছু বলে না। আবার জিজ্ঞেস করি, "বললে না তো?"

"আজ হ'তে পারে", ও উঠে ব'সে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা টান টান ক'রে বিছিয়ে দিয়ে বললে, "এক্ষুনি!"

"কি ক'রে?

"এই ফ্ল্যাগটাকে মাটিতে নামিয়ে ও হিন্দুস্থান আর কাশ্মীরের মিলনটা পূর্ণ করবে বলে ঘুরে মরছে আজীবন। এইটাই ওর সৃষ্টির সাধনা। তাই না?"

"হাঁ।"

"তোমার সৃষ্টির সাধনা আমি জানি। আজই আমার জেহাদ শেষ হয় যদি স্বাধীনতার এই তীর্থে তুমি আমায় সেই সাধনায় দীক্ষিত কর।"

"রুকায়া!"

"চমকে উঠোনা। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি ঘরের মানুষ, বুদ্ধি দিয়ে আমার জীবন চলবে না। সেদিন কামালের জন্যে তুমি আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিলে। আমি দিয়েছি। আজ আমি নিজের জন্যে তোমার কাছে ভিক্ষের ঝুলি পাতছি, তুমি না বোল না।" হাঁটু মেড়ে বসল আমার সামনে, বললে,

"বল দেবে!" অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম, ভেবেই পেলাম না কি বলব।

ও-ই আবার বললে,

"কামালের কথা ভাবছো? বিনামূল্যে কি মুক্তি নেবে? তাছাড়া, ওতো আমায় পেলেও, দেশকে ভুলবে না। আমি কি নিয়ে থাকব?" থেমে ও বললে,

"বল, দেবে?" আমি চুপ করে রইলাম, কথা জোগালো না। ও উঠে দাঁড়াল, বলল,

"দাঁড়াও আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"আমাদের ধর্মে ধর্মে মসজিদে ঢোকবার আগে মুখ হাত ধুয়ে পবিত্র হ'য়ে নাও। তাই যাচ্ছি ঐ ঝর্ণায়। যাবো আর আসবো!"

রুকায়া চ'লে গেল, আমি হতবাক হ'য়ে ব'সে রইলাম। একদিকে আমার কামালের হতাশা অন্যদিকে রুকায়ার দাবীকায়। কামাল দেখেছে আমার ভালোবাসার তার মুক্তি। রুকায়া চাইছে তার নিজের মুক্তি। ওদের দুজনের মধ্যে আমি কে? আমি কোথায়? আমি কেন? আর রুকায়া যা চেয়েছে তাই যদি হয় তাহ'লে কামাল পাবে তার পথ, রুকায়া পাবে তার পাবের আর আমার জন্যে থাকবে কেবল পথের ধুলো। ভাগ্যের অনেক ঘড়যন্ত্র উত্তীর্ণ হ'য়েছি কিন্তু এবার বোধহয় নিঃশেষেই হারালাম। একটা নিখিলেশের বোঝাই আমার সয়না—আরও? এমনি ধারা নানান ভাবনায় এমনই হারিয়েছিলাম যে গুলির প্রথম আওয়াজটা শুনিনি আর শুনলেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। চমক ভাঙল যখন রুকায়ার আকাশ ফাটা আর্তনাদ কানে এলো।

"কামাল!"

ঝর্ণার জলে মুখ গুঁজে রুকায়া পড়েছিল বড় পাথরটার মাথা আটকে। রক্তের একটা ধারা গোলাপী গাঙের মতন স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, নিচের গ্রামের দিকে, শ্রীনগরের দিকে, কিসানের দিকে। আমি জলে নেমে ওকে কিনারায় তুললাম, মাথাটা আমার কোলের ওপর রাখলাম। গোলাপী গাল দুটো ধ'রে মুখখানা তুলেও ধরলাম। ওর চুলগুলো ভিজে, মুখের ওপর মুক্তোর মতন কয়েক বিন্দু জল। ঠোঁটের কোণে ঠিক একবিন্দু রক্ত। বাঁ ধারের কাঁধের ঠিক তলায় গুলি লেগেছে। সেখানে পোড়া দাগ, এক চাপ রক্ত। আরও গুলির আওয়াজ এলো পরপর তিনটে। একটা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া, কারণ সামনের বড় পাথরটার একটা কোণ ভেঙে জলে পড়ল। বোধহয় সেই জন্যেই ওপর থেকে মানুষ পড়ার শব্দ আমি পাইনি।

আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো পাঞ্জাব আর্মড পুলিশের সেপাই রামভরোসা সিং। তখনই ওর বুকটা শেষ বারের মতন কেঁপে কেঁপে উঠে থেমে গেল। আমি ওকে আস্তে নামিয়ে, ওপরে উঠে পাথরটার ধারে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকেই দেখলাম, বাঁ ধারের গাছের তলায় দু'জন

সেপাই একটা লোককে ধ'রে ঝর্ণার জল থেকে তুলছে। আর দেখলাম, জলের ছুটে-যাওয়া গতি, কোথাও একটা ঘূর্ণি, কোথাও জলে ভাসা ফাঁওলা। আর দেখলাম রুকায়ার রুমালটা। তুলে নিয়ে এলাম। ঐটা হাতে নেওয়ার পর কান্না এলো। কামালের জন্যে কেঁদেছিলাম। আর আজ কাঁদলাম রুকায়ার জন্যে।

তখনই, মনে হয় কেউ একজন কোন সময় বলেছে, রুকায়া যখন জল খাচ্ছিল তখন গাছের ওপর থেকে রাইফেল ছুঁড়েছে যে লোকটা সে পাকিস্তানি হানাদার, নাম আবদুল কাদের, ইলেভেনথ্ এ কে ডিভিসনের সেপাই; টাস্ক ফোর্স বারামুলা ব্রিজ, নম্বর ৩৬২৩১। আরও বলেছে, প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে ওরা এসেছিল।

• • • •

ফেরার আগে কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই গামগোরের ময়দানে, আকরাণ ক্ষেতের আলের ধারে। রুকায়ার সংবাদ ও জানত না, আমিই দিলাম, আর দিলাম ওর আঠারো বছরের আসল লক্ষ্য—ছেঁড়া পাকিস্তানি ফ্ল্যাগটা। কি ওর হাতে তুলে দিলাম তা শুধু ওই জানে—মুক্তি না মৃত্যু!

॥ দুই ॥

পাড়ার কথা

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ আর পাকিস্তানের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ভারতের সামরিক অভিযান আজ লাহোর আর শিয়ালকোট সেক্টারের গোলাগুলি থেকে মিলিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংসদে গালাগালির পর্যায়ে নেমেছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আর পথ ছিল না। মাথা যাদের নিচু হয় গলাটা উঁচু করা তাদের স্বভাব—বিশেষ ক'রে ভুট্টোর মতন যারা নিখিরাম সর্দার তাদের তো বটেই। ভারত পাকিস্তানের তাগাতাগি নিয়ে মনের আনন্দে মাতামাতি করা বৃটেন এবং আমেরিকার আন্ত-ব্যবসা অতএব ভুট্টোর গালাগালির সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারাও চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে। আমেরিকা চালাক তাই চুপ করে আছে, বৃটেন বোকা তাই অবথা ব'কে মরছে।

সারা বিশ্বে ভারত পাকিস্তান আর চীন নিয়ে চুলচেরা বিচার চলেছে, সিকুরিটি কাউন্সিলে তর্কের ঝড় উঠেছে, পররাষ্ট্র সচিবদের চোখে ঘুম নেই আর আমাদের নেই শান্তি। সংসদের সীমানা পেরিয়ে একটু তাকালেই দেখা যাবে যে রাশিয়া, বৃটেন আর আমেরিকার কূট-নৈতিক সভায় ইন্দো-পাকিস্তানের আপোষ-নিষ্পত্তির সূত্র ধরে বর্তমান কূটনৈতিক দলাদলির কিছু ওলোট-পালটের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। ভুট্টোর হুমকি, জনাবের হাঁকাহাঁকি আর ছোট গলায় লাল বাহাদুরের হর্ষক মতবাদ, চীন কিছুটা পেছিয়ে গিয়ে চুপ ক'রে শুনছে, রাশিয়া শুনে হাসছে আর মাঝে মাঝে ছোটখাটো মন্তব্যের আড়ালে বড় ধরণের পরিবর্তনের পথ খুঁজছে আর সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ছোটখাটো দেশগুলো সময় হ'লে কার কাঁধে ভর করবে, মুখ বুজে তাই ভাবছে। এতদিন এবং

এখনও সারা পৃথিবীতে বলতে গেলে দুটোই দল আছে: আমেরিকা আর রাশিয়া। ভারতের যা রাখী আর ভুট্টোর যা দাপাদাপি তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে পুরোণ দল ভেঙে নতুন দল গ'ড়ে উঠেছে: এশিয়া ও য়ুরোপ। বৃটেন এবং আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে পুষ্যি নিয়ে নেয়—সেটা ভুট্টোর আবার আর ওদের ইচ্ছে তাহলে এটা হ'তে বাধ্য এবং এই পরিবর্তন আনবে ভারত।

সারা বিশ্বের এই আমূল পরিবর্তনের মূল কারণ হল কাশ্মীর। আর এই নতুন ইতিহাসের সূচনা ক'রেছে কাশ্মীরি। তারা জাতে মুসলমান কিন্তু জীবনের আধারে ওরা সত্যিকারের মানুষ। ঠিক মতন বুঝতে হলে ওদের গোড়ার ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

কাশ্মীরের গোড়ার কাহিনী হল এক কিম্বদন্তি। শোনা যায়, সেই প্রাচীন কালে, আজ যেটা কাশ্মীর উপত্যকা, সেটা ছিল মস্তবড় হ্রদ আর সতী সেই হ্রদে নৌকা বিহার করতেন ব'লে হ্রদের নাম ছিল সতীসার। এই হ্রদের চারিধারের পাহাড়ে থাকত পিশাচ, যক্ষ আর নাগ। আর তাদের অত্যাচারে কোন মানুষই সতীসারের আশেপাশে বাস করতে পারত না। কথাটা কানে উঠল মরিচীর ছেলে প্রজাপতি কাশ্যপের, তিনি পিশাচপতী জলোদ্ভবকে যুদ্ধে আহ্বান করার আগে বসে গেলেন ধ্যানে। তাঁর ধ্যানে মুগ্ধ হ'য়ে ব্রহ্মা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন আর সেই সংবাদ শোনামাত্র জলোদ্ভব পাহাড় ছেড়ে লুকিয়ে পড়লেন সতীসার হ্রদের জলের তলায়। কাশ্যপ তখন উপায়ান্তর না দেখে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন এবং বিষ্ণু তাঁর ধ্যানে মুগ্ধ হ'য়ে বারামুলার কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্যে ফুটো ক'রে হ্রদের সব জল বের ক'রে দিলেন। পিশাচপতী জলোদ্ভব তখন আত্মরক্ষার জন্যে করলেন পাতালপ্রবেশ। প্রজাপতি কাশ্যপ যখন হাজার বছরের চেষ্টাতেও আর তাকে খুঁজে পেলেন না, তখন সতী এলেন তাঁর সাধনায় মুগ্ধ হ'য়ে সাহায্য করতে। তিনি মহামায়ার রূপ ধরে মুখে ক'রে আনলেন একটা ছোট্ট পাথর আর ফেলে দিলেন তাক করে ঠিক জলোদ্ভবের মাথার ওপর।

সেই যে পাথর সতী ফেলেছিলেন সেইটা বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠল একটা পাহাড়। আগে সেই পাহাড়টাকে বলা হত সারিকা পর্বত কিন্তু হিন্দু রাজাদের আমলে তার নাম হল হরি পর্বত। এখনও তাইই আছে। বলা বাহুল্য, সতীর কৃপায় কৃতজ্ঞ হ'য়ে প্রজাপতি কাশ্যপ ঐ পাহাড়ের ওপর যে মন্দির গড়েছিলেন, আজও সেটা হিন্দুদের তীর্থস্থান আর মুসলমানরা মন্দির মালেকা ব'লে সতীর মহান রূপকে তারা আজও শ্রদ্ধা করে। হ্রদের জল বেরিয়ে যাওয়ার পর যে জমি পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হল কাশ্যপমার—অর্থাৎ কাশ্যপের আবাস, আর ঐ কাশ্যপমারের বর্তমান রূপ হল কাশ্মীর।

জলোদ্ভবের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রেবতী পিশাচদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন হ্রদের উত্তরে হরমুখ পাহাড় ছেড়ে হিমালয়ে। আজও নাকি তারা সেইখানেই আছে এবং তথাকথিত 'য়েতি' (YETI) নাকি ঐ রেবতীরই বংশধর।

এই ধরণের গল্প দিয়েই কলহন্ তাঁর পৃথিবী-খ্যাত কাশ্মীর ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী" লিখতে আরম্ভ করেন ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে। ওঁরই রচনা থেকে জানা যায় যে দু'হাজার বছর ধ'রে বাহাত্তরজন হিন্দু রাজার রাজত্বের পর খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সনে মহারাজ অশোক কাশ্মীর জয় করেন এবং শ্রীনগরীতে তাঁর রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের শ্রীনগরী ছিল বর্তমান শ্রীনগরের প্রায় তিন মাইল দূরে, শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের ওপাশে। তিনি কাশ্মীরের আরও অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। কিন্তু সত্যিকারের উন্নতির সাধনা ক'রেছিলেন রাজা কনিষ্ক।

রাজত্ব লাভ করেই কনিষ্ক দেখলেন বৌদ্ধধর্মে ভাঙন ধ'রেছে আর হিন্দুধর্ম আবার নতুন ক'রে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্ম-বিদ্বেষী তিনি ছিলেন না ঠিকই কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পরাজয় তিনি মানতে রাজি নন। অতএব, বৌদ্ধধর্মের দিকে প্রজাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তিনি নানান জায়গায় বৌদ্ধ বিহার তৈরি করলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রজাদের নানান রকম সুখ সুবিধাও দিতে আরম্ভ করলেন এবং ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সমস্ত পৃথিবী থেকে পাঁচশোজন বাছা বাছা পণ্ডিত এনে ছ'মাসব্যাপী এক বৌদ্ধ সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। এই তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের পাঁচশো পণ্ডিত সংঘে তিন লক্ষ শ্লোক রচনা করলেন। সেই সব শ্লোকের অনুলিপি দেশ দেশ থেকে দেশান্তরে আর আসলগুলো তামার পাতে লিখে পুঁতে রাখা হল মাটির তলায় কোন এক গোপন স্থানে। চীনা পরিব্রাজক হিউন সাং নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু "হিন্দু পণ্ডিতদের ভয়ে" কোথায় যে ওগুলো পোঁতা আছে তা বলেন নি। প্রায় দু হাজার বছর এর কোন সন্ধানই কেউ জানতো না। গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিঙ্গত থেকে এক সন্ধানী লামার দল এসে জানালো যে, জায়গাটার নাম নাকি "কুন্ডলবন বিহার"। কিন্তু ও নামে কোন জায়গা কাশ্মীরে নেই। ওরা ব্যর্থ হয়ে চলে যাওয়ার পর প্রায় দুশো বছর ও নিয়ে আর কেউ মাথাই ঘামায়নি। ১৯২৩ সালে কবি মেহরুর পুরোণ ইতিহাসের পাতা উল্টে আবার নতুন ক'রে তার সন্ধান আরম্ভ করলেন এবং বর্তমান কাশ্মীর সরকার তাঁরই সন্ধানের ওপর ভিত্তি ক'রে খনন কার্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করেছেন।

কনিষ্কের পর থেকেই বৌদ্ধ রাজত্বের ভাঙন ধরে এবং সপ্তম শতাব্দিতে হূণরা কাশ্মীর অধিকার ক'রে নেয়। তাঁদের নেতা মিহিরকুল ছিলেন হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসকারী। শোনা যায়, উনি নাকি পীর পঞ্জল এলাকায় এক পাহাড়ের ওপর থেকে একশোটা হাতিকে এক সঙ্গে নিচে গড়িয়ে ফেলে মজা দেখেছিলেন। সেই জন্যেই পাহাড়টার নাম হস্তিতল্ল।

হূণদের পর আবার হিন্দুরা অধিকার করলেন কাশ্মীর আর অশোকের শ্রীনগরী তিন মাইল সরে এসে হল শ্রীনগর। আজকের শ্রীনগরে যে দুটো ঝিলাম-সেতু আছে তার প্রথমটা তৈরি করেছিলেন হিন্দুরাজা প্রবরসেনা। তাঁর পরই এলেন ললিতাদিত্য। ইনি শাসনের চেয়ে শোষণই বেশী করতেন বলে আবার পতন আরম্ভ হল হিন্দু রাজত্বের এবং শেষ হিন্দুরাজা মহারাণী দিদ্দা। সুলতান মহমুদ গজনীর প্রবল আক্রমণ বহুবার প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রাজত্ব রাখতে পারলেন না। গজনীর ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মন্ত্রীর হাতে দিদ্দা নিহত হওয়ার পরই রাজত্ব ভেঙে খান খান হ'য়ে গেল আর সেই সুযোগে জম্মুর রাজা রামসিংহ দেও কাশ্মীর অধিকার ক'রে নিলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাহাড় পেরিয়ে তুর্কীরা এসে উপস্থিত হল। রাজা রামসিং রাজধানী ছেড়ে পালালেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিব্বতী মন্ত্রী রনচেন সিং সিংহাসন অধিকার ক'রে হ'য়ে গেলেন মুসলমান। ইনিই কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান এবং মুসলমান রাজা সদর-উদ্দীন।

এ পর্যন্ত কাশ্মীরে ছিল দুটো ধর্ম-বৌদ্ধ ও হিন্দু। রাজা সদর-উদ্দীন নিজে মুসলমান হ'য়েই বললেন,— "হও মুসলমান আর না হয় দাও মাথা।" দেখতে দেখতে দুবছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেল, অধিকাংশ হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালালো আর যারা রইল তারা হয়ে গেল মুসলমান। এটা হল দুশো বছর আগেকার কথা। এলাহাবাদের কাশ্মীরি সম্প্রদায় এরাই।

১৪২০ সালে রাজা হলেন সুলতান জায়নুল আবেদিন। উনি রাজা হয়েই দেখলেন যে, সদর-উদ্দীন আর তার পরবর্তী রাজা শাহমীরের উৎপাতে দেশে সত্যিকার মানুষ বলতে একটিও নেই। শিক্ষিত সমাজ চলে গেছে আর অশিক্ষিত মানুষগুলো হয়েছে মুসলমান। কাশ্মীরকে আবার নতুন ক'রে গড়বার জন্যে উনি হিন্দু পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন বিদেশ থেকে, ফিরিয়ে কর তুলে দিলেন আর শাহ মীর যে সব মন্দিরগুলো ভেঙে তছনছ ক'রে ফেলেছিল সেগুলো আবার নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে হুকুমের সঙ্গে টাকাও দিলেন ছড়াতে। ওঁরই আমলে সংস্কৃত আবার প্রচলিত হল এবং যাঁরা ফার্সী ও সংস্কৃত দু ভাষাতেই পারদর্শিতা দেখাতে পারলেন তাঁরা টাকা পেলেন সঙ্গে জমিদারিও পেলেন। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের ওপর যে মন্দির খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে জালুক রাজা তৈরি করেছিলেন সেটা জায়নুল আবেদিন আবার নতুন করে গড়লেন আর হরি পর্বতের মাথায় কাশ্যপের তৈরী সতী মন্দিরেরও আমূল সংস্কার করলেন। হিন্দু মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের এই সমন্বয়ের পরই উনি মন দিলেন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সমন্বয়ের কাজে। দেশ দেশান্তর থেকে শিল্পী এলো, সঙ্গীত নায়ক এলো, সংস্কৃত পণ্ডিত এলো, ফার্সীর উলেমা এলো আর এলো সাধু সন্ন্যাসী আর পীর পয়গম্বর। আরম্ভ হল সাংস্কৃতিক সম্মেলন, শিক্ষা সংগঠন আর ধর্ম সমন্বয়ের সাধনা সংঘ। জায়নুল আবেদিন নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলে ধর্ম সমন্বয়ের কাজ আরম্ভ করলেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে; ফলতঃ যাযার ফার্সী গানের নতুন যে প্রচলন হল ওঁর প্রচেষ্টায় তারই পরবর্তী ফল হল 'সুফিয়া কলম'। ওদিকে, শিক্ষা সংসদের মধ্যে দিয়ে উনি আরও একটা নতুন জিনিষ শুরু করলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের বললেন, সংস্কৃত ভাষায় ফার্সী গ্রন্থ অনুবাদ কর আর ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করালেন বেদ উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ। দেখতে দেখতে ইসলাম এবং হিন্দু দর্শনের সংযোগে এক নতুন ধারার প্রচলন হল, যেটাকে বলা চলে কাশ্মীরের 'ভক্তি যোগ'। মধ্য এশিয়ার মস্ত বড় পীর সৈয়দ আলি হামদানি এই ভক্তি যোগের প্রথম প্রবর্তক এবং ওঁর বহু শিষ্য আর শিষ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যা লালেশ্বরী আজও কাশ্মীরের ঘরে ঘরে পুজো পান। মুসলমানরা ওঁকে বলেন "লাল দেদ" অর্থাৎ লাল দিদিমা। তাঁর পরই হলেন হিন্দুদের জন্য ঋষি, আসলে যিনি মুসলমানদের শেখ নুরুদ্দিন। জায়নুল আবেদিনের পর বহু রাজা এসেছে, বহু রাজত্ব ভেঙেছে গ'ড়েছে কিন্তু ওঁর আমলের হিন্দু-ইসলাম ধর্ম সমন্বয়ের এই যে সাধনা তা আজও পরিপূর্ণ ভাবে প্রচলিত আছে। ঐ লাল দেদ ঐ সব ঋষির সুর ধরেই গতকালের কবি মেহজুর পাকিস্তানের প্রথম আক্রমণের সময় গেয়ে গেছেন :

"……কে শত্রু আর কে বন্ধু তোমার দেশের
মনে প্রাণে জেনে নাও সব।
প্রতিটি কাশ্মীরি আজে ও জীবনে এক,
তারা মানুষ, শুধু মানুষ
মিশে যাও তোমরা দুধ ও চিনির মতন।
হিন্দু ধরবে হাল, মুসলমান বাঁও ঝাড়
আর দেশের তরীকে আনো শান্তির কিনারায়…"

আরও লেখেছিলেন তিনি :

"……দেখেছি সেখানে আমি হিন্দু ও মুসলীম
মত করে মাথা তারা একই সত্যের বেদীতে
'প্রেমময়' পরমের সংবাদ—এর চেয়ে ভালো
আর আমি কি দিতে পারি ?..."

সাড়ে পাঁচশো বছর ধ'রে আবেহিনের হিন্দু মুসলীম একতা আজও অটুট আছে, কখন কোথাও একদিনের জন্যেও তাতে কাটল ধরেনি। কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্তের সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি সাতদিন আগেও আমি দেখেছি তা আমাদের ভারতের ইতিহাসে কোনদিন ছিল না এবং কোনদিন হবে বলেও আমার মনে হয়না। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যতই সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের অমোঘ বাণী থাক না কেন আর সেক্যুলারিজম্ নিয়ে আমরা যত বড় বড় কথাই বলা কাটিয়ে চিৎকার করি না কেন, সাম্প্রদায়িক উৎপাত আমাদের দেশে হয়েছে, এবং হবে। ১৯৩১ সালের ভাকার রায়, থেকেও যদি হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত শুধু দাঙ্গায় যত লোক মরেছে, দুটো ইন্দো-পাকিস্তান হানাহানিতেও তা মরেনি। দোষ কার সেটা বড় কথা নয়, আমাদের নৈতিক দুর্বলতাটাই আমার বক্তব্য।

আজকের কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা নব্বই জনেরও বেশী কিন্তু আজ পর্যন্ত কখন ধর্ম সংঘাতের একটাও ঘটনা ও দেশে ঘটেনি—যখন পাকিস্তান "আল্লাহো আকবর" হুঙ্কার দিয়ে সারা কাশ্মীরে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করেছিল, তখনও না। ১৯৪৭ সালে প্রথম পাকিস্তানি হামলার সময় চার লক্ষ কাশ্মীরি মুসলমানের রাস্তা ছিল দুটো, হয় পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে আর "আল্লাহো আকবর" ব'লে ধনী হিন্দুদের লুঠতরাজে ভাগীদার হওয়া আর না হয় পাকিস্তানের প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। আমি তখন ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম বলেই জানি যে যদি সারা কাশ্মীরের কোন এক কোণেও একজনও কাশ্মীরি ধর্মের ডাকে সাড়া দিত তাহ'লে সারা কাশ্মীরে একটিও অ-মুসলমান আর প্রাণে বাঁচতে পারত না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি হামলাদারদের পৈশাচিক অত্যাচার থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের পুরো পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে এমন বহু মুসলমানের ইতিহাস কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে সত্যিকার সেক্যুলারিজম্ আছে কাশ্মীরে। ওটাই হল মানব জাতির পীঠস্থান। আর, প্রত্যেকটি কাশ্মীরি হল তার অদ্বৈত পূজারী।

॥ তিন ॥

আমার কথা

কাশ্মীরে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগার তিন দিন আগে আমি অনেকটা ভাগ্যের চক্রান্তেই কাশ্মীর গিয়ে পড়ি আর সামরিক ভাবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিনদিন পর কলকাতায় ফিরেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে কাশ্মীরিরা ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে আর শুদ্ধ আবেগ-ভরা শ্রদ্ধায় আমি তাদের জীবন মরণের খেলা দেখেছি—তাদের হাসতে হাসতে মরতে দেখেছি আর

মরতে মরতে হাসতে দেখেছি। আর দেখেছি ওদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা ভারতের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অভাবনীয় অভিযান—মৃত্যুকে পদে পদে অবজ্ঞা ক'রে জীবনকে জয় করা। হানাদার-দের আক্রমণ থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়েছে কাশ্মীরি, আর্মড পুলিশ আর সাহেবের নেতৃত্বে কাশ্মীরের গৃহমন্ত্রী দুর্গা দয়।

এই কাহিনী যতই আমার ব্যক্তিগত আধারে গ'ড়ে উঠুক না কেন, নিজের কথা বাদ দিলে, কল্পনার খেয়াল খুশী খুব বেশী এতে নেই। ইতিহাস মানুষেরই সৃষ্টি কিন্তু তার মূল কথা জন ঘটনা প্রবাহ। সব ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখার সৌভাগ্য কোন মানুষের হয়না, আমারও হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। আমার কর্মক্ষেত্র থেকে কাশ্মীর কম ক'রে আড়াই হাজার কিলো দূর। কাজেই, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে আগে এবং পরে যে সব ঘট-না সমাবেশ এ বইতে ঘটেছে, সেগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে নিজের ভাষায় নিজেকে মাঝখানে বসিয়ে গুছিয়ে বলার জন্যে যেটুকু স্বাধীনতার প্রয়োজন তার বেশী আমি নিইনি, নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। গত আঠারো বছর ধরে দিনের পর দিন কাশ্মীরে যা কিছু ঘটেছে, কিছুটা আমাদের নেতাদের ইচ্ছায় ও মূর্খতায়, কিছুটা তখনকার নেতাদের নৈতিক অধঃপতির জন্যে আর বেশীটা সাধারণ মানুষের বাঁচার তাগিদে এবং যার ওপর ভিত্তি ক'রে আজকের এই ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ, তার ইতিবৃত্ত উপন্যাসের চেয়ে মনোরম, রহস্য রচনার চেয়ে রোমাঞ্চিক, চোরা কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ। বাস্তবের সেইটাই বোধ হয় আসল ধর্ম।

একটা ছোট্ট জাতির জীবনে এই সব ঘটনাবলীর একটা খুব বড় অথচ বেদনাদায়ক দিক আছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা এমন আছে যা যতই অভাবনীয় হ'ক না কেন কাশ্মীরের ইতিহাসে কোনদিনই তারা স্থান পাবে না। ভারতের ইতিহাসে তো নয়ই। ইতিহাসের পাতায় মূলতঃ, সন তারিখের সমাবেশ আর মহামানবদের ভীড়, সেখানে ছোটখাটো মানুষদের ত্যাগ ও সাধনার ইতিবৃত্ত অচল ও অনাবৃত; তাদের সমূহ স্থানাভাব। কাশ্মীরের প্রাক্তন শের-এ-আজম শেখ আবদুল্লাহ যতই ঘৃণ্য অন্যায় আর ক্ষমতার অপব্যবহারই করে থাকুন না কেন এবং তাঁরই জন্যে কাশ্মীর আমরা হারাতে বসলেও, কাশ্মীরের ইতিহাসে তিনি কায়েমি আসন জুড়ে থাকবেনই। কিন্তু কাশ্মীরের এক হারাণো প্রান্তের সামান্য মেষপালক ফকীর মহম্মদের জীবনের শেষ সাত দিন যতই অভাবনীয় হ'ক না কেন, কেউ কোনদিন হয়ত তা শুনবেও না, বুঝবেও না, জানবেও না। কাশ্মীর এলাকায় এক লাখ আন্দাজ ভারতীয় সৈন্য এবং সেই বাবদ প্রায় প্রতিদিন এক কোটি টাকা ব্যয় সত্ত্বেও ঐ এক অজানা অচেনা ফকীর মহম্মদের জন্যেই কাশ্মীর আজও আমাদের আছে এবং আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে সেটা ভারতের অপরিহার্য্য অংশ হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর নিয়ে পণ্ডিতজী যতই মাতামাতি ক'রে থাকুন না কেন, পনেরো বছর চেষ্টা করেও প্রত্যেকটি ভারতবাসীর প্রাণের এতটা কাছে কাশ্মীরকে উনি কোনদিনও আনতে পারেননি। ফকীর মহম্মদ প্রাণ দিয়েছে, যীশুর মতন ক্রুশে ঝুলেছে, আর আমার যদি আমাদের শাসনতন্ত্র দুর্যোধনের মতন ভিমিয়ে না পড়ে তাহলে বলা যায় কাশ্মীরকে সে পাকিস্তানের কবল থেকে চিরকালের জন্যে বাঁচিয়ে গেছে। প্রত্যেক কাশ্মীরি এবং কাশ্মীরকে যারা ভালোবাসে তারা সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, শেখ আবদুল্লাহের চেয়ে মেষপালক ফকীর মহম্মদ অনেক বড় এবং আরও অনেকখানি শ্রদ্ধার পাত্র। অথচ, ইতিহাসে তার স্থান কোনদিনই হবে না কারণ মানুষটা

সে ছিল সামান্য, নগণ্য, অজানা ও অচেনা। পাকিস্তানি হানাদার আসার আগে কেউ তাকে জানত না, চিনত না আর কাশ্মীরে পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটিয়ে শেষ হানাদার যেদিন নিশ্চিহ্ন হবে সেদিন বড় বড় নেতাদের সমর্থনের বাস্তবতায় সবাই তার কথা নিঃসন্দেহে ভুলে যাবে। সাধারণ মানুষের এইটাই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সে ইতিহাস সৃষ্টি করে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় কখন স্থান পায় না। কাশ্মীরের ইতিহাসে মকবুল শেরওয়ানি স্থান পায়নি, কর্ণেল রায় স্থান পাননি, ফকীর মহম্মদও পাবে না।

কাশ্মীরের সঙ্গে আমার যোগ, সময়ের মাপকাটিতে আঠারোর না ছিল। পাকিস্তান যেদিন পরোক্ষভাবে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল হানাদার পাঠিয়ে, তার চারদিনের মধ্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম ভারত সরকারের আদেশে, বেতারের কাজে। কাশ্মীরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সেই আমার প্রথম পরিচয় ও চিরকালীন প্রেম। দু'বছর পর আবার গিয়েছিলাম সরকারি বেতার দায়িত্বের আরও কিছু গুরুভার নিয়ে। কাজটা শ্রীনগরের বারে কাছেই, সারা যেত খুব সহজে আর শেখ আবদুল্লাহের পরোক্ষ নির্দেশও ছিল তাই, কিন্তু কাজের উৎসাহে আর প্রকৃতির প্রাণপ্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে কর্তব্যের সীমানা টেনেছিলাম সীমান্ত রেখার বার পর্যন্ত—সেটা আমার উচিতও ছিল। সেই অপরাধে তিন মাসের মধ্যেই আমায় কাশ্মীর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল শেখ আবদুল্লাহের কাছ থেকে "পাকিস্তানি গুপ্তচর" হওয়ার অপবাদ মাথায় নিয়ে। উনি চাননি যে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওঁর কার্যকলাপের নমুনা দেখি কিন্তু ওঁর ইশারায় ঘোরাঘোরা ইচ্ছাকে আমি হেলায় অবজ্ঞা করেছিলাম। ওঁর নির্দেশকে আমি অমান্য করেছিলাম।

ওঁর সন্দেহজনক কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আমার যে রিপোর্ট বেতার অধ্যক্ষ লক্ষ্মণন সাহেব ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, যে রিপোর্ট পড়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিল্লির জমে যাওয়া শীতের এক শেষ রাতে লোধি গার্ডেনে প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে আমায় বলেছিলেন "আমি যতদিন আছি তোমার ভয় নেই, যখন থাকবোনা তখন ভগবানকে ডেক", এবং যে রিপোর্টের জন্যে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই আমি বেতারের পাকা চাকরি ছেড়ে চলে আসা মনস্থ ক'রেছিলাম, সেই রিপোর্টের সত্যাসত্য আমার চাকরি ছাড়ার তিন বছরের মধ্যেই সপ্রমাণিত হয়েছিল শেখ আবদুল্লাহের গ্রেপ্তারে। সেদিন আমার চাকরি ছাড়ার জন্যে দুঃখ হয়নি, আবার বেতারে ফিরে যাওয়ার যে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ এসেছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে কষ্ট হয়নি এবং কাশ্মীরের প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। সত্যের সংগ্রামে অন্ন সংস্থানের পাকা পুঁজি হারালেও, মান হারাইনি। মন তো হারাইনিই।

আসলে খুসীই হ'য়েছিলাম। যে সরকারের কাছে সততা আর নিষ্ঠার মূল্য নেই, তাদের নুন খাওয়া আর বিষ খাওয়ার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? তার চেয়ে না খেয়ে মরা অনেক ভালো।

ভাগ্যের ভাগাভাগিতে আঠারো বছর পর, কাশ্মীরের দ্বিতীয় এবং সম্ভবতঃ শেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে আবার আমায় ওখানে যেতে হয়েছিল কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে ছবি করার কাজে। প্রথম যখন গিয়েছিলাম এ'বছরের জুন মাসের শেষ প্রান্তে তখন জানা ছিল না যে কিছু ধনী কাশ্মীরি আর প্রাক্তন দেশদ্রোহি কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান, সারা দেশ জুড়ে, তলায় তলায় আগ্নেয়গিরি গড়ছে। এবার গিয়ে সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোতের মধ্যে নিতান্ত অতর্কিত

ভাবেই আটকে পড়েছিলাম। তার জন্যে অবশ্য মনে আমার ভয়ও ছিল না, ভাবনাও ছিল না। সহরের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে মনের যে অপমৃত্যু ঘটে, আর কিছু না হক অন্ততঃ তার থেকে অনেকখানি পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছিল। মরবার ভয় ছিল না ঠিকই, কিন্তু বেঁচে ফেরার ভরসাও খুব ছিল না। আমার বন্ধু এবং আমাদের যোদ্ধাদী ছবির সহকর্মী বলরাজ সাহানির শ্রীনগরের দেরা পল্লী ওয়াজীরবাগের দু মহলা বাড়ীর তিনতলার কোনের ঘরে জানলায় দাঁড়িয়ে দুদিন অনবরত আর একটানা কামানের গর্জন শুনেছি আর বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে মুখ বাড়ালেই আকাশ ছোঁওয়া পপলার গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাইফেল, স্টেন গান আর হাত বোমা নিয়ে খণ্ডযুদ্ধ দেখেছি রানবাস ব্রীজের এধারে ওধারে। এ যুদ্ধ সৈন্যের সঙ্গে সৈন্যের যুদ্ধ নয়, আধুনিকতম মার্কিনী অস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রু-সৈনিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম; মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার অভিযান; দেশদ্রোহি নেতাদের নৈতিক অবনতির কারণে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন মরণ সংগ্রাম; ভাঙ্গা দিকের বন্ধ জানলার কাঁচ ভেঙ্গে বাইফেলের দুটো বুলেটও বিছানায় এসে পড়েছে, বাইরে বেরিয়ে ঐ সহজ সরল কাশ্মীরিদের জীবনযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়োবার আকুল আহ্বান জানিয়ে। আমার আগে পিছে টান নেই তাই সামনে যেতে ভয়ও খুব একটা নেই। হয়ত সেদিনই যেতাম যদি না বলরাজ বাধা দিতো। ও বললে, ভেতো বাঙালীর বাহুবলের চেয়ে বুদ্ধিবল অনেক বেশী, অতএব যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা না বাড়িয়ে যারা প্রাণ দিয়েও সাধারণ ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত আর যুদ্ধের ইতিহাসে অনাবৃত র'য়ে গেল তাদের কথা লিখতে। তাই লিখতে বসলাম।

আমার চারিধারে যা কিছু ঘটেছে এবং আজ হাজার মাইলের সীমান্ত রেখা জুড়ে যা ঘটছে, এর কিছুই একদিনে ঘটেনি, দিনে দিনে গ'ড়ে উঠেছে। কাজেই এর পেছনে একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে যার মূলে আছে অতীতের জয়নুল আবেদিন, শাল দেব, মল ঋষি, হীরা ধাকুর, আজিমাল, মেহজুর; আছে বর্তমানের শেখ আবদুল্লাহ, গুলাম মহম্মদ, পণ্ডিত নেহেরু, কৃষ্ণ মেনন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর আছে যাদের নাম কেউ কোনদিন শোনেনি, হয়ত শুনবেও না, যেমন রফিকুল শেরওয়ানি, কর্ণেল শর্মা, গুলমান, কফীর মহম্মদ, আর যার জীবন ঘিরে এই কাহিনী—রুকায়া আহমেদ। ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক বিবরণীতে নামের উল্লেখ থাকলেও প্রাণের স্পন্দন থাকে না তাই ও পথ ছেড়ে এই জৈনন্দিনের পথ ধরলাম। তার আরও একটা মস্ত কারণ হল যাদের কথা লিখতে ব'সেছি তারা অতি সাধারণ মানুষ, তাদের মন আছে, জীবনকে তারা ভালোবাসে, আর কাশ্মীর দেশটা তাদেরই। সঠিক সব কিছু জানতে হ'লে তাদের সবটুকুই জানা দরকার। ঐতিহাসিক ধারায় সেই প্রাণের স্পন্দনটুকু বাদ প'ড়ে যেটুকু বাকি থাকে তা নিতান্তই প্রাণহীন, রুক্ষ।

যাদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই কাশ্মীর পরিক্রমা, নানান কারণে তাদের কয়েক জনের নাম গোপন করতে বাধ্য হ'য়েছি বিশেষ ক'রে তাদের, যারা আমার দেশদ্রোহি নেতাদের ষড়যন্ত্র, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নির্বুদ্ধিতা আর সামরিক বিভাগের অসাবধানতার তথ্য জুগিয়েছেন। নাম প্রকাশে তাঁদের জীবনের আশঙ্কা আছে। শেখ আবদুল্লাহ, বক্সি গুলাম মহম্মদ, মির্জা আফজল বেগ প্রমুখ কাশ্মীরের দেশদ্রোহি নেতাদের পার্শ্বচর গুপ্তচর আর গুণ্ডায় গোটা শ্রীনগর ছেয়ে আছে। তাদের সহায়তায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় জন্যে তারা আজ মরিয়া হ'য়ে মরণ কামড় দেওয়ার আশায় ওৎ পেতে আছে। এদের নাম প্রকাশ করা মানেই তাদের ইহজন্ম ঘোচানো।

ভারতীয় সামরিক বিভাগের দিক থেকেও তাদের বিপদের অন্ত নেই। "সুরক্ষিত" থেকে সাত হাজার লোক সাড়ে সাতশো টন গোলাবারুদ আর আধুনিকতম মার্কিনী অস্ত্র নিয়ে যে রাতারাতি আসতে পারেনা তা নিতান্ত গণ্ডমূর্খও বোঝে। আরও মারাত্মক কথা হল যে এই সাত হাজার পাকিস্তানি হানাদারদের মধ্যে কম ক'রে দু হাজার লোক আমাদের সামরিক বিভাগের "সজাগ" দৃষ্টি এড়িয়ে সরাসরি একেবারে চলে এসে শ্রীনগরের মধ্যে ; তারা শুধু গোলাবারুদের গোদামই গড়েনি বেশ কয়েকটা সুরক্ষিত ঘাঁটিও তৈরি করেছিল। এ সবই যে আমাদের শাসন ব্যবস্থার গলদ আর সামরিক বিভাগের অদাবধানতার কারণেই সম্ভব হয়েছে এ তথ্য প্রচার করার যে দায় ও দায়িত্ব, নাম প্রকাশ করলে তার সবটাই ওদের মাথায় চাপবে। সেটা আমারই থাক। দেশ আজ এক হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ব'লেই আমাদের সৈনিকরা মরতে ভয় পায়না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মৃত্যুর বেদনা যেমন আমাদের, জয়ের উৎসবও তেমনি আমরাই, দেশের শাসনতন্ত্র নয়। এইটাই আমার বলার কথা।

এই লেখার মধ্যে 'আমি' ব'লে যে মানুষটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার মাঝখানে আমি আর-চারিপাশে অন্ত স্বতন্ত্রের সমষ্টি। তবে, এর মাঝখানের আমি যে অরাজীর্ণ সময়ে জীবনের আবহমান মানুষ নয় তা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। ঘটনার বিপর্যয়ে মানুষ বদলায় এটা আমার জানা ছিল কিন্তু রাতারাতি তার যে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হ'তে পারে তা ভাবিনি। আমার মধ্যে এ পরিবর্তন আগে কখন দেখিনি, ভবিষ্যতে আর কখন হয়ত দেখবও না। যতদিন চার দেওয়ালি সংসারের বিরাট ফাঁকির বাঁধন ছিল ততদিন মায়া মোহ আর মিথ্যা বেড়াজালের মধ্যে দাঁড়িয়ে কখন ভাবতেই পারতাম না যে জীবনে মৃত্যুও আছে। তারপর নাম আর টাকার অঙ্ক, আমার চারিপাশের মানুষদের স্বার্থ নৈতিকার মধ্যে যখন আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা পড়লাম তখন প্রতিপদে মনে হত জীবনের মৃত্যু কেন ঘটে না ? আবার একদিন যখন আমার মধ্যেকার আসল মানুষটা হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আমার মনের হাত ধ'রে ঐ মোংরা পচা আবহাওয়া থেকে টেনে বার ক'রে এনে পথে দাঁড়করিয়ে দিল, তখন মুক্তির আস্বাদে মৃত্যুর কামনা কোথায় যে নিঃশেষে হারালো তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এমনি ভাবে নানান পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আমি নানান রূপে পেয়েছি, পরখও ক'রেছি কিন্তু এবারকার মতন এমন নবীন উৎসাহে কখনও নিজেকে নিঃশেষে হারাইনি। জানলায় দাঁড়িয়ে যত ঐ সহজ সরল গ্রামবাসীদের জীবন যুদ্ধ দেখেছি ততই নিজেকে নতুন ক'রে পেয়েছি, বুঝেছি, অনুভব ক'রেছি। ট্রেন, প্লেন আর এল এস, ঘির মৃত্যু উৎসাহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা শুধু হাতে এগিয়ে গেছে নিজের দেশকে ধর্মান্ধ দানবের হাত থেকে বাঁচাবে ব'লে তারা আমার মনের মৃত্যুভয়কে নির্মূলে হত্যা ক'রেছে। সেদিন যে কোন মুহূর্তে আমি ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম ; ওদেরই মতন "কাশ্মের বিশ্বাবাস" আর 'হামলা-আওয়ার খবরদার' বলে আকাশ ছোঁওয়া হুঙ্কার দিয়ে মেসিন গানের ওপর স্বচ্ছন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। আজ শরতের আনন্দ কোলাহলে আর পাখার তলায় ব'সে সে কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। সেদিন আমার নিজের কাছে আমি নিজেই একটা অদ্ভুত অচেনা মানুষ হ'য়ে উঠেছিলাম যে আগে কখন ছিল না, হ'য়ত আর কখন তার এতটুকুও আমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। না থাক, ক্ষতি নেই ; যে সত্তা আমার মধ্যে সজীব হ'য়ে উঠেছিল আর যে স্মৃতি আজও মন ছেয়ে আছে তার মেয়াদ যত অল্পই হক না কেন তার বিরাটত্ব অসীম, তার বৈশিষ্ট্য অভূতপূর্ব। কাশ্মীরকে ভালোবাসা আমার জীবনে সার্থক হ'য়েছে।

আরও একটা কথা। এটা আজকের কাশ্মীরের ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত হলেও এতে যেমন অতীতের ইতিহাস আছে তেমনি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও ছড়ানো আছে। আপাতদৃষ্টিতে আজকের সংঘর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে হলেও মূলতঃ এটা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের চিরকালীন লড়াই সেটা যার সঙ্গেই হক, যখনই হক আর যেখানেই হক। সাম্প্রদায়িক অন্ধতার যে লড়াই ঔরংজেবের আমলে হয়েছিল, আয়ুবের আমলেও তাইই আছে, বদলায়নি, বদলাবেও না। কাশ্মীরিরা আজকের লড়ায়ে প্রাণ দিয়ে এইটাই চিরকালের জন্যে কবি মেহজুরের ভাষায় নতুন করে প্রমাণ করতে চাইছে যে :

"……মন্দিরেই যাও আর মসজিদেই যাও
গির্জাতেই যাও কিম্বা গুরদোওয়ারাতে
যেতে হবে সেই একই দরজার মধ্যে দিয়ে…"

ধর্মের আধারে এটা যেমন সত্য, মানবত্বার আধারেও তেমনি, আরও একটা সত্য আছে, সেটা জ্যোৎস্নায় ভাসানো ঝিলামের বুকে শীকারায় শুয়ে শুয়ে রুকায়া ব'লেছিল :

"একটা জিনিষ আমি বুঝতে চাই কিন্তু কেউ সেটা বলতে পারে না। এই জীবন…এই তার আরম্ভ। অন্তহীন সৌন্দর্যের জন্যে ঐকান্তিক সাধনা দিয়ে আমরা জীবন শুরু করি আর মনে করি আমার মধ্যে আমি অসীম, আমি নিঃশেষ, আমি পরিপূর্ণ। হঠাৎ হাজার মাইল দূর থেকে কার ধাক্কেয়ালের আঘাতে সেটা একদিন থেমে যায়। আমার সে ক্ষতিতে কারো কিছু যায় আসে না। ওরা যে নিঃসাড় তা নয়, আসলে ওরা বোঝেই না যে ওদের জন্যে আমি ঠিক কি হারালাম। বোঝা উচিৎ……"

মুখ ঘুরিয়ে উপুড় হ'য়ে ঝিলামের জলে চাঁদনির ঝিনুক কুড়োবার চেষ্টা করতে করতে রুকায়া আবার বলে…

"আসলে আমি নিজেই বুঝি না, সেটা কি…সেটা কেন…"

কিন্তু শুরু থেকেই আরম্ভ করা যাক, বুঝতে সুবিধে হবে, ওকে আমাকে আর কাশ্মীরকে।

চার

॥ অতীত পরিক্রমা ॥

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ১৮১২ সালে জম্মুর রাজা রণজিৎ দেওর এক চরিত্রহীন বংশধর, গুলাব সিং, কাকীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত হন। যাবার সময় তিনি কাকীকে শাসিয়ে গিয়েছিলেন যে জম্মুতে তিনি আবার ফিরে আসবেন—কাকীর জন্যে নয়, সিংহাসনে বসবার জন্যে।

জম্মু তখন মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পাঞ্জাব রাজত্বের ঠিক অংশ না হলেও অনেক রকম সাহায্যের জন্যে বহুলাংশে নির্ভরশীল। গুলাব সিং গিয়ে যোগ দিলেন মহারাজার সৈন্যদলে সাধারণ

সৈনিক হিসেবে। একে রাজবাড়ীর ছেলে, তায় দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ, মহারাজার নজর পড়তে সময় লাগল না। অল্প কিছুদিন মহারাজার পার্শ্বচর থাকার পরই উনি হ'য়ে গেলেন সেনানায়কদের মধ্যে অন্যতম আর বছর কয়েক যেতে না যেতেই একেবারে সৈন্যাধ্যক্ষ। এই সময় রজৌরির রাজা হঠাৎ রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে ঝুঁকে মেমে পড়লেন জম্মু অধিকার করার উদ্দেশ্যে। গুলাব সিং গিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বসলেন জম্মুর গদীতে। এটা হল ১৮২০ সালের কথা। বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে মানুষ ছাড়া আর কথাই বলেনা, রাজা হ'য়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি গুলাব সিংও চাইলেন রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে উনি চালিয়ে গেলেন যুদ্ধ—যখন যেদিকে ইচ্ছে, আর এদিকে রজৌরি থেকে আরম্ভ ক'রে ওদিকে বালটিস্থান, স্কার্দু, লাদাক পেরিয়ে লোক পাঠালেন তিব্বত পর্যন্ত। তিব্বতে পৌঁছোবার আগেই এদিকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লাগল শিখদের যুদ্ধ ১৮৪৫ সালে। মহারাজ রণজিৎ সিং তখন বছর ছয়েক হল মারা গেছেন। তাঁর বংশধরেরা সাহায্য চাইলেন গুলাব সিংয়ের কাছে কারণ শিখেদের মধ্যে উনিই তখন একমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ যিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সমানে যুঝতে পারেন। লাহোরের শিখ দরবারও ওঁকে ডাক দিল আর উত্তর পাওয়ার আগেই ওঁকে সাজিয়ে দিল শিখ সৈন্যদের সর্বময় কর্তা। উনি বুঝলেন ব্রিটিশ সৈন্য আটকানো সহজ কথা নয় আর রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ চট ক'রে ছাড়াও উচিৎ নয়। উনি ব্রিটিশদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে, যাবো যাচ্ছি ব'লে যুদ্ধটা এড়িয়ে গেলেন। ১৮৪৬ সালের সোবরাও-র শেষ যুদ্ধে শিখ সৈন্য যখন হেরে গেল, আর লাহোর গেল ব্রিটিশের হাতে তখন উনি শিখ সৈন্যদের সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে গিয়ে বসলেন সন্ধি করতে। দুটো সন্ধি হল। 'লাহোর সন্ধি' অনুযায়ী বিপাশা থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত সব জায়গা শিখরা বাধ্য হলেন ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে আর গুলাব সিংয়ের সঙ্গে বৃটিশদের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী 'অমৃতসর সন্ধি' হল গুলাব সিং আর বৃটিশদের মধ্যে যার ফলে কাশ্মীর আর গিলগিটের একাধিপত্য গেল গুলাব সিংয়ের হাতে পঁচাত্তর লাখ টাকার বিনিময়ে। জম্মু, কাশ্মীর আর গিলগিট নিয়ে গুলাব সিং হলেন মহারাজা, একাধিপতী এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন।

গুলাব সিংয়ের তৃতীয় পুত্র হলেন মহারাজা প্রতাপ সিং। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোবেচারি শান্ত মানুষ। কাজেই ওঁর মাথায় গাঁট্টা মেরে ব্রিটিশ উপদেষ্টা এসে বসল কাশ্মীরে আর ধূর্ত ব্রিটিশ উপদেষ্টা ব্রাউডেন মহারাজার সই জাল ক'রে রাজ্যভার তুলে দিলেন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র মিয়ন্ত্রিত এক মন্ত্রীসভার হাতে। কার্যতঃ কাশ্মীরের শাসনভার চ'লে গেল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। এই জাল চিঠি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন কলকাতার এক দৈনিক সংবাদপত্র যে বৃটেন আবার রাজ্যভার মহারাজার হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কাশ্মীর নিয়ে বৃটেনের এই প্রথম অপমানসূচক পরাজয় যা আজও ওরা ভুলতে পারেনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজ ওরা মনের মতন ক'রে গুছিয়ে নিয়েছিল। গিলগিটে একটা বেশ বড়সড় দুর্গ তৈরি ক'রে ব্রিটিশ সৈন্য সেখানে ভ'রে দিয়েছিল। কাশ্মীর গেল, কিন্তু গিলগিটের আধিপত্যটা থেকেই গেল। কাশ্মীরে ওদের উপদেষ্টার আসনটাও কায়েমি রইল।

প্রতাপ সিংয়ের কোন ছেলে ছিল না ব'লে ওঁর মৃত্যুর পর মহারাজা হ'লেন ছোট ভাই অমর সিংয়ের ছেলে হরি সিং। বিলেতে মানুষ হ'য়েছিলেন ব'লেই বোধ হয় সাদা চামড়ার প্রতি

ওঁর টান ছিল পুরো করার সামিল। উনি যখন প্রথম রাজা তার পান, তখন বয়সে কিছু কাঁচা ছিলেন বলে শাসন আরম্ভ করেন পাকা প্রজাবৎসল রাজার মতন। বছর দু'চারের মধ্যেই হাসপাতাল বানালেন, স্কুল খুললেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন আর রাজার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে খেটে তাকে খাটিয়ে নেওয়ার 'বেগার' প্রথা তুলে দিলেন। মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আগে পর্যন্ত সারা দেশে জমির সত্ত্বাধিকারি ছিলেন রাজা আর প্রজারা ছিল, যাকে বলা যায় ভাড়াটে। প্রতাপ সিং ও প্রথাটা বদলাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু শেষ করেননি। হরি সিং সেটা বদলে দিলেন। এটা হল ১৯৩০ সালের কথা।

১৯৩০।৩১ সালে যখন সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের ঝড় উঠল, শেখ আব্দুল্লাহ তখন সবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে বি এস সি পাশ করার পর স্কুল মাষ্টারি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। উনি দিল্লীতে এসে দেখা করলেন মৌলানা আজাদের সঙ্গে আর ওঁরই কথামত সোজা চ'লে গেলেন কাশ্মীর। সেখানে তখন অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরি আরম্ভ না হ'লেও পণ্ডিত আনন্দ কল আর বুধ সিং মহারাজ হরি সিংকে দেশের শাসনভার সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। ওঁদের বলার কথা ছিল যে মহারাজা গদীতে ঠিকই থাকবেন কিন্তু দেশ শাসন করবে প্রজা-প্রতিনিধি নিয়ে গড়া মন্ত্রীমণ্ডল আর অমৃতসর সন্ধি অনুযায়ী বৃটেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার চুক্তি মেনে নিয়েছিল সেটা আবার পুরোপুরি বলবৎ ক'রে বৃটিশ উপদেষ্টাকে দেশ থেকে হটিয়ে দিতে হবে। যুক্তি যে অকাট্য সন্দেহ নেই কিন্তু সাহেব-ভক্তিও মহারাজের অসীম। উনি বৃটিশ উপদেষ্টার পরামর্শ চাইলেন। তিনি সাত দিনের মধ্যে হাজির ক'রে দিলেন একজন সিভিলিয়ান মন্ত্রী, দু'জন বৃটিশ পুলিশ অফিসার আর শেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বে মুসলীম কনফারেন্স! বলতে গেলে আন্দোলনটা রাতারাতি দুভাগে ভাগ হ'য়ে গেল আর সেই সুযোগ নিয়ে মহারাজা গুলি বর্ষণ আরম্ভ করলেন একেবারে নিরীহ অসহায় কাশ্মীরি জনসাধারণের ওপর। আনন্দ কল আর বুধ সিং এটা চাননি যে কাশ্মীরি জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব শুরু হোক আর এটাও বুঝলেন যে ওঁরা যদি দু'দলে ভাগ হ'য়ে যান তাহ'লে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ভাগাভাগির দিন, ভারতের মতন কাশ্মীরেও ছড়াবে। ওঁরা তাই শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মুসলীম কনফারেন্সকে সামনে এগিয়ে দিলেন। কাশ্মীরে বৃটিশনীতির এটা দ্বিতীয় পরাজয়। এই পরাজয়ের শোধ তুললেন মহারাজা নিজে। তিনি নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন না, গরীবদের ভাতে মারতে আরম্ভ করলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য যে সমস্ত সংস্কার হ'য়েছিল রাতারাতি সবই বন্ধ হ'য়ে গেল, রাজার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটিয়ে নেওয়ার "বেগার" প্রথা আবার নতুন ক'রে শুরু হ'য়ে গেল, নতুন নতুন ট্যাক্স বসল আর রাজার টহলদারি সৈন্য স্টেটের ফ্ল্যাগ আর ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরতে আরম্ভ করল। সারা দেশে নিয়ম হ'য়ে গেল ঐ ফ্ল্যাগ দেখলেই মাথা নোয়াবে আর যে এ আইন অমান্য করবে তার মুখ মাটির ওপর ঘ'ষে দেওয়া হবে আর চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তার তুলে দেওয়া হবে।

শেখ আবদুল্লাহ সাম্প্রদায়িক দল ক'রেছিলেন ঠিকই কিন্তু মহারাজার এই দাপটটা কল্পনা করেননি। দেশের লোকও ওঁর এই দলাদলিটা অনুমোদন করল না। কবি মেহজুর আন্দোলনের প্রথম আরম্ভতে অগ্রণী ছিলেন কিন্তু শেখ আবদুল্লাহ-র ঐ 'মুসলীম' কথাটায় ঘোর আপত্তি তুলে

পুরোপুরি স'রে দাঁড়ালেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ রাজনীতির কিছুই জানত না, কবি ব'লে তারা মেহরুকে পীরের মতন ভালোবাসতো এবং ওঁরই গানের সুর ধ'রে তারা আন্দোলনে এগিয়ে ছিল। কবি যেমনি স'রে এলেন তারাও অমনি পিছিয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক ভাগুন ধরাবার বৃটিশ পরিকল্পনা আর একবার ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে উপদেষ্টা সাহেব আর এক নতুন চাল চাললেন যাতে জনসাধারণের আপত্তি সত্ত্বেও শেখ আবদুল্লাহ-র মুসলীম কনফারেন্স দাঁড়িয়ে যায়। উনি মহারাজকে উপদেশ দিলেন যে দেশের সব নেতাদের গ্রেপ্তার কর, তারপর শেখ আবদুল্লাহর মুসলীম কনফারেন্সের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি ক'রে নেতাদের ছেড়ে দাও আর অত্যাচার বন্ধ ক'রে প্রজা-সভার প্রবর্তন ক'রে দাও! তাইই হল। মহারাজা প্রজা-সভার প্রবর্তন করলেন কিন্তু ঠিক হল যে সভার সভ্য রাজাই নির্বাচিত করবেন!

বিজয়ের তকমা এঁটে শেখ আবদুল্লাহ-র মুসলীম কনফারেন্স মুফাস্সিল মজলিসে নিশান ওড়ালো কিন্তু দেশের মানুষের মন টলল না। বৃটিশ উপদেষ্টার নির্দেশ মতন থেকে থেকেই উনি নানান রকম আন্দোলন করলেন আর প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে প্রজা-সভায় কিছু সদস্য নির্বাচনের অধিকারও পেয়ে গেলেন কিন্তু দেশের মানুষ ওঁর ডাকে কিছুতেই সাড়া দিল না। কবি মেহরুর তো স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে যতদিন 'মুসলীম' কথাটা নামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ততদিন উনি কোন সম্পর্কই রাখবেন না। বাধ্য হ'য়েই শেখ আবদুল্লাহ সাম্প্রদায়িকতার সুর ছেড়ে জাতীয়তার জেহাদ শুরু করলেন ১৯৩৯ সালে। অল জাম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর মুসলীম কনফারেন্স নাম পালটে হল "জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্স"!

এই পরিবর্তনেরও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ এর শেষ ভাগে শেখ আবদুল্লাহ গিয়েছিলেন খান আব্দুল গফ্ফার খাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে তাঁরই নিমন্ত্রণে। সেখানে ওঁর দেখা হয় পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে। দলের নামে "মুসলীম" কথাটার তাৎপর্য্য কি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি বলেন "কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা নব্বই জন আর ধর্মের নামে সাড়া দেওয়া মুসলমানদের মজ্জাগত স্বভাব! খান সাহেবই ওঁকে বুঝিয়েছিলেন যে এটা ঠিক নয়, এটা বৃটিশ কুমন্ত্রণা আর 'ভাগ ক'রে ভেঙে দেওয়ার' নীতি। পণ্ডিতজী বুঝিয়েছিলেন যে রাজার সঙ্গে লড়াই প্রজাদের হওয়া উচিৎ ধর্মের নামে নয়।

নাম থেকে 'মুসলীম' কথাটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশ নেমে এলো জাতীয়তার সংগ্রাম আর ১৯৪৪ সালে যেদিন "নয়া কাশ্মীর" আন্দোলন শুরু হল ওলাম মহম্মদ সাহেবের পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের নিশান উড়িয়ে সেদিন কাশ্মীরে "সাম্প্রদায়িক ভাগ ক'রে দেশের ভাঙন ধরাণো" বৃটিশ নীতি চিরকালের জন্যে শেষ হ'য়ে গেল। নয়া কাশ্মীরের পরিকল্পনানুযায়ী পঞ্চায়েৎ থেকে আরম্ভ ক'রে রাজ্য শাসন পর্যন্ত সবই পরিচালিত হবে জন সাধারণের নির্বাচন প্রথায় এবং বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে যে চাষ করবে তাকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। যে শতকরা নব্বই জন ধর্মের ডাকে সাড়া দেয়নি তারা সবাই এবার পথে নেমে এসে দাঁড়ালো শেখ আবদুল্লাহ-র পেছনে আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালো দুমুঠো খেয়ে বাঁচার তাগিদে। দু বছরের মধ্যে দুশো বছরের আলস শেষ হ'য়ে গেল, আর ১৯৪৬ সালে দুদিনের মধ্যে দশ হাজার লোক গগন ভেদি চিৎকার ক'রে বলল, "কাশ্মীর ছাড়ো"।

১৯৪৬ সালের এই "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলন শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধেই নয়, এটা মহারাজার শাসনতন্ত্রেরও বিরুদ্ধে। শ্যাখজাল কনফারেন্স বলল, একশো বছর আগেকার "অমৃতসর সন্ধি" সন্ধি নয়, বিক্রির দলিল। গরু ছাগল মানুষ বিক্রি করতে পারে, জমিও পারে কিন্তু মানুষ মানুষকে বিক্রি করতে পারে না। বৃটিশ সরকারের কোন অধিকার ছিল না দশ লক্ষ লোককে পঁচাত্তর লক্ষ টাকায় বিক্রি করার! অতএব সন্ধির ঐ বিকৃত দলিল সভা সমাবেশে অচল!

ব্যাপক আন্দোলন শুরু হল রাতারাতি। সারা দেশে সাড়া পড়ে গেল। শ্যাখজাল কনফারেন্সের প্রত্যেকটি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল আর বৃটিশ উপদেষ্টার হুকুমে মার্শাল ল' জারি হ'য়ে গেল। নির্দেশ হল, যেখো আর মারো! কাশ্মীরে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের এইটাই মরিয়া হ'য়ে শেষ রণ কায়দা। পণ্ডিতজীও গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন। সেইটাই কাশ্মীরের দুঃখ।

১৯৪৭ এর আগষ্টের ভারত ভাগ হল। তার তিনমাস আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন গেলেন হরি সিংয়ের সঙ্গে দরবার করতে শ্রীনগর। মহারাজ জানতেন মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য, তাই তিনদিন নানান অজুহাতে উনি দেখা করাটাই এড়িয়ে গেলেন। উনি চেয়েছিলেন ভারতে যোগ দিতে কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য ছিল ওঁকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার। ভারতের গভর্ণর জেনারেল তো আর সে কথা সরাসরি বলতে পারেন না, অতএব অহর-বহু ঘুরিয়ে নাকে দেখালেন। উনি মন্ত্রণা দিলেন যে কাশ্মীরের যা ভৌগোলিক পরিস্থিতি তাতে পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, কোন দিকেই যাওয়া সমিচিন হবে না, স্বাধীন থাকাই ভালো।

তাহ'লে দেখটা পাকিস্তানের মুঠোয় থাকবে কারণ কাশ্মীরের সব কিছুই তখন রাওলপিণ্ডির পথেই কাশ্মীরে যেত।

আর যেহেতু যদি কোন রাজ্য যোগ দিতেই হয় তাহ'লে তার আগে জনমত সরকারি ভাবে জানা দরকার।

তাহ'লেও পাকিস্তান ঢুকি অনিবার্য্য কারণ মুসলমানের সংখ্যা শতকরা নব্বই জন। আর ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙামা আরম্ভ হওয়ার আগে ভোট নেওয়া হ'লে ফলটা যে তাই হত তা অনস্বিকার্য্য।

মহারাজ বাধ হ'য়ে বললেন 'জো হুকুম' আর ম্যাউন্টব্যাটেন নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলেন দিল্লী। তার সাতদিনের মধ্যেই জিন্না সংবাদ পাঠালেন শ্রীনগরে যে মহারাজ যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তাহ'লে ওঁর স্বাধীনতা পুরোপুরি বজায় থাকবে। মহারাজার প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক হলেন বৃটেনের জামাই। ওঁর স্ত্রী মেমসাহেব! তিনি বললেন সেই ভালো, কিন্তু মহারাজার তো তা ইচ্ছে নয় অতএব কাক এলেন দিল্লী মাউন্টব্যাটেনের মতামত নিতে। ঠিক হল যে সাময়িকভাবে স্বাধীনতা বজায় রেখে সই হবে ষ্টাণ্ড ষ্টিল এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ আপাততঃ যা আছে তাই থাক। জিন্না রাজি হ'লেন কারণ মাউন্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই জনমত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সর্দার প্যাটেল বললেন, 'ওসব হবে না, মনস্থির কর!' মহারাজা একটু জোর পেয়ে কাককে দিলেন ছাড়িয়ে আর রাজবন্দীদের দিলেন ছেড়ে। উনি জানতেন শেখ আবদুল্লাহ-র হাতে রাজ্যভার তুলে দিলে ভারত কাশ্মীরকে লুপে নেবে।

এর অল্পদিন আগেই পণ্ডিতজীকে মহারাজা গ্রেপ্তার করেছিলেন বলে ওঁর মনে পণ্ডিতজীর

প্রতি একটা ব্যক্তিগত ভয় ছিল তবে ভরসা ছিল যে শেষকে রাজ্যভার নিলে পণ্ডিতজী খুসীই হবেন।

কাশ্মীরের এই পরিবর্তন দেখে ঝিলা পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরের সমস্ত মাল যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন আর যা মাল ছিল সব আটক ক'রে রেখলেন। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যও পাঠিয়ে দেন শেখটাকে জোর করে হটিয়ে ক'রে নিতে কিন্তু জেনারেল অকিনলেক বুদ্ধি দিলেন যে সেটা ঠিক হবেনা কারণ খোলাখুলি সৈন্য পাঠালে ভারতও পাঠাবে আর তার ফলে দুটো দেশে যাবে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে! অতএব এলো হানাদার, অর্থাৎ সেই সৈন্যই এলো কেবল পোষাক বদল ক'রে। প্ল্যান হল যে মোজাফারাবাদ আর জম্মু আক্রমণটা এই দুদিক দিয়ে হবে যাতে ২৫ তারিখে ঈদের দিন শ্রীনগরে জিন্নাসাহেব নমাজ পড়তে পারেন!

আরম্ভ হল আক্রমণ। ২২ অক্টোবর ১৯৪৭। মহারাজার সৈন্য ছিল কিন্তু খুবই সামান্য। তারা ক্রমেই পেছু হটতে আরম্ভ করল। বিনা যুদ্ধে জয়ের আনন্দে অধীর হয়ে পাকিস্তানি হানাদারেরা ভাবল যুদ্ধ যখন করতেই হবে না তখন লুঠতরাজে আপত্তি কি? আরম্ভ হল ব্যাপক লুঠতরাজ। এই সুযোগে মহারাজার সৈন্যাধক ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং শ্রীনগরকে বাঁচাবার জন্যে ঘাঁটি পড়লেন উরিতে, পাকিস্তানি হানাদারেরা সেইখানে এসে আটকালো পুরো দুদিন।

ইতিমধ্যে ২৩ তারিখে মহারাজা সাহায্য চাইলেন ভারতের কাছ থেকে। মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে ২৫ তারিখে পাকিস্তানি হানাদার শ্রীনগর দখল করবে, কাজেই উনি ভেবেছিলেন যে সাহায্য না দিয়ে ২৫ তারিখটা পেরিয়ে গেলে ভাবনার আর কিছু থাকে না। অতএব উনি সাহায্য পাঠাতে রাজী হলেন, বললেন অ্যাকসেশন না হওয়া পর্যন্ত সাহায্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ২৬শে এইভাবে পেরিয়ে গেল আর ওদিকে হানাদারেরা পৌঁছোল উরি। সেখানে ওদের পথ আটকালেন ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং! পণ্ডিতজী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত, অতএব ইচ্ছে থাকলেও সর্দার প্যাটেলের কোন সহজ রাস্তা নেই। তবু যখন উনি জোর করলেন তখন মাউন্টব্যাটেন বললেন সাহায্য করার কথা ভাবার আগে প্রত্যক্ষভাবে জানা দরকার যে পরিস্থিতিটা আসলে কি। অতএব ঠিক হল ভি পি মেনন যাবেন পরিস্থিতি যাচাই করতে। ফলে আরও একটা দিন গেল। ২৭ তারিখ ভোরে মেনন সাহেব গেলেন শ্রীনগর। সেদিন সন্ধ্যায় সংবাদ পাওয়া গেল যে রাজেন্দ্র সিং সদলবলে নিহত হয়েছেন এবং পাকিস্তানিরা এসে পৌঁচেছে বারামুলা অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে ৩৯ মাইল দূরে! মেনন যদি মহারাজাকে ছেড়ে চলে আসেন তাহলে হানাদারদের হাতে ওঁর প্রাণ যাবে আর অ্যাকসেশনের কোন কথাই উঠবে না অতএব বুদ্ধি করে উনি মহারাজাকে পাঠিয়ে দিলেন জম্মু আর নিজে ফিরে গেলেন দিল্লী। সর্দার প্যাটেল ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এয়ারপোর্টে!

২৮ তারিখ সকাল বেলায় হানাদারেরা রওনা হবে শ্রীনগরের পথে। তাপাতাল কনকারেন্সের সামান্য কমি মকবুল সেরাওয়ানি তখন বারামুলায়। উনি হানাদারদের বোঝালেন সে সোজা পথে হাজার সৈন্য আছে, অতএব সুবিধা হবে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আর শ্রীনগরে ঢোকার আগে এয়ারপোর্টটা দখল করা কারণ ভারতের সৈন্য আসবে ঐ পথেই! শেরওয়ানি ওদের বোঝালেন যে দিনের আলোয় না যাওয়াই ভালো কারণ লোক থাকলে যাওয়ার পথে লুঠতরাজের সুবিধা হবে না; তাছাড়া, ভোরবেলা শ্রীনগর দখল করার কোনই অসুবিধা নেই। অতএব ঠিক হল সন্ধ্যায় ওদের যাত্রা শুরু

হবে। হানাদাররা মহা খুশী। সারাদিনটা ওরা গেল, বারামুলার আরও কিছু এবং আরও ভালো ক'রে লুঠ করবার!

রওনা হতে কিছু রাত হল। তারপর সারারাত এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে আর লুঠ করতে করতে হানাদাররা চলল মকবুল শেরওয়ানির পেছন পেছন। হিসেব করে মকবুল দেখিয়ে দিলেন যে ভোরবেলায় ওঁরা পৌঁছে যাবেন এয়ারপোর্ট আর সকালবেলায় শ্রীনগর। ভোর যখন হল তখন দেখা গেল ওরা আবার সেই বারামুলাতেই ফিরে এসেছে! চায়ের দোকানের যে ঘরে মকবুলকে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে ওরা তেরোটা গুলি মেরেছিল সেটা আজও আছে।

ওদিকে ২৬ তারিখ সকালেই মেনন সাহেব ফিরে এলেন দমদম, দলিল নিয়ে, সই করাবার জন্যে। রাজার হুকুম ছিল, মেনন সাহেব যদি আসেন, ঘুম থেকে তুলবে, আর যদি না আসেন তাহলে রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। মেনন সাহেব এলেন এবং দলিল সই করিয়ে নিয়ে গেলেন সেই দিনই। অধৈর্য আগ্রহে সর্দার প্যাটেল চ'লে এসেছিলেন এয়ারপোর্টে মেনন সাহেবের অপেক্ষায়। কাগজ নিয়ে সেখান থেকে লোজা গেলেন লাট ভবনে। কাগজ পেয়ে মাউন্টব্যাটেনের চক্ষু চড়ক গাছ। আবার বাগড়া দিলেন। সই করেছেন কিন্তু অনমত নেওয়ার কথা লেখা নেই। অতএব পণ্ডিতজীকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে আপাততঃ দলিলটা মেনে নেওয়া হলেও অবস্থা যখন ঠিক হবে তখন জনমত সরকারি ভাবে মেনে নেওয়া হবে।

এবার সৈন্য পাঠাবার পালা। সর্দারজী হুকুম দিলেন আজই পাঠাও। মাউন্টব্যাটেন জানালেন সেটা অসম্ভব, এক দিনে অত ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সামান্য কিছু সাহায্য পাঠানো যেতে পারে কিন্তু সেটা হবে মূর্খতা, যাদের পাঠানো হবে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আরও যদি একটা দিন দেরি করা যায়। বাধ্য হয়ে সর্দারজী পুরো দায়িত্ব নিজে নিলেন। কাশ্মীরে এটা হল বৃটিশ বদমায়েসির তৃতীয় পরাজয়।

২৭ সকালে যখন হানাদাররা আবার যাত্রা করল শ্রীনগরের পথে, বারামুলা থেকে, ঠিক সেই সময়ই দিল্লী থেকে যাত্রা করল ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরের পথে ড্যাকোটায় করে, ওদের প্রথম যুদ্ধ হল এয়ারপোর্টের ধারে।

শেখ আবদুল্লাহ সেইদিনই নিলেন কাশ্মীরের শাসন ভার। কাশ্মীরের ইতিহাসে আরম্ভ হল এক নতুন অধ্যায়।

॥ পাঁচ ॥

দোসরা সকাল

দিল্লী থেকে শ্রীনগরের আকাশ পথ বানিহাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যায় আর পৌঁছোতে লাগে প্রায় দুঘণ্টা। আগে ড্যাকোটায় ছাড়া আসা যেত না, আজকাল ভাইকাউন্টই বেশী। ভোর সাড়ে ছটায় দিল্লী ছেড়ে যখন প্রায় আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো, মেঘ-বৃষ্টিহীন ঝকঝকে খাওয়াবোর ভাগাবায়, তখন ঝলমলে রোদ্দুরে হাজার দশেক ফিট নিচের এলানো ছড়ানো পাহাড়ের চূড়োগুলো মনে হচ্ছিল যেন কোন আধুনিক শিল্পীর খেয়ালখুশীর নীল সবুজের খেলা।

ট্রেনে উঠলে আমার ঘুমের বহর যত বাড়ে বলরাজের তত বাড়ে বিভাস্ত ছোট্ট ছেলের মত জানলা দিয়ে মুখ বাড়ানোর আনন্দ। মাকটা জানলার কাঁচের ওপর চেপে ও নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল কৌতূহলে আত্মহারা হ'য়ে। মাঝে মাঝে আমায় ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা যে ও করেনি তা নয়, আমি ইচ্ছে ক'রেই সাড়া দিইনি। অনেক নিচের ছোট বড় গ্রাম আর মাঝে মাঝে সহরগুলো আমার চোখে দেখতে হলেই একই রকম লাগুক ওর কাছে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা আর প্রায় সবগুলোর নাম আর পরিস্থিতি ওর মুখস্থ। এ পথ দিয়ে যতবারই ওর সঙ্গে যাওয়া আসা করেছি, প্রতিবারই ওর এই অবাক হ'য়ে অতি পরিচিতকে আবার নতুন ক'রে দেখার এবং তার পূর্ণ বিবরণী দেওয়ার এই ছেলেমানুষী আনন্দ আমার যতই ভালো লাগুক, কোন বারেই আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে দিইনি। এবার ট্রেনে ওঠবার আগে ও বারবার চেষ্টা করেছিল যাতে আমি জানলার ধারে বসি আর আমার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের ফুলোলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটানোর জন্যে ওর রানিং কমেন্টরির সুবিধে ক'রে দি। ইতিমধ্যে তিন বাজার ও বেচারা বিফল হ'য়েছে,, এবার এড়িয়ে গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই হার প্রায় মেনেই ন'সেছিলাম, বাঁচিয়ে দিল ওর অভিনয়ের সুনাম আর নিরো হওয়ার দুর্ভাগ্য। ওকে দেখা মাত্রই ট্রেন গৃহিনীরা প'ড়ে যান আর কি! মহা সমারোহে ওকে স্বাগতম জানিয়ে জীবন সার্থক হওয়া সমারোহে ওকে দামলে নিয়ে বসিয়ে দিল জানলার ধারে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্রেন ছাড়বার আগেই ওর জন্যে টফি এলো, ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুচকি এলো আর আমার এলো ঘুম।

ট্রেন গৃহিনীর নরম সুরের ডাক আর গরম ব্রেকফাষ্টের গন্ধে চোখ খুলতেই বলরাজ বললে 'ঠিক সময়ে উঠেছ, চটপট খেয়ে নাও, একটু পরই বানিহাল।" ছোট্ট একটা 'হুঁ' ব'লে আর মস্ত একটা হাই তুলে ব্রেকফাষ্টে মন দিই। খিদে নয়, পুরোনো অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে গেল বলরাজের বুড়ো তরীপতী কানে যতই কম শুনুন আর গল্প যতই গুছিয়ে বলুন, খাওয়ার ব্যাপারে পুরে দস্তুর পাঞ্জাবী, কড়াই-র তাল আর মটর পনীর ছাড়া কথাই বলেন না। ওছুটোই আমার আবার ধাতে সয়না। ফুলোলের ব্যাপারে আমার ব্যাপারি হলেও খাওয়ার ব্যাপারে আমি রীতিমত নবাব। শ্রীনগরে আবার মাংসের সের পাঁচ টাকা আর মুরগীর তো ডাক শুনতেও পয়সা লাগে, মাংসের তো কথাই নেই।

বানিহাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বলরাজের বিবরণী শুরু হল। স-উৎসাহে নিচের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ও বললে "ঐ সামনে বানিহাল। ওটা পার হলেই শ্রীনগর একেবারে হাতের মুঠোয়। "তারপর হঠাৎ বললে" বাব্বা কি বিরাট সৈন্য সমাবেশ।" আমি না দেখেই মাথা নাড়লাম, মনটা আমার খাবারের দিকে। ও বললে "কাশ্মীরে আমাদের প্রস্তুতি একেবারে পুরোদস্তুর। পিঁপড়ে গ'লে যাবে এমন সাধ্য নেই!"

আঠারো বছর আগেকার পাকিস্তানের হানাদারি নৃশংসতা আমার সচক্ষে দেখা, বিশেষ বারামুলার কনভেন্টের ত্রিশবাধী নারীদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার আর ওখানকার বাসিন্দাদের ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ওরা করেছিল তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। খেতে খেতে বললাম "সেইটাই উচিৎ। পাকিস্তানকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। সামান্য সুযোগ পেলেই ওরা এসে হাজির হবে। বিশেষ করে এখন।"

"কেন?" ও বললে "এখন কেন?"

"শেখ আবদুল্লাহ আর বকশি-র দল কিছু কম নয়। ওরা যে ওৎপেতে আছে সে তো সাদেক সাহেব নিজেই ব'লেছেন।"

"না!" বলরাজ বেশ জোর দিয়েই বললে "সে প্ল্যান যদি পাকিস্তানের থাকত তাহ'লে হজরতের চুল চুরির সময় অরাজকতার সুযোগ নিয়ে সহজেই ওরা আসতে পারত। তাছাড়া, বক্সি গুলাম মহম্মদের পরও এখানে কম গোলমাল হয়নি, সেটাও খুব খারাপ সুযোগ ছিল না। আঠারো বছর যখন আসেনি তখন নতুন ক'রে আর ওরা আসবে না।"

কথাটা আমার মনে ধরল তাই চুপ করে গেলাম। ইতিমধ্যে আমরা বড়গাম এলাকার ওপর পৌঁছে নামবার জন্য নিচে এসেছি। বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ও জানলা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বললে:

"শ্রীনগরের বসতি এখন বড়গ্রামে ছড়িয়েছে। এ অঞ্চলে এত লোক আগে কখন দেখিনি।" ওটা যে শ্রীনগরের বসতি নয়, পাকিস্তানের হামলাদারি বেসাতি তা পরে জানা গেল।

বার দুই পাক খেয়ে প্লেন নামল শ্রীনগর এয়ারপোর্টে। তিন পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এই প্রকাণ্ড এয়ারপোর্টটা সহর থেকে সাত মাইল দূরে। জম্মু থেকে প্রায় একশো সাতাত্তর মাইল দূর শ্রীনগর বাসে আসতে লাগে প্রায় বারো ঘণ্টা। শীতকালের প্রচণ্ড বরফে বানিহাল যখন বারো ফুট বরফের তলায় ঢাকা পড়ে তখন মোটরপথ বন্ধ হতে গেলে প্রায় বন্ধই হ'য়ে যায়। আগে হ'য়েই গেছ বলে টানেলটাকে হাজার দুই ফুট নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। হলেও, অসুবিধার শেষ নেই। তাই ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সহজ পথ হল আকাশপথে। সেই জন্যেই এই এয়ারপোর্টের প্রাধান্য ভারতের অন্য যে কোন এয়ারপোর্টের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ অবাক হ'য়ে দেখলাম ওখানে পাহারার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নেই। যে যখন যেখানে ইচ্ছে অবাধে যেতে পারে, অবাধদিহির প্রয়োজনই হয় না। কাঁটা তারের একটা ছন্নছাড়া বেড়া আছে আর তার গেটের ধারে ছেঁড়া সার্ট পরা বুড়ো সর্দারজী প্রসন্ন মনে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। ওটা বোধহয় কোন রকমে ঘুম থেকে উঠে দুধ সস্তি খেয়ে আসার পর, জাড়নের বদলে দাড়িতেই হাত মোছার পর্ব সমাধান।

আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সাদেক সাহেবের বড় ছেলে রফিকসাহেব। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে সিগারেট ধরাতেই বুড়ো সর্দারজী হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। বোঝা গেল ওটা সরকারি বারণ নয়, ওর ধর্মের বিধান, সরকারের নাম ক'রে পুণ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করছিল। বলরাজ রফিক সাহেবের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, আর আমি জিনিষ সামলাবার জন্যে গিয়ে দেখি কয়েকজন মার্কিনী টুরিষ্ট মহাসমারোহে বিদায়ী ফটোগ্রাফ তুলছে কাউন্টের সামনে। এটা আরও তাজ্জব ব্যাপার। পৃথিবীর কোন এয়ারপোর্টেই বিনা অনুমতিতে ফটো তুলতে দেওয়া হয়না। কাশ্মীরে তখন ঠিক লড়াই না থাকলেও, কাশ্মীর নিয়ে লড়াই-র হুমকি আর সীমান্তে তার অল্পবিস্তর কিন্তু প্রাত্যহিক ঘনঘটা নিত্যই লেগে আছে। তা সত্ত্বেও এই এয়ারপোর্টের মতন একটা বিশেষ জায়গায় কোন রকম বিধিনিষেধ না দেখে একটু খটকা লাগল। একজন হোমরা চোমরা লোককে কথাটা বলতেই তিনি এক গাল হেসে জানালেন, "ওরা মার্কিনী টুরিষ্ট, আমাদের বন্ধের, তুলুক!"

এয়ারপোর্টের ধারে ধারে ক্ষেত। সহরের দিকে সাত পা গেলেই একধারে উঁচু-নিচু পাহাড়ে জায়গা, অন্যদিকে বড় বড় পপলার আর চিনার গাছের তলায় ঘন ঝোপের জমাট অন্ধকার। বেশ বড় সড় একদল লোক দিনের বেলাতেও বেশ স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। রাত্রিতে তো

কথাই নেই। নেহাৎ ভাগ্যদা দিয়ে না খুঁজলে পাওয়াই মুস্কিল। পাহাড়ের মধ্যে, পাশে ও ওপরে খাঁজ খাঁজ অলি গলি অনেক আছে। আধুনিক যুদ্ধ অস্ত্র থাকলে এখান থেকে এয়ারপোর্টের ওপর যে কোন সময়, যেমন ভাবে ইচ্ছে আক্রমণ চালানো যায় এবং যত বুদ্ধি যদি বাধে তাহ'লে পাহাড়ের ওপর থেকে লোক সরানো নেহাৎ সহজ কথা নয়। এইভাবে প্রায় মাইল খানেক পথ গেলে তবে আবার ধানক্ষেত, আপেল আখরোটের বাগান, ছোট বড় কাঁচা পাকাবাড়ী আর সরকারি পরীক্ষাগার। এই সাত মাইল পথে কোথাও কিছু পাহারার ব্যবস্থা নেই, লোকজনের যাতায়াতও অল্প। কথার ফাঁকে বলরাজকে বললাম :

"কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের এতো হুমকি অথচ পাহারার কোন ব্যবস্থাই কোথাও নেই!"

রফিক সাহেব হেসে বললেন :

"দরকারও নেই। আকাশ পথ ছাড়া এয়ারপোর্ট পৌঁছোতে পাকিস্তানের লাগবে হাজার বছর। এখান থেকে হাঁটা পথে সীমান্ত হল কম ক'রে ৩০ মাইল আর চারিধারে আমাদের কড়া পাহারা।"

"সাবোটাজের লোকের তো অভাব নেই। আপনাদের বাড়ীর বাবুর্চিকে যদি টাইম বম রাখতে পারে তাহ'লে এখানে শক্ত কি?"

হেসে রফিক সাহেব বললেন : "সে কথা ঠিক, তবে বকসি সম্প্রদায়ের বিষ দাঁত ভেঙে গেছে!"

"তাহ'লে আপনার বাবাকে মারবার প্রচেষ্টাটা কাদের?

রফিক সাহেব কি ভাবলেন তারপর হেসে বললেন : "ওদেরই!"

আমি আবার প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকাণ্ড ক'রে হারিয়ে ফেলি। বলরাজ সিনেমার নামকরা অভিনেতা হ'লে কি হবে, রাজনীতিতে ওর দখল আর বর্তমান অবস্থাটাকে পুরোপুরি বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে ওর কৌতূহল আমার চার জন্মের বাইরে। মুখ্যমন্ত্রীর বড় ছেলের কাছ থেকে যা জানা যাবে তার অথরিটি যে কোন সময় সে কোন লোকের চেয়ে অনেক বেশী, অতএব বলরাজ আর রফিক সাহেব রাজনীতিতে ডুব দিলেন। মাঝে মাঝে ভাসা ভাসা যে কথাগুলো আমার কানে এলো তার সবটুকু আজ স্পষ্ট মনে নেই তবে একটা কথা রফিকসাহেব ব'লেছিলেন যা কানে ব'েছিল। উনি ব'লেছিলেন যে শেখ আবদুল্লাহ-র নেটোরা প্লেবিসিট ফ্রন্ট আর বকসি গুলাম মহম্মদের মোসাহেবদের দল প্রায় সর্বত্রই হার মেনেছে মীর কাসেম সাহেবের কংগ্রেস সংগঠনের প্রচেষ্টার কাছে এবং ভারত সরকার যদি আর কোন ভুল না করে তাহ'লে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সহজেই হ'য়ে যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচ মাইলের মাথায় রামবাগ ব্রীজ। সহরের এটা শেষ প্রান্ত আর সহরের ঠিক মাঝখান থেকে হিসেব করলে মাইল দুয়েকের বেশী নয়। শ্রীনগর ঘিরে আছে ঝিলাম নদী। তার বন্যা বন্ধ করার জন্যে যে খাল কাটা হ'য়েছে, এ ব্রীজটা তারই ওপরে এবং সহর ও এয়ারপোর্টের একমাত্র সংযোগস্থল। এ ব্রীজটা যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে এয়ারপোর্ট আর তার পাশের বড়গ্রাম জেলা শ্রীনগর থেকে আলাদা হ'য়ে যায়। তাছাড়া, পাহাড় পথে সীমান্ত থেকে শুলমর্গ যেমন চট ক'রে আসা যায়, তেমনি শুলমর্গ থেকে পাহাড় বেয়ে বড়গ্রাম আসাতেও কোন অসুবিধা নেই। অতএব, যুদ্ধের ব্যাপারে এই ব্রীজটার প্রাধান্য অনেকখানি।

ব্রীজ পেরিয়েই ডানদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার মাঝখান দিয়ে সরু পিচ ঢালা রাস্তাটা রবীন্দ্র ভবনের সামনে দিয়ে ঘিরে পড়েছে একেবারে ওয়াজিরবাগের মাথার ওপর। ব্রীজ থেকে বলরাজের বাড়ী পায়ীওড়া পথে মিনিট খানেক, গাড়ীচলা পথে মিনিট তিনেক। ব্রীজ পেরিয়েই গাড়ী দাঁড়ালো চুঙ্গিখানার সামনে। রক্ষিসাহেব আমাদের রক্ষা কবচ, অতএব বিনা চেকিংয়েই পার পাওয়া গেল। যে সব লরী বাইরে থেকে আসে এবং ব্রীজ পেরিয়ে সহরে ঢোকে, এইটাই তাদের চেক্ পোষ্ট। থানাতল্লাসির পর ছাড়পত্র দিলে তবে তারা সহরে ঢুকতে পারে। সহরে ঢোকার প্রত্যেক রাস্তার মাথায় চুঙ্গিখানা আছে। এবং প্রত্যেক চুঙ্গিখানায় পুলিশ মোতায়েন আছে। এসব সত্ত্বেও কম ক'রে আশী টন অস্ত্র আর সোলা বারুদ হানাদাররা সহরের মধ্যে এনেছিল! আর আনবে নাই বা কেন? ব্রীজে কোন রকম পাহারা নেই আর চুঙ্গিখানার সামনে কাশ্মীরি পুলিশ খালি পায়ে আর ছড়ি বগলে গায়ের তলায় ব'সে চুল ছাঁটছিল! পাহারাদারি পুলিশের এমন পাহাড় প্রমাণ গাফিলতি জীবনে কখন দেখিনি!

কোন এককালে মহারাজের মন্ত্রীবর্গ এই পাড়ায় প্রাসাদ গ'ড়ে ছিলেন ব'লেই এর নাম ওয়াজিরবাগ। এখন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবীরা পাড়াটাকে বাহল্যের তকমায় এঁটে রেখেছেন। দুমহলাবাড়ীর তিন-তলার ওপর আমার ঘর। সহরের দিকে পেছন ফিরে আর প্রাকৃতিক ঔদার্য্যে চোখ মেলে ধরলে আমারই মতন ছন্নছাড়া। ওপরে টিনের গড়ানো ছাদ আর চারিদিকে কাঠের দেয়াল। জুলাই-র শেষে এখানে মশার উপদ্রব আরম্ভ হয় ব'লে বৃদ্ধ জামাইবাবু বেশ বড়গোছের একটা মিলিটারি মশারী আমার সরু নেয়ারের খাটে এমন আলু-থালু ঝুলিয়ে দিলেন যে মনে হল পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে মার শাড়ী পরেছে। মশারী টাঙানোর বহর দেখে আমি আর বলরাজ হেসেই খুন! তখন কে জানত, যে ঐ মশারীর জোরেই আমার বাঁচার মেয়াদ কিছু বৃদ্ধি পাবে!

শ্রীনগরের বাতাসে কি আছে জানিনা, বাড়ীতে পা দিয়েই মনে হল সারা সকাল কিছুই বুঝি খাইনি। আর এক প্রস্থ খাওয়ার পর্ব শেষ হ'তে না হ'তেই মেহজুর সাহেবের ছেলে আমিন এসে হাজির। মেহজুরের জীবনী অবলম্বনে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ছবি হবে হিন্দি আর কাশ্মীরি ভাষায়। এতে বলরাজের যত উৎসাহ ওঁর তত লোভ। প্রায় ৩০ বছর ধ'রে বলরাজ ভারতের প্রায় সব পরিচালকের সঙ্গেই এ বিষয় কথা ব'লেছে কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা যে ওর অদম্য আশার সেই তরী ভিড়ল, আমার কর্মজীবনের ঠিক মাঝখানে এসে। আমিন এসেছে টাকার লোভে কিন্তু তারা জানেনা যে টাকা দেওয়ার আগে আমি তার মুখ আদায় ক'রে নেব। বললাম, "চল, বড়গাম যাই!" আমিন কোন কথা বলার আগেই বলরাজ বেঁকে বসল। প্রস্তাবটা ওর একেবারেই মনঃপুত নয়। রাওলপিণ্ডিতে ওর জন্ম হ'লেও, মানুষ হ'য়েছে এই দেশের মাটিতে। এখানে ওর বাবা ছিলেন বিলেতি কাপড়ের জাঁদরেল আড়তদার আর সিগারেটের মূল পরিবেশক। লাহোর থেকে এম এ পাশ করার পরও বেশ কিছুদিন কাপড় কাঁধে দোকানে দোকানে ঘুরেছে বাবার ব্যবসায় আর গরীব সমাজে সেবার কাজের স্বপ্ন দেখেছে মনের তাগিদে। ওর ইচ্ছে ছিল ঝিলাম নদীর বাঁধ ধ'রে হেঁটে আসি সহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নয়ত নদীর স্রোতে ভেসে আসি যতদূর ইচ্ছে, যতক্ষণ মন চায়!

ওর কথায় আমি রাজি নই। এখানের বাতাসে ঘরে থাকা দায় হয় ঠিকই কিন্তু তাই ব'লে সহরের মাঝখানে? মোটেও না। কাশ্মীরের মাটীতে পা দিলেই আমার মন চায় এক ছুটে

সহরের বাইরে বেরিয়ে যাই, যান ক্ষেতের ধার দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার পার দিয়ে একেবারে গ্রামের মাঝখানে। আপত্তি তুলে বলরাজ বললে: "সাতটার সাদেক সাহেবের বাড়ীতে নেমন্তন্ন!"

"এখন তো সবে সাড়ে দশটা!"

অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল ও থাকবে আমি যাবো। সাতটার মধ্যে যদি আমি না ফিরি তাহ'লে সাদেক সাহেবের বাড়ী ও চ'লে যাবে আর আমি সোজা সেইখানেই ফিরব। ও হেসে বললে: "আসলে সেইটাই হবে—আমি জানি তুমি সোজা সেইখানেই আসবে। আমি হাসলাম। কথাটা ও ঠিকই ব'লেছে। এটা নতুন নয়, আগে বহুবার ঘটে গেছে। কাশ্মীরে কোথাও যাওয়ার কথা বলে আমি কেবলই পালিয়ে বেড়াই ও তা জানে। ওটা যে শুধু প্রকৃতির আকর্ষণে তা নয়, কাশ্মীরি বাড়ীর নেমন্তন্নে আমার ভয়ের শেষ নেই। বারো থেকে আঠারো রকম মাংসের রান্না আর চার থেকে ছয়রকম মিষ্টির বহর, দেখলেই আমার কান্না পায়। এগুলো না হয় তবু খেয়ে, এবং না খেয়ে পার পাওয়া যায় কিন্তু একটা থালা থেকে চারজন খাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন খটকা লাগে। জাতির বিচার মানিনা, রীতিকেও অমান্য করাটাকে অসভ্যতা মনে করি, তবু ওদের একত্রে খাওয়ার এই সহজ সত্যটাকে কিছুতেই যেন মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। তাই ঠিক হল, সময় পেলে আমি সোজাই চ'লে যাবো আর ফাঁকি যে দেবোনা সেটা অন্ততঃ বলরাজের কাছে প্রমাণ করার জন্যেই সার্ট প্যান্ট ফেলে কালো আচকন আর চুড়িদার পাজামা প'রে নিলাম। বলরাজ এক চোখ দেখে বললে, "একেবারে খাস্ মোগল বাঁহাপনা! দেখে কে বলবে তুমি বাঙালী! আসলে, আমার ভয় হচ্ছে, পাকিস্তানি ব'লে না কেউ ভুল করে!"

কথাটা ও যতই ঠাট্টাচ্ছলে বলুক না কেন, হাসতে হাসতে অতবড় ভবিষ্যত বাণী আর কেউ কখন করেছে কিনা জানিনা, আমার জীবনে যে কখন আর ঘটেনি তা আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি।

[ক্রমশঃ

সোভিয়েতের শিশুরা

কানাই পাকড়াশী

১৯১৯ সালে লেনিন এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, "এখন থেকে স্থানীয় খাদ্যসংস্থাগুলিকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে রাষ্ট্রের খরচায় সমস্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।" আরেক ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছিল :

"শিশু-শিবিরগুলিতে খাদ্য পাঠানোর ব্যবস্থাকে সামরিক যানপত্র পাঠানোর সমান গুরুত্ব দিতে হবে।"

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গোড়ার দিকে শিশুদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রষ্টার গভীর আবেগ তাঁর উপরোক্ত ঘোষণাদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেই আবেগ, সেই অনুভূতি নিয়ে আজও সোভিয়েতের শিশুদের পালন করা হয়। শিশুরা সেখানে রাষ্ট্রের সম্পদ, সব থেকে সুবিধাভোগ করে তারা। সোভিয়েত শিশুর ভবিষ্যত, তার স্বাস্থ্য, তার শিক্ষা সবই সেখানে সুনিয়ন্ত্রিত। সমগ্র রাষ্ট্রের সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি রয়েছে এই ভবিষ্যত নাগরিকদের ওপর।

বিদেশী পর্যটকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাত্রই সুবিধাভোগী শ্রেণী রয়েছে, সেই শ্রেণী হল শিশু-শ্রেণী। কথাটা সত্যি। প্রত্যেকটি শিশুর জীবন সোভিয়েত সরকারের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এর জন্যেই চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক বৃদ্ধি করতে সোভিয়েত সরকার কুণ্ঠিত হয় নি। চিকিৎসার ব্যাপারে সামান্যতম পরামর্শ থেকে শুরু করে আধুনিক হাসপাতালে অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচার সেখানে করা হয় বিনামূল্যে। সোভিয়েতের একটি শিশুও যাতে বিপজ্জনক রোগের কবলে পড়তে না পারে সেদিকে সরকারের প্রখর দৃষ্টি সর্বদা। সদ্যজাত শিশুকে বসন্ত প্রতিরোধক-টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি শিশুকেই পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাফ ও আন্ত্রিকতা প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে চিকিৎসকের রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হয়। তার অর্থ নার্সারী কিনডারগার্টেন্ ও বিদ্যালয়ে ডাক্তারগণ শিশুদের নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাদের এক-রে নেওয়া হয়, রক্ত পরীক্ষা হয়। ডাক্তারবৃন্দ সর্বদাই সন্তানদের বিষয়ে তাদের বাপমাকে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

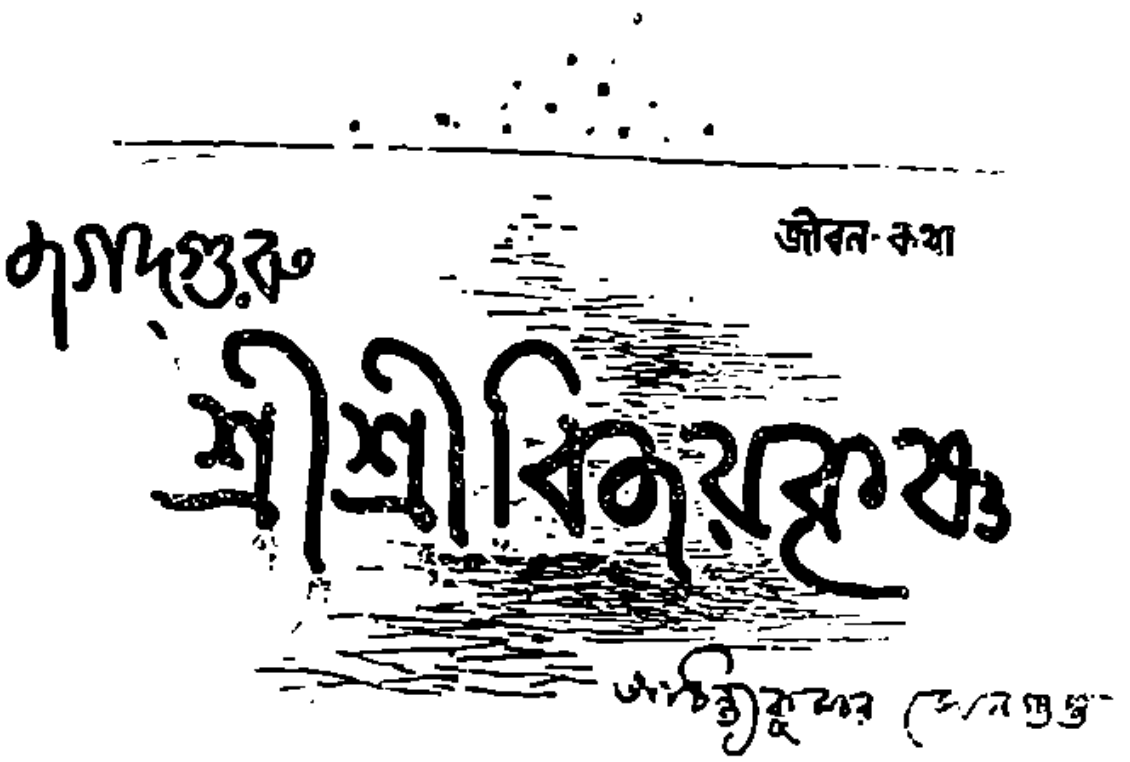

৩৬

তেরো শ চার সনের চব্বিশে ফাল্গুন, ইষ-লক্ষের সঙ্গে দু'খানি বজরা বাঁধা, একখানাতে সশিষ্য গোস্বামী প্রভু, আরেকখানাতে আত্মীয়-স্বজন পুরী-যাত্রা সুরু হল।

বিদায়কালে প্রভু করজোড়ে ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন, আমার যেন ধামপ্রাপ্তি হয়।'

একী নিদারুণ কথা, সকলে বিদীর্ণবক্ষে হায় হায় করে উঠল।

'আমরা তবে কী করব, কী নিয়ে থাকব?'

সেই মহাপ্রভুর কথাই বললেন আবার গোঁসাইজী : 'ঘরে কর নাম-সঙ্কীর্তন, শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবন।'

বিকেল চারটে, কয়লাঘাটা থেকে ইষার ছাড়ল। পরদিন দুপুর বারোটায় নোঙর করল গেঁয়োখালিতে। ডাকবাংলোয় এসে উঠলেন গোঁসাইজি। সঙ্গে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

সেদিন ষোলপূর্ণিমা। প্রভুর চরণে আবির দেবার জন্যে ভক্তদল আবেগে রঙিন হয়ে উঠল। আবির দিয়ে রঞ্জিত হল অনুরাগে।

চারদিন পরে ইষার কটকে পৌঁছুল। ন'মাইল দূরে বারং ষ্টেশন, সেখান থেকে পুরীর ট্রেন। গোঁসাইজি ঘোড়ার গাড়িতে করে বারং এলেন, স্ত্রী-ভক্তরা গরুর গাড়িতে আর অবশিষ্টের দল পদব্রজে।

দুপুরের ট্রেন, পুরী পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা গড়িয়ে গেল। ট্রেন দাঁড়াল পুরোনো ষ্টেশনে, এখান থেকে শহর দু মাইলেরও বেশি। বেশ তো, ঘোড়ার গাড়ি ডাকি।

প্রভু বললেন, 'না। পুরীধামে যানারোহণ করব না।'

কিন্তু প্রভু হাঁটবেন কী করে? দিবারাত্রি একাসনে থাকার ফলে তাঁর পায়ে বাত হয়েছে, লাঠি কিংবা মানুষের কাঁধ ছাড়া চলতে-ফিরতে পারেন না। তা কী করা যাবে, যিনি কলকাতা থেকে এতদূরে এনেছেন তিনিই হাত ধরে নিয়ে যাবেন।

দু শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে এগোলেন প্রভু। কিছুদূর গিয়ে পথের পাশের একটা বড় বাড়ির দাওয়ায় বসলেন বিশ্রাম করতে। হঠাৎ ক'জন পাণ্ডা এসে উপস্থিত হল, বললে, প্রণামী দাও। তাদের সকলের পদধূলি মাথায় নিলেন প্রভু, প্রণামী দিলেন। পাণ্ডার দল যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

এ কী, প্রভু নিজের পায়েই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। না, লাঠি লাগবে না, কারুর কাঁধ লাগবে না, প্রভু একলাই যেতে পারবেন হেঁটে। হাঁটবেন কী, প্রভু ছুটলেন, কোথায় তাঁর বাতের ব্যথা, কোথায় বা শরীরের দৌর্বল্য! মুখে হুঙ্কার, জয় জগন্নাথ, শরীরে মত্ত মাতঙ্গের বল আবির্ভূত হল। প্রভু ছুটলেন তো পিছু-পিছু আর সকলেও ছুটল—তুমুল বিপুল হরিধ্বনি। সকলের মনে হল সপার্ষদ মহাপ্রভুই বুঝি এলেন আবার নীলাচলে।

আঠার-নালার কাছে আসতেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা চোখে পড়ল। মহাভাবে বিভোর হয়ে গেলেন গোঁসাইজি, উঠল হরিকীর্তনের সিংহনাদ। প্রভু নাচতে সুরু করলেন। ভক্ত বিষ্ণু ঘোষ গাইতে লাগল: 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ দেখ তারা দু ভাই এসেছে রে, গৌর নিতাই ভক্তসঙ্গে এসেছে রে—'

সে কী উন্মাদনা। প্রভুর চরণযুগল কণ্টকবিদ্ধ হচ্ছে সেই যন্ত্রণায় বিষ্ণু বারে-বারে পথের উপর শুয়ে বুক পেতে দিচ্ছে আর ইশারায় বলছে, আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান। এমন সময় আরেক পাগল এসে উপস্থিত, কালিয়া-পাগল, সে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, ও পথে নয় এ পথে, যেন মন্দিরের পথ একলা ওরই চেনা। চারদিকে ভাবের হরির লুট পড়ে গিয়েছে। গৌরবর্ণনা লোকে এতদিন কানেই শুনে এসেছিল, এবার দেখতে পেল স্বচক্ষে।

বড়দাণ্ডে নীলমণি বর্মণের দোতলা বাড়িতে প্রভুর থাকবার জায়গা হল। কিন্তু জগন্নাথকে দর্শন করবার আগে স্থির হতে পারছেন না। ধুলো-পায়েই বেরিয়ে পড়তে চান কিন্তু তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ খুটিয়া বললেন, আগে মহাপ্রসাদ, পরে জগন্নাথদর্শন। শ্রীক্ষেত্রে এই পদ্ধতি।

মহাপ্রভুর পাণ্ডাঠাকুর কানাই খুটিয়ার বংশধর হরেকৃষ্ণ।

গোস্বামীপ্রভু হরেকৃষ্ণ-র পদপূজা করলেন। শিষ্যভক্তের দল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তীর্থগুরুর আশীর্বাদ ছাড়া তীর্থফল ফুটবে কী করে?

এবার তবে সবাই বসে যাও, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরিত হবে। না, পঙক্তি নেই, জাতি নেই, বর্ণ নেই, এমনকি উচ্ছিষ্ট বিচার নেই, মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ। সমস্ত কিছুর বাইরে, সমস্ত কিছুর উপরে।

গোঁসাইজির পাণ্ডাঠাকুরদের কী ঘোরতর সংস্কার ছিল। সারা পথ কত তিনি বলে এসেছিলেন, তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হবে, অন্যের ছোঁয়া কিছুতেই খেতে পারবেন না। উচ্ছিষ্ট তো কল্পনার অতীত। সেই শুদ্ধাচারিণী বিধবা ব্রাহ্মণী আজন্মের সংস্কার এক মুহূর্তে বিসর্জন দিল। কই দাও মহাপ্রসাদ, আমিও খাব। পাণ্ডাঠাকুরদও বসে পড়লেন পাত নিয়ে।

কী অদ্ভুত শক্তি এই মহাপ্রসাদের!

বৃন্দাবনের যেমন রজ তেমনি শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদ ভোজনের পর গোঁসাইজি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, চলো, জগন্নাথের মুখচন্দ্রমা দেখে আসি।

পাণ্ডারা নিরস্ত করতে চাইল। বললে, আজ পরিশ্রান্ত আছেন, 'আজ থাক, কাল দর্শন করবেন।'

'কাল?' প্রভু বললেন, 'কালের কথা কিছুই বলা যায় না। মৃত্যু কখন এসে পড়ে তা কে বলতে পারে? সুতরাং আজই এই মুহূর্তেই দর্শন করব।'

রাত হয়েছে, হোক, বলরাম নিয়ে প্রভু চললেন শ্রীমন্দির। বিগ্রহ দর্শন করা মাত্রই ভাববিহ্বল হয়ে বসে পড়লেন, যেন কত আপনার জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এমনি স্নেহাবেশে হাত মুখ নেড়ে অস্ফুটে কত কী বলতে লাগলেন। কত মনের কথা, কত প্রাণের ব্যথা জমে ছিল তাহাদিন—সব প্রেমাশ্রু হয়ে প্রকাশিত হল, প্রবাহিত হল। লোকে জগন্নাথকে দেখবে না জগদ্‌গুরুকে দেখবে। দুইই বুঝি একবস্তু।

শ্রীক্ষেত্রে আছেন কিন্তু গৃহস্থের নিত্যকর্ম থেকে তাঁর বিরতি নেই। ধর্মালোচনা, পূজা পাঠ ও কীর্তন সমানেই চলেছে। চলেছে অতিথিবিদায়, অতিথি সৎকার, বৃক্ষসেবা, পশুসেবা এমনকি কীটসেবা। বইয়ের নিচে বাতাসার গুঁড়ো রেখে দেন যাতে পিঁপড়েরা এসে খায়। আরশুলা, ইঁদুরকেও ভোলেননি। শস্য ছড়ানো দেখে তো পাখিরা আসছেই ঝাঁক বেঁধে। আর আসে বানরের পাল। তাদের সব বিচিত্র নাম রেখেছেন প্রভু। কেউ বুড়ো, কেউ গোদা, কেউ নাককাটা, লেজকাটা, হাঁপরপেটা, কেউ বা শুধু দাদামশাই। একদিন একটা ষাঁড় এসে উপস্থিত। সেও খেয়ে গেল সেই ভরে।

কী বলছে ভাগবত? গৃহস্থের ধর্ম কী?

গৃহস্থ কৃষ্ণার্পণ করে যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করবে, সর্বদা অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত থাকবে। যাবৎ অর্থে প্রয়োজন তাবন্মাত্র বিষয় সেবা করবে, অন্তরে থাকবে দেহ ও দেহের প্রতি বিরক্তি, বাইরে আসক্তবৎ আচরণ করে প্রকাশিত করবে পৌরুষ। আত্মীয়দের নিয়ে আমোদ করবে কিন্তু কিছুতেই মমতা রাখবে না। দৈবাৎ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন হয়, সেই অতিরিক্তে কদাচ অভিমান করবে না, কেননা, যে পরিমাণে উদরপূর্তি হয় সেইটুকুতেই গৃহস্থের স্বত্ব, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি দ্রব্যের অভিলাষ করে সে চোর, সে দণ্ডার্হ। অতএব মূষক, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, ইঁদুর, সাপ, পাখি, মক্ষিকা ইত্যাদি যে কোনো প্রাণী গৃহে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শস্যাদি ভোজন করলে তা নিবারণ করা উচিত নয়, বরং নিজের পুত্রের মতই তাদের দর্শন করা উচিত। সমস্তকে নিয়েই ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা, কাউকে বাদ দেবার বা তুচ্ছ করবার অধিকার নেই। পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহ অন্তে বিঘস, পঞ্চযজ্ঞ করে যা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করবে। মানুষ পশু পাখি দেবতা ঋষি—সমস্ত শরীরই ভগবানের সৃষ্টি, সকল পুরেই তিনি জীবরূপে শয়ন করে আছেন, সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরের অবয়ব, কাকে ছোট কাকে বড় বলবে—সমস্তই হরির শরীর হরির মন্দির।

শান্তিলতা তার ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে, তাকে গোঁসাইজি খেতে দিয়েছেন অমনি এক বানরের বাচ্চা এসে হাজির। দৌহিত্রের দিকে তাকিয়ে গোঁসাইজি বললেন, 'তুমি যেমন গোপাল

এ বানর-শিশুও তেমনি গোপাল। একেও খেতে দিতে হয়।' দুই গোপাল একই থালা থেকে খেল ভাগ করে।

ছোট একটি কাঠের মন্দির এল ঠাকুরের জন্যে। তাতে তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রা। গোঁসাইজি নিত্য সেই তিন বিগ্রহের পুজো করতে লাগলেন।

তারপর সুরু হল তাঁর তীর্থদর্শন। মার্কণ্ডেয় সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মহাপ্রভুর গম্ভীরা, গুণ্ডিচাবাড়ি, সার্বভৌমের গৃহ, হরিদাসের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গোবর্ধন মঠ, টোটা গোপীনাথ। তারপর বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা—সকল যাত্রার যাত্রী হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

চন্দনযাত্রা নরেন্দ্র সরোবরে। চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ মদনমোহন আসে। অন্য দোলায় আসে পঞ্চশিব—রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, মার্কণ্ড, লোকনাথ আর কপালমোচন। দুই নৌকো করে দুই দল সরোবর পরিক্রমা করে। পরিক্রমার পর সরোবরস্থ মন্দিরে বিগ্রহদের ভোগ-পূজা হয়—সঙ্গে কত নৃত্যগীত কত কথাকীর্তন। তারপর ভোগ-অন্তে বিগ্রহেরা যে যার মন্দিরে প্রস্থান করে।

অক্ষয় তৃতীয়া থেকে সুরু করে একুশদিন ধরে এ উৎসব চলে। প্রভু তাই দেখেন অনিমেষে, ভক্তদের বলেন, তোমরা নরেন্দ্রে স্নান করো, এ সময় এখানে গঙ্গা-যমুনা এসে মিশেছে। একসাথে গঙ্গাযমুনাস্নান হয়ে যাবে।

আনন্দের তুফান তুলে স্নান করে সকলে।

একদিন উত্তর-পশ্চিম কোণের বটগাছের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরালেন প্রভু। বললেন, 'কতদিন এই গাছের নিচে সাজোপাজ নিয়ে মহাপ্রভু এসে বসেছেন।' আরেকদিন উত্তর তীরের বন দেখিয়ে বললেন, 'কখনো-কখনো বিপিনভোজন করে গেছেন ওখানে।' আরেক দিন সেই উত্তর দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন, 'দেখ দেখ কেমন সুন্দর মন্দির। কেমন সোনার চূড়ো তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী, দেখতে পাচ্ছনা তোমরা?'

কী করে দেখবে? কী করে বুঝবে ঐটিই প্রভুর ভাবী সমাধি মন্দির?

স্নানযাত্রার দিন পরিচা-পাণ্ডারা প্রভুর কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে বসল। প্রার্থিত অর্থ না দিলে স্নানবেদীর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। অন্যায় দাবি মেনে নিতে প্রভু রাজি হলেন না, দরকার নেই তোমাদের অনুষ্ঠান দেখতে। আমি মন্দিরে চললাম, মন্দিরে বসেই আমি জগন্নাথের অপ্রাকৃত স্নানযাত্রা দর্শন করব।

পাণ্ডারা তখন বুঝল তাদের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হবে, জগন্নাথ মন্দির ছেড়ে যাবেন না স্নানবেদীতে। তাদের দেওয়া জলে স্নান না করে মন্দাকিনীতেই আজ স্নান করবেন।

তখন পাণ্ডারা এসে প্রভুর পায়ে পড়ল। চলুন স্নানবেদীতে, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার যা খুশি তাই দেবেন।

স্নানবেদীর ধারে গিয়ে প্রভু দেখলেন স্নানযাত্রা। তীর্থের সম্মান রাখতে প্রভু যে অর্থ দিলেন, পাণ্ডারা দেখল, তা তাদের প্রার্থনারও অতিরিক্ত।

কিন্তু রথযাত্রার দিন অন্যরকম বিপর্যয় ঘটল। প্রভুর পায়ে ব্যথা উপস্থিত হল, এত ব্যথা যে চলা ঘুরের কথা উঠে দাঁড়ানো কষ্টকর হল। রথযাত্রা দেখা খুঁজি অদৃষ্টে নেই। ভক্ত-শিষ্যরা বললে, ভাবছেন কেন, আপনার জন্যে আমরা ডাণ্ডায় নিয়ে আসব, তাতে চড়ে রথযাত্রা দর্শন করবেন।

রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। শাস্ত্রে আছে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে রথে জগন্নাথকে দেখলে পুনর্জন্মের খণ্ডন হয়। কিন্তু পাণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে টাকা পয়সার ঝাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া সুরু হয়েছে, বামনকে রথস্থ করা হচ্ছে না। এদিকে দ্বিতীয়া বুঝি কেটে যায়।

শিষ্যকে পাঠিয়েছেন প্রভু, বামন রথস্থ হলে যেন খবর পাঠায়। খবর পৌঁছুলে তিনি তাজামে করে রওনা হবেন।

শিষ্য খবর নিয়ে এল, দ্বিতীয়া প্রায় শেষ হতে চলল বিগ্রহকে এখনো রথে বসানো হয়নি। তবে আর গিয়ে কী হবে, তাজাম ফিরিয়ে দাও, যেতে যেতে ফুরিয়ে যাবে দ্বিতীয়া।

'এখনো তো কিছুক্ষণ দ্বিতীয়া আছে, আপনি আপনার বিগ্রহ নিয়ে তাজামে উঠে বসুন, সেই আমাদের রথস্থ বামন দেখা হবে।' শিষ্যভক্তের দল প্রভুর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল।

প্রভু উঠে বসলেন তাজামে। সঙ্গে তাঁর নিজের জগন্নাথ। শিষ্যরা তাজাম কাঁধে নিয়ে ঘুরতে লাগল। না, দ্বিতীয়ার এখনো অবসান হয়নি। কে আছ রথস্থ বামনকে দেখে জন্মমৃত্যুকে ছিন্ন করো। জয় প্রভু বিজয়কৃষ্ণ।

শিব চতুর্দশীর দিন গেলেন লোকনাথ মহাদেবকে দর্শন করতে। 'হরিহর' 'হরিহর' বলে উন্মত্ত নৃত্য করলেন। বললেন, ওঁ নমঃ শিবায়, এই নাম সর্বদা জপ করো, এতেই সিদ্ধিলাভ হবে। স্বয়ং দ্বারকানাথ এই নাম জপ করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। যে কৃষ্ণকে পুজো করে অথচ শিবকে মানেনা কিংবা যে শিবকে পুজো করে অথচ কৃষ্ণকে মানে না, উভয়েই নরকস্থ হয়। শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে। শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।'

আর ষোলযাত্রার দিন মন্দিরে ষোলবেদী ঘিরে প্রভুর সে কী মহাভাবময় নৃত্য! লোকে বিগ্রহ দেখবে না প্রভুকে দেখবে! স্বয়ং ছত্রপতি বলে উঠল, এই তো স্বয়ং এসেছেন জগন্নাথ। বলে প্রভুর মাথায়ই ছাতা ধরল।

কত লীলা কত ভাব কত আত্মপ্রকাশ। নিত্য স্নযাত্রার দিন অতর্কিতে এক চেউ প্রভুর বাঁ হাঁটুতে আছড়ে পড়ে অস্থিসন্ধি ভেঙে দিল, আবার তক্ষুনি আরেকটা চেউ এসে অনুরূপ আছড়ে পড়ে ভাঙা অস্থিতে জোড়া লাগিয়ে দিল। কেউ জানতেও পারল না কী ঘটে গেল। শিষ্যস্কন্ধে ভর দিয়ে গৃহে ফিরলেন। বললেন, ঢেউয়ের বাড়ি লেগে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি, প্রলেপ লাগাতে হবে।

সামান্য ব্যথা, প্রলেপ লাগাতেই সেরে গেল। কিন্তু সেদিন কে হঠাৎ এসে প্রভুর পা টিপতে বসল। হাঁটুর যেখানটায় ব্যথা পেয়েছিলেন সেখানটায় হাত বুলুতে লাগল। তারপরে খানিকক্ষণ তরঙ্গ বাজিয়ে নৃত্য করলে। প্রভুর ব্যথা সেরে গেছে তাতেই যেন তার আনন্দ। নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে এই দিব্যকান্তি পুরুষ?

প্রভু বললেন, 'ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব। অতর্কিতে সেদিন সমুদ্র আমাকে আঘাত করেছিল বলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করে আমার সেবা করতে এসেছিলেন। যারা ভক্ত দেবতারাও তাদের সেবা করেন।'

কখনো কখনো সমুদ্রে গিয়ে স্নান না করেও আসনে বসেই প্রভুর স্নান হয়ে যায়। ভক্তরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে প্রভুর সর্ব শরীর আর্দ্র, জটা থেকে টপ টপ করে অবিরল জল পড়ছে। এ কী অঘটন! প্রভু বললেন, 'সমুদ্রস্নান করে এলাম।'

আসন থেকে উঠলেন না, ভক্তরা অবাক হয়ে ভাবতে বসল, সমুদ্রে গেলেন কখন? প্রভু বললেন, 'আসনে বসেই সমুদ্রস্নান করলাম।'

পুরীতে তখন বানরনিধন চলেছে। বানরেরা শস্যফল নষ্ট করে, সুতরাং এদের মেরে ফেল—সরকার জারি করেছে ফতোয়া। শহরে শিকারিরা বন্দুক নিয়ে ঘুরছে, গুলি ছুঁড়ছে যত্রতত্র। একদিন তো প্রভুর চোখের সামনেই একটা বানর গুলি খেয়ে মারা পড়ল, রক্তে ভেসে গেল রাস্তা। প্রভু বালকের মত অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। পরক্ষণে বললেন দৃঢ়স্বরে, বিষ্ণুক্ষেত্র বানররক্তে কলুষিত হতে দেব না।

প্রভু তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। শিকারিরা লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে লাগল—গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের নজরে যেন না পড়ে। কিন্তু বানরের দল কী উপায়ে কে জানে বুঝতে পেরেছে প্রভু তাদের সহায়-সুহৃৎ। বন্দুক হাতে শিকারি দেখতে পেলেই বানরের দল ছুটে আসে প্রভুর কাছে, একেবারে প্রভুর পা ঘেঁষে ঘরে নিশ্চিন্তে আরাম। প্রভু বুঝতে পারলেন আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তারা ডাকছে প্রভুকে। কী করে তারা টের পেয়েছে প্রভুই একমাত্র পরিত্রাতা।

প্রভুর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে বুঝতে পেরে শিকারি সরে পড়ে।

কিন্তু একটা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বার করা না গেলে গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের স্বস্তি নেই।

মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রভু লিখিত আবেদন পাঠালেন।

সে আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

বানরেরা কী করে বুঝল তাদের পক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। তাই তারা দলে দলে প্রভুর অঙ্গনে এসে ভিড় জমিয়ে বসল। সে এক বিরাট সভা, সবচেয়ে বিস্ময়কর, কোনো কিচিরমিচির নেই, কোলাহল নেই, দস্যুতা চপলতা নেই, সব স্তব্ধ ব্যথিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, যেন বিপদের মুহূর্তে চাইছে উদ্ধারের উপায়। প্রভুই সমুদ্ধর্তা।

ছোটলাট উডবার্নের কাছে আবেদন পাঠানো হল। বানরবধ অবৈধ, অশাস্ত্রীয়। উডবার্ন বানরবধ বন্ধ করে দিল।

আনন্দের প্লাবন নামল পুরীতে। প্রভুকে ঘিরে বানরযূথের সে কী নৃত্যরঙ্গ, গতিকর্তা প্রভু সাক্ষী, তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছ।

চল্ মহাবীর ঠাকুরের পূজা দিই গে। (ক্রমশঃ)

বিচিত্রা

মেয়েদের নতুন কাজ

মহিলাদের জন্যে একটি কাজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে। এই পেশা হল গৃহধাত্রী। সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে অনেকদিন ধরেই এর প্রচলন ছিল; এবার পশ্চিম জার্মানীতে দেখা দিয়েছে। যেখানে মায়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ছেলেপুলে জন্মায় ও পরিবারের অন্যান্যদের কিছুদিন দেখাশোনা করার দরকার হয়, গৃহধাত্রীর প্রয়োজনীয়তা সেখানে দেখা দেয় এবং এসব কাজে সে সম্পূর্ণ পারদর্শিনী।

এসব মেয়ে গৃহধাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকাল ছ'মাস। পাঠ্যধারার মধ্যে আছে রন্ধন, সীবন, গৃহস্থালী, পথ্য তৈরারী, শুশ্রূষা তথা মনস্তত্ত্ব, শিশু-শিক্ষা, পুষ্টিবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও ব্যায়াম কিন্তু এতোগুলি পাঠক্রম তো ছ'মাসের মধ্যে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় সেজন্য সপ্তাহান্তিক আলোচনাচক্র ও সভার পরবর্তী ছ'মাস হাতেকলমে কাজ শেখানো হয়। এরপর একটি পরীক্ষা হয় ও পুরো একবছর হাতেকলমে কাজ করার পর গৃহধাত্রী তার সার্টিফিকেট পায়।

পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে পুরো সময়ের জন্যে ৩০০০ ও আংশিক সময়ের জন্যে ১২,০০০ গৃহধাত্রী আছে। গৃহধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সারাদেশে ২২টি স্কুল আছে। ভালো বেতন সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানীর মেয়েদের মধ্যে এই পেশা এখনও খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি; তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার সময় আরও হ্রাস করা যায়, বেতন বৃদ্ধি হয় ও এই পেশার সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিম জার্মানীতে গৃহধাত্রীদের নিয়োগ করেন বিভিন্ন দাতব্য কল্যাণ সংস্থা ও সমাজ মঙ্গল কর্তৃপক্ষ এবং তারাই এদের বেতন দেন, তবে যেসব পরিবারে এদের কাজের জন্য পাঠানো হয় তাদের আয় অনুসারে এদের ব্যয়ের অংশ বহন করতে হয়।

শহরে বা গ্রাম্য পরিবারে হোক কিম্বা শুধু শিশুদের দেখাশোনা করাই হোক গৃহধাত্রীদের প্রথম থেকেই তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। তবে এই সচেতনতা যেন সবসময় খুব

কঠোর না হয় সে দিকে সতর্ক থাকা উচিত। আরেকটা কথা, শুধু উপার্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আর্ত মানুষের সাহায্যের আদর্শ নিয়ে একাজে এগিয়ে এলে তবেই এই পেশায় সফল হওয়া যায়।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের অভিনব ব্যবস্থা

সেকেলে শহরের কথা ছেড়ে দিলেও, হালের সুপরিকল্পিত শহরগুলিতেও ভবিষ্যতে যানবাহন চলাচল দুরূহ হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। অপ্রশস্ত পথের দরুণ সময় ও জিনিষপত্রের অপচয় ছাড়াও লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর একমাত্র সুরাহা হতে পারে যদি ভবিষ্যতে ইলেকট্রোনিক্যালি বা বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় পথে যানবাহন চলাচল পরিচালিত করা যায়। পশ্চিমের বড় বড় শহরে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

একদিন ছিল যখন পুলিস তার খেয়ালখুসি মত রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করত, তারপরে তার স্থান দখল করল অটোমেশন বা আলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কিন্তু সে ব্যবস্থাও এখন প্রায় অচল হয়ে উঠছে কারণ পথে গাড়ি থাকুক বা নাই থাকুক আলোগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কাজ ক'রে যায় কিন্তু বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় যানবাহনের সংখ্যা বুঝে ট্রাফিক বা গাড়ির ভীড় নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভবিষ্যতে যখন বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হবে তখন একটি কমপিউটার যন্ত্র পথে বা পথের সংযোগস্থলে গাড়ির সংখ্যা হিসেব করে নিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। অর্থাৎ "ট্রাফিকের নাড়ি" বুঝে গাড়িগুলিকে থামিয়ে রাখা হবে, চলতে দেওয়া হবে অথবা ঘুরিয়ে অন্য পথ দিয়ে চালাতে বলা হবে। ভবিষ্যতে যখন পশ্চিমের বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থা হবে, তখন বরাবরের ব্যবস্থায় লাল, সবুজ আলো না জ্বেলে বিভিন্ন পথে ও মোড়ে গাড়ির ভীড় বুঝে আলোর সংকেত নিয়ন্ত্রণ করবে বিভিন্নমুখী যানবাহনের গতিবিধি।

কাজে অকাজে পেপার ক্লিপ

পেপার ক্লিপ বা স্প্রিং ক্লিপের কি গতি হয়, তার একটা হিসেব দিয়েছেন ওয়েলসের পরিসংখ্যানবিদরা। এই হিসেব তারা দিয়েছেন এক লক্ষ পেপার ক্লিপ সম্বন্ধে। তাদের হিসেবে এই লক্ষের মধ্যে বিশহাজার ব্যবহার হয় প্রকৃত কাজে, বাকি নানারকম অকাজে ব্যবহার হয়। এবার মজাওয়ারি ব্যবহার শুনুন: উনিশহাজার যায় বাবুদের তাসখেলার বাজিতে "পয়সা" হিসেবে; ষোলহাজার টাইপরাইটার পরিষ্কার করতে, পাঁচহাজার নখ সাফের কাজে। অন্যমনস্কভাবে কথাবার্তা বলার সময় তালগোল পাকিয়ে চোদ্দহাজার ফেলা যায়। মেয়দারেদের মোজা আটকাবার জন্যে ব্যবহার হয় সাতহাজারের বেশি আর পাঁচহাজার বেঁকিয়ে খড়কে-কাঠি তৈরী হয়। পাইপ সাফ করায় ব্যবহার হয় তিনহাজার দুশো তিরিশটি ক্লিপ ও স্ক্রুড্রাইভারের কাজে লাগে দু'হাজার চারশো একতিরিশটি ক্লিপ। প্রায় সাতহাজার মেঝেতে পড়ে গেলে খুঁটে দিয়ে ফেলা হয়। সুতরাং আসল কাজ, অর্থাৎ কাগজ আটকাবার জন্যে ব্যবহার হয় মাত্র বিশহাজার। এবার আপনারা অপব্যয়ের হিসেব করুন আর হিসেব করুন কি অপরিসীম ধৈর্যে ওয়েলসের পরিসংখ্যানবিদরা তার খতিয়ান তৈরী করেছেন।

কখনও শুনেছেন কি ?

পশ্চিম জার্মানীর স্থপতি বিশেষজ্ঞরা অফিস বাড়ীগুলো ওপরের দিক থেকে নীচের দিকে তৈরী করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস হামবুর্গের ১৩ তলা কিনসাল্ড হাউস। এটা আগামী বছরের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। ছাদের সাথে লিফ্‌ট আছে। এই লিফ্‌টের সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করা হচ্ছে। ওপর তলা থেকে কাজ শুরু হচ্ছে এবং যত নীচের দিকে কাজ অগ্রসর হবে তত শ্রমিকদের অবাধী তারা নীচের দিকে নামবে। ওপরের দিকে কাজ শেষ হবার সাথে সাথে ফিনিশ্‌ কার্পে, ইনকরপোরেশন ঘুঘো ও ফিন এয়ারলাইন্স প্রভৃতি এখানে স্থানান্তরিত হবে। সর্বোচ্চ তলায় একটা রেস্তোরাঁ থাকবে, সেখান থেকে হামবুর্গের আলস্টার লেকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। জার্মানীর অন্যান্য শহরে এ ধরনের আরও সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।

সংগীতের মোহ কোথায় নেই ?

সম্প্রতি স্টটগার্টে পশ্চিম জার্মান দন্তচিকিৎসক সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক দন্ত প্রদর্শনী হয়ে গেল। পৃথিবীর আটাশটি দেশ থেকে সাড়ে তিনহাজার দন্তচিকিৎসক এই সম্মেলনে এসেছিলেন। দাঁতের যত্ন, দাঁতের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু কথা বললেন সমবেত চিকিৎসকরা ও প্রদর্শনীতে দেখা গেল দন্তচিকিৎসায় ব্যবহৃত আধুনিক উন্নত সব যন্ত্রপাতি।

য়ুরোপে সম্পূর্ণ সুস্থ দাঁতের পাটি তাকেই প্রায় দেখা যায় না। দাঁতের চিকিৎসায় অন্ত শতকরা নব্বুই ভাগ লোককে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। আজকাল শিশু ও তরুণরাও দাঁতের রোগে খুব বেশি ভুগছে। দাঁতের যত্ন না নেবার ফলেই যে এই ভোগান্তি তা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন জার্মান দন্তচিকিৎসক সঙ্ঘের সভাপতি ডাক্তার এরিখ মুইলের। আজকাল দাঁতের যত্ন নিতে কত যান্ত্রিক উন্নতি হয়েছে, কত ওষুধ পাওয়া যায়, কত ভালো ভালো খাবার রয়েছে। তবুও যে মানুষ কতো দাঁতের রোগে ভোগে তার প্রধান কারণ দাঁতের যত্ন নিতে মানুষের অপরিসীম আলস্য। ডাক্তার মুইলেরের মতে ছেলেমেয়েদের মেঠাই মোণ্ডা খাওয়ানো একেবারে বন্ধ করা উচিত ও তার পরিবর্তে তারা যাতে বেশি করে ফল ও গাজর খায় তা দেখা দরকার। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে, স্কুলের কাছাকাছি সব মিষ্টির দোকান তুলে দেওয়া দরকার।

ভবিষ্যতে বসে বসে দাঁত না তুলে রুগীকে শুইয়ে দাঁত তোলা হবে। দাঁতের চিকিৎসায় যে ড্রিল ব্যবহার হয় তার অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে এখন। যে ড্রিল আগে মিনিটে ৮০০০ বার ঘুরত এখন তা মিনিটে ঘোরে ৪০০০০ বার। একেবারে হালে একরকম ড্রিল তৈরী হয়েছে যেটি মিনিটে সাড়ে তিনলাখ থেকে চারলাখ পাক খায়। এতে দাঁতে ফুটো করার সময় যন্ত্রণা খুবই কম হয়।

দাঁতের ড্রিলিং করার সময় রুগীর যন্ত্রণা লাঘবের জন্য দন্তচিকিৎসকরা আজকাল সঙ্গীতের আশ্রয় নিচ্ছেন। এই পদ্ধতি প্রথমে আমেরিকায় মুহূর্তে চালু হয়েছিল, এখন য়ুরোপে খুব চলছে। এতে রুগী সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হয় ও সেই ফাঁকে চিকিৎসক তার কাজ সারেন। ভবিষ্যতে হয়ত দাঁতে ড্রিলিংয়ের পরিবর্তে "লাসের রশ্মি" ব্যবহার করা হবে, কারণ পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে "লাসের রশ্মি" দিয়ে দাঁতের পোকায় নিখুঁত ভাবে ফুটো করা সম্ভব।

চিত্রনাট্য

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোন্ একটা ইংরেজি বইয়ে যেন পড়েছিলাম—

"In the film making, the beginning of all beginings and the end of all ends lie in the screenplay."

কথাটা খুব খাঁটি কথা। সিনেমার ছবি তৈরি করতে হলে সবার আগে চাই চিত্রনাট্য।

এই চিত্রনাট্য বস্তুটি যে কি, সিনেমাশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তা জানেন। জানেন চিত্রনাট্য বলতে বুঝায় একরোকা হাতে-লেখা কাগজ, যার ওপর লেখা থাকে আগাগোড়া একখানি ছবির কোন্ সটের পর কোন্ সট্ নিতে হবে, কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলাতে হবে তার একটা পরের পর নম্বর-দেওয়া হিসেব।

কম পক্ষে বারো হাজার ফুটের ছবি—একটা হিসেব না থাকলে চলে না। তার ওপর অনেক সন্ন্যাসী যেখানে—খাজন নষ্ট হবার আয়োজন সেখানে যথেষ্ট। বরবাদ হবে অনেক। কিছু বরবাদ করবে অভিনেতা-অভিনেত্রী, কিছু করবে ক্যামেরা, আর সবচেয়ে বেশি বরবাদ করবেন ডিরেক্টার নিজে। কাজেই প্রায় লাখ ফুটের কাছাকাছি বরবাদের বস্তা থেকে বারো হাজারকে টেনে বের করবার দায়িত্ব থাকবে যে বেচারার স্কন্ধে, তার নাম এডিটার (সম্পাদক)। সেই এডিটারের দুই চোখে পর্যেক্ষণ দেখার দুর্ভাবনাকে দূর করতে হলে একটা মার্কা-মারা কর্দ চাই বই-কি!

এ ঠিক যেন ধোপার খাতা।

সিল্কির ছেঁড়া শাড়ী—৪ খানা

খোকনের হাফ্ প্যাণ্ট্—০ খানা

বাবুর গেঞ্জি— ১ খানা

বাবুর ধুতি— ২ খানা

ইত্যাদি—ইত্যাদি—

এমনি সব 'ও-কে' আর 'এন্-জি'তে মেশানো শট্গুলি কেটে কেটে ছুড়ে ছুড়ে যে বস্তুটি খাড়া হবে, তার নাম হবে—সিনেমার ছবি।

আর সেই তারই পেছনে থাকবে বহু অর্থ, বহু পরিশ্রম, বহু মনস্তাপ আর একটি দেশের সিনেমা-শিল্পের ভবিষ্যৎ।

সুতরাং সিনেমা-ছবির চিত্রনাট্যকে শুধু একটা খোপার খাতার মত নম্বর-দেওয়া এলোপাথাড়ি শটের বোঝা হলেই চলবে কি?

এ-কথা বলছি অনেক দুঃখে।

রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের একটি গল্প বা একটি নাটক যেমন নিজস্ব সাহিত্যস্রষ্টার বহু সাধনার ধন, একটি চিত্রনাট্যও তেমনি চিত্রনাট্যকারের ধ্যান-ধারণা কল্পনা ভাবনার সার্থক রূপায়ণ।

কিংবা তার চেয়েও বেশি।

বেশি বলছি এই জন্য যে, চিত্রনাট্যকারকে সাধারণতঃ কাজ করতে হয় অপরের লেখা একটি গল্প বা নাটকের ওপর। গল্পলেখক বা নাট্যকার যে-ভাবে ভাবান্বিত হয়ে জীবনের যে অংশের ওপর আলো ফেলে কথার পর কথার মালা গেঁথে অপরের হৃদয়ে রস সঞ্চার করেছেন, চিত্রনাট্যকারকেও সেই একই কাজ করতে হয়, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে গল্পাংশটিকে রূপান্তরিত করে।

দু'জনেরই লক্ষ্য এক।

লক্ষ্য মানব হৃদয়।

একজনের অবলম্বন কথা। আর একজনের অবলম্বন ছবি। একজনের বাণী, আর একজনের রূপ। বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব আবিষ্কার মানুষের হাতে প্রথমে তুলে দিয়েছিল শুধু এই চলমান বিশ্বের রূপের প্রবাহকে ধরে রাখবার যন্ত্র, তারপর দিলে বাণীকে ধরে রাখবার কৌশল শিখিয়ে।

জগতের রূপ ও বাণীকে ধরে রাখবার যন্ত্র এবং সে-যন্ত্র ব্যবহারের কৌশল অবশ্য বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার—তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু এই দুটি যান্ত্রিক কৌশল আয়ত্ত করে চিত্রনাট্যকার যদি কোনও রসোত্তীর্ণ গল্পের ওপর ক্যামেরা ঘুরিয়ে, রূপে ও বাণীতে তাকে রূপান্তরিত করেই তাঁর কাজ শেষ করেন, তাহলেও তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করলেন বলে আমার মনে হয় না। চিত্রনাট্যকারের (চিত্রনাট্যকার ও চিত্রপরিচালক একই ব্যক্তি বলে আমি ধরে নিয়েছি) কাজ শুধু অনুসরণ বা অনুকরণ নয়। তাঁর কাজ আরও কঠিন। আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে, রূপে ও বাণীতে অপরূপ এক সৃষ্টিই হবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কারণ মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ দূরের কথা, একটি হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট যদি না হয় তো কোনও রসবস্তুই অপরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না।

জগতের সর্বপ্রকার বিচিত্র সুন্দর রূপ আর শব্দের অপরূপ লীলা-তরঙ্গ ধরবার যে দুটি যন্ত্র দিয়ে আমরা সিনেমার ছবি তৈরি করি, সে দুটি যন্ত্রের অপরিসীম শক্তি সম্বন্ধে আজকাল আমরা সকলেই সচেতন। এই দুটি যন্ত্র উপযুক্ত যন্ত্রবিদের হাতে প্রতিভাশালী পরিচালকের দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষের চোখে এক অত্যাশ্চর্য মায়া সৃষ্টি করতে পারে, অরূপকে দিতে পারে রূপ, ছন্দে শব্দে বচনকে করে তুলতে পারে অনির্বচনীয়। মানুষের রূপতৃষ্ণাতুর দৃষ্টির ব্যাকুলতাকে শান্ত করে দিয়ে, হারিয়ে-যাওয়া পরম মুহূর্তগুলিকে ফিরিয়ে এনে মানুষকে নবচেতনায় উজ্জীবিত করে তোলবার ক্ষমতা তাদের আছে। তা যদি না থাকতো, কলানিপুণ কোনও পরিচালক অপরের কাছ থেকে ধার করা সৃষ্টিকে চিত্ররূপে রূপান্তরিত করে কখনই তৃপ্তি পেতো না। নিজেই গল্প লিখতে বসতো।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটা মনে পড়ছে সেই কথাটা বলি।

আমাদের দেশের সিনেমা জগতে বর্তমান কালে একজন কলারসিক গুণী চিত্রপরিচালকের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তিনি শ্রীমান সত্যজিৎ রায়।

অন্তাবধি মাত্র একবার ছাড়া কোনোদিন তিনি নিজে গল্প রচনা করবার চেষ্টা করেননি। তবে কি আমি বলবো—অপরের সৃষ্টির ওপর তিনি শুধু দাগা বুলিয়েছেন? কথাশিল্পীর যে-সৃষ্টি ছিল শুধু কথার মধ্যে আবদ্ধ, তাকেই তিনি সেই কথামালার সংসার থেকে মুক্ত করে রূপের জগতে ছেড়ে দিয়েছেন?

কখনই না।

তা যদি করতেন, তাহ'লে তাঁর শিল্পীমন কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারতো না। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি আপনার আমার এবং আর সকলের মনকে স্পর্শও করতে পারতো না। মানুষের যেখানে আনন্দ নেই সেখানে তার মন বসে না। এই শিল্প রচনায় তিনি যদি আনন্দ না পেতেন, কবে পালিয়ে যেতেন এখান থেকে। অনেকে হয়ত বলবে—খ্যাতি আর অর্থ তাঁকে এখানে ধরে রেখেছে। কিন্তু কোনও সাধারণ বণিকভাবাপন্ন মানুষের বেলা হয়ত বা সেকথা সত্য হতে পারে, কিন্তু প্রাণে মনে যিনি শিল্পী, তাঁর কাছে এই খ্যাতি ও অর্থের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। মোহমুক্ত নিরাসক্ত মনই শিল্পীমন। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে মনের এতটুকু আনন্দই শিল্পীকে যেমন তার চরমতম দারিদ্র্যের মধ্যেও ধরে রাখে, তেমনি আবার জগৎজোড়া খ্যাতি এবং অপরিমিত ঐশ্বর্যও তাকে ধরে রাখতে পারে না যদি তার শিল্পসৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

এখন কথা হচ্ছে—অপরের সৃষ্টির মধ্যে চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ এমন পরিপূর্ণ আনন্দ কেমন করে পান।

এই যে বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টি এই বিশ্বচরাচর, এ তো আমার সৃষ্টি নয়। আমারও নয়, আপনারও নয়। তবু আমরা এই সৃষ্টি থেকে আনন্দ, আহরণ করি। আমরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আমাদের শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ। নিজের সন্তান, নিজের ভাই বন্ধু পরিবারকে ভালবাসার আনন্দ। এই আনন্দটুকু আছে বলেই আমরা এত দুঃখের মধ্যেও জীবনকে বহন করে চলেছি। শিল্পীও সেই আনন্দের কাঙাল। কিন্তু শিল্পীর আনন্দ আর একটু উঁচু পর্দায় বাঁধা। এমন একটা মন নিয়ে সে জন্মায় আপনারা যাকে বলেন সৃষ্টিছাড়া মন। এ পৃথিবীর সব-কিছু তার ভাল লাগে, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। পায়ের নীচের তৃণগুল্ম, ধরার ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের চন্দ্র সূর্য তারা, নিখিল চরাচরের অন্তর্লীন জগৎরহস্য আর এই জগতের মানুষ, আর মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা—এই সকলের মধ্যে নিজের অন্তরাত্মাকে—নিজের শিল্পীসত্তাকে অনুভব করতে চায় সে। তার চোখের দেখায়, মনের ভাবনায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান্ টানে মানুষের মধ্যে সে নিজেকে পুরোপুরি আদায় করে। এই যে মানুষের বহুবিচিত্র ভাবে ভাবনায় নিজের আত্মাকে মিশিয়ে নিজেকে উপলব্ধি, একে আত্মোপলব্ধির আনন্দ ছাড়া আর কী বলতে পারি? নিজের ব্যবহারিক জীবনে, নিজের সহজ প্রত্যক্ষ সংসারে যে উপলব্ধি অনেক বাধায় আচ্ছন্ন, অনেক সংশয়ে ঢাকা, সিদ্ধকাম কথাশিল্পীর সৃষ্টিতে তাই বাধামুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ। এইখানে সে তার অন্তরের প্রীতিকে, মনের আনন্দকে, সুরচিত নৈপুণ্যে এমনভাবে প্রকাশ করে যে অতি সহজেই তা জনগণের হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে ওঠে। এমনি করে শিল্পী তার জীবনবোধের সঙ্গে অপরের সৃষ্টিকে মিশিয়ে তার কর্ম রচনায় ভাবরচনায় নিজের শিল্পীসত্তাকেই প্রকাশ করে থাকে।

এই প্রকাশেই তার একমাত্র আনন্দ।

সে আনন্দ বাহ-করা আনন্দ নয়। সেও এক শিল্পীহৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত সৃষ্টির আনন্দ।

এই জন্যই বলছিলাম, সিনেমার চিত্রনাট্য যোগার খাতা নয়, সেও একটি সৃষ্টি।

চিত্রনাট্যের ভাষা ছবির ভাষা। ছবির ভাষা আমরা তখনই বুঝতে পারি সার্থক চিত্রনাট্যকার যখন আমাদের ছবির সাহায্যে গল্প শোনায়। সে ছবি মনোহর রূপে আমাদের চোখে শুধু ধরাই দেয় না, সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে।

আমাদের খোলা চোখে আমরা যে জগৎকে দেখি, সেখানে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু চিত্রনাট্যকার যে জগৎ আমাদের দেখায়, সে জগৎ আমাদের মনের জগৎ যে-মানুষকে দেখায় সে-মানুষ আমাদের মনের মানুষ।

কিন্তু সব সময় তা হয় না—এইটিই দুঃখ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ছবিতে মানুষ যা চায় তা পায় না। যা পায় তা চায় না।

অথচ ছবি দেখার একটা নেশা আছে। সেই নেশার বশবর্তী হয়ে ছবি মানুষ দেখতে যায়। ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারে না। একবার দেখলেই দেখার সাধ মিটে যায়। আজকের দেখা ছবি কালকে বেমালুম ভুলে যেতে কষ্ট হয় না।

ছবিতে যাঁরা টাকা খাটান, ছবি দেখানোর আগে তাঁরা কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসেন, ভয়ে বুক দুর দুর করে। ছবি যদি চলে তো চলে যেন দৈব অনুগ্রহে।

এমনি ধারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছবি তৈরি হয় আমাদের দেশে।

কিন্তু কেন?

ছবির জগতে যারা বিচরণ করছেন, অর্থাৎ সিনেমার রাজ্যে স্বার্থ যাঁদের কায়েমী হয়ে গেছে, তাঁদের অধিকাংশই আনাড়ি। তাঁরা আনাড়ি বলেই আমাদের সিনেমা-শিল্পের নাড়ি এত ক্ষীণ।

দৈবাৎ কোনও ছবি যদি বেশিদিন চলে যায় তো সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির কদর যায় বেড়ে—তা তারা যত বড় অপদার্থই হোক্।

কারও কোনও আত্মবিশ্বাস নেই। সবই যেন দৈব অনুগ্রহ। সবই যেন জুয়াখেলা। দান যদি পড়লো তো—চলো যার দান পড়লো তার কাছে। তার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

ছবি তৈরি করবার আগের অবস্থা—গল্প খুঁজে বেড়ানো। কোথাও মনের মত গল্প আর পাওয়া যায় না!

—লিখুন না মশাই একটা গল্প! আঃ, কী গল্পই-না লিখেছিলেন। সে রকম গল্প আর লিখতে পারছেন না।

তিনি যেন আমার সব গল্পই পড়ছেন বসে বসে। আর আমিও যেন সিনেমার গল্প ছাড়া আর কিছুই লিখি না।

সিনেমার জন্য চাই ফরমায়েসী গল্প। গল্প হবে খুব ঘটনাবহুল। খুব উত্তেজনাপূর্ণ। প্রডিউসারের পয়সা যদি থাকে তো হিরো হবে উত্তমকুমার। হিরোইন—চোখ্ বুজে চুপ করে থাকেন।

সিনেমার তাঁরাই উত্তমপুরুষ। মাথায় হলো ডিরেক্টার। আর সবার অধম হলো গল্প।

ধরুন গল্প পাওয়া গেল।

আজকাল সিনেমা ছাড়া সাহিত্য হয় না। তাতেই সব গল্পই সিনেমার গল্প।

তারপর সুরু হয়, পিঠি চটকানো।

পিণ্ডদানের অধিকারী যদি হয়, চটকালে দোষ নেই। কারণ সিনেমা না-জানা লেখকের গল্প হলে অদল-বদল দরকার হতে পারে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সবই স্বতন্ত্র।

প্রথমতঃ ভয়—ছবি যদি না চলে! (তিনি যেন জানেন কি করলে চলবে)।

দ্বিতীয়ত—সৃষ্টিসুখের উল্লাস।

ডিরেক্টার প্রাণমন দিয়ে যা সৃষ্টি করছেন, সে সৃষ্টিতে হাত দিতে তিনিও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না—যিনি ছবিরজন্য টাকা জোগাচ্ছেন। ছবির জন্য যাঁর টাকা নেওয়া হচ্ছে, তাঁর আইডিয়াই বা নেওয়া হবে না কেন?

কারও ধারণা—ছবি 'সেক্সি' না হলে চলে না।

কারও ধারণা—দর্শকদের কাঁদাতে হবে।

কারও ধারণা—হাসাতে হবে।

কেউ-বা বলেন—সাস্‌পেন্স চাই।

এমনি সব বহু শিক্ষিতের বাণীতে ছবির গল্পের অঙ্গ কতবিকৃত হতে থাকে।

সবার শেষে এলেন চিত্রনাট্যকার।

তিনি শুধু দৃশ্যগুলি ভাগ করে চরিত্রের মুখে কথা বসিয়ে দেবেন।

বাকিটা করবেন পরিচালক।

সেই সবই হবে। সবাই সব করবে। কেউ চাইবে না—ছবিটি খারাপ হোক্। পরিচালক প্রাণপণ চেষ্টা করবেন—ছবিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার। ক্যামেরাম্যান চেষ্টা করবেন। এডিটার চেষ্টা করবেন। সঙ্গীত পরিচালক চেষ্টা করবেন।

কিন্তু তবু এই এতগুলি মানুষের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ছবিটি পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করবে না।

পরিচালক দোষ দেবেন চিত্রনাট্যকারের।

চিত্রনাট্যকার দোষ দেবেন গল্পের।

একক দায়িত্ব যেন কারও নেই।

কিন্তু এ রকমটি হবে কেন? হয় সে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। আর নয় তো সৃষ্টি যিনি করবেন তাঁর শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার অভাব।

অবশ্য সকলের সব ছবিই যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করবে এমন কোনও কথা নেই। মানুষের হৃদয়মন নিয়ে যেখানে কারবার, সাহিত্যের সঙ্গে যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, সেখানে এ রকম উল্টো-পাল্টা ঘটনা ঘটবেই।

যাতে না ঘটে সেদিক দিয়ে সাবধান হতে হবে।

ক্যামেরা যেখানে সর্বদর্শী, সেখানে চোখ ভোলানো হয়ত সহজ, কিন্তু মানুষের মন ভোলান শক্ত।

চোখের আর মনের একটা ওপর-তলা আছে।

মানুষের রুচিবোধ আছে।

যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম, 'Calcutta' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা। ইংরাজি পত্রিকা। যেমন সুন্দর কাগজ, তেমনি সুন্দর ছাপা। পাতায় পাতায় ছবি। খুব চটকদার চোখ-ভোলানো পত্রিকা। একদিন খুলে দেখি—প্রথম পাতায় ছবিখানি একজন তন্বী তরুণী সুন্দরী যুবতীর ছবি। গঙ্গায় স্নান করে এলো চুলে মেয়েটি কাপড় ছাড়ছে। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কোন্ পূর্ত ক্যামেরাম্যান ছবিখানি তুলে নিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের ঘাট। বোধকরি কোনও পালা-পার্বণ ছিল সেদিন। কাগজখানি আমেরিকান কাগজ। বোধকরি সৈন্যদের আনন্দদান করবার জন্যই পত্রিকাটি জন্মলাভ করেছিল। সৈন্যরা আনন্দও হয়ত যথেষ্ট পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়েছি [illegible] তাদের জন্য রুচি আর চরিত্রের পরিচয়, আর পেয়েছি লজ্জা।

আমাদের সিনেমার ছবিকেও 'সেক্সি' করবার জন্যে এই রকম চেষ্টা আমরা মাঝে মাঝে করে থাকি। এতে হয়ত পয়সা আমরা পাই কিন্তু শ্রদ্ধা পাই না।

এটা গেল চোখের ব্যাপার।

এইবার মনের ব্যাপার বলি। কোথায় আমাদের মন বসে? না, যেখানে আমরা আনন্দ পাই। রাস্তায় যেতে যেতে যদি দেখি, রকে বসে বসে ষণ্ডাটে ছেলেরা খুব হা হা করে হাসছে আর স্কুল-কলেজে যাওয়া মেয়েদের ইঙ্গিত করে অশ্লীল রসিকতায় মেতে উঠেছে, তাহ'লে আমরা কিসের পরিচয় পাই? সেখানে তারা আনন্দ পাচ্ছে নিশ্চয়ই। সুতরাং সেইখানে তাদের মন বসেছে বুঝতে হবে।

ছবির বিষয়বস্তুকে এরই কাছাকাছি জায়গায় নামিয়ে এনে কখনও বিকৃত ভঙ্গীতে মেয়েদের বাঁচিয়ে গাইয়ে নাচিয়ে নায়কে নায়িকায় সমুদ্রে স্নান করিয়ে দু'একটি সিনেমার ছবি যদি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, আর অন্যান্য প্রডিউসারেরা যদি সেই রকম ছবিকেই অর্থ উপার্জনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে ধরে নেন, তাহলে সিনেমাকে আর শিল্পের গৌরব দেওয়া চলে না। কোনও মহৎ সৃষ্টি দূরের কথা, কোনও সৃষ্টিই সেখানে সম্ভব নয়।

মুখে আমরা বলি, বোম্বাই যা করছে আমরা তা করব না। অথচ যখন দেখি, কোনও নিম্নশ্রেণীর গল্প, কোনও 'ক্রাইম্ থ্রিলার' কিংবা কোনও বিদেশী গল্পের অনুকরণ—ব্যবসায়ের দিক থেকে সাফল্য অর্জন করলো, তৎক্ষণাৎ আমাদের দেশের সিনেমাজগৎ সেই রকম ধরণের ছবি করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। যতদিন না দু'একজন প্রডিউসার এইরকম চোখ ধাঁধা অবস্থায় 'রেস' খেলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ততদিন এই রকমই চলতে থাকে।

অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত সিনেমা-জগতের অবস্থাই এইরকম। কোথাও কম, কোথাও বেশি। তার কারণ টাকাটাই সেখানে মুখ্য, শিল্পসৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। মন ভোলাতে যখন পারছো না, তখন টাকা খরচ করে চোখ ভোলাও। যা কোনদিন দ্যাখোনি, তাই দ্যাখো। গল্পের প্রয়োজনে নয়, ছবির বহিরঙ্গের প্রয়োজনে ছোটো দার্জিলিং, ছোটো সিমলায়। মনের গহনে প্রবেশের ক্ষমতা সেখানে নেই, দেহটাকে সেখানে উলঙ্গ করে দেওয়া—ছাড়া উপায় কি? সিনেমার বাজার সেখানে বহুবিস্তৃত—অরুচিতে পরিণামটা তারা ঠিক বুঝতে পারে না। চলার অযোগ্য যে-ছবি সে-ছবিও চলে, আবার যে-ছবি ভালো শিল্পে ছিঁড়ে যায় সেখানে তো সকলের পোয়া-বারো। মন

দেউলিয়া, দেহটাই যেখানে সেখানে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তাই সবার আগে আর্টিষ্টদের অন্নসংস্থান পর্যন্ত। চাই টাকা আর চাই সুন্দরী নারী।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যটাই যেন সবচেয়ে বেশি। বাজারটাও এখানে বড় নয়, টাকার অঙ্কটাও ছোট, সুন্দরী নারী তো দুষ্প্রাপ্য। অথচ রসের সুধা মেটাবার সাধ এই বাঙালী জাতটারই যেন সবচেয়ে বেশি।

সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই।

তার প্রমাণ আমরা বার-বার পাচ্ছি।

সিনেমার এই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে পৃথিবীর নানান দেশে। বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আজ এই নিয়ে চিন্তা করছেন। নানা ধরণের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক ছবি তৈরি হয়েছে। এই সব ছবি নিয়ে ফেষ্টিভ্যাল্ হচ্ছে। আমাদের এই ক্ষুদ্রতম বাংলাদেশ তাতে সাড়া দিয়েছে সবার আগে। শ্রীমান সত্যজিৎ বাংলার মুখ রক্ষা করেছেন। সবচেয়ে বড় সম্মানের গৌরব তিনি বারম্বার অর্জন করে চলেছেন।

কুমার সম্ভব কাব্যে পড়েছি—

উমা যখন মহাদেবকে পাবার জন্য তপস্যা করছিলেন, তখন মহাদেব নিজেই একদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে উমার কাছে এসে বললেন, 'কার জন্য তপস্যা করছো তুমি? মহাদেব তো শুধু নামেই মহাদেব। ওর না আছে রূপ, না আছে গুণ। বলবার বিভব ঐশ্বর্য তো নেই-ই। মহাদেবকে চেয়ো না। ঠকবে।'

উমা তখন জবাব দিয়েছিলেন, 'মনস্তু ভাবৈক রসং মনস্বিনঃ।'

মহাদেবের প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করছে। তাইতেই আমার মনের আনন্দ। সুতরাং আনন্দের জন্য আমার আর কোনও উপকরণের প্রয়োজন নেই।

তাই বলছিলাম—কেউ যদি পারে তো শঙ্কর-পার্বতীর দেশ—এই বাংলাই পারবে সে গৌরব রক্ষা করতে। ভাবরসে সমৃদ্ধ চিত্রনাট্য, চরিত্রমাধুর্যে সুন্দর অসুন্দরের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিতে পারবে একমাত্র এই বাংলা দেশ।

চোখ-ভোলানো সৌন্দর্যের দাসত্ব সে মানে না। মানুষের কল্যাণবুদ্ধি এসে যোগ দেয় সেখানে। মনের অধিকার তার সীমা লঙ্ঘন করে। নয়নমনলোভা তরুণী বারবনিতা সেখানে লজ্জায় মুখ লুকোয়। কল্যাণী সতী এসে তার স্থান অধিকার করে।

পণ্ডিতম্মন্য চিত্রনাট্যকার সবকিছু বুঝিয়ে বলতে চায়। কিন্তু যে-চিত্রনাট্যকার পণ্ডিত নয় শুধু শিল্পী, বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা সে খুঁজে পায় না। বুঝিয়ে সে বলতে পারে না তাই মজিয়ে দেয়।

আপামর সাধারণের মনকে মজিয়ে দেবার মন্ত্র বাঙালী ভুলে গেছে শুনলে মনস্তাপের আর অবধি থাকে না।

ছন্দ-পতন

শান্তি দাশগুপ্তা

পার্থ যখন রাণীগঞ্জ এসে পৌঁছল, তখন ইলপেক্‌সন বাংলোয় তালা লাগিয়ে কেয়ার-টেকার যাত্রা শুনতে চলে গেছে ধরিয়ায়। অফিস থেকে সোজা এখানে এসেছে পার্থ, ধনির অডিটের জন্য। দলবল আসানসোল থেকে আসবে।

স্থানীয় লোকের কাছে নির্দেশ নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চেপে পার্থ তখন সার্কেল অফিসারের কোয়ার্টারের দিকে রওনা হল, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তাকেও পাওয়া যেতনা, একটা খুনের তদন্তে তিনি বেরিয়েছেন, রাতের মধ্যে ফেরার সম্ভাবনা নেই।

খবরটা পরিবেশন করলেন এক ভদ্রলোক, তিনিও একটা প্রয়োজনে সার্কেল অফিসারের কাছে এসেছিলেন। পার্থর বিমূঢ়, অসহায় ভাবটা লক্ষ্য করলেন তিনি, প্রশ্ন করলেন, স্থানীয় লোক তো মনে হচ্ছেনা। প্রয়োজনটা আমাকে জানাতে পারেন। হয়তো কোন কাজে লেগেও যেতে পারি, তাছাড়া সার্কেল অফিসার আমার বন্ধু। তার অবর্তমানে আমাকে ছাড়া বলবেনইবা কাকে?

ভদ্রলোকের আচরণটি সহৃদয়।

পার্থ বলল, "তেমন কিছু নয়, একটু আগেভাগে এসে বিপদ বাধিয়েছি। অডিটের জন্য এসেছিলুম। রাতটা কাটাবার মত একটা আস্তানা যদি…।" ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এ আবার একটা সমস্যা নাকি? আপনি অডিটর, আপনাকে খাতির করে আশ্রয় দেবে সবাই।"

"সবাইর দরকার নেই, আপাততঃ একটি আশ্রয় জুটলে বেঁচে যাই।"

"আরে মশাই, আশ্রয় আপনি চাইবেন না। আপনাকেই আশ্রয় চাইবে। চলুন চলুন, আমার বাড়ীতে অনেকদিন মেহমানের আবির্ভাব হয়নি……"

"না, না সেকি? আপনার বাড়ীতে……"

"একটা রাত তো! আমার গরীবখানার যত অসুবিধাই হোক, একটা বিছানা, একটা নিরাপদ আস্তানা পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আমাদের খনিতেই যে অডিট হবে। চলুন, কোন কথাই আমি শুনবনা।"

পার্থ ইতস্তত করে বলে, "আমি অপরিচিত……"

"দূর মশাই, পুরুষ মানুষ নাকি আপনি? দিন তো আপনার ব্যাগটা আমার হাতে।" জোর করে পার্থর ব্যাগটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "বার্থ আছে ভাই, আপনাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আঠারো আনা স্বার্থ আছে, অডিটে কি সাপ ব্যাং বেরোবে কে জানে। আগেই খাতির করে রাখছি খোদ অডিটরের সঙ্গে।"

ভদ্রলোক একরকম জোর করেই পার্থকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন, বিরাট ফ্যামিলাক-খানা নিজেই ড্রাইভ করে। দোতলা বাড়ী, লাল কাঁকর বিছানো রাস্তার দু'পাশে মরসুমী ফুলের ঝাড়। চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, কসমস। চন্দ্রমল্লিকার বিরাট আকার সচরাচর এমন চোখে পড়েনা।

ঢুকতে ঢুকতে ভদ্রলোক বললেন, "দেখেছেন এমন মল্লিকা?"

"আপনার মালী খুব দক্ষ শিল্পী।"

"মালী নয় মশাই, মালিনী, আরে মেয়েদের ছোঁয়া না পেলে কোন কিছুই সংসারে খোলেনা। আমার মল্লিকা বারমাস ফোটে। ভীষণ ভালবাসেন আমায় মালিনী।"

হেসে ফেলল পার্থ। ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি স্ত্রীর প্রসংগ সুরু করবেন, তা সে ভাবেনি।

মৃদু হেসে সে বলল, "মালকের মালাকর বেশ রসিক সুজন বুঝতে পারছি।"

"দূর দূর। লোহা, লক্কর ইঁট পাথর নিয়ে সংসারের একপাশে পড়ে আছি, রসকষ কিছু নেই।"

লাল রাস্তা শেষ হল। রাস্তা থেকে সোজা উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। দোতলার জানালায় হালকা নীল পর্দা হাওয়ায় দুলছে, কম্পাউণ্ডের প্রাচীর ঘেঁষে ঝাউগাছ। তারই ছায়ায় স্নিগ্ধ শান্ত একটা পরিবেশ। কম্পাউণ্ডে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটির স্নিগ্ধতা মনকে সরস করে তোলে।

দোতলায় সিঁড়িতে ওঠবার মুখে একখানা ঘরে পার্থকে নিয়ে ঢুকলেন ভদ্রলোক। ডিসটেম্পার করা আধুনিক রুচিতে সজ্জিত ঘর। দেওয়ালে অবশ্য ঠাকুরের ঝাঁকা এক রাজপুতানী, আর বন্ধলালের নাতজামাই। কোথাও কোন বাহুল্য নেই, আতিশয্য নেই।

"এই ঘরে একটা রাত কাটাতে খুব অসুবিধা হবে আপনার?"

পার্থ হেসে বলল, "আপনার গরীবখানায় আমার কোনমতে রাতটা কেটে যাবে, কিন্তু আপনাদের যে অসুবিধা হবে।"

"তা একটু হবে, কিন্তু একে অতিথি, তায় অডিটর, অসুবিধাটুকু মেনে নিতেই হবে। আচ্ছা, বিশ্রাম করুন, এক্ষুনি চা এসে যাবে।"

ব্যাকুলভাবে পার্থ বলল, "চায়ের দরকার নেই। অযথা ব্যস্ত হবেননা।"

"দরকার যে আছে, সেটা চা না আসা পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। আর ব্যস্ততার কথা বলছেন। আমার স্ত্রীর মতে আমার মত ব্যস্তবাগীশ মানুষ দুকায়তে দুটি নেই। সুতরাং ওসব ভেবে আপনি আর যেন ব্যস্ত হবেন না।"

পার্থকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের বেগে ভদ্রলোক দোতলায় উঠে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক যাবেই আবার তিনি নেমে এলেন। ম্লানমুখে বললেন, "আপনার বরাতটা খারাপ মশাই, বাড়ীর কর্ত্রীঠাকরুণ কি চাকরদের ছুটি দিয়েছেন কোথায় যাত্রা শুনতে যাওয়ার জন্য। আমায় আবার এক্ষুনি বাইরে ছুটতে হবে, মুরগী দুটো ছিল, কিন্তু কাটবে কে? শ্রীমতীজী কায়ার হয়ে গেছেন।"

পার্থ অপ্রস্তুতভাবে বলল, "এখানকার যাত্রাটাই আমার পক্ষে অযাত্রা হয়ে দাঁড়াল দেখছি। ভদ্রমহিলা তো রাগ করবেনই। বাড়ীতে কাজ করবার লোক নেই, আপনি একটি অতিথি আনলেন। চলুন, আমিও উঠি আপনার সঙ্গে।" ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।

ভদ্রলোক অবাক বিস্ময়ে তাকালেন, "আপনি উঠবেন? তাহলে আমার স্ত্রীরত্নটি আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে? তিনি রেগে আছেন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি বলে, আপনি সুস্থ হয়ে বসুন। চা এসে যাবে এক্ষুনি।"

বেরিয়ে গেলেন তিনি। তার প্রবেশ এবং প্রস্থান দুইই আকস্মিক। পার্থ অগত্যা আবার বসে পড়ল।

একটা বই তুলে নিল হাতে অলসভাবে। অলসভাবেই পাতা উল্টে আস্তে আস্তে ডুবে গেল বইয়ের মধ্যে; Lust for life অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাভঙ্গি। ভ্যান গগের লেখা আত্মজীবনী।

হঠাৎ অতল নীরবতার কোনখানে একটু চিড় খেয়ে গেল। একটা ভারী কিছু পতনের শব্দ এবং স্ত্রীকণ্ঠের অস্ফুট আর্ত্তনাদ পার্থর অখণ্ড মনোযোগ ব্যাহত করল, দোতলার থেকেই শব্দটা এসেছে।

বাড়ীতে কেউ নেই, নিশ্চয় একটা বিপদ আপদ কিছু ঘটেছে, কারণ আর্ত্তনাদটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক। উচিত অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামাবার আগেই কি এক অমোঘ আকর্ষণে পার্থ দোতলায় উঠে গেল।

নীল পরদা হাওয়ায় দুলছে। অন্তঃপুরের ঠিক সামনে এসে পরদার বাধাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনা পার্থ। নিষেধের মত সামনে দুলছে পরদা। হঠাৎ তার কানে এল একটি কণ্ঠস্বর, "নারে, তেমন কিছু হয়নি, ডাক্তার লাগবেনা। আমি ভাবছি দুধটা সব গেল, এখন চা হবে কি দিয়ে।"

কণ্ঠস্বরটা পার্থর চেতনার তারে একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

"এক কাপ চা না পেলে ভদ্রলোক ভাববেন ইস্টিনিয়ার বাবুর বউটা তো ভারী কাদের মেয়ে চাল্লা কলকাতার মানুষ।" খিলখিল করে হেসে উঠল কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী। অলতরঙ্গের ঝঙ্কারের মত সে হাসি তরঙ্গায়িত হল পার্থর সমস্ত দেহমনে। পরদা সরিয়ে ফেলল সে। একটি মুহূর্ত্ত, তারই মধ্যে যা দেখবার ছিল দেখে ফেলল পার্থ। ঘরের মেঝেতে বসে আছে একটি মেয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে। সামনে হিটার জ্বলছে, দুধের কড়া হাত থেকে হয়তো পড়ে গেছে। একটি বৃদ্ধা সেটা পরিষ্কার করছে, মেয়েটি হাতে ভর দিয়ে বসে আছে, সেই হাতের তর্জ্জনীর আঙুল আধখানা নেই।

যেভাবে উপরে উঠে গিয়েছিল পার্থ, সেইভাবেই দ্রুতপায়ে নেমে এল। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে, উচিতও নয় হয়তো। কণ্ঠস্বর, হাসির আওয়াজ তাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, তর্জ্জনীবিহীন হাতখানা তাকে যেন চাবুক মেরে সচেতন করে দিয়েছে।

জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলো ওই আধখানা তর্জ্জনী হেলনে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছে ফিরেছে। পাঁচ বছর বয়স থেকে ওই মেয়েটি তার সমস্ত সত্তা জুড়ে বসে আছে।

'অনু, অনুরাধা'। গুনগুন করে ওঠে পার্থর মন। পৃথিবীর রং গেল বদলে। রাত্রিশেষের বিষণ্ণ আকাশ ঝলমল করে উঠল রূপে রসে। মন বলে উঠল, অনুকে আর একবার না দেখে যাওয়া চলবেনা।

কি অদ্ভুত যোগাযোগ। নিবিড় বেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে পার্থর মন।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতো তারা। জাপানী বোমার আতংকে

শহরের বাড়ী ছেড়ে দুটো সংসার চলে গিয়েছিল দাঁওতাল পরগণার ঝিঝিয়ায়। অনুর মাকে কাকিমা ডাকতো পার্থ। অবাধ প্রশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন কাকিমা। সেই প্রশ্রয়ের ছায়ায় বসে অনুর উপর খবরদারী করতো পার্থ। দুরন্ত দুর্বিনীত অনু একমাত্র পার্থকে ভয় করত। তাই অনুর মা বলতেন, "পার্থর সঙ্গেই বিয়ে দোব মেয়ের। মারধর না করলে এ মেয়ে তো শায়েস্তা হবেনা।" সেই কথাটা পার্থর মনে ধরেছিল; অন্ত তার, অনুকে নিয়ে সে যা খুশী করতে পারে।

একদিন অনুর মা ফ্রক সেলাই করছিলেন সিংগার মেসিনে। বারবার সুতোর সুতো খুলে দিচ্ছিল অনু। বিরক্ত হয়ে অনুর মা ডাকলেন, "পার্থ, আয়তো একবার।" কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই চীৎকার করে উঠল অনু। পার্থর নামে সাবধান হতে গিয়ে মেসিনের হ্যাণ্ডেলে আঙুল ঢুকে গিয়েছে, তর্জনীর কচি হাড়টা ভেঙে গেছে। হাসপাতালে গিয়ে আধখানা আঙুল বিসর্জন দিয়ে এল অনু।

অনুর মা বললেন, "একে মেয়ে, তায় খুঁত হল। বিয়ে দিতে প্রাণ অস্ত হবে।"

পার্থর মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আহা, অমন মেয়ে! ওই একটু খুঁতে বিয়ে আটকায় কখনো। ওর বিয়ে হবে রাজার ঘরে। দেখে নিয়ো তুমি।"

অনুর মা বিষণ্ণ হেসে বললেন, "রাজায় আমার দরকার নেই দিদি, খাইয়ে পরিয়ে রাখবে, আর কাটা আঙুলের খোঁটা দেবেনা, এটুকুই যথেষ্ট।"

তখন অনুদের সেইরকম অবস্থাই ছিল। কোনমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা।

পার্থ তখন ভেবে পায়নি কাকিমা এমন কথা বলছেন কেন অনুকে তো সে বিয়ে করবে। আঙুল না থাকলো তো বয়েই গেল।

পার্থদের তখন জমজমাট সংসার। অনুর মত মেয়েকে সে পরিবারের বধূ হিসাবে কল্পনা করা যায়না। অনুকে স্নেহ করলেও পার্থর মা তার একমাত্র ছেলের জন্য তাকে নির্বাচন করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

হঠাৎ বুকের একটা কি কষ্ট নিয়ে অনুর বাবা সপরিবারে চলে গেলেন জব্বলপুর। ঘুরে ফিরে কখন যে তিনি বাংলায় ফিরে এসে পার্থর বাবার সাহায্যেই কোন্নগরে বাড়ী করে বসবাস সুরু করেছেন সে খবর রাখতনা পার্থ। সে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। প্রেসিডেন্সীর ছায়া-সুনিবিড় প্রাঙ্গণে, কফি হাউসের মুখোমুখী চেয়ারে তার তরুণ যৌবন তখন উন্মন হয়ে উঠছে সহ-পাঠিনীদের কল-গুঞ্জনে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে হঠাৎ একদিন বাজারের কাছে অনুর বাবাকে দেখে থমকে দাঁড়াল পার্থ। বয়স অনেকটা বেড়ে গেলেও চেহারা এখনই রকম আছে, শুধু দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

রাস্তার মাঝেই প্রণাম করল পার্থ।

"তুমি, মানে, ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

"আমি পার্থ, পার্থসারথী……"

"ওহো!" জড়িয়ে ধরলেন অনুর বাবা, "তুমি, আমাদের সেই ছোট্ট পার্থ এত বড় হয়েছ, কি করে চিনবো বল? কি করছো আজকাল? হাঁা, হাঁা, তোমার বাবার কাছে শুনেছিলুম তুমি আই, এ পড়ছো। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেকেণ্ড ইয়ার।"

"আমার উচিত ছিল তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করে আসা। কিন্তু মনোকাশে, বুঝতেই পারছো পার্থ, মনের ইচ্ছাটা মনেই থেকে গেছে! কেমন আছেন তিনি?"

অনেক প্রশ্নই তিনি করলেন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একবারও বললেন না পার্থকে তার বাড়ীতে যেতে।

পরপর দু'তিন দিন পার্থ ইচ্ছা করেই তার সামনে পড়ল এবং অবাক হবার ভানও করল। কিন্তু তুল করেও তিনি বললেন না, "চল পার্থ, তোমার কাকিমা তোমাকে যেতে বলেছেন।"

পার্থও হাজারটা অনাবশ্যক কথা বলেছে, কিন্তু অতি আবশ্যকের প্রশ্নটা করতে পারেনি, অনুর কি খবর?

'অনু, অনু' গ্রীষ্মের উদাস হাওয়ায় একটা নামই শোনে পার্থ। সমস্ত ছুটিটা তার মাটি হয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত অনুর বাড়ীর কাছাকাছি ঘোরে সে। অনু কত বড় হয়েছে, দেখতে কেমন হয়েছে? পার্থর কথা কি তার মনে শিহরণ তোলে, রক্তে লাগে দোলা? অথবা পার্থকে সে বিস্মৃত হয়েছে, ভুলে গেছে শৈশবের অধ্যায়?

মনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করে হেরে গেল পার্থ। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঢুকে পড়ল অনুদের বাড়ীতে অনুর বাবার অবর্তমানে।

দরজা খুলে দিল ঝি, এবং দরজা খোলার পরে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অনুর মা। পার্থ দেখেই চিনতে পারল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বলল, "আমি পার্থ, কাকিমা।"

"পার্থ! এতদিনে মনে পড়ল তবে কাকিমাকে, কাছেই তো থাক শুনেছিলুম।"

পার্থ অপ্রতিভ ভাবে বলল, "পড়াশোনার চাপ খুব, তাছাড়া···" পার্থর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এসে অনু। অনু কেমন হয়েছে ভেবে যে ক'টি চিত্র মনে এঁকেছিল পার্থ, তার একটাও মিললনা। অনু অনুই, কোন ধারণা দিয়ে তাকে মাপা যায়না। একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল পার্থ।

"অনু, বলতো কে?" কাকিমা হেসে প্রশ্ন করলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করে অনু বলল, "আহা, পার্থ তো।"

"ওমা, তুই চিনলি কেমন করে?" অকৃত্রিম বিস্ময় কাকিমার কণ্ঠে, "আমি কিন্তু চিনতে পারিনি।"

অনু মৃদু হাসল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

"যা অনু, পার্থকে ঘরে নিয়ে যা। আমি এক্ষুনি আসছি।"

অনুর মার ব্যবহারে উষ্ণতার পরশ আছে, ভরসা পেল পার্থ।

ঘরের ভিতর ঢুকে দুজনেই চুপ করে রইল। অনু এটা সেটা নাড়ছে, আর পার্থ একটা ক্যালেণ্ডারের পাতায় বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখতে সুরু করল। ঘরের মধ্যে টাইমপীসটা টিক টিক করছে, আর দ্রুতভাবে চলছে দুজনের বুকের স্পন্দন, এছাড়া শব্দময় পৃথিবীতে আর কোন শব্দনই ছিল না। প্রেসিডেন্সীর বক্তিমায় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত আর্টনেস।

অনুরাধাই নীরবতা ভাঙলো, "এতদিনে তাহলে সময় হল আসবার।"

পার্থ তাকাল অন্নুর দিকে, তারপর বলল, "আমার আসাটা এত মূল্যবান বুঝলে অনেক আগেই চলে আসতুম।"

"প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খোঁজ করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।"

অন্নু কেমন স্বচ্ছন্দে কথা বলছে, আর পার্থ-যেন কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ কত কথা বলবার ছিল তার।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, "আমাকে দেখে এত বছর পরে চিনতে পারাটা খুব আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে আমার। কেমন করে এটা সম্ভব হল?"

অন্নু হেসে বলল, "আমাকে কিন্তু তুমি বলেই কথা বলতে। তৃতীয় পুরুষে নয়। ভুলে গেছ নিশ্চয় সেকথা।"

পার্থ ভাবতেই পারে না অন্নু এমন সহজে একটা পরিপূর্ণ বয়সের ছেলেকে তুমি বলে সম্বোধন করছে কিভাবে। শৈশবের পরিচয়ের সুযোগে?

অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার জন্য পার্থ বলল, "আমার কথার উত্তর দিলে না তো! কি দেখে চিনলে আমাকে?"

আবার সেই অপরূপ শ্রীবাভঙ্গী, "কেন, তোমার চোখ। ওরকম নীলচোখ একবার দেখলে ভোলা যায় নাকি?"

মন নৃত্য করে উঠল ময়ূরের মত। পার্থ জানে তার আশ্চর্য্য গৌরবর্ণের সঙ্গে গাঢ় নীল চোখ তাকে সাধারণের মধ্যে অনন্য করে রেখেছে। বাল্যকালের মুহূর্তগুলিতে, গাঢ় কণ্ঠস্বরে সেকথা উচ্চারিত হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু সেই কথাটিই অন্নুর মুখে বেজে উঠল বীণার ঝংকারের মত। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর রং গেল বদলে।

হঠাৎ উঠে পড়ল পার্থ, বলল, "আজ চলি।"

"মা যে বসতে বলে গেলেন।"

"আরেক আসবো, আজ বসার উপায় নেই, কাকিমাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল।"

আজ এই মুহূর্ত একটু একলা থাকার দরকার পার্থর, মনের সঙ্গে মুখোমুখী বসে জেনে নেওয়া প্রয়োজন কেন অন্নুর একটি কথায় এমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে সে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এ কিসের উন্মাদনা। পার্থসারথী কি তবে প্রেমে পড়ল!

তারপর সুরু হল সেই চিরন্তন মন দেওয়া নেওয়ার খেলা। কি এক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পার্থ। অন্নুকে একদিন না দেখলে সমস্ত দিনটা হয়ে যায় মাটি। পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল একখানি নিরালা গৃহকোণে। অন্নুরাধার উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু পার্থর উচ্ছ্বাসের আবেগ বাঁধভাঙা বন্যার মত অন্নুর বোধ বিবেচনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আই. এস্ রেজাল্ট আশানুরূপ হলনা। বি. এ পরীক্ষাটা কোন রকমে চুকিয়ে পার্থ কোডাইকানালে এসে পড়ল। অন্নুর নীরব স্বীকৃতিতে আর মন ভরছেনা, তার মৌখিক স্বীকৃতি চায় পার্থ। ঠিক এমনি সময় একদিন অন্নুর বাবার মুখোমুখী পড়ে গেল সে, অন্নুর ঘরে ঢোকবার মুখে।

"পার্থ, তোমার সঙ্গে কথা আছে, একবার আমার ঘরে এসো।" ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। পার্থ নীরবে তাকে অনুসরণ করে।

কোনরকম ভূমিকা অথবা ভনিতা না করে তিনি প্রশ্ন করলেন,"বি. এ পাস করে কি করবে ঠিক করেছ ?"

"এম. এ পড়বো আর চাকরীর চেষ্টাও করতে হবে। অনেকগুলো দরখাস্ত করে ফেলেছি…"

"তাহলে চাকরী করবে ? জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আর কোন পথ তোমার জানা নেই !"

অন্তর বাবার কণ্ঠে বিদ্রূপ লক্ষ্য করে একটু উষ্ণ হয়ে ওঠে পার্থ, তবু সেটা গোপন করে বলে, "আপনি কি করতে বলেন ?"

"আমি একটা চান্স দিতে চাই তোমাকে, তার জন্য ঘুরোপথ ঘুরে আসতে হবে তোমার।"

"আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলছেন আপনি।"

অন্তর বাবা বললেন, বছর তিনেক ধরে আমার বাড়ীতে আসছো, আমার মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করছো। সেই মেলামেশার গুরুত্ব নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই।"

"আজ্ঞে, মানে তেমন……" পার্থ তোতলাতে সুরু করে।"

বাধা দিয়ে অন্তর বাবা বললেন, "এসব জিনিষের উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই, কিন্তু তোমার কাকিমার আছে। সুতরাং তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। তেমনি তোমারও দায়িত্ব আছে আমার প্রতি।"

কথাগুলো বোধগম্য না হলেও পার্থ একটু অপমানিত বোধ করে অন্তর বাবার কণ্ঠস্বরে।

"আপনি কি আমাকে আর আসতে নিষেধ করছেন ?"

"অনেক আগেই নিষেধ করা উচিত ছিল। এখন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। সোজা কথাই বলছি আমি, অন্তকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা তোমার নেই।"

হঠাৎ এইরকম প্রসঙ্গ এসে পড়ায় পার্থ হতভম্বি হয়ে গেল। তারপরই নিদারুণ অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

অন্তর বাবা বললেন, "কিন্তু যোগ্য হতে হবে তোমাকে, তার জন্যই বিদেশে পাঠানো দরকার। তোমার বাবার পক্ষে সম্ভব নয় তোমাকে পাঠানো, খরচটা আমিই করবো। আমার প্ল্যানমত চললে পরে সমস্ত বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবো আমি।" নীরস বৈষয়িক কণ্ঠ তাঁর।

আজই প্রথম লক্ষ্য করল পার্থ, অর্থে সামর্থে অন্তরাধা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। আজই মনে হল সোনার গয়নায় ঝলমল করছে অন্তু আর তার মা। অসহায়ভাবে উপলব্ধি করল সে, অন্তদের বাড়ীটা কত বড়, কত উঁচু, পার্থদের মত লোকেরা সেখানে অনাহুত, অপাংক্তেয়। আশ্চর্য, এতদিন সে শুধু অন্তকেই দেখেছে, অন্তর চারপাশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তো দেখেনি।

দমিয়া হয়ে পার্থ প্রশ্ন করল, "অন্তরও কি এই মত ?"

"অন্তু এবং তার মা তোমাকে পছন্দ করে। তাদের মতামত অন্যরকম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এ সংসারে আমার মতই একমাত্র মত।"

পার্থ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্তর বাবা বললেন, "তোমাকে দু'দিন সময় দিলাম, ভেবে দেখো, আজ আর নয়।"

অপমানে পার্থ লাল হয়ে উঠল। এই প্রস্তাব নিয়ে দু'দিন ভাববে সে। অন্তর বাবা যেভাবে এতক্ষণ সে সহ্য করেছে। কিন্তু সময় নিয়ে আর দীনতা সহ্য করবে না পার্থ।

অনুর বাবার চোখের উপর চোখ রেখে বেশ সহজভাবেই সে বলল, "আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলুম না। মাপ করবেন।"

"তার মানে ?"

"কোন কিছুর জন্যই ঘুরোপ যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অসহ্য ক্রোধে অনুর বাবা বোবা হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য, তারপর বললেন, "অনুকে বিয়ে করতে চাও না তুমি ?"

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছিল পার্থ অরূপ রতন আশা করে, সেই অরূপাকে অনায়াসে অনায়াসে পেয়েও অনায়াসে ছেড়ে দিল পার্থ। মৃদু হেসে বলল, "অনুকে চাই না একথা বলতে পারবনা। কিন্তু তার মূল্য বড় বেশী চেয়েছেন আপনি। আমার মা, বাবা, আমার বংশমর্য্যাদা সব কিছুর প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে।"

অবরুদ্ধ আক্রোশ যেন ফেটে পড়ল হঠাৎ। চেঁচিয়ে উঠলেন অনুর বাবা, "এতদিন কেন তাহলে আমার বাড়ীতে এসেছ ? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার মত একটা ছেলে, যার ভবিষ্যৎ শুধু কেরানীগিরি করা, তার হাতে আমার একমাত্র মেয়েকে দেবার জন্য আমি এতদিন পরে বাংলায় ফিরেছি ?"

পার্থ উত্তেজিতভাবে অনুর ঘরের দিকে পা বাড়াল। যাহোক একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাক আজই।

"ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?"

"কথাটা যখন উঠেই পড়ল, তখন তার শেষটা জেনে যেতে চাই।"

"কথাটা উঠে পড়তে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহলে ছিল না বুঝি ? একটি মেয়ের সঙ্গে তুমি মিশবে, কিন্তু বাহিরের প্রশ্ন উঠলে এড়িয়ে যাবে, এটাই বুঝি চরম আধুনিকতার লক্ষণ।" বিষাক্ত ছুরির মত কথাগুলো পার্থকে আঘাত দেয়। পার্থ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

ঈষৎ বিদ্রূপ জড়ানো কণ্ঠে সে বলে, "আপনার প্রস্তাব মত চললে আপনার মেয়েই কি পারবে আমাকে শ্রদ্ধা করতে ? সেই প্রশ্নটাই একবার তাকে করে আসি।"

উত্তেজিত পায়ে অনুর ঘরে ঢুকল পার্থ। চিরদিনের মত চলে যাওয়ার আগে অনুর কথা জানা দরকার।

আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে অনু। তার বসবার ভঙ্গীটা ভারী অসহায়। পার্থর মনটা কোমল হয়ে গেল।

অনুর পাশে দাঁড়াল সে, তারপর তার শিথিল একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ডাকল, "অনু, বাবা।"

আকাশ-বিহারিণী মাটিতে নেমে এল, পার্থর মুঠো থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে বলল, "বল।"

"তোমার কথা তোমার মুখ থেকে শুনবো বলে এসেছি।"

ধরা ধরা গলায় অনু বলল, "আমার বাবার কথাই আমার কথা।"

"তুমিও বলছো আমাকে অতদূরে যেতে ?"

"কেন বলব না ? আমার জীবনে অনেক ambition আছে।"

জোর করে অনুর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে পার্থ বলল, "ambitionটাই জীবনে সব? মানুষের চেয়েও বড়?"

অনুর গভীর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল। তারপর গ্রীবার সেই একই ভঙ্গী করে বলল, "ambitionহীন মানুষকে আমি মানুষ বলেই ভাবতে পারি না।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে বসবার ভঙ্গীও পালটে গেল অনুর। সমগ্র অবয়বে ফুটে উঠল একটা উদ্ধত কাঠিন্য।

"কিন্তু একটা কথা কেন ভাবছো না অনু? আমার বাবা মার আমি এক ছেলে।"

"তুমি ভাবছো আমার বাবা মার কথা?" ভ্রূকুঞ্চিত হল অনুর, "আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। আমি তোমার বাবা মার কথা ভাববো, আর তুমি ভাববে না আমার বাবার কথা? আমার ভবিষ্যতের কথা?"

পার্থ উত্তেজিতভাবে নিজের মাথার চুল ধরে টানল। তারপর বারকয়েক পায়চারী করে অনুর মুখোমুখী দাঁড়াল।

"এভাবে যদি বিদায়ই দেবে, তবে এতদিন খেলা করছিলে কেন, সেকথা অন্ততঃ বুঝিয়ে বলতে হবে।"

ঝন করে জ্বলে উঠল অনু, "খেলা! ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকো ভবিষ্যতে। আর একটা কথা, তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম কবে পার্থ যে নাটকীয়ভাবে বিদায় দেবার কথা বলছো?"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনু, রাজেন্দ্রাণীর মত দৃপ্ত চরণে। যতক্ষণ পার্থ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

অনুর বাবা অস্ফুটে বললেন, "হাউনফ্রেন্ড।"

তারপর বছর সাতেক কেটে গেছে, সুদীর্ঘ সাত বছর পরে অনুরাধাকে দেখল পার্থ। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল অনু তার বুকের মধ্যে আজও কতটা স্থান জুড়ে বসে আছে, আজও তার স্মৃতি তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই বেদনা-মধুর।

অনুর বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছিল তার বাবার কাছে, পাত্র ইঞ্জিনিয়ার তাও শুনেছিল সে, কিন্তু এই সুখী সুন্দর পরিবেশে অনুকে দেখে আশা করে যেমনে। একটা প্রশ্নও কিছু ঘটিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না অনুর সুখী নির্দ্বোষ হাসি!

"এই যে আপনার চা।"

চমকে উঠে তাকাল পার্থ। স্থির হাতে অলখাবারের থালা, আর অনুর হাতে চা।

"তুমি! পার্থ!" অনুর কাপ থেকে চা চলকে পড়ল সাড়ীর উপর।

"কি হল মা? বলদুর পা পুড়ে গেছে, নীচে নামবেন না।" স্থির কণ্ঠে অনুরোধ।

"আচ্ছা হয়েছে। তুই যা, দেখতো আর এক কাপ চা করা যায় কিনা। এ তো পড়েই গেল।"

"আমি একুণি চলে যাবো, চায়ের দরকার নেই।"

অনুর ইসারায় ঝি দোতলায় উঠে গেল।

"বল।" পার্থকে যেন আদেশ করল অনু, "আমার স্বামীকে দেখেছ তো? চলে গেলে ঠিক খুঁজে বার করে ধরে আনবে, ওর বাড়ীতে এসে না খেয়ে যাবে তুমি!"

স্বামীগর্বে যেন ফেটে পড়ছে সরবিনী। পার্থ উত্তপ্ত হয়ে উঠল, "তোমার স্বামী তো আর জানেন না রাস্তা থেকে কাকে ধরে এনেছেন! জানলে এত সমাদর করে একলা রেখে যেতে ভরসা পেতেন না।"

কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়ল অনু, "কি যে বল! তোমাকে চেনেন না ঠিকই, কিন্তু তোমার কথা সবই জানেন। সবই বলেছি ওকে।"

অসহ্য ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে পার্থর। সবই বলেছে, তার মানে পার্থ যে কাঙালের মত হাত বাড়িয়েছিল আকাশের চাঁদের দিকে, সেই কথা নিয়ে হয়তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কৌতুকের অন্ত নেই।

পার্থর গম্ভীর মুখের দিকে অনু হেসে বলল, "ভয় নেই গো, আমার স্বামী খুব উদার। এমন মহৎ মানুষ আমি দেখিনি!"

"ভালই আছ তাহলে!"

"বাঃ, ভাল থাকবার জন্য কত দেখে শুনে বাবা বিয়ে দিলেন। বল!" একটু থামল অনু, তারপর কৌতূহলী হয়ে বলল, "নিজের কথাই বলছি। তোমার কথাই বল। বউ কেমন হয়েছে বলবে না তো!"

এতক্ষণ এই সুযোগই চেয়েছে পার্থ। এই চটুল, চপল, হৃদয়হীন মেয়ের জন্য আজও সে ঘর বাঁধতে পারেনি, একথা ভেবে নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছিল তার। একটু হেসে বলল, "তুমি প্রশ্ন না করলে বলি কেমন করে? হাজার হোক, দুজনে কম বোকামী তো করিনি এক সময়।"

"কি বললে? বোকামী?" একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল অনুর উজ্জ্বল মুখখানা।

পার্থ তখন আর কিছুই লক্ষ্য করছে না। নিজের মুখখানা উদ্ভাসিত করে তুলে বলল, "বয়সটা যে বোকামীরই বয়স তখন।"

"শুধু বোকামীরই বয়স তখন!" অস্ফুট কণ্ঠ অনুর।

"কল্পনাকেও বলেছি সেকথা·····"

"বউর নাম বুঝি? কি, কি বলেছ তাকে?" রুদ্ধ হয়ে আসে অনুর কৌতূহলভরা কণ্ঠ।

"এই, কেমন করে লেখাপড়ার ক্ষতি করে দিনগুলো নষ্ট করেছি। সত্যি আমি বড্ডো বোকা ছিলুম।"

পরে অনু বলল, "তোমার বিয়ের খবরও দাওনি আমাদের। কল্পনা দেখতে কেমন? সুখী হয়েছে তো!"

পার্থ বলল, "স্ত্রী স্বামীর চোখে কেমন, তা কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মুখে শোনমি। স্ত্রী মাত্রেই অনন্তা। আর সুখী কিনা যদি বল, লোককে সুখী করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওর। বাড়ীর সবাই খুশী। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পার্থ। তারপর যেন খুব মজার কথা বলছে এমন মুখ করে বলল, "ওর কিন্তু দন্তটা আদৌই অক্ষত।" বলেই হো হো করে হেসে উঠল পার্থ।

মুহূর্তে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল অনুর মুখ। বর্ণহীন ধূসর চোখে সে তাকাল বাইরের আকাশের দিকে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি তখন রাঙিয়ে তুলেছে পশ্চিমের আকাশ।

সেই রং এসে ছড়িয়ে পড়েছে পার্থর মুখে। একবার সেই বলিষ্ঠ উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে অনু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। তারপর যখন ফিরে তাকাল, দেখল, সোফায় সেই একা বসে। পার্থ কখন না জানি নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, অনুর ছায়ার পিছনে পার্থ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করল অনুই প্রথমে। মৃদুস্বরে বলল আকাশের দিকে চোখ রেখেই, "পার্থ, আমি সুখী হতে পারিনি। জীবনে সুখ কাকে বলে বিয়ের আগে জানতুম, এতক্ষণ তোমার সামনে সুখের অভিনয় করছিলুম।"

পার্থর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। অনুর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে অনুর পিঠের উপর হাত রেখে ডাকল, "অনু, অনু।"

অনু জানলার গ্রীলের সঙ্গে মুখটা চেপে ধরল, তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল থরথর করে পার্থর স্পর্শে।

"যে সময়টা তোমার জীবনে আজ শুধু বোকামী, সেই সময়টা আমার জীবনে হয়ে আছে বেঁচে থাকবার অবলম্বন। তুমি যে দিনগুলো নষ্ট করে আজ অনুতাপ করছো, পার্থ, সেই দিনগুলো আমি কৃপণের মত সঞ্চয় করে রেখেছি।"

হঠাৎ পার্থর সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। বলল, "তাহলে কেন সেদিন অমন নিষ্ঠুরের মত ফিরিয়ে দিয়েছিলে? কেন, কেন?"

পার্থ তার হাত ধরে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনী দিল। সেই আকর্ষণে অনু পার্থর বুকের উপর এসে পড়ল। অবসন্নভাবে সে পার্থকে আশ্রয় করে বলল, "অভিমানে।"

"কিসের অভিমানে তুমি এমন ক্ষতি করলে আমাদের দুজনের?"

"কেন তুমি বাবার কথা শুনে আমার মতামত জানতে গেলে পার্থ? আমার মনের খবর তুমি জানতে না? আমাকে অবিশ্বাস করলে কেন?" ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অনু।

পার্থ বলল, "ক্ষমা কর, অনু আমার সব ভুলকে ক্ষমা কর।"

অনু অস্ফুটস্বরে বলল, "তুমিও আমাকে ক্ষমা কর। এসব কথা বলে তোমাদের সুখের জীবনে কোনরকম ছায়া আমি ফেলতে চাইনি পার্থ, হঠাৎ দিশেহারা হয়ে বলে ফেলেছি।"

অনু বসে পড়ল পাশের সোফার উপর। অনুর পাশে বসল পার্থ। বলল, "আমিও এতক্ষণ সুখের অভিনয় করছিলুম। বিয়ে আমি করিনি। এরকম মন নিয়ে বিয়ে করে কোন মেয়েকে ঠকাতে চাইনা আমি।"

"কোন কথাটা বিশ্বাস করবো পার্থ?"

"এই কথাটা, তোমার কাছে মিথ্যে কোনদিন বলিনি অনু। আজ কোন অধিকার আমার নেই তোমার উপরে, কিন্তু আমার মনের উপর তো কারো হাত নেই। সেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।"

"অধিকার নেই কেন বলছো? মনের ভালোবাসায় অপমৃত্যু ঘটে না।"

"অহু! অহু!" গুন গুন করে উঠল পার্থ। "তোমার স্বামী তো চমৎকার মানুষ, তবে কেন তুমি অসুখী?"

পার্থের কথায় অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে অহু বলল, "ও যে কতবড় নিষ্ঠুর তা আমি ছাড়া আর কে জানে। ভালবাসাহীন জীবনে দিনরাত অভিনয় করে যাচ্ছি। কিন্তু আর পারিনা। এমন করে তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করা আর সম্ভব হচ্ছে না।"

"তোমার স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে ইচ্ছে করছে অহু। তার বাগান আলো-করা মল্লিকার মালিনীকে কেন তিনি একটা প্রাণহীন পুতুল করে রাখবেন?"

পার্থর কথার উত্তরে বলল অহু, "না পার্থ, ওসব তোমাকে আমি করতে দেবনা। যা আছে আমার দুঃখ, তা আমারই থাক, যা আছে আমার সুখ তাও আমারই থাক। তোমার কথা ভেবে, আজকের এই সন্ধ্যার কথা ভেবে আমি যে আনন্দ পাবো, তা তুমি নষ্ট করে দিও না।"

অহুর বুকের উপর রাতের আকাশের একটা আলো এসে পড়ল, তার মুখখানা দুহাতে তুলে ধরল পার্থ। হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অহু।

"আমার স্বামী এসে গেছেন।"

কম্পাউণ্ডের ভিতর মোটর বাইকের গর্জন শোনা গেল।

সমস্ত মনটা একটা বিষাদ মধুর রাগিনীতে বাজতে থাকল পার্থর। মনের মত অভিনেতার কাজ করেছে। পার্টির সঙ্গে ঘুরেছে বিভিন্ন মেলা। মন তার সর্বক্ষণ গুনগুন করেছে এক অপার্থিব আনন্দে। সে আনন্দ বেদনায় মধুর, বিষাদে পবিত্র। অহুর ভাবনাটাকে সে সযত্নে ঘুরে রেখেছে, নিরালায় নিভৃতে ভাববার জিনিষকে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে অমর্যাদা করতে চায়না সে। সমস্ত কিছু শেষ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে খুলে বসবে সে স্মৃতির পসরা। আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে পার্থ সেই দিনটির। সেদিন তার আর অহুর মাঝখানে থাকবেনা কোন নিত্য নৈমিত্তিকের ক্লান্তি। তার অনাবৃত মনের সামনে অহু এসে দাঁড়াবে অকুণ্ঠিত পায়ে, রাঙ্গীগঞ্জের সন্ধ্যার অমলিন স্মৃতি নিয়ে।

মাসখানেক বাদে ফিরে এল পার্থ ধনির অভিট শেষ করে। বাড়ী ফিরে দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে একখানা চিঠি, নীল রংয়ের একখানা সৌখীন খাম। চিঠিখানার জড়ানো রয়েছে এক অস্পষ্ট সৌরভ। এই সৌরভের সঙ্গে জড়ানো আছে রাঙ্গীগঞ্জের এক রক্তাক্ত সন্ধ্যা। অহু তাকে চিঠি লিখেছে।

কম্পিত হাতে খামটা ছিঁড়ে ফেলল পার্থ।

সম্বোধনহীন এক পত্র। সেই পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর একখানা কৌতুকমণ্ডিত মুখ হয়ে পার্থর চোখের সামনে হেসে উঠল—

"আমাকে তুমি ক্ষমা করো। সেদিন তোমাকে আমি প্রবঞ্চনা করেছি, সেদিন যা যা বলেছি সব মিথ্যে, নিছক মনগড়া কাহিনী শুনিয়েছিলাম, শুধু তোমার সহানুভূতি পাবার জন্য।

আমি সুখী, হ্যাঁ খুব সুখী, আমার স্বামী আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। চোখের জলের কথা ভাবছো? মেশোনি তো মেয়েদের সঙ্গে। তাই জানোনো। আসল দুঃখের কারণ ঘটলে,

বিশেষ করে যদি স্বামী সংক্রান্ত হয়; মেয়েরা প্রতাপ করে না মরে গেলেও। কিন্তু নকল দুঃখ তৈরী করে তারা আসল কান্নাই কাঁদতে পারে। সেদিন সেই দুঃখেই কেঁদেছিলাম, কিন্তু তোমার আসল দুঃখ, তোমার সত্যিকারের চোখের জল আমার সে দুঃখকে বড় লজ্জা দিয়েছে।

তোমার সুখের কথা শুনে ঈর্ষা হয়েছিল প্রথমটা, তারপর আমার মেয়ে মনটা সজাগ হয়ে উঠল, জানতে চাইলাম সত্য কথা অভিনয় করে।

আজো সেই অবুঝ ছেলেই আছ তুমি। তাই সুখের কথা শুনেই জল হয়ে গেলে। আমার স্বামীর উদার সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার, তার বাড়ী, গাড়ী কিছুই দেখলে না, দেখলেনা আমার সুখী চেহারা!

তোমাকে একটা অনুরোধ করবো পার্থ। আমার শেষ অনুরোধ এটা, তুমি রাখবে জানি বলেই বলছি, পার্থ। আর তুমি আমার সামনে এসোনা। আমার জীবন থেকে দূরে থেকো। আমার মিথ্যে অভিনয়টাকে সত্য বলে আঁকড়ে না থেকে সুখী হবার চেষ্টা কর। তুমি সুখী জানলে আমার সুখের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে। তার আগে একটু অপূর্ণতা থেকে যাবে, একটু অপরাধবোধের গ্লানি। এই গ্লানি থেকে তুমি ছাড়া আর কে মুক্তি দেবে বল?

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যোগ্য সাথী পেয়ে সার্থক হয়ে উঠতে পার যেন জীবনে। এই আমার শেষ চিঠি। শেষ স্মৃতি বলে এটা যেন কাছে রেখে দিও না।

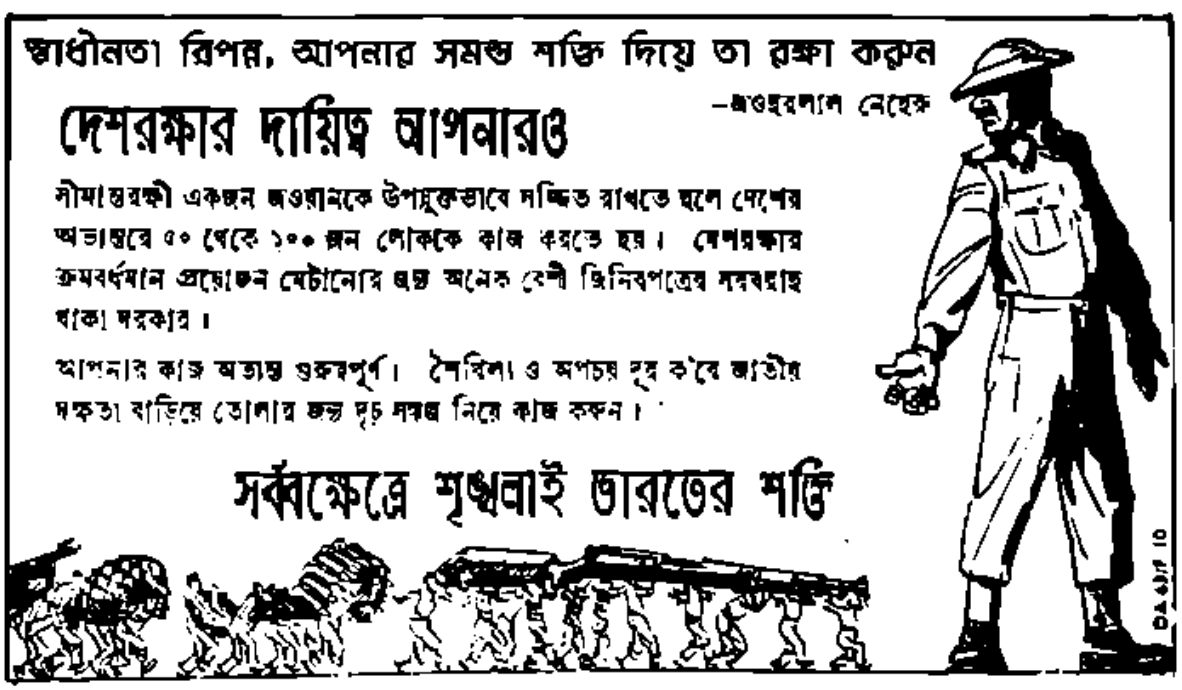

এক অসমসাহসিক অভিযান

বরুচি

পৃথিবীর নানা দেশে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী আছে, কিন্তু সাহসে আর বৈচিত্রে সকলকে হার মানিয়েছে একটি কাহিনী। —একটি মানুষের এক বেপরোয়া পরিকল্পনার রোমহর্ষক ইতিবৃত্ত।

• • • •

হজের তিথিতে মক্কা।

পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লাখো লাখো মুসলমান তীর্থযাত্রী দুঃসহ পথের কষ্ট সহ্য করে পরম-ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছেছে।

পবিত্র নগরে অগণিত মানুষের ভীড়। চারিদিকে বিপুল প্রাণচঞ্চল স্রোত। ভীড়ের মধ্যে পথ চলা দায়।

প্রখর সূর্যকিরণে দিক-দিগন্ত ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘর্মাক্ত দেহে তীর্থযাত্রীরা কাবা শরিফের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাণের আকুতি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে।

সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

সেই ভীড়ের মধ্যে সকল শ্রেণীর মুসলমান আছেন। ধনকুবের আরব সওদাগরের পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর দীনতম ভৃত্য। বাদশার প্রতিনিধির সঙ্গে গা ঘেঁসে রয়েছে গাঁয়ের গরীব চাষী। এই পুণ্যতম প্রতিষ্ঠানের সামনে মানুষে মানুষে আজ ভেদ নেই, সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার মুসলমান আজ একই পিতার সন্তান, যাঁর কাছে সন্তানে সন্তানে নেই কোন বিভেদ।

এমনি দিনে সেই কাবা শরিফের চত্বরে এক দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ভক্তকে দেখা গেল, ভীড় ঠেলে তিনি বেদীর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর অঙ্গে তীর্থযাত্রীর পোষাক, তীক্ষ্ণ দু'চোখের দৃষ্টি, ঘনকালো গোঁফ আর পাতলা দাড়ি তাঁর রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ মুখমণ্ডলকে এক বিশিষ্ট ও বিচিত্র রূপ দান করেছে।

পবিত্র পাথরের সামনে গিয়ে তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন, তারপর যেমন করে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ভক্ত তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেন তেমনি করে নিখুঁত ভাবে তিনি তাঁর ধর্মকর্ম সমাপন করলেন।

আশ্চর্য লাগবে শুনতে যে তিনি ছিলেন না মুসলমান। তিনি একজন খৃষ্টান, তিনি ইংরেজ। মুসলমানদের কাছে তিনি বিধর্মী কাফের!

সেই বিধর্মী খৃষ্টান, মুসলমানদের পবিত্রস্থানে পৌঁছে, গোপনে ছদ্মবেশে তাদের ধর্মকর্মে অংশ গ্রহণ করলেন।

তিনিই প্রথম ও শেষ বিধর্মী যিনি এই চরম দুঃসাহসিক কাজ করতে পেরেছিলেন। সে দেশের লোকের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল মির্জা আবদুল্লা অল বুখিরি।

তাঁর আসল নাম, রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন।

রিচার্ড বার্টন ছিলেন এক অসমসাহসী এবং বিরল প্রতিভার অধিকারী অনন্যসাধারণ মানুষ। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের নানা সংঘাত ও সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মক্কা অভিযান সেই বর্ণাঢ্য জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

সেই অভিযানে, মাসের পর মাস, তিনি তাঁর জীবনকে. যাকে বলে, হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে ঘুরছেন।

একটি মাত্র পদস্খলন, একটি কথার ভুল উচ্চারণ কোন আচরণের মধ্যে সামান্যতম অসঙ্গতি যদি প্রকাশ পায়, ব্যস, তাহলে আর দেখতে হবে না, প্রাণ যাবে অবধারিত।

কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর ছদ্মভূমিকাটিকে জীবন্ত রেখে তাঁর অভিনয় শেষ করেছিলেন।

• • • •

ভ্রমণ করব দেশ-দেশান্তরে, দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর সাগর পেরিয়ে চলে যাব মানুষের অগম্য অরণ্যে, অজানাকে জয় করব, মানুষকে শোনাবো আমার সেই সব অভিজ্ঞতার কাহিনী—এমনি এক অসাধারণ মনোবৃত্তি নিয়ে রিচার্ড বার্টন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২১ সালের ১৯শে মার্চ ইংলণ্ডের বার্টকোর্ড শায়ারে।

ছেলেবেলা কেটেছিল ফ্রান্স আর ইতালীতে।

অল্পবয়সেই ফরাসী আর ইতালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘাস্যিপনারও অন্ত ছিল না। অভিভাবক থেকে মাষ্টারমশাই সবাই তাঁর দাপটে অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর উপর মারধোরও কম চলত না।

কিন্তু স্বভাব সোজা হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, শোনা গেল তাঁর প্রাণায় কলেজকর্তৃপক্ষ আদি আদি রব তুলে তাঁকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করেছেন।

কিন্তু বিতাড়িত ছাত্রটি সেজন্যে একটুও দুঃখিত নন, লজ্জিত নন!

স্কুলের সংকীর্ণ গণ্ডী, বাড়ির উঁচুবাধা দেওয়াল তাঁর জন্যে নয়, তাঁর জন্যে সুদূর দিগন্তের হাতছানি, বৃহত্তর বিশ্বের আহ্বান, যে হাতছানি অনুক্ষণ মানসচক্ষে দেখছেন তিনি, যে আহ্বান শুনছেন অহোরাত্র দু'কান ভরে।

যোগ দিলেন সেনাবিভাগে। পাড়ি দিলেন পূর্বদিগন্তের রক্তরঞ্জিত মহাদেশ ভারতবর্ষের উদ্দেশে।

নিজের রুচি অনুযায়ী পরিবেশ পেয়ে প্রাণোচ্ছল কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিদিনে সাফল্য অর্জন করতে লাগলেন। কে বলে, তিনি পড়া পারেন না? কে বলে তিনি পরীক্ষা দিতে ভয় পান? বোম্বাই-এ সামরিক অসামরিক অনেকগুলি পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষকরা ওঁর ভাষার বিন্যাস, লেখার রীতি এবং মননশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে দু'মুখে তাঁর প্রশংসা করলেন।

তারপর বার্টন ঘুরে বেড়ালেন নানা দেশ। শুধু ভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হলেন না। লিখলেন সেইসব ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সেই সরস ভ্রমণকাহিনীগুলি পড়ে পৃথিবীর সকল ইংরেজী সবিশ পাঠক চমৎকৃত হল। তাঁর লেখায় তারা নতুন আস্বাদ পেল। নতুন রস, নতুন ব্যঞ্জনা। এতদিন যেসব ভ্রমণ কাহিনী লেখা হয়েছে তাদের সঙ্গে বার্টনের লেখার অনেক তফাৎ, অনেক বেশী চিত্তস্পর্শী তাঁর রচনা, অনেক বেশী জীবন্ত।

ভারতবর্ষে থাকাকালে তিনি তিরিশটি বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন, ইতিহাসের বই পড়েছিলেন অজস্র, প্রত্নতত্ত্ব আর প্রাচ্যদেশের প্রাচীন রীতিনীতি নিয়ে গবেষণাও করেছিলেন প্রচুর।

পড়াশোনা গবেষণা লেখালেখি—এসবের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর ভ্রমণের নেশা। সে এক দুর্জয় নেশা।

নানা দেশ দেখতে হবে। শুধু তাই নয় যে দেশে যাবেন সেই দেশের মানুষের মতো সেজে যাবেন। এটা ছিল তাঁর এক বিচিত্র খেয়াল।

সুতরাং ছদ্মবেশ ধারণে তাঁরা শিখলেন এবং শিগগিরই নকল মানুষ সাজার কাজে পাকা ওস্তাদ হলেন। নিজের চেহারাকে এমনভাবে পাল্টে ফেলতেন যে নিজেই চমৎকৃত হতেন সময়ে সময়ে।

মুসলমান সওদাগর চলেছেন বড়বাজারের দিকে। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, কুঞ্চিত লম্বিত কেশদাম, ঘনকালো দাড়ি আর ছাঁটা গোঁফ, পরণে দামী জোব্বা, মাথায় তাজ। রীতিমত রাজকীয় ব্যক্তিত্ব।

অথবা হিন্দু শেঠজি চলেছেন মন্দিরে পূজা দিতে। পরণে রেশমের আচকান, রেশমের ধুতি, মাথায় পাগড়ী, নগ্ন পদ। মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল, কাঁচাপাকা ঘন গোঁফ। যোধপুরি কচ্ছ-প্রদেশের কোন রইস নাগরিক।

হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী আফগান—যে কোন সাজেই রিচার্ড বার্টন সমান দক্ষ। এবং সেই সঙ্গে আশ্চর্য নিখুঁত তাঁর অভিনয় ক্ষমতা।

মক্কায় যাবার সাধ ছিল অনেকদিনের, তাই যখনই অবসর পেতেন তখনই বাজারে বাজারে ঘুরে তিনি মুসলিম তীর্থযাত্রীর গতিবিধি, মুসলমানদের আরব কায়দা রীতি চালচলন এবং সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চলতি কথা, প্রার্থনা শব্দ আর ধর্মাচরণ সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করতেন; পাকা অভিনেতার মতো নিজের আচার আচরণ কথাবার্তা আর চলাফেরার মধ্যে তাদের রূপায়িত ক'রে তুলতেন।

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে সেনাবিভাগ থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে তিনি প্রথমে গেলেন ঘরেণে।

তারপর সেখানে আর একদফা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে বেরুলেন তাঁর দুঃসাহসিক যাত্রায়, মদিনা এবং মক্কা অভিমুখে। ছদ্মবেশ নিলেন এক পারস্য নাগরিকের।

বহু দুর্গম পথ পার হয়ে দিন রাত্রির সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত সচকিত অবস্থায় যাপন ক'রে প্রথমে পৌঁছোলেন মদিনায়।

গোপনে গোপনে সেখানকার ছবি এঁকে নিলেন, ডায়েরীতে লিখে নিলেন প্রতিদিনের ঘটনা, নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা। তারপর সেখানকার পালা সাঙ্গ ক'রে দশদিন অবিরাম পথ চলার পর হাজার হাজার তীর্থ-যাত্রীর সঙ্গে ঢুকলেন মক্কায়। ঢিপ ঢিপ করছে বুক, থেকে থেকে পা কাঁপছে!

এগিয়ে গেলেন কাবাশরীফের দিকে। ধরা পড়লে রক্ষা নেই। কিন্তু আর পিছু হেরবার উপায়ও নেই। পিছু ফিরলেই লোকে সন্দেহ করবে। কপাল ঠুকে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় বারবার শিহরিত হচ্ছে। মিশে গেলেন ভীড়ের সঙ্গে। তারপর নিরাপদে ফিরে এলেন স্বদেশে!

তাঁর এই অসম্ভব কাজ আর সাফল্যের সংবাদ যেন বিদ্যুতের মত চারিদিক ছড়িয়ে দিল। তেত্রিশ বছর বয়সে রিচার্ড ফ্রান্সিস বারটন জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করলেন। রাতারাতি তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে।

* * * * *

তিনি কিন্তু কোনদিনই জনসাধারণের সস্তা হাততালির প্রতি লোলুপ ছিলেন না। মক্কা মদিনার বিস্ময়কর অভিযান শেষ করে যখন বিলাতে পৌঁছলেন তখন চারিদিকে তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠেছে, অভূতপূর্ব এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে তাঁকে সম্মানিত করবার জন্য। কিন্তু সেইসব আড়ম্বর আর সম্বর্ধনাকে পাশ কাটিয়ে তিনি সোজা ফিরে এলেন সেনাবিভাগে, ভারতবর্ষে। কোন বড় কাজ করবার পর নিজেকে জাহির না করবার মতো মনের নির্লোভ প্রবৃত্তি সামান্য কথা নয় চরিত্রের এই অসামান্য বৈশিষ্ট রিচার্ড বারটনের জীবনকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে কিছুদিন শান্ত হয়ে রইলেন তিনি। তারপর আবার তাঁর অশান্ত মন দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেড়াবার জন্যে উন্মুখ হল, যে দেশে কখনো কোন সভ্য মানুষ যায়নি, সেই দেশ দেখবেন তিনি, যে-পথে পা বাড়াতে ভয় করেছে সবাই, সেই পথ মাড়িয়ে চলবেন তিনি, যে অরণ্য-জাতিকে কেউ বশ করতে পারেনি, তাদের বাগ মানাবেন তিনি। পৃথিবীর মানচিত্র দেখতে দেখতে পূর্ব-আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। সোমালিল্যাণ্ড! অজ্ঞাত রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক অসভ্য দেশ। দেখতে হবে সেই দেশ, আলাপ করতে হবে সেই দেশের মানুষের সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোড়জোড় শুরু হল। তিনজন সহযাত্রী নিয়ে বারটন রওনা হলেন নিরুদ্দেশের পথে।

বারবেরা বন্দরে বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে বারটন একাকী পূর্ব আফ্রিকার অন্য একটি শহর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কাছেই ছিল এক রহস্য ঘেরা জনপদ। তার নাম হারার। কোন বিদেশী ইতিপূর্বে সে দেশে ঢুকতে পারেনি। বারটন স্থির করলেন, পথেই যখন পড়ল সেই অজানা অগম্য স্থান, তখন তার ভিতরটা একবার প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে দোষ কি? জেনেশুনে এমন বেপরোয়াভাবে চরমতম বিপদের সামনে এগিয়ে যাবার যে দুর্জয় সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি তা অতুলনীয় বলা যেতে পারে। একজন অভিনেতা যখন রাত্রিবেলা কয়েকঘণ্টার জন্যে অন্য এক মানুষের বেশ ও মূর্তি ধারণ করে অভিনয় করেন তখন তাঁর সেই ছদ্মবেশ ও ছদ্মরূপের আমরা বাহবা দিই, তারিফ করি। কিন্তু বারটন যে অভিনয় করেছিলেন, মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় সে জন্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দিন রাত্রির সর্বক্ষণ, চব্বিশঘণ্টা, দিনের পর দিন, কয়েক সপ্তাহ ধরে এক আরব সওদাগরের বেশ ও মূর্তি ধারণ করে তিনি যে নিপুণ ও নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ নটের কাছেও তা বিস্ময়ের বস্তু।

দ্বারের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছেন তখন তাঁকে আটক করা হল। ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে নয়, বলা হল আরব সওদাগর হলেও তিনি একজন গুপ্তচর। মহামুস্কিলে পড়লেন তিনি। অবশেষে বিষম ক্রুদ্ধ হবার ভান করে তিনি শিবিরে ঢুকে এক পত্র রচনা করলেন। পত্রখানি লিখছে যেন এক ইংরাজ এজেন্ট, সেই পত্রে আরব সওদাগরকে সেই দেশের সম্রাট প্রবল প্রতাপ আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে গ্রহণ জানাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাল চিঠি। পত্রখানি গ্রেপ্তারকারী দারোগার হাতে দিয়ে বললেন—নিয়ে যাও তোমাদের বাদশার কাছে। তারপর মজা টের পাবে।

তাঁর বেপরোয়া ভাব আর কথা শুনে দারোগা ঘাবড়ে গেল। পত্র গেল যথাস্থানে। কিছুক্ষণ পরেই মহামান্য আমিরের কাছ থেকে ডাক এলো। বারটন স্বপ্নেও বোধকরি ভাবেন নি যে তাঁর এতবড় ধাপ্পা এতখানি কার্যকরী হবে। কিন্তু তখনকার এক সংকটকালে এমনি এক তরফের দুঃসাহসিক চালেরই প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তীকালে তাঁর পত্নী স্বামীর যে প্রামাণ্য জীবনী লিখেছিলেন তার মধ্যে বারটনের নিজের কথায় এই সাক্ষাৎকারের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। বারটন লিখেছেন— "দু'জন সশস্ত্র প্রহরী প্রথমে আমার একটা প্রকাণ্ড হলঘরে নিয়ে গেল। সেখা ঘরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে বল্লমধারী বহু সৈনিক। তাদের লাল লাল চোখগুলো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। স্বাস্থ্যের মতো তারা নিশ্চল। কিন্তু আদেশ পেলেই তারা যে তীরবেগে আমার দিকে ধেয়ে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘাড় উঁচু করে আমি তাদের মধ্যিখান দিয়ে এগিয়ে চললাম। ভিতরকার জামার পকেটে ছিল একটি ছ'ঘরা পিস্তল। দরকার হলেই তার ব্যবহার করব এই ছিল পণ। যাইহোক তার প্রয়োজন হল না। আমির সাহেব সহৃদয়তার সঙ্গেই আমার অভ্যর্থনা জানালেন।"

অতঃপর দশদিন সেই রাজ্যে অতিবাহিত করে বারটন হারার পরিত্যাগ ক'রে বারবেরায় পৌঁছে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বহু বাধাবিঘ্ন আর বিপদ এড়িয়ে অভিযান সমাপ্ত করে তাঁরা যখন দেশে ফিরলেন, তখন জনগনের যে বিপুল অভ্যর্থনা তাঁরা পেয়েছিলেন তা তখনকার দিনের কোন রাজা বাদশাও পাননি।

• • • •

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী রূপেই যে বারটনের ক্ষমতা ও প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল, তা'নয়। লেখক হিসাবেও তিনি সে যুগের সেরা গ্রন্থকারদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর বিরাট সাহিত্যকৃতি "অ্যারেবিয়ান নাইটস" তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে।

শুধু অভিযাত্রী বা লেখকই ছিলেন না তিনি, প্রশাসক রূপেও তাঁর কর্মক্ষমতা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দামাস্কাস-এর কনসালের পদে তিনি তাঁর রাজ্যশাসন-ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৮৯০ সালের ২০শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন। সে সময় তিনি ট্রিয়েষ্টির কনসাল রূপে সেই দেশে কর্মরত ছিলেন।

॥ দুই ॥

একটি সৈনিকের কাহিনী

উৎপল চক্রবর্ত্তী

ওকে আমি প্রথম দেখি অন্ধকারে। তখন চিনতে পারিনি। ওরা মাটি কাটার দল আমি অনুমানে বুঝেছিলাম। ঘনায়মান সন্ধ্যার ঘনতর অন্ধকারে সড়া কয়েকটা মূর্তির মতো ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে।

—বাবু আপনার সাথে একটা কথা ছিল।

ওদের একজনের কণ্ঠস্বর শুনলাম।

সারাদিনের কাজের শেষে বাড়ী ফিরছিলাম, মন অবসন্ন ক্লান্ত, যথেষ্ট উৎসাহিত হতে পারলাম না একথায়।

—যা বলবার তাড়াতাড়ি বল।

আমার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরে ওরা যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আসের কণ্ঠটি বললো।

—কিন্তু আপনি না শুনলে তো চলবে না বাবু।

শঙ্কা। আমার তাই মনে হলো। ফলে প্রায় রাগত স্বরে বললাম।

—কেন?

—আজতো মাটিকাটা শেষ হয়ে গেল। কাল থেকে কি করব? প্রশ্নটা মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে দিলে আমাকে। আমি এর কি উত্তর দেবো। আর আমি কি দায়বদ্ধ নাকি এ ব্যাপারে! তাছাড়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার এলাকার বাইরে। ওদের নিয়োগ করেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

—আমি কেন? আমি কি বলব?

অস্বস্তি দূর করার জন্য সিগারেট ঠোঁটে রেখে দেশলাই জ্বালালাম।

—বড়বাবু আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন।

সেই কণ্ঠস্বর। চকিতে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম ঘাড়ির ঘন আলোয় দেখলাম জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো।

কাপ্তিটা নিতে গেল।

গলার স্বর নামিয়ে বললাম।

—কাল দেখা করো।

পরদিন প্রায় দেরবার মুখেই বাধা পেলাম।

—বাবু আপনি দেখা করতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু গলার আর কেউ আসে নি। এবং যে এসেছে তাকে প্রথমেই চিনে নিলাম কণ্ঠস্বরে। গতরাতের শ্বাপদ লোকটি। সবল পেশল চেহারা, মাথাভর্তি গুচ্ছ গুচ্ছ উদ্ধত চুলের রাশ, তার নীচে চওড়া কপাল আর তারপর সেই ক্ষুধিত শ্বাপদের চোখদুটো। দিনের আলোয় আরো স্পষ্ট দেখলাম যেন জমাট রক্ত চোখের ভেতর চাপ বেঁধেছে, রক্তচাপে স্ফীত শিরাগুলি তরংকর সরীসৃপের ক্রূরতা এনেছে চোখে!

আমি নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠলাম। একটা ভয়ানক ক্রিমিনাল যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে; একে আমি কি কাজ দেবো।

দ্বিধা ঝেড়ে বললাম।

—আর সব কোথায়?

রক্তিম সরীসৃপগুলো যেন বিদ্যুতের মতো ফণা তুলল মুহূর্তের জন্য।

—ওদের আর কি বাবু। ওরা তো চাষ করবে আবার।

—তুমি?

—আমার জমি কই? আর আমি ওসব তো করিনি কোনদিন!

তাহলে? আমি কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।

—বাবু, আমার একটা নিবেদন ছিল!

—নিবেদন!

শুধু কথাটায় নয়, ওর গলার স্বরেই এবার চমকে উঠলাম। অভূতপূর্ব কোমল, অশ্রুতপূর্ব প্রার্থনার সারল্য গলায়!

—কি ব্যাপার?

মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল সে। ভারী মাথাটা নেমে এল। তারপর যেন দ্বিধা ঝেড়ে সবলে আবার মাথা তুলল!

—আপনাদের কলেজে তো একটা ক্যান্টিন হবে। ওটা যদি আমাকে দেন! বাস্তবিক, প্রস্তাবটা এমন অকল্পনীয় যে কিছুক্ষণ চিন্তাশূন্য অবস্থায় রইলাম। মনে পড়ল তারপর, এ ব্যাপারটাও আমার এক্তিয়ার বাইরে।

—এটা জোগাড় করে দিতেই হবে বাবু। নইলে না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

—মারা যাবে!

আমি শুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর শরীরের দিকে তাকালাম। এই বিশ্বাস দেহ না খেতে পেয়ে মারা যাবে, সেও দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, এ কথাও মনে পড়ল। কিন্তু কথাটির তাৎপর্যগত সত্য আমাকে স্পর্শ করল। বলতে কি নিছক মানুষ হিসেবেই একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং আমার মনে হলো!

বললাম,—দেখছি কি করা যায়!

—যাব, আপনাকে একটা কথা বলব!

হরেন। আমাদের কলেজের এক সিওন।

—কি ব্যাপার?

হরেন আমার কাছে সরে এল। তারপর যেন অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলছে, এমন সতর্কতার সাথে বলল,

—সুরেন আপনাকে কিছু বলেছে?

—কে সুরেন? আমি স্পষ্টতঃই রাগ প্রকাশ করলাম।

—ওই যে মাটি কাটার দলের……

—হ্যাঁ।

আমি অনুমানে বুঝলাম কে, কার কথা ও বলতে চাইছে।

—কিন্তু কেন?

—ও, আমার দূর সম্পর্কের ভাই। তাই……

হরেন একটু থামল।

—তাই কি?

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম। অনুমান করলাম বাঙালীর স্বভাব অনুযায়ী এখুনি নিন্দে সুরু করবে। হরেন থতমত খেলো।

—না বলছিলাম কি, ওর তো বাপ মা কেউ নেই, তাই দয়া করে যদি ক্যান্টিনটা ওকে দেন!

—দেখছি। তুমি কাজে যাও।

থামিয়ে দিলাম হরেন কে!

কিন্তু বাধা দিলেন স্বয়ং অধ্যক্ষ।

—আপনি চেনেন ওকে?

প্রায় আমার মুখের উপর চোখ রেখে তিনি বললেন। আমি ঘিয়ায় পড়লাম।

—চিনি মানে দেখেছি আর কি! আর ও তো আমাদের সিওন হরেনের ভাই!

—আমি জানি।

আমি গভীর গাম্ভীর্য ভরলাম অধ্যক্ষের গলায়।

—ওকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি। ও পারবে না কাজ করতে।

—কেন ?

—ও পারে না কাজ করতে। এপর্যন্ত অন্ততঃ দশজায়গায় কাজ করেছে, কোনখানে টিকতে পারে নি।

—কিন্তু কেন ?

আমি আকণ্ঠ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিক কি কারণ আমি বলতে পারবো না। তবে সব জায়গাতেই প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, কোথাও মারামারি অবধি করেছে।

মুহূর্তের জন্ত ওর বাপের চোখ দুটোর কথা মনে পড়ল।

—কিন্তু সব জায়গায় কি ওর দোষেই……

অধ্যক্ষ হাসলেন।

—বলেছি তো কারণটা ঠিক বলতে পারবো না। তবে আমি ওকে নিতে পারবো না।

—আর একবার অন্ততঃ চান্স দিয়ে দেখুন।

—অনেক দিয়েছি। কিন্তু ও সংশোধনের অযোগ্য।

—আমি দায়িত্ব নিচ্ছি ওর।

অধ্যক্ষ বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন।

—বেশ। কিন্তু পরে এর জন্ত আপশোষ করবেন।

তবু আমি অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানালাম।

আমাকে বিবেকের পীড়ন থেকে আপাততঃ তিনি মুক্তি দিলেন।

—বাবু!

ঘুরেন।

কিন্তু আমাকে কিছু বলার অবকাশ দিলো না। হঠাৎ প্রায় উপুড় হয়ে পড়ল আমার পায়ের উপর। আমি সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ালাম।

—কি করছ কি!

—প্রণাম বাবু। আপনি আমাকে বাঁচালেন। ওর বাপের রক্তিম চোখ দুটোয় একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখলাম।

—কিন্তু আর একটা উপকার করতে হবে বাবু!

আবার কি ?

গোটা দশেক টাকা ধার না দিলে দোকান শুরু করতে পারবো না বাবু।

আবার স্পর্ধা। প্রশ্রয় পেলে সত্যি দেখছি এদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

—আমার কাছে টাকা হবে না।

মুহূর্তের জন্ত কণা ফুলল চোখের সরীসৃপ!

—আপনি দশদিনের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবেন বাবু! —আশ্চর্য দৃঢ়তা ওর স্বরে।

টাকা দিলাম।

এবং তারপর দেখতে দেখতে বাস্তবিকই ভারী সুন্দর একটা ক্যান্টিন গড়ে তুলল সুরেন। কলেজ সাহেব হোস্টেলের ছেলেরাও তৃপ্ত মনে হলো। চা খাবার এবং ওর ব্যবহারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও। সেজন্য একদিন আনালামও অধ্যক্ষকে।

বিনিময়ে অধ্যক্ষ হাসলেন,

—ভালো। তবে যার শেষ ভালো তার সব ভালো।

আমিও হাসলাম মনে মনে। সুরেনকে চিনতে এরা বোধহয় ভুল করেছেন।

ঠিকই চলছিল সব। চতুর্দিকই তৃপ্ত। কিন্তু আচমকা একটা কাণ্ড ঘটল একদিন। আর তার ভেতরে আমি যন্ত্রণার মেঘের সম্ভাবনা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

—বাবু, আপনি এর একটা বিহিত করুন।

দীনু গোয়ালা সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

—কি ব্যাপার?

—সুরেন আমার দুধের দাম দেয়নি বাবু আজ ছমাস!

—সেকি!

আমি অকপট বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। ওর বিক্রী তো ভালোই জানি।

—মিথ্যা কথা বলছি না বাবু, আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

অতএব সুরেনকে ডাকলাম।

—একে টাকা দাওনি কেন?

—টাকা কোথায় পাবো বাবু। ছাত্রমহাশয় সব বাকী রেখেছে।

হতে পারে! এবং হিসেবের খাতা প্রমাণ করল ও নিরপরাধ। টাকাটা আদায় করে দিলাম।

কিন্তু আমার শঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হলো না। চাওয়ালা একদিন দরজায় কড়া নাড়লো।

—তোমার কয় মাসের বাকী?

—সাত মাসের টা।

অতএব আবার সুরেন।

—চাওয়ালাকে টাকা দাওনি কেন? ছাত্রদের কাছে বাকি আছে?

—না।

—তবে?

মুহূর্তের মধ্যে কণা ভুলল সেই চোখের দরীসৃপ।

—টাকাটা দিয়ে আমি খেয়েছি।

—খেয়েছো?

বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হলো।

—গাওয়ালাদের টাকা না দিয়ে তুমি খেয়েছো?

—কি করব বাবু!

নির্লজ্জ, স্পষ্ট উক্তি! আমি স্তব্ধাক হলাম। একে আমি কি বলব।

অভিযোগ এল এবার অন্তরঙ্গ থেকে। ছাত্ররা ক্রমাগত বলাবলি করতে লাগল ক্যান্টিন রাখবার কোন মানে হয় না। কেননা সময় মতো চা পাওয়া যায় না, অধিকাংশ সময় দুধ থাকে না!

আমিই যেন এর জন্য দায়ী, আমার এমন মনে হলো! ক্রোধে বিরক্তিতে অসহ্য মনে হলো সুরেনকে!

—কি ব্যাপার তোমার? তোমার জন্য দেখছি আমার সম্মান আর থাকে না কি আরম্ভ করেছ তুমি? কেন দুধ থাকে না দোকানে?

আমার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। আমি ফেটে পড়লাম রাগে।

—এটাও তুমি খাও নাকি?

—হ্যাঁ।

হ্যাঁ!

বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

—তুমি কি পাগল নাকি? তোমাকে যা বেচে খেতে হবে তাই খেয়ে……

—কি করব বাবু!

সেই এক কৈফিয়ৎ। আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম,

—তোমাকে আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি সুরেন। এ অভ্যেস যদি না ছাড়ো তবে আগামী সপ্তাহে উঠে যেতে হবে। আমি সাতদিন সময় দিলাম। কথা তুলল চোখের সরীসৃপ। মুহূর্তের জন্য। তারপর গুটিয়ে নিল। চলে গেল সুরেন।

কিন্তু সপ্তাহও গেল না। একজন ছাত্র হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

—স্যার শিগ্‌গীর চলুন। সুরেনকে ওরা বোধহয় মেরেই ফেলবে।

—কারা?

—পাওনাদাররা। আপনি শিগ্‌গীর চলুন।

অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে জানতাম না। দ্রুত পায়ে ঘটনাস্থলে গেলাম।

—শালা, তুমি চালাকি পাইস? আমার টাকা না দিয়ে পলাইবা ভাবছ? করলাওয়ালার কণ্ঠ।

—হারামজাদার পোলা, তোমারে কাঁচা খাইয়া ফ্যালামু! শয়তান,—ঘুঁটেওয়ালা। (বাস্তবিক, ও কাঁচা বা পাকা কোন অবস্থাতেই খেতে পারবে কিনা এ সময় সন্দেহ হলো আমার।)

—তোমার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবো শালা। আমাকে চেনো না তুমি।

—লাগাও ধোলাই। ধোলাই দিলেই সব টাকা হবে। দুধওয়ালা।

এবং ভয়ংকর ঘুষি আর চড় পড়ছে সুরেনের গায়ে! ছিঃ ছিঃ। টাকা মানুষকে এমন পাশবিক করে এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু কোথায় সুরেনের সেই ঘাসল সরীসৃপের হিংস্রতা!

—এই ছেড়ে দাও ওকে। আমি চিৎকার করলাম। ভীড় সরে দাঁড়ালো। ভয়ে নয় সম্মানে।

—কি হয়েছে কি?

—আমাদের টাকা।

ওদের বিচিত্র চিৎকারে এই দাবী স্পষ্ট হয়ে উঠল বুঝতে পারলাম।

—ঠিক আছে দাঁড়াও।

আমি সুরেনের দোকানে ঢুকলাম। তারপর একে একে সব জিনিসপত্র বের করে দিলাম ছাত্রদের দিয়ে।

এগুলো সব বিক্রী হবে।

ছাত্রদের টাকাও আদায় করা হলো। পাওনাদারেরা সুরেনের সার্টটা অবধি ছাড়তে চাইছিল না।

সুরেনের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। রক্তাক্ত মুখে মাটিতে বসে ছিল। ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে, ব্যথায় ভাঙা মূর্তির মতো।

—ছিঃ।

আমি বললাম,

—শেষে এইভাবে তুমি আমার নাম ডোবালে। এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সুরেন। ছেঁড়া সার্টের হাতায় নাকের রক্ত মুছল। মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠতে দেখলাম চোখদুটোকে এমন মনে হলো! তারপর নীরবে বেরিয়ে গেল আমার সম্মুখ দিয়ে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক আর একবার ব্যর্থ হলো। আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না।

তারপর কত দিন গেছে। আমাদের ভেতরে, কলেজে, দেশে কত পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সুরেনকে আর আমি কোনদিন দেখিনি। হরেনকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে বলে নিরুদ্দেশ হয়েছে কোন খোঁজ পায়নি। মাঝে মাঝে মনে পড়েছে ওর চোখ দুটো। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল বাপদের চোখের মতো। মনে হয়েছিলো ও একটা ক্রিমিনাল। সেটাই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো ভেবে কষ্ট হতো। অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে।

—আমি ওকে চিনতাম। দেখলেন তো শেষ পর্যন্ত!

হ্যাঁ, দেখলাম। কিন্তু কিছুতেই এ ধারণা সত্য হতে পারে এমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মনে হচ্ছে কোথাও যেন আমাদের ভুল হচ্ছে অথবা ওর। হয়তো ও ওর সঠিক স্থান খুঁজে নিতে পারছে না।

ইতিমধ্যে আরো দিন গেছে। আচমকা পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে তার বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে। আর এদেশের মানুষ নতুন উদ্দীপনা উত্তেজনায় অনেক তুচ্ছ ঘটনাই ভুলে গেছে। দেশের শত্রুর সাথে সংগ্রামের প্রস্তুতিতে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে মনের অতলে।

হঠাৎ একদিন হরেন এসে বললো।

—স্যার, আজ একটু আমাদের বাড়ী যাবেন?

—কেন?

আমি বিস্মিত।

—একটা খবর আছে।

—কি খবর?

—সুরেন এসেছে স্যার।

—সুরেন!

বিস্ময়ে আমি উত্তেজিত গলায় বললাম,

—কোথায় ?

—আমাদের বাড়ীতে !

—ওকি করে এখন ?

কিন্তু সে উত্তর পেলাম না হরেনের কাছে। অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললো,

—চলুন তো বাবু।

তাহলে ! আবার কোন বাদেলা বাধিয়ে এসেছে নাকি ! নাকি এবার মেরেই ফেলেছে ওকে। উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় একটু অধীর হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার চারপাশে চেপে বসেছে। হরেনের সাথে ওর বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছি !

—এসে গেছি বাবু।

—কিন্তু। সকলে কাঁদছে কেন ?

আমি স্তম্ভিত পায়ে দাঁড়িয়ে পেলাম। ডুকরে কেঁদে উঠল হরেন।

—সুরেন মারা গেছে বাবু !

—সেকি !

আমার অনুমান এমন সত্য হয়ে যাওয়াতে শিউরে উঠলাম।

—কি করে ?

—আসুন। দেখুন।

হ্যাঁ দেখলাম। সুরেন কোথাও নেই। বারান্দায় পড়ে আছে একজোড়া পোষাক। হ্যারিকেনের মৃদু আলোতেও চিনতে আমার একটুও দেরী হলো না। এ পোষাক সৈনিকের। তবে কি।

—যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে বাবু। ওর পোষাক দিয়ে গেছে আমাদের।

হরেন কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কিন্তু আমি তখন সম্পূর্ণ অন্যভাবনায় ডুবে গেছি। নিজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্য একবার পরাজিত সৈনিকের মতো ওকে পালাতে দেখেছিলাম আর আজ তার একি রূপ। সমগ্র দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়ে সে আজ সে অপরাজিত। মৃত্যুঞ্জয়। হ্যারিকেনের করুণ আলোতে টকটক করছে পোষাকের উপর সুরেনের রক্তের দাগ। ওর সেই রক্তাক্ত চোখের মতো।

আমি স্বাপদ সরীসৃপ বলে ভুল করেছিলাম। ও চোখ সৈনিকের।

ওকে আমি প্রথম দেখি অন্ধকারে। তখন চিনতে পারি নি। আজ এই শেষ দেখলাম আলোতে।

ওকে আমরা সত্যিই চিনতে পারিনি।

বন্দী না বীর ?

গৌরীশঙ্কর দে

১৮৯৬ সালের পয়লা অক্টোবর। লণ্ডনের শরৎকালের সেই বিশ্রী সন্ধ্যা। বেড়ালের হাঁচির মতো বৃষ্টি আর বিরক্তিকর কুয়াশা। চীনদেশীয় এক তরুণ ইউস্টন ষ্টেশনে গাড়ি থেকে নামলো। লিভারপুল বন্দরে মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে 'ম্যাজেষ্টিক' জাহাজ নোঙর করেছে। সে এসেছে ওই জাহাজে। 'ম্যাজেষ্টিক' ছেড়েছে নিউইয়র্ক থেকে। সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময় তরুণ যাত্রীটি নিজের কেবিন ছেড়ে বড়ো একটা বাইরে আসেনি।

যুবকের বয়েস উনিশ কি বিশ। লণ্ডন শহরের পথে মাঝে-মাঝে যে-সব প্রাচ্য ছাত্র চোখে পড়ে, যাদের দেখে মনে হয় অধ্যয়নই তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, চীনা তরুণটিকে মনে হচ্ছিল তাদেরই একজন। পরনে কালো বর্ষার তৈরি পোষাক। নরম লোফ। সুবিন্যস্ত কালো চুল। হাঁটা-চলায় বেশ একটা সাবলীল ক্ষিপ্র ভাব। সৈনিকের মতো।

এই অল্প বয়সেই যুবক বেছে নিয়েছে দুঃসাহসিকতার, দুর্গমতার পথ। চীন-সম্রাটের রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে মাতৃভূমি থেকে। আর ইতিমধ্যেই সে পরিক্রমা ক'রে এসেছে প্রায় সারা দুনিয়া। ম্যাকাও, হংকং, সিঙ্গাপুর, যুকোহামা, বাটাভিয়া, হনলুলু, সান-ফ্রান্সিসকো ইত্যাদি কত জায়গায় যে তাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এবার সে হাজির হয়েছে লণ্ডনে। এখানে আবার কী ঘটে কে জানে! একটা গাড়িতে উঠে প'ড়ে সে কোচোয়ানকে বললো স্ট্রাণ্ড-এ ওয়াল্ডর্ফ হোটেলের দিকে নিয়ে যেতে।

হোটেলে নির্দিষ্ট ঘরখানা দেখে মনে হলো বেশ আরামেই থাকা যাবে। তখনো গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, আগের মতোই কুয়াশা, তবু পূর্বদেশীয় যুবক বেরিয়ে পড়লো পথে। গাড়ি-ঘোড়া, ভিড়, লণ্ডন শহরের মেজাজ তার রমনীয় মনে হ'লো। খুশি মেজাজে ভাবলো ভূতপূর্ব শিক্ষক ডাক্তার জেমস ক্যান্টাইলের সঙ্গে দেখা ক'রে এলে মন্দ হয় না। ডাক্তার ক্যান্টাইল হংকং মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি বিদায় নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন।

ক্যাস্টাইল পরিবারের সবাই তরুণ অতিথিকে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানালো। তাঁদের বাড়ি ৬৩ ডিভনশায়ার ষ্ট্রীটে। পেছনে ছোট একটা বাগান। ভারি সুন্দর। কত কথা যে হলো। তারা কয়েকজন বন্ধুর খবর জানতে চাইলেন। তারা যুবকটিরও বিশেষ পরিচিত। চীন সাম্রাজ্য থেকে তারা যেন কর্পূরের মতোই উবে গেছেন। চীনা যুবকটির সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতার কথা এবং কেন ও কী ভাবে সে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছে, তা শুনে ডাক্তার ক্যাস্টাইলের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। বললেন: "এখান থেকে চীনা দূতাবাস কিন্তু খুব একটা দূরে নয়।"

মিসেস ক্যাস্টাইল বললেন: "পারতপক্ষে দূতাবাসের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। সুযোগ পেলে তোমাকে চুরি ক'রে জাহাজে আবার চীনদেশের দিকে চালান দিতে পারে।"

লণ্ডন শহরের সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিতে পারলো যুবক। যেন নিজের দেশেই আছে। তার পোশাক-পরিচ্ছদ পুরোপুরি য়ুরোপীয়, ইংরেজী বাচন শুদ্ধ। লণ্ডনে এসে তার মনে হলো এতদিন পরে বুঝি উপকূল সে খুঁজে পেয়েছে।

পরদিন সে দেখা করতে গেলো ডাক্তার হেনরী ম্যানসনের সঙ্গে। তিনিও আগে ওর শিক্ষক ছিলেন। চীনা দূতাবাস থেকে দূরে-দূরে থাকবার জন্য তাঁর বাড়ি থেকেও ওকে সতর্ক ক'রে দেয়া হলো। এই সব হুঁশিয়ারীতে যুবক তেমন একটা কান দিলো না। হতে পারে চীনে তাকে এখন ব্যাপক ভাবে খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে লণ্ডনে কে তার খোঁজ পাবে। এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে ক্যাস্টাইল পরিবারের সাহায্যে যুবক গ্রে'স ইন রোডে একটা বাড়িতে এসে উঠলো।

লণ্ডনে পৌঁছাবার এগারো দিন পরে। যুবক যাচ্ছিল ডাক্তার ক্যাস্টাইলের বাড়ির দিকে। তাঁর পরিবারের লোকদের সঙ্গে চার্চে যাবে আগে থাকতে কথা রয়েছে। কিছুক্ষণ হ'লেই একটা কথা মনে হচ্ছিল। অক্সফোর্ড সার্কাসে এসে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইলো না। কে যেন পেছন থেকে ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে আর যে জায়গাটাকে সে প্রাণপণে এড়িয়ে চলেছে সেই পোর্টল্যাণ্ড প্লেস এবং ওই রাস্তায় চীনা দূতাবাস এখান থেকে খুব কাছে। পেছন দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো মাত্র কয়েক হাত দূরে একজন চীনা রাজকর্মচারী। লোকটা যে হঠাৎ এসে পড়েছে তা মনে হলো না। কারণ সে জোরে পা চালিয়ে যুবকের পাশে এসে হাজির হলো। মুখে সৌজন্যের হাসি নিয়ে চমৎকার ইংরেজীতে বললো:

"আপনি চীনা, না জাপানী?"

অপরিচিত প্রশ্ন-কর্তার দিকে তাকিয়ে তরুণটি জবাব দিলো: "আমি চীনা।"

"চীনের কোন অঞ্চলে আপনার বাড়ি, জানতে পারি কি?"

"ক্যাণ্টনে।"

"ও, তাহলে তো আমরা একই দেশের লোক। আমাদের ভাষাও এক। আমার বাড়িও ক্যাণ্টনে।" অজ্ঞাত ব্যক্তি এবার চীনা ভাষায় কথা বলতে লাগলো।

কথা বলতে বলতে তারা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল। ক্যাভেণ্ডিশ ষ্ট্রীটে পৌঁছাতেই আরেকজন

চীনা রাজকর্মচারী হাজির হলো। অতি সাবলীল ভঙ্গিতে এসে দুজনের সঙ্গে ভিড়ে গেলো। নতুন লোকটি যুবকের বাঁ পাশে।

কথাবার্তা চলছিল ক্যান্টনের আঞ্চলিক ভাষায়। নতুন চীনা ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ জানালো: "চলুন, আপনারা দু'জন আমার ঘরে গিয়ে একটু চা পান করবেন।"

যুবক সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো: "খুব দুঃখিত, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ক'য়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে আমার চার্চে যাবার কথা। সময় গেলে অন্য এক সময় আপনার বাড়িতে যাওয়া যাবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন মাটি ফুঁড়ে তৃতীয় একটি চীনার আবির্ভাব ঘটলো। তারো পরনে রাজকর্মচারীর পোষাক। লোকটার মুখের দিকে তাকালেই মনে কেমন বিরূপ ভাব জাগে। যেন যে-কোনো নৃশংস কাজই তার দ্বারা সম্ভব। যুবকটির সঙ্গী দুজনের মুখ থেকে সৌজন্যের মুখোস এর মধ্যেই খসে পড়েছে। দু'দিক থেকে ওরা শিকারের হাত জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেলো রাস্তার এক কোণে। যুবক তাকিয়ে দেখলো ৪৯ পোর্টল্যান্ড প্লেস। ওরা যেতেই দরজা খুলে গেলো। যেন আগে থেকেই বলা ছিল। সিঁড়ি দিয়ে হাঁটিয়ে একটা হলঘরের ভিতরে যুবকটিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

নিমেষের মধ্যে কী যে ঘটে গেলো যুবক বুঝে উঠতে পারছিল না। রবিবারের সাজন শহরে দিনে দুপুরে এ-রকম কাণ্ড! এত দূরে এসেও কি তাহলে সে শেষ পর্যন্ত চীনা গুপ্তচরদের খপ্পরেই পড়লো!

কয়েক মিনিট পরেই সব জানা গেলো। একটা ঘরের ভেতরে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা এঁটে দেয়া হলো। ঘরের ভেতরে মূল্যবান নানা আসবাব।

ঘরের দরজাটা ভারি সুন্দর। তবে তার গায়ে আড়াআড়ি লোহার শিক। আর কোনো সন্দেহ নেই। সে চীনা দূতাবাসে বন্দী। ডিভনশায়ার ষ্ট্রীটে ক্যান্টাইল পরিবারের সবাই তার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবে। তার অনুপস্থিতির কারণ কি তারা খোঁজ ক'রে দেখবে? তারা হয়তো ভাববে সে যেতে ভুলে গেছে। যাক, এ-সব ভেবে লাভ নেই। যুবক শান্ত হবার চেষ্টা করলো।

ঘণ্টা দুই পরে তাকে অন্য একটা ঘরে স্থানান্তরিত করা হলো। যুবক বুঝতে পারলো সে আছে দূতাবাস ভবনের দ্বিতলে। কারণ বারান্দায় যাদের দেখা যাচ্ছে তারা সকলেই চীনা আর অনেকেরই পরনে রাজকর্মচারীর পোশাক। দুজন চীনা এসে তার জামা প্যান্টের পকেট হাতড়ে ঘড়ি, কাগজ-পত্র ইত্যাদি সব বের ক'রে নিলো। অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এই ঘরটি ত্রিতলে। ছোট ছোট জানালাগুলিতে মোটা-মোটা লোহার শিক বসানো। বাইরে তাকালে চোখে পড়ে, কুয়াশা আর ধোঁয়া। আর তার ভেতরে অস্পষ্ট ভাবে প্রতিবেশী কয়েকটি বাড়ির ছাদ আর চিমনি।

যে ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতার সঙ্গে তাকে চুরি ক'রে আনা হয়েছে আশ্চর্য হয়ে যুবক তার কথাই ভাবছিল। হঠাৎ দরজাটা বাইরে থেকে খুলে গেলো। দীর্ঘ-দেহী, শ্বেত-কেশ একজন ইংরেজ কামরাতে এসে ঢুকলেন। পরে যুবক জেনেছিল তিনি ব্যারিষ্টার স্যার হ্যারিডে ম্যাকার্টনী। চীন সরকারের পরামর্শদাতা এবং আইন উপদেষ্টা।

বললেন: "শুনুন, আপনি এখন চীনদেশের মাটিতে। চীনের আইনের আওতায়। আপনার নাম?"

বন্দী নাম বললো।

ইংরেজ ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন: "দেখুন, আপনাকে আমরা ভালো রকমই চিনি। আপনার নাম সান ওয়েন।"

সংস্কারের জন্য আবেদন, রাজনৈতিক পুস্তিকা, ম্যানিফেস্টো ইত্যাদিতে যুবক এই নামই ব্যবহার করেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোক আবার বললেন: "আর লুকিয়ে লাভ কি! আপনার সব গতিবিধি আমাদের নখদর্পণে। আমেরিকা থেকে আগেই আমরা খবর পেয়েছিলুম আপনি "ম্যানিলিক" জাহাজে শাঙ্ঘাই আসছেন। চীনের রাজার অনুরোধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"গ্রেপ্তারের কারণ জানতে পারি কি?"

"সে তো আপনি নিজেই ভালো ক'রে জানেন। আপনার কাণ্ড-কারখানায় চীনের সম্রাট এবং চীনের সরকার অসন্তুষ্ট।"

কয়েদী চুপ ক'রে রইলো। স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে যে বিপদ দেখা দিতে পারে তা জেনে শুনেই তো সে বিপ্লবের পথে পা দিয়েছে। এই আন্দোলন যে চীন সম্রাটের চোখে গর্হিত অপরাধ তাতো সে জানেই।

"সম্রাটের পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত আপনাকে এখানে বন্দী অবস্থায়ই থাকতে হবে।"

সম্রাটের পরবর্তী আদেশ যে কী হবে তা কল্পনা ক'রে নিতে যুবকের একটুও কষ্ট হলো না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একজন জল্লাদ, তার হাতে চকচকে তরবারি।

"আমি দূতাবাসে রয়েছি এ-খবরটা কি আমার ইংরেজ বন্ধুদের জানাতে পারি?"

"না, আপনি তা পারেন না। বরং আপনার বাড়ি-আলাকে একটা চিঠি দিলে আপনার জিনিস-পত্র আমরা এখানে পৌঁছে দিতে পারি।"

কয়েদী রাজী হলো। তার হ্যান্ডিতে আর কোনো কথা না ব'লে চ'লে গেলেন। যুবক আবার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

ঘণ্টা-খানেক পরে একটা ভয়াবহ শব্দ শুনে যুবক চমকে উঠলো। মিস্ত্রিরা তার ঘরের দরজায় আরেকটা তালা লাগাবার ব্যবস্থা করছে। তাছাড়া জানতে পারলো তার ঘরের সামনে দু'জন প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা অনবরত নজর রাখবে। ক্যান্টনের আঞ্চলিক ভাষায় প্রহরী দুজন কথা বলছে শুনে কয়েদীটি কবাটের ফাঁক দিয়ে তাদের ডেকে কথা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা সাড়া দিলো না। উপরন্তু দরজা খুলে তার পকেট হাতড়ে চাবি, ছুরি ইত্যাদি নিয়ে নিলো। পকেটের টাকা-কড়িতে কেবল ওদের হাত পড়লো না।

দিনে আর বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটলো না। সন্ধ্যার একটু আগে প্রহরীরা তার কাছ থেকে জানতে চাইলো সে কী খাবে। শারীরিক এবং মানসিক দুদিক থেকেই তখন সে বিপর্যস্ত। আনাজো এক গ্লাস দুধ হলেই তার চলবে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দুজন ইংরেজ চাকর এসে ঘর ঝাঁট দিলো, কার্বলাইজ করলো এবং কাঠ সাজিয়ে রাখলো। কিন্তু ঘরের ভেতরে যে একজন মানুষ আছে তা যেন ওদের চোখেই পড়লো না। হয়তো ওদের উপরে কর্তৃপক্ষের সে-রকম আদেশই আছে।

সারারাত কেটে গেলো অদ্ভুত অস্থিরতায়। যে বিছানায় ওকে শুতে দেয়া হয়েছে তা খুবই আরামদায়ক। তবু জামা-কাপড় ছেড়ে ভালো ক'রে শোবার ইচ্ছা তার একবারো হলো না। সে

সবই শুনতে পাচ্ছে : দরজার ওধারে প্রহরীদের কথাবার্তা, জানালার বাইরে নৈশ মহানগরীর বিচিত্র ধ্বনি, ঘোড়ার গাড়ির আসা-যাওয়া, ঘোড়ার খুর আর গাড়ির চাকার শব্দ। নানা-রকম অবাঞ্ছিত চিন্তা মনে ভিড় ক'রে আসছে। মরতে সে ভয় পায় না। কিন্তু তা বলে এ-রকম ফাঁদে প'ড়ে নির্বোধ ইঁদুরের মতো মৃত্যু! ম্যাকার্টনীর মতো একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এক সামন্ত, স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে কাজ করছেন কেমন করে, এ প্রশ্নটা তার মনে বারবার ঘুরে এলো।

পরের দিন ভোরে বন্দীর মুখ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে দেখালো। কিন্তু তার বুদ্ধি হয়ে উঠেছে আগের দিনের চাইতেও অনেক তীক্ষ্ণ। পালাবার সব রকম চেষ্টাই একবার করে দেখতে হবে এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রথমে দেখতে হবে ঘুষ দিয়ে কিছু হয় কি না। কিছু সময় পাওয়াও তীব্র দরকার। চীনা দূতাবাস এড়িয়ে চলার জন্য তার বন্ধুরা তো হাজারবার বারণ করেছিল। যখন তারা দেখবে সে নিখোঁজ তখন নিশ্চয়ই এখানে এসে সন্ধান করবে।

এই দিন তার সঙ্গে যে প্রথম দেখা করতে এলো সে তার ১নং অপহরণকারী। এই লোকটাই সেদিন প্রথম তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল। আজ সে জানালো তার নাম তাং। চীনা দূতাবাসের সে একজন সেক্রেটারী।

তাং বললো : "তোমার নাম যে লান ওয়েন এই বেলা তা স্বীকার করেই ফেলো। তুমি যাতে চীনে ফিরে যেতে পারো তার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে।"

তারপর গলায় বিদ্রূপ মিশিয়ে বললো : "দেখে তুমি তো খুবই বিখ্যাত। সম্রাট তোমাকে ভালো করেই চেনেন, তোমার কাজ-কর্মের খবর রাখেন। আরো বিখ্যাত হবার সুযোগ তোমার এসেছে। জীবনের কী সুন্দর সমাপ্তি! সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যু-বরণের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে চলেছে। এইভাবে মরে গিয়ে তুমি যে একজন খাঁটি হিরো হয়ে উঠবে সে।"

অপহরণকারীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি আঁচ করবার জন্য কয়েদী ব'লে উঠলো : "কেন ব'রেই নিচ্ছেন যে আমি মরতে যাচ্ছি? এটা তো ঠিক যে আমি এখন আছি স্বাধীন দেশ ইংল্যাণ্ডে চীনদেশে নয়। এখানে যতদিন আছি সত্যি কি আপনারা আমার ক্ষতি করতে পারেন? অবশ্য এই দূতাবাসের ভেতরেই আমাকে শেষ ক'রে ফেলতে পারেন। তা খুবই সহজ। কিন্তু কোনো রকম বিচার না ক'রে এ-রকম ব্যাপার এ-দেশে হত্যাকাণ্ড বলেই ধরা হবে। আর এই সব ব্যাপার তো শেষপর্যন্ত চাপা থাকে না, কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশ পাবেই। ব্রিটিশ সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পড়ার ইচ্ছা নিশ্চয়ই আপনাদের নেই? আপনারা আমাকে এখানে বহুদিন কয়েদ ক'রে রাখতে পারেন। কিন্তু টের পেলে ব্রিটিশ সরকার তা-ও সহ্য করবেন না। জানেন তো, ইংল্যাণ্ড বহু আগে থেকেই রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত ব্যক্তিদের আশ্রয় দিয়ে আসছে?"

দূতাবাসের সেক্রেটারীর মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠলো : "ওই সব আটক রাখা টাকার মধ্যে আমরা নেই। ও-রকম বোকামীর কাজ আমরা কখনোই করবো। না এই মুহূর্তেই সাউথাম্পটনে একখানা ফ্রেইটার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। দূতাবাস থেকে তোমাকে জাহাজে চালান দিতে আমাদের কোনো রকম কষ্টই হবে না। এরপরে তোমার হাতে পায়ে শেকল পরানো হবে। হংকং-এ পৌঁছাবার আগেই একটা পানবোট এসে তোমাকে নিয়ে যাবে ক্যাণ্টনে। সেখানেই তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

"বিচার না করেই বোধহয়।"

"তা নয়, অনুষ্ঠানে সব ঠিকই পালন করা হবে। প্রথমে বিচার, তারপর শিরশ্ছেদ।"

"কিন্তু আমি তো এখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করতে পারি।"

"সে গুড়ে বালি। সব পথ বন্ধ।"

"কিন্তু যে জাহাজে ক'রে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে কি আর অফিসার আর নাবিকেরা থাকবে না? তেকে দোকজনও তো থাকবে। তারা কি আর কিছুই টের পাবে না?"

তার কথায় তাং একটুও বিচলিত হলো না। জানালো, জাহাজের মালিকেরা সবাই তার হ্যালিডে-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে উৎসুক। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা পারতপক্ষে ঘটতে দেবে না।

তাং-এর সঙ্গে যত আলাপ চালানো যাবে ততই ষড়যন্ত্রের কথা জানা যাবে, এমনকি পালাবার উপায়ও বেরিয়ে পড়তে পারে, কয়েদীর এ-রকম মনে হলো। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদেরই আয়ত্তাধীনে এ-রকম দৃঢ় বিশ্বাসে তাং-ও সব পরিকল্পনা নিজে থেকেই ব'লে যেতে লাগলো। যেমন তাং বললো প্লেন লাইনের একটা চীনারে করে তাকে আসছে সপ্তাহেই এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তার 'আপ্যায়নের জন্ত' চীন সরকার আয়োজনের কোন রকম ত্রুটিই রাখেন নি।

কয়েদী বললো: "সমস্ত ব্যাপারটা কেমন জটিল মনে হচ্ছে। কোথাও একটু গোলমাল হলেই গোটা পরিকল্পনাই যাবে ভেস্তে।"

তার রসিকতায় তাং সাড়া দিতে পারলো না। নির্বিকার মুখে সে বললো: "তুমি তো বেশ চতুর লোক, তোমাকে আর কী বলবো! চতুর হয়েও সরকারের অনুগত নও, কেবল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখো, এই হলো তোমার দোষ। তুমি ঠিকই বলেছো। সমস্ত ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে তোমাকে এই দূতাবাসের ভিতরেই খতম করে ফেলতুম। দুঃখের বিষয় তা নেই। সম্রাটের হুকুম, তোমাকে চীনদেশে পাঠাতে হবে। সম্রাটের ইচ্ছা।"

তাং আরো জানালো যে, যুবককে এইভাবে ধরিয়ে দেবার জন্ত তাং-এর নিশ্চিত পদোন্নতি ঘটবে।

কয়েদী শুধালো: "আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?"

"এ হলো গিয়ে সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর আদেশ ছিল, যে ক'রেই হোক তোমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, যে কোনো মূল্যে। আর জ্যান্ত ধরতে পারলেই ভালো।"

বন্দীকে এতটুকুও বিচলিত মনে হলো না। যেন তার নয়, অন্ত কারুর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে। আগের মতোই শান্ত গলায় বললো: "কিন্তু একদিন তো আপনাকে দেশে ফিরতেই হবে। আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছেও আপনার দুষ্কৃতি অজানা থাকবে না। তখন যে তারা আপনার পরিবারের লোকদের কোতল করে বদলা নেবে।"

কথাটা শুনে তাং-এর মুখ শুকিয়ে গেলো। সে আমতা-আমতা ক'রে বললো: "আমার কোনো দোষ নেই। আমি কেবল সম্রাটের হুকুম মেনে চলছি। তা করতে গিয়ে যদি কিছু অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্ত ক্ষমা চাচ্ছি। আর একটা সৎ পরামর্শও দিচ্ছি।"

একটু থেমে তাং বললো: "এখনো তোমার বাঁচার কিছু আশা আছে। তুমি ব্রেক ধরে

দেবে ক্যাপ্টেনের ষড়যন্ত্র কিংবা সংস্থার আন্দোলনের সঙ্গে তোমার কোনো-রকম যোগ-সাজস ছিল না। যারা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, সেটা তাদের উপরেই চাপিয়ে দেবে। বলবে, চীনা রাজকর্মচারীরা তোমাকে ফাঁদে ফেলেছিল। বলবে, নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার জানবার জন্য নিজের ইচ্ছাতেই তুমি দূতাবাসে এসেছিলে।"

উপায়ান্তর না দেখে করেদীটি সেই ভাবেই একটা চিঠি লিখে দিলো। সে আশা করছিল এতে হয়তো ওদের মন ভিজবে। চিঠিটা হাতে পেয়ে তাং-এর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এর পরে আর কোনোদিন তাং-এর টিকিটাও দেখা যায় নি।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু বুঝতে পারলে চিঠি লিখে দিয়ে সে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছে। নিজে ইচ্ছে ক'রে দূতাবাসে এসেছে—এ-কথা কেন সে লিখতে গিয়েছিল ? নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেরই হাত-পা কামড়াবার ইচ্ছা হলো। এর ফলে দূতাবাসের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত কোনো ব্যবস্থা নেয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে হয়তো আর সম্ভব হবে না।

দিন যতই কেটে যাচ্ছে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বন্দীর মন ততই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। জানালা-পথে যে-টুকু চোখে পড়ে তা দেখে মনে হয় বিশাল জগৎ যেন অনবরত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যেন-তেন প্রকারেন মুক্তি পেতেই হবে। গোপনে বন্ধুদের কাছে দুবার চিঠি লেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও কোনো চাকরকে সে-চিঠি নিয়ে যেতে রাজী করানো গেলো না। যদি কোনো পথচারীর চোখে প'ড়ে যায়, এই আশায় ছোট-ছোট কাগজে নিজের অবস্থা জানিয়ে সে জানালা দিয়ে ফেলে দিলো। কিন্তু প্রথম বারের কাগজগুলি বাতাসে উড়ে গিয়ে পড়লো একটা নর্দমার ভিতরে। নিজের চোখে দুবার ছোট চিঠিগুলির পরিণতি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

রাস্তার উপরেই যেতে গিয়ে পড়ে সেই জন্য পরের চিঠিগুলির সঙ্গে বেঁধে দিলো তারার পয়সা। একটা গিয়ে পড়লো পাশের বাড়ির বাগানে। দ্বিতীয়টি ৫৩নং বাড়ির ছাদে আর তৃতীয় এবং শেষ চিঠিটি রাস্তায় পড়লো বটে, কিন্তু দূতাবাসের প্রহরীদের নজর এড়াতে পারলো না।

নিজের দুর্দশার প্রতি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ এরপরে একেবারেই রইলো না। দূতাবাসের কয়েকজন ভৃত্য ঘরে ঢুকে জানালার গায়ে তক্তা এঁটে দিলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেলো ঘর। অবস্থাটা হলো আগের চাইতেও শোচনীয়। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল ওই জানালাটা। সেটাও বন্ধ ক'রে দেয়াতে পৃথিবী থেকে করেদীটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

বন্দী জীবনে দীক্ষিত হয়েছিল একেবারে বাল্য বয়সে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে সে বন্দী-জীবনের দুঃখ ভুলে থাকার এবং সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বেশ কয়েক ঘণ্টা তার কেটে যেতো প্রার্থনায়। তার তো এখন অন্ধের মতো অবস্থা ; দিন কি রাত্রি জানবার উপায় নেই। কখন ভোর হয়, কখনই বা সন্ধ্যা আসে তা সে জানে না। আকাশের সূর্য আর মানুষের ঘড়ি দুই-ই এখানে অনুপস্থিত। কতদিন কেটে গেলো কে জানে ! এই ঘরে তো চিররাত্রি ; যেন হৃদয়েরো ঘন তমসা। তার একমাত্র আলোর উৎস এখন ঘরের এক কোণে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।

যে ইংরেজ চাকর দুটি রোজ তার ঘর পরিষ্কার করে, তার খাবার দিয়ে যায়, আগুন

আলাবার করলা সাজিয়ে রাখে, তাদের একবার কাতর অনুরোধ করলে কেমন হয়। এই বোধহয় এখন তার বাঁচবার একমাত্র উপায়। লোক দুটো কাজ ক'রে যায় একেবারে যন্ত্রের মতো, তার সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, তাকে দেখেও যেন দেখে না। তবে চাকর দুজনের ভিতরে যার বয়েস কম তার মুখে যেন একটু দয়া-মায়ার ভাব আছে। তার মাথা এডওয়ার্ড কোলে। একদিন ভোরে মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে কয়েদী তাকে বলেই ফেললো :

"স্যার, আমার একটু উপকার করবেন ?"

চাকরকে 'স্যার' বলা! লোকটা রীতিমতো চমকে তার দিকে তাকালো, যেন এই প্রথম সে কয়েদীটিকে দেখতে পেয়েছে। ভয়-ভয় নিচু গলায় শুধালো : "আপনি কে ? আমাকে আপনি কী করতে বলেন ?"

"আমি রাজনৈতিক কারণে চীন থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। ব্রিটিশ সরকার আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এই আশায় ইংল্যাণ্ডে এসেছিলুম। আপনি যেমন আমিও তেমনি একজন খ্রীষ্টান। খবরের কাগজে বোধহয় দেখেছেন তুরস্কের সুলতান আর্মেনিয়ার খ্রীষ্টানদের হত্যা করছেন। আমি খ্রীষ্টান ব'লে চীনের সম্রাট আমাকে হত্যা করতে চান। আমি যে পার্টির সভ্য তার লক্ষ্য দেশে সুশাসন এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কারুর ক্ষতি আমি করিনি। কৌশলে আমাকে এখানে আটক ক'রে রাখা হয়েছে।"

কয়েদী যে-ভাবে কথা বলছিল তাতে প্রহরীদের গুলে ফেলবার সম্ভাবনা। কিন্তু উপায় কি ! লোকটার মন ভেজাতে হবে তো।

কোলে কিন্তু তার কথার জবাব সঙ্গে-সঙ্গে দিলো না। আগের মতোই ব্যস্ত হাতে ঘর ঝাঁট দিতে থাকলো। তারপর নিচু গলায় বললো : "জানি না ব্রিটিশ সরকার আপনাকে সাহায্য করতে রাজী হবেন কি না। আপনি যে বিদেশী, আর এই দুভাবাসের যারা তারাই তো আপনার দেশী লোক।"

সংকটের মুখে এসে কয়েদীর বুদ্ধি তখন ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। তার এই মুহূর্তের উত্তরের উপর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে জেনে সে ব'লে উঠলো : "ব্রিটিশ সরকার আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। তা জেনেই তো এরা আমাকে এমন ভাবে জোর ক'রে আটকে রেখেছে।"

চাকরটি আবার নিজের মনে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। তার মনে সহানুভূতি জেগেছে, না কি সে কয়েদীর দুঃখের প্রতি এখনো উদাসীন তা জানা গেলো না। বন্দী অনুনয় ক'রে বললো : "স্যার, আমার জীবন এখন আপনার হাতে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যদি একবার আমার অবস্থাটা একটু জানানো যায় তাহলেই আমি বেঁচে যাই। না হলে আমার প্রাণ যাবে। একজন মানুষ মরে যাচ্ছে এ দেখার চাইতে তাকে বাঁচানো কি অনেক ভালো কাজ নয় ? উপর-আলার হুকুম তামিল করা নিশ্চয়ই কর্তব্য, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কর্তব্য হলো একজন খ্রীষ্টানের জীবন রক্ষা করা। কী বলেন ?"

কোলে-এর কাছে এই ভাবে, এই ভাষায় এর আগে আর কেউ আবেদন করেনি। তার মনে আলোড়ন উপস্থিত হলো। বাইরে কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলো না। বশংবদ একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো ঘরের কাজ শেষ ক'রে চুপচাপ চলে গেলো।

বন্দীর আরেকটি বিনিদ্র রাত্রি কোনোক্রমে অতিবাহিত হলো। কোলে-এর মন কি সত্যি বিচলিত হয়েছে—নাকি বন্দী যা কিছু বলেছে সবই সে ফাঁস ক'রে দেবে কর্তাদের কাছে ?

রাত্রি শেষ হলো। কোলে সকালের খাবার নিয়ে এলো। টেবিলের উপর খাবারটা রেখেই তাড়াতাড়ি স'রে পড়লো। যেন ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেলো বন্দীর করুণ দৃষ্টি। সন্ধ্যাবেলা যখন এক-পাত্র করলা রেখে গেলো তখনো একটি কথাও বললো না। কেবল ইসারায় পাত্রটা দেখিয়ে দিয়ে স'রে পড়লো।

করলার টুকরোর মাঝখানে ভাঁজ করা একখণ্ড সাদা কাগজ। বন্দী ব্যগ্র হাতে কাগজখানা ছোঁ মেরে তুলে এনে পড়লো :

"আপনার চিঠি পুলিশের কাছে নয়, আপনার বন্ধুদের মধ্যে কারুর কাছে পৌঁছে দিতে রাজী আছি। চিঠিটা আবার টেবিলে ব'সে যেন লিখবেন না ; কারণ দরজার ফুটো দিয়ে প্রহরীরা দেখে ফেলতে পারে। বিছানায় বসে যদি লেখেন তাহলে বাইরে থেকে কেউ আর দেখতে পাবে না।"

বন্দী বিছানায় শুয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে একটা পুরোনো ময়লা ভিজিটিং কার্ডের উপরে একটুকরো পেন্সিল দিয়ে ছোট একটা চিঠি লিখলো :

ডাক্তার জেমস ক্যাণ্টাইল

৪৯, ডিভনশায়ার ষ্ট্রীট

যে বার্তা-বাহককে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি তার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কারণ আমার উপকার করতে গিয়ে তার চাকরীটি চ'লে যেতে পারে। গত রবিবার আমাকে চুরি ক'রে এনে চীনা দূতাবাসে আটক করা হয়েছে। আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে চীনে আমাকে গোপনে পাচার করা হবে। আমাকে সত্বর উদ্ধার করুন। চীন দেশে আমাকে চালান দেবার জন্য এর মধ্যেই একটা জাহাজ পর্যন্ত ঠিক করা হয়ে গেছে। সারাটা পথ আমাকে রাখা হবে হাতে পায়ে শিকল এঁটে ; পৃথিবীর কারুর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় আমার থাকবে না। কী দুর্ভাগা আমি।"

কোলে এই চিঠিটি কিন্তু বন্দীর বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিলো না। তার বদলে নিজে একটা চিঠি লিখে সে-টা দিয়ে এলো। সেই চিঠিটার ভাষা এ-রকম :

"গত রবিবার থেকে চীনা দূতাবাসে আপনার একজন বন্ধু অন্তরীণ অবস্থায় রয়েছে। এরা তাকে চীনে পাঠাবে বলে মনস্থ করেছে ; আর সেখানে পাঠাবার অর্থই হলো বন্দীকে বধ করা হবে। বন্দী সত্যি দুর্ভাগা। এক্ষুনি তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা না হলে এখান থেকে তাকে পাচার করা হবে, আর কেউ তা জানতেও পারবে না। চিঠিতে নাম সই করার সাহস আমার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি যা লিখেছি তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। যা করবেন খুব তাড়াতাড়ি করবেন ; বিলম্বে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। যতদূর জেনেছি বন্দীর নাম লিন ইয়েন সেন।"

অন্যান্য শনিবারের মতো সেই শনিবার রাত্রিতেও ক্যাণ্টাইল পরিবার ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে ছিল, কেউ বা বই পড়ছিল। এমন সময় চিঠিটা হাজির হলো। পরিচিত চীনা ভদ্রলোকটিকে কয়েকদিন দেখতে না পেয়ে ওদের মনে খটকা লেগেছিল ঠিকই। তবে, ওরা ভেবেছিল যুবকটি তো একটু খেয়ালী প্রকৃতির ; দু' তিন দিন পরে নিশ্চয়ই আবার সে দেখা করতে আসবে। তখন তার হঠাৎ এ-রকম অনুপস্থিতির কারণটাও জানা যাবে।

ক্যাপ্টাইল বুঝতে পারলেন যা করার তাঁকে অবিলম্বে করতে হবে। তিনি তেমন বিদ্বান অধ্যাপক। তন্ত্র, গুপ্তচর, মানুষ চুরি, রাজনীতি, কূটনীতি—এই সব বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না। কেবল তিনি জানতেন তাঁর ছাত্র ডে ম্যাকার্টনী চীনা দূতাবাসের আইন-উপদেষ্টা। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করবেন ব'লে ক্যাপ্টাইল স্থির করলেন। প্রথমেই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত—এ-কথাটা একবারও তাঁর মনে এলো না। তিনি জানতেন কাছেই—নং হাসী প্লেসে ধূসর পাথরের তৈরি চারতলা মস্ত একটা বাড়িতে তাঁর ছাত্র থাকেন। গিয়ে দেখলেন উঁচু দোতলার বসবার ঘরটার ভালা খুলছে, প্রত্যেকটি জানালার খড়খড়ি নামানো। সপ্তাহ শেষে বাড়ির মালিক বোধহয় গ্রামে বেড়াতে গেছেন।

তাড়াতাড়ি মেরিলীবোর্ন রোডের কর্তব্যরত কনস্টেবলটি উদ্বিগ্ন-মুখ ভদ্রলোকটিকে জানালো, বাড়িটা অন্ততঃ ছ'মাস ধ'রে এ-রকম বন্ধ রয়েছে। নিকটবর্তী থানায় খবর দেবার কথা এইবার ডাক্তার ক্যাপ্টাইলের মনে হলো। একজন পুলিশ ইনস্পেকটর সব কথা শুনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাবার পরামর্শ দিলেন।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের উর্ধতন কর্মচারীরাও বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন। কিন্তু গল্পটা এমনই অবিশ্বাস্য আর আজগুবী যে তাদের ধারণা হলো ডাক্তারের মাথার বোধহয় গোলমাল আছে। তারা অবশ্য ডাক্তারের বিবৃতি টুকে নিলেন এবং ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে স্থির করলেন। সেদিন মধ্যরাত্রে বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত শুধু এইটুকু কাজই ডাক্তার ক্যাপ্টাইল করতে পারলেন।

পরদিন ভোর আটটাতেই কিন্তু তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গেলেন এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। তারা দুজনে মিলে বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির করলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যদি কিছু করতে না পারে তবে ব্যক্তিগতভাবে কারুর মারফৎ দূতাবাসে খোঁজ-খবর নেয়াই সমীচীন হবে।

হাসি প্লেসে ক্যাপ্টাইল আরেকবার গেলেন। তাঁর ছাত্রের বাড়ির দরজা জানালা আগের মতোই বন্ধ।

বাড়িতে যখন ফিরলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, অস্বাভাবিক হাঁটাহাঁটিতে পা দুটো টন-টন করছে। বাড়িতে ফিরে দেখলেন কোলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনলেন।

তাঁর ছাত্রের বাড়ি থেকে কীভাবে বিফল হয়ে ফিরেছেন সে-কথা জানাতেই কোলে অবাক হয়ে তাকালো। তাঁর ছাত্র তো লণ্ডন শহরেই আছেন, চীনা দূতাবাসে তিনি রোজই প্রায় একবার ক'রে যান। কোলে জানালো, ঘটনাটায় তাঁরও হাত আছে বলে মনে হয়।

এই কথা শুনে ডাক্তার ক্যাপ্টাইল বুঝলেন তিনি যা ভেবেছিলেন ব্যাপারটা তার চাইতেও জটিল। ম্যাকর্টনী-র মতো ব্যক্তির প্রভাব আর প্রতিপত্তি যে লণ্ডনে কতখানি তা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

কোলে আরো জানালো, মঙ্গলবার কয়েদীকে জাহাজে ক'রে চালান দেওয়া হবে। এই বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য একজন ক্যাপ্টেন আর জন তিরিশ নাবিক দূতাবাসে এসেছে।

তার মানে, যা কিছু করার তা করতে হবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ডাক্তার ক্যাপ্টাইল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমব্যবসায়ী বন্ধু ডাক্তার মানসনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে গেলেন। দুজনে মিলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে হাজির হলেন সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে আরেকবার আবেদন করতে।

কর্তব্যরত কর্মচারীটি সব কথা শুনলেন। রেজর্ড বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে বললেন: "শনিবার রাতে তো আপনারাই এসেছিলেন ? তারপর থেকে এমন কোনো নতুন তথ্য আমাদের হাতে আসেনি যাতে আপনার গল্প আমরা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারি।"

উপায়ান্তর না দেখে দুই ডাক্তার সরাসরি গিয়ে হাজির হলেন বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু ওঁদের ভদ্র ভাষায় জানানো হলো, মন্ত্রণালয়ের কেরানীটি এখন খুব ব্যস্ত, বিকেল পাঁচটার আগে তিনি দেখা করতে পারবেন না।

পাঁচটা পর্যন্তই ওঁরা অপেক্ষা করলেন। কেরানীর সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু সব শুনে তিনি বললেন: "আজ যে রবিবার, আজ কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে কাল ভোরে আমি উপর-আলাদের ব্যাপারটা জানাবো।"

দুই ডাক্তার হতাশ হয়ে পড়লেন। চীনারা যদি ওদের প্লান বদলে একদিন আগেই কয়েদীটিকে পাচার ক'রে দেয় ? দ্বিগুণ সংহাইকে গালাগাল দিতে ইচ্ছা হলো। দিনটা রবিবার ব'লে ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত আইন-কানুন যেন একেবারে অচল হয়ে পড়েছে ; চারদিকে এখন মরের মুলুক।

দূতাবাসের কর্মচারীটি বুঝিয়ে দিলেন যে, ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো। কূটনৈতিক শিষ্টাচার, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বাঁচিয়ে তবে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই ক্ষমতা উপস্থিত কর্মচারীটির নেই। কাজেই তাদের দুজনকে অন্তত: একদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

ওঁরা দুজন কিন্তু অত সহজে নিরাশ হবার পাত্র নন। দূতাবাসের বাইরে গিয়ে ওরা পরবর্তী কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললেন। চীনা দূতাবাসে নিজেরা গিয়ে খোঁজ নিলেই তো হয়। ডাক্তার ক্যাস্টাইলের না যাওয়াই ভালো, কারণ তাঁকে সবাই ভালো করেই চেনে। ডাক্তার ম্যানসনের সেই অসুবিধা নেই, তিনি যাবেন। দূতাবাসে ঢুকবার পর যদি এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি বাইরে চলে না আসেন তবে ডাক্তার ক্যাস্টাইল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দেবেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় ডাক্তার ম্যানসন ৪৯নং পোর্টল্যাণ্ড প্লেসের দরজার কলিং বেল টিপলেন।

দরজা খুললো একজন ইংরেজ প্রহরী। ডাক্তার ম্যানসনকে নিয়ে গিয়ে সে বসালো একটি সুসজ্জিত কামরায়। কামরার দেয়াল সোনালি রুপোলি পর্দায় ঢাকা। ঘরের এক কোণে ব্রোঞ্জের একটি বুদ্ধমূর্তি এবং চীন-সম্রাটের এক বিশাল প্রতিকৃতি।

দূতাবাসের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীর সঙ্গে ডাক্তার ম্যানসন দেখা করতে চাইলেন। জানালেন, "জীবন দরকার।" একটু পরেই তাং এসে ঘরে ঢুকলো। সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাঁর এখানে আসার কারণ জিগেস করলো।

"আমার একজন বন্ধু, চীনে মেডিকেল কলেজে যখন পড়াতুম সেই সময়কার আমার একজন ছাত্র, এই দূতাবাসে তাকে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছে ? তার সঙ্গে আমি এক্ষুনি দেখা করতে চাই।"

কথাটা শেষ হবার আগেই তাং-এর মুখ পাথরের মতো কঠিন, ঠাণ্ডা আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। বললো: "দূতাবাসে কোনো কয়েদীই নেই। আপনি যে যুবকের সঙ্গে দেখা করতে চান তার নাম ?"

"লান ওয়েন।"

"এই নামে কোনো লোকই আমাদের এখানে নেই।"

"আমি তো জানিই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর বৈদেশিক দপ্তরও খবর রাখে যে এখানে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে।"

তাং-এর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। উত্তেজিত আগন্তুককে সে বুঝিয়ে দিলো যে, মোটা ব্যাপারটাই একেবারে অবিশ্বাস্য। কেউ বোধহয় ডাক্তারকে নিয়ে বিশ্রী রকমের একটা ঠাট্টা করছে। তাং এমন ক'রে বললো, ডাক্তার ম্যানসনের মনে হলো সে-ই ঠিক কথা বলছে। তার কথাই ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন। আধঘণ্টা পরে যখন তিনি ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের কাছে ফিরে এলেন তখন তাং-এর কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, মোটা ব্যাপারটাই একটা, বুজরুকি। কেউ নিশ্চয়ই ডাক্তারকে নিয়ে তামাশা করেছে। চীনা দূতাবাসের লোকেরা এই বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না।

তাঁর কথা শুনে ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের উদ্বেগ কিন্তু আরো বেড়ে গেলো। বন্ধুর ব্যাখ্যা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। বরং তাঁর মনে হলো দূতাবাসে এসে তাঁরা তরুণ বন্ধুটির বিপদ আরো বৃদ্ধি করেছেন। তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে কয়েদীকে পাচার ক'রে ফেলবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিযুক্ত করলে কেমন হয়। দূতাবাস থেকে কয়েদীকে সরাবার চেষ্টা করা হয় কিনা সেদিকে সে লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আজ যে রবিবার, ভিক্টোরীয়ান রবিবার। কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভকেই আজ পাওয়া যাবে না।

ক্যাণ্টাইল আবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাতর অনুরোধ জানালেন দূতাবাসের উপর নজর রাখবার জন্য একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে। কিন্তু তারা জানালো, দূতাবাস যেখানে সেই জায়গাটা তাদের এলাকার বাইরে। ওরা তাঁকে পরামর্শ দিলো ওয়েস্ট এণ্ড ষ্টেশনে যেতে।

ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের মুখে ঘটনাটা শুনে ওই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারও বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলেন না। জানালেন হাতে-নাতে কোনো প্রমাণ না পেলে কী ক'রে তিনি দূতাবাসের উপর নজর রাখবার জন্য কনস্টেবল পাঠাবেন। সেটা হবে সম্পূর্ণ বে-আইনী। মরিয়া হয়ে ক্যাণ্টাইল জানালেন, অক্স ডিউটির কোনো কনস্টেবল যদি তার কাজটা করে তবে তাকে তিনি মোটা পারিশ্রমিক দেবেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো সকলেই সেই রাতে আগে থেকে কাজ নিয়ে ব'সে আছে। তবে থানার লোকেরা দয়া-পরবশ হয়ে জানালো, ইসলিংটনে একজন রিটায়ার্ড কনস্টেবল থাকে। পারিশ্রমিক পেলে সে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবে।

ইসলিংটনে যেতে হয় ফ্লিট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়ে। যেতে যেতে ক্যাণ্টাইলের হঠাৎ একটা কথা মনে এলো। 'দি টাইমস' সংবাদ-পত্রের আপিসে গিয়ে তিনি সম্পাদকীয় দপ্তরের একজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

তাঁকে সাহায্য করার জন্য কাউকেই তেমন আগ্রহী দেখা গেলো না। সামনের দিকে যে কেরানীটি ব'সে ছিল সে সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলে অধীর ক্যাণ্টাইল কেরানীর কাছ থেকে টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে লিখলেন:

"চীনা দূতাবাসের অমানুষিক মানুষ চুরি; বন্দীর অবিলম্বে নিরাপত্তা হবার সম্ভাবনা।"

কাগজের লেখা দেখে লোকটার চোখ তো কপালে উঠবার উপক্রম। এ-রকম বার্তা নিয়ে রোজ খবরের কাগজের আপিসে লোক আসে না। তবু সে জানালো, যিনি সংবাদ গ্রহণ করেন, রাত দশটার আগে তিনি আসবেন না। কেরানীটি বললো: "তখন আবার আসবেন।"

ক্যাপ্টাইন গম্ভীর মুখে বললেন : "আসবো।"

ইসলিংটনে গিয়ে শুনলেন রিটায়ার্ড কনস্টেবলটিও সেই রাতে কাজ নিয়ে ফেলেছে। তবে পরিবর্তে অন্য একজন লোক দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিলো।

তখন ডাক্তার ক্যাপ্টাইনের চরম পরিশ্রান্ত অবস্থা। হয়রানি ভোগ ক'রে সারাটাদিন কেটে গেছে। যৌবনকাল থাকলে অন্য কথা ছিল। তবু তিনি 'দি টাইমস'-এর আপিসে আবার হাজির হলেন। একজন ঝানু সাংবাদিক ব'সে ছিলেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন, ঘটনাটা খুবই অসাধারণ, তবু সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তিনি এই ধরণের কোনো খবর ছাপতে ইচ্ছুক নন, কারণ তাতে কাগজের পক্ষে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডাক্তার ক্যাপ্টাইন খবরের কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সবগুলি সম্ভাব্য দরজায় তিনি টোকা দিয়েছেন, কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারে শূন্য হাতে। মনে হলো তাঁর সমস্ত চেষ্টাই যেন কেবল শুভ্রশ্রমই হয়েছে।

বাড়িতে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন রাত সাড়ে এগারোটা। শরীর মন দুইই দারুণ ক্লান্ত। তবু ঘুমুবার ইচ্ছা একেবারেই নেই। স্ত্রী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। দুজনে মিলে অনেক পরামর্শও করলেন। মিসেস ক্যাপ্টাইন বললেন : "সকালে উঠে নিশ্চয়ই একটা ভালো উপায় বাৎলানো যাবে।" কিন্তু তাঁর কথা শুনে ডাক্তার যেন আরো অস্থির হয়ে পড়লেন। যুবক বন্ধুটির যখন প্রতি মুহূর্তেই নিহত হবার সম্ভাবনা, তখন তিনি চোখে ঘুম আনবেন কেমন করে। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। শিক্ষা এবং গবেষণার কাজেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে গেছে। সেই জীবন থেকে তিনি শিখেছেন অধ্যবসায়ের মূল্য। চেষ্টা ক'রে যেতে হবে।

এই কথা ভেবে ডাক্তার ক্যাপ্টাইন স্থির করলেন আজকের রাতটা তিনি না ঘুমিয়েই কাটাবেন। গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন চীনা দূতাবাসের দিকে। কাউকে যখন পাওয়া গেলো না, তখন তিনি নিজেই নজর রাখবেন দূতাবাসের উপর। সারারাত তাই করলেন। সকালে গিয়ে হাজির হলেন সলটায়ার'স ডিটেকটিভ এজেন্সীতে। দপ্তরটি খুলতে না খুলতেই। ওখানে গিয়ে জনকয়েক গোয়েন্দার উপরে ভার দিলেন দূতাবাসের উপর রাত্রি-দিন নজর রাখবার জন্য।

এর পরে গেলেন বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে। শপথ ক'রে ঘটনাটা আবার বললেন। তাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলো না। দপ্তরের অফিসাররা বললো, কয়েদীর ছোট চিঠিটা ছাড়া আর কোন প্রমাণই নেই। তদন্ত করতে গিয়ে যদি দেখা যায় গোটা ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পা তখন কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

তবে, চীনা দূতাবাস কোনো জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে সম্প্রতি কোনো চুক্তি করেছে কি না তা জানার জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ঘটনাটা ইয়ার্ডকে নির্দেশ দিলো।

যদি দ্রুত কাজ করার ইচ্ছা ঘটনাটা ইয়ার্ডের থাকে, তবে তা সে অনায়াসেই পারে। তদন্তের ফল খুব তাড়াতাড়িই পাওয়া গেলো : একটা জাহাজ অবিলম্বে চীনের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। মওজুদারী জিনিষই থাকবে জাহাজে। তবে একজন যাত্রীও যাবে। তার নাম দেয়া হয়নি ; তবে সে চীন দেশের একজন নাগরিক।

• • • •

ডাক্তার ক্যাস্টাইল যখন একটার পর একটা জায়গায় গিয়ে সাহায্যের জন্য ধর্না দিচ্ছিলেন, তখন অনিশ্চয়ের মধ্যে থাকলে যেমন হয়, কয়েদী মনে-মনে অনেকবারই মৃত্যু দণ্ডের যন্ত্রণা ভোগ ক'রে যাচ্ছিল। কোলেকে তখনো সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। চিঠিখানা সত্যি-সত্যি কি সে ডাক্তার ক্যাস্টাইলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে?

প্রথম আশার রশ্মি এসে পৌঁছলো যখন কোলে পাত্র ভরে আবার করুণা নিয়ে এলো। করুণার টুকরোর মধ্যে সেদিনের মতো একটুকরো চিঠি:

"আশা রাখুন। আমরা আপনার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি।"

কিন্তু, চেষ্টা করলেও সময় ফুরাবার আগে যে উদ্ধার করা সম্ভব হবে তার গ্যারেন্টি কী! ইতিমধ্যে ডাক্তার ক্যাস্টাইল কোলে-এর কাছ থেকে আরেকটা চিঠি পেলেন:

"আজ রাতে পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে পাশের বাড়ির ছাদে আপনার বন্ধুকে একবার বের করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে। তাকে নিয়ে যাবার মতো লোক যদি পাওয়া যায় তবে আগে থেকে আমাকে জানিয়ে রেখেন, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবো।"

ক্যাস্টাইল ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। আবার তিনি ছুটলেন ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে। অনুরোধ করলেন, দূতাবাসের পাশের বাড়ির ছাদে জন কয়েক কনস্টেবল মোতায়েন রাখতে। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হলেন না। এ-রকম কাজ পুলিশ-বিভাগের পক্ষে মান-হানিকর। আইন-সম্মত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শীগগিরই সরকারী নির্দেশে দূতাবাসের ভিতরে তল্লাসের অনুমতি পাওয়া যাবে।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হেবিয়াস কর্পাস করেন্টির তরফ থেকে প্রয়োগের জন্য অনুরোধ এল ২২শে অক্টোবর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বিচারকের কাছে আবেদন-পত্রটি উপস্থিত করা হলো তিনি আবেদন নাকচ ক'রে দিলেন।

তবে এতে একটা ফল হলো।

ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলি বীর বিক্রমে এগিয়ে এলো। 'গ্লোব' কাগজের একজন রিপোর্টার ঘটনাটা জানবার জন্য ডাক্তার ক্যাস্টাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ডাক্তার ক্যাস্টাইল তাকে ঘটনাতো জানালেনই, উপরন্তু 'দি টাইমস' কাগজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও বললেন।

তাতেই মোড় ঘুরে গেলো। দূতাবাসের কয়েদীটি সম্পর্কে অন্য সব সংবাদপত্র বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়লো। পোর্টল্যাণ্ড প্লেস সিরগিরি করতে লাগলো সাংবাদিক আর রিপোর্টারে। তারা কয়েদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জোর দাবী জানালো। সেক্রেটারী তাং রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো। মিষ্টি হেসে, মোলায়েম ভাষায় সে রিপোর্টারদের বোঝাবার চেষ্টা করলো; গোটা ব্যাপারটা হলো কোনো গাঁজা-খোরের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বিরাট ধাপ্পা।

রিপোর্টাররা তাকে সতর্ক ক'রে দিলেন যে, ওই দিনেরই মধ্যে অর্থাৎ বারো ঘণ্টার মধ্যে যদি বন্দীকে মুক্তি দেয়া না হয়, তবে দূতাবাস আক্রমণ ক'রে নাগরিকেরা কয়েদীকে ছেড়ে দেবে।

তাং শুধু চীনা হাসি হেসে ভেতরে চলে গেলো। যেন বলতে চাইলো সাংবাদিকদের রসিকতাটা তার ভালোই লাগছে। লণ্ডন শহরের লোকদের মেজাজ যে কী, আর জাতীয় সংবাদপত্রের প্রভাব নাগরিকদের উপরে কতখানি তা বোধহয় তার একেবারেই জানা ছিল না।

ফিলড্যাণ্ড হাউসে গিয়ে সাংবাদিকেরা স্যার হ্যালিডে ম্যাকার্টনীকেও ঘেঁাকের মতো ছেঁকে ধরলো। চীনা দূতাবাসের আইন উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করার সুযোগ প্রথম পেলো 'ডেইলী মেইল'। ওই কাগজ বিবৃতি দিলো: বন্দীকে মুক্তি দেবার জন্ত লর্ড স্যালিসবারী চীনা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন কি না জিজ্ঞাসার উত্তরে স্যার হ্যালিডে ওই কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও জানিয়েছেন, দূতাবাসের প্রতি কোনো অশিষ্টতা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বন্দীকে মুক্ত করা হবে।

সংবাদপত্রের এক প্রতিনিধির কাছে স্যার হ্যালিডে এ কথাও জানিয়েছেন: "যাকে আমরা আটক ক'রে রেখেছি তার আসল নাম সান ওয়েন নয়। তার প্রকৃত পরিচয় আমরা জানি। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে তার পা দেবার পর থেকে তার সব গতিবিধির খবরই আমরা রেখেছি। নিজেই ইচ্ছা করে সে দূতাবাসে এসেছিল। তাকে চুরি ক'রে বা জোর ক'রে সেখানে কিছুই নিয়ে যাওয়া হয়নি। লণ্ডনে এসে একজন নিঃসঙ্গ চীনা তরুণ তার দেশী লোকদের সঙ্গে আলাপ করার জন্ত দূতাবাসে আসবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। তবে, তার পরিচয় আমরা জানি না এই বিশ্বাসে এই যুবকটি আমাদের গোপন খবর বার করবার জন্ত গুপ্তচরের ভূমিকা নিয়েছিল। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে এমন কিছু কথাবার্তা বলে যাতে আমার মনে হয় আমরা যে বিপজ্জনক গুপ্তচরটির সন্ধান করছি এ সেই। সন্দেহ অমূলক নয় এ-রকম প্রমাণ পেয়ে তবে আমরা তাকে আটক ক'রে রেখেছি। এখনো সে বন্দী অবস্থায়ই রয়েছে; তার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে তার জন্ত আমরা চীন সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি।"

ব্যাপারটার আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার হ্যালিডে বলেছেন: "লোকটি ব্রিটিশ নাগরিক নয়, চীন সম্রাটের একজন প্রজা। সে যখন স্বেচ্ছায় দূতাবাসের এলাকার ভিতরে এসে পড়েছে তখন তার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কেবল চীন সরকারেরই আছে, ব্রিটিশ সরকারের নয়। সে যদি দূতাবাসের বাইরে থাকতো তবে পরোয়ানা ব্যতিরেকে কিছুই তাকে গ্রেপ্তার করা যেতো না।"

সাংবাদিকদের আরো প্রশ্নের জবাবে স্যার হ্যালিডে জানিয়েছেন, চীনা যুবকের প্রতি মোটেই বন্দী-সুলভ ব্যবহার করা হচ্ছে না, তার আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বন্দীকে শারীরিক ভাবে নিপীড়িত করা হতে পারে এই সম্ভাবনাকে স্যার হ্যালিডে বিদ্রূপ ক'রেই উড়িয়ে দিয়েছেন। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর কাছে যে চিঠিটি এসেছে তার সুবিবেচনা করবেন ব'লে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

সেণ্ট্রাল নিউজ এই সংবাদ প্রকাশ করলো যে, বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে চীনা দূতাবাসে যাবার পথে স্যার হ্যালিডে মন্ত্রী লুং তা জেন-এর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সান ওয়েনকে ছেড়ে দেবার জন্ত লর্ড স্যালিসবারীর আদেশের কথা তাঁকে জানিয়েছেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে দূতাবাসের ঘটনা নিয়ে অসংখ্য সম্পাদকীয় বেরুলো। চীন-সম্রাটের দূতাবাস আন্তর্জাতিক আইন অমান্ত ক'রে যে অসৌজন্তের পরিচয় দিয়েছে তার প্রতি তীব্র কটাক্ষে প্রতিটি সম্পাদকীয় মুখর হলো। ঘটনাস্থল ইয়ার্ড দূতাবাসের চারদিকে চৌকিদার মোতায়েন করলো।

সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষকে সতর্ক ও সজাগ ক'রে রাখা হলো। ২৩শে অক্টোবর মাগাদ ব্যাপারটা একেবারে উপর মহলে চলে গেলো। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যালিসবারী চীনা মন্ত্রীর কাছে একটি প্রতিবাদ-লিপি পাঠালেন এবং বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিলেন।

ওই নির্দেশের ঠিক দু'ঘণ্টা পরে দূতাবাসের কয়েকজন প্রহরী এসে সান ওয়ান-কে পোষাক, টুপি, আর জুতো প'রে তাদের সঙ্গে যেতে বললো। ওদের ষড়যন্ত্রের এই কি শেষ ধাপ? জাহাজে চালান দেবার জন্ত কি এ-ভাবে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? নাকি তাকে আরো গুপ্ত কোনো কক্ষে আটক ক'রে রাখবার জন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? হয়তো সেখানেই তাকে গুলি ক'রে মারা হবে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" নির্বিকার মুখ চীনা প্রহরীরা তার প্রশ্নের কোনো জবাবই দিলো না।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁটিয়ে নিচের একটি অভ্যর্থনা-কক্ষে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনজন ভদ্রলোক তার জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। আর তাদের ভিতরে একজন অতি পরিচিত বন্ধু। মানুষের মুখ দেখে এত আনন্দ আর কোনো দিনই বোধহয় সে জীবনে পায়নি সেদিন যেমন সে পেয়েছিল ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের মুখ দেখে। ডাক্তারের সঙ্গে এসেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেক্টর জার্ভিস আর বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন কেরানী। তাই, ম্যাকার্টনী বা দূতাবাসের অন্ত কাউকেই সেই ঘরের আশে-পাশেও দেখা গেলো না।

কামরার দরজা খুলে গেলো। চারজন বেরিয়ে এলো দূতাবাস থেকে। বন্দীকে অভিনন্দন জানাবার জন্ত বাইরে এত বিরাট জনতা অপেক্ষা করছিল। তাকে বীরের সম্মান জানাবার জন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সবার অগোচরে একটি যুবক ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিল। সেদিন কেউ তাকে চিনতো না। আর আজ? তাকে হাজার হাজার প্রশ্ন করছে সাংবাদিকেরা। যে প্রশ্নটি বেশির ভাগ সাংবাদিকেরাই করলো তা হলো কী ক'রে সে ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? ভূতপূর্ব বন্দী কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর একেবারেই দিলো না। যে নির্বাক ভৃত্যটি তার জীবন রক্ষা করেছে তার নাম বলে সে তাকে বিপন্ন ক'রে তুলতে চায় না।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একবার হাজিরা দিয়ে এবং ডাক্তার ক্যাণ্টাইলের বাড়িতে ভোজ সেরে নিয়ে, ধীরে সুস্থে বসে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে লণ্ডনের প্রতিটি সংবাদপত্রের অফিসে একটি ক'রে চিঠি পাঠালো। সেদিন কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকই জানতো না যে এই যুবকই একদিন হবেন চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট এবং চীনা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। দূতাবাসের খবরে প'ড়েও যে যুবক সেদিন আসন্ন মৃত্যুদণ্ড থেকে এ-রকম আশ্চর্য পরিত্রাণ পেয়েছিলেন তিনি সর্ব-দেশের ও সর্ব-কালের দেশপ্রেমিক ও দেশ-নেতাদের অন্তত্ম, স্বনামধন্ত সান ইয়াৎ সেন।

সারা পৃথিবীর সেরা অভিনেত্রী সারা বার্নার্ড

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারা বার্নার্ড

নয়-দশ বছরের দুটি মেয়ে খেলা করছে। সামনে একটা গর্ত। গর্তটা লাফিয়ে পার হতে হবে।

প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বিদ্রূপ করে বললে—"আমি কেমন সহজে লাফিয়ে পার হতে পারি। কিন্তু তুই পারিসনা। হুঁহো।"

ভীষণজী রুগ্ন-চেহারার দ্বিতীয় মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে মনে মনে বললে, আমাকে পারতেই হবে। মুখে বললে—"আমিও পারি।"

—"ইস্ তুই পারিস। লাফা না দেখি।"

দ্বিতীয় মেয়েটি আর কোনো কথা না বলে গর্ত পার হবার জন্যে লাফ দিলে। পারলে না। গর্তের মধ্যে পড়ে গেল।

আশপাশ থেকে লোক ছুটে এসে তাকে গর্তের মধ্যে থেকে টেনে তুলে বাড়ীতে দিয়ে এল। মেয়েটি কিন্তু তখনো সমানে বলছে,—"আমি নিশ্চয়ই ঐ গর্ত লাফিয়ে পার হব। আমি পার হবই।"

সেদিনকার সেই ছোট্ট মেয়েটির পরবর্তী সারা জীবনের মূল মন্ত্রই হল ঐ একটি কথা—আমি পার হবই।

সেদিনকার সেই মেয়ে পরবর্তীকালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু সেই স্বীকৃতি সহজে আসেনি। পদে পদে তাঁকে বাধাবিঘ্নের বড় বড় পাহাড় পার হতে হয়েছে।

অসহ্য ছিল তাঁর ইচ্ছাশক্তি, অদ্ভুত তেজ আর অসাধারণ নিষ্ঠা।

রোমাঞ্চকর তাঁর জীবনের প্রতি অধ্যায়।

ফরাসী দেশের মেয়ে তিনি। সেই দেশের বিখ্যাত রঙমঞ্চ কমেডী ফ্রাঁসাই-এ যখন তিনি প্রথম অভিনয় করতে নামলেন তখন তাঁকে দেখে নাট্যসমালোচকরা হেসেছিল। একি চেহারা! সরু কাঠির ওপরে আলু বসানো। মাথার চুলেরও তেমনি ছিরি।

তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে এই চেহারা নিয়েই ঐ মেয়ে বিয়োগান্ত নাটকের ট্র্যাজিক নায়িকারূপে একদিন সারা পৃথিবীর দর্শকদের স্তম্ভিত অভিভূত করে দেবে।

১৮৭৯ সালে যখন তিনি লণ্ডনে গেলেন তখন সে দেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রথমদিন অভিনয় করবার আগে তিনি এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে কিছুতেই তিনি সেদিন অভিনয় করতে ইচ্ছুক হননি। ম্যানেজার যখন ব্যাপারের গুরুত্ব তাঁকে বোঝান তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। ম্যানেজার ভাবলেন, বোধ করি সারার হঠাৎ মাথার গোলমাল ঘটেছে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সারা উঠে দাঁড়ালেন, ম্যানেজারকে বললেন—"আপনি কিছু ভাববেন না। আমি মন ঠিক করে নিয়েছি। হ্যাঁ, দেখবে, আজকের দর্শক আমার অভিনয় দেখবে। তাদের জন্যে আমি দেহের সমস্ত রক্ত দেব, আমার জীবন দেব, আমার আত্মাকে পর্যন্ত দেব।"

"Yes, you shall see. I am going to give you my very blood, my life itself, my soul."

এমনি ছিল সারার দুর্দমনীয় মনোভঙ্গী আর অপরাজেয় প্রাণশক্তি।

সেদিন তাঁর সেই অভিনয় দেখে বৃটিশ দর্শক বিহ্বল বিস্মিত হয়েছিল। একজন অভিনেত্রীকে অভিনন্দন জানাতে সেদিন সেই প্রেক্ষাগারে যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি। সেদিন বৃটিশ দর্শক তাঁর নতুন নামকরণ করেছিল—Divine Sarah!

কিন্তু তারা সেদিন জানতে পারেনি যে সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে সারার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর এমনই চাপ পড়েছিল যার ফলে অভিনয়ের শেষে ক্লান্তি আর অবসাদে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, ডাক্তার সঙ্গে দিয়ে তাঁকে বাড়ী পাঠাতে হয়েছিল এবং সেরাত্রে প্রতি মুহূর্তে তার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করেছিলেন ডাক্তার।

• • • •

১৮৪৫ সালের ২৩শে অক্টোবর সারা বার্নার্ড-এর জন্ম।

তাঁর মা ছিলেন এক অতি সুন্দরী ইহুদী মেয়ে। বাবা ছিলেন ফরাসী। আইনের ছাত্র।

দুজনের বিবাহে যখন অভিভাবকদের আপত্তি হল তখন তাঁরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন।

কিন্তু এ বিবাহ সুখের হল না। সারার যখন দু' বছর বয়েস, তখন তাঁর বাবা এডোয়ার্ড বার্নার্ড পত্নীকে পরিত্যাগ করে সুবোধ বালকের মত বাপমায়ের কাছে ফিরে গেলেন।

সারার মা অকূল পাথারে পড়লেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন তারি তেজী স্বভাবের মেয়ে। কান্নাকাটি করলেন না বা শ্বশুরবাড়ীর দরজায় গিয়েও হাজির হলেন না। টুকটাক ছোট খাট শিল্পকাজ করে দিন গুজরান করতে লাগলেন।

ছোটবেলায় অত্যন্ত হীন অবস্থায় সারা বার্নার্ড-এর জীবন কেটেছে।

শেষ-পর্যন্ত এক ধনী মাসীর কৃপায় তিনি তাঁর আশ্রয়ে থেকে সুখ এবং বিলাসিতার আস্বাদ পেলেন জীবনে।

মেসো ছিলেন একজন বড়দরের কাস্টম এবং নাট্যানুরাগী। তাঁরই চেষ্টায় এবং ইচ্ছায় সারা বার্নার্ড অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশ করেন।

প্রথম অভিনয় রজনীতে গ্রীনরুমে পোষাক পরতে পরতে সারা শুনলেন প্রেক্ষাগারে অনেক গণ্যমান্য নরনারীর সমাবেশ হয়েছে, এবং তাঁদের মধ্যে তাঁর মাও আছেন।

মা তাঁর অভিনয় দেখতে এসেছেন। কি সর্বনাশ! মায়ের সামনে বেরিয়ে এত সব কাণ্ড-কারখানা এত বাচালপনা তিনি করবেন কেমন করে!

কিছুতেই ষ্টেজে যাবেন না। পরিচালক ধমক দিয়ে উঠল।

কাঁপতে কাঁপতে ষ্টেজে প্রবেশ করলেন সারা। তারপর যেই না মাকে দেখা অমনি কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে ষ্টেজ থেকে পালিয়ে গেলেন।

চারিদিকে হাসাহাসি হৈ-চৈ। ড্রপ ফেলে দিতে হল।

• • • •

অনেকেই সারার ওপর বিরক্ত হলেন, কিন্তু তাঁর মেসো বললেন—"তুমি ঘাবড়ে যেও না মা। ও অমন হয়। তোমাকে আমি অভিনয় শেখার ইস্কুলে পাঠাব। সেখান থেকে ফিরে এসে তুমি সকলকে দেখিয়ে দেবে যে তোমার মত অভিনেত্রী শুধু এ দেশে নয়, অন্য কোনো দেশেও নেই।"

মিথ্যা হয়নি মেসোর কথা। কিছুদিন এক নাট্যশিক্ষালয়ে হাতে কলমে পাঠ নেবার পর সারা যখন কমেডী ফ্রাঁসাই-এ অভিনেত্রীরূপে অবতীর্ণ হলেন তখন দেখা গেল, প্রখর ব্যক্তিত্বে, অপূর্ব বাচনভঙ্গীতে এবং ভাব প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতায় সারা বার্নার্ড এক বিস্ময়কর নাট্য-শিল্পী, অতুলনীয়া এবং অসাধারণ মহিমান্বিতা।

কিন্তু তাঁর মেজাজ ছিল বরাবরই বড় উগ্র। এতটুকু অন্যায় বা অসৌজন্য সইতে পারতেন না।

সারার একটি খুড়তুতো ছোট বোন ছিল। সেও তাঁর সঙ্গে অভিনয় করত ছোট ছোট ভূমিকায়।

একদিন এক নাটকের মহলায় সেই থিয়েটারের অন্য এক প্রধানা অভিনেত্রী সারার ভগ্নীকে কি একটা কটুকথা বলে উঠল।

সারার কানে সে কথা যেতেই একেবারে জ্বলে উঠলেন। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমার বোনকে গালাগাল। ছুটে গিয়ে মারলেন এক চড় সেই অভিনেত্রীর গালে।

হৈ-হৈ কাণ্ড। একি সাংঘাতিক ব্যাপার।

সেই অভিনেত্রীটিও কমদরের ছিল না। অনেকেই তার পক্ষ নিলে।

সারাকে বলা হল ক্ষমা চাইতে। ক্ষমা চাওয়া সারার কুষ্ঠীতে লেখেনি। তার চেয়ে কাজে ইস্তফা দেওয়া ঢের সহজ।

বোনকে নিয়ে তখুনি বাড়ী চলে গেলেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তো হতভম্ব।

এমনি ছিল সারার মেজাজ আর তেজ। এর জন্যে তাঁকে অনেকবার অনেক দুর্বিপাক,

সাহনা সইতে হয়েছে। চাকরী গেছে একাধিকবার! অর্থের অভাবে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন অনেক সময়। কিন্তু তবুও কারুর কাছে কোনোদিন হাত পাতেননি।

তখনকার দিনের সবচেয়ে নামকরা থিয়েটার ম্যানেজার ছিলেন, চিল্লি। উঠতি অভিনেতা অভিনেত্রীদের চেনবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। সারাকে তিনি চিনেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে এই মেয়ে একদিন জগৎ জয় করবে। তিনি সারার নামকরণ করেছিলেন—স্বর্ণকণ্ঠী সারা। "The actress with the voice of gold."

সারার সাফল্যের মূলে চিল্লির উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা কম সাহায্য করেনি। এ কথা সারা নিজেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেই সময়কার তাঁর অভিনয়ের কয়েকটি সমালোচনা আমরা একটি সংকলনগ্রন্থে পড়বার সুযোগ পেয়েছি এবং তাতে দেখেছি বিভিন্ন দেশের সমালোচকদের কি উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি।

এক একটা অভিনয়ে সারার সেই সোনার কণ্ঠস্বর কখনো দুঃখে, কখনো আনন্দে, কখনো উত্তেজনায়, কখনো ক্রোধে, কখনো স্নেহে, কখনো কোনো বিচিত্রতর বিচিত্র ভাব প্রকাশে যখন প্রেক্ষাগারে পরিব্যাপ্ত হত তখন দর্শকরা আত্মবিস্মৃত হত, তারা ভুলে যেত যে তারা অভিনয় দেখছে, তাদের মনে হত যে তারা যেন কোনো এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে, এক আশ্চর্য মায়ার জগৎ যার সম্রাজ্ঞী তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

• • • •

১৮৭০ সালে দেশে যুদ্ধ বাধল।

সারা বার্নার্ড বললেন, এখন আর অভিনয় নয়। এখন সেবা করতে হবে। নার্সের কাজ নিয়ে চলে গেলেন রণক্ষেত্রে। হাসপাতালে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

আহত সৈনিকদের মধ্যে সেকি আনন্দ, উদ্দীপনা। দেশের সব সেরা অভিনেত্রী "স্বর্গীয়া সারা" তাদের সেবা করছে এই আনন্দে তারা চাঙ্গা।

প্যারিস অবরোধের সময় ওডিয়ন থিয়েটারকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হোল এবং সারা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে আহত জওয়ানদের সেবা শুশ্রূষা করলেন।

তাঁর দেশের লোক তাঁর অন্য এক পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল। সারা বার্নার্ড সারা দেশের চিত্ত জয় করলেন।

• • • •

যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার পর তিনি আবার ষ্টেজে ফিরে এলেন।

তখন আবার সেই উগ্র স্বভাব আর অসহিষ্ণু মেজাজ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি। তাঁর কথার ওপর কথা বলা চলবে না। তিনি যা চান তাই করতে হবে। তাঁর সুবিধা অনুসারে রিহার্সালের সময় ঠিক করতে হবে। তাঁর ইচ্ছামত সীন সাজাতে হবে। তাঁর পছন্দ মত পোষাক তৈরী করতে হবে। এমন কি তিনি যদি কোনো সহঅভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয় পছন্দ না করেন তো তাকে বাদ দিতে হবে।

এত যন্ত্রণা আর অবমাননা সহ্য করা কঠিন বৈকি। তাঁকে নিয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাজেহাল।

একটু অবনিবনা হলেই, বইল তোমার চাকরী।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাঁকে চাকরী ছাড়তে হয়েছিল।

সে ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর শত্রুদের চক্রান্তে অন্যায় করে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিল। এবং তিনি তা করেননি। ফলে তাঁর নামে দু' একটি পত্রিকায় নানা নিন্দাবাদ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, তাঁর চড়া স্বভাবের জন্যে অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তাঁরা রীতিমত তাঁর পিছনে লেগেছিল।

শেষবার চাকরি ছাড়বার পর কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁর ডাক এল না।

তাঁর জীবনে এমন কখনো হয়নি। এক থিয়েটার ছেড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য থিয়েটার ডবল মাইনে দিয়ে তাঁকে লুফে নিয়েছে।

মনে হচ্ছে যেন দুঃসময় এসেছে সারার জীবনে।

কিন্তু ভেঙে পড়বার মেয়ে তিনি নন। নিজেই একটা দল তৈরী করলেন। তারপর সেই দল নিয়ে দেশের নগরে নগরে এবং বিদেশেও অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। বিশ্বজয় করবার সে যেন এক দিগ্বিজয়ী অভিযান।

যেখানে গেলেন সেখানেই পেলেন অভূতপূর্ব সংবর্ধনা।

সফর শেষ করবার পর দেখা গেল সমস্ত খরচ-খরচা বাদে তাঁর নিজের লাভের অংশে জমেছে প্রায় ন'লাখ টাকা।

সেই সময়, ১৮৮২ সালে, তিনি তাঁর দলেরই এক অভিনেতাকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম জেকস দামালা।

প্যারিসে ফিরে এসে তিনি সেই কমেডি ফ্রাঁসেয়া-তেই আবার অভিনয় শুরু করলেন। সারা প্যারিস যেন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

* * * *

১৯১৪ সাল। তখন তাঁর ৬৯ বছর বয়েস। কিছুদিন আগে জানলায় কত হওয়ায় সেই পাটি তাঁর কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থাতেও তিনি ষ্টেজে নেমেছেন। কখনো বা চেয়ারে বসে, কখনো বা কোনো সহঅভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি তাঁর ভূমিকার অভিনয় নতুন ভাবে দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেছেন। তাঁর যে একটি পা নেই তা যেন দর্শকদের বোঝাই হচ্ছে না, কণ্ঠস্বরের যাদুতে আর অভিব্যক্তির প্রাণস্পর্শী প্রকাশে তিনি দর্শকদের ভুলিয়ে দিতেন, ডুবিয়ে দিতেন তাঁর সেই অতলস্পর্শী অভিনয়-সমুদ্রে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—"ডিভাইন সারা"।

দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের ছিল না। স্বামী ছিলেন অত্যন্ত নষ্টচরিত্র। রূঢ় এবং অভদ্র ছিল তাঁর দৈনন্দিন আচার আচরণ। কিন্তু তাহলেও তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পুরুষকে নিয়ে জীবন কাটানোর কল্পনাও কোনোদিন করেননি সারা।

আজকালকার দিনে মঞ্চ ও সিনেমার অভিনেত্রীদের কাছে এ কথাটা যেন অবিশ্বাস্য মনে হবে। স্বামী পাল্টানোই তো এ যুগের রীতি।

দেশে দেশে সারার প্রশংসাভিক্ষু ভক্তের দল। সর্বোচ্চ পদবিধারী কোটীপতি থেকে শুরু করে

শিল্পজগতের সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভাধর ব্যক্তিও তাঁকে পাবার জন্যে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সারা বার্নার্ড-এর চরিত্র ছিল অন্য ধাতুতে গড়া।

* * *

স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, বসবাস নেই বহুদিন।

হঠাৎ একদিন সারা শুনলেন যে তাঁর স্বামী রাশিয়ায় এবং সাংঘাতিক অসুখে মরণের।

সেদিন ছিল তাঁর একটি বিশেষ অভিনয়ের অনুষ্ঠান। কিন্তু বাতিল করে দিলেন সেদিনের অভিনয়। তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন স্বামীর উদ্দেশে। তাঁর রোগশয্যার পাশে গিয়ে বসলেন। দিনরাত শুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন।

দুজনের মধ্যে পুনর্মিলন হল।

জেকস ভামালা তাঁর সবরকম কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করে মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাঁর ভাঙা শরীর আর জোড়া লাগল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

তাঁদের একটিমাত্র সন্তান হয়েছিল—পুত্র মরিস। তারই কোলে মাথা রেখে ১৯২০ সালের ২৬শে মার্চ ৭৮ বছর বয়সে সারা বার্নার্ড এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

---

* * *

শিক্ষক এবং চিকিৎসক হিসাবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী ছিলেন অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস; আর লেখক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি তো দেশে দেশান্তরে।

এ হেন লোকের কাছে একবার একটি লোক এল। এ কথা সে কথা চলছে হঠাৎ লোকটি ওয়েণ্ডেলের একটি কাজের প্রশংসা করে বসল।

আর দশজনের মতো বিনয়ে বিগলিত হয়ে তিনি মোটেই বললেন না সেই মামুলী কথা, "না-না আমি ওর যোগ্য নই।"

বরং বললেন, "দেখুন আমি কানে একটু কম শুনি। আপনি যদি একটু জোরে বলেন কথাটা।"

মানুষকে প্রশংসা করলে সে খারাপ হয়ে যায়—এ ধারণা একেবারেই মিথ্যে। আপনি স্বীকার করুন আপনাকে কেউ ভালো বললে আপনার তা শুনতে ভালো লাগে, আর সেই সঙ্গে আপনিও অপরকে ভালো বলার মতো মনোভাব অর্জন করুন। আমরা অনেক কষ্ট করে মানুষের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়াই, মানুষের গুণ খুঁজতে আমাদের অতদূর যেতে হবে না।

শ্বেতদ্বীপের যবনিকা কম্পমান

নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাণী।

গল্পে রাণীর নাম নেই।

এক শীত-প্রধান দ্বীপের রাণী এবং তাঁর স্বামী। তাঁদের রাজধানীতে ভারি হুরাশা। তাঁদের নিয়ে এক রূপক কাহিনী।

রাজার মেয়ে সিংহাসন পেয়েছেন। তাঁর স্বামী কিন্তু রাজা নয়। তিনি স্রেফ রাণীর স্বামী। তাঁকে বলা হয় কনসর্ট।

রাণীর মতই মেজাজ হুরাশা-রাজ্যের সেই রাণীর।

কনসর্ট-এর সঙ্গে নিত্য খিটিমিটি।

কনসর্ট রাজ্যের সরকারী রক্ষণশীলতায় "কোটেকাঠিণ্যে" হতাশ এবং বিরক্ত। মুক্ত বিহঙ্গের মত তিনি চান স্বাধীন জীবন।

একদিন এক ভোজ সভায় কনসর্ট প্রচুর মদ্যপান করে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন।

চোখাচোখা বুলি দিয়ে তিনি মন্ত্রীপরিষদের গোঁড়ামি আর মস্তিষ্কহীনতার উল্লেখ করে তাঁদের বিদ্রূপ করলেন।

চারিদিকে চাপা উত্তেজনা। মন্ত্রীদের মুখ ভার।

রাণীর স্বামী। তাঁকে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এ অপমান যে অসহ্য। কিছু একটা করতেই হবে।

রাণীর সঙ্গে মন্ত্রীদের পরামর্শ হল। স্থির হল রাণীর স্বামীকে কিছুদিন বিদেশ ঘুরিয়ে আনতে পারলে তাঁর স্বভাব-চরিত্র শুধরে যেতে পারে।

মন্ত্রীরা সলা করে স্থির করলেন কনসর্টকে এক কূটনৈতিক সফরে দূর প্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

রাজকীয় জাহাজটিকে সাজান হল। তারপর দলবল নিয়ে কনসর্ট মহাআনন্দে যাত্রা করলেন।

রাণীর শাসন আর মন্ত্রীদের আদব কায়দার বাঁধন অসহ্য লাগছিল তাঁর।

এবার ছুটিয়ে জীবনকে উপভোগ করবেন তিনি।

জাহাজে সুরার স্রোত বইতে লাগল। সেই সঙ্গে নাচ গান হল্লা।

ভাসতে ভাসতে জাহাজ গিয়ে ভিড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে।

সেখানকার সুন্দরী মেয়েরা তাদের রীতি অনুযায়ী কনসর্ট-এর গলায় মালা পরিয়ে তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

কনসর্ট বিমুগ্ধ বিহ্বল!

এই তো স্বর্গরাজ্য। এই তো সব স্বর্গরাজ্যের অপ্সরীরা! তাদের নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেহে যৌবনের কী উচ্ছল প্রকাশ।

সব সেরা রূপসী ঐ যে অদূরে দাঁড়িয়ে। কনসর্ট তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তার নাম শুধোলেন।

টিয়া! কী সুন্দর নাম!

সিকের উঁচল সাম্রাজ্যের তরফে কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং তদনুরূপ আলাপ-আলোচনা। কনসর্ট সব কিছু ছেড়ে তাহিতি রূপসীদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন। টিয়া হল তাঁর দিন রাতের সঙ্গিনী।

কুয়াশা-ঘেরা রাজ্যের রাজধানীতে যখন রাণীর স্বামীর এই অনাচারের খবর পৌঁছোলো তখন রাণীর মুখ রাগে রাঙা হল মন্ত্রীদের মুখ হল দুশ্চিন্তায় কালো।

রাণীর কাছ থেকে দস্তখত-করা হুকুমনামা গেল কনসর্টের কাছে—এখনি ফিরে এসো।

কিন্তু কারুর পরিবেদনা। কনসর্ট তখন টিয়ার প্রেমের নেশায় বুঁদ। তিনি সে হুকুম পালন করলেন না।

তখন মন্ত্রীমণ্ডলী গভীর পরামর্শ করে রাজ্যের একদল সেরা গোয়েন্দাকে কনসর্টকে ধরে আনবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

গোয়েন্দারা সব ছদ্মবেশে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হল। তারপর তারা কনসর্টকে কীভাবে গুম্ করে একেবারে উড়োজাহাজে চাপিয়ে রাণীর রাজধানীতে নিয়ে এলো—সে এক রীতিমতো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী।

কিন্তু এখানেই কেচ্ছার শেষ হল না।

এক গুপ্ত-মন্ত্রণাসভায় মন্ত্রীরা স্থির করলেন, এরকম বিপজ্জনক ব্যক্তিকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। রাজ্যের কল্যাণে এবং প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্যেই রাণীর স্বামীর 'দোকাত্তরিত' হওয়া আবশ্যক। এবং সেজন্যে একটা 'দুর্ঘটনার' সৃষ্টি করলেই হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু!

দুর্ঘটনার আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

কিন্তু কেমন করে জানি, কনসর্ট সেই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেললেন।

ভুখোড় লোক তিনি। চুপচাপ রইলেন। দুর্ঘটনা যথাসময়ে ঘটল। কিন্তু সেই দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেলেন না। মারা গেল তাঁর পোষাক-পরা এক ভৃত্য।

সারা রাজ্য শোকে মগ্ন হল। রাণী বিধবা হলেন।

এদিকে কনসর্ট করলেন কি? রাতের অন্ধকারে এক উড়োজাহাজ বাগিয়ে উড়ে চলে গেলেন তাঁর প্রিয়তমা টিয়ার কাছে।

• • • •

এই হল কাহিনী।

কল্পিত গল্পের নায়কটিকে পাঠক চিনতে পারলেন কি?

তিনি হলেন, বর্তমান ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অফ এডিনবরা।

তাঁকে বাদ বিদ্রূপ করে এই কাহিনী লিখেছেন এটনি হেকস্টল স্মিথ নামে ষাট বছর বয়স্ক এক ইংরাজ। এই ভদ্রলোকের ইংলণ্ডের রাজবাড়ীতে অবাধ গতিবিধি। তাঁর বাবা সম্রাট পঞ্চম জর্জের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রিন্স ফিলিপের বাকভঙ্গী, তাঁর চালচলন, তাঁর আচার আচরণের বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখভঙ্গী—সব কিছু এমন হুবহু দেখানো হয়েছে যাতে তাঁকে চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না পাঠকের।

তা তো হল। এখন এই বই নিয়ে ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় যে কী করবেন প্রথমটায় তা ভেবে পেলেন না। এই বই বাজারে বেরুলে যে প্রোকিউমো-কেলেঙ্কারীর বাড়া হবে।

এই বইএর প্রকাশক হলেন অ্যাটনি ব্রুস কোম্পানী। বই ছাপা হয়ে গেছে। বাজারে ছাড়া হবে। এমন সময় ইংলণ্ডের শাসকদের হাতে বইখানার একটা কপি পৌঁছোলো। এবং তা প'ড়ে তাঁদের তো চক্ষুস্থির।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত বইখানা আর বাজারে চালু হল না। প্রকাশক বইটাকে চেপে দিলেন।

তা না দিলে, অর্থাৎ এই বই বাজারে ছড়িয়ে পড়লে, পৃথিবীময় যে কীরকম হৈ-চৈ প'ড়ে যেতো তাতে আর সন্দেহ নেই।

এবং তাহলে এর লেখক এবং প্রকাশককে ফৌজদারী দণ্ডবিধির কবলে প'ড়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ'ত।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে খেলোয়াড়-সুলভ উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন প্রিন্স ফিলিপ নিজে। ব্যাপারটা জেনে উচ্চহাস্য করে তিনি বলেছেন—"বোকা লোকের কাণ্ড।"

• • •

স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সার্ভেন্টিসের মৃত্যু হয় ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর ঠিক দশ দিন আগে। দুঃখ কষ্ট পেয়ে গেছেন সারাজীবন, তবু শেষ দিন পর্যন্ত মনের আনন্দ এতটুকুও হারাননি সার্ভেন্টিস। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে লিখে গেলেন নিজের কল্পনা আর প্রিয় বন্ধুদের উদ্দেশে:

"বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে। বাসনা রইল পরলোকেও তোমাদের সুখী রাখতে পারো।"

তাঁর অমর কাহিনীর নায়ক ডন কুইক্সোটের মতো সার্ভেন্টিসও সাহিত্যের জগতে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

লেখনী, সুখের খনি

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

নিজের তৈরী পেশা ছেড়ে শেষ পর্যন্ত লেখার পেশা ধরেছেন, অথবা নিজের প্রথম পেশার চেয়ে দ্বিতীয় পেশা অর্থাৎ লেখার পেশার মাধ্যমেই অধিকতর খ্যাতি ও স্বীকৃতিলাভ করেছেন, এমন অনেকেরই পরিচয় আমরা জানি।

কিন্তু লেখার পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরেছেন এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি একটিও নেই।

লেখার নেশা একবার যাঁকে ধরেছে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সেই নেশাতেই মশগুল রেখেছে।

অন্য সব জিনিষই বোধ করি ছাড়া যায়। কিন্তু লেখা ছাড়া যায় না। এর মধ্যে হয়ত এমনই কোন সুখের সন্ধান পাওয়া যায় যার জন্যে, একবার যিনি লেখকের পেশা গ্রহণ করেছেন, শেষ অবধি সে-পেশাকে ছাড়তে পারেন নি। তাই বোধকরি লেখনীকে সম্বোধন করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, লেখনী, সুখের খনি।

এই নেশাজাগানো পেশায় আকৃষ্ট হয়ে, কেরানী তাঁর চাকরি ছেড়েছেন, ডাক্তার ডাক্তারি তুলেছেন, উকিল-ব্যারিষ্টার তুলেছেন মক্কেল। শেষ পর্যন্ত লেখার পেশা গ্রহণ করে তাঁরা লেখক হয়েছেন, প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, জাতির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

খুব ছোট বেলা থেকেই লেখার নেশায় পেয়েছে, লেখাকেই মূলমন্ত্র বলে মনে করেছেন, এমন মনীষীর সংখ্যা কম।

আট থেকে আশী বয়স পর্যন্ত এক-নাগাড়ে কবিতা লিখেছেন, সেই সঙ্গে আরো অজস্র রচনা—তেমন মানুষ পৃথিবীতে একজনই জন্মেছিলেন আমাদের দেশে।

ওদেশের বার্নজাক ছিলেন তেমনি আর একজন। ছোট বেলাতেই তিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন। বাপমায়ের ঘোর আপত্তি, তিরস্কার লাঞ্ছনা—কিছুতেই বার্নজাককে থোবরানো গেল না। লেখক তিনি হবেনই। শেষ পর্যন্ত হলেনও।

কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অন্য পেশা ছেড়ে লেখার পেশা ধরেই অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন।

'মোবি ডিক' নামে বিখ্যাত বইএর লেখক হারমান মেলভিল প্রথম জীবনে ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানী তারপর সেলসম্যান। অবশেষে সমুদ্রে পাড়ি দেবার সুযোগ পেলেন এবং লিখলেন তাঁর বিখ্যাত বই—মোবি ডিক। সেই থেকে হলেন লেখক—পেশাদার লেখক।

জুলস ভার্ন, যাঁর বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনাগুলি পৃথিবীর সকল ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে,—

শেয়ার বাজারের দালালি করে প্রথম জীবনের অনেক বছর অতিবাহিত করেন। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল, লেখার মধ্যেও বিস্তর সুখ আছে, নিজের ঊর্বর কল্পনাকে কলমের মুখে ছুটিয়ে তুলতে পারলে জীবনে তার সার্থকতাও কম নয়। কলম ধরলেন। সে কলম আর ছাড়লেন না।

'ইউলিসিস্'-খ্যাত জেমস অগেস ডাবলিন শহরে ডাক্তারি পড়তেন। ভাল লাগল না ডাক্তারি শাস্ত্র। লিখতে সুরু করলেন। প্রথম প্রথম অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচ। তারপর তাঁর কলমের মুখে নামল যেন জলপ্রপাতের স্রোত।

ডি এইচ লরেন্স ছিলেন ইস্কুল মাষ্টার। নীরস গতময় জীবন। কোন স্বপ্ন নেই। কোন সম্ভাবনা নেই। মনের বিস্তীর্ণ অবসাদ নিয়ে জীবন কাটাবেন কেমন করে ভাবতে ভাবতে নিজের মনের কথাই লিখতে সুরু করলেন। থামলেন না আর।

কবি রবার্ট ফ্রষ্ট ছিলেন মিল-শ্রমিক, তারপর চাষী, অবশেষে গ্রাম্য-ইস্কুলের মাষ্টার। একদিন সব ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে লিখতে আরম্ভ করলেন। অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি সারা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল, মুক্তির গান গেয়ে উঠল, আর তারই সুর ধরা দিল তাঁর লেখায়।

টমাস ম্যান চলেছেন একতাড়া কাগজ বগলে করে। এ আপিস থেকে সে আপিস। অফিসীয়ার দালাল। চোস্ত কথাবার্তা। বিশিষ্ট ভঙ্গী। দুই চোখ যেন সারাক্ষণ এ জগৎ ছাড়িয়ে অন্য কোন জগতের সন্ধানে মগ্ন।

দালালি ছেড়ে লেখা ধরলেন টমাস ম্যান। জার্মান সাহিত্যে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হল। নোবেল পুরস্কার পেলেন কয়েক বছরের মধ্যেই।

এক নিউইয়র্ক-প্রকাশকের কাছে পাবলিসিটি অফিসারের কাজ করতেন সিনক্লেয়ার লুইস। রাত জেগে পড়াশোনা করতেন। আর লিখতেন। শেষ পর্যন্ত প্রচারবিদের পদ ত্যাগ করে লেখকের পদ নিলেন।

"শুধু-কেরাণী" ছিলেন টি এস এলিয়ট, পি, জি ওডহাউস, ও হেনরি।

এমন কি বার্ণার্ড শ। তিনিও কিছুদিন এক ডাবলিন অর্থবিনিয়োগকারী-আপিসে কাজ করেছিলেন।

ডাক্তারি পেশা থেকেও অনেক খ্যাতিমান লেখক পাওয়া গেছে।

সমারসেট মম সেন্ট টমাস হাসপাতালে ডাক্তারি পড়তেন। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্র তাঁকে বেশিদিন ধেঁধে রাখতে পারেনি। পৃথিবী তাঁকে জানল এক অসামান্য শক্তিশালী লেখকরূপে।

আর্থার কোনান ডয়েলও ছিলেন এক পসারহীন ডাক্তার।

চেম্বারে রুগী আসে না। ব'সে ব'সে নিজের মনেই লেখেন। লিখতে লিখতে এমন হল যে, যাও বা দু-চারজন রুগী-মক্কেল ছিল, তারাও অদৃশ্য হল।

কিন্তু জগতের লাভই হল তাতে।

হার্লে ষ্ট্রীট রইল না বটে। কিন্তু অমর হল বেকার ষ্ট্রীট, তাঁর গল্পাবলির কাহিনীতে।

ডাক্তার থেকে কবি হয়েছেন দু'জন—অলিভার গোলডস্মিথ আর জন কীটস।

ম্যাকাসম গোকি প্রথম জীবনে ছিলেন নিরক্ষর মাঝি—ভল্গা বোট্‌ম্যান।

জোসেফ কনরাড ছিলেন, আহাজের খালাসী, এইচ জি ওয়েলস—এক সাধারণ দোকানম্যান।

আধুনিক যুগে অপরাধী এবং জেল-কয়েদীরাও লেখক-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এমন নজীরও আছে।

তাঁদের মধ্যে দুটি বিখ্যাত নাম—ক্যাথরিন চেসম্যান এবং বিল স্ট্যাণ্ডস।

অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী চেসম্যানকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

দশ বছর পর্যন্ত চেসম্যান আপীলের পর আপীল করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। এবং সেই অবসরে লিখেছিলেন তাঁর দু'খানি বিখ্যাত বই—নিজের জীবন এবং সংগ্রামকে অবলম্বন করে লেখা দু'টি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হয়েছিল।

ডাকাতির অপরাধে বিল স্ট্যাণ্ডস যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জেলে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন—মাই স্ট্রাগ্‌ল্ অ্যাণ্ড ফাইট।

* * *

আমাদের দেশেও অন্ধ লেখা থেকে লেখক হবার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। হাফিম লিখবেন বলে মাতৃস্বর—এ কী কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? অথবা, বর্মার সেই কাঠের গোদার শীর্ষ নিতেন বাঙালী কেরাণীর বিস্ময়কর রূপান্তর?

সামান্য হলেও নিশ্চিত মাসিক উপার্জনকে পরিত্যাগ করে যখন লেখনী সম্বল করে তিনি দেশে এলেন, তখনো তাঁর কত দ্বিধা, কত সংশয়! বাংলা দেশে শরতের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল—শরৎচন্দ্র।

অনেক টাকা খরচ করে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এলেন দুজন। সবাই ভাবল, এবার হাইকোর্টে তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যাবে। কিন্তু তা তো হল না। তাঁরা কলম ধরলেন। এবং, ছি ছি কি লজ্জার কথা! তাঁরা বাংলায় লিখতে লাগলেন।

একজন একটা নতুন যুগই এনে ফেললেন বাংলা সাহিত্যে। তিনি বীরবল, প্রমথ চৌধুরী।

অন্যজন বাংলা কথাসাহিত্যকে এক শাশ্বত ঐতিহ্য দান করলেন। তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সরকারী চাকরিতে চুল পাকিয়ে সরকারি খাতায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে জীবনের অর্দ্ধেকেরও বেশি কাটিয়ে কলম ধরলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর সে কি আশ্চর্য ব্যাপার। রসের স্রোতে বাঙালীর প্রাণ যেন ডুব দিয়ে উঠল এক নিমেষে।

বেশ তো ভাগলপুরে ওকালতি করছিলেন আর মেয়ার চোটে প্রতিপক্ষকে কাৎ করে মামলার পর মামলা জিতছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সখের লেখা অবিশ্যি কিছু ছিল। কিন্তু তাতে মন ভরল না। আদালত ছেড়ে পুরোপুরী বসলেন সাহিত্যের পূজায়। কত বড় এলো জীবনে। কত দুর্বিপাক। কিন্তু নিঃশঙ্কচিত্ত মুক্তপ্রাণ ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কলম থামেনি তাঁর।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা। ল্যাবোরেটরি। তারই তত্ত্বাবধান করেন। সর্বদিকে চোখ রেখে সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি পর্যন্ত পরীক্ষা করে নিজের প্রতিষ্ঠানকে বড় করবার কাজেই আত্ম-নিবেদন করেছেন তিনি—অন্য কোন ধ্যানজ্ঞান যে তাঁর আছে তা মনেই হয় না। তারই ফাঁকে কখন একটি লেখা লিখেছেন আর সেই লেখাকে চিত্রিত করেছেন তাঁরই প্রিয়পাত্র এক শিল্পী।

লেখাটি তাঁর অনিচ্ছাতেই এক পত্রিকায় প্রকাশিত হল। ব্যস! তারপর আর যায় কোথায়!

দেখতে দেখতে বাংলা-সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাব হল।

দেশে বিদেশে এমনি আরও কত দৃষ্টান্ত আছে, তাদের বাঁশীর মত লেখনীর দুর্বার আকর্ষণের এমনি অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে এদেশে ও ওদেশে।

চলতি দুনিয়া

ইতালীর পতিতা সমস্যা

১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ইতালীর পার্লামেন্ট পতিতাবৃত্তি-উচ্ছেদ আইন পাশ করে। এই আইন পাশের উদ্যোক্তা ছিলেন একজন বয়িয়সী বিধবা, এঞ্জেলিনা মার্লিন। তিনি একজন প্রাক্তন শিক্ষিকা। গত দশ বছর ধ'রে তিনি ইতালির পার্লামেন্টের সহযোগী সদস্যদের ওই আইন পাশ করার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। রাজ্য-সরকার পতিতাদের কাছ থেকে কর হিসেবে বছরে ২০ মিলিয়ন ডলার পেতেন। এই জঘন্য ব্যবসা রোধ করার জন্য শিক্ষিকা মার্লিন উঠে-প'ড়ে লাগলেন। তাঁর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হলো। পুরুষ সদস্যরা আইনটি পাশ করতে অনিচ্ছুক থাকার জন্যই এই দেরী হয়েছিল। এতদিন পরে ইতালির সর্বত্র পতিতা-বৃত্তি আইনত নিষিদ্ধ হলো।

কিন্তু এঞ্জেলিনার আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হলো না। সেনেটের সদস্য-পদের প্রার্থী হয়ে যে-এলাকা থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেই এলাকার দুষ্ট পুরুষ-ভোটাররা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিলো। তিনি নির্বাচনে হেরে গেলেন। শুধু তাই নয়, ১৮ হাজার পতিতাকে তিনি দুর্নীতির জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো রাস্তায় বেরিয়ে তারা ধন্দের পাকড়াও করছে। আইন পাশ হওয়াতে তাদের বরং সুবিধাই হয়েছে। পুলিশী বহি-পত্রে আর তাদের নামও লেখাতে হচ্ছেনা, ডাক্তারী পরীক্ষার হাঙ্গামের মধ্যেও যেতে হচ্ছে না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার চালাবার দায়ে ধরা পড়লেও খুব একটা শাস্তির ভয় নেই, মাত্র আটদিন কারাবাস। ইতালির বার-বনিতাদের আর্থিক অবস্থা বরং আগের চাইতে অনেক ভালো হলো। ফলে, আগের চাইতেও অনেক বেশী সংখ্যায় মেয়েরা পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করলো।

বর্তমানে ইতালিতে ২ লক্ষ স্ত্রীলোক ঐ বৃত্তি ক'রে জীবন ধারণ করে। একমাত্র মিলান শহরেই ৩ হাজার 'হাই-ওয়াকার' এবং ৮ হাজার 'কলগার্ল' রয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে ১৩ বছরের একটি বালিকার মেয়ের অধিকার নিয়ে দুই দালাল রীতিমতো এক খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে বসে।

রোম শহরে প্রতি বছর ১২ হাজার পতিতা শিকারের সন্ধানে রাস্তায় বেরোয়। টুরিন শহরের মেয়র অভিযোগ করেছেন, ওই শহরের রাস্তাঘাট এবং পার্ক অত সুন্দর, অথচ কোনো ভদ্র সন্তান বা ভদ্রমহিলার সেখানে বেড়াবার উপায় নেই। কারণ ওখানে ৩ হাজার 'ষ্ট্রীট-ওয়াকার' এবং ৮ হাজার 'কলগার্ল'।

কয়েকদিন আগে ইতালির সেনেট 'মালিন আইন' সংশোধন করেছে। কোনো স্ত্রীলোক লজ্জাজনক বা বিরক্তিকর আচরণ প্রকাশ্যে করলে তাকে পুলিশ এখন গ্রেপ্তার করতে পারবে। যদি তখন সে বাধা দেয়, তবে তার ৪ মাস জেল কিংবা ১৩৫ ডলার জরিমানা হবে। আগে মাত্র সাড়ে তিন ডলার জরিমানা আর ৮ দিনের কারাবাস ভোগ করতে হতো। যৌন-সংসর্গের প্রয়োচনা প্রকাশ্যে দিতে গিয়ে যদি কেউ ধরা পড়ে এবং তার শাস্তি হয় তবে পনেরো দিন অন্তর অন্তর তাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হতে হবে। ইতালির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে ভাবছেন, আইন প্রণেতারা নষ্ট মেয়েদের আবার হয়তো পতিতালয়ে ফিরে যেতেই বাধ্য করবেন।

• • •

মিউনিকের মডেল

দেশে-বিদেশে মিউনিকের রূপসী মডেলদের খুবই চাহিদা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জার্মানীর দীর্ঘদেহী কুমারীরা ইংরেজ, ফরাসী আর মার্কিনী যুবকদের চোখে নেশা ধরিয়েছে। আবার, জার্মানীর মধ্যে মিউনিক শহরের মেয়েরা সব চাইতে রূপসী। তার নামই হয়ে গেছে 'সুন্দরীদের শহর'। প্রায় প্রতি বছরই অসংখ্য বিদেশী শিল্পী এই শহরে হাজির হন সুদর্শনা মডেলের সন্ধানে।

• • •

জার্মান হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসক

রঞ্জিত সিংহের চিকিৎসা করেছিলেন

১৮৩৯ সালে পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিংহের মৃত্যু হয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছিলেন। ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন জার্মান চিকিৎসক ডাক্তার হেনিগবার্জার।

জয়পুরে হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তারদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডাক্তার পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তথ্য উদ্ঘাটন করেন। তবে তিনি বলেছেন যে, অনেকে মনে করেন রঞ্জিত সিংহেরও একশো বছর আগে বাংলা দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয়।

• • •

বিগত কালের প্রসাধন

কোন দেশের, কোন কালের মানুষই বা সুন্দর হতে চেষ্টা করেনি? তবে, প্রসাধনের ব্যবহার একেক দেশে দেখা গেছে একেক রকম।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ক্রিম রাখার শ্বেত পাথরের পাত্র আর গন্ধের কৌটো। চার হাজার বছর আগে মিশর-রূপসীরা যে পাত্রে প্রসাধন-সামগ্রী রাখতেন তা-ও সংরক্ষিত রয়েছে জার্মানীর ডাহ্লীজ যাদুঘরে। রয়েছে খ্রীষ্টের জন্মেরও দু হাজার বছর আগে চুলে ঢেউ খেলবার একটি যন্ত্র।

ঘন্টা ব্রোঞ্জের তৈরী। এমন কি, ঘুমোবার সময়ও কেশসজ্জা যাতে ঠিক থাকে তার জন্য ঘাড়ে লাগাবার যন্ত্র পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের ৮০০ বছর আগে গ্রীসে তৈরি দাড়ি-কামাবার ক্ষুর। পুরোনো আমলের ব্রোঞ্জের আয়না, হাতীর দাঁতের চিরুনী দেখেও অবাক না হয়ে উপায় নেই।

• • •

জাপানীরা কি দিন-দিন বধির হয়ে যাচ্ছে?

বাইরের দেশ থেকে যাঁরা জাপানে বেড়াতে যান তাঁরা একটা জিনিস দেখে খুবই অবাক হন। ওই দেশের বেশির ভাগ মেয়ে-পুরুষ, তরুণ-তরুণীরা বড়ো অন্যমনস্ক। তা সে রাস্তায়ই হোক, ট্রামে-বাসেই হোক, আর পার্কেই হোক। কাছে গিয়ে দেখা যাবে তাঁদের কাণে একটা ছোট বোতাম লাগানো। কানে কম শোনেন ব'লে কি ওঁরা যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন? না, মোটেই তা নয়। আসলে জাপানে অতি ক্ষুদ্রাকার ট্রানসিষ্টর রেডিয়োর প্রচলন খুবই বেড়ে গেছে।

• • •

আকাশ থেকে মেয়ে নামছে

আগেকার দিনের তথাকথিত লক্ষ্মী মেয়ে আর আজকের একটি আধুনিকা দুরন্ত মেয়ে—দুয়ের মধ্যে আপনার অমিল কোথায়? নতুন-নতুন কাজে, নতুন-নতুন খেলাধুলায়, শরীর-চর্চায় আজ মেয়েদের আনন্দ। ১৯৫৫ সালের পর থেকে য়ুরোপের যুবতীদের একটি প্রিয় কসরত হলো প্যারাস্যুট নিয়ে আকাশ থেকে মাটিতে অবতরণ। অনেক মেয়ে এতে পাখির মতো শূন্যে সন্তরণের আনন্দ পান। ২৭,০০০ ফুট উঁচু থেকেও অনেকে নির্ভয়ে নেমে আসেন।

• • •

লিপস্টিক না দেশের মানুষের রক্ত?

জানেন কি ভারতীয় নারীরা যে বিদেশী লিপস্টিক ব্যবহার ক'রে থাকেন তাতে করে দু'কোটি টাকা আমাদের দেশ থেকে বাইরে চ'লে যায়? অথচ দেশী লিপস্টিকের অভাব নেই। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইজন্য লক্ষ লক্ষ রোগীকে মৃত্যু বরণ কর্তে হচ্ছে। শুধু এই কাও! দেশের এই দুর্দিনেও! এই তথ্যটি জানা গেছে নিখিল ভারত জনসংঘ দলের সংগঠন সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ রাও যোশীর ভাষণ থেকে।

• • •

জার্মানীতে ভাবী দম্পতি সরকারী সাহায্য পায়

জার্মানীতে যে-সব তরুণ-তরুণী বিয়ে করতে যাচ্ছেন তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করলে টাকা ধার পেতে পারেন। মানে, মা বাবার দেয়া টাকার উপরে সেখানে তেমন নির্ভর করতে হয় না।

১৯৫০ সালের পর থেকে জার্মান সরকার নব দম্পতিকে এইভাবে সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য বিয়ের কিছুকাল আগে থেকে বর-কনেও নিজেরা বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করে।

• • •

বীট-ভক্তদের কাণ্ড

হাজার চারেক বীট-ভক্ত অপেক্ষা করছিলো পিকাডেলী সার্কাসে। কখন বীট-কবিরা আসবে তাদের দর্শনের অপেক্ষায়। কাছেই একটা সিনেমা হলের সামনে ডিউটি দিচ্ছিল ২৪০ জন পুলিশ।

রাত্রি শেষ হবার আগেই চৌদ্দ-পনেরো বছরের জন সাতেক ছেলেকে তো হাসপাতালে পাঠাতে হলো। হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য জন তিরিশকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা করা হলো।

পুলিশকে লণ্ডভণ্ড হতে বেগ পেতে হলো বীট-ভক্ত কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে। বীট কবিদের দেখার জন্য ওই মেয়েদের তো বেসামাল অবস্থা।

• • •

সবচেয়ে সুলজ্জিতা তরুণী

১৯৬৪ সালের আন্তর্জাতিক বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্কের ২২ বৎসরের তরুণী শ্রীমতী কার্টার বার্ডেন সবচেয়ে সুলজ্জিতা নারী বলে সম্মানিত হয়েছেন। নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন এমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের মা শ্রীমতী রোজেফ কেনেডি ও হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতার পত্নী শ্রীমতী কার্ক ডগলাস।

পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী জেকুলীন কেনেডিকে সুবিখ্যাত 'Fashion Hall of Fame' এর আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। আর আর নূতন সদস্যদের মধ্যে আছেন থাইলেণ্ডের রাণী সিরিকীট, ব্রিটেনের নৃত্যশিল্পিনী ডেম মারগট এবং নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের নাট্য প্রযোজক লিলহার্ট লিলারের পত্নী। সারা পৃথিবীর ২৪০০ আধুনিক সাজসজ্জার সুনিপুণা মহিলাদের ভোটেই 'Hall of Fame' এর সদস্যত্ব নির্ব্বাচিত হয়।

• • •

পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন লোকের মৃত্যু

হাজি মহম্মদ বেন বসির কেসাব্লেঙ্কা নগরীতে গত ১৬ই জানুয়ারী ১৬৬ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমান ১১০ বৎসর বয়সেও বেশ সুস্থ ও সবল দেহে জীবনযাপন করছেন। হাজি মহম্মদের ৩৪টি ছেলে মেয়ে ও ১৫২টি নাতি ও নাতনী। ১৮০০খৃষ্টাব্দে মরক্কোর অন্তর্গত গ্রা উপত্যকার টাগলাউট গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি পাঁচবার বিবাহ করেন। তিনি কেবলমাত্র সিদ্ধ তরীতরকারী ও শাকসব্জী আহার করিয়া দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। তিনি জীবনে কখনও ধূমপান করেন নাই এবং মদ্যও স্পর্শ করেন নাই।

• • •

মশার উৎপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ

অষ্ট্রেলিয়ার নিউকেসেলের ১৮ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে নিউকেসেল নগরীর নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে পার্শ্ববর্তী জলা হইতে মশককুল তীব্রণ বাধা দিয়া কাজ স্থগিত রেখেছিল। তারা এমন প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছিল যে ১২জন বিলডার ও রাঘার তাদের যন্ত্রপাতি ফেলে প্রাণভয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইউনিয়ন সমূহের প্রধান ব্যক্তিগণ ও কণ্ট্রাক্টারদের মধ্যে আলোচনার পর মশকনাশক প্রতিষেধক ব্যবহার করে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে।

—:—

অশান্ত পৃথিবী

নলিনীরঞ্জন মিত্র

রোডেশিয়া

বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রোডেশিয়া। মধ্য আফ্রিকার এই দেশটি আজ সমগ্র পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমস্যাটি কিন্তু কিছু অভিনব নয়। সেই পুরোনো ইতিহাস—শ্বেতাঙ্গ ইউরোপ কর্তৃক কৃষ্ণ আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী। যেভাবে ইংরেজ জাত ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলিকে শাসন ও শোষণ করেছিল ঠিক সেভাবেই তারা আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদ-নীতির দ্বারা এক বিরাট অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বর্তমান রোডেশিয়া সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর টেক্কা দিয়েছেন তাদেরই তৈরী ক্রাইস্টচার্চ-আয়ান স্মিথ। যেখানে ৪০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ লোক বাস করে, সেখানে মাত্র দুলক্ষ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর নেতা আয়ান স্মিথ গত ১১ই নভেম্বর ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন না নিয়েই একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তবুও এ ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইলসনের ভূমিকা খুব স্পষ্ট হয়নি। আয়ান স্মিথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও তার ব্যর্থতা এবং বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে তার টালবাহনা বিশ্ব জনমতের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, সমগ্র ঘটনার পেছনে কার যেন অদৃশ্য হাত রয়েছে।

বৃটেনের প্রভূত বাণিজ্য স্বার্থ জড়িত রয়েছে এই অঞ্চলে। রোডেশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তাদের বিরাট বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগাল রোডেশিয়ার সমর্থক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করতে পারেননি। তারা শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী-করবার জন্যে ব্রিটেন বিশ্ববাসীর সহযোগিতা কামনা করেছে। ইতিমধ্যেই তামাক ও তৈল সরবরাহ

বন্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, রোডেশিয়ার বাইরে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তারা মনে করেন, এটা শুধু রোডেশিয়ার আভ্যন্তরিণ সমস্যা নয়; এ সমগ্র আফ্রিকার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের এক চ্যালেঞ্জ। এবং আফ্রিকাবাসী এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। OAU-এর সম্মেলন হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আফ্রিকার এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরই অনৈক্য রয়েছে। স্বভাবতই ব্রিটেন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র এই অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। এমনকি রোডেশিয়ার দুই প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ নেতার মধ্যেও সদ্ভাব নেই। কয়েকটি রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগেরবিরোধী। তারা সমস্যাটি জাতি সঙ্ঘের হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যা আলোচনার জন্যে তাঁদের রাজধানী লাগোসে কমনওয়েলথ সম্মেলন আহ্বান করেছেন। ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে লাগোসে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং আশা করা যায়, লাগোসে রোডেশিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও এই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

রোডেশিয়া সমস্যার সঙ্গে আবার জাম্বিয়ার প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। জাম্বেসী নদী জাম্বিয়া ও রোডেশিয়াকে ভাগ করেছে। ঐ নদীর পারে কারিবা বাঁধ ও একটি বিদ্যুতাগার তৈরী হয়েছে। বিদ্যুতাগারটি কিন্তু রোডেশিয়ার ভিতরে অবস্থিত; সুতরাং অস্ত্রটি স্মিথের হাতে—যে-কোন সময়ে তিনি জাম্বিয়াকে 'শায়েস্তা' করবার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। এমতাবস্থায় জাম্বিয়াকে এক বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এবং রোডেশিয়ার প্রশ্ন জটিল থেকে জটিলতর হবে।

বর্তমানে ভারতসহ এফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রবর্গের দাবী—অবিলম্বে রোডেশিয়ার বে-আইনী সরকারের পতন চাই। ব্রিটিশ সরকারকে কঠোরতর নীতি অবলম্বন করতে হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সেখানকার শাসনব্যবস্থা কৃষ্ণাঙ্গদেরই হাতে দিতে হবে। এবং আয়ান স্মিথকে তার বেয়াদপির শাস্তি পেতে হবে।

রোডেশিয়ার স্মিথ সরকার এখনও তাদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ, যারা মুখে শান্তির কথা বলেন এবং বর্ণবিদ্বেষের প্রতি সর্বদাই জেহাদ ঘোষণা করেন, তারা এ ব্যাপারে নীরব। আরও আশ্চর্যের বিষয় আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রবর্গ যারা মুখে শক্তিপ্রয়োগের ভয় দেখিয়েছিলেন তারাও এখন নির্বাক। উইলসন সরকার পুরোমাত্রায় অর্থনৈতিক বয়কটের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এই পদ্ধতিতে স্মিথ সরকারকে বশে আনা যাবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও কঠোর নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

ভিয়েৎনাম

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ এই ভিয়েৎনামে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তাঁবেদার সরকারের রক্ষাকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট জনসন। যদিও তাঁর নিজের দেশবাসী চায় না রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রাম। ভিয়েৎকং গেরিলা যোদ্ধারা প্রাণপণ সংগ্রামে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনে ব্রতী হয়েছে! এবং একথা জগতের

বড়দিন উপলক্ষে কয়েকঘণ্টার যুদ্ধ বিরতি স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশাকে কিছুটা উজ্জ্বলতর করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'Peace offensive' পৃথিবীতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, সোভিয়েট ইউনিয়নও শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে। মিঃ খ্রুশ্চেভ আলোচনার জন্যে জেনেভায় এসেছেন। এদিকে প্রেঃ জনসনের ব্যক্তিগত দূত গোল্ডবার্গ ও হ্যারিম্যান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তির পথ অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। তাঁরা ১৯৫৪ ও ১৯৬২-এর জেনেভা চুক্তির উপর ভিত্তি করে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন, সবদিক থেকে একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হ'তে চলেছে। আমরা শান্তিকামী জনগণ আশা করবো যে অচিরে যেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়।

ভিয়েৎনামের অধিবাসীগণ মাত্র কয়েকদিন শান্তির স্বাদ উপভোগ করেছেন। আমেরিকান বোমাবর্ষণ পুনরায় সুরু হয়েছে। ফলে অগণিত ভিয়েৎনামবাসী নিহত হচ্ছেন। নিরাপত্তা পরিষদ ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ আলোচনা করতে মনস্থ করেছে। এদিকে প্রেঃ জনসন খুব নাটকীয় ভাবে হনলুলুতে শান্তি আলোচনায় যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেখানে তিনি সায়গন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই দুই সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য দূর করবার চেষ্টা করবেন। ভিয়েৎনাম সমস্যা নিয়ে জনসন সরকার বিশেষ বিব্রত বোধ করছেন কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটার এই নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। আশা করা যায় এই সপ্তাহেই ভিয়েৎনাম পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে।

নাইজিরিয়া :

সবেমাত্র কমনওয়েলথ সম্মেলন শেষ হয়েছে। নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় এই কমনওয়েলথ সম্মেলনে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতখানি কার্যকরী হচ্ছে তা দেখবার জন্যে এক পর্যবেক্ষক সমিতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ নাইজিরিয়ার রাজনৈতিক আকাশ অশান্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে সৈন্যবাহিনীর এক বিদ্রোহীদলের অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এখন বন্দীদশায় জীবন যাপন করছেন। কয়েকজন আঞ্চলিক প্রধানমন্ত্রীও নিহত হয়েছেন। বর্তমানে সৈন্য ও পুলিশবাহিনীকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদলের নেতারা সামরিক শাসকের হাতে ক্ষমতা সমর্পন করেছে। এই নিয়ে মাত্র একবছরের মধ্যে আফ্রিকার দুটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলো। নয়া আফ্রিকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এই দ্রুত পট পরিবর্তন সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর নেতা জেনারেল আয়রন্সি সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

॥ শীতের সময় গরম পোষাক ॥

আত্তা পাকড়াশী

শীতকালে পিঠে পায়েসের সঙ্গে গরম গরম কড়াই শুঁটির কচুরি বা ফুলকপির সিঙ্গাড়া আমাদের রসনার পক্ষে যেমন উপাদেয়, ঠিক তেমনি নতুন ধরণের শীতের পোষাকও অঙ্গাবরণের জন্য লোভনীয়। তবে নতুন কিছু প্রত্যেক বছর তৈরী করা বা কেনা অসম্ভব ব্যয়সাধ্য, তাই আসুন পুরনো জিনিষকেই কেমন করে নতুন ধরণে বা রুচিসম্মত ভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই আলোচনা করি। খরচে কুলোলে দু একটা নতুন জিনিষ তৈরী করেও নেওয়া যাবে বৈকি।

আগে আসছে কাকে কি মানায় সেই কথা। সোয়েটার, কার্ডিগান, ক্লোক, হাত লম্বা ব্লাউজ, শাল, সকলের সবই আছে, কিন্তু মানিয়ে ব্যবহার করতে হবে, তবেই সেটি দৃষ্টিসুন্দর হবে।

যাঁরা একটু মোটাসোটা ক্লোক বা কার্ডিগান তাঁদের জন্য নয়। এতে পেটও পিছন উৎকট দেখাবে। আপনার বয়েস কম হলেও পরবেন না। বরং একটু হাল্কা রংএর শাল ব্যবহার করবেন।

যাঁরা বেশ লম্বা, ছিপছিপে শরীরের অধিকারিনী তাঁরাই ঐ কার্ডিগান বা ক্লোক পরবেন। যাঁরা বেশী মোটা তাঁরা একটু ঝুলো ধরণে বোনা চিলে কার্ডিগান পরুন। সুন্দর মানাবে। কিম্বা হাফকোট অবশ্যই কলার দেওয়া ও চিলে হাতের পরবেন। অনেক সেকেলে বাড়ীতে সুন্দর কাজ-করা চারকোনা শাল আছে। এগুলিকে রুমাল বলা হত। ছোট মেয়েদের ব্যবহারের জন্য আগেকার দিনে এগুলি ব্যবহৃত হত। এখন তো আবার সেই সব আগেকার ম্যাজেন্টা ও আসমানী রং ফিরে এসেছে। ঐ শাল মাঝখান দিয়ে ভাঁজ দিলে তিন কোণা হল। পিঠের দিকে কাজটি রেখে কাঁধের দুপাশ দিয়ে টেনে নিন। বেশ সুন্দর দুটি পাথর বসান বা ভাল কাজ-করা ব্রোচ কিনুন। কাঁধের দুপাশে ঐ দুটি ব্রোচ লাগিয়ে ঐ রুমাল পরুন, নিঃসন্দেহে নতুন ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে যাবে এটি। যদি পার্টিতে বা নেমন্তন্নেও যান চমৎকার হবে। রং খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে রং করিয়ে নেবেন। একটু ফুটোকাটা থাকলে রিপু করিয়ে সাচ্চ রং করাবেন। কাশ্মিরী কাজের বা কাথিওয়াড়ী কাঁচের কাজ-করা ক্লোকএর তারী সুন্দর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাদা ক্লোক পরবেন ঘন উজ্জ্বল রংএর শাড়ীর সঙ্গে

আর কালো বা নেভি কিম্বা গাঢ় নীল (এই ক'টি রং-এর ক্লোকই ভাল লাগে) রং-এর ক্লোক বা শাল মানায় হাল্কা রং-এর শাড়ীর ওপরে। এই ক্লোক বা কার্ডিগান কিন্তু কম বয়েসীদেরই বেশী মানায়।

এবার শাল। সেকালের চওড়া পাড় দোশালাকে এক ভাজ করে গায় দিয়ে যে কোনও পার্টিতে বা নেমন্তন্নে যেতে পারেন। পাড়ের ধার দিয়ে চিরে দিয়ে থাকলে রং মিলিয়ে ভেলভেট বা সিল্কের মুড়ি লাগিয়ে নিন চারধার দিয়ে। বহুদিনের সুন্দর মানাবে। এছাড়াও চমৎকার সব ডিজাইন আছে। সবসময় ব্যবহারের জন্য। সুতির মণিপুরী শাল খুবই সুন্দর। বেশী শীত পড়লে কটন উল বা সার্জের একটি ফুল হাতা ব্লাউজ পরুন। একটি হাত-কাটা কোটি (ওটি বোনা হলেই ভাল হয়) গায়ে দিন, তার সঙ্গে শাল।

থ্রি কোয়ার্টার স্লিভের কটন উলের ব্লাউজ সবচেয়ে আরাম দেয় শীতে। আর গরমেও আরাম দেবে। একটি হাল্কা রং-এর যেমন ক্রীম কালার বা বাদামী রং-এর আর একটি লাল বা কালো, এই হলেই তো প্রায় সব শাড়ীর সঙ্গে চলে যায়। ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই ব্যবহার করতে পারেন। আর যাঁরা বুনছেন তাঁরাও যদি একেবারে টুকটুকে লাল একটি ও একটি কালো থ্রি কোয়ার্টার হাতের ব্লাউজ বুনে নেন সেও সব শাড়ীর সঙ্গে পরতে পারবেন।

শীতের সময় বিয়েও হবে, নেমন্তন্নও আসবে—ঐ সময় দামী শাড়ীর ওপরে বেনারসী ট্রেলি বা আউরঙ্গবাদী জরদাজরীর কাজের শালও বড় সুন্দর মানায়। যাঁরা বয়স্কা তাঁরাও গয়নার ওপর সাদা বেনারসী ট্রেলি, শালের মত করে ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে সুন্দর একটি আভিজাত্যের অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে। অবশ্যই এই সঙ্গে নামিয়ে চটি আর ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ঝিনুক আর মুক্তোর গয়নার সঙ্গে সাদা দামী শাল বা বেনারসী ট্রেলি খুব সুন্দর মানায়।

কম বয়েসীরা গাঢ় রং-এর বেনারসী ট্রেলি বা মুক্তোর সঙ্গে বোনা কার্ডিগান ব্যবহার করুন। ঝুটো মুক্তো ওজন দরে কিনে বোনবার সময়তেই সেগুলি লাগিয়ে নিতে পারেন বা পরেও ঐ এক রংএর উল দিয়ে ওপর থেকে টেঁকে নিতে পারেন। হাল্কা রং-এর কার্ডিগান এর ওপর কালো বা লাল পুঁথিও সুন্দর দেখায়। যাঁরা শলমা চুমকির কাজ জানেন তাঁরা শালের মাপের ভেলভেট কিনে নিন। লাল বা কালো ভেলভেটের ওপর শলমা চুমকির কাজ করে সেটি শালের বদলে ব্যবহার করুন। দামী শাড়ীর ওপর খুব সুন্দর মানাবে। যদি তেমন গরম চান,তবে ঐ রংএর কটনউল বসিয়ে নিন। একটি ভাল কোট করতে বা অনেক চওড়া কাজের একটি শাল কিনতে যা খরচ তার চেয়ে কম খরচেই আপনি সুন্দর জমজমাট শলমায় আনকোরা একটি নতুন শাল পেতেন।

এবার এই গরম কাপড়গুলি ব্যবহার করবার বিষয় কিছু বলি। যেমন সকালের দিকে সব বাড়ীর মেয়েরাই কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন, এসময় যা কিছু গায় দেবেন সেগুলি নিঃসন্দেহে গাঢ় রংএর আর কমদামী জিনিস ব্যবহার করবেন। অথচ যেন খুব সুন্দর হয়।

শীতকালে দুপুরের দিকেও বেড়াতে আসেন কেউ কেউ; সুতরাং স্নানের পর অল্প একটু প্রসাধন করে বেশ সুন্দর একটি সুতীর মণিপুরী শাল বা কটন্ উলের ব্লাউজ ব্যবহার করুন। যদি সুতির হাতলম্বা ব্লাউজ ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আপনার হাতদুটি সুন্দর থাকবে। কাটবে না বা রোদ পোয়াতে বসলে রোদের ছাপ পড়বে না। বেশ সুন্দর রংএর ছাপা খদ্দর বা লিনেন খুব আরাম দেবে। দেখাবেও ভাল। পায়ে চটি পরা অভ্যেস করুন, পা ভাল থাকবে।

বিকেলে বেড়াতে যান বা বাড়ীতে থাকুন, বেনারসী ক্রেপ বা মুক্তোবসান কার্ডিগান না হলেও একটু ভাল কিছু গায় দিন। আবার রাত্রে সেটি ভাঁজ করে একটি পুরনো কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিন। সহজে ময়লা হবে না।

গরম জামা কাপড় সব সময় অল্প গরম জলে কাচবেন। আছড়াবেন না, মসড়াবেন না। আলতো করে চেপে চেপে কাচবেন। বীচের জল বা গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাচলেই ভাল থাকে। সোয়েটার বা কার্ডিগান কখনো টাঙিয়ে শুকোতে দেবেন না। মাটিতে বা সম্ভব হলে চৌকিতে পুরনো খবরের কাগজ পেতে বেশ করে টেনে টেনে ঠিক কাচবার আগে যে মাপের ছিল সেই মাপে এনে দিয়ে শুকোবেন। তারপর জামাটি উল্টে নিয়ে তার ওপর একটি পাতলা ভিজে কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করবেন। দেখবেন কেমন সুন্দর নতুনের মত হয়ে যাবে। গরম জামা কাপড় সাবান জলে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে দেবেন না, তাহলেই রং জলে যাবে। গরম কাপড় বা সিল্কের কাপড় বেশী কাচলেই কিন্তু তার ঘাহায় চলে যায়। সেইজন্য একটু সাবধান হয়ে ব্যবহার করবেন। গায়ের পাশে বা সিল্কের শাড়ীতে হঠাৎ কিছু পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গাটির যত্ন নেবেন। শুধু ঐ স্থানটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেবেন। এতে আপনার কাচবার পরিশ্রমও বাঁচবে আর জিনিষগুলিও অনেকদিন পর্যন্ত ঝকঝকে সুন্দর নতুনের মত থাকবে। ব্যবহার করে আনন্দ পাবেন আর গর্বও বোধ করবেন।

* * *

জেমস ম্যাডিসনের মনে তখন আর কোন আশা নেই, বিশ্বাস নেই। সে দুর্বল, ভীত, প্রচণ্ড অবসাদের ভারে একেবারে ভেঙে পড়ছে। এ জীবনটাই অর্থহীন। তার দ্বারা আর কিছুই হবে না, এইটে সে নিশ্চিন্ত ভাবে জেনেছে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সংস্পর্শে এলো সে।

মহাপণ্ডিত ব্যক্তি এই ফ্র্যাঙ্কলিন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল ম্যাডিসন, কই আর দশজনের মতো তিনি তো তাঁর কাজের ভুল ধের করছেন না, তা ছাড়া বিতর্কণ লোক, আর পাঁচজনে যেমন তীব্র তিক্ত কটু সমালোচনা করে থাকে, তাও তো তিনি করছেন না!

বরং উল্টে তিনি ম্যাডিসনের মধ্যে যেখানে যতটুকু ভালো দেখতে পাচ্ছেন তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করছেন।

এর মানে কি!

এর মানে ইতিহাস জানে, তার পাতায় লেখা রয়েছে সে দিনের সেই হতাশ যুবকটি ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কর্মের উদ্দীপনা, তিনিই "Father of the constitution", তিনিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট।

মানুষের নিহিত শক্তির উৎস উন্মুক্ত হয়ে যায় উৎসাহ পেলে—আর আমরা সেইটুকুই দিতে পারি না।

নাম মাত্র খরচায় রূপ ও শ্রী

সুরঞ্জনা সেন

যে সব বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রসাধন দ্রব্য বিক্রি ক'রে থাকেন তাঁরা নিজেরাই বলেন, ওই সব জিনিষ যে চড়া দামে বিক্রি করতে হয়, তার কারণ প্যাকিং করার খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ আর তাদের ট্রেডমার্কের জিনিসগুলির দাম আসলে খুবই কম। কিন্তু তৈরি অবস্থাতে যখন দোকানে আসে তখন ক্রেতাদের বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়।

রান্নাঘরে, ওষুধের বাক্সে, কিংবা কাছাকাছি ডাক্তারখানাতেই কিন্তু অধিকাংশ প্রসাধন-দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সব জায়গা থেকে সংগ্রহ করলে দাম খুবই কম পড়ে।

সুন্দর ত্বকের জন্য

(১) মুখে ব্যবহারের পক্ষে সবচাইতে ভালো জল হলো নরম জল। কঠিন জলে মুখের শুষ্কতা আরো বৃদ্ধি পায়। কঠিন জল সিদ্ধ ক'রে নেবার পর কিছুক্ষণ রেখে দিলেই তা নরম জলে পরিণত হয়। অথবা একটু সোহাগা বা টিংচার অব বেনজোইন দিয়ে নিলেই কঠিন জল নরম জলে রূপান্তরিত হয়।

(২) আপনার ত্বক যদি এমনিতেই শুষ্ক হয় তা হলে বারে বারে সাবান লাগাবেন না। তাতে দেহ থেকে স্বাভাবিক ভাবে নিঃসৃত তৈলের ঘাটতি ঘটে, এবং ত্বক খসখসে হয়ে যায়। বরং আপনি নিয়মিত তৈল অথবা ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।

(৩) বেশিক্ষণ রোদে কাটালে আপনি গায়ে তিনিগার মাখবেন। এতে আপনার ত্বক মসৃণ থাকবে। কড়া চায়ের জল ব্যবহার করলেও ঐ একই ফল পাওয়া যায়।

(৪) সারা মুখে কী রকম দাগ পড়েছে? ঘাবড়াবার কিছু নেই। কয়েকটুকরো সাবান, কয়েক ফোঁটা ব্লিচিং অ্যামোনিয়া আর তার তিনগুণ গোলাপজল মিশিয়ে একটা ক্রীম তৈরি করুন। মুখে মেখে মিনিট পাঁচেক রাখার পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

সুন্দর চুলের জন্য

(১) পরিষ্কার জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলে দিয়ে তাই চুলে মাখুন। জলে যেন লেবুর বীচি না পড়ে। জলটা মাখবেন শাম্পু করার পর।

(২) চুল সুবিন্যস্ত রাখার জন্য চুলে একটু সর-তোলা দুধ মেখে নিতে পারেন।

(৩) সুগন্ধি চুলের জন্য মাথায় মাখবেন কোলোন। তবে শুষ্কতাই যাদের চুলের বৈশিষ্ট্য তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নয়।

ঝলমলে চোখের জন্য

(১) চোখের পাতায় একটু ভ্যাসলিন মেখে নিলে বেশ ঝলমলে দেখায়। তেল ব্যবহারে চোখের ভ্রূ বৃদ্ধি পায় এবং চোখের পাতার শুষ্কতা দূর হয়।

(২) চোখ লাল হলে ঠাণ্ডা জলে সমান পরিমাণ চুনের জল মিশিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে চোখের পাতার উপর রেখে অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন।

সুন্দর হাতের জন্য

(১) হাতে যদি সবসময়ে একটা স্যাঁতস্যাতে বা ভেজা-ভেজা থাকে তবে হাতে একটু বেবী পাউডার মেখে নেবেন।

(২) আপনার হাতে কি রকম দাগ? লেবুর রস নিয়মিত মাখুন। পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(৩) নখের স্বাস্থ্য যদি খারাপ হয় তবে যে-সব খাবারে 'এ' ভিটামিন বেশি থাকে সেই খাবার বেশি ক'রে খান।

স্নানের জন্য

(১) স্নানের জলে একটু লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এতে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য আর রং দুইয়েরই উন্নতি হবে।

(২) পায়ের চামড়া যদি খসখসে হয় তাহলে পায়ে ভালো ক'রে বেবী অয়েল মাখবেন।

পায়ের জন্য

ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরবেন পায়ে বেশ ক'রে কোল্ড ক্রিম মেখে ম্যাসেজ করবেন। তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

• • •

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন পঞ্চম চার্লস—হোলি রোমান এম্পায়ার স্পেনের সম্রাট—কত শক্তি তাঁর—কত দক্ষতা তাঁর যুদ্ধ বিদ্যায়।

অনেক যুদ্ধ জয় করলেন তিনি কিন্তু মানুষকে জয় করতে পারলেন না। তিনি মানুষের কেবল দোষটা দেখতেন, দেখতেন তার দুর্বলতা। সিংহাসন লাভের পর যখন বেশ শাসনের সময় উঠলো তখন তিনি শাসক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারলেন না ঠিক মতো। ফলে তাঁর বিরাট রাজ্যে ধরল ভাঙন।

এরই পাশাপাশি আর এক চিত্র—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে মিত্র পক্ষের অন্যতম সেনাপতি জর্জ মার্শালের লক্ষ্য ছিল কে কোথায় কতটুকু রণদক্ষতা প্রদর্শন করেছে তার ওপর। তিনি বেছে বেছে এমন সব অফিসার এমন সব যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাতেন যে তা।। যুদ্ধ জয়ের মন্ত্রে দীক্ষা করতো অনুপ্রাণিত প্রেরণা, অপরিসীম উদ্দীপনা।

মানুষের শক্তিকে চিনতে পারার মধ্যে যে মানবিক সম্পর্কের উন্মোচন হয়—এ পৃথিবীতে সেই সম্পর্কই রাজ্য ভাঙাগড়া ইতিহাসের ওঠাপড়ার মধ্যে কাজ করে চলেছে।

ঘর না ফুলের বাগান

প্রতিমা চক্রবর্তী

আপনি কি সারাটা শীতকাল নিজের ঘরে বসন্তের আবহাওয়া রাখতে চান? তাহলে পুরোনো একটা কায়দাতেই করুন না। ফুল পাতা ঘাস ইত্যাদি অতি সাধারণ উপকরণের সাহায্যেই তা সম্ভব। এই সব ফুল এবং ঘাস আপনার নিজের বাগানে বা বাড়ির আশেপাশে থেকেই পেতে পারেন।

এইসব ঘাস পাতাকে শুকিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রিরও প্রয়োজন হয় না বা পয়সা খরচের ব্যাপারও নেই। যে ঘর বেশ শুকনো, তার সিলিং থেকে ঘাস পাতা বা ফুল ছোড়া করে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। আর চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় ফুল কাঠের বাক্সে বালির মধ্যে রেখে বালি দিয়ে ঢেকে রাখুন। অন্ততঃ চার পাঁচ দিন।

ফুলগুলি যখন বেশ শুকিয়ে যাবে, তখন আসবে আপনার পরবর্তী কাজ অর্থাৎ রং-করা। লক্ষ্য করবেন যে, সাদা ফুলগুলি শুকিয়ে তাতে রং করলেই রং বেশী খোলে এবং সাদার ওপর প্রত্যেক রং করার পক্ষে সুবিধা। আর যদি ঘন রং দিতে চান তাহলে শুকনো রঙিন ফুলেই তা ব্যবহার করবেন। অবশ্য কি রং দেবেন তা নির্ভর করবে আপনার রুচি শিল্প সম্মত কিনা তার উপর। রং লাগাবার আগে হাতে রবারের দস্তানা লাগিয়ে নিতে পারেন তাতে আপনার হাতে রং লাগবার ভয় থাকবে না।

শুধু ফুল কেন চেঁকিশাক, খেজুরের পাতা, দেবদারু পাতা, নানাপ্রকার বড়ো বড়ো ঘাস যার আগুলি খুব নরম, ইত্যাদি শুকিয়ে নিলেও দেখতে বেশ লাগবে। তিনভাগের দুভাগ জল আর তিন ভাগের একভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে তাতে এইসব পাতা, এবং ঘাস সপ্তাহ-খানেক ভিজিয়ে রেখে তারপর তুলে নিন।

এরপর ইচ্ছে করলে আপনি রংও করতে পারেন নিজের খুশীমতো, কিংবা প্রকৃতির রাজ্যে যে-রকমটি দেখা যায়।

শুধু ফুলের রং নয়, সৌরভকেও বেশ কিছুটা সময় ধরে রাখা সম্ভব। এই করতে গেলে গোলাপ, জুঁই, ইত্যাদি ফুলগুলির পাপড়িগুলি শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর বিভিন্ন আতরে সেই ফুলগুলিকে ডুবিয়ে নিন।

বাগানে ফুল নেই? ঘরে বাইরে সর্বত্র ফুলের অভাব? তাতে ভয় কিসের? আপনার ঘরে তো এখন ঘাস-পাতা ফুলের ছড়াছড়ি, শুধু চেয়ারের নয়, বর্ষে সজ্জেও তারা আসনের কাছাকাছি। দোকান থেকে প্লাস্টিক কিংবা কাগজের তৈরি ফুল না কিনে শুকনো ঘাস ফুল-পাতা দিয়ে মনের মতো করে ঘর সাজিয়ে দেখুন এতে কতখানি আনন্দ, আর তৃপ্তি।

বাগানের ফুল নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু কতটুকুই বা তার আয়ু! কিছু কিছু ফুল তো ভোরের শিশিরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ব'সে অতি সহজে আপনি যে ঘাস-ফুল-পাতা মনোহারী ক'রে ফুলদানে রাখবেন তা আপনি রেখে দিতে পারেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বেশ কয়েক বছর তবু ম্লান হবে না তার পাপড়ির রং, বিস্মিত হবে না তার সৌন্দর্য। কারণ তা আর শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, আপনারও রচনা। এই কারণেই এই শিল্প-কর্মটি অনেক জায়গাতেই ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ফুল-পাতা-ঘাস আপনি রচনা করেছেন তা ব্যবহার করতে পারেন নানাভাবে। যদি আপনি ফুল-বিলাসী হন, কিংবা কোনো ফুলের স্মৃতি নয়, ফুলটিকেই বহুদিন রেখে দিতে চান তাহলে সেই ফুলটিকে ওই ভাবে শুকিয়ে নিয়ে এবং রং ক'রে অ্যালবামে রেখে দিতে পারেন। যেমন ক'রে আপনি ফটো রাখেন। এই ধরণের অভিনব অ্যালবাম প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে আপনি তাকে বিস্মিত শুধু নয়, আনন্দও দিতে পারেন। উজ্জ্বল বর্ণের ফুল ফ্রেমে ছবির মতো করে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখবেন আপনার ঘরের চেহারাই পাল্টে গেছে। আজে-বাজে ছবি টাঙিয়ে রাখার চাইতে অনেক ভালো লাগবে। কাচের আবরণের আড়াল থেকে ছবিগুলি হাসি-খুশী মুখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে ফুলের রঙের সাথে যাতে ফ্রেমের রং বেশ মানানসই হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সাদা ফ্রেমে অনেক ফুলের বেশ রং খোলে। শুকনো ফুল কিংবা পাতা চা বা কফির টেবিলে রেখে কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখুন; দেখবেন আপনি এবং আপনার অতিথি উভয়ই মুগ্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন। আপনার তৈরি ফুল সুন্দর টবে সাজিয়ে রাখুন; বহুদিন আপনার ঘরের আবহাওয়া সজীব, মনোহর রাখবে। টবে আবার ফুল ক'রে জল দেবেন না যেন। দেখুন তো কত সুবিধা। টবে ভরা ওই ফুল আলমারি কিংবা বিছানার ধারে টিপয়ে রেখে দিতে পারেন। আর সুগন্ধের ব্যবস্থাও তো আগে থেকেই ক'রে রেখেছেন। বৃষ্টির জন্য বাইরে বেরুতে পারছেন না? তাতে কী হয়েছে, আপনার ঘরখানাকেই তো সুন্দর একটি ফুলের বাগান ক'রে রেখেছেন।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

"আজি হতে শতবর্ষ পরে"—পুণ্যশ্লোকা তাসখন্দের শিক্ষালয়ে বসে সেখানকার ছাত্র প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী পড়ছে—

মহামানবের উদয়-তীর্থ ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছিলেন এক যাদুকর ১৯৬৬ সালের শীতঋতুর বর্ষারম্ভে। সেই ছোট্ট বিরাট মানুষটির এক হাতে ছিল চক্র, আর এক হাতে পদ্ম। দুর্মদ শত্রুকে পরাভূত করেছেন তিনি। আবার তারই জন্যে এনেছেন শান্তি ও প্রীতির পুষ্প উপহার। তাঁর সাপখেলাবার বাঁশী বাজল তাসখন্দের পথে, সারা পৃথিবী সেই বাঁশী শুনে সম্মোহিত হল। যে জন্ম-শত্রু বিদ্বেষে হিংসায় প্রতিনিয়ত ছোবল মারবার জন্যে উদ্যত ছিল, তার অন্তরেও বুঝি অনির্বচনীয় কাঁপন জাগল। তাসখন্দের মিলন সভায় ঘটল পৃথিবীর এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। তারপর প্রচণ্ড কর্মের চাপে ক্লান্ত ও নিদ্রিত সেই মহামানবের শিয়রে এসে দাঁড়াল রাজদূত, বললে, "সময় হয়েছে, সেখানে আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্যে রাজাধিরাজ অপেক্ষা করছেন, আসুন আমার সঙ্গে।" ছোট্ট মানুষটি বললেন, "আমার কাজ কি শেষ হয়েছে?" রাজদূত বললে, "যা করেছেন, আপনাদের দেশে এতাবৎ তা আর কারুর দ্বারাই সম্ভব হয়নি। আপনার পরমতম শত্রুও আজ আপনার কথা ভেবে আবেগে স্পন্দিত হচ্ছে। যা বাকি রইল তা করুক আপনার দেশবাসীরা। আসুন, আর দেরী নয়।"

পরমাশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটে। মানুষের কাঁধে কাঁধে ছোট্ট মানুষটি চলেছেন শেষ যাত্রায়। কিন্তু উনি কে? অত সবাইয়ের সঙ্গে কাঁধ দিয়েছেন? উনিই সেই শত্রুদলের নেতা না? আশ্চর্য, হ্যাঁ, তাইত।

সত্যি, শাস্ত্রীজী যা করে গেলেন আমাদের দেশে আর কারুর পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি—শত্রুর কাঁধে চেপে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করা, ইতিহাসে এর নজির নেই। তাসখন্দে পাকিস্তানে ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় নেতার মৃত্যুতে এতখানি শোকের চিহ্ন দেখা যায়নি। এই ঘটনাটি আজ আমাদের মনে গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছে। তাসখন্দের বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ যখন শাস্ত্রীজীর শবাধারটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পাকিস্তানী হাইকমিশনার আর্সাদ হোসেন কেঁদে ফেলেছিলেন। দিল্লীতে রামলীলা ময়দানের শোকসভায় পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী গোলাম ফারুকের মর্মবেদনার

আন্তরিক উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করেছে। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর খবর পরিবেশনে পাকিস্তানী পত্রিকা-গুলি যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছে তাও তোলবার নয়। সেদিন সমগ্র পাকিস্তানে সর্বত্র পতাকা ছিল অর্ধনমিত। আয়ুব তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। বহু অনুষ্ঠান-অধিবেশনও স্থগিত রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের নানাস্থানে শোকসভা করে সেখানকার মানুষ ভারতের এই নেতার প্রতি তাদের অন্তরের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। পাকিস্তানী সংবাদপত্রের লেখায় এক আশ্চর্য নতুন সুর শোনা গিয়েছিল, শাস্ত্রীজীকে মহান নেতারূপে বন্দনা জানিয়ে বলা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যু এক মারাত্মক আঘাত, কেবল ভারতের প্রতি নয়, কেবল পাকিস্তানের প্রতি নয়—সারা বিশ্বের প্রতি। শাস্ত্রীজী তাঁর জীবন আহুতি দিয়ে দুই দেশের হৃদয়কে কাছাকাছি এনে দিয়ে গেলেন। এমন আশ্চর্য ঘটনা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারেনি।

• • •

সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর তদন্তের ফলে যে প্রকাণ্ড রিপোর্ট বেরিয়েছে তা পড়ে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। কিছুদিন আগে ঐ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ঘুষের উপর দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ভার নিয়েছিলেন। এগুলির সঙ্গে ৩১ জন গেজেটেড অফিসার এবং ১৯০ জন অন্যান্য সরকারী কর্মচারী জড়িত ছিল। ২৮টি ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ করা হয় এবং মামলা দায়ের করা হয়। ঘুষ নেওয়া, অপরাধমূলক অসদাচরণ, প্রতারণা এবং অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগে ৪জন গেজেটেড অফিসার এবং ১৮ জন নন-গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ১২টি মামলায় অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং মোট ১১,৭৫০ টাকার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী মহলে দুর্নীতি যে কী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা বুঝতে দেরী হয় না! শুধু কেন্দ্রে নয়, প্রত্যেক রাজ্যেই এই বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীরাই যদি এই ধরণের কার্যকলাপে লিপ্ত আছেন জানা যায় তাহলে তাঁদের যোগসাজসে জনসাধারণও যে বেপরোয়া হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে।

বাংলা রাজ্যও পেছিয়ে নেই। এখানেও সরকারী মহলে নানা লীলা-খেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। এই তো সেদিন খবর পাওয়া গেল, এই রাজ্যের একটি শিল্প কর্পোরেশনের এক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং তবিল তছরূপের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ঐ কীর্তিমান অফিসারটি এই নতুন কাজের কাজী নন। জালিয়াতি এবং তবিল তাঞ্চার কাজে তিনি রীতিমত হাত পাকিয়েছেন। যখন যে দপ্তরে কাজ করেছেন সেখানেই তাঁর মহিমাকে প্রকট করেছেন। তাঁকে চেনে জানে সবাই। কিন্তু এমন কিছু প্যাঁচ তাঁর পকেটে আছে যার জোরে তিনি তাবৎ কারণিক তত্ত্বকে ট্যাকস্থ করে দিব্যি তুড়ি মেরে বেড়াচ্ছেন।

• • •

বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে লড়াই করার পদ্ধতি জানা আছে, তাদের চেনাও আছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যদি আততায়ী জাতিদ্রোহীরা অনবরত আমার সর্বনাশের চেষ্টা করে তাহলে তা ঠেকাই কি করে? লোভ আর দুর্নীতির পঙ্কে ডুবে গিয়ে তারা এমনই বিবেকহীন এবং

অনুভূতিশূন্য হয়েছে যে তারা ব্যবসায় মুনাফা লোটবার জন্যে জাতভাইয়ের বঞ্চিত করতে বা তাদের প্রাণে মারতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

চালের এই হাহাকার বাংলা দেশে, আর সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, পশ্চিম দিনাজপুরে প্রায় পাঁচহাজার একর জমির ধান মাঠ থেকে কাটার পর সরাসরি বিহারে চালান দেওয়া হয়েছে। এর দাম প্রায় দশলক্ষ টাকা।

• • •

তারপর লেভি প্রথা। তাও এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আপনি নিয়মকানুন চালু করলে কি হবে তাকে ফাঁকি দেবার মত বুদ্ধি কি আমার নেই? এইরকম যেখানে মনোভাব সেখানে করবেন কি? এসব ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না। যোধকরি এই রকম ক্ষেত্রেই দরকার জঙ্গী শাসন—তাহলে একদিনেই পাপিষ্ঠরা চিট হয়ে যায়। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ ঢুকেছে। মানুষ মরে গেছে। শকুনি উড়ছে। আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাই অন্যের কাছে চড়া দামে বিক্রী করে মুনাফা লোটবার জন্যে হীনতম মনোবৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্যদেহধারী পিশাচ ফাঁকির রাস্তা দিব্যি খুঁজে নিয়েছে। খবরে প্রকাশ, লেভি ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেভি প্রথা চালু হবার আগেই পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ ১ কোটি মণ ধান আগাম বিক্রী হয়ে গেছে। অন্য পথেও লেভি ফাঁকির চেষ্টা চলছে। কৃষকরা থানায় ডায়েরী লেখাচ্ছে, রাতে কে বা কারা যেন তাদের মাঠের ধান কেটে নিয়ে গেছে। অনেক কৃষকই নাকি মনে করছে যে, ধান চুরি হয়ে গেছে দেখাতে পারলে আর লেভি দিতে হবে না। এরমধ্যে আবার উকীল এসে পড়েছে। উকীল পরামর্শ দিচ্ছে, চুরির রাস্তা দেখাচ্ছে, বলছে, লেভি-অর্ডার জারি হবার আগে ধান বিক্রী দেখাও, হুহু, তাহলেই সরকার টাইট, আইনতঃ কাৎ, সে ধান আর সরকার ছুঁতে পারবেন না। অতএব যত পার ধান সরিয়ে ফেলো আর আমাদের পাওনাগণ্ডা ছাড়, তোমাদের ঠিক আইনের ফাঁকির রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেব।

বুঝুন উকিলদের মনোভাব। এরাই নাকি দেশের মাথা। সাধে কি আর গিরিশচন্দ্র লিখে গেছেন—"উকিল কি চিজ্‌রে।"

• • •

পৃথিবীর সব দেশেই কিছু কিছু "বাহাদুর" আছে, যাদের তথাকথিত গর্ব থাকে যে, তারা সত্যি কথা বলতে ভয় পায় না, অর্থাৎ নিজের দেশকে গাল দিতে দুঃখ বোধ করে না, স্বজাতির নিন্দা করতে পিছপা হয় না, নিজের ধর্মকে উচ্ছন্ন দিয়ে আনন্দ পায়, এমন কি নিজের পিতৃপুরুষকেও বেজন্মা বলে সত্য কথা বলার বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করে।

কত রকমেরই তো বিকৃতচরিত্রের মানুষ থাকে জগতে। এই জাতের একদল লেখকও আছে পৃথিবীর নানা দেশে। এরাও সেই একই ধরণের পারভার্ট! নিজের দেশকে, নিজের জাতকে, নিজের ধর্মকে অপর দেশের কাছে, অপর জাতের কাছে বিকৃত করে দেখিয়ে এরা সত্য কথা বলার "বাহাদুরী" নেবার। কিন্তু আসলে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঐ ধরণের বিকৃতবুদ্ধি কোন লেখকের লেখার মধ্যে যত অল্পতাই থাকুক—আসলে, সব গুণ সত্ত্বেও, সে একটা বিকৃতমানস—পারভার্ট! এর মূলে আছে হয়ত তার জন্ম ইতিহাস, বংশ ইতিহাস অথবা কোন ব্যর্থতা বা অপকর্ম।

আমাদের জাতের মধ্যে সেই রকম একজন বিকৃতমানসসম্পন্ন বিজাতীয় লেখক আছেন।

তাঁর নাম নীরদচন্দ্র চৌধুরী। ইনি ইংরাজীতে লেখেন এবং খুব ভাল ইংরাজী জানেন। এঁর একমাত্র আনন্দ, লেখার মধ্যে নিজের দেশ, নিজের জাত এবং নিজের ধর্মকে লোকসমক্ষে, বিশেষ করে বিদেশীর চোখে, হীন প্রতিপন্ন করা। ইনি অবশ্য ফতোয়া দেন এবং এঁর গুণগ্রাহীরাও বলেন যে ইনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলেন, অর্থাৎ যা মন্দ যা হীন তাই ইনি কলমের জোরে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু আসলে এ হচ্ছে নিছক কালাপাহাড়ী মনোভাব। বিকৃতবুদ্ধির পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এঁর অনুবাদিত গ্রন্থে ইনি বলেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিরাট প্রতিভা হচ্ছেন বঙ্কিম, এবং বঙ্কিম হচ্ছেন এক বৃহত্তর "হিন্দু-মানস"। ইনি বোধ করি জানেন না (হয়ত জানেন) যে এই বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন, অনেক রকম পাপ আছে পৃথিবীতে, কিন্তু স্বজাতির নিন্দা করার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই।

নীরদ চৌধুরীর আলোচ্য বইখানার নাম The Continent of Circe। প্রকাশ করেছে বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক চ্যাটো অ্যাণ্ড উইনডাস। ভারতের কেচ্ছা আছে এমন বই প্রকাশ করতে বিলাতী প্রকাশকরা সব সময় প্রস্তুত। তারা তো তাই চায়। ভারতের কুৎসা রটনা যুগ যুগ ধরে পশ্চিমীদের জাত-ব্যবসা। আর ভারত-বিদ্বেষী পত্রিকায় তাদের আলোচনারও অভাব হয় না। এই বইএর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ন্যাকে টক, অর্থাৎ যার মজ্জায় মজ্জায় ভারত বিদ্বেষ, তেমনি এক ইংরাজী সৈনিকের পুস্তক-পরিচয় পৃষ্ঠায় এই বইএর দীর্ঘ আলোচনা বেরিয়েছে।

বইটার নামের তর্জমা করলে দাঁড়ায় "কুহকিনীর মহাদেশ"। ভারতবর্ষকে লেখক এই আখ্যা দিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছেন: হিন্দুরা সব জীবন্ত লাশ, কুহকিনীর সন্তান তারা, তারা তাদের ঋষি-বাক্য "আত্মানাং বিদ্ধি", এ তত্ত্ব ভুলেছে। তাদের জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু নেই, যাঁটি হিন্দুরূপে তাদের চরিত্র ঘৃণ্য, আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগে তাদের বর্তমান যে চরিত্র তা হাস্যকর এবং বিরক্তিকর, তারা বিদেশীদের চুচক্ষে দেখতে পারে না, তারা নীচ, তারা অশিক্ষিত, শুধু তারাই নয়, মুসলিম, ব্রিটিশ, আমেরিকান সবাই অধঃপাতে যাচ্ছে, সভ্যতা জগত থেকে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে হিন্দুদের ঘরে আজ আর কোন সভ্যতা নেই, আছে শুধু ক্ষুদ্রতা আর অপার দুঃস্থতা, শুধু তাই নয়, হিন্দুরা পরমাণুবোমাসুদ্ধ, সামরিক শক্তিবৃদ্ধির অভিলাষী, ধর্মনিরপেক্ষতার আওয়াজ তুলে হিন্দুরা ভণ্ডামী করে, আসলে তারা অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক।

হিন্দুদের সম্বন্ধে এইসব "মুখরোচক" মন্তব্য ছাড়াও আরও অনেক কথাই এই বই-এ আছে। মোটের ওপর লেখক তামাম ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য আর বর্তমান সর্বব্যাপক উন্নতিকে সমভাবে মস্যাৎ করে দিয়েছেন। বলেছেন, ভারতের ঐতিহ্য ছুঃ ছুঃ, ভারতের বর্তমান প্রগতিও ছুঃ ছুঃ। এদেশের কোনদিন ভাল কিছু ছিল না, কোনদিন ভাল কিছু হবেও না—হিন্দুরা বাকি তা করতে দেবে না।

পাশ্চাত্যদেশে এই বই নিশ্চয়ই খুব সমাদর পাবে, প্রকাশক বই বেচে পয়সা লুটবে প্রচুর। ভারতের কেচ্ছা—তার মতো সুস্বাদু বস্তু আর কি আছে!

এদেশেও চৌধুরী-অনুরাগীর অভাব নেই। ককটেল পার্টিতে, ঔনপয়া-ভারতীয় মেয়েদের অন্নদাতাদের মন্ত্রণাসভায় আর বৈঠকখানায়, পাইপধারী-ধ্যাকা মুখের আলোচনায় এই বইএর প্রশংসা মুখর হয়ে উঠবে। এইসব নিজদেশবিদ্বেষীলেখক আর অ-মানুষদের লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্রের একটি মন্তব্য মনে পড়ল—"ওদের সব ঘরসের দোষ আছে।"

দিল্লীর সরকার সম্প্রতি ফতোয়া দিয়েছেন যে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমাগত বাড়ছে এবং জনজীবনে তা অহরহ অশান্তির সৃষ্টি করছে।

আঠারো বছর ধরে গদীতে বসে রইলাম। তার নীট ফল কী হল, না, দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে আমরা তাদের উপদেশ দিচ্ছি, যত পারো কম খেয়ে এবং পারলে না খেয়েই বেঁচে থাকো এবং আমাদের গদীতে বহাল রাখো।

অন্য রাজ্যের কথা বলতে পারি না। আমরা যে রাজ্যে থাকি, তার হাল চোখের উপর দেখছি, তার কথাই বলতে পারি। এই রাজ্যের যাঁরা শাসক তাঁদেরও মুখে ওই এক বুলি, ছাত্ররা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাঁরাও ওই একই ফতোয়া দিচ্ছেন—না খেয়ে থাকো। শুধু তাই নয়। তাঁরা একে একে ছোট শিল্পগুলিকে উচ্ছেদ করছেন। ফলে বেকারী বাড়ছে। আর শিল্পপতিদের বৃহৎ পুঁজি আরও বড় হচ্ছে! আমরা তোমাদের খেতে দিতে পারছি না—আমাদের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না, অথচ আর কেউ সেই ভার নিক—আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি—বাপরে! তাও কী কখনো হয়! এমন বাদশাহী সুখ কী ছাড়তে পারি।

হ্যাঁ। যে কথা বলছিলাম—ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা! দিল্লী সরকারের ইস্তাহারের মর্মার্থ এই রকম :—

১। সাধারণতঃ ধর্মঘট বা কোন আন্দোলন ছাত্ররাই আরম্ভ করে। তারপর জনসাধারণ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মন্তব্য :—ছাত্ররা ধর্মঘট করে কেন? তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে কি? সাধারণত জীবনে যখন ব্যর্থতা আসে, নিজের দোষে নয়, অভিভাবকের দোষে, তখনই একটা বেপরোয়া বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয় তরুণ জীবনে। এ মনস্তত্ত্ব সর্বসম্মত। এদেশের ছাত্ররা যে সেই ব্যর্থতার চাপে পিষ্ট হচ্ছে এ সত্য কী অস্বীকার করা যায়? কী সুবিধা আমরা তাদের দিতে পেরেছি? রাষ্ট্র তাদের সম্বন্ধে কতটুকু দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে এ তাবৎ? জনসাধারণ তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ঐ একই কারণে। জনসাধারণ বলতে আমরা যাদের বুঝি, তারা তো সর্বহারা, তারা তো নিশ্চিহ্ন হবার মুখে।

২। এর কারণ স্বরূপ ইস্তাহারে বলা হয়েছে, যথোপযুক্ত শিক্ষাগত পরিবেশের অভাব এবং পিতামাতা শিক্ষক ও সরকার প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব।

মন্তব্য :—শিক্ষাগত পরিবেশের অভাব—এই স্বীকারোক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর শ্রদ্ধার অভাব, তা পিতামাতার উপর নয়, তা শিক্ষকদের উপর এবং সরকারের উপর। শিক্ষক আজ বিদ্যা ব্যবসায়ের কালোবাজারী, সরকার আজ কালোবাজারীদের পৃষ্ঠপোষক! অতএব শ্রদ্ধার কথা তোলাটা হাস্যকর নয় কি?

৩। ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা আজ এক সর্বব্যাপক সমস্যা। শহর থেকে আরম্ভ করে পল্লী পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই এই শৃঙ্খলাহীনতা দেখা যাচ্ছে। অনেক সময়েই সামান্য কারণেই তারা উত্তেজিত হয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে আইন ভাঙতে উদ্যত হয়। এবং একবার উত্তেজিত হলে তাদের আর বাগ মানানো যায় না।

মন্তব্য :—সামান্য কারণে তাদের উত্তেজিত হয়ে ফেটে পড়বার পিছনে আছে বহু কারণ, বহু

হতাশা, বহু ব্যর্থতা—পুঞ্জীভূত ক্রোধ যে এমনি করেই সামান্য কারণ অবলম্বন করে সারা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, ইতিহাসে তার বহু নজির আছে, তা কি বাদশাহী মন্ত্রণাপরিষদ জানেন না?

আর তাদের শায়েস্তা করা? কেন, সেজন্যে তো অসংখ্য পুলিশ আছে, ইংরাজদের বর্বরতাকেও হার মানায় এমনধারা জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারী আছে। কাঁদুনে গ্যাস, বন্দুক, গুলী, দরকার হলে সাঁজোয়া বাহিনী আছে—অতএব চিন্তার কারণ নেই! ছাত্ররা বেশী কিছু করতে পারবে না। তবে দেওয়ালের লেখাটার প্রতি তাঁরা যেন নজর রাখেন। আর স্মরণ রাখেন ইতিহাসের অমোঘ সংকেত!

আইন বেরিয়ে নয়, ছাত্রদের বশ করবার জন্যে চাই অন্য মন্ত্র! কিন্তু বর্তমান শাসকদের মুখে সে মন্ত্র শোনা যাবে কি?

• • •

শিক্ষক মশায়রা পাঠ্যপুস্তক লেখেন। ভাল কথা। কিন্তু কোন দেশে এরকম ব্যাপার শুনেছেন? শুনুন। একটি পাঠ্যপুস্তক বার করেছেন, ধরুন, বঙ্গভারতী প্রকাশালয়। বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্য। এই একই প্রকাশকের ওই একই বই, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে তার আলাদা আলাদা লেখক। বিষয়বস্তু এক। শুধু টাইটেল পৃষ্ঠায় লেখকের নাম আলাদা। ধরুন উত্তর কলিকাতার এক নামকরা শিক্ষকের নাম আছে সেই বই-এ। সেই বই উত্তর কলকাতার স্কুলের জন্যে। অর্থাৎ সেই শিক্ষকের জনপ্রিয়তার সুবিধা নিয়ে প্রকাশক উত্তর কলকাতায় তাঁর নামে বইটি চালু করলেন। মধ্য কলকাতায় সেই একই বইএর লেখকের নাম পৃথক। দক্ষিণ কলকাতায় আবার অন্য এক নাম। বুঝুন ব্যাপার! আর বুঝুন কাণ্ড প্রকাশকের কারসাজি! সে তো গেল একটা দিক, অন্য দিকে যেসব শিক্ষক এইভাবে তাঁদের নাম ব্যবহার করবার অনুমতি দেন, মোটা টাকা খেয়ে—তাঁদের কী বলব! তাঁরা কী ছাত্রদের কাছে সম্মান পাবার যোগ্য?

তারপর আরও আছে। সরকারী কর্মচারীরা এই ধরণের বই লিখছেন আজকাল। লিখছেন, স্কুল-ইনসপেকটাররা, শিক্ষাদপ্তরের কেরাণীরা! শুধু তাই নয়, দেখা গেছে, এঁরা অনেকেই প্রকাশ্যভাবেই কোন কোন প্রকাশকের অনুকূলে ক্যানভাসিং করছেন!

এইবার তলিয়ে দেখুন, আমাদের রাজ্যে "শিক্ষা" কোথায় তলিয়েছে!

• • •

খৃষ্টমাস খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে পুণ্যতম দিন। ঐ দিন মহামানব যীশুর পুণ্য আবির্ভাব। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের দেবতা তিনি। ঐদিন গির্জায় গির্জায় তাঁর আরাধনা। ঐদিন খৃষ্টধর্মের অনুশাসনে খৃষ্টানদের পূত পবিত্রচিত্তে দিনযাপনের নির্দেশ আছে।

কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের সভ্যতা-গর্বিত দেশগুলির জনসাধারণ কী ভাবে ঐ দিনটি পালন করেন তার বিবরণ আমরা প্রতি বছরই পাই। ঐ দিনটিকে তাঁরা মদ্যপানের রেকর্ড করার দিন রূপে বার করেছেন, ঐদিনে তাঁরা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা করে মারামারির দ্বারা কাটাতেও পশ্চাৎপদ হন না। এবিষয়ে প্রতিবারেই রেকর্ড করে যাচ্ছেন রাষ্ট্র।

এ বছরের সংবাদে প্রকাশ:—খৃষ্টমাস উপলক্ষে তিন দিন ধরে ঐ দেশে যানবাহনের তলায় চাপা পড়ে ৬৯১ জন অবলীলা সাধ করেছে, মদের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ মানুষকে চাপা

দিয়েছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, ন্যাশপোর্টে নিজে ধাক্কা খেয়েছে। একেবারে রাজত্বর ব্যাপার। স্বাস্থ্যবিভাগ সেকটি কাউনসিল বলেছেন, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। হাসপাতালে গিয়ে যারা খাবি খাচ্ছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আর হাসপাতাল থেকে ফিরবে না। এ বছরের মৃত্যু-সংখ্যা মার্কিন দেশে নতুন রেকর্ড। বৃটেন, ফ্রান্স, উত্তর ইতালী, ডেনমার্ক, সুইডেন, অ্যাবাইকা প্রভৃতি দেশেও লোক মরেছে। কিন্তু মার্কিন দেশের তুলনায় তারা নগণ্য।

শুধু গাড়ি চাপা পড়েই মরেনি। খুন-জখমেও মরেছে অনেক। ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক। উত্তর ইংলণ্ডে নিউকাসল শহরে ২৯ বছর বয়সের এক যুবতীকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই নাকি ক্রিসমাস-পর্বের পূর্বরাত্রে এক পার্টিতে তার তরুণীপত্নিকে ছোরা মেরে খুন করে ফেলেছিল!

ক্রিসমাস দিবসে এক পত্নীকে ঠেঙিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবার অভিযোগে দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে একজন ৩১ বছরের যুবককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

লীডস শহরে একজন ২০ বছর বয়সের তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে তার বৃদ্ধ বাপকে গলা কেটে সাফ করে ফেলেছিল। ঐ শহরেই ২৬ বছর বয়সের এক যুবককে পাকড়াও করা হয়। সে তার স্ত্রীকে গলা টিপে নিকেশ করে দিয়েছিল।

"পশ্চিমের পথে পথে নরহত্যার এই রূপ হেরি!
ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু কাঁদে, কাঁদে মাতা মেরি!!"

• • •

মিষ্টার শিল্পীদের মেয়ে দুধের যোগান বাড়াবার পরিকল্পনা হয়েছিল। মনে করা গিয়েছিল, এর ফলে দুধের দাম কমবে এবং গরীব দুঃখীরাও দুধ কিনে খেতে পারবে। কিন্তু তাও কী কখনো হয়, গরীবদের জন্যে তো এদেশ নয়।

দুধের যোগান বাড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়ল। ১লা জানুয়ারী থেকে হরিণ ঘাটার দুগ্ধকেন্দ্রগুলি থেকে বাড়াদামে দুধ কিনতে হচ্ছে। আর সেই কথাই প্রচার করা হয়েছিল দুগ্ধ দপ্তর থেকে কবিতা লিখে। মরি মরি। কী আদিখ্যেতা রে! রাজ্যসরকারের পশুপালন শাখার সেক্রেটারী ডাক্তার বি, কে ভট্টাচার্য এই উপলক্ষে এক গদ্য-কবিতা লিখে ফেলেছিলেন এবং সেটিকে ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন। এই দেশেই এরকম যেহারাপনা সম্ভব।

সে-বস্তির গ-দ্য কবিতাটাকে উদ্ধৃত করতে চাই না। উত্তরে এইভাবে উত্তোর পাওয়া যেতে পারে :—

মরি মরি গোবস্তির কী গদ্য কবিতা!
কাব্যলক্ষ্মী হাঁক ছাড়ে রও তুমি জিতা!
শুধু নয় গোরুর দুধ, সঙ্গে আছে আরও দুধ!
ডি টি এস আর স্টাণ্ডার্ড, দাও বেশী সুদ!
গাওয়া আছে ভরসা আছে আছে টেবিল ক্রীম
দাম শুনেই চিৎপটাং, অধ হল হীম!
কবি বলছেন, আরে বাপু,
তোমরা ঘুরে যাও,

কোন অরণ্যে গাওয়া তরসা
খাবার আশা রাখ?
এসব খাবার দেশ আলাদা, তাদেরই এই দেশ!
কাড়ে রংগে মোরে করে তোমার হবে শেষ?

• • •

ইংরেজীতে চিতাবাঘের আর একটি নাম—LEOPARD! এ একজন মানুষের চামড়াঢাকা মার্কিন চিতা। সম্প্রতি এদেশে হানা দিয়েছে।

কী সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা!

দেশের যারা ভাল ছেলে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা প্রথম দ্বিতীয় হবে, ভবিষ্যতে সরকারী বড় বড় পদগুলো স্বভাবতই তারা পাবে। সুতরাং তাদের হাত করতে পারলে শাসনতন্ত্রের খাসমহলে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারা যাবে। অতএব তাদের মজ্জায় মার্কিন কৃষ্টি সঁাধ করিয়ে দাও। অর্থাৎ তাদের মার্কিন ভাবাপন্ন করে তোল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে লেপার্ড নামে মার্কিনীটি এখানে কাজ সুরু করেছিল। তার পদ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী অধিকর্তা! পদের মানে গুরুর মাথা। তার কাজ হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ভাল ভাল ছাত্র ছাত্রীদের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে তাদের নিয়ে কিছুটা শিক্ষামূলক আলোচনা বাকিটা মাইকেল মধুসূদন আর টুইস্ট্।

কী করছ এখানে বসে? কী হবে এদেশে পড়ে থেকে? চলে যাও বোস্টন, ওয়াশিংটন—হারভার্ড, মাসাচুসেটস, কিলা-ডেল-কিয়া, নিউইয়র্ক। লেখাপড়া শেখা সার্থক হবে? ধরচপত্র! তার জন্যে ভেবো না। তার জন্যে আমি আছি! আমরা আছি!

সত্যিই দু'চারজনকে পাঠিয়ে দিল লেপার্ড মার্কিনদেশে তাদের ফলাফলিত জোগাড় করে দিয়ে! তাই দেখে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মোহিত হল। আর তাছাড়া কী দিলখোলা মেজাজ! সুপুরুষ তরুণ। অকৃতদার। পঁচিশ বছর মাত্র বয়েস কিন্তু কী পরিণত বুদ্ধি। বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা একেবারে বিগলিত! কয়েকটি ছাত্রী তো শোনা গেল একেবারে বেসামাল।

কিন্তু সব ছাত্র-ছাত্রীর মতিগতি সমান নয়। কয়েকজন ছাত্র এইভাবে মধুসূদন মাইকেলের বিরুদ্ধাচরণ করল। ফলে চিতাবাঘ ক্ষেপে গেল! সেইসব ছাত্রদের অবধ্য গাল দিল! তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। ব্যস! তাতেই সুরু হল গণ্ডগোল। লেপার্ডচক্র ফাঁস হয়ে পড়ল। বর্তমানে লেপার্ডকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগ তার অন্তর্ঘাত মূলক কার্যকলাপের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছে।

দেখা যাক, ফল কী হয়!

• • •

সরকারী মহলে আবার উদ্বেগ। এবার কোপ পড়েছে কেরিওলাদের ওপর। কেরিওলা, ঠেলাওলা, রিক্সাওলা—এরা পথে বড় ভীড় করে। এদের জন্যে মোটরগুলি তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। চেম্বার অফ কমার্সের কর্তারা সরকারের ওপর অনেকদিন ধরেই চাপ দিচ্ছিলেন। সত্যিই

তো। এই সব হতভাগা কেরিওলা ঠেলাওলা রিকসাওলা—এরা পথের আপদ। দূর কর জঞ্জাল, রাস্তা সাফ হোক। মোটর ছুটুক জোরে। অতএব তাদের বধ কর—নিকেশ করে দাও। এর ফলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ এবং তাদের আত্মের উপর নির্ভরশীল আরও হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু অন্নহীন হল। তাদের জন্যে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? তারা সব সমাজের আবর্জনা। তারা গেলেই মঙ্গল।

• • •

আমাদের দেশে যারা শাসক, যাদের হাতে আমাদের মান-সম্ভ্রম জমি সম্পত্তি সব কিছুই নির্ভর করছে তাদের বেহিসেবী কাণ্ড কারখানা আর নিজের পয়ের সমর অন্ধর সব দরজাই খোলা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো, শুধু তাই নয়, কারকাছ থেকে কি পেলাম এবং আমাদের জমিজমা সম্পত্তির কতখানি বাড়বাড়ন্ত—তাও আমরা সবাইকে জানিয়ে দিই।

আশ্চর্য ব্যাপার। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা লড়াই করে সাফল্য অর্জন করার পরেই আমাদের কর্তারা গলাবাজি করতে লাগলেন, কিভাবে কোন্ অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে আমরা পাকিস্তানকে ঘায়েল করেছি। পাকিস্তান আর তার মুরুব্বিরা কান পেতে সেই কথা শুনল আর তাদের ফাঁকগুলো ভরাট করল।

সাম্প্রতিক সবচেয়ে কেলেঙ্কারী, রাশিয়ার কাছ থেকে আমরা যে সব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছি তাও গলবাস্ত সহকারে সারা দুনিয়ায় প্রচার করেছি। ফলে রাশিয়া আমাদের কান মলে দিয়ে বলেছে, আঠারো বছরে রাজনীতির অ আ ক খ এখনো শিখতে পারোনি। তোমাদের দেশেই না চাণক্য পণ্ডিত জন্মেছিল? তোমাদের মত এরকম বুদ্ধু তো দুনিয়ায় দেখিনি। কের যদি এইরকম বেফাঁস কথা বলো তাহলে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করে দেব।

এক প্রকাশককে বলেছি কয়েক কপি চাণক্য শ্লোক কিনে কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

• • •

দিল্লী দরবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক খবর হচ্ছে—অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ এবং বাঙালী ব্যারিষ্টার শ্রীশচীন চৌধুরীর ঐ পদ লাভ।

স্মরণ থাকে এইবার নিয়ে কৃষ্ণমাচারী দু'বার পদত্যাগ করলেন। এবং স্বাধীনতার পর থেকে এই নিয়ে ছয়বার অর্থমন্ত্রীর পদ শূন্য এবং পূর্ণ হল।

প্রথম অর্থমন্ত্রী সম্ভবতঃ ছেষট্টি বছর ঘুরেকের মধ্যেই সরে পড়েছিলেন। তারপর জন মাথাই। তিনিও বেশীদিন টিঁকতে পারেন নি। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী শ্রীডি. দেশমুখ অবশ্যই মানুষ ছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে মতভেদ ঘটায় তাঁকে গদি ছাড়তে হয়েছিল। তারপর আগমন হয় এই কৃষ্ণমাচারীর। মুদ্রার ব্যাপারে তিনি ঘুলো ঘোলাই হয়ে পদত্যাগ করেন। তারপর আসেন মোরারজী ভাই। কামরাজ কোপে তাঁকে গদি হারাতে হয়। আবার আসেন কৃষ্ণমাচারী। কিন্তু আবার গেলেন।

দেখা যাচ্ছে দিল্লী দরবারের ঐ বিশেষ পদটি যেন শনির প্রভাব যুক্ত। শুরু যিনিই বসছেন তিনিই খসছেন।

শ্রীযুক্ত শচীন চৌধুরী অবিলম্বে শশিপুজো দিন ও একটি নীলা পরুন যদি অর্থমন্ত্রী হিসেবে কিছুদিন টিকতে চান।

• • •

তাসখন্দ এযুগের একটি বিস্ময়কর দিকচিহ্ন, চিরকাল মানুষ তাকে সেইভাবেই স্মরণ করবে। কিন্তু তার মোহে আমরা যেন ভুলে না যাই যে সব কিছুই ফুরতে হয়ে গেছে, এবং শয়তানের দল সবাই ধর্মগ্রন্থ পড়তে সুরু করেছে। মোটেই না মোটেই না।

পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। সহরে সহরে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানানো হচ্ছে। ধরপাকড় চলেছে। এবং তার ফলে তাঁর সামরিক সদিচ্ছা আর সংবুদ্ধি কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। ২রশে জানুয়ারী করাচীর বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় তিনি বলেছেন, বা বলতে বাধ্য হয়েছেন, "তাসখন্দ চুক্তিতে এমন কিছু নেই যাতে পাকিস্তানকে কাশ্মীর সম্পর্কে তার মনোভাব বদলাতে হবে।" শুধু তাই নয়, আয়ুব আরও বলেন যে, কাশ্মীরীরা আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের জন্যে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবে। তাসখন্দ চুক্তিতে তাদের কাজে কোন বাধা হবে না। অর্থাৎ হানাদাররা কাশ্মীরী সেজে "মুক্তি যুদ্ধ" চালাবে এই আর কি! অতএব আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী হবে না।

* * * *

ইস্টার্ণ কোম্পানীতে শ' আষ্টেক আধা-শিক্ষিত কর্মী রয়েছে, তাদের কারিগরী জ্ঞানটা বেশ পাকাপোক্ত নয়।

কোম্পানীর পরিচালকরা ঠিক করলেন তাদের যে যেখানে যতটুকু দক্ষতা দেখিয়েছে, যতটুকু ভালো কাজ করেছে তার প্রশংসা করা হবে।

আর তাহলেই সেই সব শ্রমিকরা বলে বসবে, আরো মাইনে বাড়াও, তোমরাই তো বলছ আমরা ভালো কাজ জানি।

মাইনে সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে রিভিউ বোর্ড পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল।

পরিকল্পনামত খুঁজে খুঁজে শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া হতে লাগল, তাদের প্রশংসা করা হোল।

আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল!

উৎপাদন বেড়েছে, বাতিল মালের সংখ্যা কমেছে, কারিগরদের মধ্যে নেই ফাঁকি দেয়ার মনোভাব।

আরো আশ্চর্যের কথা—একটি লোকও একবারের জন্যেও মাইনে বাড়ানোর কথা বলেনি।

মানুষকে না বুঝতে শিখলে তাকে দিয়ে কাজ করানো যায় না, তার কাজের যেটুকু ভালো সেটুকুকে ভালো বলার মধ্যেই রয়েছে তাকে বুঝতে শেখা, তাকে উৎসাহ দেওয়ার চাবিকাঠি।

LION - POSTMASTER.

THE BRITISH POSTMASTER GENERAL ANNOUNCED THAT THE STAMPS ISSUED BY THE SOUTH RHODESIAN RACIALIST GOVERNMENT IN CONNECTION WITH THE PROCLAMATION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE, ARE INVALID.

I WILL NOW STRIKE ANOTHER RESOLUTE BLOW AT THE RHODESIAN RACIALISTS - I'LL CANCEL THEIR STAMP.

ব্রিটিশ সিংহের বিক্রম।

অগ্রীক্ষণ

মানুষের তৈরী
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া !

দুর্গম পথ যাত্রী !

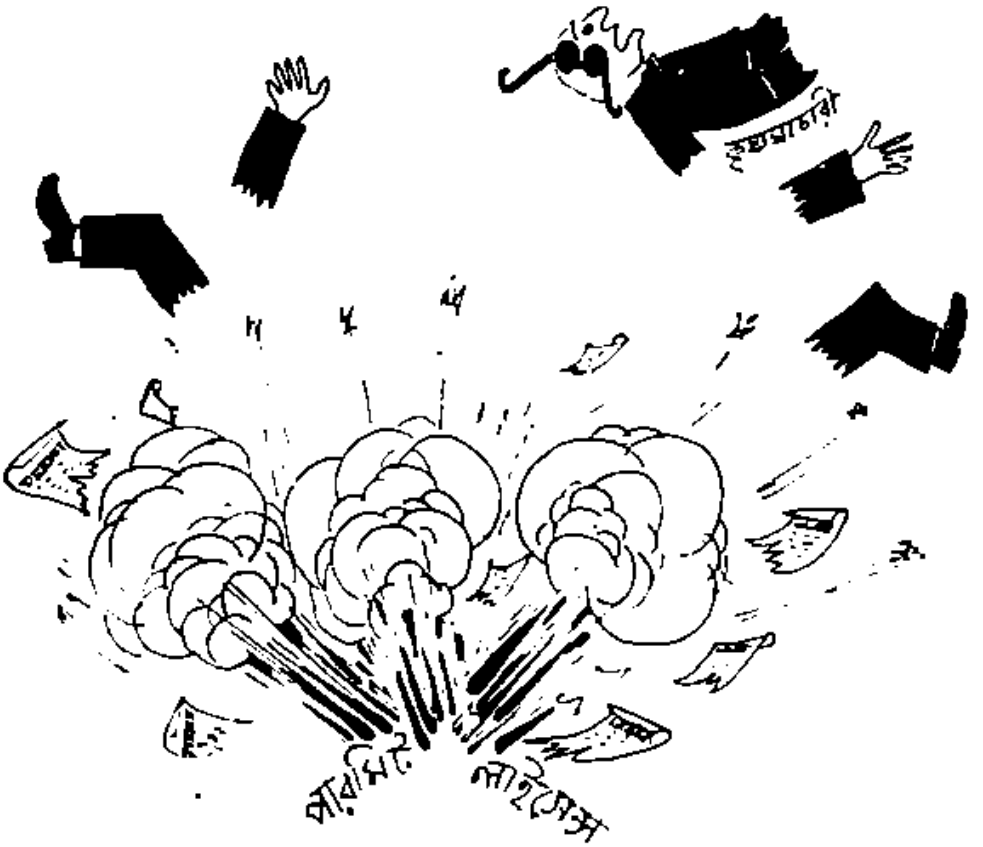

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটি ভাল ঘি।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছে। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে একপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

—ইংরাজী নববর্ষের নবীন সাহিত্যোপহার—

॥ আসন্ন প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী'র	বড়বাবু
অন্নদাশঙ্করের	পসারিণী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের	আর এক সাবিত্রী
প্রেমেন্দ্র মিত্রের	অমলতাস
প্রবোধকুমার সান্যালের	উত্তর হিমালয় চরিত
আশাপূর্ণা দেবীর	রঙের তাস
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের	কলধ্বনি
অবধূতের	নীলকণ্ঠ হিমালয়
ডাঃ সুকুমার সেনের	নট নাট্য নাটক
ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর	রাজস্থান-কাহিনী
স্বামী অভয়ানন্দের	প্রেম-কথা
স্বামী তত্ত্বানন্দের	তপস্বী ভারত
মহাশ্বেতা দেবীর	অজানা
নীহাররঞ্জন গুপ্তের	তালপাতার পুঁথি
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	নায়িকার মন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের	শ্রীমান-শ্রীমতী
শম্ভু মহারাজের	গহন গিরি কন্দরে
নকুল চট্টোপাধ্যায়ের	তিন শতকের কলকাতা
সুমথনাথ ঘোষের	বনরাজিনীলা

উপন্যাস : ভ্রমণকাহিনী : প্রবন্ধ
রম্যরচনা : ইতিকাহিনী

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা ॥
বিচিত্র বিষয়বস্তু ॥

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে
প্রকাশিত হইবে

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

লাইব্রেরীতে রাখার মতন বই।

সবেমাত্র প্রকাশিত।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের
আধুনিকতম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

অর্চ্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

আধুনিক কবিতার আর একখানি
উল্লেখযোগ্য বই—

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

সাগর আকাশ

দাম—২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯ বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ, ১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

Regd. No. C3643

14 MAR 1966

একটি সুপরিচিত নাম

লক্ষ্মী ঘি

এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর

LO-3/65

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
মাঘ ১৩৭২, JANUARY 1966

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়
বিদায় সম্ভাষণ : সুবোধ বসু
পুণ্যজীবন স্মরণী : ধনঞ্জয় পাঠক
(লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনের খণ্ডচিত্র)
মার্কটোয়েন কলকাতায় : অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আউটডোর শুটিং : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
অশান্ত পৃথিবী : নলিনীরঞ্জন মিত্র
শেষ মুহূর্ত : মানুষ যখন চাঁদে নামবে
চাঁদের আত্ম কথা

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা—সডাক পনের টাকা

গল্পভারতীর পরবর্তী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়

হাজার হাজার হানাদার কাশ্মীরে ঢুকছে নানা পথে। শ্রীনগরের দিকে তারা অগ্রসর হয়েছে। লেখক হানাদারদের হাত থেকে কোন রকমে ছাড়া পেয়ে শ্রীনগরে ফিরেছেন। তারপর প্রত্যক্ষ দেখেছেন, নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর হানাদারদের অত্যাচার, তাদের প্রতিরোধে কাশ্মীরীদের মরণপণ লড়াই এবং ভারতীয় জওয়ানদের সাহস আর বীরত্ব। ঘটনার পর ঘটনা। চমকের পর চমক। এ এক দুর্লভ রচনা। প্রামাণিক, রোমাঞ্চকর, মর্মস্পর্শী।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—

মহাজীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী পর্যায়ক্রমে গল্প-ভারতীতে লিখছেন জীবনী-সাহিত্যের নূতন পথের দিশারী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

কোম্পানী আমলের কাহিনী : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এবারের রচনায় লেখক অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। ওয়ারেন হেসটিংস কাকে বিবাহ করেছিলেন? সেই মহিলাটির পূর্ব স্বামী কে ছিলেন? কোথায় কেমন করে সেই মহিলার সঙ্গে হেসটিংস-এর আলাপ হয়েছিল—সেই সব চমকদার বৃত্তান্ত পরিবেশন করেছেন লেখক এবারকার কাহিনীর মাধ্যমে। সেই সময়কার ইংরেজ-সমাজের কৌতুকাবহ চিত্র ধরা দিয়েছে এই রচনায় এবং সেই সময়কার কলকাতার হালচাল।

অভিনেত্রীর জীবন সংগ্রাম : নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায়

চূড়ান্ত বিলাসব্যসন আর সুখসমৃদ্ধির সপ্তম স্বর্গ থেকে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়ে নিঃসঙ্গ ঘরে দিন যাপন। ভাবতেই অবাক লাগে। কেরা যায়। ফিরে পাওয়া যাওয়া সব। কিন্তু সোজা পথে নয়। অন্ধকারে বাঁকা চোরা পথের সাহায্য নিলে আবার সব ফিরে পাওয়া যায়। অন্য যে কেউ হলে সে পথ গ্রহণ করত। বিপাকে নিয়ম নাস্তি। মূল্য বোধের কিছু ঘাটতি হলে মহাভারত এমন আর কি অশুদ্ধ হবে? এ সবাই করে থাকে। কিন্তু অভিনেত্রী অ্যানা নীগল, ইংলণ্ডের সবচেয়ে নামকরা মঞ্চ ও চিত্র তারকা, সে-পথে গেলেন না। স্বামীর হাত ধরে দাঁড়ালেন ঝড়ের মুখে। দারুণ পরীক্ষার মধ্যেও ভুললেন না জীবনের মূল্যবোধ। জীবনের সঙ্গে সে এক আশ্চর্য সংগ্রাম—উদ্দীপনাময় অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর। নানা ঘটনা দিয়ে সেই জীবনযুদ্ধজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই রচনায়।

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

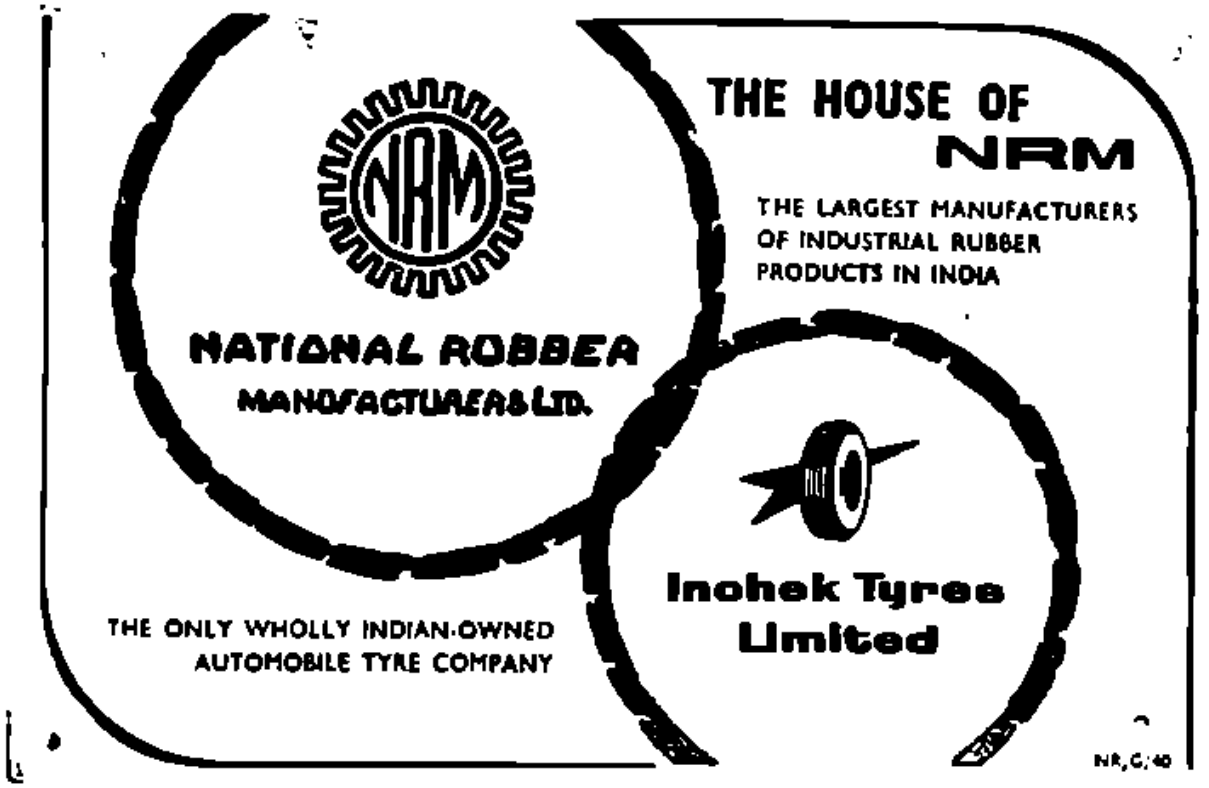

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

অভিধান সিরিজ

SAMSAD LITTLE
ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত অহরহ ব্যবহারের উপযোগী একটি সহজ বহনীয় শব্দকোষ। বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস-কর্মীদের একান্ত উপযোগী।

[টাঃ ১'৫০]

SAMSAD
ENGLISH BENGALI
DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি বাঙ্গালা অভিধান। ইংরেজি ও বাঙ্গালায় শব্দের উচ্চারণ-সঙ্কেত ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। সর্ববৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উপযোগী শব্দকোষ। [টাঃ ১২'৫০]

সংসদ

বাঙ্গালা অভিধান

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত বাঙ্গালা অভিধান। শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ ও ব্যুৎপত্তি সন্নিবিষ্ট। [টাঃ ৮'৫০]

প্রতিটি অভিধান একটি বিশিষ্ট অভিধান

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৮

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাস্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যালকেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

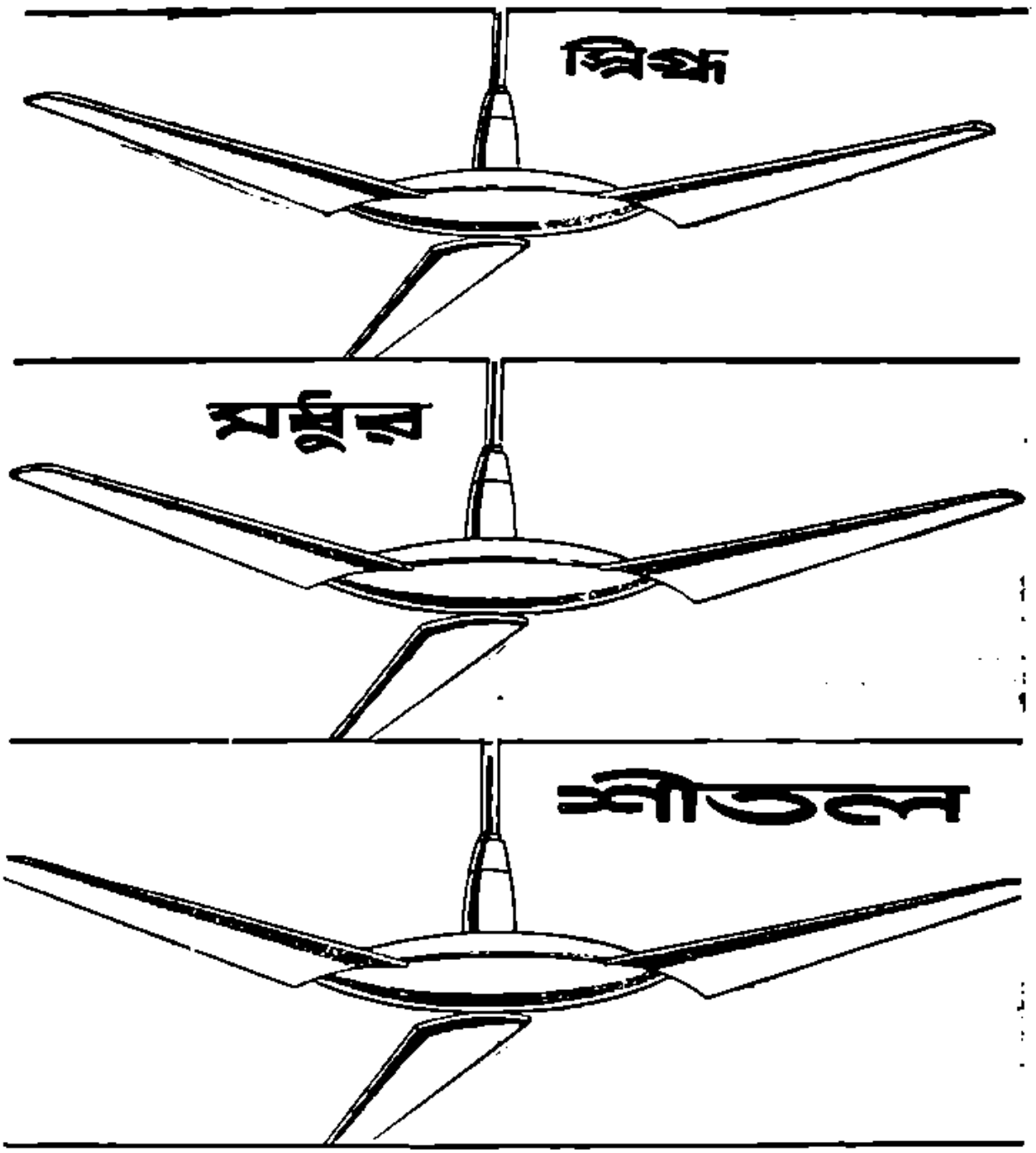

"EVERREST" G.E.C. সিলিং ফ্যান

সাগর পারের হাওয়ার মতো সরস্বরে

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুখাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল
কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে।
এই তেল নিয়মিত ক্যান্থারাইডিনের
প্রয়োগে খুসকি চুলের স্বাস্থ্য
নষ্ট হয়ে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৬২৫

বিদায় সম্ভাষণ—সুবোধ বসু ৭২৮

পুরাতন পাতা (বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদি কথা) ৭৩৫

একটি স্বর্গীয় কাহিনী—অসিতবরণ সরকার ৭৩৯

গুপ্তচর কাহিনী—গৌরীশঙ্কর দে ৭৪২

বিশ্ব-সাহিত্য

প্রেম চিরন্তন—মূল : গলওয়ে কিনেল, অনুবাদ : সুপর্ণ রায় ৭৪৯

মার্ক টোয়েন—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৭৪৯

মার্ক টোয়েন কলকাতায়—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৫২

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৪টি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অস্বস্তাব কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

২ বছরের কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেন্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

BBL

এই সংখ্যায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ঝড় আসন্ন, ১৯১৪— ৭৫৫

আমি স্বীকার করছি—বররুচি ৭৫৬

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৭৬১

সত্যমেব জয়তে—আনন্দ ভট্টাচার্য্য ৭৬৫

অশান্ত পৃথিবী—নলিনী রঞ্জন মিত্র ৭৭০

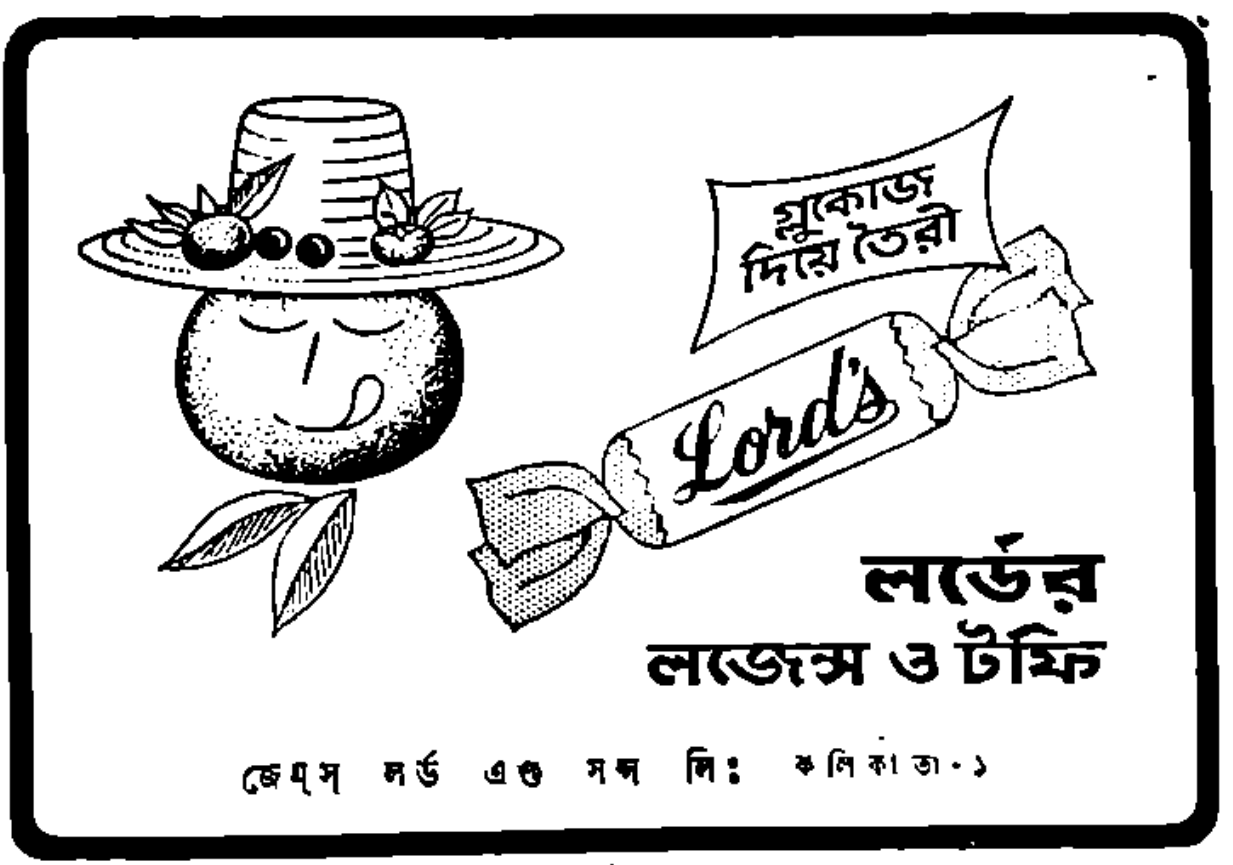

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
ওয়ারী ফেল্ডী, টী-শার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেন সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই দেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বাণীমন্দির মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীউদ্দিন—১৩৩, এস এন, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—জাতীয়বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; বম্বে ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল রামরতন; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ হরারাম ফেত্রী; অরুণ অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টালাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮০

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—আভা পাকড়াশী ৭৭৩

মৃণাল বাহুর সন্ধানে—সুরঞ্জনা সেন ৭৬৬

সুন্দরী হতে চান?—সোনালী রায় ৭৭৭

স্নান : একটি আশ্চর্য্য প্রসাধন—লিপ্রা রায় ৭৭৮

চলতি দুনিয়া ৭৭৯

পুণ্য জীবন স্মরণী ৭৮২

অমৃত কথা— ৭৮৬

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ৭৮৭

শেষ মুহূর্ত্ত ৭৯১

আউটডোর সুটিং—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৯৫

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

৫, ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯১

১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

২৬; যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

ওস্তাদ অসরাম বলেন

খেলা বা কাজ যা-ই হোক, আলোর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কি বাড়ীতে, কি অফিসে, অসরামই হচ্ছে ঠিক ল্যাম্প। কারণ এই ল্যাম্প টেঁকে অনেক দিন, আর আলোও দেয় অনেক বেশী। অসরামের পেছনে রয়েছে জি.ই.সি.—যাঁরা ল্যাম্প ও আলোর ব্যাপারে বিশ্বে নেতৃস্থানীয়। কাজেই যে ল্যাম্পের ওপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন, সেই ল্যাম্পটিই কিনুন

G.E.C. আপনার গ্যারান্টি

দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোং, অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট্ লিমিটেড

GEC/G/77

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে

নিম অদ্বিতীয়

নিম-এর উপকারিতা হাজারেরও
বেশী বছর ধরে পরীক্ষিত ও
প্রমাণিত

নিম টুথ পেস্ট হচ্ছে একমাত্র টুথ
পেস্ট যাতে নিম-এর বীজাণুনাশক ও
দুর্গন্ধনাশক সক্রিয় গুণগুলি তো আছেই,
তাছাড়াও আছে আধুনিক দন্ত
বিজ্ঞান সম্মত ভেষজ রসায়ণ এবং
'ফ্লুরাইড'। নিম টুথ পেস্ট দাঁত ও
মাড়ীকে সুস্থ ও সবল করে,
দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে
সাহায্য করে এবং দাঁতকে
ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করে' শ্বাসপ্রশ্বাসকে
সুরভিত করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
বর্ষব এগত

CNF-18-F-65

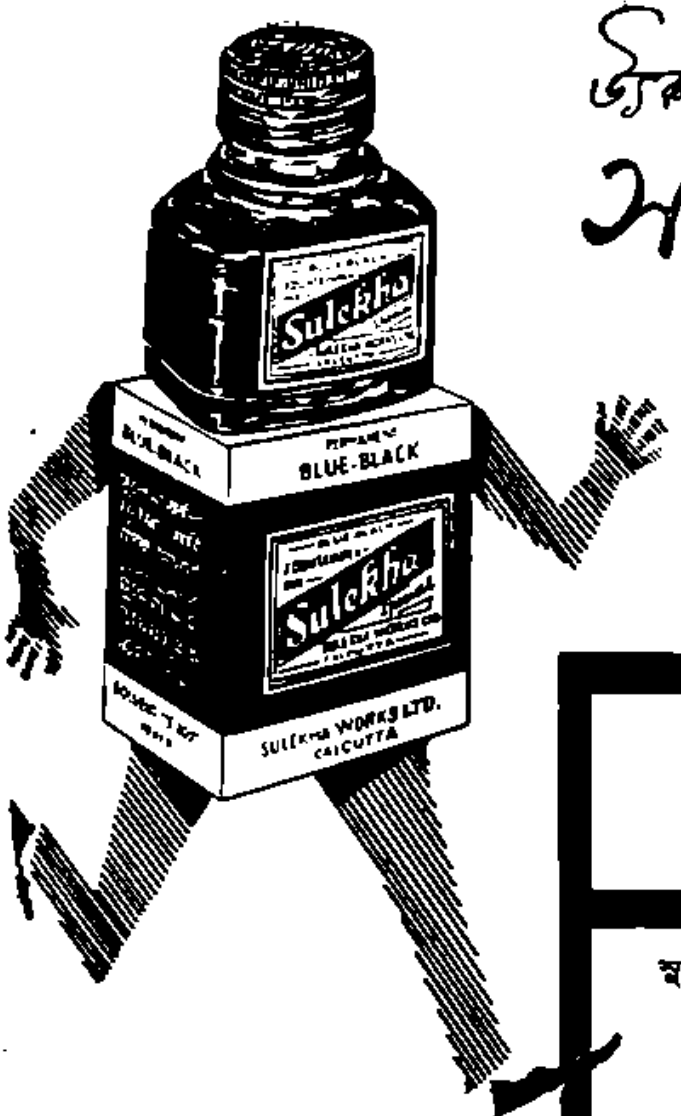

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ঝরঝরে
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন ইঃ
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭১২০ এম. এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PRO/SW—11

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

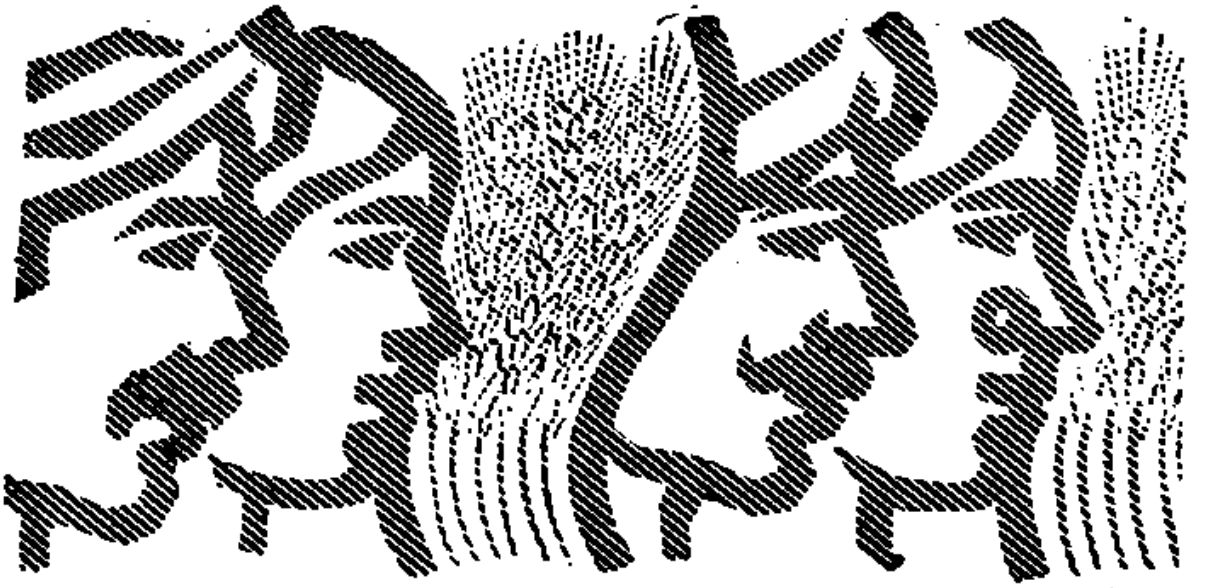

আমরা আমাদের কৃষকদের জন্য গর্ব বোধ করি। তাদেরই হাতের ছোঁয়ায় শস্য জন্মায়। খাদ্য চাই আমাদের সীমান্তরক্ষী জোয়ানদের জন্য, কারখানার শ্রমিকদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য। উত্তরোত্তর আরো ফলন চাই। এই ভাবেই আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব। আমাদের কৃষকরা জানে যে খাদ্য আমদানীতে আমরা যত কম খরচ করব, আমাদের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার কাজে তত বেশী ব্যয় করতে পারব। কৃষকরা সমগ্র জাতির সেবায় রত। আপনিও তো তাই?

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

DA 65/F7 Bengali

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।; রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
লক্ষেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশতৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

UNIVERSITY

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কাশ্মীর রণরঙ্গ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[ছয়]

দোসরা নভেম্বর

রামবাগ ব্রীজ পেরিয়েই বড়গাম তহশিলের রাস্তা বন্যাখালের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই পাকা পিচের রাস্তাটা আসল মঞ্জিতে এদিক ওদিক ঘুরে গিয়ে পড়ে এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে। বছর কয়েক আগে রাস্তাটা সোজাই চ'লে যেত কিন্তু ডাইকাউন্টের ওটা মামার ধাক্কায় এখন ডান দিকে বেশ খানিকটা ঘুরে একেবারে দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি গিয়ে পড়ে। পাহাড় দুটো আড়াআড়ি ভাবে এয়ারপোর্টটাকে আগলে আছে ঠিকই, কিন্তু এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে গেলে গুলমার্গ একেবারে হাতের কাছে আর গুলমার্গ থেকে বুদ্ধ-সীমান্ত, পাহাড়ী হাঁটা পথ জানা থাকলে একদিনেই চলে যাওয়া যায়। এয়ারপোর্ট তল্লাটে যারা থাকে তারা পাহাড়ী পথেই গুলমার্গ যায়। পাকা রাস্তায় যেতে গেলে শ্রীনগর হ'য়ে যেতে হয়, প্রায় সাঁইত্রিশ মাইল। সীমান্ত থেকে আক্রমণোদ্যত হ'য়ে আসতে হলে এই পাহাড়ী এলাকার মধ্যে দিয়েই যে মানুষ আসবে সেটা আমাদের কর্তাদের কখন মনেই হয়নি। হ'লে অনেক হানাদারি কায়েদা বেঁচে যেত। মনে রাখা উচিত ছিল, কারণ গত আক্রমণেও হানাদাররা এই পথেও এসেছিল এয়ারপোর্ট আক্রমণ করার জন্য এবং তাঁদের আটকাতে গিয়ে স্রেন থেকে নামার আধঘণ্টার মধ্যে প্রথম ভারতীয় সেনানায়ক প্রাণ দিয়েছিলেন কর্ণেল শর্মা। কর্ণেল শর্মার স্মৃতিফলক আজও সেখানে আছে। সেবারেও যেমন গ্রামবাসীরাই প্রথম হানাদারদের আটকে ছিল, এবারও তাই, কিন্তু আত্মপ্রসাদের আসনে এ পথে প্রহরী বসানোর প্রয়োজনবোধ কেন যে কারো হয়নি তা কর্তারাই বলতে পারেন।

দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথটা এসে আর এক ঢালু পাহাড়ের মাথায় যেন থমকে দাঁড়ায়। খুব সতর্ক নাহলে গাড়ীটা একেবারে গড়িয়ে নেমে যাওয়ার সমূহ বিপদ আছে। এখানে এক রকম বিনা নোটিশেই পুরোপুরি বাঁদিকে ঘুরে ওঙ্কারের মতন বাঁক কাটতে কাটতে রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে। আমিন গাড়ী থামিয়ে নিচে নামল এবং আরও নিচের উপত্যকাটা দেখিয়ে বলল :

"এই পুরো উপত্যকাটা বড়গাম তহশিল। আমার বাবা যখন আর যতবারই এ পথে গেছেন, এইখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবারই বড়গামকে দু চোখ ভরে দেখে, দুহাত তুলে খুদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যা'লেছেন, বেহেস্ত যদি কোথাও থাকে তাহ'লে এইখানে, সেটা এইটাই।"

সত্যিই তাই। ঘন সবুজ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আর বড় বড় পপলার সারির মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা মাটির মতন ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেছে সেই নিচে পর্যন্ত। সামনের সমতলভূমি সবুজের সংসার। আল বাঁধানো উঁচু নিচু ক্ষেতগুলোর কোনটার সঙ্গে কোনটার রং মেলেনা, আকার আয়তনের মধ্যেও কোথাও সাদৃশ্যের বালাই নেই। দেখলে মনে হয় কোন অতি-আধুনিক শিল্পী জ্যামিতির জাল বিছিয়ে রংয়ের খেলায় অনেকা সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছে। বড় বড় চিনারের ঘন ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল মাটির বাড়ীগুলো খেলাঘরের অলস-বিন্যাস। বাঁ দিকে দুধগঙ্গা নদী কৌতূহলী শিশু মায়ের মতন আপন আনন্দে আপনিই দিশাহারা হ'য়ে ইচ্ছে মতন ঘুরে ফিরে চলে গেছে একটা নিচু কিন্তু লম্বা টানা পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়ে। পাহাড়টা দেহন দিকে ঠেলে উঠে, আকাশের কোলে হেলান দিয়ে আসন্ন অবকাশের অনন্ত প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরের নীলাভ ছানব পাহাড়টা বরফের টুপি প'রে এই অবাধে ছুটে যাওয়া উপত্যকাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তবের সাধনায়। বর্ষায় এই পাহাড়ের বুক ব'য়ে যে সব বড় বড় ঝর্ণা নামে, এখন সেগুলো শুকিয়েছে কিন্তু তাদের চলার পথের দাগগুলো এতো দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর্ব যেন গলায় মুক্তোর মালার মতন। তারপরই নীল আকাশ। এখান থেকে তার সৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এতদূর আর এত বেশী যে সহজে মানুষের কাছে তার প্রায় সবটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এইখান থেকে মাইল ছয়েক নেমে তবে আরিগাম। এই বাঁকা বাঁকা পথটা যেখানে এসোমেলো ঝর্ণার গা ঘেঁসে ঠিক এক চুমুক জলে চমকে দাঁড়ায় সেইখানেই, প্রকাণ্ড চিনার গাছটার তলা দিয়ে কাঠের সাঁকো গেছে আরিগামে। আগে যদি আরিগামটা দেখতাম তাহ'লে পরে অনেক সুবিধা হত কিন্তু তীব্র বাঙালীর ভাগ্যে তখের বড় আসবে এইটাই ছিল আমার ভাগ্যের লিখন। তাছাড়া, মানুষের দৈনন্দিন খোরাকিটা নিতান্তই কপালের লিখন, ভাগ্যে না থাকলে জোটেই না। এখানকার রাজকীয় ভোজের কথা পরে জানা গেল।

এখান থেকে উটরা গ্রাম আরও সাত মাইল। পথ নেই, পুতুল নাচের মতন সাকিয়ে সাকিয়ে গাড়ী চলে। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে ছোট্ট গ্রাম, সেইখানে ট্যাক্সি ছেড়ে মাইল খানেক হেঁটে এলে দুধগঙ্গা নদী। ওটার ওপারে পাহাড়ে উঠলে তবে উটরা গ্রাম। খাড়া চড়াই উঠতে যাবার নাম ইয়াদ আসে কিন্তু প্রকৃতির এখানে এমনই প্রাচুর্য্য যে নারী-যৌবনও হার মেনে যায়।

আমিনের বড় মামা পীর আব্দুল আজীজ সত্তর বছরের বুড়ো হ'লে কি হবে, সাতাশের মতন জোয়ান আর সতেরোর মতন চঞ্চল। প্রথম হানাহানির যুদ্ধে উনি তিনদিন ল'ড়েছিলেন

পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে আর দুটো বাইসনের শিঙ্গ নিয়ে। গ্রামের দুজন মহিলা কিন্তু হানাদারদের ওপরে উঠতে দেন নি। ওঁর কানের পাশে ঘুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন :

"দেশভক্তির এইটাই আমার 'পরম বীরচক্র'।"

মানুষটা সত্যিই মজার আর গ্রামবাসীদের মাটিতে লুটিয়ে পড়া কুর্নিশ দেখে বোঝা গেল কেউকেটাতো বটেই। শাহজীর নামে সারাই বাবা সোঠার আর আমি ওঁর খাস্ অতিথি শুনে গ্রামবাসীরা পারলে আমায় মাথায় নিয়ে নাচে। খাওয়ার পর সাড়া না হ'লে শাহজী আমায় গ্রাম পরিদর্শনে যেতে দিতে নারাজ। অতএব ওঁর সঙ্গে ব'সে জলখাবার খেতে হল বেলা বারোটায় বেশী নয় খানদশেক বড়সড় পরোটা, ছটা ডিম আর বালতি খানেক খাঁটি গরুর দুধ। দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ, উনি শুধু সস্নেহে বললেন : "মেহমান কা খানা আর কাশ্মীরি জেনানা, জিৎনা খা সকো খালো আর বাকি লে জানা!"

গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড আখরোট গাছ। লোককবি মেহজুর তাঁর সারা সকালের দরকারি কাজ আর বাকি দিনের লেখার কাজ এইখানে ব'সেই সারতেন। সারা দিন রাত কাটাবার মতনই জায়গা বটে। ওঁর মতন এক অতি সুপুরুষ কবির জীবনে নারী প্রভাবের অভাব দেখে বেশ খানিকটা অবাক হ'য়েছিলাম, এখানে এসে আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। এমন প্রকৃতির মধ্যে থাকলে প্রেমের প্রয়োজন কবির জীবনে ঘটে না। খাড়া উৎরাই-এর শেষে, অনেক নিচে, ঝরণাটা চ'লে গেছে ডাইনে আর বাঁয়ে। তার ওপারে আবার পাহাড়, পাহাড়ের ওপর একখানা বাড়ী। বাঁ দিকে সেই ছায়ন্ত পাহাড়, এখন ধূসরও নয়, নীলও নয়। অনেক কাছে, সবুজ বেষা। ডান দিকে পাহাড়ের ওপরে শ্রীনগর সহর আঁকা ছবির মতন আকাশে ছড়িয়ে আছে। তিরিশ টাকা মাস মাইনের সামান্য পাটোয়ারি মেহজুর তাঁর কর্ম জীবনের শেষে তেরো বছর এইখানে, এই গাছের তলায় ব'সে মাটির ভাষার মানুষের গান গেয়েছেন আর সারা কাশ্মীরে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। আজও কাশ্মীরের প্রত্যেকটি স্কুলে তাঁরই লেখা গান দিয়ে দিন আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেতে, কি হিন্দু কি মুসলমান তাঁরই গান গেয়ে ধান কাটে, প্রতি ঘরে ঘরে বিয়ের মেহেদি রাতে তাঁরই গান গেয়ে ক'নে সাজানো হয়, ঈদের মেলা, দোলিতে রংয়ের খেলা, কাশ্মীরি জাতীয় সঙ্গীত, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রচার বাণী তাঁরই গানে সম্পূর্ণ হয়। অর্থের আকর্ষণ, সম্মানের আহ্বানে, প্রতিপত্তির প্রলোভন কোন কিছুই তাঁকে কাশ্মীরের এই কোণ থেকে সরাতে পারেনি। কেন যে পারেনি, এইখানে এসে তবে বোঝা যায়।

নির্বাক আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে কতক্ষণ আমি ঐ প্রাকৃতিক অসীমতায় হারিয়েছিলাম জানিনা, হঠাৎ কানে এল' বহু কণ্ঠের কাকলি। কাশ্মীরে স্ত্রী পুরুষ সাধারণতঃ কাজ বেশী করে তাই কথা কম বলে। সহরের মধ্যেও লোকগোল অন্য জায়গার তুলনায় অনেক কম—নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই রবিবারের দুপুরে, সহর থেকে তিরিশ মাইল দূরের নির্জন পাহাড়ের কোণে আচমকা কলরোলটা কানে লাগল, মানে ভালোই লাগল কারণ, অদূর থেকে আসা ঐ আওয়াজে মেয়েদের মিহি সুরের বাহুল্যই বেশী। তাছাড়া, এখানকার প্রকৃতির এমনই প্রাণ-প্রাচুর্য যে নিঃসঙ্গতা আমার মতন মানুষের মনকে কিছুতেই যেন বেহাই দেয় না।

লম্বা পায়ে পথ চলতে চলতে এসে দাঁড়ালাম ছোট্ট সুন্দর বাড়ীটার সামনে। দুখানা ছোট

ঘর আর চারিপাশে বড় বারান্দা ঘেরা মাটির ঘাড়ী, সামনে সীমাহীন কম্পাউণ্ড। কোথাও উঁচু টিপি, কোথাও নিচু চাল, মাঝে মাঝে শঙ্কেশ্বর সারি আর এ প্রান্তে পরম উচ্ছাসে ব'য়ে যাওয়া ঝর্ণা। ঘুলটার সামনে দাঁড়াতেই ছোট ছেলেমেয়েদের একটা বড় রকমের ভিড় আমায় ঘিরে ধ'রে উঠল। ভেতরে মহিলাদের জমাট ভিড়, দল করে সব বেরিয়ে আসছে। আজে মুসলমান হ'লেও এ জগতে বেশীর ভাগ পরিবারেই পর্দার বালাই নেই। সামান্য যেটুকু আছে তা পয়সাওয়ালা বড়লোক পরিবারে। তাঁরাও আজকাল বোর্খাটাকে পর্দার প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার ক'রে থাকেন।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাশ্মীরি মেয়েদের সৌন্দর্য্য, আমার মনে যতই সন্দেহ-সাপেক্ষ হ'ক, দুনিয়ার চোখে ওদের সুনামটা সর্বজনবিদিত। অতএব, চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ক'রে নেওয়ার এমন সমারোহপূর্ণ সুবর্ণ সুযোগ ছাড়বার ছেলে আমি নই; কিন্তু বিদ্রোহ করল' আমার নাসিকা। ওদের গায়ের দুর্গন্ধ দু মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। বাধ্য হ'য়ে স'রে এসে পাহাড়ের কিনারা ঘেঁসে দাঁড়ালাম। আর সরবার উপায় নেই, তাহ'লেই একেবারে খুবসুরার পড়তে হবে। ওরা যখন বেরিয়ে এসে, বলতে গেলে, আমার গায়ের ওপর দিয়েই যে যার পথে যেতে আরম্ভ করল, তখন একবার মনে হয়েছিল যে হাত পা আর চোখ কানের মতন প্রাণও যদি আমার ছুটো থাকত, তাহ'লে তার একটা আজ আনন্দে বেরাতে পারতাম নিচে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে। ওদের তুলনায় বোকা পাঁঠাও হার মানবে।

কাশ্মীরের এই হারিয়ে যাওয়া চোখে আমার মতন আচকণ পরা মানুষ কমই আসে বোধ হয়, তাই ওদের কাছে আমি কড়া নজরে লক্ষ্য করার চিজ! আড়চোখে দেখলাম ওরা আমায় বেশ দুচোখ ভরেই দেখে যাচ্ছে। দেখুক ক্ষতি নেই, তাড়াতাড়ি গেলে বাঁচি!

সবাই গেলেন কেবল দুজন র'য়ে গেলেন। আমার চারিধারের ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে, দুই সখীর মধ্যে যিনি সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে সহরে তিনি মাথা নুঁকিয়ে বললেন: "আদাব।" আদাব জানিয়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম ওর মুখোমুখি। মহিলাটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। চোখ দুটোই আগে চোখে পড়ে। ঘন নীল। চুলগুলো কালো নয়, ঘন বাদামি, চওড়া কপাল, নাকটা অবশ্য জায়গা জুড়ে নেই, গোলাপী গাল আর ধবধবে কর্সা। দেহের ঠিক জায়গায় অজন্তার সন্তার, বাকিটা ভালো শিল্পীর সুন্দর কল্পনা। আন্দাজে বয়স মনে হল তিরিশ, তবে কম যদি হয় তাহ'লে বেশীটা অভিজ্ঞতার পোড়া দাগের দিগ্‌দারি। শাড়ী পরার ধরণ দেখে সহজেই ধ'রে নেওয়া যায় যে উনি সহরের মানুষ এবং শিক্ষিতা। উনি কথা আরম্ভ করলেন, এবার আর উর্দুতে নয়, রীতিমত অভ্যাসের শান-দেওয়া ইংরেজিতে।

"কিছু কি জানতে চান?" প্রশ্নের মধ্যে যে ইঙ্গিত সেটা প্রচ্ছন্ন হ'লেও, আমার কাছে খুব স্পষ্ট। বোঝা গেল, আমায় নিয়ে ওঁর মনে কিছু সন্দেহের অবকাশ ঘটেছে। সোজাসুজি জবাব না দিয়ে আমিও প্রশ্ন ক'রে বসলাম।

"আপনি কি জানতে চান?" মহিলা বুঝলেন যে কোলাকুলিটা বেশ খেয়ালে খেয়ালেই হ'য়েছে। ভণিতা না ক'রেই বললেন।

"এখানে আপনি কি করছেন?"

"বেড়াচ্ছি।"

"পুরো কাশ্মীর ছেড়ে এইখানে?" হেসেই বলি :

"এটাও তো কাশ্মীরের একটা কোণ!"

"এখানকার সন্ধান আপনি কেমন ক'রে পেলেন?" প্রশ্ন-উত্তরটা একটু এবং অযথা ভারি হ'য়ে আসছিল, তাই খানিকটা হাল্কা করার জন্যেই বললাম :

"ধরা যাক যেমন ক'রে আপনি পেয়েছেন।"

"আমি কাশ্মীরি। আমার জানা আছে!"

"আমি কাশ্মীরি নই, কিন্তু কৌতূহল আছে!" এবার মহিলাদের আপেক্ষে আলাপ করলেন ওঁদের ভাষায়। তারপর অন্য মহিলাটি এগিয়ে এলেন। প্রথমটিকে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হ'য়েছিল, একে দেখবার প্রয়োজন হল না। এক চোখ দেখলেই বর্ণনাটা মুখস্থ করা যায় : "মেয়ে স্কুলের বড় দিদিমণি"। উর্দুতে উনি প্রশ্ন করলেন :

"আপনাকে এখানকার কেউ কি চেনে?"

হেসে বলি :

"ধরুন, যদি না চেনে?" বেশ কড়া সুরেই মহিলা জবাব দিলেন :

"তাহ'লে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"চলুন।" ঘড়ি দেখলাম, একটা। সকালের প্রাতঃরাশ তখনও রাশি রাশি হ'য়ে পেটের মধ্যে জমা হ'য়ে আছে। অতএব হাঁটায় আপত্তি নেই, হজমের সুবিধেই হবে। তাছাড়া, সঙ্গীহীন হেঁটে বেড়ানোর যে সত্যিকার শূন্যতা তার থেকেও বাঁচা যাবে—আর সব চেয়ে সত্যি কথা, অজন্তা সুন্দরীর দেখা-না-দেখার ভঙ্গিমাটুকু বেশ ভালোই লাগছিল।

তিনজনে পথ হাঁটছি। কুচোর দল আস্তে আস্তে কেটে পড়ল, অজন্তা সুন্দরী বার কয়েক আড়চোখে দেখতে গিয়ে প্রতিবারই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে কথা পাড়লাম।

"কোথায় আমি যাচ্ছি এবং কতদূর এবং কেন?" জানতাম, উর্দুতে প্রশ্ন করলে মাষ্টারনী মাসিমা জবাব দেবেন, তাই প্রশ্ন ছিল ইংরেজিতে। মহিলা ছোট জবাব দিলেন :

"গেলেই দেখবেন!"

"তবু?"

"আমাদের তহসিল দপ্তরে!"

"কোথায় যাচ্ছি জানা গেল। এবার বলুন সেটা কতদূর এবং সেখানে কেন যাচ্ছি?" মহিলাটি রাগ করলেন না, কপট রাগে কিছু ঝাঁঝ বাড়ালেন।

"হেঁটেই যখন যাচ্ছি তখন নিশ্চয় বেশী দূর নয় এবং নিয়ে যাচ্ছি কারণ আপনার পরিচয় আমাদের পাওয়া দরকার!"

হেসে বলি :

"তার জন্যে হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার দরকার কি? আপনার কৌতূহলই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কি জানতে চান বলুন?" আমার কথায় এবার উনি হাসলেন, বোধ হয় কিছু কৌতুক অনুভব করলেন।

"ওটা আমার কাজ নয়, পুলিশের কাজ!"

"তাহ'লে আমায় গ্রেপ্তার করেছেন কেন?"

এইবার মহিলা হেসে ফেললেন।

"সন্দেহে।"

"কিসের?"

"আপনার গতিবিধির। এখানে, এতদূরে কখন কোন ভিজিটর আসে না, আপনি কেন এসেছেন আমাদের জানা দরকার!"

"যদি না বলি?"

"সেইজন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি খেমে গিয়ে বললাম:

"আর, যদি আমি না যাই?" আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উনি ওঁর শাড়ীর ভাঁজ থেকে একটা ছোট্ট রিভলবার বের ক'রে খুব শান্ত ভাবেই বললেন:

"যেতে আপনাকে হবেই!"

এতক্ষণ মহিলার প্রতি আমার ছিল সবটাই পুরুষালি কৌতূহল। এবার হল শ্রদ্ধা। বললাম:

"ওটার প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রাণের মায়া আমার যথেষ্ট আছে। চলুন।" শ্রদ্ধা যতই হ'ক ভয় যে আমার হয়নি তা নয়। রিভলবার বুঝি কিন্তু মহিলার হাতে ওর ভারটাকে বিশ্বাস করার ঠিক সাহস হচ্ছিল না। তাই, অনেকখানিটা পথ আর কোন কথা বলার চেষ্টাই করিনি।

ঔৎরাই নেমে দুবরদা পেরোবার সময় দেখি ওপার থেকে শাহ সাহেব আসছেন হন্তদন্ত হ'য়ে। শুকনো নদীটার মাঝ বরাবর যে পাহের গুঁড়ির শাঁকো আছে তার ওপারে ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া গেল। শাহ সাহেব মহানন্দাবোহে অজান্তা সুন্দরীকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে আমায় বললেন:

"ইয়া আল্লা। এসেছিলেন তো মেহমুদের জীবনী খুঁজতে আর ধ'রে নিয়ে এলেন কাশ্মীরি আসমানের আলিশান্ তারা। ফকায়া বেগমকে? সাবাস্ ডিরেক্টর, সাবাস্!" কথাটা শুনে ফকায়া বেগম তাঁর নীলচোখ দুটো আকাশের মতন ছড়িয়ে দিলেন আর মাষ্টারনি মাসি এত বড় ভুল করল যে চেষ্টা করলে তার মধ্যে মোষ ঢোকানো যায়। আমি হাসতে হাসতে বললাম:

"আমি ধ'রে আনিনি, উনি আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"মানে?"

আমি বেগম সাহেবার দিকে চোখ তুলে বললাম:

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি হুকুম করেছেন আমি পালন করছি!" বেগম সাহেবা এইবার বুঝে খুশি হলেন। ওঁদের মধ্যে কথা হল কাশ্মীরি ভাষায়। কথা শেষ করার আগেই শাহসাহেব এমন উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন যে ওপারের গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। ফকায়া বেগম সলজ্জ ভাবে বললেন:

"আপনি যে আমার দেশের অতিথি সে কথা আগে বলেননি কেন?"

হেসে বললাম :

"সাহেব সাহেব যে আপনার জানাশোনা লোক সেটা জানতাম না তাহলে জানাবার অবকাশ আপনি দিলেন কখন ?"

"সত্যিই !" উনি বললেন, "আমরাই অন্যায় হ'য়ে গেছে। আসলে, আঠারো বছর পাকিস্তানের শুশুরে দেখে দেখে, মনটাই আমাদের বিগড়ে উঠেছে। অচেনা লোক দেখলেই আগেই সন্দেহ করি !" ওঁর অপ্রস্তুত ভাবটা কিছু কমাবার জন্য ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে বলি :

"ভাগ্যিস্ শুশুরে ভাবলেন, নইলে অশুরে হতাম কি ক'রে ?" সাহেবের আর একবার তাঁর প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন !

"আরে ভায়া, বাড়ীতে ঘুড়িয়া না থাকলে আমি রুকায়ার পার্শ্বচর হ'য়ে যেতাম ! মাসি তো মাসিই, রসকষের বালাই নেই।" টাইমপিস্ বাঁধা হাতটা এগিয়ে বললেন :

"এবার যেতে হবে ! মেয়েরা অপেক্ষা করছে !"

সাহেবের রুকায়ার হাতখানা ধ'রে বললেন :

"যেয়ে যাও আর ডিরেক্টার সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে যাও, তোমায় ষ্টার বানিয়ে দেবে !"

রুকায়ার যে ইচ্ছে ছিল তা ওর ঐ মাষ্টারনি মাসির দিকে উৎসুক চোখের চাউনি থেকেই বোঝা গেল। মাসি কিন্তু নারাজ। সেই ওপর পড়া হ'য়ে বলল :

"আজ থাক সাহেব, আর একদিন হবে !"

সাহেব রসিক লোক, মাষ্টারনিকে বললেন :

"আর এনেই বা হত কি ? ডিরেক্টর সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে তো আর রুকায়াবিবি নজর দিতো না ! আর তুমিও আবার আমাকে মনেই ধর না।"

রুকায়া চ'লে গেল। আবার দেখা হবে কিনা জানবার লোভ হ'য়েছিল কিন্তু মাসির ভয়ে সেটা সামলাতে হল। ওরা যাওয়ার পর সাহেবের দিলেন সহজ ভাষায় ওর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। জানা গেল রুকায়া কলেজে পড়ার আর কাজের বাইরে সমাজ-সেবা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে। সেই সঙ্গে দেশের নিরাপত্তাকে ও নিজের দায়িত্ব মনে ক'রে গোয়েন্দাগিরিও করে। সারা কাশ্মীর উপত্যকায় ওর কাজের বাহার আর নামের বহর। আজ এই গ্রামে এসেছিল মেয়েদের জন্মনিয়ন্ত্রণ শেখাবার কাজে। আবার আসবে একমাস পর।

ওকে যতটুকু দেখেছি আর ওর যতখানি জানা গেল, তাতে মন যেন ভরতেই চায় না ; তাই কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর আরও কিছু পরিচয় পাওয়ার চেষ্টায় অকারণ লজ্জাই কিছু পাওয়া গেল। সাহেবের পুরোণো আমলের ঘোনেদি রসিক, হাসতে হাসতেই বললেন :

"মহারা ! [এটা ওদের সাদর অভ্যর্থনা, বোধহয় 'মহারাজ' কথাটার অপভ্রংশ।] দিল্ দিয়েছ ভালো কথা, তার বেশী আর লোভ কোর'না ! ও হল কাশ্মীরের নূরজাঁহা আর সারা কাশ্মীরের ন-জোয়ান ওর জন্যে মরছ হ'য়ে আছে !"

না হওয়ার কোন কারণ নেই, না হ'লেই বরং অবাক মানতাম। রুকায়ার সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ, ওর আকর্ষণ উত্তপ্ত। ওর নীল চোখে মানুষ নিজেকে হারায়, ওর দেহের গঠনে, নিজেকে খুঁজে পায়।

ওর শরীর বাংলাদেশের মতন নরম নয়, উগ্র, অনবরত হাতছানি দেয়। ওর দেহ সৌষ্ঠব, কল্পনা করেছি, কম দেখেছি, কখন পাইনি। হঠাৎ শাহজী বললেন :

"জিসম্ (দেহ) বুড়ো হ'য়েছে কিন্তু সোচ যায়নি। রুকায়া আমার সারা দেহ ভ'রে এই কথাটাই জানিয়ে গেল।"

॥ সাত ॥

দোসরা বিকেল

শাহজীর সঙ্গে সারা পথ কথার ফলে, রুকায়ার ছায়া মনের ওপর ছড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল একটু নির্জন অবসর পেলে ওর কথা আর একটু ভাবা যাবে কিন্তু নানান কথার মধ্যে, মনের এই নাবালক অনুভূতিটাকে আমল দিইনি। বিপদ ঘটালো শাহজীর বাগানের এক জোড়া বুলবুল। দোতালার সরু বারান্দার কোণে যখন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে খেতে ব'সেছি তখন বুলবুল দুটো, বলা নেই কওয়া নেই, উড়ে এসে আমার দু কাঁধে ব'সে গান জুড়ে দিল। মেহবুব সাহেবের মুখ থেকে এটা নাকি চলে আসছে ঐ বুলবুল দুটোর উর্দ্ধতন তিন পুরুষ ধ'রে। শাহজীর কাছে শোনা গেল, এই বুলবুলের ঠাকুর্দা, এমনি এক গ্রীষ্মের দুপুরে মেহবুবের কাঁধে এসে ব'সেছিল, আর কবি না কি ব'লেছিলেন, 'গান শোনা তাহ'লে রোজ খাবার দেব'। সেই থেকে ওরা বাড়ীর বাগানে বাসা বেঁধে আছে, বাচ্চা হ'লে সব উড়ে যায় কিন্তু একটা থাকেই। সেই একটা তার দোসর নিয়ে আসে আর খাবার দেখলেই দুজনে মিলে গান শোনায়। ঐ গানের সুরে রুকায়া আমার নতুন আবেশে জেগে উঠে, খাওয়ার শেষে ঘর থেকে আমার প্রকৃতির মধ্যে ঠেলে দিল।

মনের মধ্যে ওর ছাড়া ছাড়া কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে মেহবুবের অতি প্রিয় সেই আখরোট গাছের দিকে পা বাড়ালাম। মহিলা অনেক দেখেছি জীবনে, সমাজ-সেবিকাদের চেহারাও আমার অজানা নয় কিন্তু দুয়ের এমন সুন্দর সমন্বয় আগে অল্পই দেখেছি। সারা দুপুর যে মানুষটা ছিল নিতান্তই পুরুষ মনের অহেতুক কৌতূহল। প্রকৃতির কোলে পা দিয়েই বোঝা গেল, সে হয়ে উঠেছে অনেকদিন হারিয়ে যাওয়া মনের একটা নতুন কল্পনা। শুধু মনেরই নয়, আমার চোখে সারা কাশ্মীরের স্বাদটুকুও যেন বদলে গেছে। আঠারো বছর ধ'রে আমার কাছে দেশটা ছিল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে অসীম আর রাজনৈতিক আলোড়নে অহেতুক। রুকায়ার সঙ্গে এক সকালের আলাপেই দেশটা হ'য়ে উঠেছে প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ আর রাজনৈতিক আঘাতে অপরিহার্য্য। যেন আমারই দেশ।

গাছের তলায় এসে দেখি মেহবুব সাহেবের বুড়ো চাকর আবদুল ওয়ানি, আমার জন্যে তার গায়ের কম্বলটা গাছের তলায় বিছিয়ে রেখে ওরই মতন বহু পুরাতন হুঁকোর নলটা মুখে দিয়ে আরামে জিয়োচ্ছে। মেহবুব সাহেব মারা যাওয়ার পর, আজ তেরো বছর, ও সব ছেড়ে শুধু ওঁর স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে। আমি ওর স্মৃতির অনেকখানি নিংড়ে নিয়েছি আমার সৃষ্টির কাজে তাই পারলে, আমার জন্যে ও প্রাণটাই বিছিয়ে দেয়। ওর মুখে কবির কথা শুনে আমার মন ভরে, কারণ ওর কাছেই পাওয়া যায় কবির মনটা আর সেই মানুষটার আসল পরিচয়।

আমি কম্বলটা তুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে ও অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অল্প একটু হাসল, আর বললে, আমি নাকি মেহবুব সাহেবের বহু (আত্মা)। উনিও নাকি এইভাবে গায়ের চাদর তুলে মাটিতেই বসতেন।

আমি ওর পাশে বসলাম পা ছড়িয়ে। ও হুঁকোটা এগিয়ে দিল। না দিলে ও মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই আপত্তি করলাম না। কাশ্মীরে গ্রামাঞ্চলে এইটাই হল বন্ধুত্বের অলিখিত স্বীকৃতি। যে যার আপন আপন হুঁকো নিয়ে ঘোরে, কেউ কাউকে দেয়না, কেবল বন্ধুর প্রণাম হ'লে হুঁকো বিনিময় হয়। আমি হুঁকো বয়লাম, ও আমার পাটা পরম আদরে টিপতে আরম্ভ করল। ইচ্ছে না থাকলেও অন্ততঃ কৃতজ্ঞতায় ওর সঙ্গে কিছু কথা বলার দরকার, তাই বললাম :

"কি অপূর্ব আরাম এইটা।"

ও হেসে বললে :

"একটু চুপ ক'রে থাক, মহারা, দেখবে এমন কিছু যা আর কোথাও, কেউ, কখন দেখেনি। সন্নাটা (নিস্তব্ধতা)। এমন মিষ্টি সে কথা বলে ঠিক মেয়েদের হাতের চুড়ির মতন। চুপচাপ ঘরে যেমন জেনানার চুড়ির শব্দে তার মোহস্বং মালুম পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি।"

"আবদুল, তুমি বিয়ে করনি ? ছেলেমেয়ে নেই ?" ওর হাতটা আমার পায়ের ওপরই থেমে গেল। বোবা কান্নায় ওর চোখ দুটো ছলছলে। কোঁচকানো মুখে যেন শিশুর অসহায়বোধ।

"ছিল।" ও বললে, "সব ছিল বাবু, সব গেছে।"

"কোথায় ? কেমন ক'রে ?"

"বারামুলায়। হানাদারদের হাতে।" বোবহয় কান্না এড়াবার জন্যেই ও আবার পা টেপা আরম্ভ করল। আরো জোরে জোরে। এমন নিঝুম নিস্তব্ধতা যে নিঃশ্বাসে শব্দ গর্জনের মতন শোনায়। প্রণামীর পাখা হাপটানিও বুঝি কানে আসে। থেকে থেকে আর থেমে থেমে ও বলতে থাকে ওর বিবির কথা, ওর বাচ্চাদের কথা, ওর পরিপূর্ণ জীবনের কথা। তারপর কথার পিঠে কথা চাপিয়ে ও পৌঁছে গেল বারামুলায়—সেই বিভৎস রাত্রের পৈশাচিক ইতিহাসে।

বারামুলাতে ওর বৌ ছিল মিশনের আয়া। টাকার দরকারে ও কাজ সে নেয়নি, মেয়েটা কানে কম শুনত ব'লে চিকিৎসার জন্যে দিয়েছিল, আর কিছুদিন থাকতে হবে ব'লে কাজটা নিয়েছিল। সাতচল্লিশের হামলায় হানাদারদের অত্যাচারের কাহিনী যখন কানাঘুষা ওরও কানে এলো তখন ও গেল বারামুলায়, বৌ আর মেয়েকে আনতে। সবাই ব'লেছিল, ওয়ানি যাস্‌নি, মেম সাহিবদের কাছে আছে তারা, কোন ভয় নেই। ওরা হল সাদা চামড়া, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের ঝগড়ায় ওদের কোন তালুক নেই। তাছাড়া জিন্দগি ভোর ওরা আমাদের কত উপকার করে, ওদের হাতায় যারে এমন হারামখোর মানুষ পৃথিবীতে নেই। সব শুনে ওয়ানি বললে, সে যাবেই, শয়তান যখন সুযোগ পায় সে তখন আর সাদা কালোয় ফরক বোঝে না। মেহবুব সাহেব হাত দুটো ওর নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে ব'লেছিলেন, ওয়ানি বেটা, আল্লাহতালার কসম খা, যা যা শুনছি তার একটুকুও যদি সত্যি হয়, তাহ'লে নিজের খুন দিবি, তবু হিন্দুর গায় হাত দিয়ে খুদাতালার অপমান করবি না! কথাটা শুনে ওয়ানি অবাক মেনেছিল, তারপর হেসে বলেছিল, বরখুদা, পীরসাহেব, কি কথা বলছেন ? হিন্দুভাইদের গায়ে হাত দেব, কেন ? লড়াই তো হামলাদারদের সঙ্গে কাশ্মীরিদের। এই ধরতির ওরাও তো সন্তান!

মিস্তিরগাম থেকে হাঁটা পথে তিন মাইল গেলে তবে ঘুলওয়াসাতে বাস পাওয়া যায়। পথের দুধারে বড় বড় চিনারের সারি আর তারি পায়ের তলায় আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ধানের ক্ষেত। ফসল তখন সবে ধ'রেছে, আর এরই মধ্যে ফসলের ভারে নুয়ে পড়া গাছগুলো দেখে ওয়ানির মনে হল, ওরা বুঝি জমজ ছেলে পেটে নিয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আছে। ওই দেখেই ওর আরও মনে হল, মেয়েটা যখন ভালোই আছে তখন এবার একটা ছেলে না হ'লে আর চলছে না! ওর এতো ক্ষেতখামার, ম'রে গেলে দেখবে কে? মনে মনে ঠিক ক'রে নিল, এই ভাদ্রেই কথাটা জেনানাকে জানাবে, নইলে সে রাজিই হবে না, বলবে, বুড়ো বয়সে রঙ দেখ!

ঘুলওয়াসাতে বাস এলো ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়াবার পর। এমন তো তখন হয় না। বাস আসে আর ঘণ্টা অন্তর আর টাইটম্বুর ভর্তি। এ পথে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের অনবরত ছোটাছুটি, তারাও পাওয়াই বুঝিল। আজ বাস প্রায় খালি। তাদের মিঞা বললে, যাচ্ছিস্ কি, শুনিস্ নি? উরিস্তে যে খুনের দরিয়া ব'য়ে গেছে। রাজার দেড় হাজার তোপয়া সেপাইকে ওরা কতল ক'রে সহর গ্রাম সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ সব চুয়ার নতুন যে যেদিকে পাচ্ছে পালাচ্ছে! ওয়ানি ছোট্ট জবাব দিল, তাই তো যাচ্ছি!

সারা মিস্তিরগামে আলো জ্বলে দুটো চারটে। বিয়ে সাদি হ'লে, কিছু তার বেশী। বেহাতি লোকদের চোখে শ্রীনগরের রোশনাই তাই রোশনচৌকি অথচ সেই সহরটা কালো ঘুটঘুটে। জোয়ান ছেলে হঠাৎ ঘরে গেলে তার বুড়ো মা যেমন বেহোসের মতন হ'য়ে যায়, ঠিক তেমনি। বরফুদা, শ্রীনগরের একি অবস্থা! লোক নেই, জন নেই, আলো নেই, আওয়াজ নেই, ঠিক যেন একটা মুর্দা। বাস আড্ডায় গিয়ে দেখল একদম জনমানব নেই। যে দুচারজনকে ও বাসের কথা জিজ্ঞেস করল, তারা এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যেন ও বহু পাপল। একজন শুধু বললে, হাগো, তোমার কি মাথা খারাপ? বারামুলা আছে না কি? শোননি, মহারাজা নিজেই দেশ ছেড়ে চ'লে গেছেন প্রাণের বাহিরে?

বাধ্য হ'য়ে ও হাঁটা পথেই পা বাড়াল। হিসেব ক'রে দেখল চল্লিশ মাইল পথ, হেঁটে লাগবে কম করে দুদিন, গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলে দেড় দিনে হলেও হ'তে পারে। বারামুলা যাওয়ার আগে বৌ খরচতি বাবদখানি বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে আছে তারই কিছু খাবার, দুদিন অনায়াসেই চলে যাবে। ভাবনা শুধু তামাক। হুঁকোটা সঙ্গেই আছে। রাত্তিরটা বাস আড্ডার ধারে দোকানের বারান্দায় কাটিয়ে ও রওনা হবে পরদিন সকালে। দিনটা ওর ঠিক মনে আছে। ২৪ তারিখ—কারণ তারপর দিনই ছিল ঈদ। হিসেব করেই বেরিয়েছিল। বাসে-বাসে ও যৌকে নিয়ে ঈদের দিন গ্রামে ফিরবে। সেটা আর বোধহয় হল না।

দোকানের বারান্দায় শুয়ে পড়ল গায়ের কম্বলটা বিছিয়ে। কালো কুকুরটা বাবরখানির গন্ধ পেয়ে সামনে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করল। থলি থেকে বের ক'রে একটা তাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরও চারটে কুত্তা যেন আসমান থেকে টপকে পড়ল। রসুল আল্লাহ, তাদের ঝগড়া যদি দেখতেন, পারলে এ ওকে বুঝি ছিঁড়ে খায়। হুস্ হাস্ ক'রে সেই তাদের তাড়ালো অমনি অন্ধকার সহরটা কবরের মতন হ'য়ে উঠল। ঠিক যেন ভূতের বাড়ী।

ইয়া আল্লাহ! তাজ্জব ব্যাপার! সকাল হওয়ার আগেই হাজার হাজার মানুষের চিৎকার।

বাস আড্ডা যেন একেবারে ঈদ্‌গা। বাস সব আসছে তো আসছেই আর একদল ভর্তি ভর্তি। আর সে কি কান্না—ঔরৎ বচ্চা সব যেন খুদার অন্তে মাতম লেগেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সব আসছে উরি থেকে, বারামুলা থেকে, পিটপুর থেকে, সাহিদুর থেকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কেউ কথা বলে না, কেবল কাঁদে। কেউ কেউ আবার আল্লাতালাকে হারামজাদা বলে গালাগাল দেয়।

বন্দুক কাঁধে নিয়ে যে লক্ষরত লোকগুলোকে চুপ করতে বলছিল আর স্থানীয় কমকারেন্সের নাম ক'রে খাবার দিচ্ছিল তাকে গিয়ে ওয়ানি বললে, হুজুরত, আমি বারামুলা যাবো। সে বললে, পাগল, দেখছিস্ না এরা সব জান নিয়ে পালিয়ে আসছে সেখান থেকে। তারপর আর কোন কথাই সে বললে না। কি করবে ভেবে না পেয়ে ওয়ানি গিয়ে বসল আবার বারান্দায়, মাথে হাত দিয়ে। তখন ঐ মেয়েটা কফায়াবিবি, পনেরো বছরের আকবর মুল, একেবারে বেহেস্তের হুর, এসে বললে, হুজ, এখান থেকে হটে যাও, এটা আমাদের হাসপাতাল হবে। ওয়ানি অবাক হয়ে বললে, ইয়া আল্লাহ, এখানে হাসপাতাল? মেয়েটা বললে, হাঁ গো হুজ, হাঁ এখানে বাচ্চা হবে! বারমুলার হাসপাতাল হানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছে। দশজন বিবির বাচ্চা হ'য়েছে বাসে, সকলের সামনে।

ও তখন হাঁটতে আরম্ভ করল। যাবেই, যেমন ক'রেই হক। বারমুলার কাঠের সাঁকো পেরিয়ে শেষ লাইনের বর্ণার কাছাকাছি এসে দেখা গেল হাজার হাজার লোক আসছে হাঁটা পথে, বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান, ঔরৎ—সব, সারা ঘর গরস্থি কাঁধে নিয়ে। তাদের পেরিয়ে আর কোন রকমে পাশ কাটিয়ে চলেছে ওই একমাত্র মানুষ। ওদের উল্টো পথে। ওরা ওদের কান্না যেন আসমানে পৌঁছে দেবে। তারই মধ্যে একআধজন হাতাকার থামিয়ে এক পলক হতবাক হ'য়ে দেখল। একটা বুড়ো হাত ঘুরে বললে, ওদিকে যাস্‌নি, ওদিকে মৌত আছে, আর কিছু নেই। ওয়ানি তবু চলল। আরও আছে দুজন, ওর বিবি, ওর বিটিয়া। ওর বেহেস্ত, ওর হুর।

সামনে পথ আর দেখা যায় না, খালি মানুষ আর মাথা। সঙ্গে গরু, ছাগল, ভেড়া আর কুকুর। তিন বছরের বাচ্চা হাঁটছে, আশী বছরের বুড়িরা হাঁটছে। খোড়া, অন্ধ, রোগাক্রান্ত, সব হাঁটছে। পথ দিয়ে, খান ঘ'রে, মাঠের পাকা ফসল মাড়িয়ে। কথা নেই, শুধু কান্না। মানুষ নয়, যেন ভাঙা মেসিন, পায়ে পায়ে চিৎকার করছে। কেউ আল্লাহর কাছে দুয়া চাইছে, কেউ বদ্‌দুয়া আল্লাহকে রাস্তায় কুকুর আর সুয়ার-কা-বাচ্চা ব'লে চিৎকার করছে। ওয়ানির মনে হল, এরা মানুষ নয়, সব জানোয়ার বনে গেছে। এরা জীতু, এরা গদ্দার, নইলে মানুষের মতন মুখোমুখি দাঁড়াতে, মারত আর না হয় মেরে মরত। হানাদারদের কাছে না হয় বন্দুকই আছে, তবু মানুষ তো বটেই। এমনি ক'রে পালিয়ে না এসে যদি এক জাঁক হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহ'লে ঐ অল্প কজন হানাদার কি করতে পারত?

মাইল করেক পেরিয়ে যখন রাস্তাটা কিছু খালি মনে হল তখন ও মাঠ ছেড়ে ওপরে উঠে এলো। আগেই উঠে আসত—ঐ পাকা ফসলগুলো মাড়িয়ে যেতে ওর মন চাইছিল না, কিন্তু উপায় কি? পথ তো নয়, মানুষ ভর্তি ঈদগার প্রকাণ্ড মাঠটা কেউ যেন টেনে লম্বা করে বিছিয়ে দিয়েছে। পথের মোড়ে যখন বর্ণার শব্দ কানে এলো তখন জলতেষ্টায় ওর ছাতি ফাটছে। নিচে নামতেই দেখে গাছের ধারে কি যেন একটা ছটফট করছে। কাছে গিয়ে দেখে, সদ্যজাত বাচ্চাটা। দিন দুয়েকের বেশী কিছুতেই নয়। হায় খুদা, এতটুকু বাচ্চা এখানে প'ড়ে, মা'টা কোথায় গেল? বাপ তাই কেউ

নেই ? দুনিয়াটার হল কি ? কি করবে ভাবছে একটা পাগলি বুড়ি ছুটে এসে বললে, নিবি ? নিয়ে যা ! তারপর হাসল। ঠিক যেন কঙ্কন থেকে বেরিয়ে এসে একটা মুর্দা হাসছে। বাচ্চাটা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। বুড়িটা পাশে বস ক'রে বসে বলল, মার জন্যে কাঁদছিস্ ? কিসে খেয়েছে ? চ, খাবি চ। ব'লে বাচ্চাটাকে তুলে ছুট দিল বড় পাথরটা পেরিয়ে। ওয়ানি পেছন পেছন ছুটে গিয়ে দেখে মাঠের ধারে খানাটার মধ্যে গোটা দুয়েক কুকুর লাস থেকে মাংসছিঁড়ে খাচ্ছে আর আপোষে কামড়া কামড়ি করছে। বুড়ি বললে, ঐ দেখ, তোর মাকে খাচ্ছে—খা খা তুইও খা ! পেট ভ'রে খা। বাচ্চাটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল খানার মধ্যে আর কুকুরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই বাচ্চাটার ওপর। ওয়ানি এক লাফে নেমে যাচ্ছিল, বুড়ি ওর কাপড় চেপে ধরল, বললে, খবরদার, তুই ওর বাপকে খেয়েছিস্, মাকে খেয়েছিস্, ওকে খেতে পাবি না। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে ওয়ানি যখন নামল নিচে কুকুরগুলো লাফিয়ে এলো ওর ঘাড়ে। ভাবল বুঝি ও একটা লাস্।

নিশুতি রাত। আকাশ-ভরা তারা আর দুনিয়া-ভরা অন্ধকার। হাঁটা মানুষগুলো মনে হয় বাঁচা মৃতদেহ। প্রেতাত্মার চেয়ে ভয়াবহ। অন্ধকারে পথ চলতে পায়ে পায়ে লাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। বাচ্চার কান্না, অর্দ্ধমৃতের গোঙানি। আল্লাহতালার নাম ক'রে অর্ত্তনাদ, সব মিলিয়ে যেন নরক। পথের দুধারে ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলো জ্বলছে, আকাশটা রাঙা আভায় রাবেয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ওয়ানির মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া এক নিশুতি রাতের কথা। একটা ঘরে পুরো সংসার থাকে, মা বাপ, ছোট ভাই আর ওরা দুজন। অনেক রাতে ও যদি একটু কাছে যায় তাহলেই রাবেয়া রেগে আগুন হয়ে যায়, বলে, ছিঃ লজ্জা সরম কিছু কি নেই ? তাহলে, কি হবে ? অভিমান ক'রে ওয়ানি বলে, থাকব না কি সারা জীবন দুটো ভাই বোনের মতন ? দুই, রাবেয়া বলে, দুঃখ কোর না, ব্যবস্থা হবে। ষোল বছরের মেয়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে ঠিক শেখ আবদুল্লার। সন্ধ্যা যেমনি হয় হয়, মার পায়ে কেঁদে প'ড়ে রাবেয়া বলে, আমি গুনাহ করেছি। মা বলেন, কি ? রাবেয়া বলে, গুনে গেঠে ভেড়া তুলতে গিয়ে দেখি একটা কম। দিলে-নাদানটা বোধহয় মাঠেই র'য়ে গেছে। মা গালে হাত দিয়ে বলেন, হায় আল্লাহ, শিগগীর যা নইলে নেকড়ে ধরবে। রাবেয়া বলে, ঘর খুদা, একলা যেতে পারব না, জিন ধরবে তুমিও চল সঙ্গে ! মা বলেন, 'আমি ? আব্বার রুটি করবে কে ? তাহলে তুই বরং আবদুলাকে নিয়ে যা। রাবেয়া গাল দুটো লাল ক'রে বলে, হায় আল্লি, ও আমি পারব না, আমার লজ্জা করে ! মা হেসে বলেন, শোন পাগলির কথা, বাবিন্দের সঙ্গে যাবি, লজ্জা কিসের ? আমরাও তো গেছি বয়স কালে, এখনই না হয় যাই না, চাঁদা লাগার ভয়ে। যা শিগগীর, নইলে দিলে-নাদান বেচারা বেঘোরে প্রাণ দেবে।

সেদিনও ছিল এমনি ধারা আকাশ-ভরা তারা আর দুনিয়া-ভরা অন্ধকার, আর ছিল আসমানের ঐ গোলাপী আভা রাবেয়ার গাল দুটো ঝুড়ে। হাত দুটো ধরে, আর উচ্ছল ঝর্ণার মতন বেণীটা দুলিয়ে ফেরার পথে রাবেয়া জিজ্ঞেস করল, মন ভ'রে গেছে ? হাঁ, আবদুল বলেছিল, পেয়েছি, আমার দিলে-নাদান।

ঐ নরকের মধ্যে দিয়ে আঠারো মাইল পথ চলা খুব কম কথা নয়। পাটন পৌঁছে পা'টা টান করবার জন্যে আবদুল ওয়ানি যখন মসজিদের ধারে কম্বল বিছিয়ে বসল রাত তখন আধেক।

সবে একটু তন্দ্রা নামা এসেছে, চোখে পড়ল গাড়ীর আলো। ভাবলো বুঝি বাস, হাত তুলে থামিয়ে দেখে, ইয়া আল্লাহ, এ যে সেই রাইফেলধারী হজরত আর সঙ্গে সেই বারামুলা হাসপাতালের নার্সের মতন পনেরো বছরের মেয়েটা। হজরত বাচ্চে বারামুলা; ওয়ানি পা দুটো জড়িয়ে ধরল। হজরত বললে, মাথা খারাপ, সেখানে কি যাবি, সারা সহর পুড়ছে আর সব মানুষ পালিয়েছে। কুকুর বেড়ালই নেই, তো বিবি বাচ্চা। ওয়ানি বললে, সহরে নেই, আবার বিবি বাচ্চা আছে মেম সাহিবের হাসপাতালে। তখন মেয়েটা বললে, আহা কাফের, ওকে তুলে নাও, সেখানে হামলাকারীরা কিছু করেনি, আমি কাল বিকেল পর্যন্ত দেখেছি। কামাল বিরক্ত হ'য়ে বললে, কফায়া তুই একদম বাচ্চা, যে শয়তানরা বাচ বছরের বুড়িদের পর্যন্ত ছেড়ে কথা বলেনি তারা কি মেম সাহেবদের ছেড়ে দেবে? কফায়া তবু বলে, আহা চলুক। হাজার হাজার লোক বিবি বাচ্চা ফেলে পালিয়েছে, একজন যদি তাদের জন্যে মরণের মুখে যায়, সে তো শহিদ! চলুক। ওয়ানি ওর কথা শুনে কেঁদে ছিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোন ভাষা পায়নি।

সহরের আস্তাবলে মাঝরাতেই কামালের জীপ পৌঁছোল বারামুলা। ওয়ানিকে কামাল নামিয়ে দিল চকের চৌমাথায়। এখন ওখানে লোক ছিল না একটাও তাই মিশন হাসপাতালের সঠিক সংবাদ কিছু জানা গেল না, কিন্তু চকবাজার শিখ দুই তিনঘরের বাসের ভাড়া কামালের জানা ছিল—বারামুলা থেকে শ্রীনগর মাথা পিছু আট টাকা (চার দিন আগে পর্যন্ত ভাড়া ছিল চোদ্দ আনা।) তাই কফায়া বার বার ওকে বলে দিল, বিবি বাচ্চা নিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা না ক'রে ও যেন এইখানেই অপেক্ষা করে সন্ধ্যাবেলা, ওরা কোন এক ফাঁকে ওকে তুলে নিয়ে যাবে জীপে। এটা কিন্তু বলা নয়, কফায়া বেশ জোর গলায় জানিয়ে দিল, এটা ওর শেষ-দিনের সেলামী। মৌতের মুখে যে নিজের জান কুরবানি দিতে ছুটে আসে বিবি বাচ্চাদের জন্যে, সে মানুষ নয়, পীর। পরিনির্বানীয় কৃতজ্ঞতায় ওয়ানি কফায়ার হাই-এর মতন হাত দুটো বুকে চেপে ধ'রে বলল, "যেটি তুই সত্যিই বেহেস্তের হুর, আল্লাহতালার আশীর্বাদ।" ওকে নামিয়ে বিউপুরের পথে জীপ ছুটে গেল উর্ধ্বশ্বাসে। আসবার সময় কামাল সাহেব ডাক্তারের কাছে সংবাদ পেয়েছিল যে সেখানকার জেনানা হাসপাতালে হানাদারেরা মেয়েদের নিয়ে পশুর খেলা খেলছে। সাহেব ডাক্তারটি সব ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, কামাল তার রাইফেলের ভয় দেখিয়ে সঙ্গে ক'রে এনেছে।

চকই হল বারামুলার বড় বাজার। একেই কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে ছোট্ট সহরটা। এদিক ওদিক ছোট বড় বাড়ী আর সরু কাঁচা রাস্তা। ধান চালের বেশ বড় আড়ৎ ব'লে দিন আর রাতের প্রভেদ এখানে অল্প, জীবন কখন থামে না। আজ কিন্তু সারা সহর নিঃসাড়, একটা কুকুর বেড়ালও নেই। কোনদিন কোন মানুষ এখানে যেন কখন ছিলই না। ইদের চাঁদ আগের সন্ধ্যায় দেখা গেছে তাই আজকের রাতটা আকাট অন্ধকার হওয়ারই কথা কিন্তু, চারিদিকে আকাশ-ভরা তারাতে আভায় গাছ বাড়ী সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওয়ানি বেশ খানিকটা অবাক মনে হিসেব করতে থাকে ইদের রাতে এমন ধারা আকাশ জীবনে কখন দেখেছে কিনা। পঞ্চাশটা ইদের পাঁচ-মেশালী স্মৃতি আছে কিন্তু আকাশের এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য আগে কখন দেখেছে ব'লে ওর মনে পড়ল না।

বারামুলায় ওয়ানি আগে বহুবার এসেছে ঠিকই কিন্তু মেম সাহিবের হাসপাতালটা ঠিক যে কোন্ দিকে ওর জানা নেই, কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে যে জেনে নেবে তারও উপায় নেই। সারা

দিনের পথ চলায় সারা দেহ ঝিমঝিম করছে অথচ রাবেয়াকে না দেখা পর্যন্ত স্থির হ'য়ে বসার উপায়ও নেই। কোন্ পথে যাবে, কি ক'রে জানবে এই সব কথাই ভাবছে, এমন সময় কানে এল আসমান-কাটা উন্মত্ত চিৎকার "আল্লাহ্ হো আকবর!" ময়লা ফেলা রাত-গাড়িটা পথের ধারে পড়ে ছিল; ও তারই মধ্যে লুকোতে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই একটা বুড়ো সেখানে ঢুকে ব'সে আছে। গলির মোড়ে পোড়া বাড়ীটার পাথরের পেছনে লুকিয়ে বসল। কিছুটা প্রাণের ভয়ে, বেশীটা কি করবে বুঝতে না পেরে। মশাল হাতে আর বন্দুক কাঁধে কম ক'রে হাজার খানেক লোক। পোষাক দেখে বোঝা যায় পরদেশী; মজফ্ফারাবাদের পাহাড়ী মুলুকের বাসিন্দাও তাদের মধ্যে বহু। সামনের রাস্তা দ'রে তারা আসছে, দুধারের দোকানে আগুন লাগাতে লাগাতে আর উন্মত্ত গলায় অনর্গল হুঙ্কার করতে করতে-যেন সব ক্যাপা জানোয়ার, আঁচড়ে কামড়ে দুনিয়াটাকে চিব চিব করে দেবে। একটা ক'রে বাড়ী হাউ হাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, ভেতর থেকে মরিয়া মানুষগুলোর প্রাণ-কাটা আর্তনাদ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে; যেকলেই মারবে আর যেমেই পৈশাচিক চিৎকারে পাথরও কাটিয়ে দেয় "আল্লাহ্ হো আকবর।"

সামনের দলটা হড়ি বাঁধা লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো চকের মাঝখানে। কেউ লাথি মারল, কেউ বন্দুকের গুঁতো মারল, কেউ তার পা দুটো ধরে ঝুলে ওপর থেকে আছাড় মারল। একজন চিৎকার ক'রে বললে, আগ লাগাতে, আর একজন বললে, জলন্ত মশাল পেছন দিকে ঢুকিয়ে দে! ওদের সবাইকে হটিয়ে দিয়ে উর্দি পরা সাহেব ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে দাঁড় করালো, বললে, শালা বেইমান গদ্দার। আমাদের ঝুল পথে চালিয়েছে সারারাত। চোখ উদ্ভূত হুকুম দিল, ধ'রে আন হারামজাদার মা বাপ ভাই বোন আর বৌকে। হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল "আল্লাহ্ হো আকবর।" লোকটার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, প'ড়ে গেল। সাহেব আবার হুকুম দিল, বাঁধ এই সুয়ারের বাচ্চাকে, সামনের দোকানে ঐ খুঁটিটার সঙ্গে। লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, জনা ছয়েক লোক। সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, নিয়ে আয় সারা সহরের লোক, লোক যে যেখানে আছে। যে আসবেনা তাকে গুলি ক'রে মারবি আর বাড়ীতে তার আগুন দিবি। পাকিস্তানের পা যে চাটবে না তার কি অবস্থা হবে জেনে যাক। আবার সেই উন্মত্ত চিৎকার "আল্লাহ্ হো আকবর।"

দেখতে দেখতে আকাশ ছুঁড়ে উঠল আগুনের হল্কা। গুলির আওয়াজে, প'ড়ে যাওয়া পোড়া বাড়ীগুলো পর্যন্ত থর থর ক'রে শিউরে উঠল, আবার নতুন করে। এক হুকুমের হুমকিতেই সারা সহরটা যেন ভয় পেয়ে ঘুম-ভাঙা শিশুর মতন আর্তনাদ ক'রে উঠল, আল্লাহ্-র নামে; আর সেই একই আল্লাহ্-র নামে ধরে হিংস্র পশুরা বার বার হুঙ্কার দিল "আল্লাহ্ হো আকবর!" মানুষের আর্তনাদ আর পশুর আস্ফালন মিলে এক বিচিত্র আবর্ত আসমান ভ'রে তুললো। ওয়ালি মুল্লা দেখেছে, মানুষকে মরতে দেখেছে, মারতেও দেখেছে তারা আল্লাহ্-র নামে মানুষ যে এমন পৈশাচিক হ'তে পারে তা ও দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

ভোরের আগেই সারা চকটা মানুষে মানুষে ভ'রে গেল। ছেলে মেয়ে বুড়ো। জেনানা, মর্দানা। কাঁদতে কাঁদতে এলো অশীতি বৃদ্ধা, আসন্ন প্রসবা। কাঁপতে কাঁপতে এলো অরাজীর্ণ যাদা, পরদাদা। বন্দুকের গুঁতোয় আর শক্ত পায়ের লাথিতে ওরা চক্রাকারে দাঁড়াল, চকের চারিদিকে; মাঝখানটা খালি রইল, পাকিস্তানি আল্লাহ্-র দরবারের জন্যে। পুরু ঠোঁটে বাঁকা সিগারেট ঝুলিয়ে

উর্দিপরা কাপ্তান সাহেব এসে দাঁড়ালেন সেইখানে। অকস্মাৎ অনতার কণ্ঠে আল্লাহ-র নামের আর্তনাদ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। উনি হাত তুলে হুকুম দিলেন, পাঠান ব্রাদার্স!

হাজার হাজার মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়াল। চোখের পাতাও কারো পড়ছে না, পাছে শব্দ হয়। কুড়িজন পাঠান এসে দাঁড়াল, মাংস-কৃতি দৈত্যের মতন। পাথরের মতন নিশ্চল, মানুষের মতন নৃশংস। সাহেব সামনে দিয়ে হাঁটলেন। বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। বন্দুক বোধহয় অত কঠিন নয়, কর্কশ তো নয়ই। 'আল্লো হারামজাদার দাদা আল্লাকে!' খোলা জায়গাটার মুখ থুবড়ে পড়ল বুড়ি মা, কিশোরী বৌ, কচি বোন আর বুড়ো বাপ। তিনজন পাঠান সৈন্য রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল তাদের দু পাশে। ক্যাপ্টেন সাহেব বাঁধা লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন:

"এই শালা সুয়ার কা বাচ্চা কাশ্মীরি, আমাদের শ্রীনগরের রাস্তা দেখাবার নাম ক'রে সারারাত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে আবার বারামুলায় ফিরিয়ে এনেছে। এ যদি পাকিস্তানের সঙ্গে বেইমানি না করত, তাহ'লে আজ আমরা সারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের বেহস্ত বানাতে পারতাম। এ আমাদের সঙ্গে গদ্দারি ক'রেছে, আমাদের কারেদে আজম জনাব জিন্নার অপমান ক'রেছে, পাকিস্তানের আল্লাহতালাকে অবজ্ঞা ক'রেছে। এই ধরণের কাজ করলে কাশ্মীরিদের কি শাস্তি হবে তার কিছু ইশারা আজ আমি এখানে রেখে যাবো। যে দেখবে সে জানবে যে পাকিস্তানি আল্লাহতালার কি মহিমা, আর যে দেখবে না ব'লে চোখ বন্ধ করবে, তার চোখ গুলি দিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হবে। যে কাঁদবে, চিৎকার করবে, অজ্ঞান হবে কিম্বা চোখ বন্ধ করবে, আমাদের আইনে সে হবে পাকিস্তানের শত্রু আর শত্রুর শাস্তি—" সাহেব ঘুরে হুকুম দিলেন, "আল্লো বুড়িয়াকে আর' খুলে ফেল ওর গায়ের কাপড়।" আকাশ ফাটিয়ে দিল—"আল্লাহো আকবর!"

পাঠান ব্রাদার্সের একটা জোয়ান বাচ্চিল হুকুম তামিল করতে, সাহেব চিৎকার করলেন, "তুমি নয়, তোমার কাজ অন্য"। চারটে লোক বুড়িমাকে ধ'রে এনে ফেলল, পাকিস্তানি আল্লাহ-র খোলা দরবারে। বায়নেটের মাথা দিয়ে কেটে ফেলল তার কাপড়। হাজার জনতা ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল। সাহেব হুকুম দিল, "চালাও গোলি!" হুকুমের অন্যথার উপায় নেই। পেছনেও চলল গুলি। আবার হুকুম হল, "থামাও গুলি!" সাহেব চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সব চোখ খোলা কি না। বুড়ো বাপের চোখ বন্ধ ছিল, একজন বায়নেটের খোঁচা দিতে যাচ্ছিল, সাহেব বললেন, "ওকে নয়, ওর অনেক দেখা এখনও বাকি আছে।"

আবার সেই পৈশাচিক নীরবতা। সাহেব তার বুট-পরা পা'টা দিয়ে ঠেলে ধরলেন বুড়ির গলা আর হুকুম দিলেন, ওর পা দুটো ধ'রে দুদিকে টেনে ধর। নিয়ে আয় মশাল আর কর গরম একটা বড় বায়োনেট। হুকুম তামিল হল। সাহেব তাকালেন বাঁধা লোকটার দিকে। সে চেয়ে আছে।

সাহেব হুকুম দিলেন "সে পুরোটা ঢুকিয়ে!"

হুকুম তামিল হল, "আল্লাহ হো আকবর!"

বুড়ি শুধু অস্পষ্ট বলল, "ইয়া আল্লাহ!"

সাহেব পা'টা সরিয়ে নিলেন, "এইভাবেই রেখে দে যতক্ষণ বেঁচে আছে। আর ওর বোনটাকে।"

এবার আর বন্দুকের বায়োনেট নয়, বন্দুকধারী পাঠান। আদেক প্রাটুন। দুজন হাত ধরল, দুজন পা ধরল আর বাকি দুজন সাহেবের হুকুম তামিল করল। মেয়েটা কাঁদল না, চিৎকার করল না। সে জানলও না পাকিস্তানি আল্লাহতালার দরবারে তার কি শাস্তি হল। আমার আগেই সে ম'রে গিয়েছিল।

আনা হল তার কিশোরী স্ত্রীকে। আসন্ন-প্রসবা সে। এবার আর শুধু প্রাটুন নয়। যে কজন হানাদার আছে আর যতক্ষণ মেয়েটার জ্ঞান থাকে, আর নয় যতক্ষণ না সে বলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। সাদিস হাসল, বলল "মো হুকুম কাপ্তানসাব—আমি তোমার হুকুম মানব শুধু একটা আমার অনুরোধ। একটা শুধু রাইফেল দাও, যাতে যাঁরা ঐ মজাদারকে আমি নিজে হাতে আগে গুলি করি, তারপর বলব।" অভিভূত ঐ বাঙালি মানুষটা চিৎকার ক'রে উঠল, 'মেইয়ান' আর বলল, 'কায়েদে জিন্দাবাদ।' আরও বলল, 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!'

সাহেব বললেন, সাবাস! এই নে বন্দুক! দেখুক সব মক্কার কাশীরি পাকিস্তানের সাচ্চা যোদ্ধা কে।"

সাদিস তুলে নিল বন্দুক, খুলে দিল সেফটি আর গুলি করল, চক্ষের পলকে সাহেবকে! এবার পুরো বারামুলা চিৎকার ক'রে উঠল, "আল্লাহ হো আকবর!"

সাহেব গেল কিন্তু তার হাজার প্রেতাত্মা এক একটা হানাদারের মধ্যে। পাঠান প্রাটুনের সর্দার এসে দাঁড়াল ওর কাছে, চিৎকার ক'রে উঠল—"হুকুম তামিল কর!"

বাঙালি যাঁরা আমী চিৎকার ক'রে বললে "সাদিস ভয় নেই, আল্লাহতালার নাম কর!"

সাদিস পাগলের মতন হেসে উঠল, "মকবুল, সে মেইয়ান ম'রে গেছে!"

জলতার যাতন শুরু হল আটটার পর, যখন হানাদারের দল পা বাড়াল শ্রীনগরের দিকে। যাওয়ার আগে তারা বাঙালি মকবুল শেরওয়ানিকে তেরোটা গুলি মেরে গেল। একটা একটা ক'রে, পা থেকে আরম্ভ ক'রে মাথা পর্যন্ত।

ওয়ানি মেম পাদ্রিদের হাসপাতালে পৌঁছোল বেলা এগারোটায়। হাসপাতাল তখন পুরো ছাই হ'য়ে গেছে আর উন্মত্ত হানাদারের দল প্রকাশ্য রাজপথে তেরো জন নান-এর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রে চলেছে। তাদের সাদা দেহ ঘিরে রক্তের বন্যা বইছে, কেউ কেউ ম'রেও গেছে কিন্তু হানাদারদের ভ্রূক্ষেপ নেই এক বিন্দু। তাদের দৃশ্যসে লালসায় রণ এক, হুঙ্কার এক, ভাষাও এক—'আল্লাহ হো আকবর!'

ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি ওয়ানিকে প্রশ্ন করি :

"আর তোমার বিবি বাচ্চা?" ও এবার একটু হাসে, বলে :

"আমার জেনানা বড় ভক্ত ছিল আল্লাহতালার। সেইজন্যেই তিনি ওর ওপর বেশদাস মেহেরবানী করেছেন, মেয়ের ওপরও।"

একটু যেন আমার ভয়টা কাটল, তবু অস্পষ্ট প্রশ্ন করলাম :

"কি রকম?"

"হানাদাররা যখন বড় মেম সাহেবকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝখানে অত্যাচার আরম্ভ

করল, ও তখন ছিল ঘোড়শার কোণে রান্নাঘরে! ও পাগলের মতন চিৎকার ক'রে উঠল, হায় আল্লাহ! সেটা শুনে হারাম্বারের দল তাকাল ওদের দিকে আর দু' তিনজন ছুটে গিয়ে ওকে ধ'রে আনবে ব'লে। একটুও ভয় পায়নি রাবেয়া। ও চট ক'রে ছুরিটা বন্ধ ক'রে মেয়েকে টেনে নিল, বুকের মধ্যে আর আদর ক'রে বললে, কাঁদিস্ কেন পাগলি, ভয় কি, আমাদের আল্লাহ আছে, না? ব্যস্ তারপরই বিজলি দুইচের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আঙুল দুটো!" এক মিনিট চুপ ক'রে রইল ওয়ানি বুড়ো, ভেবে নিল, বোধহয় আল্লাহতালার সঙ্গে রাবেয়ার সেই মুহূর্তের পরমতম সংযোগটুকু, তারপর বললে:

"ঐ পোড়া হাসপাতালের কোণের ঘরে ঠিক ঐ ভাবেই ওদের দু'-বেটিকে পেয়েছিল রুবায়া।"

"রুবায়া?"

ও বললে:

"হ্যাঁ মহারা। হারামুলার চরে আমায় না দেখতে পেয়ে ঐ দুর বদমাস নিয়ে এসেছিল আমার খোঁজে হাসপাতালে! আমি তখন পাথরের মতন ব'সে আছি ভাঙা গেটের ধারে। ওরাই খুঁজে বের করল, রাবেয়াকে আর বিটিয়াকে। এমন পুড়েছিল যে চেনাই যেত না, যদি না হাতে তার এই আংটিটা থাকত।"

"কোন আংটি?" পরম স্নেহভরে ওর বাঁহাতের কোড়ে আঙুলে পরা আংটিটা বার দুয়েক আঙুলের ওপর ঘুরিয়ে ও হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ধাতু চোরা লোহার আংটি লাল রংয়ের কাঁচ লাগানো—পাথরও হ'তে পারে।

"সেই যেদিন আমরা ছোট্ট তেড়া দিদে-বাবাকে খোঁজবার অছিলাতে পালিয়ে গিয়ে এক পলকের জন্যে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলাম চশমা সাহির কিনারায়, সেদিন এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আর অনেকখানি পাওয়ার এক ফাঁকে এটা ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলাম।" ওর সব হারানো জীবনে ঐ ছোট্ট স্মৃতির সঞ্চয়টুকু আর একবার দেখে নিয়ে ও বললে:

"এমন পাগলি দুনিয়ায় দেখিনি! যেদিন ওকে শ্রীনগর নিয়ে গেলাম বাইস্কোপ দেখাতে সেদিন বললাম, চ' তোকে চাঁদির আংটি কিনে দি। ও বললে, 'ইয়া আল্লাহ, সে কি এর মতন ভালো?' বুঝলেন মহারা, অনেক খোঁজাম কিন্তু কিছুতেই কিনল না!"

কথায় কথায় কত যে বেলা গড়িয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ দেখি প্রায় পাঁচটা। এলে ট্যাকসিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক ছিল, যে ব্যবস্থা ক'রে বলরাজ আমার সহকারি গাড়ি পাঠাবে। সেটা এসেছে কিনা জানতে গেলে দুরত্বটা পেরিয়ে ও পাহাড়ের কিনারায় যেতে হবে। ওয়ানি বললে, তুমি বোস, মহারা, আমি দেখে আসছি। নিজের বয়সের দিকে তাকিয়ে এতোখানি পথ ওকে পাঠাতে লজ্জা করল, কিন্তু ও কিছুতেই শুনল না, হেসে বললে, "কাশ্মীরির বয়স দেহে নয়, মনে। বোল (ভালোবাসা) করলে আমরা জান কবুল ক'রে দিতে পারি!"

ওয়ানি চক্ষের নিমেষে পাকদণ্ডি ধ'রে নিচে নেমে গেল, আর আমি আমমনা হ'য়ে আনত সায়াহ্নে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম। আমরা সহরের সভ্য মানুষ, শিক্ষার বড়াই করি, সংস্কৃতির নামে শপথ করি কিন্তু জীবনের মূল্যবোধে ওয়ানির তুলনায় আমরা কতটুকু? ওর কুঁচকে যাওয়া আঙুলে কাঁচ বসানো লোহার আংটিতে স্নেহ ভালোবাসার যে অসীম সঞ্চয়, আমাদের ম্যানিকিওর করা আঙুলের

হীরের আংটিতে তার এক কথাও কি আছে? মনে পড়ে গেল, কোন একদিন চাঁপা-কলির মতন এক সুন্দর আঙুলে আমি হীরের আংটি পরিয়ে দেবেছিলাম, ভালোবাসা বুঝি আমার অক্ষয় হ'য়ে রইল। হঠাৎ একদিন দেখলাম সেই আঙুলের ইসারাতেই তিনটে জীবন তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেল, আর এক পুরুষের আরও একটি আংটির মোহে! 'আল্লাহ্‌ সো আকবর!'

"আসলাম্‌ ওয়ালেকম্‌!"

চম্‌কে তাকালাম।

॥ আট ॥

দোসরা সন্ধ্যা

দেখবার মতন চেহারা তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা দু'ফুট লম্বা, কম ক'রে বেয়াল্লিশ তার ছাতি। কালো রোঁয়ারা টুপি, তা দেওয়া গোঁফ, ডোরা কাটা হাঁটু ঢাকা কামিজ আর মরলা পায়জামার। পায়ের পেশোয়ারিটি ঘুসিঘুসিয়ে। প্রকৃতির প্রাচুর্যে মানুষ হয় ব'লে কাশ্মীরি চোখে চমৎকার একটা কমনীয়তা থাকে। এর চোখ ছোট, চাউনি প্রখর। কাশ্মীরি নয়, পাঠানও নয় যে পাকিস্তানি ব'লে সন্দেহ করব। সহর হ'লে জানবার কিছু থাকত না, সহজেই আলাপটা ফিরিয়ে দিয়ে আলাপ জমাতে পারতাম। হারানো কোথ ব'লেই যত হয়রানি! এক পা এগিয়ে এসে, লোকটা আবার বললে:

"আদাব অরায।"

ভাষা শুনে বোঝা গেল, লোকটা পাঞ্জাবি। গলায় তাবিজ আছে, অতএব মুসলমান।

"আদাবরজ।"

ও এসে আমার পাশে বসল লাল রঙের রুমাল বিছিয়ে। আমি স'রে ওর জন্যে জায়গা ক'রে দিলাম। বসতে বসতে চোস্ত উর্দুতে লোকটা বললে:

"আপনি কাশ্মীরি?"

প্রশ্ন করার ধরণটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। বললাম:

"আজ্ঞে না।"

"তাহ'লে?"

"বাঙালি।" স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা খুব অবাক হ'য়েছে! চোস্ত উর্দু ছেড়ে এবার পাকা ইংরেজীতে বলল:

"আপনার কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই।" আমি উর্দুতেই জবাব দিলাম:

"সবাই তাই বলে।"

"এখানে?"

"একটু কাজ ছিল।"

এক নজর আমায় দেখি ক'রে লোকটা জানতে চাইল :

"কি কাজ ?"

আমি কিছু বিরক্ত বোধ করলাম। অহেতুক কৌতূহল এমনিতেই আমার খারাপ লাগে। বারামুলার বর্বর ইতিহাস আর কাশ্মীরের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মনটা আরও খারাপ ছিল। তাদের ওপর বিষফোড়া হল ঐ ফিলম্ প্রসঙ্গ। ও কথা উঠলে লোক একেবারে ঐ'কের মতন পেয়ে বসে। ফিলম্ করি শুনলে অত্যন্ত অসাধারণ মানুষও অনসাধারণের মতন কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। তাই ইচ্ছে ক'রেই ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বললাম :

"একজনের বিষয় কিছু অনুসন্ধান করছি। নাম হয়ত শুনেছেন। মেহজুর।"

লোকটা চমকে তাকালে, তারপর এক গাল হেসে বললে :

"আমিও তাই ভেবেছিলাম !" মেহজুরকে সবাই জানে আর বলরাজকে সকলেই চেনে, অতএব আমাদের ছবির কথা সারা কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই যে ছড়িয়েছে তা আমার জানা ছিল। ও ভাবলে এ আর এমন আশ্চর্য্য কি। লোকটা বললে :

"কতদূর এগুলো আপনার কাজ।"

"অনেকখানি।"

"আর কত দিন লাগবে ?"

"দিন দুয়েক।" লোকটা অহেতুক আনন্দে আমার পিঠ চাপড়ে বললে,

"সাবাস্! আপনার হেড কোয়ার্টার কোথায় ?"

"ওয়াজির বাগ।" লোকটা মনে হল আরো অনেকখানি খুশী হল। ছবি করি শুনলে লোক অবাক হয় কিন্তু ফিরে যাওয়ার বহর অনেক বেশী। ঠিক তেমনি। লোকটা পকেট থেকে প্যাকেট বের করল, বললে :

"নিন।"

অচেনা সিগারেট। প্যাকেটটা উল্টে দেখা। একটু অবাক হলাম। তিরিশ বছরের নেশা, ভিন্নদেশী রকম প্যাকেট দেখেছি অনেক পৃথিবী ঘুরে কিন্তু উল্টে দেখা প্যাকেট কখন দেখিনি। সিগারেট যেমনই হক, নতুন ব্রাণ্ডের একটা আলাদা স্বাদ আছে। লোকটাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করল। পেটে খাবার পড়লে মনের ঔদার্য্য বাড়ে এটা বিলেতে থাকাকালীন শুনেছিলাম। সিগারেটের ধোঁওয়ায় আজ সেটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রশ্ন করলাম :

"আপনি ?"

ইংরেজিতে ছোট্ট জবাব দিল :

"বাটার ফ্লাই।"

বোঝা শক্ত নয়। রকম যে-রকমের প্রজাপতি ধরা আর বোর্ডে পিন দিয়ে গেঁথে ফ্রিজিংরুম সাজানো একটা অনপ্রিয় সাহেবি নেশা। বিলেতে বহু দেখেছি। কাশ্মীরের পথে প্রান্তরে শুধের ছড়াছড়ি, নানান রঙের, নানান আকারের। বোঝা গেল ও তারই ব্যবসা করে। আরও কিছু খোঁজ খবর নেব কিনা ভাবছি, ওয়ানি বুড়ো খবর দিল গাড়ি এসেছে। পাঁচটা বাজে ; প্রায়

শুনলাম। পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ঐ তিরিশ মাইল যেতে লাগবে কম ক'রে ঘণ্টা ছেড়েক। বাসে গেলে ঘণ্টা তিনেক তো বটেই। লোকটা বললে :

"কোথায় যাবেন? হেড কোয়ার্টার?"

একটু ইতস্তত খেয়ে জবাব দিলাম :

"নেমন্তন্ন আছে।"

"কোথায়?"

বাধা হ'য়ে বলতেই হল :

"সাহেব সাহেবের বাড়ী!" লোকটা এবার রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল বেশ মিনিট খানেক।

"কোথায়?"

হেসে বললাম :

"কেন? বিশ্বাস হল না? সাহেব সাহেবের বাড়ীতে!"

"ও!" জবাবটা ছোট কিন্তু অবিশ্বাসটা স্পষ্ট। বোঝা গেল ও ভেবে নিয়েছে আমি মিথ্যে কথা বলছি। সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার জন্যেই যোগেন বললে :

"চলুন, আমার জীপ আছে।" বাঁচা গেল। কেরা নিয়ে ভাবনা হ'য়েছিল, আমায় মিথ্যুক ভেবেছে ব'লে খুশীই হলাম। ও বললে :

"চলুন।" শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে ক্ষমাতীত অপরাধ হবে, তাই বললাম :

"আপনি এগিয়ে যান আমি শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি।"

"ওঁকেও চেনেন নাকি?"

হেসে বললাম :

"এখানে আমি ওঁরই অতিথি!"

"ইয়া আল্লাহ! চলুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাই। নাম অনেক শুনেছি কিন্তু দেখা করার সাহস হয়নি।"

শাহজীর সদয় ব্যবহার আর সাদর অভ্যর্থনা সকলের জন্যে সমান! উনি লোকটিকে বুঝে ব'লে দিলেন :

"বহুত বড়দিন ছিল, লোকের অভাব ছিল না। আবার তার খুব আসছে আর আমাদের বাড়ীতে জবাবরা।" লোকটার ইচ্ছে ছিল জমিয়ে আড্ডা দেয় কিন্তু আমার ভাগ্যদায় আর বদা হল না। আন্দাজ ক'রেছিলাম আধিন থেকে যাবে, গেলও। শাহজী একবার বলতেই ও একেবারে রাজি। আমার বাড়ীর অমন রান্না ছেড়ে ঐ বাইরে মানুষ হোটেলের খাবার খেতে শ্রীনগর ফিরবে এমন কথা ভাবাই অন্যায়। আবার আমার আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে শাহজী আর আধিন আমাদের বিদায় দিলেন গুলমার্গ এলাকা থেকে।

চারিদিকে বড় বড় পাহাড় আছে ব'লে এ অঞ্চলে রোদ্দুরটা চট ক'রে চ'লে যায়। গুলমার্গ ওপারে ছোটবাটো পাহাড় আর বড় বড় পাথরের জন্যে চলার পথটা-বানিয়ে তোলা খুবই শক্ত। এখানকার মানুষ যখন যেখানে ইচ্ছে পথ ক'রে নিয়ে হাঁটে ব'লে চারিদিকেই পথের চিহ্ন আছে আর

গাড়ীর ঘানাই নেই ব'লে আসল আর নকলের মধ্যে প্রভেদ বোঝা শক্ত। কাজেই, পথের দিকে নজর ছিল, ব'লে মুখে আমাদের কথা ছিল না। কথা না বলার আরও একটা কারণ ছিল ঠকারা। বীরের আংটি-পরা হাতের ঘা খেয়ে মেয়েদের প্রতি মনটা আমার এ ক' বছর ঘৃণায় বিষাক্ত ছিল। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক পরিপূর্ণতায় ছোঁওয়া লেগে মনটা কিন্তু নরমই হ'য়েছিল তাই ঠকারার আকর্ষণ দাগ কাটতে সময় নেয়নি। অচেনা পথের ওপর ঐ অজানা মানুষটা আমার নতুনের ছায়া ফেলল। শাহজী সতর্ক ক'রে দিয়েছেন, ওর অঙ্গে বহু মানুষ মজত হ'য়ে আছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার বয়স নেই, অথচ পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। আমার ঘর বাঁধার বাসাই চুকেছে, ওর ঘর ভাঙার ভয়ও আছে। এড়িয়ে যাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু কেন? আবার, এগিয়ে যাব—তাইই বা কেন? এখানে আমার থাকার মেয়াদ অল্প। কাজ আরম্ভ হ'লে কখন কখন আসব। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত কচিৎ কখন দেখা হবে। অনেকখানি পাওয়ার লোভ, আরও অনেকখানি দূরত্বের ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠল। গড়িয়ে যাওয়া বিকেলের শান্ত পরিবেশেও মনটা অশান্ত হ'য়ে উঠল। লোকটা বললে:

"কি ভাবছেন?"

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম:

"ভবিষ্যতের কথা।"

হেসে লোকটা বলল:

"ভাবনা নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে!"

গ্রামের প্রান্তে এসে দেখা গেল গাড়ী নেই, গাছের তলায় একটা লোক ব'সে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। লোকটি গিয়ে তাকে কি বলল, সে ছুটে চ'লে গেল বাঁ দিকের রাস্তা ধ'রে পাহাড়ের দিকে। ওর ব'সে থাকার ভঙ্গিমা, কথা বলতে বলতে এর সচকিত চাউনি আর দ্রুতপদে ঐ লোকটার চ'লে যাওয়া, সবই হ'লেও খুব যেন স্বাভাবিক মনে হ'ল না। হয়তো সবটাই আমার সন্দিগ্ধ মনের আশঙ্কা কিম্বা অবচেতনার অনুভূতি, তবু মনের কোণে কোথায় যেন বেসুরো বাজল। লোকটা আমার পাশে এসে বলল:

"দেরি হ'য়ে যাচ্ছে?"

"না:।"

"কটায় যাওয়ার কথা?"

"সাড়ে সাতটায়।"

বেশ দামি হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে লোকটা বলল,

"অনেক সময় আছে!"

বেশ বলল "কাজ সব ঠিক ঠিক হ'য়ে যাবে তো?" কথা বলতে ভালো লাগছিল না তাই ছোট্ট উত্তর দিলাম।

"আশা করছি!" জীপ এলো, আমাকোয়া নতুন টায়ারের গন্ধ খুব খুব করছে! সেফ্‌ট হাও ড্রাইভ, কাশ্মীরের নম্বর। আমি আর দেরি না ক'রে উঠে বসলাম। ও ড্রাইভারকে বললে:

"শ্রীনগর যাও, সাহেবকে নিয়ে।"

"কোথায়?"

"সাহেব যেখানে বলবেন।" ড্রাইভার বেশ কড়া নজরে আমায় মেপে নিয়ে বললে :

"কি আছা।" এদিক ওদিক চেয়ে লোকটা আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করলো :

"সঙ্গে মাল আছে ?"

বুকটা আমার ধড়াস্ ক'রে উঠল। এতো পায়ে-পড়া আলাপের কারণটা এবার আন্দাজ করা গেল। টাকার প্রয়োজন ছিল না তাই সঙ্গে কিছু আনিনি। হাতঘড়িটা পরের, আংটিটা-পুরোন আর পেনটার দাম পাঁচ সিকে। মনে মনে লোকসানের হিসেবটা ক'রে নিয়ে ভয়ে ভয়েই বললাম :

"না। এখানে দরকার ছিল না তাই সঙ্গে কিছু আমি আনিনি।"

"সঙ্গে কি তাহ'লে ওয়াজিরবাগ হ'য়ে যাবেন ?" ওয়াজিরবাগ পৌঁছোতে পারলে আর যাই হোক অন্ততঃ প্রাণটা থাকবে। সেই আশাতেই বললাম :

"হ্যাঁ।"

ও তখন ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল :

"আছে ?"

সে ছোট্ট উত্তর দিল :

"কি না !"

লোকটা পট্ ক'রে তার আমার আস্তিনের বোতাম খুলে বের করল একটা ছোট্ট রিভলভার, দিয়ে বলল, "সঙ্গে রাখো !"

এতক্ষণ মনের মধ্যে ভয়ের একটা ঝড় বইছিল। এবার আরম্ভ হল কৌতূহল। সবটাই যেন হেঁয়ালি, অথচ সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে জেনে নেব, এমন সাহস নেই। মনে মনে ঠিক ক'রে নিলাম, যাওয়ার পথে সুটকেসের স্থান যদি থাকে তো বিনা দ্বিধায় সব কিছু দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মনে মনে আরও একবার হিসেব ক'রে দেখা গেল, দিলে যা যাবে তা অল্প, যা থাকবে—যদি থাকে, তা পয়সা দিয়েও মেলে না—প্রাণ। কৌতূহল মাথায় থাক, কোন রকমে শ্রীনগরের এলাকায় পৌঁছোতে পারলে বাপের নাম। ভাবনার বোঝা হাল্কা করার জন্যে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম :

"আসুন।" আমার যাতায়াত সাধারণতঃ থার্ড ক্লাসের স্লিপিং কোচে। তার জন্যে চারমিনারই যথেষ্ট। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগে কায়দা ক'রে ছোট্ট একস্‌প্রেস কিনেছিলাম অনেক দাম দিয়ে। পরে তার জন্য অনুতাপও কম হয়নি কিন্তু এখন, প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ভালো সিগারেট দামে যতই ভারি হক না কেন নেশাখোরদের কাছে তার মান আলাদা। লোকটা মহানন্দে মাথা নাড়ল, আর হাতের মতন হাত বাড়ালো। ওর ভাবে আর ভঙ্গিতে বোঝা গেল ওর প্রাণ যাই হক, আমার প্রাণের প্রয়োজন বোধহয় নেই। ও আরাম ক'রে হেলে বসলাম। গাড়ী ছুটল আর সেই সঙ্গে আমার মনটা। সারাদিনের ছোটখাটো কথা আর ঘটনার রাশি আমার সচেতন মনে কোথায় যেন কাঁটার মতন বিঁধে রইল কিছুটা ভয়ের ছোঁওয়া নিয়ে আর বেশীটা রহস্যের ঘন অন্ধকারে।

দেশটা যাই হক কলকাতা কি কাশ্মীর ; রাতের চেহারা প্রায় সব জায়গাতেই সমান,

আকাশটাই যা আলাদা। এখানকার বাতাসে ধুলোর প্রলেপ নেই ব'লে আকাশটা ঘন নীল আর সূর্যাস্তের রঙের খেলায় পলকে পলকে রং বদলায়। আকাশের এ সৌন্দর্য্য ইচ্ছে ক'রে দেখিনি, যাচ্ছা হ'য়েই দেখেছিলাম আমার ড্রাইভার সাহেবের নির্বাক গাড়ী চালানো আর মাঝে মাঝে আমার বেশী বড় নজরে দেখাটা ভালো লাগছিল না ব'লে। নিজের কথা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ভাবছিলাম ব'লে ওকে প্রথমটা লক্ষ্য করিনি। আবিষ্কারের কাছ বরাবর টাল সামলাতে না পেরে ও এমন জোরে ব্রিয়ারিং ঘোরালো যে ঠিকরে আমি প্রায় বেরিয়েই যাই আর কি। তারপর থেকে ওর দিকে আধ-চোখে পুরো মন দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে সামনে একটুখানি সোজা রাস্তা পেলেই ও আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। বেশ খানিকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে আর ওর ওপর মনটা রেখে যাওয়ার পর হাসি পেল। অথবা ওকে সন্দেহ করছি। দ্বিতলভাবটা যদি আমার অঙ্গে হয় তাহ'লে আমার সামনে ওকে সেটা ফেরত দেওয়া হত না। অতএব ওটা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। কিন্তু ওরই বা কিসের ভয়? সাহস ক'রে প্রশ্ন করলাম :

"এদিকে কি ভয়ের কিছু আছে?"

ও আমার দিকে না তাকিয়েই বলল :

"না। রামবাগ পুলের কাছে আছে।" আমি একটু অবাক হলাম। পুলটার অনেক আগে থেকেই অরবিন্দর দোকানের আরম্ভ হ'য়ে যায় আর ওটার ওপারেই শ্রীনগরের শুরু। তাহ'লে ভয়টা কিসের এবং কেন? ভাবনার বোঝা হাল্কা করতে গিয়ে রহস্যের বোঝা কিছু ভারিই হ'য়ে উঠল। কিন্তু ভেবে লাভ নেই অতএব গুন গুন ক'রে গান ধরলাম। এটা আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। মনের ভয় যত বাড়ে গানের সুর তত সাফ হয়। কথা অবশ্যই মনে থাকে না কিন্তু রামাতে কতক্ষণ?

পুল পেরিয়েই চেকপোষ্ট। সকালবেলা সাহেবজাদার সঙ্গে দেখা এবং দুপুরবেলা সেলামও পেয়েছি অতএব এখন আবার স-সেলাম ছাড়া পাওয়া গেল। গাড়ীটা থামাতে হ'য়েছিল তাই ঘড়িটা দেখে নিলাম। সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। ওয়াজিরবাগ যাওয়ার ব্যবস্থাটা বন্ধ করে বললাম, "গাগরিবল।"

ও বলল :

"কোথায়?"

বোধহয় ঠিক মত শুনতে পায়নি। তাই আবার বললাম :

"গাগরিবল।"

সেটা কোথায়?"

আরও এক প্রশ্ন অবাক হলাম। কাশ্মীরের ড্রাইভার গাগরিবল চেনে না? কথাটা অবিশ্বাস্য।

"ডাল লেকের ডান দিকে, শঙ্করাচার্য্যর তলায়।"

ডাল লেক পর্যন্ত ঠিক গেল, তারপর বলল, "এবার?"

বোঝা গেল সাদেক সাহেবের বাড়ীতে কখন যায়নি। পথটা আমারও খুব স্পষ্ট জানা ছিল না কারণ সরকারি কাজে সর্বদা সরকারি গাড়ী পেয়েছি। তবু আন্দাজ ক'রে বাড়ীর গেট পর্যন্ত পৌঁছোনো গেল অনায়াসে। গাড়ী থেকে নেমে আগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সময় মত পৌঁছেছি, সামান্য হ'লেও জিনিষগুলো যায়নি আর প্রাণটা ঠিকই আছে। নিরাপদে

পৌঁছোবার নিবিড় আনন্দে ওকে বলতে ভুলে গেলাম যে সামনের রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক, গাড়ীটা না ঘোরালেও চলবে। সেপাই গেটটা খুলেই রেখেছিল। আমি ভেতরে ঢুকলাম আর ও গাড়ী ঘোরালো।

সেট গেরোলেই গাছের ঝাড়। সেটা ঘুরে শ' খানেক গজ গেলে তবে দু' ধাপ সিঁড়ি আর দু' ধারে বাগান। আরও শ খানেক গজ গেলে তবে বাড়ীর বারান্দা। বলরাজ সেইখানে ছিল সাহেব-আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় মগ্ন হ'য়ে। মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়ে সাত কথা শুনিয়ে যেব আগেই ঠিক ক'রেছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ও বললে:

"যা ইচ্ছে তাই বল ক্ষতি নেই কিন্তু দোষটা ঠিক আমার নয় ভাগ্যের। গাড়ী গেল বিগড়ে আর ট্যাক্সি দিল বাগড়া। ভাবছিলাম কি করা যায়, রফিক সাহেব বাতলে দিলেন যে, অতিথিকে একদিনে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ আর যেই হক, শাহাজী নন। অতএব, আমরা ঠিক করছিলাম যে কাল সকালে তোমার শাহজীর অত্যাচার থেকে উদ্ধার ক'রে আনব! এখন বল, এলে কি ক'রে?"

ঐ মানুষটার ওপর মেজাজ করতে পারে এমন মানুষ ওর মেয়ে ছাড়া আর অন্য দেখিনি। হেসে বললাম।

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়! এসেছি এক নতুন জীপে, সঙ্গে ছিল সশস্ত্র ড্রাইভার!"

"নতুন জীপ?" রফিক সাহেব অবাক হ'য়ে তাকালেন।

"একদম। আনকোরা। নতুন টায়ারের গন্ধ নাকে এখনও লেগে আছে।"

"কার জীপ?"

"বিপদে ফেললেন।" হেসে বললাম, "নাম তো জানি না, তবে পেশা বলতে পারি। প্রজাপতি ধরার ব্যবসা আছে!"

"সে আবার কি? ও ব্যবসা কাশ্মীরে কেউ করে বোলে আমার জানা নেই!"

আমি এসে গেছি শুনে খাওয়ার ডাক পড়ল। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে রফিক সাহেব বললেন:

"হেঁয়ালি ছেড়ে হক্ কথাটা বলুন তো! নতুন জীপ তো আছে এক পুরোণ পাপীর কিন্তু তার ব্যবসা নদীর। মেয়ে নিয়ে মাতামাতিও করে কিন্তু সব কটাই চায়চিকে! কিন্তু তার গাড়ীতো এ বাড়ী পর্যন্ত আসবে না!"

হেসে বললাম:

"সর্বনাশ! একটা গাড়ী নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি হবে জানলে লোকটার বাড়ি নক্ষত্রের ইতিহাস নিয়ে আসতাম।"

রফিক সাহেব নাছোড়বান্দা, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন:

"পেলেন কোথায়? আর সে দিলই বা কেন?"

"তাহ'লে তো আপনাকে সারাদিনের সবিস্তারিত ইতিহাস বলতে হয়।"

উনি হেসে বললেন:

"প্রথম পর্বটা বাদ দিতে পারেন, ফকায়ার কাছে সেটা আমাদের শোনা হ'য়ে গেছে।"

ফকায়ার নাম শুনে নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হ'য়ে গেল। সারা বিকেলের ব্যাপ্তিতে ওর কথা একবারও

মনে হয়নি। আকাশে রঙের খেলা দেখতে দেখতেও না। নিজের প্রতি সন্দেহ হল ; ও কি তাহ'লে শুধু ম'জই মৈহিক আকর্ষণ ? —না কাশ্মীরের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য মন ভরেছে ব'লে দেহ তার দাবী জানালো ?

রসিক সাহেব তাড়া দিলেন—

"কৈ বললেন না ? এতো কি ভাবছেন ?"

হেসে বললাম,

"মনটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।"

পালিয়াকে হার মানানো কাশ্মীরি কাপেটের ওপর ব'সে সাম্রাজ্যের ইতিহাস সবিস্তারে সবেমাত্র বলতে আরম্ভ করেছি, ব'ব সাবল ওয়াচ আণ্ড ওয়ার্ডের সর্দার কর্তা সর্দার সাধু সিং। সে এসে সংবাদ দিল যে জীপ ড্রাইভার 'ওয়ান ওয়ে' নিয়ম মানে নি ব'লে তাকে আটক করা হয়েছে, এখন সাহেবের কি হুকুম ? প্রিয়াকে পাশে নিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও মানুষ বোধ হয় অতটা খুশী হয় না যতটা রসিক সাহেব হলেন। 'আসছি' বলে উনি এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুযোগের সুবিধে নিয়ে সাহানি সাহেব বললেন,

"তুমি কি যাদু জানো ?"

"সে আবার কি ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে !" বলরাজ বললে, "সারা সন্ধ্যা একটা সে ইশারাই দিয়েছে।"

"কি রকম ?" একটু আগে মনে যে সন্দেহ হয়েছিল, এক পলকে সব যেন মুছে গেল। মনটা সজীব হ'য়ে উঠল। দেহটাও সচকিত।

"ঘটনাটা মুখে বলেছে, অঘটনের ইঙ্গিত চোখের ভাষায়। এবার তোমার দিকটা বল।"

ওর কাছে না বলার মতন আমার কোন কথা নেই। ওর এক কিশোরী আত্মীয়াকে কঠোর মনে প্রত্যাখ্যান ক'রে ওকেই আগে ব'লেছিলাম। অতএব একটার কথা বলতে কোনই বাধা নেই কিন্তু আর হল না।

"আদাব !"

দরজায় দাঁড়িয়ে একটা। রূপ আর যৌবনের এমন অস্বাভাবিক সমন্বয়, শিল্পীর কল্পনাতেই শুধু থাকে, তাও সকলের নয়। সুন্দরী কথাটা সামান্য, অসামান্য সুন্দরী কথাটাও অসম্পূর্ণ। কাছাকাছি হল শ্রীসুন্দরী। আবার দেখার আনন্দ আর উপভোগ করা আকর্ষণে আদাব জানাতেও ভুলে গেলাম। লিপ্সিত সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতার পাশে বসে বলল, "এলেন কি ক'রে ?"

গুছিয়ে জবাব দেওয়ার আগেই জোর একটা কলরব শোনা গেল। ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে রসিক সাহেব বললেন, "ড্রাইভার প্রথমে বলেছিল আপনার জীপ, পরে বলেছিল আপনার তাড় করা জীপ।"

"দোষটাই ঠিক নয়। এখন কি বলছে ?"

"সাধু সিং যখন হুকুম নিতে এসেছিল তখন সে বেপরোয়া গাড়ী চালিয়ে উধাও হ'য়েছে। কালের যে মন্থরটা টুকে রেখেছিল সেটা বারামুলার পুলিশ সাহেবের গাড়ীর নম্বর মেলে।"

"তাহলে জীপটা নিশ্চয় ওঁর!"

"সেটাতো আমরা কেউ বলছি না, তাছাড়া পুলিশ তো আর প্রমাণপত্রের ব্যবস্থা করে না!"

"ওঁর কোন আত্মীয়ের কাছে যাব। আছে?"

রুকেয়া বললে, "খোঁজ নিলেই তা হয়।"

রফিক সাহেব সিগারেট ধরালেন, বললেন, "তাই ব'লে এলাম।"

কালিন ঘেরানো ঘরে কাশ্মীরি কায়দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হল এক থালায় চারজন ক'রে। মাঝখানে চিপি ক'রে ভাত রাখা থাকে আর যে যার দিক থেকে কুরে কুরে খায়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ থাকে না, তবে মেয়েরা আলাদা বসে। এ ব্যবস্থায় সাম্যবাদ যতই থাক, আমাদের সংস্কারে কোথায় যেন বাধে ব'সে পেট ভরলেও মন ভরে না। সকলে এইভাবে বসলেও, রুকেয়া আমার আর বলরাজের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা ক'রে দিল আর আমাদের পাশেই ও নিজের জায়গা ক'রে নিল। সাহিত্যের মোহ ওরও কিছু কম নয়। খানার কথার ফাঁকে বলরাজ বলল—

"যাদুকর, ও কে নিশ্চয় জানো?"

"জানি, কিন্তু জেনেও কোন লাভ নেই।"

"কেন?"

"কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য ওর মধ্যে কতখানি তা কি দেখোনি?"

"দেখিছি" বলরাজ বললে, "সেইজন্যেই তো ভাবনা। তুমি যদি যদু হারাণ তো রবি ঠাকুরের কবিতা শোনাবে আর ও যদি কাশ্মীরের পুরনিতা প্রকৃতির মাঝখানে ব'সে তোমার মুখ থেকে তা শোনে তাহ'লে ও যে দেশকাল হারিয়ে মোহাবিনী হ'য়ে উঠবে। তখন?"

রুকেয়া ইতিমধ্যে আমার এসে বসল বলে ও প্রসঙ্গ বন্ধ করতে হল। ও চালাক মেয়ে আর পুরুষ চরিত্র খুব বোঝে। হেসে বলল—"আমার সম্বন্ধে আলোচনা আমার শুনতে খুব ভালই লাগে!"

হেসে বললাম, "আলোচনা নয়, আমরা করছিলাম আপনার সমালোচনা!"

"বেশ তো। না হয় তাই—ই শোনা যাক।"

একদিনের আলাপে অনেকখানি ভালোই লেগেছে ওকে, খুঁত কিছু খুঁজে পাইনি। তবু, সমালোচনা যখন করতেই হবে তখন সামান্য জিনিষ নিয়ে করাই ভালো। তাই বললাম, "আপনি তো কাশ্মীরি, শাড়ী পরেন কেন?"

মেয়েরা যতই আধুনিক হক না কেন পোষাকের নিন্দে কিছুতেই সহ্য করে না। রুকেয়ার ধবধবে ফর্সা মুখে গোলাপীর একটা জোয়ার ব'য়ে গেল। খুব সতর্পণে নিজেকে সামলে নিয়ে ও আমায় পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনি তো দাড়ালি, ধুতি পরেন না কেন?"

বলরাজ হেসে ফেলল, "আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ!"

"ধুতি পরি না কারণ বোতামানোর অসুবিধে। আরও একটা কারণ হল পুরোপুরি অর্থনৈতিক। খারাপ ধুতির দামে ভালো প্যান্ট পাওয়া যায়। এ দুটো অসুবিধের একটাও কিন্তু আপনার পক্ষে খাটে না। বোতাম বোতামানোর অসুবিধা নেই আর যে শাড়ী প'রে আছেন তার দামে কম ক'রে চারটে জোব্বা পাওয়া যায়। এ ছাড়া যদি কিছু অসুবিধে থাকে, বলুন।"

ফকারা হেসে ফেলে বলল, "তার মানেটা। আসলে এটা আপনাদের অনুকরণ!"

বলরাজ বললে, "সৌন্দর্যও বাড়ে আর সুবিধাও হয়!"

ওর সেহনে দাগা আমার চিরাচরিত স্বভাব, সুযোগ পেয়ে খুশী হলাম, "শাড়ী পরিনি কাজেই সুবিধের কথা জানিনা, তবে সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে বাড়লেও, সাধনা অনেকখানি কমে—যেমন আমাদের মেয়েদের ভিন্ন পথ। দেখলেই মনে হয় মেয়ে নয়, ট্যাস্ ফিরিস্তির বাচ্চা!"

বলরাজ হেসে বললে, "শ্রীমতী ঠিকই ব'লেছিলেন। মনটা তোমার মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের প্রাপ্ত বয়স্ক বিধবার মতন।"

ফকারা প্রশ্ন করল, "কার কথা বললেন?"

"ওঁর প্রাক্তন স্ত্রী।"

শাড়ীর মতন, মেয়েদের আরও একটা সনাতনী দুর্বলতা হল হাঁড়ির খবর। সেখানে যদি স্যাতেলের সামান্য ইশারাটুকুও থাকে তো কথাই নেই। আরও কিছু জানবার আগ্রহে ফকারা বলল:

"অর্থাৎ?"

আমি হেসে বললাম, "অর্থাৎ আমার একটি স্ত্রী ছিলেন। ন'দশ বছর ঘর করার পর আমার সম্বন্ধে তিনটি প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কার ক'রেছিলেন। একটি যা বলরাজ বলেছে, আর দুটো আমার বলতে বাধা নেই। এক, লোকটা আমি অত্যন্ত খারাপ। দুই, স্বামী হিসেবে ওঁর জানাশোনা আরও দুচারজনের আমি সমকক্ষ নই। বলা বাহুল্য, ওঁর এই আবিষ্কার আমি আনন্দ সহকারে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছি!"

"এখন?" অত্যন্ত চালাক মেয়ে একটা ছোট্ট কথায় ও দুটো জীবনের ইতিহাস জানতে চায়। হেসে বললাম, "আমি ভূস্বর্গে এবং আশা করি উনি জীবনের তৃতীয় স্বর্গে!"

তবু পাছিলাম এর পরই হয়ত ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ উঠবে। নিজের জীবন যতই হেসে উড়িয়ে দিই না কেন, ওদের জীবন নিয়ে অনেকখানি দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। কিন্তু সেটা আর উঠল না। বারামুলা থেকে খবর এলো যে পুলিশ সাহেবকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে সারাদিনের ইতিবৃত্ত জানিয়ে যখন উঠলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলেন রফিক সাহেব আর ফকারা। ফকারা বলল, "কথায় কথায় আসল কথাটাই জানা হল না। আপনার কাজ কতদূর এগুলো?"

"অনেকখানি। জীবনের ইতিহাস সবটাই জানা হয়ে গেছে।"

"কে বলল?"

"ওঁর জানা শোনা ষাট পঁয়ষট্টিজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আর সারা কাশ্মীর ঘুরে এসেছি।"

"সত্যি?" আনন্দে যেন উথলে পড়ল ফকারা, "শুনতে হবে তো। কাল কি করছেন? চ'লে আসুন না চা খেতে!"

চায়ের একটা নেমন্তন্ন বলরাজই আমাদের দুজনের হ'য়ে গ্রহণ করেছে ওর এক সহপাঠীর বাড়ী।

অথচ ওইই বললে, "ঠিক কথা। তুমি তো ফ্রি আছো. চ'লে এসো।"

"আচ্ছা। কিন্তু কোথায়? এখানে?"

কথায় এক চোখ রফিক সাহেবকে দেখে নিয়ে বলল, "আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। খরচ চারটে, কেমন?"

কিছুটা আনন্দে কিছুটা আশঙ্কায় আমি বললাম, "আচ্ছা!"

যত রাতেই বাড়ী ফিরি না কেন আর কাজ থাক বা না থাক, টেবিলে বসা আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। আজ কাজ অনেক ছিল, তবু টেবিলে বসা হল না। বলরাজ হাসতে হাসতে বললে, "বুঝলাম, বুড়ো বয়সে আবার পথে বসলে।"

। নয় ।

দোসরা রাত

"এইভাবে দুনিয়াটাকে সৃষ্টি ক'রে আর ইন্সেয়ত ইনসানকে আবাদ করার পর আরম্ভ হল জানোয়ার আর চিড়িয়ার ভাগ বাঁটোয়ারা। মেহেরবান খুদাতালা নিজে আর বাঁটোয়ারা করলেন না, ইনসানকে ডেকে বলে দিলেন, যার যা মর্জি নিয়ে যাও।

"আফ্রিদিরা সবার আগে নিল হাতী সিংহ, হরিণ, যা ছিল ভারো সুন্দর সব। সাহেবরা সৌখীন মানুষ, তারা নিল কুত্তা আর বিল্লি। আরবীরা মস্ত আদমি তারা নিল ঘোড়া। হিন্দুস্তান ধর্মের পুজারী, তারা নিল গরু আর মেয়েদের কথা ইয়াদ ক'রে নিল ময়ূর।

"সবার শেষে খুদাতালার কাছে গেল কাশ্মীরি। জানোয়ার তখন আর কিছুই বাকি নেই, আছে চিড়িয়া। সে তাই নিয়েই খুশী মনে চলে আসছিল হঠাৎ শুনল, পেছন থেকে কে যেন করুণ কণ্ঠে তাকে ডাকছে। ফিরে দেখে একটা ভেড়া। সে বেচারা নিতান্ত বোবেচারি বিরীহ ব'লে কেউ তাকে নেয়নি। কাশ্মীরি তাকে তুলে নিল কোলে। আল্লাহতালা খুশী হয়ে বললেন, তোদের দিল সবার সেরা। তিনি দুয়া দিয়ে দিলেন। বললেন, যাকে তোরা গিয়ে পাহাড়ের ওপর যেখানে শীতল বাতাস আছে, ফলফল প্রকৃতি আছে, ঝর্ণার জল আছে আর আমার ছায়া। ব্যস্ সেই যে আমরা চলে এলাম এইখানে, আর কোথাও আমরা যাইনি।"

গল্পটা পুরো শুনে তবে ফকীর মহম্মদকে ছাড়ল তার বড় ছেলে, সাত বছরের ছোট্ট খিদু। এর মধ্যে বিবিজানের বারতিন চার তাগাদা দিয়েছে ঐ ঘরের কোণ থেকে, মহম্মদের যাওয়ার জন্যে কিন্তু খিদু ছাড়েনি। এ গল্প সে আব্বার কাছে বহুবার শোনে সারা শীতকাল ধ'রে কিন্তু মন তার কখনই ভরে না। শুধু খিদু নয় গুজ্জরদের সব ছেলেমেয়েই এই গল্প শুনে আসছে যুগ যুগ ধ'রে। সেই জন্যেই বুঝি তারা তাদের পাহাড়ি এলাকা আর ভেড়ার দল ছেড়ে কখন কোথায় যায় না।

এটা শক্ত সমর্থ পুরুষের বাড়ীতে থাকার সময়ও নয়, ফকীরও ছিল না, আগের দিন রাতে এসেছে। বিবিজানের সন্তান হওয়ার কথা ছিল তাই। মেয়েরা ঠাট্টা করেছে চোখ উল্টে 'এ আবার কোন নয়ী মরদ রে আল্লাহ!' করবারই কথা। বসন্তের প্রথম ইশারা পেলেই ওরা যে ভেড়ার দল নিয়ে মরদানে যায়, আর মাসেক শীতের আগে পর্যন্ত, তা সে ছেলেই হক আর বাপই হক। এসে যদি দেখে ছেলে হয়েছে তো ভেড়া কাটে, মদ খায়, নাচ গান করে। যদি শোনে বৌ মরেছে

তো আমার নিকে করে। এইই ওদের জীবনের ধারা সেই আদিমকাল থেকে চ'লে এসেছে। ব্যতিক্রম ঘটালো ফকীর। ময়দানে যাওয়ার আগে বিবিজান আল্লাহতালার নামে কসম্ খাইয়ে নিয়েছিল অন্ততঃ একবেলার জন্যেও যেন সে আসে। ফকীর হেসেছিল, বলেছিল, 'কেন রে দিয়ানা এ আবার কেন?' বিবিজান বলেছিল, 'ঐ যে বললি, দিয়ানা! তোকে না দেখলে আমি যে দিয়ানা হয়ে যাই আর এমন শয়তান পেটে দিয়েছিস্ যে সারাদিনরাত লাখি মেরে মেরে আমার ছেলে কথা মনে করিয়ে দেয়। আসবি তো?'

ফকীর তাই এসেছিল, খুশীও হ'য়েছে। খুদাতালার দুয়া না হ'লে এমন ভাগ্য কজনের হয়? একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে ছেলে। আর ছেলে কি! একেবারে বাপ কা বেটা। গ্রাম থেকে ময়দানে উঠতে লাগবে কম ক'রে ঘণ্টা চারেক তো বটেই, তাই বিবিজান সেই দুপুর থেকে তাগাদা দিচ্ছে অনবরত, এবার যা নইলে আসেরা হ'য়ে যাবে। ওর আর যাওয়ার মন নেই, এটা ওটা ব'লে কেবলই দেরি করছে। আসলে ইচ্ছে ছিল আরও একটা দিন থেকে যায়। 'বিবিজান বাবা হয়ে তার দেখিয়েছে তুই না গেলে আমিই কিন্তু উঠে যাবো। ও আদর ক'রে বলেছিল, যাবি? কখন তো যাস্‌নি, চ না একবার দেখবি, আল্লাহতালার কি মেহেরবানি আমাদের ওপর! এবার যা ঘাস হ'য়েছে, আল্লার কালে দেখিনি, যেন বয়কের চাই দেখবি, যা ফুস হবে, চার মানুষ বড়লোক হ'য়ে যাব!' বিবিজান বললে, চাই না আমার চার মানুষ, হক আর একটা ছেলে, খাস্ পীর বাবা পাঁচদিনের জিয়ারতে চার ভেড়া চাড়াওয়া দেব'—আল্লাহর কসম্!' খুশী হ'য়ে ফকীর বললে, 'তুই চার দিবি, আমি পাঁচ দেব, একটা এই কাশ্মীরের রক্ষতির খাতির! ঐ তুষ ময়দানের খাতির। এই মেহেরবানির খাতির।'

যাওয়ার সময় ওর হাতে বিবিজান এক বস্তা বাখরখনি দিল, আর দু'বোতল শরাব, বললে 'যাওয়ার পথে যাকে যাকে পাবি দিয়ে যাস্!' ফকীর বললে, 'ইয়া আল্লা ওটা আবার এখন কেন? ফিরলে তো হবেই!' হুঁ, বিবিজান বললে, 'পীর বাবা পাঁচদিনের এতো মেহেরবানি, আমার আর তর সইছে না!'

এই অজুহাতে ফকীর ময়দানের পৌঁছোতে রাত হল। তবু দিনেই তো হল না গাঁয়ের খবর আছে কে গেল কে এল, তার হিসেব আছে আর আছে পাকিস্তান থেকে যারে কাছে কোন হামলা হয়েছে কিনা তার হিসেব নেওয়া। ও পালারা একদম হারামজাদা, মাঝে মিশিমে দু পাঁচজন চুপি সাড়ে যখন ছিটকে আসে তখন তেড়া ছিনিয়ে নেয় আর কিছু বললে গুলি মারে। সরকারকে এরা সবাই মিলে বহুবার জানিয়েছে কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বাকসি তো এদের খেদিয়েই দিয়েছিল গালিগালাজ ক'রে। সাহেব শুধু সেপাই পাঠিয়ে ব্যবস্থা ক'রেছে। রিসুয়ানের পল্টন, অতএব ভয় নেই একদম। হামলা শুধু আধি ছিল, মাস খানেক চুপ চাপ। ওরা আপোষে এ নিয়ে আলাপ করে কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা। একে ওরা ফকীর তার পালা হারামির জাত একমাস চুপ আছে, ব্যাপারটা কি? চুরি চামারি না করলে তো ওদের চলেই না একদম! তা'হলে? কেউ বলে ভয় পেয়েছে সেপাই দেখে, কেউ বলে সাহেবরা হয়েছে সাহেবের হাতে, ফকীর কিন্তু জানতে রাজি নয়, বলে, শয়তান কা বাচ্চা, মরে কিন্তু মচকায় না!

পথে বন্ধুদের সঙ্গে খুস্ খবরি আর বাখরখনির সঙ্গে মদও ভাগ ক'তে নিতে হয়েছে তাই তুষ ময়দানে উঠে এসে যখন দেখল যে চারিদিকে টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে তখন ও ভেবেছিল বুঝি

ওগুলো সব সিতারা। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, আসমান প্রতিদিনের মতন জল জল করছে। তা'হলে? মনের নেশায় ওর বোধহয় বিভ্রম ঘটেছে। বর্শার ঠাণ্ডা জলে মুখ আর মাথাটা ভালো ক'রে ধুয়ে দৃষ্টিটা স্থির দাঁড় করিয়ে দিল সামনের দিকে। সত্যিই আলো, অনেকগুলো. তাঁবুও আছে মাঠে আর পাহাড়ের সারা গায়ে যেন লক্ষ জোনাকি ব'সে আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। দুদিনেই এতো পরিবর্তন? হকচকিয়ে ভাবতে থাকে তুষ মরদানে হল কি? ভেড়াগুলোই বা গেল কোথায়? সভয়ে আর সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, ভালো ক'রে দেখবার জন্যে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল শুধু আলো নয়, মাঠ ভর্তি মানুষ ঘুরছে একবার শ্রীনগরে জোয়াইন্ দেখেছিল ঠিক সেই রকম।

আরো কাছে গেল কবীর। এখন আর ভয় নেই, তখনকার কৌতূহল। এতো মানুষ কোত্থেকে এলো আর কেনই বা এলো। তার চেয়ে বড় কথা, কবে বিদেয় হবে? গুজরেরা গণ্ডীভুক্ত মানুষ, বিদেশীদের সওয়োল একদম পছন্দ করে না, আর যদি তেড়া চরানোর ব্যাঘাত ঘটায় তাহ'লে তো কথাই নেই! আরো একটু এগিয়ে দেখল অবাক কাণ্ড! রাইফেল আছে মেশিনগান্ আছে, ট্রেন আর ট্রাক গাদের ছড়াছড়ি কিন্তু আশ্চর্য্য, সেপাই নয় একটাও। সবাই সাধারণ পোষাকে ঘুরছে। বন্দুক আর বাবরা দেখে ভেবেছিল বুঝি হিন্দুস্তানী সেপাই ওরা, কুচকাওয়াজে এসেছে। কিন্তু তা যদি হত তবে ইউনা দিয়ে আসত যেমন মাঝে মাঝে আসে। তাছাড়া, বাদ লস্করী আর জীপ গাড়ী তো মাঠের নিচেই থাকে। আসবার সময় সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে এসেছে, ওসব একটাও দেখেনি। গাছের আড়ালে থেকে দেখে আর ভাবতে থাকে। কে ওরা? কি চায়? কোন এক কালে শুনেছিল, নয়দানে নাকি সেপাইদের ঘুটি হবে! ওরা বিদ্রোহের কড় তুলেছিল আর নিচের সবলক্ষ অমলে ওদের পীর বাবা পামদিনের জিয়ারতে গিয়ে কসম নিয়েছিল যে যতদিন একটিও গুজর জীবিত থাকবে ততদিন ওরা লড়াই চালিয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে সেই ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল সাহেক সাহেবের কথায়। আজ কবীরের সন্দেহ হল, হয়ত সাহেক সাহেব ওদের ধোঁকা দিয়েছে! ভাবছে গিয়ে গাঁ মোড়লকে ডেকে আনবে কিনা, পেছন থেকে একটা ইয়া বড়োপানা লোক ওর কাঁধে হাত রাখল।

"আসলাম ওয়ালেকম!" কবির চমকে উঠল। এমন ঘুইয়েছিল ও নিজের ভাবনায় যে খেয়ালই করেনি। কথা হারিয়ে ও তাকিয়ে রইল। লোকটা হেসে ওর হাত ধরল।

"ডর পেওনা, আমি জিন্ নই, জয়হুল।" এইবার কবীরের ভয় ঘুচল।

"ওয়ালেকম্ সেলাম হজরত।"

"আমার সঙ্গে এসো!"

"তোমরা কে?"

লোকটা আবার হাসল, বললে, "ইয়া বাবা পামদিন! ডর নেই, আমরা তোমাদের দোস্ত। এসো না।"

কবীর তখনও ভাবছে যাবে কি যাবে না, পেছন থেকে আর একটা লোক এসে পিঠ চাপড়ালো। মুখে তার হাসি কাঁধে তার রাইফেল। এবার সে হেসে বললে, "আও দোস্ত!" দুজনে ওর দুপাশে এমন ভাবে দাঁড়াল যে নড়বার জায়গা নেই; অতএব না গিয়ে উপায়ও নেই। যেতে যেতে আর কোন কথা হল না। বসতির বহর দেখে ও হতবাক হ'য়ে গেল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর পায়নি এখন বোঝা গেল যে হাজার হাজার লোকের বসতি বসেছে। ওর আন্দাজে মনে হল হাজার দুয়েক তো হবেই।

পরে জানা গিয়েছিল ওরা ছিল তিন থেকে চার হাজার।

মাঠের শেষ প্রান্তে ঐ একমাত্র গাছটার ঠিক পাশে যে ছোট্ট তাঁবুটা ছিল তারই বাইরে দাঁড় করিয়ে জয়গুল ঢুকে গেল ভেতরে আর বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। পেছনে তার আর একজন লোক, দেখে মনে হল যোদ্ধার বলের সর্দার। তিনি ওকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন ইয়া প্রকাণ্ড ছাতির ওপর। ভাবটা যেন বহুকালের হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজে পেয়েছেন নিতান্ত অতর্কিতে। ঐ ভাবে ওকে নিয়ে গেলেন তাঁবুর ভেতরে আর সামনে খুলে দিলেন বিলেতি সরাবের বোতল। পিঠ চাপড়ে সর্দার বললেন। "চলুক। আমরা তো সব ভাই বেরাদরি!"

দেশী মদের নেশা ওর অনেক আগেই ছুটে গেছে কিন্তু বোতল ও ছুঁলো না। বললে, "আমরা হলাম শুদ্ধর মানুষ ও আমাদের সইবা!"

"তাতে কি হয়েছে", সর্দার বললে, "ভাই বেরাদরিতে সবই চলে।" ফকীর তবু খেলোনা। সর্দার নিজেই বোতলের আধেকটা এক চোকে শেষ ক'রে ফেললেন।

"ভাবছ নিশ্চয় আমরা কে? আমরা হলাম আজাদ ফৌজ! হিন্দুস্থানে এখানে ঘাঁটি করবে বলেছিল না? আমরা এসেছি সেটা বন্ধ করতে পাঁয় পাঁয়ত্রিশের কলম্।"

ফকীর শুধু বললে, "ওঃ!"

"তোমায় আমাদের সাহায্য করতে হবে!"

আবার ছোট্ট উত্তর দিল, "কি?"

এক বাণ্ডিল টাকা ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন সর্দার সব দশ টাকার আনকোরা নতুন নোট, তাবতীয়। বললেন, "টাকার জন্য ভাবনা নেই। আরও লাগলে তাই পাবে।" ফকীর টাকার বাণ্ডিলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে রাখল সর্দারের ওপর। বললে, "কি চাই?"

"মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য খচ্চর এক একটা একশো টাকা রোজ আর প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা ক'রে চালক। তারও তাড়া আলাদা রোজ দুশো টাকা।"

"আর?"

"আর চাই গাইড। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"ক'জন চাই?"

"দুড়ি জন। আধেক আমাদের নিয়ে যাবে গুলমার্গ আর বাকি আধেক নিয়ে যাবে বড়গাম।" থেমে সর্দার বলল, "দিনের বেলায় বড্ড গরম আজকাল তাই আমরা রাতের বেলায় চলব। গাইড মজুরি পাবে দিনে পাঁচশো। ভালো হ'লে হাজারও দিতে পারি!" এইবার ফকীর হাসল, যেন সব ব্যাপারটা তার কাছে এইবার পরিষ্কার হয়েছে। বললে, "আর এমন যদি গাইড হয় যে এক রাতেই গুলমার্গ পৌঁছে দেবে?"

"তাহ'লে সে পাবে দেড় হাজার। আছে তেমন লোক?"

"আছে। কিন্তু গুলমার্গে।"

"আনতে পারো?"

"সময় লাগবে।" একটু ভেবে আবার বললে "যেতে আমায় হবেই ওখানে। খচ্চর তো আর এখানে মিলবে না।"

সর্দার অধৈর্য্য আনন্দে উঠে পড়লেন তাঁর ক্যাম্প খাট থেকে, ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, "আজই যেতে পারো ?"

হেসে ফকীর বললে, "এক্ষুনি !" মুচকি হেসে আবার বললে, "তবে সাহেব একটা কথা। আমি রাতে হাঁটি, আমার রেট আলাদা।"

"কি চাই ?"

"রোজ এক বোতল মদ !"

"এক কেন দু বোতল পাবে !"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফকীর আধখালি বোতলটা তুলে পুরো খালি ক'রে দিল। বলল, "যাই তাহ'লে ?" সর্দার বললেন : "শুভস্য শীঘ্রম্। কখন আসবে ?"

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে ফকীর বললে : "কাল বিকেলে। খচ্চর আসবে রাত লাগলে আর, রাত শেষ হওয়ার আগেই শুলমার্গ পৌঁছে যাবে !"

"বরমুদা ! তা যদি হয় তাহ'লে দুনিয়ার সব দৌলত তোমার পায় ঢেলে দেব, আলবৎ !"

খিক্ ক'রে হেসে ফকীর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। কি সব ভাবল, বিড় বিড় ক'রে বলল ও অনেক কিছু আপন মনে।

"কি হল ?"

"শুলমার্গ সোজা যাওয়া ঠিক হবে না সাহেব। তার চেয়ে ভালো হবে তিন মাইল উত্তরে বাবা মাখবি গাঁয়ে। সেখান থেকে শুলমার্গ দূর নয় !"

সর্দার স-উৎসাহে বললেন,

"সাবাস্ এই তো চাই। এমন না হ'লে দোস্ত কিসের ?"

ফকীর মহম্মদ আর দাঁড়ালো না, দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নোটের বাণ্ডিলটা নিতে ভুললোনা। একটাই নিল অন্যটা ছুঁলোই না।

সর্দার হাঁক দিয়ে বললেন, "আরে এটা নিলে না ?"

ফকীর একটু হেসে জবাব দিল, "সোস্তাকি মাফ। আমরা গুজর হজরৎ, মিহনতের দাম জানি, হারামি করিনা। আগে কাম, পরে দাম !" যেতে গিয়ে আবার থেমে গেল ফকীর, বললে,

"মাঠে আমার ভেড়া ছিল, তার একটাও দেখলাম না।"

সর্দার হেসে বললেন,

"সে আমরা সব হালাল ক'রেছি। দাম পাবে। কত চাই ?"

রাগে ফকীর মহম্মদের মাথা ঘুরে গেল। তার ইচ্ছে হল সর্দারকেই হালাল্ ক'রে ফেলে কিন্তু উপায় নেই। দেশের বিপদ আর একটা যদি ভুল চাল হয় তো জীবনই ওর চলে যাবে। হেসে বললে,

"তাহ'লে এই বাণ্ডিলটাই নিলাম আমি। আর যদি দরকার হয় বলবেন, পীর বাবা গাজীদিনের কৃপায় আমাদের কাছে ভেড়ার অভাব নেই !" সর্দার কি জবাব দিলেন ও শুনলই না। হালালের অন্তে পরের কাছে ভেড়া বিক্রি করা অবশ্যই গুনাহ। ও কথা শোনাও পাপ ! ফকীর দৌড় দিল। যেতে যেতে শুনল পাকিস্তান রেডিও থেকে কি সব হচ্ছে।

শুধু হাঁটলে চলবে না, ফকীর মন্ত্রতন্ত্র ছুটতে আরম্ভ করল। আলপাথর ছুঁয়ে পেরিয়ে অনর্গত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলো পীর বাবা পামদিনের দুয়া চাইতে চাইতে। এসব জায়গায় প্রতিটি পাথর ওর চেনা, হাঁক না ছড়ই অন্ধকার আন্দাজেই ও পথ চিনে নেয়। ভয় খালি ঐ ভল্লুকদের। এ অঞ্চলে এমনই ওদের উপদ্রব যে রাত থেকাতে পথ চলবে এমন বীরপুরুষ দুনিয়ায় নেই।

আজ কিন্তু ওর না আছে ভয় আর না আছে ভাবনা। পীর বাবা পামদিনের নাম নিয়েছে, বাবা মাতৃষির কাছে মানতও করেছে। ওরাই ওর সবথানি ভরসা। যেতে যেতে ভাবতে থাকে, ওরা চাইলে কি না হয়? পর পর তিনটে ছেলে হবে এ কথা কি ও ভেবেছিল? ওদের দুয়া হয়েছে তাই হয়েছে। ওদের কাছে মানত করে মনের মতন সন্তান পেল আর এইটুকু পাবে না? ভয় যে ওর হয়নি তা নয় কিন্তু ভল্লুকের ভয়ে কাবু হয়ে এমন মুহূর্তটাকে বিপন্ন করলে নিমকহারামি হবে। শুভ্ররা সব পারে, পারে না শুধু ঐটে। বস্তুতি চল ওদের ঝিয়ারত। জান দেবে তবু ঝিয়ারত দেবে না।

এমনই পীর বাবার দুয়া আর বাবা মাতৃষির মেহেরবানি যে পথে বিপদ তো দূরের কথা, একটা ভল্লুকের দেখা পর্যন্ত মিলল না। শুধু কি তাই? অঘোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে, ছোট বড় পাথরও পড়িয়েছে কিন্তু পা'টা ওর একবারও পেছলায়নি। এইভাবে সারারাত পথ হেঁটে ও শুভমার্গ পৌঁছলো ভোর আজানের আগে ভাগে।

[ক্রমশঃ]

* * * *

বাঙলায় তখন নবজাগরণের যুগ। বাংলার এক প্রধান কবি গোপনে তার নিজের একটি নাটক অনুবাদের। একজন তাঁর সামনে পড়ে গেল আর তিনি অবিরাম গতিতে তার ইংরেজী অনুবাদ করে চললেন। এক রাত্রির মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। হয়তো এ ইতিহাসের মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে; তবু বিনা পারিশ্রমিকে দেশ-প্রেমিক কবির সাধনাই এতে বড় হয়ে উঠেছে।

পুস্তক প্রকাশিত হোল। দেশব্যাপী দারুণ উত্তেজনা। প্রকাশক অভিযুক্ত হলেন রাজদ্বারে। তাঁর জরিমানা হোলো এক হাজার টাকা, সেই সঙ্গে এক মাস কারাবাস।

রাজাদীর আর এক বয়েণ্য সন্তান আদালতে জরিমানার টাকা গুণলেন।

কালীপ্রসন্ন টাকা দিয়েছিলেন যেমকে ভালবেসে আর যিনি অনুবাদ করেছিলেন সেই কবি শ্রীমধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

বিশ্বসাহিত্যে এমন গ্রন্থ খুব কম আছে যা 'নীল দর্পণে'র মত ইতিহাস রচনা করেছে।

বিদায় সম্ভাষণ

সুবোধ বসু

মসৃণ ও শীতল বিছানাই বলতে হবে! গদির আরাম না থাকলেও সারাদিনের শক্ত কাজের পর কম আরামপ্রদ নয়, প্রফুল্ল এক ঘুমের পর জেগে উঠে সকৌতুকে ভাবতে লাগল। প্রত্যুষ থেকে বাজি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়েছিল। থেমেছে ওদিকের জবাব থামবার পর। মানে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে যারা ওদিক থেকে প্রথম অগ্নিলীলা শুরু করেছিল। ঠাণ্ডা হয়েছে প্রান্তরটা। আশা করা যায় বাকি রাতটা নীরবতাই চলবে। তারপর দেখা যাক, কাল সকালে আবার কি হয়। ইতিমধ্যে কামানের উপর শুয়ে যতটা বিশ্রাম করে নেওয়া যায়।

অনতিদূরে চকচক করছে ইছোমতি খাল। তার ওপারেই শত্রুসৈন্য। সুবিধা বুঝলেই তারা তোপ ছোঁড়া শুরু করবে। তাই অর্ডার হয়েছে কামানের ঘাঁটি ছেড়ে কেউ দূরে যেতে পারবে না। ফিল্ডগানের চার দিকে বালির বস্তার প্রাচীর। মাথার ওপর ক্যামোফ্লাজ নেটের চাঁদোয়া, তাতে কিছু ডালপালা গোঁজা। এই টুটা-ফুটা আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে ফিল্ডগানের নানা অংশে। যেন অপ্সরা এসে কক্ষের তপোভঙ্গের চেষ্টা করছে। মনেই হয় না যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি এমনি পরিপূর্ণ শান্তি চারদিকে।

কেন যে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে না। এ ছুতোর ও ছুতোর ঝগড়া লাগায়, প্রফুল্ল মনে মনে ভাবে। যুদ্ধ তার পেশা; যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে পারলে সে খুশি হয়, নিজের শিক্ষার সম্মান রাখতে পেরেছে মনে করে গর্বিত বোধ করে। কিন্তু এর পেছনে যদি দেশরক্ষার তাগিদ না থাকত তবে শত্রু-হননেও সে উৎসাহিত বোধ করত না। ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো সৈন্যদলের অফিসার হয়েও সে যুদ্ধবিরোধী। রুটে যাবার হুকুম আসবার পর যুদ্ধ পড়বার ভয় নয়, মরবার ভয় নয়, মনের এই বিধাটা একটা অপরাধের মত তার মন জুড়ে বসেছিল। আমি কি আমার কর্তব্য বিবেকের সঙ্গে পালন করতে পারব? আমি কি যথেষ্ট কঠিন হ'তে পারব? রেজিমেন্টের নাম খারাপ করব না তো?

তার উপরওয়ালা অফিসার মেজর অবিনাশ সিংএর সঙ্গে তার হৃদ্যতা যথেষ্ট। নানা বিষয়ে তারা আলোচনা করে। কোনও অসুবিধে বা সমস্যার উদ্ভব হলে দু'জনে মিলে তার সমাধান করে। মেজর সিং আর ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জির সখ্য রেজিমেন্টের সবারই জানা। রুটে রওনা হবার আগের রাত্তিরে প্রফুল্ল গিয়ে তাঁকে নিজের মনের এই দ্বিধাভাবের কথা সসঙ্কোচে জানালে।

'প্রথমবার ওরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে। এ রকম হবেই। সবারই হয়। এটা এক রকম বার্থাসনেস্।' মেজর সিং তাঁর কিট্‌ব্যাগ গুছাতে গুছাতে বললেন। 'একবার আগুনের ব্যাপ্টিসমালের মধ্যে দিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'যুদ্ধের ভয় বা মরবার ভয় আমার নেই।' প্রহ্লদ জবাব দেয়। 'আমি ভাবছি, আমাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলে আমি তা যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে বা ruthlessness-এর সঙ্গে পালন করতে পারব কিনা। আমার মনের মেরু-আপটা বোধার সঙ্গে অন্য রকম, এমন কি হাস্যকর রকম প্যাসিফিস্ট। নীতির দিক থেকে দুটো আমার অপছন্দ···'

'সেটা তো সারা ভারতেরই মনোভাব। আমার দেশ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়?' একবার চোখ খুলে মেজর বললেন। 'কিন্তু শান্তি চাইলেই তো তা পাওয়া যায় না। অন্যেরা যদি শান্তি না চায়, তবে শান্তিভঙ্গ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই ধর, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র মা বাবা চায়ের টেবিলে বসেছে। মন প্রফুল্ল, দুনিয়ার কারও ওপর, কিছুর ওপর বিদ্বেষ নেই; নিজেকে নিয়ে নিজে খুশি আছ। এমন সময় বাড়ীতে গুণ্ডা চড়াও করল, ছোরা হাতে এসে দাঁড়াল। কি করবে তুমি? শান্তির জন্যই তাকে উল্টো আক্রমণ করতে হবে, রক্তপাত করতে হবে। তখন কি বলা চলে, মারামারি কাটাকাটি আমার পছন্দ নয়? এও অবিকল তাই। তোমার একার বাড়ী নয়, দেশের সমস্ত বাড়ী, সমস্ত আদর্শ, সমস্ত ভদ্রজীবন রক্ষার জন্য তোমাকে আততায়ীর মোকাবিলা করতে হবে। হামলা কি আমরা চেয়েছি। হামলা তো আমাদের ওপর নিজে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিজের বাড়ী বাঁচাতে হবে তো, তা সে কাজ যতই কঠিন, যতই অপ্রিয় হোক।'

এসব কথা প্রহ্লদ জানে। তবু সেদিন মেজর সিংয়ের এই কথাগুলি তার জড়তা দূর করতে সহায়তা করেছিল। আমরা যুদ্ধ চাইনি। আমাদের দিগ্বিজয়ের যুদ্ধ নয়। শত্রু আমাদের বাড়ী চড়াও করেছে। বন্দুকটিতে তার হাত তাগতে হবে, নইলে সেই আমাকে শেষ করবে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মিলিটারি ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসে যেতে যেতে দারুণ উত্তেজনা এবং দৃঢ় সংকল্পে ক্যাপ্টেন প্রহ্লদ চ্যাটার্জির মন পূর্ণ হয়েছিল। আকাঙ্ক্ষা সুফলা সুফলা এই পাঞ্জাব। বাংলাদেশের মতই নদীমাতৃক, বাংলাদেশের মতই স্নিগ্ধ সবুজ। এই আমার দেশ। মহান দেশ। গায়ের জোরের চেয়ে চিরকাল এখানে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন হয়েছে। এর সুবিধে নিয়েছে বহু বর্বর ইতিহাসের যুগ থেকে। গায়ের জোর দিয়ে গায়ের জোর চূর্ণ করতে হবে যাতে যা সত্য, যা সুন্দর, যা চিরন্তন তার বিকাশ হতে পারে।

সারা রাত চলবার পর যখন সকাল হলো তখন তাদের ট্রাকের কনভয় অমৃতসরের উপকণ্ঠে পৌঁচেছে। জোয়ানদের আপ্যায়নের জন্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একাধিক চা ও প্রাতরাশ সরবরাহের কেন্দ্র খুলেছে পাঞ্জাবের জনসাধারণ। দেশরক্ষী বাহিনীর প্রতি প্রীতি, সমর্থন ও উৎসাহ জানাতে চায়। এদের সাদর আমন্ত্রণ সযত্নে এড়িয়ে সৈন্যদল শহরের দিকে এগিয়ে গেল। অমৃতসর স্টেশনের কাছাকাছি থামার নির্দেশ আছে। এখানে তাদের প্রাতরাশ দেওয়া হবে; কিছু অতিরিক্ত অপেক্ষা করছে। বর্তমান গন্তব্যস্থল সেটাই।

প্রহ্লদের ট্রাক সর্বশেষে এসে দাঁড়াল বিশ্রামস্থলে ছুই ভজন সৈন্যবাহী গাড়ীর পেছনে। ইতিমধ্যেই ভিড় লেগে গেছে গাড়ীর চারদিকে। প্রশংসমান জনতা গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে বাহিনীর একে ওকে

যাকে কাছে পাচ্ছে তাকেই। ভালো ভালো চায়ের পটে চা এনে সুন্দর সুন্দর কাপে ঢেলে দিচ্ছে। ট্রে-তে ভরে মঠ্‌ঠী, বরফী, লাড্ডু হাজির করেছে। মোহানরা যেন তাদেরই অতিথি। তারাই অতিথি-সৎকার করবে। এদের খাতির দেখিয়ে তাদের আত্মীয়তা জানাতে চায়।

অতি কষ্টে প্রহ্লন এদের অতিআপ্যায়নের এবং উৎসাহের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে। একেবারে হতাশ করা যায় নি, কিছু উপহার নিতেই হয়েছে। আমি এখন সিপল্‌স আমি, জনতার আপন জন। তাদেরই মেয়েছে প্রহ্লনের কাছে এই আত্মীয়সুলভ মনোভাব। পাঞ্জাবের প্রাণগুলি বহু জোয়ান ছুপিয়েছে ভারতবর্ষকে। সৈন্যকে এরা আপন মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে কাজে তারা যাচ্ছে, সারা দেশবাসীরই কাজ সেটা।

'বেটা, ইয়ে ফল খা লে। বহুত মিঠা সেও…'

প্রাতরাশ এবং আদর গ্রহণ সমাপ্ত করে প্রহ্লন সবেমাত্র ট্রাকে চালকের পাশে তার নিজের আসনে উঠে বসেছে। রওনা হতে আরও বিশ-পঁচিশ মিনিট দেরি। একটু যেন তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল চোখে। খুব কাছাকাছি উপরোক্ত অনুরোধ শুনে সে চমকে পাশে তাকাল।

এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধা লোলচর্মে মস্ত বড় একটা রঙিন আপেল প্রহ্লনের দিকে তুলে ধরেছেন। সঙ্গে বছর কুড়ি বাইশের সালোয়ার-কামিজ পরা একটি মেয়ে বোধহয় বৃদ্ধার নাতনী হবে। বাঁ হাতটা ঠাকুমার পিঠে ঠেকনা হিসেবে রাখা—পাছে পড়ে যান। মাথায় সোনালী চুল, নীল চোখ, গ্রাম আপেলের মতই মুখের বর্ণ। ডান হাতে আশ্চর্য্য রকম বড় আকারের অসংখ্য পাপড়িতে ঠাসা লাল গোলাপ।

'খা লে বেটা। ইয়ে সেও খা লে।' যেন নিজের প্রিয় পৌত্রকে আদর জানাচ্ছেন বৃদ্ধা।

'আমি এইমাত্র অনেক খেয়ে নিয়েছি, নানীজী। আর তো পেটে জায়গা নেই।' সলজ্জ স্মিতমুখে বেশ চোস্ত হিন্দীতেই জবাব দিলে প্রহ্লন। দেরাদুন মিলিটারী আকাডেমীর ছাত্র সে। হিন্দী ভালো করেই শিখেছে। পাঞ্জাবীতে জবাব দিতে হলে মুস্কিলে পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে হিন্দী পাঞ্জাবের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

'তবে নিয়ে যা। পথে খাস্‌।…দুধের বাছা! কার কোল শূন্য করে দুষমনের সঙ্গে লড়তে চলেছে। আশীর্বাদ করি, বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরে আসিস। মায়ের কোলে আবার ফিরে যাস্‌…' হাত বাড়িয়ে প্রহ্লনের হাতে প্রায় জোর করে আপেলটা গুঁজে দিলেন বৃদ্ধা।

'নিন এটা।' নাতনী বললে। 'আপনাদের ফল দেবার জন্য বিবিজী দু মাইল ছুটে এসেছেন। আর এটা আমার তরফ থেকে।' বলে সলজ্জ হাত ভরে সে হাতের প্রকাণ্ড গোলাপ ফুলটা প্রহ্লনের দিকে এগিয়ে দিলে।

'যদি তোমার নামটা বল।' প্রহ্লন দুষ্টুমি করে' বলল, 'তবেই তোমার ফুল নেব।'

'শীলা। শীলা শর্মা।'

'পড়?'

'হাঁ। রোজ মেরী কলেজে পড়ি বি-এ ক্লাসে…'

'আমার নাম প্রহ্লন চ্যাটার্জি। আমি কলকাতার লোক।'

'ওঃ, কলকত্তা!' বৃদ্ধার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমার এক মাসি ছিল

কলকত্তায়। আমি কখনও যাইনি। শুনেছি খুব ভারি শহর।···কত দূর থেকে এসেছিস বেটা দেশরক্ষা করতে, দুষমনের হাত থেকে আমাদের ইজ্জৎ বাঁচাতে। পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করি জঙ্গী হয়ে ফিরিস্, দেশের মুখ, বাপ মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিস্···'

'আমিও সেই প্রার্থনা করি, ক্যাপ্টেন।' শৈলা বললে।

শুভ কামনা সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করল প্রহ্লন। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'। মেয়েটি নিতান্ত আত্মীয় বলে মনে হলো এদের। বললে, 'যদি জঙ্গী হয়ে ফিরে আসি তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তোমাদের ঠিকানাটা কি বলতো শৈলা, নোট বইয়ে টুকে নিই···'

'১১৭২ কুচা বলবন্ত সিং, কর্ণডোরী, অমৃতসর।' শৈলা বললে।

'আসা চাই কিন্তু বেটা। আমরা এন্তেজার করব।' শৈলার ঠাকুমা আগ্রহের সঙ্গে বললেন। 'ক'দিন থাকতে হবে। সময় করা চলবে না। তুই আমার বেটা···'

'হাঁ জী।' প্রহ্লন সহাস্যে মেনে নিলে আত্মীয়তার সম্পর্ক। ইতিমধ্যে ট্রাকের এঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে। রওনা হবার আদেশ পৌঁছে গেছে। প্রশংসমান জনতা 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর করে তুলেছে রাজপথ। এই ধ্বনি এক সারি মোটরের এঞ্জিনের আওয়াজের সঙ্গে মিশে আশ্চর্য ঐক্যতান সৃষ্টি করেছে। যারা বিদায় নিচ্ছে এবং যারা বিদায় দিচ্ছে উভয়ের মনে অদ্ভুত উৎসাহ ও আবেগের সৃষ্টি করে সৈন্যবাহী জিপ্ ও ট্রাকের কনভয় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক সড়ক ধরে' ওয়াগাহ সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

চলন্ত ট্রাক থেকে বার বার পেছনে তাকিয়ে দেখেছে প্রহ্লন। পিছন থেকে একটা ক্ষীণ দুর্বল হাত ও একটা শাদা রুমাল উদ্যত দেখেছে অনেকক্ষণ। তা যখন অস্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন দেখা গেল রঙিন উত্তরীয়ের একটা প্রান্ত উড়ছে আকাশে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠাকুমা আর নাতনী।

কামানের উপর শুয়ে শুয়ে প্রহ্লনের বিনিদ্র চোখে মধ্যরাত্রের স্বপ্নের মত এইসব দৃশ্য ভেসে উঠছে।

প্রায় সারাটা দিনই কামানের গোলা চালিয়েছে শত্রু সমাবেশের উপর। অবিশ্রান্ত চলছে তার ইউনিটের তৎপরতা। অধীনস্থদের বিশ্রাম দেবার জন্য প্রহ্লন নিজ হাতে পর্যন্ত কিউজে অগ্নিসংযোগ করেছে। দূর করতে হবে তাদের যারা আমার দেশে হানা দিতে চায়, আমার দেশের সীমান্ত থেকে তাদের অনেক দূরে রাখতে হবে।

সহকর্মী অফিসারদের কেউ কেউ আড়ালে কমাণ্ডের সমালোচনা করে বলেছে, লাহোর তো প্রায় কামানের আওতার মধ্যে, আরও দু এক মাইল এগিয়ে লাহোরের কিছুটা ভাঁড়ো করে দিলে ক্ষতি কি। প্রহ্লন তা চায় না! কমাণ্ডের সিদ্ধান্তই তার কাছে উচিত মনে হয়। নিরীহ লোক না মেরে, সম্পত্তির ক্ষতি না করে' শত্রু দমন করতে পারলে তাই সবচেয়ে অভিপ্রেত নয় কি? অতি-সাবধানতার সঙ্গে প্রহ্লন তার নিশানা ঠিক করেছে। জন-বসতির ওপর যাতে না পড়ে কামানের গোলা সে সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থেকেছে সর্বদা। গুলি মেরে লাহোর ধ্বংস করার সে পক্ষপাতী নয়।

ধ্বংস করবার জন্য শত্রুসৈন্য দূর থেকে কলকাতার ওপর অনর্গল বোমা ফেলছে তাদের বাড়ী, পাড়ার আরও দশটা বাড়ী ভেঙে হয়তো চুরমার হয়ে গেছে, পার্কে ছুটোছুটি করছিল যে খোকা চড়ুইগুলি এমন শিশু মরছে ক'জন, মিউজিয়ম আর এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ী ভেঙে পড়েছে বেমবোমা গোলাবর্ষণে। কি কুৎসিত জিনিষ হতো এমন হলে। শত্রু জয় করার প্রয়োজনে, তাদের শক্তি চূর্ণ করার প্রয়োজনে, প্রয়োজন হলেই লাহোরে ঢুকতে হবে। কিন্তু মিছিমিছি ক্ষতি করতে, নিরীহ মানুষের জীবন বা সম্পত্তি নাশে প্রফুল্লের সামান্য ইচ্ছাও নেই, তা হোক ওদের জন-সাধারণ আমাদের বিপক্ষে। যুদ্ধের সময় এ রকম হবেই। স্বাভাবিক কারণ না থাকলেও ক্রোধ তৈরি করা হয় এ সময়। যুদ্ধলিপ্সা যাদের যত বেশি, প্রচারের কলাকৌশলও তাদের তত জোরালো।

'কিন্তু ওরা যদি সুযোগ পায়, আমাদের ওপর কি এতটা দয়া দেখাবে?' মেজর সিং চোখে একটু দুষ্টুমির ঝলক খেলিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

'ওরা যাতে মোটেই সে সুযোগ না পায় তার জন্যই তো আমরা এতটা দূরে এগিয়ে এসেছি।' প্রফুল্ল ইঙ্গিতে ইঙ্গোসিল খালটা দেখিয়ে বলেছিল। 'আমাদের এফিক্স্ নিয়েই আমরা লড়ব। মিছিই এফিক্স্ অনুকরণ করতে যাব কেন?...'

'ঠিক আছে। লাহোরের ওপর গুলি নাই ছুঁড়লে। লাহোরের সামনে যে সব নিরীহ প্যাটন আর পর্শন খাড়া আছে তাদের মই দিতে পারলেই চলবে। একটা মাত্র দুপুরে কম mowing করা হয়নি, তবুও, cease-fire-এর জন্য নাকি দারুণ ডিপ্লোমেটিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। লাহোর জয় করবার আগে আবার সেটা চালিয়ে না দেওয়া হয়!'

মেজর সিং মনে প্রাণে যোদ্ধা। যুদ্ধটাকে জয় করার দিকেই তার প্রধান নজর।

কামানের শীতল অঙ্গে শুয়ে প্রফুল্ল ভাবছে। ভাবছে, শত্রুপক্ষ যদি অমৃতসরের কাছাকাছি পৌঁছতে পারত, তবে কি আমাদের মত দয়া বা বিবেচনা দেখাত? শত্রুপক্ষের একটা গ্রাম অধিকার করবার পর প্রফুল্ল দলের ক'জন জোয়ান নিয়ে টহলে বেরিয়েছে। দেখলে আধ-পোড়া একটা বুলবির সামনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী বেড়া টেনে সেটা জোড়াতাড়া দেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এতগুলি ভারতীয় সৈন্য দেখে সে প্রথমে থমকে; তার চোখে মুখে আতঙ্কের নিবিড় ছায়া চকিতে গাঢ় হয়ে উঠল। প্রফুল্ল আর দলের ক'জন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'সব, তোমার বাড়ী ঠিক করে দিচ্ছি। তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা শুধু সৈন্যের সঙ্গেই লড়াই করি...' প্রায় আধঘণ্টা ধরে বাড়ী মেরামত করে তারা যখন বিদায় চাইলে, বুড়ী তখন একেবারে কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষ কি এতটা মোলায়েম হবে? অসহায়কে রক্ষা করবে, নিরপরাধের উপর, অসামরিক জন ও জনপদের উপর অস্ত্রাঘাত করতে বিরত হবে? ওদের মনোবৃত্তি আর আমাদের মনোবৃত্তি কি এক? বিবেক যদি মাত্রাহীন হয়, তবে এ সংযম তো সম্ভব নয়।

শত্রুপক্ষ অমৃতসরের দরজায় হাজির হয়েছে এই পরিস্থিতি সে মনশ্চক্ষে টেনে এনে ভীত হলো। দুমদাম্ শব্দে বোমা পড়ছে শহরের ওপর; তাসের বাড়ীর মতো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে বসতবাড়ী ইস্কুল হাসপাতাল। উন্মাদ উল্লাসে ঢুকে পড়েছে হাজার শত্রুসেনা। আর্তনাদে ভরে উঠেছে নগরীর আকাশ। চিতার আগুনের মত আগুন জ্বলে উঠেছে এখানে ওখানে। যার

যার পথে এগিয়ে চলেছে রাজ্যলোভী রক্তলোভীর দল। পায়ের বুটে শৈলার বুড়ী ঠাকুমার তুর্বল হাতটা গুড়িয়ে, শৈলার দেহটা পিষে বিজয়োল্লাসে এগিয়ে যাচ্ছে!···

'ক্যাপ্টেন, তৈরি হও। ওদের জাহাজের আওয়াজ শোনা গেছে।'

'আমরা তৈরি।' এক লাফে কামানের শয্যা ত্যাগ করে প্রদুন অন্ধকারে ছায়ার মত হাজির হওয়া মিশ্‌টার কাছে পলকে এগিয়ে গেল।

রুখতে হবে। যেমন করে হোক রুখতে হবে। প্রাণ দিয়ে রুখতে হবে। নইলে যা আমি ভালবাসি, যাদের আমি ভালবাসি তারা বাঁচবে কি করে? তারা মুখ দেখাবে কি করে? মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে কি করে?

শুরু হয়ে গেল আগুনের হোরিখেলা। বুম্ বুম্ গুম্ গুম্। অবিশ্রান্ত গোলা বিনিময়। দুপুরে রৌদ্রদীপ্ত আকাশে যেন শত শত বিদ্যুৎ স্ফুরণ। ব্যাট্-ব্যাট্-ব্যাট্ আওয়াজ আসছে মেশিন-গানের। হাত-বোমার বিস্ফোরণ হচ্ছে মুহুর্মুহু। এরোপ্লেনের গুঞ্জার আসছে মাথার উপর থেকে। লড়াই হচ্ছে ফাইটারে ফাইটারে মহাশূন্যে। বোমারু বিমান ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসছে সুযোগ পেলেই। যেন রক্তের নেশায়—শকুন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শিকার সন্ধানে। মৃত্যুর মহোৎসবে মেতে উঠেছে দিকবিদিক। বোমা পড়ছে এখানে ওখানে। আগুনের হল্কা জিব মেলে এগিয়ে আসছে। জীবন মৃত্যু দুটোই তুচ্ছ হয়ে গেছে। তুমি মার শত্রুকে, নইলে সে তোমাকে মারবে। তোমার বীরত্ব ও রণদক্ষতার উপর নির্ভর করছে সমস্ত বাহিনীর সাফল্য, তোমার দেশের ভবিষ্যৎ। হে সৈনিক, প্রাণ দিয়ে লড়া চাই, প্রাণপণে লড়া চাই।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীন অ্যাডভোকেট মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কোর্টে যেয়বার উপক্রম করছেন। নথিপত্র সব গাড়ীতে উঠেছে। এবার তিনি নিচে নামবেন।

ঠিক এই সময় নিচ থেকে তার ক্লার্ক গৌরীকান্ত চিঠিটা এনে মধুসূদনের হাতে দিলে। বললে, সামরিক কুরিয়র এটি নিয়ে এসেছে। মধুসূদন কম্পিত হাতে চিঠিটা নিলেন। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন খামটা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে পাশের লাইব্রেরি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। যেন পথ চলতে চলতে সহসা বজ্রাহত হয়েছেন।

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, গত উনিশ তারিখে সোলঙ্কাজ কোরের ক্যাপ্টেন প্রদুন চ্যাটার্জি যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি সাইটেশনে বলা হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি রণক্ষেত্রে অমিত শৌর্য প্রদর্শন করেন। তাঁর ছোট ইউনিট নিয়ে তিনি শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির উপর আশ্চর্য নিশানার সঙ্গে কামানহীন গুলি বর্ষণ করে তাদের পর্যুদস্ত করতে থাকেন। বিপক্ষদল কিছুতেই তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। তখন শত্রুর একটি ছোঁ-মারা বোমারু বিমান আমাদের বিমানের বেড়া দিয়ে গলিয়ে এসে ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জির ঘাঁটির খুব কাছে গোলাবর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে তার ইউনিটের চার জন জোয়ান প্রাণ হারায় ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি নিজে গুরুতর রকম জখম হন। কিন্তু এই আঘাত উপেক্ষা করে একক তিনি আরও আধঘণ্টা কাল তাঁর কামান থেকে গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখেন। বিপক্ষদলের কামান নিস্তব্ধ হওয়ার পর মাত্র তিনি

তাঁর কামানের পাশে পড়িয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই রণক্ষেত্রে তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন—তাঁর শৌর্য্য ও রণনৈপুণ্যের জন্য মৃত্যোত্তর সম্মানের জন্য তাঁর নাম প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে···

ঠিক এই দিন প্রায় একই সময়ে একটি সেপাকা এলো অমৃতসরের কর্ণডোরীর শীলা শর্মার কাছে। অপরিচিত হাতের লেখা ঠিকানা। খামের ওপর মিলিটারি ক্যান্সের সীল। বিস্মিত হয়ে শীলা চিঠিটা খুললে।

লাহোর ফ্রন্টের কোনও এক জায়গা
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রিয় শীলা,

এই চিঠি পেয়ে তুমি খুব আশ্চর্য্য হবে। হাতে খুব কাজ। চা খাওয়ার অবসরে এই কয় লাইন লিখছি। কাউকে চিঠি লিখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কাল বাড়ীতে চিঠি দিয়েছি। আজ কাকে লিখি? আজ তোমাকে লিখছি। অমৃতসরে তোমাদের বিদায় অভিনন্দনটা আমি ভুলিনি। দারুণ ভালো লেগেছিল আমার। বলেছিলাম, যুদ্ধ জিতে যদি ফিরতে পারি তবে তোমাদের বাড়ী গিয়ে দেখা করে যাব। সে কথা আমি ভুলিনি। ঠিকই রাখব সেই প্রতিশ্রুতি।

আর যদি না ফিরি? চট্ করে ভুলে যেও না যেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের রক্ষা করতে হবে, তোমাদের বাড়ী থেকে শত্রুকে বহুদূরে রাখতে হবে এই সংকল্প আমাকে প্রতিক্ষণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। খুব লড়াই করছি। ওরা আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। কিন্তু সৈনিকের জীবন। যে কোনও সময় যা কিছু ঘটে যেতে পারে। যদি না ফিরি, মনে রেখো। ভুলো না আমরা তোমাদের জন্যই যুদ্ধ করেছি, তোমাদের জন্যই প্রাণ দিয়েছি। ···আজ আর সময় নেই। দূরে কামান গর্জন করছে। এখন বিদায়, শীলা।—আন্তরিকভাবে।

তোমার
প্রহ্লাদ চ্যাটার্জি

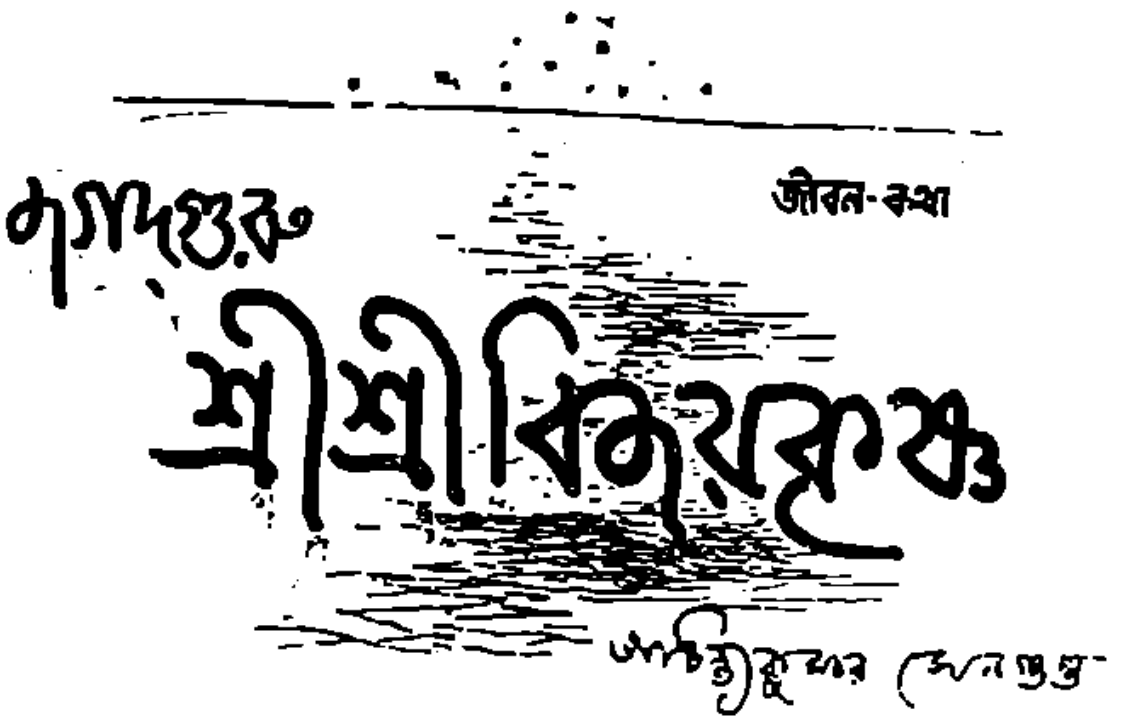

৩৭

হৃদয় যদি শুষ্ক মনে হয়, অন্তরে যদি ভাব না থাকে, তবে কাউকে কিছু দান করে এস। গোস্বামী প্রভু বললেন, 'লোককে খুব দেবে। দিলেই সব খুলে যাবে।'

দানের স্পর্শেই খুলে যাবে কাঠিন্যের কারাগার, সরে যাবে কার্পণ্যের অবরোধ।

পাত্রাপাত্রের বিচার উঠে গেল। কার কী অভাব বলো, সাধ্যমত মোচন করে যাই। যেদিন কিছু দান হয় না সেদিন বন্ধ্যা দিন।

শ্রীমন্দিরের কাছে এক মিঠাইওলা হাত পাতল। বললে, 'ছেলের বৌভাতে দিতে পাচ্ছিনা, যদি কিছু দেন—'

প্রভু দশটাকা দিয়ে দিলেন। বললেন, "পত্র পুষ্প দিয়ে কোনো রকমে।'

আনন্দে ভরে উঠল মিঠাইওলা। বললে, 'রাধারাণী তোমাকে বনায়ে রাখে।' পাশের লোককে টাকা দেখিয়ে বললে, 'বাবা মহারাজজিকা জয়। যমুনামাই উনকে বনায়ে রাখে।'

'ঘরে ঘর ভেঙে পড়েছে, মেরামত করবার পয়সা নেই।' আরেকজন হাত পাতল।

কুড়ি টাকা দিয়ে দিলেন গোঁসাইজি।

'দেশে ফিরে যাবার রেলভাড়া জুটছে না।'

দিয়ে দিলেন যা দরকার। ভাণ্ডারে যদি একটি পয়সাও থাকে তা দান করে যাবে।

সেদিন যে একটি পয়সাও নেই। না, দিন বন্ধ্যা হতে দেব না। দুটি ঘটির একটি বেচে দিলেন প্রভু। সেই পয়সা বিতরণ করলেন।

কলিতে শুধু দুই বস্তু। দান আর নাম। সম্পূর্ণ বস্তুত্যাগই দান যাকে দেবে সে যদি তক্ষুনি তা নষ্ট করে ফেলে, কিছু বলতে পারবে না। আগুনে দগ্ধ করে ফেললেও না। তুমি যদি মনে করো তোমার সর্ত-মত দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে, তা হলে সেটা আর দান নয়, সেটা ন্যাস—গচ্ছিত রাখা। তেমন দান পাপ। সমস্ত নিঃশেষ করে দেওয়ার নামই দান।

যে চেয়েছে তাকে দেওয়ার চেয়ে যে চায়নি তাকে দেওয়া মহত্তর। কিন্তু যে যাচ্ঞাও করেনি, দান পেয়ে স্বীকারও করবে না অথচ ফিরিয়েও দেবে না তাকে দেওয়াই মহত্তম। সামান্য স্বীকৃতির আশাটুকুও রাখবে না।

চেয়েছে তাই দিয়েছ—সেটা দানমাত্র। কিন্তু চায়নি অথচ দিয়েছ সেটা ইষ্টদেবের পূজা। সে দানের মত আনন্দ নেই।

'যা খাবেন সমস্ত ভগবানের কাছে ধরবেন।' বললেন প্রভু, 'প্রহ্লাদ যখন বিষ খায় তখন তাও ভগবানকে নিবেদন করেছিল। জলটুকু খেতে হলেও মনে মনে ভগবানে নিবেদন করে নেবেন। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণির নাভিটির কী সুন্দর ভাব দেখেছিলাম। প্রসাদী বস্তু ছাড়া আর কিছু সে মুখে তুলবে না। এমনকি জল পর্যন্ত না।'

বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে। প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, তারও অতিভ্রম হল।

তার মধ্যে দৈত্যভাব আরোপ করবার জন্যে দৈত্যরা তার খাবারের মধ্যে মদ মাংস মিশিয়ে দিতে লাগল। মদ-মাংসের স্পর্শে তার মধ্যে জেগে উঠল তমোভাব। ফলে সে বেরুল দিগ্বিজয়ে। যে রাজ্যে যায় সে রাজ্যেই সকলে তাকে নানা উপচারে পরিতুষ্ট করতে লাগল। শেষকালে বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হল প্রহ্লাদ। একেবারে ভগবানের সিংহাসনে গিয়ে বসল। লক্ষ্মী জিগগেস করল, ঠাকুর, প্রহ্লাদ এ কী করল? নারায়ণ বললে, প্রহ্লাদকে আমি আগুনে জলে পতনে পেষণে সর্বত্র কোলে করে রক্ষা করেছি। ও আমার সিংহাসনে বসেছে এ এমন কী বেশি অপরাধ! নারায়ণ প্রহ্লাদের সামনে এসে দাঁড়াল। নারায়ণে দৃষ্টি পড়ামাত্রই প্রহ্লাদের তমোভাব কেটে গিয়ে সত্ত্বভাব প্রকাশ পেল। এ আমি কী করেছি, বলে কাঁদতে লাগল প্রহ্লাদ। নারায়ণ বললে, ভয় নেই। দৈত্যরা তোমাকে চালাকি করে মদ-মাংস খাইয়ে তমোভাবান্বিত করেছিল। তুমি দেখব খাদ্য আমাকে নিবেদন করে গ্রহণ করলে এমন বিভ্রান্তি ঘটত না। প্রহ্লাদ বললে, ঠাকুর, আমার ওসব নিবেদন করতে কেন ইচ্ছে হয়নি কে বলবে? নারায়ণ বললে, বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে, সেই মলিনতাতেই এই বিভ্রান্তি।

আহারদোষ স্বয়ং প্রহ্লাদকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে।

'আহারের সঙ্গে ধর্মের যোগ আছে।' বললেন গোঁসাইজি, 'শরীর আর আত্মার একত্র

উপস্থিতি। আর শরীরের পরিণতিই তো মন। তাই আহারই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। আহারের দোষেই রোগ, আহারের দোষেই সর্বনাশ। শুধু প্রণালী মত আহার করো, তাইতেই সব হবে। আর কিছু করতে হবে না।'

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলছে, আহারশুদ্ধে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধে ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। আহার শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ঘটে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়। স্মৃতিলাভ হলেই সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির বিমোচন।

অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করতে হয় না। করলেই অপরাধ।

প্রভু যখন স্নানাবেশে, পরিক্রমা করছেন, দেখতে পেলেন একটি সাধু অনাবৃত শরীরে শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তাকে একখানা কম্বল দিয়ে সমস্কার করলেন প্রভু, বললেন, আপনি এই কম্বলখানা গায়ে দিন। সাধারণ মামুলি কম্বল সাধুর পছন্দ হল না। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এমন বাজে কম্বল আমি নিই না, এ বাজারে বিক্রি করে দাও। কত অনুনয়-বিনয় করলেন প্রভু, সাধু গ্রাহ্য করল না। আরেক সাধুকে দিতেই সে তা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল।

কয়েক দিন পরে শুরু হল তুমুল বর্ষণ। যমুনায় চড়ায় যাবে, সাধুদের শারীরিক দুর্গতির শেষ রইল না। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েছিল যেই সাধু তার বুঝি বেশি কষ্ট। সে শীতে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ধুনি জেলে যে শরীরটাকে গরম করবে তার পর্যন্ত কাঠ নেই। তখন কাঠের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে লকড়ির গোলা থেকে কয়েকটা কুঁদো চুরি করল। লকড়িওয়ালা ছাড়লেনা, চোর বলে ধরিয়ে দিল। বিচারে সাধুর জেল হল। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েই তার এই দুর্দৈব।

প্রভু বললেন, 'অভাবে পড়লে অযাচিতভাবে যা আসে তাই ভগবানের দান মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য করলে বিষম অনর্থ ঘটে। দেখ ঐ সাধুর দশা। যখনই কম্বল ছুঁড়ে ফেলল, আমার মন বললে, ও অভিমানী সাধু নির্ঘাৎ বিপদে পড়বে। অভিমান করে শ্রদ্ধার দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

তিনজন পুলিশ কর্মচারী বারোজন সাধুকে ধরে এনেছে। অপরাধ টিকিট না কেটেই ট্রেণে চড়েছে। বারো জনের ভাড়া পনেরো টাকা। এই টাকা না দিলে লোআপ হাজতবাস।

গোঁসাইজি পনেরো টাকা দিয়ে দিলেন। খালাস করে নিলেন সাধুদের। বললেন, 'কাল থেকে এদের ভোজন হয় নি, মহাপ্রসাদ পাইয়ে দাও।'

দুপুরে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, একটি ওড়িয়া সাধু রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে প্রভুকে প্রণাম করল। পরে উঠে দুই হাতে প্রভুকে আরতি করতে করতে ওড়িয়া ভাষায় গান করতে লাগল।

সাধুর প্রায় উলঙ্গ-বেশ, প্রভু বললেন, 'ওকে একখানা গায়ের কাপড় দিলে হয়।'

সাধু কিছু দূর চলে গিয়েছে, সতীশ ছুটে গিয়ে তাকে একখানা কম্বল আর চার আনা পয়সা দিয়ে এল।

কম্বল আর পয়সা ফিরিয়ে দিল সাধু। আবার গান ধরল ওড়িয়া ভাষায়। গান শেষে চলে গেল হাসতে হাসতে।

'ঐ দুটো গানের অর্থ কী?' একজন জিগগেস করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'প্রথম গানের অর্থ, হে রাম, তোমাকে বহুদিন পর দেখলাম। কত তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি কোথাও। এত দিন কোথায় ছিলে? কেন দেখা হাও নি? আজ দেখলাম, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।'

'আর দ্বিতীয় গান?'

'দ্বিতীয় গানের অর্থ, হে রাম, হে হরিত, আর ছলনা কেন? আবার ঐশ্বর্য কেন? কম্বল কেন? আমার কি কিছু অপ্রতুল আছে? আমাকে যে দুখানি হাত দিয়েছ তাই দিয়েই তো আমি শীত নিবারণ করি। পয়সার কী দরকার? আমার তো প্রসাদই আছে।'

সকলে মুগ্ধ হয়ে রইল।

প্রভু বললেন, 'এই কম্বল আর পয়সা আর কাউকে দিয়ে এস।'

একদিন সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন, দেখলেন এক নেংটিপরা সাধু রাস্তার পরিত্যক্ত হাঁড়ি থেকে মহাপ্রসাদ কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছে। প্রভু সতীশকে বললেন, 'চারটি পয়সা আর আমার এই গায়ের চাদরখানা ওকে দিয়ে এস।'

সতীশ কাছে যেতেই সাধু তৃণগুচ্ছ হাতে করে প্রভুকে আরতি করতে এল। গান ধরল: নীল চক্র, জগন্নাথ, মন ভজ না চৈতন্য, মন ভজ না চৈতন্য।' প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। বৃন্দাবন শূন্য। এখন দেখছি দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এখানে বিরাজ করছ।'

গায়ের কাপড়, পয়সা, কিছুই নিলে না। বললে, 'আমার প্রারব্ধ যা আছে তাই হবে। একশো বছরের উপর কেটে গেল। জগদ্বন্ধু এখন এসব দিচ্ছেন কেন?' চলে গেল আপন মনে।

প্রভু বললে, 'কাপড় ফেলে রেখে এস। যে নেবার নেবে।'

কতক্ষণ পরে সেই সাধু ফিরে এল। সবাই ভাবল কাপড় পয়সা নিয়ে যাবে বোধ হয়। কিন্তু, না, আবার গান ধরল: 'চৈতন্য ভজ না মন, দেখ মোর কেলে সোনা' প্রভুকে দেখে তার কী আনন্দ! আবার গান: 'কত যোগ দেখি নাই তোর চন্দ্রবদন। আজ দেখছি। এতরূপ দেখি নাই, এমন প্রেম দেখি নাই।'

নাচতে-নাচতে আবার চলে গেল পথ দিয়ে। কোথায় কাপড়, কোথায় পয়সা, চেয়েও দেখল না।

ঠাকুর বললেন, 'একেই বলে পঞ্চম পুরুষার্থ।'

'আমার আকাশবৃত্তি।' বললেন আবার প্রভু, 'ভগবান যেদিন যেমন দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া বলে অনুভব করি। অশনে যে সুখ অনশনেও সেই সুখ। যিনি অশন দিয়েছিলেন তিনিই রেখেছেন অবশনে।'

সুবাবনে আরেকদিন যমুনার চড়ায় বিশ্রাম করছেন প্রভু, সাধুদের ভিড় ঠেলে চলেছেন দূর প্রান্তে সেখানে ফাঁকায় একটি অচিকন সাধু কয়েকজন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে বসে ধর্মালোচনা করছে।

প্রভু এক পাশে বসলেন। অবসরমত জিগগেস করলেন, 'মহারাজ আজ আপনা সেবা হয়া হায়?'

সাধু বললে, 'নেহি।'

'কাল হয়া হায়?'

সাধু মন্দ মুখে বললে, 'নেহি।'

'পরশু হয়া হায়?'

মন্দতর মুখে সাধু বললে, 'নেহি।'

ক্রমান্বিত জিজ্ঞাসা করে প্রভু জানলেন গত সাতদিন ধরে সাধু অভুক্ত আছে। অথচ দেহে অবসাদ নেই মনে অপ্রসাদ নেই। কেন, কেন এই অনাহার? সাধু খোয়াতে চাইল সব গোবিন্দের ইচ্ছা। চেষ্টা করলে কোথাও কি ভিক্ষে মিলত না? সাধু বললে, প্রাণ যায় যাবে তবু কারু কাছে যাচ্ঞা করতে পারব না। যার প্রাণ তিনি ইচ্ছা করলে রাখবেন, ইচ্ছা করলে নিয়ে নেবেন।

এইটুকুই জানতে এসেছিলেন প্রভু। তক্ষুনি তাঁর কুঞ্জে ফিরে এসে সাধুকে খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সাধু তা প্রত্যাখ্যান করে কী করে? এ যে অযাচিত পাওয়া। এ যে গোবিন্দের পাঠানো।

গেণ্ডারিয়ায় থাকতে একদিন গৌদাইজির শাশুড়ি বুড়ো-ঠাকুরাণী নবকুমার বিশ্বাসকে বললেন, 'আজ তো হাতে কিছু নেই, আশ্রমে এতগুলি প্রাণী, খাবার কী হবে?'

নবকুমার আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাজার থেকে ধারে নিয়ে আসি গে।'

চাল ডাল তেল যা দরকার নবকুমার সওদা করে নিয়ে এল।

আহারান্তে প্রভু ডাকলেন নবকুমারকে। জিগগেস করলেন, 'বাজার থেকে কিছু জিনিস ধারে এনেছেন বুঝি?'

'বুড়ো ঠাকুরাণী বললেন তাঁর তাঁড়ার পূর্ণ—'

'তা আপনার কোনো দোষ নেই। কিন্তু আপনাকে আমার ব্রতের কথা জানাই। আমার আকাশবৃত্তি, আমার আহ্বানও নেই বিসর্জনও নেই। ভগবান যেদিন যা মেলান তাই আশ্রমের সকলকে সমানভাবে খেতে হবে। নিজের থেকে উদ্যোগ করে সে ভার নিতে গেলে ব্রতসাধন হয় না।'

'আমি জানি না।' নবকুমার হাত জোড় করল: 'আমাকে মার্জনা করুন।'

কী বলছে গীতা? 'অনন্যচিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।' যারা অন্য সব কামনা ত্যাগ করে একমনে আমারই উপাসনা করেন সেই নিত্যযুক্ত ভক্তদের আমি ভরণ-পোষণের ভার বহন করি।

যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, কেউ কেউ তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, তোমার নিরাশ্রয় পরিবার অনাহারে শুকিয়ে মরবে। গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবানের নাম প্রচারের জন্য ভগবান যদি আমার পরিবারকে শুকিয়ে মারেন আমার আক্ষেপ করবার কী আছে!'

আসামে যাচ্ছেন, টাকা যা ছিল তাহাজ ভাড়াতেই শেষ হয়ে গেল। দুদিন চলে গেল, আহার কিছুই জোগাড় হল না। তৃতীয় দিন খিদের জ্বালায় নদীর পাড়ের খানিকটা পলিমাটি জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেললেন। যাত্রীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন এ দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী করলেন? গোঁসাইজি বললেন, 'তা আর কী করা! ভগবান যা দিলেন তাই প্রণাম করে সাদরে গ্রহণ করলাম।'

'বা, আমাদেরও তো জানাতে পারতেন।'

গোঁসাইজি হাসলেন। বিনয় বচনে বললেন, 'আপনাদের উপর নির্ভর করে তো যাত্র হইনি। যাঁর উপর নির্ভর করে যাত্র হয়েছি তিনি যা জুটিয়ে দিলেন তাই খেলায় তৃপ্তি করে।'

ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। যদি শুধু শুকনো চাল জুটছে তো চিবিয়েই খেয়ে নিচ্ছেন। কত দিন তো শুধু রাস্তার দোপাটি ফুল খেয়েই কাটালেন। হাঁটলেন দিনে আটচল্লিশ মাইল করে। যদি কখনো ভাত জুটেছে তো তাই সই, নুন জোটেনি বলে প্রাণ করেননি। যা এসেছে তাই ভগবানের প্রসাদ। যা আসেনি তাও।

আগে আগে বুড়ো ঠাকুরাণীর হাতে আশ্রমের ভার ছিল, তিনি ভেবে-চিন্তে ঘরে-ঘরে খরচ করতেন, তাই বুঝি অর্থও কম আসত। পরে যোগজীবন যখন ভার নিল তখন হিসেব উড়ে গেল, বাছবিচারের সর্ত রইল না। যা পাঠিয়েছেন ভগবান পাঠিয়েছেন, আর তুমি যদি ভগবানের আশ্রিত হও, নাও তোমার প্রয়োজন মত, যত প্রয়োজন তত আয়োজন। স্রোতের মত অর্থাগম হতে লাগল। ব্যয়ে কার্পণ্য নেই বলে আয়েও অজস্রতা। যেমন প্রভুর আকাশবৃত্তি তেমনি তাঁর ভাণ্ডারও ভগবানের ভাণ্ডার। আমি নিষ্কিঞ্চন কিন্তু আমার ভগবান যে রাজরাজেশ্বর।

'এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা দেখবি আয়
তোদেরি এই নদীয়ায়।
এবার তার রং ফিরেছে চং ফিরেছে
কালো এখন চেনা দায়।
আর তার কালো বরণ নাই
এবার রাই-অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে গৌর হয়ে তাই
সেই ব্রজের প্রেমের খেলা সেই ব্রজের রসের খেলা
সেই ব্রজের ভাবের খেলা খেলতে এসেছে হেথায়।'

ফুলন পূর্ণিমার দিন সকলের ইচ্ছে হল প্রভুর জন্মোৎসব হোক। প্রভু বললেন, 'যদি কাঙালীদের পেট ভরে ভালো করে খাওয়াতে পারো তাহলেই উৎসব হতে পারবে।'

কিন্তু অত টাকা কই?

কোত্থেকে বিধু ঘোষ এসে বললে, 'এই উৎসবের দৃশ্যটা খুব আছে দেখ। ডাকো কাঙালীদের।'

'ওর মরিয়াবারার ভয়।' কাঙালীরা উল্লাস করে উঠল। এত পিঠে-পায়েস কেউই আমাদের খাওয়ায় নি, তাও এত যত্ন করে। কত ভদ্দুর লোক এল-গেল এমন কেউ করবে না।

প্রভু বললেন, 'দেবতা প্রসাদ থেকে কী আশ্চর্য সুগন্ধ বেরুচ্ছে। যথার্থই আজ অমৃতান্নের ভোজন হল। এ তাঁরই পরিতৃপ্তির সুগন্ধ।'

আর কী সুন্দর পরিবেশন। পরিবেশনে এতটুকু অনাস্থা নেই। পরিবেশনে অসাম্যও অপরাধ।

আর পরিবেশনই তো আমাদের জীবে জীবে ব্রহ্মকে প্রণাম।

'ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।' এইতো প্রণাম মন্ত্র।

'রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম থেকে ওঠবার সময়, দাবন করতে বসে এবং দাবনের পর ওঠবার সময় ভগবানকে স্মরণ করে এই মন্ত্র পড়ে নমস্কার কোরো।' বললেন প্রভু, 'ভগবৎ মূর্তিতে যেখানে যখন নমস্কার করবে এই মন্ত্র পড়ে কোরো। ভগবানের অন্তর্ধানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঋষিগণ দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করেছিলেন। এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করলে সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌঁছুবে এরূপ বর আছে।'

প্রভু পায়ে হেঁটে লঙ্গরখানায় যাচ্ছেন, তাঁর বেশ দেখে একজন কাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'পাল্কি চড়েও তো যেতে পারেন—'

প্রভু বললেন, 'এ স্থানের বালুকা স্বর্ণ বালুকা। এ গায়ে লাগলে শরীর পবিত্র হয়ে যায়। বরং শরীর পাত করে এ ধূলির সঙ্গে মিশে যাওয়া ভালো তবু পাল্কিতে চড়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

'আসল কী জানো!' বলছেন গোঁসাইজি। 'আসল হচ্ছে ভগবৎ ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছার চেষ্টায় কিছু হয় না, ভগবৎ ইচ্ছায়ই সমস্ত। যখন চিকিৎসা করতাম, মনে ধারণা হত, এই ওষুধটা দিলেই রোগ আরাম হবে। পরে দেখি তা হয় না। বারে বারেই হয় না। তখন বুঝলাম, ওষুধ কিছুই নয়, আসল হচ্ছে ভগবানের কৃপা। প্রথম প্রথম প্রচার করতে গিয়ে দেখি, লোকে একমনে শোনে আমার আনুকূল্য করে। শেষে দেখি সকলে উদাসীন, আমার কথায় কিছু হবার নয়। বুঝলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়—ভগবৎ কৃপায়ই সমস্ত। এমনিধারা পুরুষকারে আঘাত খেয়ে খেয়ে বুঝে নিয়েছি, আমি কিছুই নই, অসারের অসার। কর্মকর্তা ভগবান, সর্বনিয়ন্তা, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা। ভেবে চিন্তে ইচ্ছে করে নিজের জীবনই কি আমি গড়তে পেরেছি!' টোলে পড়তাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। হয়ে উঠলাম ঘোর বৈষয়িক। পরে গেলাম ব্রাহ্মসমাজে। প্রচারক হলাম। ডাক্তারি করলাম। তারপর ঘুরে ফিরে আবার এই অবস্থা। ভগবৎইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পন্ন হচ্ছে। এখন শুধু দেখছি শিশুর মত অবস্থান। যদি যথার্থ শিশুর মত থাকতে পারি তাহলে মা সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন।

কয়বাস দিয়ে প্রসাদী লাড্ডু আনা হয়েছে। সবাইকে দিয়েছ তো? জিগ্‌গেস করলেন প্রভু।

অনেককেই দিয়েছি। ভক্ত উত্তর করল। শুধু পাণ্ডাদের দিইনি। ওদেরকেও কি দেব?

প্রভু বললেন, 'সকলকেই দেবে। চাকর, বেশ্যা, বানর, গরু কাউকে বাদ দেবে না। সকলকে দিলেই ভগবান পান।'

কাকে বাদ দেবে? বাদ দিলে যে ভগবানই বাদ পড়ে যাবেন।

মিউনিসিপ্যালিটি থেকে টিকাদার টিকে দিতে এসেছে, মেয়ে নারায়ণীর গায়ের জামা খুলে টিকাদার দেখছে টিকে নেবে কি না, তাইতে জগবন্ধু ভীষণ চটে গিয়ে টিকাদারকে গালাগাল দিতে সুরু করেছে। প্রভু বললেন, 'একটু হলেই যদি উত্তেজিত হতে হয় তবে আর কী হল।' 'রাগের অবস্থায় স্থিরভাবে কাজ করাই মহত্ত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির হয়ে কাজ করায় মহো বাহাদুরি কী।'

পরে আরো বললেন, 'যদি শান্তি পেতে চাও সকলকে মিষ্টি বাক্য বলবে। কাউকে নিন্দা করবে না।'

শ্রীধর বললে, 'ঠাকুরমা আমাকে কী সুন্দর বলেছিলেন, যেখানে যাবি এমন বাক্য বলবি যেন প্রাণ শীতল হয়ে যায়।'

'আমি দিই তা কে বলে?' বললেন প্রভু, 'সমস্ত জগন্নাথদেবই দেন। তিনি ভিতরে ইচ্ছা না দিলে কেই বা দিতে পারে? কে দাতা কে গ্রহীতা কারই বা এই দানযজ্ঞ?'

'সেই এক পুরাতনে পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-করণ প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।
জীবন্ত জ্যোতির্ময় সকলের আত্মায়
দেখে সেই, যে জন বিষাদ করে।
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে যাঁহায় চিত্তনে সন্তাপ হরে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণ দাতা নিকট সহায় দুঃখ সাগরে।
তাঁর মূল দেখি সবে হও হে সুখী তৃষিত মনপ্রাণ যাঁর তরে।
ভজন-সাধন তাঁর করহে নিরন্তর
চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।'

ক্রমশঃ

বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিকথা

বেলগাছিয়া নাট্যশালা :

১৮৫৮ সাল

কলকাতার সেসময় একাধিক সখের নাটুকে দল তৈরী হয়েছিল। বাংলা নাট্যাভিনয়কে জনপ্রিয় করতে তাঁদের অবদান কম নয়।

এই রকম একটি নাট্যশালা ছিল বেলগাছিয়ার রাজাদের বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা।

তখনকারদিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের মতে এরকম সুন্দর নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় আগে আর হয়নি।

এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সেযুগের ইংরেজী শিক্ষিত বহু বাঙালী তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার অভিজাত মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়ে যায়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে এরকম সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও দেখা যায়নি।

গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয়-কৃতিত্ব-কাহিনী সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের মত সর্বজনবিদিত। তাঁর বিবরণ থেকে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতানবাদনের প্রবর্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐকতানের দল গঠন করেন।

এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। নাট্যশালা নির্মাণে মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন।

এই নাট্যশালায় অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রত্নাবলী নাটকে বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, অভিনয় কালে অফুরন্ত ব্যঙ্গ-রহস্যের সংযোগ ঘটিয়ে বিদূষকের ভূমিকাটির এমন জীবন্ত বাস্তবরূপ দিতে পেরেছিলেন যে, তিনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলকাতার দেশী ও বিদেশী বহু গণ্যমান্য লোক এবং সপরিবারে বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশববাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশববাবুর গম্ভীর ও শান্ত চেহারা দেখে তিনি যে বিদূষকের ভূমিকা এইরকম নিপুণতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন, তা কেউ বলতে পারত না।

শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন ঐ নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ সনের ৩১এ জুলাই, শনিবার। এর কয়েকদিন পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' (১৮৫৮, ৭ই আগষ্ট) এর একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য কথার মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন :—

"পাইকপাড়ার রাজারা শিক্ষা ও দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্ত হস্তে দান করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছেন। এবারে তাঁহারা নাট্যশালা ও নাটকের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে তাঁহারা একটি চমৎকার সখের নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছেন। গত শনিবার রত্নাবলী অভিনয়ের দ্বারা এই নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। আমাদের দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রৌঢ় পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের স্মরণ আছে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উইলসন ও হেনরী টরেন্সের সময়ের এবং চৌরঙ্গী ও সাঁহুসি থিয়েটারের কথা স্মরণ আছে, তাঁহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভ্যুদয় ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি নবানুরাগের সংবাদ খুব আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে। এ যুগের নবীন যুবকেরাও এই আমোদের নূতনত্ব ও নাট্যশালার সুব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বিচক্ষণ দর্শকেরা সেদিনকার অভিনয় দেখিয়া খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন।" (অনূদিত)।

একজন ইংরেজ শ্রোতা বলেছিলেন, এই অভিনয়ে ভারতীয় বাদ্য ও গীত শুনে তাঁর মনে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিরূপ ভাব ছিল, তা সম্পূর্ণ দূর হয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু এই অভিনয়ের প্রশংসাবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, কতকগুলি দোষও দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী অভিনয়ে সেই দোষগুলি সংশোধিত হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে, (৮ আগষ্ট ১৮৫৮, রবিবার) 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল :—

"গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় মুবাব্যক্তিকর্তৃক রত্নাবলী নাটক সমাধা হয়। রাত্র ৮।০ সাড়ে আট ঘটিকাসে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ছোট গবরনর শ্রীযুক্ত মাডবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুক্ত হিটন সাহেব, ডাক্তার গুডইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচাদ মিত্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। নাট্যোক্ত স্ত্রীপুরুষেরা যে প্রকার অঙ্গভঙ্গিমা ও নৃত্যগীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, নাট্যশালা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, নাট্যোক্ত ব্যক্তিবর্গের বেশবিন্যাস অতি সুদৃশ্য ও মনোহর হইয়াছিল, এই ব্যাপার এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওয়া কালীন অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং নাট্যোক্ত পুরুষদিগকে বস্ত্রযুগ দিয়া বিদায় করিলেন। শুনা গেল আগামি বৃহস্পতিবার ঐ নাটক ঐ স্থলে পুনরায় হইবেক, তাহার কারণ শুনা গেল যে, গতবারে স্থানের সঙ্কীর্ণতা জন্য অনেক ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায় নাই, সেজন্য দুইবার করিয়া সর্বলোকের মনোরঞ্জন করিবেন।"

'রত্নাবলী' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছ'সাতবার অভিনীত হয়। অভিনয় দর্শনের জন্য বহু বিশিষ্ট ইংরেজ নিমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের সুবিধের জন্য পাইকপাড়ার রাজারা 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুবাদকার্যের ভার পড়েছিল মধুসূদন দত্তের ওপর। তিনি এর জন্য রাজাদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলেন।

এইভাবে মাদ্রাজ প্রবাস থেকে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার উপলক্ষ্য হিসেবে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মধুসূদনের মনে নাটক লেখবার সঙ্কল্প জাগে। শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যই লিখেছেন :—

"এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায় স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪৯ সালে মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দু কলেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাঁহাকে চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের মধ্যে একজন। গৌরদাসবাবু তাঁহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিলেন।

মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন।...তাহার পর মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন প্রণালীতে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল।...তাঁহার জীবনচরিতকার বলেন যে, এই বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সম্পর্ক হইতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সূত্রপাত।...বলিতে কি ঐ রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ মধুসূদনের প্রতিভা বিকাশের বেতুভূত হইল।"

মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' লিখলেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয়ের আয়োজন চলতে লাগল। যখন 'শর্ম্মিষ্ঠা'র মহলা দেয়া হচ্ছিল, সেই সময় পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বন্ধু গৌরদাস বসাককে একখানি চিঠি লেখেন; চিঠিখানির তারিখ ২৪ মার্চ ১৮৫৯, এতে অভিনেতাদের নামের এইরকম উল্লেখ আছে :—

রাজা যযাতি—প্রিয়নাথ দত্ত	মাধব্য—বিদূষক—কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি
মন্ত্রী—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শুক্রাচার্য—ঋষি—দীননাথ ঘোষ
কপিল—ঐ শিষ্য—শরৎচন্দ্র ঘোষ	প্রথম নাগরিক—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বৃষপর্ব্বা—সৈন্যাধ্যক্ষ—ঈশ্বরচন্দ্র সিং	দ্বিতীয় ঐ —রসিকলাল সাহা
দরোয়ান—রাজকর্ম্মচারী—তারাপদ গুহ	তৃতীয় ঐ —ব্রজদুলাল দত্ত
সভাসদবর্গ—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	চোপদারদ্বয়—দ্বারিকানাথ মল্লিক এবং মহেশচন্দ্র চন্দ্র
প্রিয়নাথ শেঠ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র	দ্বারবান—যদুনাথ ঘোষ
দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শর্ম্মিষ্ঠা—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণিকা—কালিদাস সান্যাল	দেবিকা—অঘোরচন্দ্র ধাগরিয়া
নটী—চুণীলাল বসু	পরিচারিকা—কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমরা ১৮৫৯ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' থেকে জানতে পারি যে, ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়। তৃতীয় অভিনয় হয় ২১এ সেপ্টেম্বর, বুধবার। 'শর্ম্মিষ্ঠা'র ষষ্ঠ অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২৭এ সেপ্টেম্বর। বাংলা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্র্যাণ্ট সাহেব, পাটনার মুন্সী আমীর আলী, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। রাজারা বিদেশী দর্শকদের সুবিধের জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের ন্যায় মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকেরও ইংরেজী অনুবাদ করিয়েছিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় প্রসঙ্গে মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন :—

When Shermista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Shermista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell." Poor old Ramchandra was half mad and grasped my hand, "why my dear Modhu! this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."

'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয়নি। ১৮৬১ সনের ২৯এ মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই অল্পকালের মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে উৎকর্ষ দেখিয়েছিল তা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। মধুসূদন সত্যসত্যই বলে গেছেন, "যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয় তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন (প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ) উদ্যমশীল পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না.—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।"

একটি স্বর্গীয় কাহিনী

অমিতবরণ সরকার

স্বর্গধামে তুমুল আয়োজন চলিয়াছে। মন্দাকিনীর তীরে প্রশস্ত স্থানে সুদৃশ্য মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে। আসাগোড়া শ্বেত বস্ত্রে আবৃত মঞ্চ, দুই পার্শ্বে বিশিষ্ট অতিথিদের উপবেশন আসন, মধ্যস্থলে আলিম্পনা অঙ্কিত নাতিউচ্চ বেদী। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া উৎসব তিনি এই বেদীতে উপবেশন করিবেন।

গোলোক এভিনিউর দুই পার্শ্বে পোষ্টার পড়িয়াছে। ২রা অক্টোবর স্বর্গলোকে গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাত্মাজী আপত্তি করিয়াছিলেন। মর্ত্যধামে থাকিতেই প্রতি বৎসর এই তারিখটিতে অনেক ঝামেলা সহ্য করিতে হইত, আবার এ সব ঝামেলা এখানে কেন?

আপত্তি টেঁকে নাই। সম্প্রতি তাঁহার অন্যতম শিষ্য পণ্ডিতজী মর্ত্যধাম হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি এবং প্যাটেল সাহেব দুইজনে মিলিয়া, আরো পাঁচ সাতজনকে দলে টানিয়া গণ্ডগোলটি পাকাইয়া তুলিয়াছেন।

উৎসবের প্রধান অতিথি হিসাবে কেনেডী সাহেবকে পাওয়া গিয়াছে। সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন কাউণ্ট বার্ণাদোত।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে একটি কবিতা পাঠ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাগ হ্যামার শীল্ড চতুর্দিকে চরকীর মত পাক খাইয়া ফিরিতেছেন।

কাজের আর অন্ত নাই। প্রভাত ফেরীর জন্য প্রায় দুই হাজার বিদেহী সঙ্গীতজ্ঞ বৈকুণ্ঠ স্তবে মহড়া দিতেছেন। শোনা যাইতেছে প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সুরযন্ত্রের জন্য বিশ্বকর্মা পঁচিশ হাজার চরকায় অর্ডার পাইয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব কারখানায় প্রচণ্ড উৎসাহে চরকা প্রস্তুত হইতেছে।

বিড়া সাহেব ও নিয়াজৎ আলিকেও আহ্বান জানানো হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা আসেন নাই। বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, মর্ত্যধামে থাকিতে বিজাতি তত্ত্বের প্রেতের পাল্লায় পড়িয়া যে নাচানাচি করিয়াছিলেন তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া এখন আর মহাত্মাকে তাঁহাদের মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বাপুজীর লজ্জা হইতেছিল। না, না, এই বৃদ্ধ বয়সে এই সব ধাপচপলতা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। জন্ম-মৃত্যুর অতীত লোকে আবার নূতন করিয়া জন্মদিন করিতে গেলে লোকে কি বলিবে?

তিনি পণ্ডিতজীকে কহিলেন, 'জহর, মেরা বেটা, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি?'

'কতি নেহি', পণ্ডিতজী সদর্পে ঘাড় নাড়িলেন।

সারা জীবন বৃহৎ কর্ম করিয়া আসিয়া এই স্বর্গলোকে চুপচাপ বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদেশিক সফর নাই, পকেটভর্তি বিতরণ নাই, পার্লামেণ্ট নাই, দিল্লীর রামলীলা ময়দান নাই, ক্যাবিনেট মিটিং নাই,—নাগা সমস্যা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম—ভাষণ বা বিবৃতি দিবার কোনো সুযোগই নাই—তিনি কি লইয়া স্বর্গবাস করিবেন?

প্যাটেল সাহেবও সেই কথা বলিলেন, 'কমসে কম কুছ হোনা তো চাহিয়ে।'

'আপনি আপত্তি করছেন কেন?' কেনেডী স্মিতমুখে গান্ধীজীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'না, আপত্তি ঠিক নয়, ভাবছি সারা জীবন যে আদর্শ প্রচার করে এলাম, পৃথিবী তা বুঝলো না, নিলো না। জন্মদিন করে কী লাভ?' বাপুজীর শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

'আদর্শ কেউ কোনদিন অনুসরণ করে না,' বলিলেন কেনেডী, 'দেখুন না আপনাকে, আমাকে, কাউণ্ট বার্ণাদোত, আব্রাহাম লিঙ্কন সবাইকে গুলি খেয়ে মরতে হলো। ভেবেছিলাম মরলে যদি দেশটার আক্কেল হয়। তা, শুনেছি জনসন এর মধ্যেই অনেক কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসে আছে।'

'আমার ভারতেরও সেই এক অবস্থা,' গান্ধীজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, 'সারা জীবন পাকিস্তানের তোয়াজ করলাম কিন্তু হতভাগারা নাকি আবার ভারত আক্রমণ করেছে।'

'আগেই শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল আপনার, আপনার জন্যই তো···।' সরোষে কথা কটি বলিয়া ফেলিয়াই প্যাটেল লজ্জায় জিভ কাটিলেন।

বাপুজী হাসিলেন, 'তুমি তো বলতেই, তবে কি জানো? মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমার শেষ পর্যন্তই ছিল। জহরেরও ছিল, তাই নয়?'

'ছিল,' স্বীকার করিলেন জহর, তারপর আবার বলিলেন, 'কিন্তু এখন আর নেই, চীন আমায় খুব আক্কেল দিয়েছে।'

'শাস্ত্রী নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে?' গান্ধীজী প্রশ্ন করিলেন।

'শুনছি তো তাই, খবর তো বিশেষ কিছু এখানে আসে না', বলিলেন জহর।

'আচ্ছা কিয়া, বাহাদুর কা মাফিক কাম কিয়া,' সগর্বে বলিলেন প্যাটেল।

গান্ধীজী স্মিতমুখে প্যাটেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ভুলো না, বল্লভ, আমি অহিংসার পূজারী!

• • • •

প্রধান অতিথির ভাষণ শেষ হইয়াছে। বিরাট মণ্ডপে তিল ধারণের স্থান নাই। শুভ্র বস্ত্র পরিহিত বাপুজী একটি প্রত্যুষের প্রদীপ শিখার মত বেদীতে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ, বেদব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, টলষ্টয়, হুগো প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ও আরিস্টটোল, প্লেটো প্রমুখ বিষয়ণ্ডলী উপবিষ্ট।

সভাপতি কাউন্ট বার্নাদোত তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে মহাত্মাজীর প্রেম ও অহিংসার বাণীর চিরন্তন সত্যই যে এই বিশ্বরক্ষার একমাত্র সহায়ক তাহা ব্যক্ত করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে কোলাহল সমুত্থিত হইল।

সভাস্থ সকলে চকিত হইয়া উঠিলেন। একী কাণ্ড! একজন স্বেচ্ছাসেবক দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া মঞ্চের উপর উপবিষ্ট পণ্ডিতজীর কানে কানে কী বলিল। পণ্ডিতজী বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'আভি নেহি।'

নীরবে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত উপবিষ্ট মহাত্মাজী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অহরের দিকে চাহিলেন, 'কি ব্যাপার?'

'কিছু না, অহর কহিলেন, 'পৃথিবী হইতে একদল আজই স্বর্গলোকে পৌঁছিয়াছে। তাহারা আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'আনে দেও!' গান্ধীজী আদেশ দিলেন।

'কিন্তু···।' অহর ইতস্তত: করিতেছিলেন।

'তব ম্যয় খুদ্ যাউঙ্গা', বলিয়া গান্ধীজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া অহর দর্শনপ্রার্থীদের সারিবদ্ধ ভাবে মঞ্চের কাছে আসিতে বলিলেন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিতভাবে দেখিল রক্তাপ্লুত এক দীর্ঘ মিছিল হাস্যমুখে গান্ধীজীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

'তোমরা কারা?' শোভাযাত্রীদের পুরোবর্তীজনকে বাপুজী প্রশ্ন করিলেন।

'আমরা ভারতবাসী', দলটি উত্তর দিল।

'তোমাদের মৃত্যুর কারণ কী?' গান্ধীজী আবার প্রশ্ন করিলেন।

'আমরা মরি নাই;' বজ্রধ্বনির মত দলটির উত্তর ভাসিয়া আসিল, 'দেশের আজাদীর জন্য আমরা বুকের রক্ত দিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছি।'

'তোমাদের নাম কি?' বিহ্বলকণ্ঠে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন।

'এক নাম নয়, বহু। আমাদের কেহ বা অভিজিৎ, কেহ প্রবাল, কেহ হামিদ। তবে আজ আমাদের সব নাম বিলুপ্ত। আমাদের একটি মাত্র পরিচয়—আমরা ভারতের জওয়ান, শহীদ।'

শুনিতে শুনিতে বাপুজীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মঞ্চ হইতে তিনি একেবারে দলটির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই দীর্ঘ বাহু দিয়া তাহাদের বুকে টানিয়া লইয়া আবেগ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বারবার বলিতে লাগিলেন, 'সাবাস, সাবাস!'

'কিন্তু বাপুজী, ইহারা তো অহিংস নয়, আপনি,' অস্ফুট কণ্ঠে আপত্তি জানাইলেন অহর।

গান্ধীজী সবেগে অহরের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুই চক্ষে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়া উঠিল। পরক্ষণেই এক আশ্চর্য প্রশান্ত কৌতুকস্নিগ্ধ চক্ষুতে অহরলালের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'অহিংসা কাপুরুষের ধর্ম নয় লাল, বীরের ধর্ম। সারা জীবনেও তুমি সে কথা শিখলে না। এরা বীর। আও, মেরা ভাইয়ো।'

বাপুজী দলটিকে লইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন।

গৌরীশঙ্কর দে

পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে ডিউকের বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রেমিকার চিঠি! এসেছে স্ট্রাসবুর্গ থেকে। জার্মানী আর ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমান্তে এক গ্রামে সে এখন বন্দিনী। তাকে মুক্ত করার জন্য সে আকুল আবেদন জানিয়েছে ডিউকের কাছে।

ডিউক এলফিয়েন সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললেন। মেয়েটির প্রেমে তিনি পাগল। যে করেই হোক তাকে উদ্ধার করতেই হবে। আর তা বোধহয় খুব শক্তও নয়। তরুণীটিকে যারা কয়েদ ক'রে রেখেছে তাদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা গুঁজে দেয়া। বাস্। তাহলেই কর্ম ফতে।

বনের বিজন পথে ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছেন ডিউক। যেন রূপকথার রাজকন্যাকে মুক্ত করতে যাচ্ছে রাজকুমার। অনেক মধুর মুহূর্তের স্মৃতি মনে আসছে থেকে থেকে। প্রেমিকার জন্য দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই। কত উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ।

চারপাশের বন হঠাৎ যেন ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। ডিউক স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন একদল ফরাসী অশ্বারোহী চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি বন্দী।

ডিউকের বিচার হলো। মৃত্যুদণ্ডে তিনি দণ্ডিত হলেন। নিশানা যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য ডিউককে বাধ্য করা হলো লণ্ঠন উঁচু ক'রে ধরতে। আর তারি আলোতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন তিনি।

মৃত্যুর পূর্বে প্রেমিকাকে চিঠি লিখে জানালেন, তাকে উদ্ধার করতে না পেরে তার দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু ডিউক জেনে যেতে পারলেন না যে প্রেমিকার যে চিঠি তিনি পেয়েছিলেন, যে চিঠি তার পক্ষে কাল হয়েছে সেটা জাল, প্রেমিকা তার বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

চিঠিটা জাল করেছিল ম্যালমিস্টার, নেপোলিয়নের গুপ্তচরদের মধ্যে সব চাইতে দুঃসাহসী। ধর্মাধর্ম, রীতিনীতির ধার বিশেষ সে ধারত না। নিজের মতলব হাসিল করার জন্য যে-কোনো অন্যায় কাজ সে করতে পারতো। নেপোলিয়নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তালেরাঁ ম্যালমিস্টার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "এই লোকটির কেবল মগজই আছে, হৃদয় নেই।"

ম্যালমিস্টারের মুখ ছিলো যেন মুখোস। চওড়া কাঁধ এবং বুক। তেমন লম্বা নয়, তবে স্বাস্থ্যবান। অস্ট্রিয়ার রাজসভার কর্মচারী ব'লেই লোকে তাকে জানতো। নারী, শিশু, সেনাপতি এবং সামন্তগণ সকলেরই সে ছিল প্রিয়। ফরাসী আর জার্মান এই দুই ভাষাতেই সে অনর্গল কথা ব'লে যেতে পারতো।

১৮০৪ সালে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের অভিযান তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। তিনি যেন ঘড়ি দেখে অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু ওই অভিযানের কৃতিত্ব সবটুকু নেপোলিয়নের নয়। যবনিকার অন্তরাল থেকে তাঁকে সাহায্য করেছিল স্কালমিস্টার।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধের কিছুদিন আগে স্কালমিস্টার হাজির হলো ভিয়েনাতে। হাঙ্গারীর এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ব'লে নিজের পরিচয় দিলো। ফ্রান্সে সে ছিলো, পরে অস্ট্রিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে নেপোলিয়ন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, ভিয়েনাতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে এই কথাই রটালেন স্কালমিস্টার। আর অস্ট্রিয়াতে যাবার আগেই সে একখানা চিঠি লিখে দিলো অস্ট্রিয়ার সেনাপতি মার্শাল ম্যাক-এর কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট, ফরাসী-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধস্পৃহার জলন্ত চিঠি। এই ধরণের একজন গুপ্তচর পেয়ে মার্শাল ম্যাক তো হাতে আকাশ পেলেন। সেনা বিভাগের সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ১৮০৪ সালে সেনাপতির ব্যক্তিগত গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান রূপে নিযুক্ত হলেন স্কালমিস্টার।

এদিকে স্কালমিস্টার কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর প্রতি মুহূর্তের খবরই ফরাসীরা তার মারফত পাচ্ছে। বদলে স্কালমিস্টার ফরাসী সরকারের কাছ থেকে পেলো প্রচুর অর্থ। অবশ্য সে খরচও করতো দরাজ হাতে।

মার্শাল ম্যাক নির্বোধ ছিলেন না। তবু স্কালমিস্টারের ধূর্ততার কাছে তাকে হার মানতেই হলো। তার কথা শুনে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তিনি বিশ্বাস ক'রে ফেললেন ফ্রান্সে একটা ভয়ংকর রকমের গৃহযুদ্ধ আসন্ন, নেপোলিয়ন সৈন্যবাহিনী রাইন সীমান্তে সরিয়ে নিচ্ছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফল যা হবার তা-ই হলো। তিরিশ হাজার সৈন্যের একটি অস্ট্রীয় বাহিনী ফরাসীদের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হলো।

স্কালমিস্টার কিন্তু তবু ধরা পড়লো না। আবার সে ফিরে গেল ভিয়েনায়। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়া আর রাশিয়ার সামরিক নেতারা স্কালমিস্টারের বক্তব্য এবং প্রস্তাবকেই গুরুত্ব দিলো। তাদের ধারণা হয়েছিলো মার্শাল ম্যাকই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সামরিকভাবে তাঁর পরাবনতিও ঘটলো।

স্কালমিস্টারের পরামর্শ গ্রহণের ফল অস্ট্রিয়া আর রাশিয়া ভালো ক'রেই টের পেলো। অস্টারলিজের প্রান্তরে নেপোলিয়ন আবার একটা বড়ো রকমের যুদ্ধ জিতলেন।

এবার কিন্তু স্কালমিস্টার গ্রেপ্তার হল। বিচারে নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হতো। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসী সৈন্যরা ভিয়েনা শহরে এসে পড়েছিলো। শহর দখল করার পর স্কালমিস্টারকে তারা মুক্ত করে। কেবল নাটকেই এরকম ঘটনা ঘটে।

স্কালমিস্টারের ক্ষমতা সম্পর্কে নেপোলিয়ন সচেতন ছিলেন, তাকে ব্যবহার করেছেন নানা ভাবে, বদলে অর্থ ঢেলেছেন প্রচুর ; তথাপি ফরাসী সম্রাটের মনে কোথায় যেন এই অসাধারণ গুপ্তচরটি সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবও ছিলো। তাই 'লিজিয়ন অব অনার' লাভ স্কালমিস্টারের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। এর জন্য সে কখনো নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ করেনি বরং সম্রাটের কাছ থেকে যা পেয়েছে তার জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করেছে। অনেক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্কালমিস্টারের চরিত্রে একটা জিনিসের অভাব ছিলো : খোসামোদ করতে সে জানতো না। এর জন্যই বোধ হয় ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তার করায়ত্ত হলো না।

———

প্রেম চিরন্তন

মূল : গলওয়ে কিনেল

অনুবাদ : সুপর্ণ রায়

[কবি গলওয়ে কিনেল এর জন্ম ১৯২৭ সালে, রোড আইল্যাণ্ডে। তিন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। শিকাগো বিশ্ব বিদ্যালয়ে বছর চারেক অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে ফুলব্রাইট স্কোলারশিপ নিয়ে প্যারিসে ছিলেন। গদ্য ও কবিতার সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর ছোটগল্পের অবস্থান।]

কাছাকাছি কোনো চেয়ার ছিল না। ডেকের উপরেই শুয়ে প'ড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছি। যে-সব পুরোনো গ্রীক জাহাজ চার কি পাঁচ শ্রেণীর যাত্রী নিয়ে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াত করে এটা তাদেরই একটি। একেবারে নিচের ক্লাসের যাত্রী হ'লে না জুটবে বিছানা, না দেয়া হবে খাবার, শুতে হবে ডেকের উপর, নিজের খাবার নিজেকেই নিয়ে আসতে হবে, জাহাজে সারাটা সময় প্রায় একাই কাটবে।

ডেকের উপর শুয়ে নিজেকে বড়ো অসুস্থ লাগছিল। গত দু সপ্তাহ কেটেছে পোর্ট সৈয়দে। হোটেলের একটা ছোট কামরায় ছিলুম। রাস্তার ওপারে ছিল একটা মদের দোকান, তার দোতলায় একটা নাচ-ঘর। সকালে লেখার চেষ্টা করতুম। কিংবা বিকেলে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় শহরের পথ ধ'রে হাঁটতুম। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যেতুম আরবদের পাড়ায়। আরব দেশের অন্ধকারে বেড়াতে বেড়াতে মনে হতো আমার শাদা চামড়ায় এসে লাগছে চতুর্দিকের প্রাণ:স্পন্দন। এরপরে হাজির হতুম নাচঘরে। না, তার আগে মদের দোকানে ঢুকে একটু পান ক'রে নিতুম। পোর্ট সৈয়দে ওটাই ছিল একমাত্র দোকান যেখানে সব-রকম মদ পাওয়া যেতো। নাচ-ঘরটা আসলে ছিল একটা নাইট ক্লাব। সেখানে ঢুকে একটা মেয়ে জুটিয়ে নিতুম। রাস্তার অন্ধকারে হোটেলে এসে আমরা কান পেতে শুনতুম একঘেয়ে সংগীত। লালসার সঙ্গে বিষাদ মিশে তাই যেন বাতাসে ভেসে-ভেসে ছুটে আসতো আমাদের দিকে। পোর্ট সৈয়দের মতো নারকীয় জায়গা দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ডেকের উপরে শুয়ে আধ-খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছিলুম নীল আকাশ, শুনতে পাচ্ছিলুম সিন্ধু-সারসের কান্না। কিন্তু তা যে সিন্ধু-সারসের তা কি আমি নিশ্চিত জানি? ভূমধ্যসাগরের জল কেটে একটা গ্রীক জাহাজ চলেছে; আর আমি তার একেবারে নিচের তলার যাত্রী মানে ডেকের জায়গায় (নামটা আমারি দেয়া) শুয়ে আছি। নিচের কামরার ভিতর থেকে ইঞ্জিনটা চাপা গর্জন করছে। সিগ্রেট ধরালুম মুখে ধোঁয়া আর উত্তাপ লাগছে। জাহাজের ডেকের মতোই তা কড়া।

জাহাজটা যাচ্ছে বৈরাটের দিকে। তারপর যে কোথায় যাচ্ছি নিজেই জানি না। হয়তো চলতেই থাকবো। ক্রমেই জনহীন জায়গা এসে পড়ছিল। যেন আমি ইচ্ছা করেই বিস্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে যেতে চলেছি, আর কেবল তা জানার জন্যই এখনো বেঁচে রয়েছি। পৃথিবীর যে স্বল্প-সংখ্যক লোক আমাকে চেনে আমি চাই তারাও আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাক। ছ'মাস হলো কারো সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রের যোগাযোগই নেই। কোথায় আছি কেউ জানে না। তবে, আমার বাড়ির লোকেরা বোধহয় জানে যে আমি এখনো জীবিত, কারণ আমার ম'রে যাওয়ার খবর তো তারা এখনো পায়নি। তাদের আগেই আমি মারা যাবো। আর তাইতো যাচ্ছি।

ঝলমলে রোদে ডেকের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভূমধ্যসাগরের পূব-প্রান্ত ঘেঁষে জাহাজ যাচ্ছে পূবের দিকে। ক'ঘণ্টা ধ'রে ছেঁড়া অনেক স্বপ্ন দেখলুম। মডিগ্লিয়ানির আঁকা ছবির মেয়ের মতো একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলুম—অদ্ভুত দীর্ঘকায় একটি মেয়ে। লম্বা সরু মাথা, সরু নাক, সরু ঘাড়, সরু কাঁধ। স্বপ্নের ভিতরে তার বড়ো-বড়ো চোখ যেন আমাকে বলছিল: "আমার সর্বনাশ করো না।" স্বপ্নটা আমার হুবহু মনে আছে এই কারণে যে আমি উঠে পড়েছিলুম এই বলতে বলতে: "না, তা আমি করবো না, তোমার ভয় নেই।" আমি জানতুম মিথ্যা কথা বলছি। সুযোগ পেলে সর্বনাশ না ক'রে ছাড়তুম না।

স্বপ্ন থেকে জেগে চারদিকে তাকালুম। একেবারে নিচের ক্লাসের যাত্রী সংখ্যায় খুব কমই ছিল। রাজনৈতিক কারণে মিশর থেকে বিতাড়িত লেবাননবাসী কিছু লোক, কিছু হতভাগা আরব। আগুন জেলে তার চারদিকে ওরা গোল হয়ে বসেছিল। আগুনের উপরকার পাত্রের ভিতরে কফি। আমাকে জাগতে দেখে ওরা এক কাপ কফি এগিয়ে দিলো। আমার সঙ্গে তেমন টাকা-কড়ি নেই। সঙ্গে খাবার আনতেও ভুলে গেছি। কতক্ষণই বা জাহাজে থাকবো। মাস্তুলের উপরে লেবাননবাসী ক'টির দারুণ রাগ; কারণ বিষয়-আশয় সবই তারা ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জন্য মনে সহানুভূতি জাগলো। কফির জন্য ওদের ধন্যবাদ জানালুম।

রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। তাকালুম জলের দিকে। ঘনত্বাণ অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার হ'য়ে আসছে। সিন্ধু-সারসেরা নিঃশব্দে আমাদের জাহাজের পিছে-পিছে আসছে। জল শান্ত। কেবল এঞ্জিনের শব্দ।

আবার নিজেকে অসুস্থ মনে হলো। হাঁটু ভেঙে আসছে। রেলিংয়ের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। মনে পড়লো ছেলেবেলায় খুব অসুস্থ ছিলুম। অসুস্থ থাকতেই যেন ভালো লাগতো। আর কখনো অসুস্থ হবো না, তবু যেন চিরকাল অসুস্থ থাকবো। ভাণ করবো আমি অসুস্থ নই, রোগের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টা করবো। রেলিংয়ের গায়ে ভর দিয়ে অন্ধকার জলের দিকে তাকালুম। মাথার ভিতরটা কেমন ঝাপসা লাগছিল। মনে হলো মাথা ঘুরে এক্ষুনি প'ড়ে যাবো।

একেবারে হঠাৎ যেন রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। এখনো মাথা ঘুরছে, তবু আস্তে আস্তে সব আবার স্থির হয়ে আসছে। আগেও এ-রকম বহুবার হয়েছে। ফ্রেমিং বরাবর তাকিয়ে দেখলুম নীল রঙের অদ্ভুত পোশাক আর টুপি পরে আমার দিকেই একজন মহিলা আসছে। ভ্যালেন্টাইনের আকারে কাটা একখণ্ড লাল ভেলভেট, অবিকল হৃদয়ের মতো, তার বুকের উপর।

তার মুখখানা লম্বাটে। যেমন স্বপ্নে দেখেছি। য়ুরোপীয় মেয়েদের মতো তার গায়ের রং লালচে। যেন বেশির ভাগ সময় সে বাড়িতেই কাটায়। তার চোখের তারা পেন্সিলের তীক্ষ্ণ ডগার মতো।

সে বলে উঠলো: "আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

বললুম: "না তা নয়। শুধু সাময়িক একটু মাথা ঘুরছিল। সমুদ্রের উঠানামার জন্য। সমুদ্রে এলেই আমার এ-রকম হয়।"

মেয়েটি বললো: "আসুন, তাহলে আমরা বসি।" যে সর্বনামটি সে উচ্চারণ করলো তাতে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেলো। আগের চাইতেও ঠাণ্ডা লাগছিল, অসুস্থ বোধ করছিলুম।

"কোথায় যাচ্ছেন?" মেয়েটি শুধালো।

বললুম: "দূরে।" আর কিছু বলা হলো না।

"কোথা থেকে এসেছেন?"

বললুম: "ইলিনসিস থেকে।" অদ্ভুত শোনালো নামটা। ইলিনসিস থেকে আবার কোনো লোক আসতে পারে নাকি?

জিগেস করলুম: "আপনি?"

"আমি প্রথমে বৈরাটে যাবো, তারপর যাবো পাহাড়ের উপরে আমাদের গ্রামে। আমি যীশুর একজন সেবিকা। লেবাননের ছোট একটা গ্রামে কৃষকদের মধ্যে থাকি। আমি এসেছি ফ্রান্সের সাভয় থেকে। সেখানেও আছে পাহাড়।"

জিগেস করলুম: "কেন পাহাড়ে যাচ্ছেন? পৃথিবী আপনার অস্তিত্ব ভুলে যাবে এই আশায়?

"না, তা নয়। হয়তো তাই। আমি চাই অর্ধেক জগৎ আমার অস্তিত্ব ভুলে যাক। বাকি অর্ধেক পৃথিবীকে আমি সেবা করতে চাই।"

"আমারও তা-ই ইচ্ছা। তবে আপনার মতো আমার সামনে বাকি অর্ধেক জগৎ বলে কিছু নেই। যা অর্ধেক আছে তা-ই আমার কাছে সব।" বলতে বলতে ভাবছিলুম মেয়েটি কী সুন্দর। জিগেস করলুম: "কেন সেবিকা হতে গেলেন? আপনি এত সুন্দর! আপনার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা ক'রে ছিল এক উজ্জ্বল জগৎ। তাই না কি?"

আমার দিকে তাকিয়ে সে খানিক থেকেও ইতস্তত: ক'রে ব'লে উঠলো:

"আপনিও তো সুন্দর। তবু কি পৃথিবীতে উজ্জ্বল জীবন ভোগ করতে পেরেছেন? সেবা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমি সেবিকার ব্রত গ্রহণ করেছি। মনে হয়েছিল মানব-সভ্যতার কাছ থেকে এই একটি জিনিসই শুধু আমার চাওয়ার আছে। অনেকে জন্ম থেকে কেবল নিজেদেরই বিশ্বস্ত আর সুখী করার জন্য ব্যস্ত থাকে। ছলে-বলে-কৌশলে। আর, অনেকে পৃথিবীতে আসে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে। আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিসে; কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় উপকরণ ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও উপভোগের মন পেলুম না। নিজেকে ওখানে অপরাধী মনে হতো, সব চাইতে নিচু আর সর্বস্তরের মানুষের চাইতেও হীন মনে হতো নিজেকে। আমার মনে মানুষকে সেবা করার ইচ্ছা। কিন্তু প্যারিসে তার সুযোগ কোথায়! আপনার জীবনেও কি এ-রকমই ঘটেছে?"

বললুম: "অনেকটা তাই।" আরো ব্যাখ্যা ক'রে বলবো কি না ভাবছিলুম কিন্তু দেখলুম সে ঠিক বুঝে নিয়েছে। চারদিক তখন অন্ধকার ক'রে এসেছিল।

আমার হাতে হাত রেখে মহিলাটি বললো: "বন্ধু, এবার আমাদের ঘুমোতে যাওয়া উচিত।"

ধীরে ধীরে উঠে সে চ'লে গেলো। এতক্ষণ দুজনে মিলে যে-সব কথা বলেছি তা মনে পড়তে লাগলো। মনে হলো মানুষের সেবা করার ক্ষমতা আমারো আছে। শেষ জীবনে প্রজ্ঞা সাহের দৃষ্টান্ত তো ইতিহাসে অনেক রয়েছে।

একটু প'রেই কানে এলো সেবাননবাসীদের সঙ্গে পেটি-র কথাবার্তা। মেয়েটি বলছে, ডেকের নিচেকার লোকটি একখানা কম্বলও দিতে রাজী হচ্ছে না; এমনকি শিশুদের জন্যও নয়। আমি বলটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম তাদের ভিতরে দু'টি শিশু রয়েছে। কোট ছাড়া তাদের গায়ে আর কিছু নেই; রাত্রির ঠাণ্ডাটাও ক্রমশ: কনকনে হয়ে উঠছে। মেয়েটি কী ভালো! শিশু দুটির জন্য সে কম্বল চাইতে গিয়েছিল নিচে। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে; তবু মেয়েটি কী বিনীত। আমি তো অত বিনয়ী নই; আমি একবার নিচে যাবো। আমি বলটির পাশ দিয়ে সেই ঘিঞ্জি জায়গাটায় নেমে গেলুম। সব চাইতে নিচু শ্রেণীর যাত্রীরা ওখানে ব'সেই খাওয়া-দাওয়া করে। কর্মচারীটিকে দেখতে পেয়ে বললুম: "শুনুন, উপরে দুটি শিশু রয়েছে। এই ঠাণ্ডা রাত। ওদের গায়ে দেবার মতো একখানাও কম্বল নেই। ওদের জন্যে আমি খান দুই কম্বল চাই।"

লোকটা জবাব দিলো: "তা তো সম্ভব নয়। আইনের বিরুদ্ধে ও-কাজ আমি করতে পারবো না। কম্বল গায়ে দেবার অতই যদি সখ, তবে বাপু এমন খোলামেলা জায়গায় টিকেট কিনে বেড়ানো কেন?"

বললুম: "দেখুন, আমি আইন কাইনের ধার ধারি না। দুখানা কম্বল চাই, ব্যস্।"

"বেশ....."

"আরেকটা কথা। উপরে একজন সন্ন্যাসিনী আছেন। তারো কোনো কম্বল নেই। তার জন্যও একখানা কম্বল চাই।"

"বেশ....."

"মোট তিনখানা কম্বল দিয়ে প্রমাণ করুন যে আপনি লোক ভালো।"

"এটা তো নিয়ম-বিরুদ্ধ। তবু আপনাকে তিনখানা কম্বল আমি দেবো।"

কম্বলগুলো হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বেশ মজা লাগছিল। খানিকটা গর্বও বোধ করছিলুম। কী করেছি? সামান্য অর্থের বিনিময়ে নারী-দেহ চাইবার কালে কিংবা অন্য সময়ে যে রকম মাঝে-মাঝে ঘিন ঘিন ভাইতো করেছি। তবু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে এখন একটু গর্বিতই বোধ করলুম। কিন্তু তা যেন কিসের প্রত্যাশায়। পেটি-র সামনে কম্বলগুলি রেখে এবং তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে (কী ক'রে ও-গুলি সংগ্রহ করেছি তা তো সে অনুমান করতে

পারে নি) আমি অদ্ভুত খুশি হয়ে উঠেছিলুম। তবে খুশিটা একটু সস্তা বলেই মনে হচ্ছিল। একেই বলে মানুষের সেবা ? হবে।

সকলের কাছ থেকে স'রে এসে কুণ্ডলী-করে-রাখা তুলাকার দড়ির পেছনে শুয়ে পড়লুম। সীমাহীন আকাশে ছায়াপথের তারাগুলি যেন দীর্ঘ মৃণালে বাঁধা কেবল এঞ্জিনের গোঙানি ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ চোখ খুলে রেখে মেটি-র কথাগুলি মনে আনবার চেষ্টা করলুম। 'সেবা' কথাটা মনে-মনে বারবার আওড়ালুম। শেষে মনে হলো ওই শব্দটার যেন অন্ততঃ বিশটি অর্থ আছে। তবে, চিন্তা করার ক্ষমতা বোধহয় আমার তেমন নেই ; তাই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ঘুমের ভিতরে আমার কাঁধ আর ঘাড় থেকে কোটটা খুলে গিয়ে থাকবে। হঠাৎ অস্পষ্ট ভাবে টের পেলুম কে যেন কোটটা টেনে আবার ঠিক ক'রে দিচ্ছে। চোখ খুলে দেখি মেটি। সে চলে যাচ্ছিল। আমি তার হাত মুঠিতে নিয়ে তাকে ধ'রে রাখলুম। জানতুম আর আমার পরিবর্তন হবে না, জানতুম যদিও আমরা একই বন্দরে গিয়ে নামবো তবু আমরা যাচ্ছি ভিন্ন দুটি দেশে, জানতুম এর পরে আর কোনোদিন এ-রকম একজনের হাত ধ'রে রাখার সুযোগ পাবো না। আমাদের এতই ব্যবধান।

বললুম : "আমরা একে অন্যের কত কাছাকাছি।"

"সত্যি।"

"তবু কত ভিন্ন।"

"তাও সত্যি।"

আমি তাকে দড়ির স্তূপের উপরে এমনভাবে টেনে আনলুম যে আমার পাশে সে ব'সে পড়তে বাধ্য হলো। যাকে পেছনে ফেলে আমরা চলে যাচ্ছি, পশ্চিমের সেই অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। প্রান্তর, ইলিনয়িস সব প'ড়ে থাকলো পিছে, ক্ষতি কী ! তার চাইতে তাকালো সেই অন্ধকারের দিকে যার দিকে আমরা ছুটে চলেছি।

"জীবনে যা হয়েছো তার জন্য কি মাঝে-মাঝে তোমার অনুতাপ হয় ?"

মেয়েটি বললো : "মোটেই না। অনুতাপ কিংবা বিষণ্ণতা কখনোই বোধ করিনি। তবে এই মুহূর্তে বোধ করছি। হয়তো এখন একটু বিষণ্ণও লাগছে। না, ঠিক বিষণ্ণ নয়। একটুও বিষণ্ণ নয়। এই মুহূর্তেও নয়।" হঠাৎ গলায় খুশির ভাব এনে সে বললো : "ও কেবল একমুহূর্তের ব্যাপার।"

বললুম : "বুঝেছি। আগে কখনো পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। মনে হলো ওই একটি মুহূর্তে যেন সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছি। সেই অনুভবটুকু এখন, অবশ্য আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।" বললুম : "জাহাজের গতি অনুভব করো। আমাদের চোখে যাদের স্থির মনে হচ্ছে সেই তারাদের গতি অনুভব করো, কান পেতে রাখো আমাদের চতুর্দিকে ধাবমান অন্ধকারের দিকে……"

আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। অন্য কোনো দেশে এর মধ্যেই কি তার মন উধাও হয়েছে ?

কিন্তু আমার ভাববার ছেদ টেনে সে বলে উঠলো : "আমরা তো দুজন দুজনকে ভালোবাসি, তাই না ? আর প্রেম, সে তো চিরন্তন।"

মার্কটোয়েন

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

[১৩০৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় (সম্পাদক) সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্ত লেখাটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমযোগী সাহিত্য নামক বিভাগে বহু বিদেশী পত্রিকা থেকে নানা চিত্তাকর্ষক বিষয় আহরণ করে বাঙালী পাঠকদের পরিবেশন করতেন। পাঠকদের ভাল লাগলে এই রকম আরও কয়েকটি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য রচনা পরিবেশন করবে।]

গত জুলাই মাসের 'ক্যাসলস্ ম্যাগাজিনে' মিষ্টার নয়খ্‌প্‌ 'মার্কটোয়েনের সহিত এক দিবস' নাম দিয়া একটি মনোজ্ঞ গল্প অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গল্পের পরিহাস রসিকের শৈশব-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম সামুয়েল ক্লেমেন্স। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। যখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর, তখন একবার তাঁহার পিতা হানিবল নামক স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করিবার সময় শিশুর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব আবাসে ফেলিয়া যান। শিশু তখন উদ্যানে কর্দ্দমপিণ্ড নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিল। অল্পক্ষণের পর অনেক আত্মীয় শিশুকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে পথে পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। বাল্যকালে দুর্বল ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে শিক্ষা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করিত না। ঐ সময়ে তাঁহার একটি কু-অভ্যাস ছিল—স্বপ্নসঞ্চরণ। বালক ঘুমের ঘোরে উঠিয়া বেড়াইত। ১০ বৎসর বয়সের পূর্বে মার্কটোয়েন নয়বার প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটাতে বালককে তাঁহার ভ্রাতার আফিসে কাজকর্ম শিখিতে হয়। ভ্রাতা পল্লীগ্রামে একখানি সংবাদপত্রের পরিচালন করিতেন। সেইপত্রে বালকের রহস্যচর্চায় "হাতেখড়ি" হয়। মুদ্রাকর বালক হইতে তিনি একবার সপ্তাহকালের জন্য সম্পাদকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর, তখন একবার তিনি ফিলাডেলফিয়ায় পালাইয়া গিয়া 'লেজার' পত্রের মুদ্রণে নিযুক্ত হন। তারপর সাত বৎসর মিসিসিপিতে পাইলটের কাজ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রায় ১৪০০ মাইলের মধ্যে প্রত্যেক স্থল তাঁহার নখদর্পণে ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে দাসপ্রথা লইয়া যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি পাঁচ সপ্তাহ কাল দক্ষিণ বিভাগের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন।

একখানি শকটযোগে তিনি আমেরিকা-ভ্রমণে বাহির হন। ঐ যাত্রায় তিনি তাঁহার Roughing it-এর উপাদান সংগ্রহ করেন। নেভাডায় অবস্থানকালে তরুণ ক্লেমেন্স স্থানীয় Enterprise পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র ডাচিনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। ঐ সময়ে তাঁহার রচনাবলী Josh এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার M. Twain এই নামে বাহির হইতে থাকে। এই নাম মিসিসিপিতে পাইলটদিগের ব্যবহৃত জল মাপিবার সঙ্কেত হইতে উদ্ভূত। পরিমাণরজ্জুর চিহ্নযুক্তস্থানী জলের গভীরতা কোথাও চার 'বাম' কোথাও দুই 'বাম'। M. Twain অর্থাৎ দুই 'বাম' এই সঙ্কেত কিঞ্চিৎ বিচিত্র ও সুমিষ্ট বলিয়া লেখক উহা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সাহিত্য রচনায় চিরপ্রসিদ্ধি করিয়াছেন।

কিছুকাল খনির ব্যবসায় করিবার পর তিনি দুই বৎসর Enterprise-এর সম্পাদন কার্য্য করেন। পরে ২৯ বৎসর বয়সে সান ফ্রান্সিস্কোর 'Call'-এর সংবাদদাতা হইয়া যান। অনতিকাল পরেই স্যাণ্ডউইচ, দ্বীপে গিয়া তথায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার একখানি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক য়ুরোপ-পর্য্যটক দলের নেতৃত্বে বৃত হইয়া য়ুরোপে গমন করেন। ঐ ভ্রমণের ফল তাঁহার Innocent abroad নামক গ্রন্থ। এই পুস্তকখানি প্রায় ১০০০০০০ দশ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছিল। তিনি শ্বশুরের নিকট একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একখানি লাভজনক পত্রিকার তৃতীয়াংশ লাভ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মূলধন সাহায্যে তিনি ওয়েবষ্টার কোম্পানী নামে পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতি হইল, এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনেকেই তাঁহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া পাওনাদারদিগের সহিত একটা রফা করিতে বলিলেন। এত অধিক বয়সে অন্য কোনও লেখককে এমন গুরুতর দায়ে পড়িতে হয় নাই। যে ঋণভার তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে নিজ স্কন্ধ হইতে অপসৃত করিতে পারিতেন, তিনি তাহারই পরিশোধার্থ নিজের মস্তিষ্ক বাঁধা দিলেন। ফলতঃ, দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে আবার সাহিত্য শ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

সারাঙ্কা হ্রদের দক্ষিণ উপকূলে তটপ্রান্তেই একখানি পল্লীকুটীরে এই সুবিখ্যাত রহস্য-নিপুণের বাস। হ্রদটি আমেরিকার হ্রদ সমুদয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সমধিক খ্যাত। তিনি ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে চাহিতেন না। কদাচিৎ পরিবারবর্গের সহিত হ্রদবক্ষে নৌকাবিহারে বাহির হইতেন। প্রায় সর্ব্বদাই শৈলমধ্যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেন না।

লোকালয় হইতে সুদূরে অবস্থিত ও কৌতূহলী পথিকবর্গের পক্ষে দুর্গম বলিয়া তিনি ঐ নিভৃত স্থানটি মনোনীত করেন। গৃহের উত্তরাংশে হ্রদের আরও নিকটে তামবিদ্ধ ছায়াতটে মার্কটোয়েন নিজের জন্য একটি নিভৃত আশ্রম নির্ম্মিত করিয়াছেন। সেখানে একটি টেবিল ও একখানি চেয়ার ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই ক্ষুদ্র আশ্রমে একান্ত নিভৃতে মার্কটোয়েন যাবতীয় গ্রন্থের রচনা করেন। সাধারণতঃ তিনি একদিনে প্রায় ২০০০ শব্দ লিখিতে পারেন। কখনও কখনও উহার সংখ্যা ৩০০০ পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু সে কদাচিৎ। লিখনকার্য্যে তিনি হংসপুচ্ছ ব্যবহার করেন। টাইপরাইটার যন্ত্র তিনি দেখিতে পারেন না। প্রতিদিন প্রাতে ১০টার সময় তাঁহার নিভৃত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দৈনিক

কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার দৈনিক কার্য্য অনেকটা আফিসের কার্য্যের মত। কোনও দিন কোনও কারণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দৈনিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে না। ৫।৭ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তিনি দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন।

হার্টফোর্ড নামক স্থানে তাঁহার একটি শীতাবাস আছে। যখন তিনি এখানে বাস করেন সপ্তাহে একদিন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বড় অল্প নহে। বিলিয়ার্ড তাঁহার বড় প্রিয়। ইহাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। কিছু দিন পূর্বে বিচক্রযানে ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহাতে আর তাঁহার অনুরাগ নাই। তাম্রকূটে তাঁহার একান্ত অনুরাগ। দৈনিক কুড়িটি চুরুটের কমে তাঁহার চলে না। ব্রাউনিং তাঁহার প্রিয় কবি, এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁহার প্রিয়।

মার্কটোয়েনের রসিকতার একটি নমুনা :

ভদ্রলোকের ঘরে বইয়ের সংগ্রহ দেখে আগন্তুকের তো চক্ষু স্থির। যে-দিকে তাকান শুধু বই আর বই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। তিনি বললেন : এই জ্ঞান-ভাণ্ডারে আপনার বাস। নিশ্চয়ই আপনি সুপণ্ডিত ও সাহিত্য-রসিক। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা না ব'লে পারলুম না। এত সব মূল্যবান বই ; অথচ তার এত অযত্ন। ভালো ক'রে আলমারীতে সব সাজিয়ে রাখেন না কেন ?

গৃহস্বামী মুচকি হেসে জবাব দিলেন : মশাই, বই হাতড়াবো ঢের সোজা, আলমারী…"

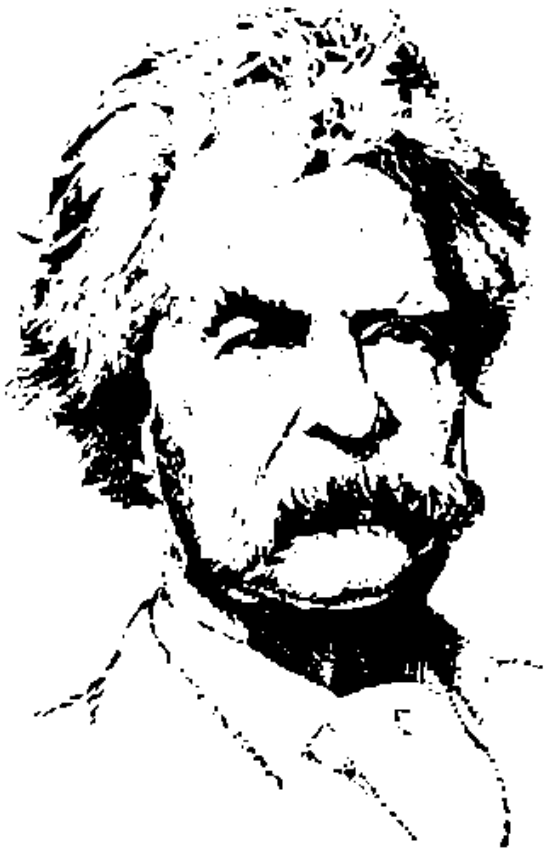

মার্ক টোয়েন কলকাতায়

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসরচনাকার মার্ক টোয়েন কলকাতায় এসেছেন—আজকের দিনে যদি এই খবর প্রচারিত হত তাহলে সারা শহরে যে তুমুল হৈ চৈ পড়ে যেত, খুব সম্ভ্রান্ত, বিদগ্ধ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষাব্রতী এবং সেই সঙ্গে ফ্যাশনেবল সমাজেও যে বিপুল ঔৎসুক্য এবং কৌতূহলের সৃষ্টি হত তাতে আর সন্দেহ নেই।

মার্ক টোয়েন-এর ইংরেজী বই এবং তাঁর অনেকগুলি বইয়ের বাংলা অনুবাদ এদেশে আজ বিশেষ জনপ্রিয়।

তাই তিনি যদি আজ এই শহরে আসতেন তাহলে নিশ্চয়ই বিপুল অভ্যর্থনা এবং বিশেষ মান-অভ্যর্থনা পেতেন।

মার্ক টোয়েনের লেখার সঙ্গে এদেশের পাঠক পরিচিত। কিন্তু সেইসব পাঠকরা বোধকরি প্রায় কেউই জানেন না যে, মার্ক টোয়েন একদা সত্যিই এই শহর কলকাতায় শুভাগমন করেছিলেন।

তারিখটি হচ্ছে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬, শুক্রবার।

সেই সময় ভারতভ্রমণে এসেছিলেন তিনি। এসেছিলেন কতকটা নিজের গরজে। টাকা সংগ্রহ করতে।

জীবজন্তুর ব্যবসা করে তিনি প্রায় হেউলে হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ৬০ বছর বয়েসে তিনি টাকার ধান্ধায় বিশ্বভ্রমণে বেরুলেন। এই ভ্রমণের তিনি নিজেই নামকরণ করেছিলেন—"বক্তৃতাসফর"। অর্থাৎ তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মার্ক টোয়েন-এর আসল নাম, স্যামুয়েল লাংহর্ন ক্লেমেন্স (১৮৩৫—১৯১০)।

তাঁর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন এখানকার এক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা, আর. এস. আইথ। সাকা লোক ছিলেন তিনি। এখানকার আয়োজন ভালই হয়েছিল। ষ্টেটসম্যান দিনের পর দিন প্রচুর প্রশংসাবাক্য উদ্গীরণ করেছিল। ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ এবং ইংলিশম্যানও কম যায়নি।

FIRST APPEARANCE IN CALCUTTA
FIRST APPEARANCE IN CALCUTTA

OF THE

GREATEST HUMORIST OF THE AGE.

The Author of "The Innocents Abroad"

MARK TWAIN
MARK TWAIN
MARK TWAIN
MARK TWAIN

WHO BEGINNING

Next Monday afternoon at 5-30
AND ON WEDNESDAY AND THURSDAY

IN THE

THEATRE ROYAL

WILL GIVE

THREE MARK TWAIN "AT HOMES."
THREE MARK TWAIN "AT HOMES."
THREE MARK TWAIN "AT HOMES."
THREE MARK TWAIN "AT HOMES."

BEING THREE

Entirely different Entertainments.
Entirely different Entertainments.

FURTHER PARTICULARS TO-MORROW.

ADMISSION—Reserved Rs. 4.
PLAN at T. E. BEVAN & Co.'s where tickets may be obtained and seats booked.

c3150

থিয়েটার রয়েল নামক বিলাতী নাচঘরে তিনটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১০ই, ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী—প্রতিদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। দর্শনীর হার—বক্স ২৪'০০, সংরক্ষিত আসন ৪'০০ এবং ৩'০০, সাধারণ ২'০০। ১৫ নম্বর ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের বিভান কোম্পানীর দোকান থেকে অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল।

ইংরাজী পত্রিকাগুলির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ তিনদিনই মার্ক টোয়েনকে দেখবার জন্যে এবং তাঁর আলাপচারী শোনবার জন্যে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল।

তিনদিনের তিনটি অনুষ্ঠানেই লেখক, অভিনেতা এবং বক্তা ছিলেন মার্ক টোয়েন একা। ছোট ছোট নানা রসালো এবং হাসির ঘটনা; নিজের জীবনের টুকরো টুকরো মজাদার কাহিনী এবং সেই সঙ্গে নানাধরণের চরিত্রের রঙ-বাহারী বর্ণনা—অনুকরণীয় ভঙ্গিতে বলা তাঁর ওইসব আলাপচারীগুলি ক্ষণে ক্ষণে প্রেক্ষাগারে তুমুল হাসির রোল তুলেছিল এবং পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে দর্শকরা ঘরে ফিরেছিলেন।

ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান এবং ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ, এই তিনটি ইংরাজ মালিকের পত্রিকায় মার্ক টোয়েন সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানা খবর বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়কার প্রতিপত্তিশালী দেশী পত্রিকাগুলি, যথা বেঙ্গলি, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুপেট্রিয়ট এবং ইণ্ডিয়ান মিরর, এই তিনদিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোনো সংবাদই পরিবেশন করেনি।

তার কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্ক টোয়েনের হোটেলের

ঘরে যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল তাতে ঐ "নেটিভ" পত্রিকাগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

উপরন্তু বাঙালী "বাবু"দের সম্বন্ধে সেই সময় নানা বিদ্রূপাত্মক রচনা একাধিক ফিরিঙ্গি কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

মার্ক টোয়েনের কলকাতা-অনুষ্ঠানের ম্যানেজারও ঐ জাতের মানুষ। অতএব তিনি সেইমতই নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই মার্ক টোয়েনকে আবদ্ধ রেখেছিলেন।

তাঁদের বিদ্বেষ বুদ্ধির দোষে মার্ক টোয়েনের মত এতবড় একজন গুণী এই শহর কলকাতায় এসে এদেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে সম্বর্ধনা পাবার সুযোগ পাননি।

পরিশেষে জানানো যেতে পারে, এই শহর কলকাতায় স্বল্প কয়েকদিন অতিবাহনের মধ্যে মার্ক টোয়েন-এর জীবনে একটি করুণ এবং স্মরণীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই শহরের হোটেলে (মার্ক টোয়েনের আস্তানা—কনটিনেন্টাল হোটেল) পঞ্চাশ বছর বাদে একান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তাঁর এক বাল্যসঙ্গিনী এবং প্রণয়িনীর দেখা পেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে নিজের আত্মজীবনীতে সেই সাক্ষাৎ-এর বিবরণ তিনি অতি করুণ কোমল কাব্যময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

যে ছিল সেদিন ফুটন্ত গোলাপের মত উৎফুল্ল যৌবনা তরুণী, কলকাতায় তিনি তাঁকে দেখলেন শীর্ণ পক্বকেশী বিধবা।

দুজনে সেদিন একসঙ্গে বহুক্ষণ অতিবাহিত করেছিলেন। মার্ক টোয়েন তাঁর বাল্যসখীর কাছে মনকে উজাড় করে দিয়েছিলেন সেদিন সেই শীতশেষের করুণ মধুর অপরাহ্নে।

"অতীতকালের শক্তিধারিনী স্মৃতিসুরায় আমরা দুজনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিলাম—যে অতীত ছিল আমাদের কাছে অতি সুন্দর, অতি করুণ, অতি সুখের এবং অতি দুঃখের। আমরা সেইসব নাম স্মরণ করে উচ্চারণ করতে লাগলাম যেগুলি গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের ঠোঁটের মধ্যে নীরব হয়ে ছিল। সেইসব নামগুলি যেন এখন সঙ্গীতের মত শোনাল আমাদের কানে। শ্রদ্ধা-সিক্ত হাতে আমরা আমাদের কিশোর দিনের সাথীদের কবর থেকে তুললাম, তাদের উদ্দেশে আমাদের প্রাণের ভালবাসার কথা শুনিয়ে তাদের আদর করলাম। আমাদের স্মরণের মণিকোঠার ধূলিধূসরিত প্রকোষ্ঠগুলি অন্বেষণ করে আবিষ্কার করলাম অনেক ঘটনা, অনেক নষ্টামি ও বোকামির স্মৃতি, তাদের স্মরণ করে আমরা দুজনে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম।"

এই অতুলনীয় স্মৃতি-চারণের উৎপত্তিস্থল হিসেবে শহর কলকাতা গর্ববোধ করতে পারে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ঝড় আসন্ন, ১৯১৪

বই-পত্র লেখা হয়েছে অনেক ; তবু, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ নিয়ে বিতর্কের অবসান আজো হয়নি। ২৮শে জুন তারিখে সেরাজেভোতে যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ডের হত্যা আর আগষ্ট মাসের গোড়াতে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত—এই দুয়ের মধ্যবর্তী উৎকণ্ঠার সময়টিতে কূটনৈতিক যে-সব চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়েছিলো তা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে যেন জটিলতার অরণ্যে হারিয়ে যেতে হয়। তখনকার সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল আর কাগজ-পত্রই অবশ্য এখন ছাপার অক্ষরে পাওয়া যাচ্ছে। য়ুরোপের প্রধান-প্রধান দেশগুলি এই বিষয়ে কোনো ত্রুটি রাখে নি। তবু এখনো অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ কী তা স্পষ্ট ক'রে বলা, এ বিষয়ে একমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, কখনোই সম্ভব হবে না। এফ. এইচ. হিন্সলে বলেন, যুদ্ধের জন্য কে দায়ী তা নির্ণয় করার জন্য কাগজ-পত্র ঘাঁটবার প্রয়োজন নেই ; নিরপেক্ষ বিচারে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয় : সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পরিস্থিতি চ'লে গিয়েছিলো সরকারের, মানুষের হাতের বাইরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জার্মানীতে অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে। তবে বাইরের দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। লুইগি আ্যালবার্টিনি-র লেখা এবং তিনখণ্ডে প্রকাশিত 'দি অরিজিনস অব দি ওয়ার অব নাইন্টিন ফোরটিন' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এই বইখানিকে প্রামাণ্য ব'লে ধরা হয়। অবশ্য কয়েকজন জার্মান ঐতিহাসিক তাঁর বইটিকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। তা ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ঘটনাগুলি ঐতিহাসিকের কাছে যেন আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

• • • •

১৯৬১ সালে অধ্যাপক ফ্রিৎস ফিশার প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ বিষয়ে নতুন ক'রে বিতর্কের সূত্রপাত করলেন। তাঁর বইতে দেখালেন যুদ্ধের সময় জার্মানী সমগ্র য়ুরোপের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো। মধ্য প্রাচ্য আর মধ্য আফ্রিকার দিকেও তার নজর পড়েছিলো। ঔপনিবেশ নীতি ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই তার এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মধ্য প্রাচ্য আর বল্কান এলাকার সুবিধা করতে না পেরেই জার্মানী য়ুরোপখণ্ডে লড়াই বাধিয়ে নিজেকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত করতে চেষ্টা করে।

ফ্রিৎস ফিশার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য মূলত জার্মানীকেই দায়ী করেছেন। তাঁর এই মতবাদ আরো জোরালো ভাবে উপস্থিত করেছেন তাঁর ছাত্র ডাক্তার ইমানুয়েল গীস। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা নিতে গেলে ডাক্তার গীস-এর বই অপরিহার্য। দুই খণ্ডে বইখানি প্রকাশিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর কতটা দায়িত্ব ছিলো ডাক্তার গীস তা নতুন ক'রে বিচারের চেষ্টা করেছেন। এই ঐতিহাসিক বিচারের উপর জার্মানীর ভবিষ্যৎ জাতীয় নীতিও অনেকখানি নির্ভর করবে। কারণ অতীত সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝতে সাহায্য করে।

আমি স্বীকার করছি

বরুরুচি

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যা।

ঘাটশীলায় সুবর্ণরেখার অদূরে সুরম্য বাংলো 'মলয়াবাসের' প্রশস্ত বারান্দায় গৃহস্বামী চন্দ্রনাথ আর তাঁর আধাল্য সুহৃদ দেবেন্দ্রশঙ্কর বসে আলাপ করছেন। দু'জনেরই বয়স ষাট পেরিয়েছে। দু'জনেই সংসারের কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন।

আমোদপ্রিয় এবং বিলাসী বলে কৃতী ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথের একদা খুবই খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেই সৌখিন মানুষটিকে আজ যেন আর চেনাই যায় না। আজ তিনি একান্ত নিরাসক্ত উদাসীন। গত বছর তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মলয়া এইখানেই এই সুবর্ণরেখার তীরে ইহলীলা সম্বরণ করেছে। সেই অবধি চন্দ্রনাথ এখান থেকে আর অন্য কোথাও যাননি। কলকাতার তাঁর ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি ভোগ করছে তাঁর ভাইপোরা। চন্দ্রনাথ নিঃসন্তান।

চন্দ্রনাথের শুষ্ক সমাহিত জীবন একমাত্র যাঁর সাহচর্যে আজো উত্তপ্ত এবং রসসিক্ত হয়, তিনি তাঁর আজন্মের বন্ধু দেবেন্দ্রশঙ্কর।

অকৃতদার দেবেন্দ্রশঙ্করের সংসারে কোন বন্ধনই নেই। আইন ব্যবসা থেকে বহুদিন অবসর নিয়েছেন। সহরতলীর একাংশে প্রকাণ্ড বাড়ী। সেখানে একাকী যখন ভাল লাগে না তখন চলে আসেন বন্ধুর কাছে ঘাটশীলায়।

দূরে বিসর্জনের বাজনা। দুই বন্ধু কথা শেষ ক'রে নীরবে বসে আছেন। দু'জনেই রোমকরি অতীত স্মৃতির রোমাঞ্চে আন্দোলিত। দু'জনেরই মনে এইক্ষণে যার স্মৃতি ভেসে উঠেছে সে আজ ঠিক একবছর আগে তাঁদের ছেড়ে গেছে।

ক্ষণেক পরে দেবেন্দ্রশঙ্কর বললেন—এই সময় মনে পড়ছে মলয়ার কথা। তোমার কলকাতার বাড়ীর সামনে দিয়ে চৌধুরীদের প্রতিমা বিসর্জনের দল এই সময় ফিরতো আর তার পরেই মলয়া এসে আমাদের মিষ্টিমুখ করাতো। এই দিনটিকে কোনদিন ভুলবো না।

মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে চন্দ্রনাথ বললেন—আজকের দিনটিই যে আবার তার জন্মদিনও ছিল। তাই বছরের এই দিনটিকে সে সবদিক দিয়ে সার্থক করে তুলতে চাইতো।

গাঢ়স্বরে দেবেন্দ্রশঙ্কর বললেন—আমি তা জানি। তোমাদের জীবনের কোন কথাই তো আমার অজানা নয়। আমি জানি। সব জানি।

শেষের দিকে তাঁর কোমল কণ্ঠস্বর যেন হৃদয়োচ্ছ্বাসে ঈষৎ কেঁপে উঠল।

বন্ধুর প্রসারিত করতলের উপর নিজের ডান হাতখানি রেখে চন্দ্রনাথ বললেন—জানবে বৈকি আমাদের জীবনের কোন কথাই তোমার কাছে গোপন নেই। তোমাকে পেয়েছি মলয়াকে পাবার অনেক আগে থেকেই। তোমার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম আলাপ হয় কলেজের কমন রুমে, সেদিনটির কথা আজো আমার মনে আছে। চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু সেদিনের সেই বন্ধুত্বের বন্ধন আজো অটুট।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। তারপর দেবেন্দ্রশঙ্কর বললেন—গত বছরও মলয়া আজকের দিনে আমার কাছে এসে খানাতল্লা দিয়ি দিয়েছিল। কত কথা হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। সব মনে পড়ছে।

আবিষ্টকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললেন—অনেক তপস্যা করলে তবে মলয়ার মত স্ত্রী পাওয়া যায়। সেবায় যত্নে সে আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আর শুধু কি আমায়? অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি তার আদরযত্ন তাকে সকলের কাছে প্রিয় করেছিল। বিশেষ করে তোমাকে তো সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা করত।

চন্দ্রনাথের কথার শেষটুকু শুনে দেবেন্দ্রশঙ্কর যেন কিছু বিচলিত হলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সহসা আবেগানুভবরে বললেন—চন্দ্রনাথ! আজ তোমাকে আমি একটা কথা জানাতে চাই। সে গোপন কথাটি আমি এতদিন একাই বহন করেছি। কিন্তু মরণের পথে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। তোমার কাছে স্বীকার করে আজ মনের ভার লাঘব করব। তোমায় শুনতে হবে।

শান্তকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললেন—বেশ তো। তুমি বল। আমি শুনবো।

দেবেন্দ্রশঙ্কর অস্থির বোধ করতে লাগলেন। কিভাবে কথাটা শুরু করবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্ষণকাল পরে বললেন—শোন চন্দ্রনাথ। একবার মলয়া আর আমার মধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল যাতে তোমার প্রাণঢালা বন্ধুত্বকে আমি প্রতারিত করতে উদ্যত হয়েছিলাম।

—রহস্য কোরো না শঙ্কর, রহস্য কোরো না।

—রহস্য না বন্ধু। সত্যি।

মুখ তুলে চন্দ্রনাথ বললেন—তুমি কি বলতে চাও মলয়া আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী ছিল? সে ছিল অসতী?

দেবেন্দ্রশঙ্কর মাথা ঝাঁকিয়ে বিস্ময় দিয়ে উঠলেন—ছিঃ! বন্ধু! ছিঃ!

মৃদু হাসলেন দেবেন্দ্রশঙ্কর। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বললেন—কোন পাপ মলয়াকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। স্বর্গের দেবীর মতোই সে ছিল নিষ্কলঙ্ক। শোন চন্দ্রনাথ……

মনের সমস্ত শক্তিকে একত্র করে বলতে লাগলেন দেবেন্দ্রশঙ্কর—শোন চন্দ্রনাথ। সে আজ বোধকরি পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগেকার কথা। তুমি তখন তোমার নতুন বাড়ী তৈরী করেছো। বড়লোক বলে তোমার নাম জাহির হয়েছে। কত সৌখীন মানুষের আনাগোনা তোমার বাড়ীতে। কিন্তু সেসব কথা থাক। একজন ভ্রাম্যমাণ অভিনেত্রী ছিল। তার নাম বোধকরি কমলা। তাকে মনে পড়ে চন্দ্রনাথ?

চন্দ্রনাথের মুখে স্মিত হাসির রেখা।

—খুব মনে পড়ে।

দেবেন্দ্রশঙ্কর বলতে লাগলেন—তুমি মলয়াকে লুকিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে তোমার বরানগরের বাগান বাড়ীতে রেখেছিলে। মনে করেছিলে, কেউ সে কথা জানতে পারবে না। কিন্তু মলয়া জানতে পেরেছিল।

—বল। তারপর?

কয়েক মুহূর্ত থেকে দেবেন্দ্রশঙ্কর বলতে লাগলেন—আমার নিঃসঙ্গ জীবন একটি মাত্র নারীর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিল। সে নারী মলয়া। আজ তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি মলয়াকে আমি ভালবাসতাম।

চন্দ্রনাথ আবার হাসলেন। বললেন—শুনে আশ্চর্য বোধ করছিনা বন্ধু। তারপর বল।

দেবেন্দ্রশঙ্কর অন্যমনস্কের মতো বলতে লাগলেন—তার প্রতি তোমার প্রবঞ্চনায় মলয়া দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল যেন। তার অবস্থা দেখে একদিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে দেখে মনে হয় যেন কী একটা গভীর দুঃখ আপনাকে ঘিরে রয়েছে। কী সে দুঃখ? আমার কাছে বলতে কি বাধা আছে?' উত্তরে ম্লান হেসে মলয়া বললে, 'আজ নয়। সময়ান্তরে বলব।' তারপর দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। এলো এমনি এক বিজয়ার সন্ধ্যা। সন্ধ্যায় তোমার বাড়ী গেলাম। তুমি নেই। মলয়া একাকিনী বিবর্ণ মুখে বসেছিল। আমাকে দেখে তার মুখে ক্ষীণ আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তুমি মলয়াকে বলে গেছ, বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছো, বিজয়ার দিন সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে। আমি জানতাম, তোমার কাজ কোথায়। ইচ্ছে করছিল, তোমার বাগানবাড়ীতে গিয়ে কমলার কাছ থেকে তোমায় জোর করে টেনে নিয়ে আসি। চোখের সামনে মলয়ার এই দুঃখ অসহ্য লাগছিল।

চন্দ্রনাথের মুখে ক্ষীণ হাসি। বললেন—বলে যাও, বন্ধু। তারপর কি বল?

দেবেন্দ্রশঙ্কর বলতে লাগলেন—ক্রমে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল, তুমি ফিরলে না। তুমি না এলে মলয়ার জন্মদিনের সন্ধ্যাটি ব্যর্থ হবে। সে অধীর হয়ে উঠল। তার চোখেমুখে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, তার ডাগর দুই চোখের কোলে জল, সেই জল আমার সামনেই ঝরে পড়ল, তাকে সে ঠেকে রাখতে পারলে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তোমাকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনবো, এই আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মলয়া বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন?' বললাম, 'চন্দ্রনাথকে খুঁজে আনি। আমার কথার উত্তরে হঠাৎ আর্তকণ্ঠে মলয়া বলে উঠল, 'না, না, আপনি যাবেন না। তিনি কোথায় আছেন আমি জানি। আপনি থাকুন। দয়া করে আমায় ছেড়ে যাবেন না।' কথার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ল।

বলতে বলতে দেবেন্দ্রশঙ্কর নিজেও যেন ভেঙে পড়লেন। আচ্ছন্নের মতো বলতে লাগলেন—'কথা শেষ করে সহসা মলয়া আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর আমি কোন কথা বলবার আগেই আমার দু'হাতের ওপর তার দু'হাত রেখে আমার বুকের কাছে মুখ এনে করুণ কণ্ঠে বলে উঠল—আপনি থাকুন। আপনিও আমায় ত্যাগ করবেন না।'

এই পর্যন্ত বলে দেবেন্দ্রশঙ্কর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সবেগে বলে উঠলেন—'আমায় বাধা দিও না চন্দ্রনাথ আগে আমার সব কথা শোন্। আমায় বলতে দাও।'

উদাসকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললেন—'আমি তো তোমায় বাধা দিইনি। বল। তারপর?'

কণ্ঠস্বর সংযত করে দেবেন্দ্রশঙ্কর বললেন—'তারপর? হ্যাঁ, তারপর। মলয়ার স্পর্শ পেয়ে আমার সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এ পর্যন্ত কোন নারী এমন করে আমার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়নি। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। দুরন্ত কামনা দেহের শিরায় শিরায় উন্মাদ নৃত্য সুরু করেছে। সামনে যেন অতল অন্ধকার গহ্বর। তার ওপরে দাঁড়িয়ে আমি আর মলয়া। আর এক পা মাত্র। তারপরে দুজনেই সেই অন্ধকারে তলিয়ে যাব। ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করলাম। তাকে পাশের সোফায় বসিয়ে সামনা সামনি হলাম। উত্তেজিত মুহূর্তে মলয়ার মনে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, নিমেষের মধ্যে তাকে জয় করে সে গভীর লজ্জায় অভিভূত হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলে। কিছুক্ষণ পরেই তুমি বাড়ী ফিরলে। আমায় দেখে জড়িয়ে ধরলে। অনেকক্ষণ খোসগল্পে কেটে গেল। তারপর আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ী ফিরলাম। সেদিনের পর আবার যথারীতি তোমাদের কাছে যেতে লাগলাম। মলয়ার ভাব দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। সেদিনকার সন্ধ্যার স্মৃতি সে যেন বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারলাম না। আমার মনে এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এলো। মলয়ার দেহের স্পর্শ, তার দেহের সুরভি আমায় যেন মাতাল করে দিয়েছিল। থেকে থেকেই সেই স্মৃতি আমার দেহের শিরাউপশিরায় কামনার আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। আমি জ্বলতে লাগলাম।'

থামলেন দেবেন্দ্রশঙ্কর। চন্দ্রনাথ বললেন—'থামলে কেন। শেষ কর।'

—'হ্যাঁ। এইবার শেষ অঙ্ক। একবছর এমনি অবস্থায় কাটবার পর আবার বিজয়ার সন্ধ্যা ঘুরে এলো। তোমার বাড়ীতে গিয়ে সেই ঘরের মধ্যে আমরা দু'জনে বসলাম—মলয়া আর আমি। তুমি তোমার ব্যবসার কাজে কলকাতার বাইরে গিছলে। সেদিন বিকেলে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তোমার শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছিলে। আমরা দু'জনে কথা বলতে লাগলাম। মলয়ার পাশে বসবার পর থেকেই এক বছরের পুরনো স্মৃতি সহস্র মাদকতা নিয়ে আমার দেহে সাড়া জাগালো। আর একবার তার নমনীয় দেহের স্পর্শ পাবার জন্যে মুহুর্মুহু মন অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠল। একবার। শুধু একটিবার। তার চোখের দিকে তাকালাম। তারপর আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিলাম নিজের দিকে। অসহ্য উত্তেজনায় তখন আমি যেন ভূতগ্রস্তের মতো অভিভূত হয়ে পড়েছি।'

কাঁপতে লাগল দেবেন্দ্রশঙ্করের কণ্ঠস্বর। বলতে লাগলেন, 'বোধকরি এক মিনিট। তারপরেই আমার হাতের ওপর তার নরম দুখানি হাত রেখে কোমলস্নিগ্ধস্বরে মলয়া বললে, বন্ধু, মনের এ দুর্বলতাকে জয় করুন। পাশের ঘরে যে মানুষটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে অকাতরে ঘুমুচ্ছে আপনার প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাসকে নষ্ট করবেন না। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল যেন বিদ্যুতের আগুনে আমার সমস্ত দেহ মন পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল। দারুণ লজ্জায় আমার ঘাড় নুঁকে পড়ল। মনে মনে বললাম, এ দুর্বলতার আগে, হে জগদীশ্বর, তুমি আমার মৃত্যু-বিধান করলে না কেন। এমন সময় মুখ মুছতে মুছতে তুমি ঘরে ঢুকলে। দুজনে কোলাকুলি করলাম। মলয়া আমাদের জন্যে মিষ্টি নিয়ে এলো। আমায় জোর করে অনেকগুলো সন্দেশ খাওয়ালে। মনে হল কণকাল আগে অন্তরের ভিতর থেকে যে দানবটা আত্মপ্রকাশ করেছিল সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

'এই কি শেষ?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নেড়ে দেবেন্দ্রশঙ্কর বললেন, 'না আর একটু বাকি আছে। সেদিনের পর আর কোন সময়েই মনের মধ্যে কোন দুর্বলতা, কোন পাপ বোধ করিনি। আমি জানতাম, মলয়া আমায় ভালবাসে না। তার কাছ থেকে আমি আশা করতে পারি, শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, করুণা—তার বেশি কিছু নয়। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল। আমরা যৌবন এবং প্রৌঢ়কাল পেরিয়ে এলাম। তুমি তোমার কৃষ্ণদাস ছেড়ে আদর্শ স্বামীরূপে জীবন কাটাতে লাগলে। মলয়া এবং আমার মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক সখ্যতা গড়ে উঠল। যে সখ্যতার মধ্যে কোন মোহ ছিল না, কামনা ছিল না। আজ মলয়া নেই। আর একটি বিজয়ার সন্ধ্যা ফিরে আসবার আগে হয়ত আমরাও তার অনুসরণ করব। আজ তোমার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি বন্ধু, একদিন মনে এবং বাক্যে আমি তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলাম। সেজন্যে আমায় ক্ষমা কোরো।'

দেবেন্দ্রশঙ্কর তাঁর কম্পিত ডানহাতখানি চন্দ্রনাথের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুহাতের মধ্যে বন্ধুর হাতখানি টেনে নিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন—ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই বন্ধু। তুমি যা বলবে তা আমি অনেকদিন আগেই জানি। মলয়া আমার কাছে সবকথাই প্রকাশ করে বলেছিল।'

চন্দ্রনাথের কথা শুনে দেবেন্দ্রশঙ্কর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

নিষ্কম্পকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন—'মলয়ার সঙ্গে একদিন আমার অনেক কথাই হয়েছিল। তার মুখ থেকে আমি অনেক কিছু একান্ত অপ্রত্যাশিত কথা শুনেছিলাম। এবং তুমি তো ভালই জান যে মলয়া কখনো মিথ্যা কথা বলত না।'

দেবেন্দ্রশঙ্কর নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

স্থির প্রশান্তস্বরে চন্দ্রনাথ বললেন—'কিন্তু আমি যে কেন বাড়িতে থাকতাম না, কেন যে কুসঙ্গে মিশে বেড়াতাম তা কি জানো শঙ্কর?'

—'জানি না তো! কেন তুমি কিছুদিনের জন্যে অমন বিপথগামী হয়েছিলে?'

—তার কারণ, আমি কোনদিনই মলয়ার ভালবাসা পাইনি।

—সে কি?

মৃদু হেসে চন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ, তাই। সে ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সুগৃহিণী, সেবাশুশ্রূষায় অকুণ্ঠচিত্ত, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসতে পারেনি কোনদিন। সে আমার কাছে স্পষ্টই স্বীকার করেছিল যে জীবনে সে একমাত্র তোমাকেই ভালবাসে।

চক্রপাণি
(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

একদিন আমাদের দেশে শিশুদের একটি মামা ছিল। তার নাম ছিল চাঁদমামা। শিশুদের কপালে টিপ দেবার জন্যে মায়েরা তাকে আহ্বান করত—'আয় চাঁদ আয়!' তাছাড়া ওই প্রিয় গ্রহটিকে নিয়ে পৃথিবীর কবিরা আর প্রণয়ীরা যুগে যুগে পাগল হয়েছে। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে কত প্রেমিক প্রেমিকার মনের বনে রজনীগন্ধা দুহুলিত হয়েছে, কত কানাকানি, কত চোখের জল, কত হা হুতাশ—ও চাঁদ চোখের জলের নোনা জোয়ার, দুখের পারাপারে—চল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওইপারে।

চাঁদের এই মোহ রহস্য, মায়া সব আজ খসে পড়ছে। চাঁদের ওপর একরূপ বীভিমত মানুষের বলাৎকার চলেছে। চাঁদের বুকে মানুষ তার গাড়ি চড়িয়েছে, হাউই দিয়ে তার বুক ছ্যাঁদা করে দিয়েছে—বলাৎকার নয়ত কী?

এদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। আর ওদিকে মানুষে মানুষে তাই নিয়েই রেষারেষি। স্বভাব যাবে কোথায়! রাশিয়ার চন্দ্রযান চাঁদের বুকে বসে নানা কসরৎ দেখাচ্ছে! ইংরেজ তাই নিয়ে ছবি ছাপিয়ে বাহাদুরী দেখালে। রাশিয়া চটে আগুন। ইংরেজ বোম্বেটে, জলদস্যু ছিল চিরকাল, এখন আকাশদস্যু হতে চাইছে। ছবিগুলো জুরী করে ছাপিয়েছে। ছবিগুলো ঠিক নয় মোটেই। ওই সব ছবিতে চাঁদ গোল না হয়ে লম্বা হয়ে গেছে। আমেরিকাও চুপ করে বসে নেই। রাশিয়ার কৃতিত্ব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কী করে তাকে টেক্কা দেওয়া যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করছে। অর্থাৎ চাঁদে মানুষ দিয়ে পৌঁছোলো বলে—আর দেরী নেই। একজন বড়দরের ইংরাজ বিজ্ঞানী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, এযুগের শেষ দিকে অথবা ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়ানরা চাঁদে মানুষ পাঠাবে।

মানুষ তো মানুষ, শোনা যাচ্ছে, রাশিয়ানরা অভিযোগ করেছে যে, চাঁদে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য জংলী কর্তারা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ সব কথার শেষ কথা হচ্ছে—জোর যার চাঁদ তার। তুমি আগে গেলেই বা কি, আর আমি পরে গেলেই বা কি। ওখানে সামরিক ঘাঁটি যে আগে করতে পারবে—তারই জিৎ! বলা যায় না, পরবর্তী যুদ্ধটা হয়ত বিশ্বযুদ্ধ না হয়ে চন্দ্রযুদ্ধ হবে।

ব্যবসায়ীরাও বসে নেই। তারাও তাদের কাজ শুরু করেছে।

—কেয়া ভাও?

—কিলিকা!

—আরে হুঁয়াও! অমিনকা?

চাঁদে অমির ইস্তাহার নিয়ে নাকি রাজধানীতে রীতিমত কাটাকাটি শুরু হয়েছে আর সেই সঙ্গে গুন-পুকুরের অমির দাম কমেছে। বিলাতে চাঁদে যাওয়া নিয়ে বাজি ধরা চলেছে। জ্যোতিষীরা গ্রহীদের ভাগ্য গণনা শেষ করে চাঁদের ভবিষ্যৎ গণনায় লেগেছেন।

কিন্তু এত যে কাণ্ড হচ্ছে, এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের বিশেষ যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমরা সেইসব সাধারণ মানুষদের কথাই বলছি, যাদের আমরা নিত্য দেখছি আমাদের আশেপাশে, যাদের প্রাণান্তকর জীবনসংগ্রাম পথে পথে প্রত্যক্ষ করছি প্রত্যহ, যাদের জীবন থেকে চলে গেছে সব রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ। রাশিয়া চাঁদে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান পেলো, অথবা আমেরিকা সপ্ততল পাতালে প্রবেশ করে কুবেরের ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করল, তাতে কি এসে গেল ঐসব সংসার চক্রপিষ্ট মানুষের। চাঁদের লোভ তাদের নেই, কুবেরের ভাণ্ডার তারা চায় না। তারা চায় দু'বেলা দুমুঠো অন্ন, দুখানা পরিধের তাদের সংকীর্ণ সংসারের মধ্যে আরও আসুক, কঠিন পরিশ্রম করে সৎপথে থেকে তারা শুধু সেইটুকুই পেতে চায়। সারা বিশ্বের মনীষীরা বিজ্ঞানের জয়গান করছেন, অবাক হবার মতই কাণ্ডকারখানা তার, কিন্তু কোথায় সেই মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানী যাঁর মস্তিষ্কের জোরে পৃথিবীর মানুষ নিজের ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যে বাস্তব উপকার পাবে, আনন্দ পাবে, আশা পাবে, মাথা তুলে ভবিষ্যৎকে দেখবার প্রেরণা পাবে। একদিকে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে অন্যদিকে পাপ ততই বাড়ছে মানুষের কষ্ট ততই বাড়ছে, হাঁ পাপ, মানুষকে শোষণ করে, শোষণ করে একদল রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করছে, ওষুধে বিষ, খাবারে বিষ, সেই বিষ অকাতরে মানুষ তুলে দিচ্ছে মানুষের হাতে, এতবড় দুর্দিন মানুষের আর কখনো আসেনি যেমন আজ এসেছে। প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রচেষ্টা কি আমাদের এ দুর্দিনের অবসান ঘটাতে পারবে?

• • • •

পুরুতরা ঘুষি লড়ছে নিজেদের মধ্যে। আমাদের দেশে নয়, সভ্যতার পীঠস্থান খাস ওতনে, সেখানকার সবচেয়ে বড় গীর্জা বিখ্যাত ওয়েস্ট মিনিষ্টার এ্যাবেতে। সেখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক পুরুত ধর্মোপদেশ দেবার সময় প্রটেষ্টাণ্টরা খাপ্পা হয়ে মারমার শব্দে তাঁর দিকে ধেয়ে যায় এবং তখন রীতিমত ঘুঁসির লড়াই শুরু হয়। চারশ'বছর ধরে কোনো রোমান ক্যাথলিক ঐ গীর্জায় ধর্মোপদেশ দেবার অধিকার পায়নি। ঐ গীর্জায় প্রটেষ্টাণ্টদের একচেটিয়া আধিপত্য। তাই সেখানে রোমান ক্যাথলিকের বক্তৃতা তারা সহ্য করতে পারবে কেন? নিমন্ত্রিত হয়েই রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ফাদার টমাস করবিশলে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণ যায় আর কি। কোনো রকমে পুলিশ এবং গীর্জার রক্ষীরা ছুটে এসে তাঁকে বাঁচায়। আমাদের দেশে যদি এইরকম ঘটনা ঘটত তাহলে বিলাত ও আমেরিকার পত্র পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বড় হরফে চড়া রংয়ে এই খবর ছাপা হত—দেখ, দেখ, কি অসভ্যদেশ, কি ধর্মের গোঁড়ামি।

• • • •

আমাদের দেশে ব্যবসায়ী হলে কি সততাকে বিসর্জন দিতেই হবে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা হেসে বলে, সাধু ব্যবসায়ী, তা সেতো সোনার পাথরবাটি! কোথাও পাওয়া যাবে না। অন্যদেশের কথা জানি না, আমাদের দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সাধু ব্যবসায়ী আমাদের দেশে সত্যি বোধকরি এক অপ্রাং অলীক বস্তু। বাস্তবে পাওয়া যাবে না। প্রায়ই কাগজে দেখি অসাধুতার জন্যে ব্যবসায়ী ধৃত, কারারুদ্ধ, দণ্ডিত। নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, ট্রেসব ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সরকার আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ৪৯৩টি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করেছেন। ১০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৩১টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ১৮৬টি ক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এবং ৩৫টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এদাদি কাণ্ড যাকে বলে।

• • • •

খবরের মত তিনটি খবর!

কলির বুকোদর! অনেক খাইয়ে লোকের কথা শুনেছি। আবদুল কৈলাস, ভেড়ুমনি ভটচায, দু'মনি নদেরচাঁদ। কিন্তু আজকের যুগে এক তিরিশবছর বয়সের বাঙালী পুলিশ কনস্টেবলের যে আহারের পরিমাণ শোনা গেল তা যেন সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। রাপনের যুগ। জানা গেছে, তাঁর আড়াই সপ্তাহের রাশন এক বেলায় সাবাড়। লোকটির নাম রাধাবল্লভ দাস। কাঁসীপুর থানার বুকোদর। তাঁর খাবার বহরটা শুনুন: সকালের ব্রেকফাস্ট ৭৫০ গ্রাম ছোলা সেদ্ধ, ২০০ গ্রাম আদার কুঁচি, ৪০০ গ্রাম আখের গুড়। কখনো আবার বিকল্পে ছেড় কিলো চিঁড়ে, ১ কিলো দই, ৮টা পাতিলেবু। দুপুরে নিয়মিত মেনু ২ কিলো চালের ভাত, ৪০০ গ্রাম ডাল, ৩০০-র মত তরিতরকারি। আমিষ হলে, ২টি কিলো চালের ভাত, ১ কিলো মাছ, ২০০ গ্রাম ডাল ও উপযুক্ত পরিমাণ তরিতরকারি। রাত্রে লঘু আহার—১ কিলো আটার রুটি, সঙ্গে তরিতরকারি এবং চাটনি।

রাশনে তো এ পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কমিশনারের কাছে বাড়তি পরিমাণের জন্যে আবেদন করেন কিন্তু তা নাকচ হয়েছে। এদিকে ভদ্রলোক সিকিপেটা খেয়ে কাহিল। ক'মাসেই দেহের ওজন ৩ মণ থেকে আড়াই মনে নেমেছে। দিনদিনই নামছে। বন্ধুরা তাঁকে হটযোগ অভ্যাস করতে বলেছেন। হটযোগিরা বাকি না খেয়েও থাকতে পারে। যাইহোক, ভদ্রলোক যে অচিরেই সুস্থ দেহ ধারণ করবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

• • • •

একটি বিদেশী খবর। ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। এ খবর বিদেশের সবত্রই ফলাও করে প্রচারিত। সুদূর ওলন্দাজদের দেশে সেখানকার ছাত্ররা ভারতের খাদ্যাভাবে ব্যথিত হয়ে ভারতকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে নেমেছে। ৩৫টি স্কুলের প্রায় ৭ হাজার ছাত্র এই উদ্দেশ্যে ২ দিন উপবাসের সিদ্ধান্ত করেছে। মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক পি. এস. সাকাপেল-এর উস্কানিতে ছাত্ররা ২ দিন ধরে শুধু চা আর চিনির পানা খেয়ে কাটাবে। তার দ্বারা তারা ছাত্র প্রতি গড়পড়তা কম বেশী ৭ শিলিং, ধরা যাক ৬ টাকা সংগ্রহ করতে পারবে বলে আশা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ৪২০০ টাকা তারা

তুলতে পারবে। তারা ঐ টাকা তারতে দেবার জন্যে নিজেদের সরকার অথবা আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

• • • •

আর একটি খবর। ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে কোন্ বাপ আর না চায়? সকল অভিভাবকই ইচ্ছা করেন যে, তাঁদের ছেলেরা ভাল স্কুলে এবং ভাল মাষ্টারের কাছে পড়বে। কিন্তু সকল সময় সাধ্যে বা সুযোগ সুবিধায় তা সম্ভব হয় না। যাতে তা সম্ভব হয় অর্থাৎ তাঁর ছেলে যাতে একেবারে একটি সবদেরা স্কুলে সবদেরা শিক্ষকের কাছে পড়তে পারে সেজন্যে ইংলণ্ডের ওয়াশটন নামক স্থানের জর্জ্জুর নামে এক ব্যবসায়ী এক অভিনব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একটি পোড়ো ইস্কুলই কিনে ফেলেছেন। হেড মাষ্টার প্রাথমিক স্কুল নামে বিদ্যালয়টি কেনার পর তিনি তাকে উন্নত করার কাজেও সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়েছেন। প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছে। নতুন নতুন ক্লাসঘর, ব্যায়ামের আখড়া, খেলাধুলোর ব্যবস্থা, মায় সাঁতার কাটবার জন্যে একটি গরম জলের পুকুর। ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কেটে ছেলের যদি সর্দ্দি হয় সেজন্য সবসময় পুকুরে গরম জল। তাছাড়া দিগ্‌গজ সব শিক্ষকও নিযুক্ত হয়েছেন সেই সঙ্গে। রমারম ব্যাপার। এই কাজে ভদ্রলোকের প্রাথমিক খরচ হয়েছে প্রায় সাড়েসাত লাখ টাকা। এর একটা ভাল ফল হল এই যে, একটি ছেলের জন্যে আরও দশটি ছেলে একটি ভাল ইস্কুল পেলো।

• • • •

এই সংখ্যার লেখার শুরুতে বিজ্ঞানের দাপট সত্ত্বেও তার প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনীহার কথা লিখেছিলাম সেই কথারই সুর শোনা গেল ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কণ্ঠে। বোম্বাইয়ে ভারত বিদ্যাভবনের আন্তর্জাতিক অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, সারা বিশ্বে বর্তমানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সঙ্কট এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে স্বৈরাচার প্রকট হয়েছে। মানুষ আজ জানেনা কোন দিকে সে যাবে এবং কি করবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্ময়কর সাফল্য সত্ত্বেও মানুষের মনে আজ গভীর শূন্যতা। তাদের কাছে আমাদের এমন কিছু দিতে হবে যা বুদ্ধি এবং নীতির দিক থেকে তাদের বিবেকের কাছে গ্রহণীয় হবে। এখন চাই এমন কিছু যা সাধারণভাবে সারা বিশ্বের নৈতিক উন্নতি সাধন করবে।

মহাদার্শনিকের কথায় সেই আদিবাণীর সুর। অর্থাৎ যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড় এবং আজকের প্রয়োজন—চাই মানুষের মত মানুষ।

• • • •

মহাজাতি সদনের পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম। দেখছি আমাদের মত আরও অনেকেই এই পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত জাতীয় নিকেতন সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুভাষচন্দ্র এর প্রতিষ্ঠাকালে বলেছিলেন, জাতির কল্যাণ, ব্যক্তিত্বের, সমাজের এবং সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে এই গৃহ নিবেদিত হোক এবং তার নাম সার্থক করুক। রবীন্দ্রনাথ এর ভিত্তিফলক স্থাপন করে বলেছিলেন, এর মধ্যে দেশের মানুষের মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হোক এবং বাঙালী আত্মোপলব্ধির

প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক। হায়! কোথায় তলিয়ে গেছে এই দুই মহান নায়কের স্বপ্ন। মহাজাতি সদন বলতে মানুষ আজ বোঝে, থিয়েটারের আখড়া বা নাচগানের আসর। তা হোক, তাতে আপত্তি ছিল না। আর পাঁচটা হলের মত ওটাও যদি একটা নাচঘর হত তাতে মনে লাগত না। কিন্তু রবীন্দ্র-সুভাষস্মৃতি বিজড়িত এর ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যে অবমাননা আপত্তিকর। এই সদনের একটি ট্রাস্টিবোর্ড আছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই বোর্ড যে অকর্মণ্যতা এবং চিন্তাহীন বিকৃত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে চলেছেন, অন্যদেশ হলে তার জন্যে ভালমতই ধাবড়া হত। কিন্তু এদেশে এরেরই জয়জয়কার। এই বোর্ডের বিরুদ্ধে এক পত্রিকায় লম্বা ফিরিস্তি বেরিয়েছে। এর সেক্রেটারি এবং লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে বহু- অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, ঐ সেক্রেটারি পুরুষ মহাজাতি সদনকে ফিরিঙ্গি মেয়েদের নাইটক্লাবে পরিণত করবার উদ্যোগী হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে সেখানে একদল আধ-নেটো ফিরিঙ্গি মেয়েদের নাচগানের আসর বসেছে, অর্থাৎ সেদিক থেকে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রমে রীতিমত নিয়মিত ভাবে চলবে। বাঃ!

গত দুই শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস, ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই দুই লাইন কাহিনীর মধ্যে ভরে গিয়েছে।

ঠাকুর একদিন কলকাতায় এক বিখ্যাত ধনীর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখলেন, দেওয়াল জুড়ে সব বড় বড় বিলিতী ছবি।

বালকের কৌতূহলে তিনি ধনী মালিককে বললেন, হাঁ গা, এত ছবি, একখানাও ঠাকুর দেবতার ছবি নেই?

সেখানে একটি বালক ছিল। ঠাকুরের প্রশ্নে সে জবাব দিল, আছে। বাড়ীর ভেতরে, অন্দর মহলে।

বালকের উত্তর শুনে ঠাকুর আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সত্যমেব জয়তে

আনন্দ ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন আগেকার কথা।

ইহুদীরা তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীন। এই সময় এঁদের মধ্যে নাহুম নামে এক ইহুদী ভদ্রলোক ছিলেন। নাহুম অত্যন্ত সৎ, ধর্মপরায়ণ এবং সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছিল তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এবং ভগবানে অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। অদৃষ্টের দেওয়া দুঃখ কষ্ট বা বিপদ আপদকে তিনি আদৌ ভয় করতেন না। হাজার দুঃখকষ্ট বা আপদ বিপদের ঝঞ্ঝাটে তিনি অটুট থাকতেন, সর্বদা খুশী মনেই থাকতেন। যত খারাপ ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাঁর জীবনে তিনি হাসিমুখে বলতেন—এটাও ভালর জন্যই হয়েছে—ভগবান মঙ্গলময়। হিব্রু ভাষায় 'এটাও'-কে বলে 'গাম্ জো'। এবং নাহুমের এই দৃঢ় স্বভাবের জন্য ক্রমে তিনি 'গাম্ জো' মানুষটি নামে লোক সমাজে পরিচিত হয়ে উঠলেন। এরকম এক একটা চলতি ডাক নাম প্রায় অনেকেরই হয়ে যায়, বিশেষ কোন মুহূর্তের কোন স্মরণীয় ঘটনার পর থেকে।

রোম সম্রাটকে বার্ষিক খাজনা দেবার সময় এসে গেছে। ইহুদী সমাজের তাবৎ জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন, নাহুমই এবার রোমে খাজনা নিয়ে যাবেন। কারণ তাঁরা সকলেই অবগত আছেন যে, নাহুম একজন খাঁটি ও সৎ লোক। আরও জানেন যে, এই গাম জো মানুষটির জীবনে এমন বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে যেগুলি সত্যই অবিশ্বাস্য এবং তিনি ছাড়া ওরকম বিপদজনক অবস্থায় কেউ অবিচল থাকতে পারতেন না। সুতরাং এ বছরের উপহার নাহুমই রোমে নিয়ে যাবেন।

তথাস্তু! তাই হোক।

অতঃপর নাহুম খাজনার বস্তাটি নিয়ে রোমের পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন। এবছর ইহুদীরা রোম সম্রাটকে খাজনা স্বরূপ দিয়েছে সোনা।

জেরুসালেম থেকে রোম অনেকখানি পথ। সমস্ত দিন ধরে বিরামহীন পথ চলে রাত্রে যে কোন সরাইখানায় তিনি বিশ্রাম নিতেন। কয়েকদিন এরকম চলতে চলতে একসময় তাঁর চলার পথ ফুরিয়ে এল। বাকি শুধু একটি রাত। এ রাত পোহালে নাহুম রোম পৌঁছবেন। সেই শেষ রাতেও যথারীতি তিনি একটি সরাইখানায় রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে এসে উঠেছেন। সঙ্গে সেই খাজনার সোনা ভর্তি বস্তা।

খুব সম্ভবতঃ, নাহুমের ক্লান্তশ্রান্ত চেহারা দেখে সরাইখানার কয়েকজন কৌতূহল বশতঃ তাঁকে তাঁর যাত্রার বিষয় প্রশ্ন করল।

সরল প্রাণ নাহুমও বললেন: আমি জেরুসালেমবাসীর তরফ থেকে রোম যাচ্ছি। রোম সম্রাটকে প্রদেয় তাঁদের বার্ষিক খাজনা এই বস্তায় আছে। আমি এটি সম্রাটকে পৌঁছে দেব।

নাহুমের অকপট উক্তিতে লোকগুলি ভয়ানক অবাক হল এবং তাদের কৌতূহলও বেড়ে চলল। খাজনা! এবং ঐ বস্তায়! বস্তাটির আনুমানিক মূল্য নিয়ে যে যার মনে মনে কল্পনা করে একটা ধারণা করতে চেষ্টা করল।

একজন আর থাকতে না পেরে সোজা জিজ্ঞাসাই করে বসল:

—খাজনা বাবদ এতে কি আছে? মানে টাকা পয়সা না কোন কিছু?

—ঠিক বলতে পারব না ভাই। তবে শুনেছি এবার নাকি সোণা দেওয়া হয়েছে। নাহুম বললেন।

লোকগুলি হো হো করে হেসে উঠল নাহুমের এমন অদ্ভুত কথা শুনে। একজন বলল:

—আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি! খাজনার এই বিরাট থলে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অথচ জানেন না এতে কি আছে!

নাহুম তেমনি অবিচলিত ভাবে বললেন: কোন জিনিষের প্রতিই আমার অহেতুক কোন কৌতূহল নেই। শুনেছিলাম সোণা। দেখিনি তো এর মধ্যে কি আছে।

লোকগুলি ঘ' মেরে গেল। লোকটা বলে কি! আচ্ছা বেকুব তো? এরকম যে কা লোক হয় নাকি? তারা প্রত্যেকেই মনে মনে স্থির করে ফেলল—এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

অতঃপর রাত্রের আহারাদির পর সরাইখানার যে যার শয্যায় শুতে চলে গেল। নাহুমও গেলেন। কিন্তু গেল না ঐ লোকগুলি। তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

সারা দিনমান বোঝা নিয়ে পথ চলায় নাহুম এমনিতে ক্লান্ত শ্রান্ত, তারপর রাত্রের পর শয্যায় শুতেই অচিরে গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। খাজনার বস্তাটি তাঁর শিয়রে।

নাহুম ঘুমে অচৈতন্য হতেই ঐ দুর্বৃত্তগুলি আর সময়ের অপব্যয় করল না। তারা সবাই মিলে ধরাধরি করে অতি সন্তর্পণে বস্তাটি বাইরে নিয়ে এল এবং খুলতেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল। বস্তা ভর্তি সোণার নানান অলঙ্কার। নাহুমের মত সাদাসিধে সোজাসাপ্টা লোক যাতে সন্দেহ না করে সেইজন্য লোকগুলি সম পরিমাণের ইট পাথর ও গুলো বালি জোগাড় করে সোণাদানার পরিবর্তে বস্তাটিতে ঠিক তেমনই ভাবে রেখে দিল এবং মূল্যবান খাজনা নিয়ে রাতারাতি সরে পড়ল।

সকালে যথারীতি নাহুম ঘুম থেকে উঠলেন। সরাইখানার পয়সা মিটিয়ে প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি করে বস্তাটি নিয়ে রোমের পথে পাড়ি দিলেন। রোম এখান থেকে আর কিছুটা পথ মাত্র।

নাহুম রোম পৌঁছলেন। তাঁকে যথা নিয়মে ও সসম্মানে রাজার কাছে নিয়ে আসা হল। এবং তিনি রাজাকে খাজনার বস্তাটি উপহার দিলেন:

—হে রাজাধিরাজ আপনার ইহুদী প্রজাদের সপ্রেম এই উপহার সামগ্রী আপনার জন্য আমি বহন করে এনেছি। গ্রহণ করে বাধিত করুন।

রাজকর্মচারীরা রাজার আদেশে বস্তাটি খুললেন। কিন্তু একি! ইঁট পাটকেল ও ধুলো বালি! এই কি রাজনা? উপহার! ভালমানুষ নাহুমও অবাক। রীতিমত বেকুব।

রাজার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা? রোম সম্রাট ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা। অপমানও বটে।

—ইহুদীদের এত বড় স্পর্ধা! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি।

আমি এই বর্বরকে সমুচিত শিক্ষা দেব। তিনি আদেশ করলেন: এই কে আছিস! এখুনি গ্রেপ্তার করে বধ্যশালায় নিয়ে যা। আমি এর কাটামুণ্ড দেখতে চাই।

এমন অভাবনীয় কাণ্ড দেখে নাহুম একেবারে হতবাক। কি যে বলবেন! এমন আজগুবি ব্যাপার তাঁর কল্পনাতীত। সোণার বস্তায় ধুলো বালি! কেমন করে সম্ভব? হঠাৎ তাঁর মনে হল নিশ্চয়ই কোন সরাইখানায় এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটেছে। নিশ্চয়ই কোন বদমাইস লোকেদের কীর্তি! কিন্তু ঠিক কোন্ সরাইখানায় এটা হয়েছে বা কারা করেছে এসব হীন কাজ তা তিনি ঠিক করতে পারলেন না। আর করলেই বা কি হয়? যা হবার তা তো হয়েইছে। বিপদের এমন চরমতম দুঃসময়েও তিনি কিন্তু বিচলিত হলেন না। এবং বললেন: এটাও তালর জন্যই হয়েছে—ভগবান মঙ্গলময়।

পরম ভক্ত নাহুমের এই সঙ্কট দেখে স্বর্গে এলিজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। এলিজা একজন দয়ালু ও ত্রিকালদর্শী সাধু ছিলেন। বহুদিন আগে জেরুসালেমে তিনি ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের ও ভবিষ্যবাণীর কথা সমগ্র দেশে এমন ছড়িয়ে পড়ে যে স্বর্গ থেকে বিশেষ রথে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে প্রায়ই দয়ালু এলিজা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে মর্ত্যে আগমন করতেন এবং বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করে মুক্ত করতেন। নাহুমের এই বিপদে তিনি ঠিক থাকতে পারলেন না এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য মর্ত্যে নেমে এলেন।

এবার মহর্ষি এলিজা রোমসম্রাটের সভাসদের বেশে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন এবং সম্রাটকে বললেন:

—মহারাজ! রাজনাবাহক এই ইহুদীটিকে ফাঁসি দেবার আগে ঐ ইঁট পাটকেল ও ধুলোবালি-গুলিকে একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়!

—কি যাতে বকছেন আপনি? সম্রাট গর্জে উঠলেন: ধুলো বালির আবার পরীক্ষা কি? আপনি কি বলতে চান যে ঐ ইঁট পাটকেলের স্তূপের মধ্যে কোন গুপ্তধন আছে?

—না। ঠিক তা নয় প্রভু। সভাসদটি খুব ঠাণ্ডা ও ধীর স্বরে বললেন: তবে এমনও তো হতে পারে যে ঐ ধুলোবালি বা ইঁটপাটকেল বলে যাকে তুচ্ছজ্ঞানে অবহেলা করছেন, সেগুলি ইহুদীদের পূর্বপুরুষ মহাত্মা আব্রাহামের মরদেহ। এই ধুলোবালির এমনই যাদুকরী শক্তি যে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলেই তা রসুরূপে রূপান্তরিত হয়ে ওদের ঘায়েল করবে!

—তাই নাকি? রোমসম্রাট এমন অচিন্ত্যপূর্ব এক প্রস্তাবে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কিন্তু পরে পরে বিচলিত হয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। রাজা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। বললেন:

—বেশ। তবে তাই হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাবিশগুলোর পরীক্ষা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর ফাঁসি বিলম্বিত হবে। এটা একটা চালও হতে পারে। সুতরাং এই ইহুদীটিকে আপাততঃ হাজতে রাখা হোক। যদি তেমন কোন সুযোগ আসে যখন এই ধুলোবালির পরীক্ষা সার্থক হবে তখনই ওকে ছাড়া হবে। নতুবা ওকে মুণ্ডহীন হতেই হবে।

রাজাজ্ঞা! নড়চড় হবার কোন উপায় নেই। সুতরাং নাছস গাম্‌ছো মানুষটিকে বন্দের পরিবর্তে কারারুদ্ধ করা হল। ফলাফল যাইহোক, নাহুম আনীত ঐ ধুলোর বস্তাটিকে সম্রাট রোমের সীমান্ত প্রদেশে পাঠাবার হুকুম দিলেন। এই সীমান্তের পরপারের একটি প্রদেশকে জয় করে নিজের রাজ্যভুক্ত করার বহু চেষ্টা রোমানরা বহুবার করে বিফল হয়েছে। সৈন্যবাহিনী বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে শত্রুপক্ষের হাতে। সত্যি বলতে কি ঐ প্রদেশটিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা যদি রোম সম্রাটের না থাকত তাহলে তিনি ধুলোর বস্তা পাঠিয়ে লড়াই করে রাজ্য জয় করার এমন হাস্যকর প্রচেষ্টা কখনোই করতেন না।

সম্রাটের এমন উদ্ভট ইচ্ছা, তথা আদেশ শুনে সৈন্যরা তো হেসেই গড়াগড়ি। কেউ কেউ রেগেই অস্থির। কেউ তো রাজাকে 'পাগল' বলেই উড়িয়ে দিল। সত্যি তো! যে সব বীর সৈন্যেরা বিরাট বিরাট ও ভীষণ ভীষণ তীর ধনুক, চাঁদ তলোয়ার প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধে অভ্যস্ত তাদেরই এখন কিনা ইটপাথর ও ধুলোবালি দিয়ে লড়তে হবে! এর চেয়ে গাঁজাখুরী কাণ্ড আর কি হতে পারে?

তবু উপায় নেই! রাজাজ্ঞা। পার্ষদের ভবিষ্যবাণী। নড়চড় হবার জো নেই।

বলতে গেলে একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেই রোমের সৈন্যরা সীমান্ত পারের রাজ্যটির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং সবিস্ময়ে তারা অবিশ্বাস্য কাণ্ডটি নিজেদের চোখের সামনে ঘটতে দেখল। শত্রুপক্ষ ভীষণভাবে নাজেহাল হল এবং হত হল, পরাজয় স্বীকার করে রোম সম্রাটের কাছে বিনাসর্তে বশ্যতা স্বীকার করল। রোম সাম্রাজ্যে আরও একটি প্রদেশযুক্ত হল।

এই অভাবনীয় আনন্দ সংবাদটি বিদ্যুৎগতিতে রোম সম্রাটের কর্ণগোচর হল। তিনি আনন্দে ও খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। নাহুমকে তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত করা হল। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁকে স্বাধীন করেই ক্ষান্ত থাকতে চাইলেন না, সম্রাট কি করে তাঁকে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন ও খুশী করবেন সে কথা ভাবতে লাগলেন। ঠিক করলেন, যে বস্তাটি করে নাহুম জেরুসালেম থেকে খাজনা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, সেই বস্তাটি নানান মূল্যবান মণি-মাণিক্য সোণাদানা দিয়ে ভরে দেবেন।

অতঃপর গাম্‌ছো মানুষটি জেরুসালেম ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলেন। সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছলেন সেই সরাইখানায় যেখানে তিনি মুষিত হয়েছিলেন। এখানকার লোকগুলি নাহুমের ফাঁসির কথা শুনেছিল এবং বেশ নিশ্চিন্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী ঘটনার বিষয় কিছু জানত না। নাহুমকে আবার দেশে ফিরতে দেখে তারা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। ওরা ভেবেছিল, নাহুমের শিরশ্ছেদ কার্যটি এতক্ষণে নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

তাঁকে সশরীরে বিদ্যমান দেখে লোকগুলি আর কৌতূহল চাপতে পারল না। খুবই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল:

—আপনি কি সম্রাটের দরবারে গিয়েছিলেন?

আর একজন বলে: সত্যি দেখা করেছেন তো!

—করেছি বৈকি! নাহুম ভাল মানুষটির মতই বেশ জোর দিয়েই বললেন: নিশ্চয়ই দেখা করলাম। খাজনাটিও রাজাকে অর্পণ করলাম।

—বলেন কি!

—তারপর? লোকগুলির ব্যগ্র প্রশ্ন।

—তারপর আর কি! নাহুম আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটির বিস্তার করলেন।

লোকগুলির চোখ ছানাবড়ার আকার ধারণ করল এবং কিছুতেই নাহুমের কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। ওদের মধ্যে একজন তো আবার জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারল না:

—সত্যি করে বলুন তো, আপনি সম্রাটের কাছে খাজনা বাবদ কি এমন জিনিষ নিয়ে গেলেন যে এত সম্মান ও পুরস্কার পেলেন।

—কেন! যেটা আমি এখান থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম! হ্যাঁ। সেটাই তো বিলাম রাজাকে।

লোকগুলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। রোম সম্রাট তাহলে ধুলোবালি প্রভৃতির বদলে এত সোণা দানা হীরে জহরত দিতে ইচ্ছুক?

পরদিন প্রত্যুষে নাহুম জেরুসালেমের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার সাথে সাথেই ঐ লোকগুলি অনেক বস্তা ইঁট পাটকেল আর ধুলোবালি নিয়ে রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হল।

চতুর সম্রাট এবার পরম কৌতূহলে দেখলেন। এবার আর একটি লোক নয় বহু লোক নাহুমের মত থলি ভর্তি রাবিশ এনেছে। সম্রাট ওদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং ঐগুলি তাঁর এলাকার গোলমেলে জায়গাগুলিতে পরখ করার জন্য পাঠালেন।

কিন্তু হায়! যথা সময়ে রাজার কাছে সংবাদ এল, ধুলো ধুলোই রয়ে গেছে আর ইঁট পাটকেল ইঁট পাটকেলই। সম্রাট লোকগুলিকে দেশদ্রোহী বলে বিচারে তৎক্ষণাৎ ফাঁসির হুকুম দিলেন।

শিল্পকলার ইতিহাসে এমন সব প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে যার সঠিক উত্তর মেলে না।

মাইকুইস যখন ঘোষণা করলেন আল্টামিরার অপরূপ গুহাচিত্রের কথা তখন অনেকে বলল, লোকটা চালাকী খেলছে। পণ্ডিতরা রায় দিলেন, অসভ্য মানুষেরা কখনো এত ভাল ছবি আঁকতে পারে না। লোকটি মাদ্রিদের শিল্পী দিয়ে ওসব আঁকিয়ে নিয়ে খুব উঁচু দরের প্রত্নতাত্ত্বিক সাজবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু অন্যত্র গুহাগাত্রেও এই শিল্পধারার আরো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। না, তাহলে ব্যাপারটা ধাপ্পা নয়।

কিন্তু এত গভীর অন্ধকারে কি করে এমন সুন্দর ছবি আঁকা হল! কেমন করে সম্ভব হল এমন উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস।

এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি আজ পর্যন্ত।

অশান্ত পৃথিবী

নলিনীরঞ্জন মিত্র

ভিয়েৎনাম :

উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ আবার পুরোমাত্রায় সুরু হয়েছে। Peace offensive-এর ধোকায় কিছুদিনের জন্যে বিশ্ববাসীকে ভুলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিছুটা সুনাম কিনতে চেয়েছিল। শান্তিকামী বিশ্ববাসীর সব আশাকে নির্মূল করে ভিয়েৎনাম সমস্যা এক জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বারোবছর আগে স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তি আজ একরত্ত ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়েছে। এই চুক্তির সর্ত পালন করবার সদিচ্ছা এখন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নেই। তাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু তারা জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি সেই হেতু ঐ চুক্তির সর্ত মানবার বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারও একই ধরণের দলী। এরা আজ কম্যুনিষ্ট ভূতের ভয়ে ভীত।

মার্কিন সরকার ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের নাটকীয় ভাবে হনলুলুতে গমন এবং সেখানে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের সঙ্গে গলা পরামর্শ এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সদ্য প্রকাশিত মার্কিন বাজেটও এযুক্তিকে সমর্থন করছে। সমগ্র বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয় করা হবে। এই বাজেটকে 'guns and butter' বাজেট বলে অভিহিত করা হয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এতে butter থেকে gunsই বেশী। শুধু ভিয়েৎনাম যুদ্ধেই 10,300 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে। তারা যে শান্তি প্রস্তাব করেছিল শুধুমাত্র বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করবার জন্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে, Sunday observer পত্রিকার সংবাদদাতা Gavin Young লিখছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছে যে, 17th paralel উপর থেকে হানয় সরকার সৈন্য অপসারণ না করলে তাদের সঙ্গে কোন শান্তি আলোচনায় বসা হবে না। মার্কিন সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী

রক্তক্ষয়ী নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরও এক প্রবল জনমত গড়ে উঠছে। এবং একথা জলের মত স্পষ্ট যে, এই জনমতকে তোষামোদ করবার জন্যেই প্রেসিডেন্ট জনসন মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছেন।

ওয়াল্টার লিপম্যান আশা করেন যে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি যুদ্ধের দফা রফা করবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমেরিকা ভিয়েৎনাম থেকে চলে আসুক সেটা এরা চান না, কারণ তা'হলে সমগ্র এশিয়ায় চীনের আধিপত্য বিস্তৃত হবে।

বিখ্যাত সেনেটার ম্যান্সফিল্ড ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঘুরে এসে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টতই বিকৃত হয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি ভিয়েৎনামবাসীদের মনে ক্রমশঃ অসন্তোষ উৎপাদন করছে। বর্তমান সামরিক সরকার যে আমেরিকার বেয়নেটের জোরে টিকে আছে এ কথা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে "the secret version of this report is even grimmer then one published." তাঁর মতে এই যুদ্ধ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতে মার্কিন সরকার সুদূর প্রাচ্য ও ইউরোপে জনপ্রিয়তা হারাবে। সেনেটার Wayne Morse এবং আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ভিয়েৎনাম নীতি সমর্থন করেন না। কিছুদিন পূর্বে ওয়াশিংটনে এক শান্তি অভিযান চালানো হয়েছিল। এই অভিযানে ডেমোক্রেট, রিপাবলিকান ও সমাজ-তন্ত্রবাদীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন সরকার একে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেছেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য প্রতিদিন White Houseএ ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পত্র আসছে। সরকার এদের গুপ্তচর ও বিপ্লববাদী বলে নিন্দা করেছেন। বহু ছাত্রকে জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এর জন্যে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিল। একদল যুবক এর প্রতিবাদে তাদের registration card প্রকাশ্যে পুড়িয়েছে। সেনেটার Dodd এ সকল ঘটনাকে নিন্দা করে বলেছেন যে, এর দ্বারা সরকারের বৈদেশিক নীতিতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, যাদের বিনা দোষে যমভূমিতে পাঠানো হচ্ছে তারা প্রতিবাদও করতে পারবে না? এই প্রসঙ্গে কবি টেনিসনের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে 'Their's is but to do and die.'

কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমেরিকার প্রগতিশীল জনমতকে সরকার কণ্ঠরুদ্ধ করতে পারছেন না। তাই ক্রমশঃ শান্তি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। বিভিন্নস্থানে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে জনসভা হচ্ছে। এমনকি কম্যুনিষ্ট নেতাদের সেখানে বক্তৃতা করবার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে। বর্তমান কালের আমেরিকার ইতিহাসে বোধহয় এমন অজনপ্রিয় যুদ্ধ আর ঘটেনি। জনগণ আজ আর যুদ্ধ-বিগ্রহ চায় না। কারণ তাদের স্মরণকালের মধ্যে তারা দুটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দেখেছে। এমনকি যারা কোনদিন রাজনীতিতে মাথা ঘামাতো না তারা পর্যন্ত anti-war campএ যোগদান করছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুদ্ধচিত্র তাদের মনে বিতিষ্ণীকার সৃষ্টি করছে। যেখানে শিশু জনন্ত আগুনে পুড়ে মরছে, পরিত্রের কুঁড়েঘর মাটি মাটি করে জলছে, যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেই হতভাগ্য ভিয়েৎনামীদের জন্যে আমেরিকানদের হৃদয় যে একটু কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক। আমেরিকা-বাসীদের প্রশ্ন করে জানা যায় যে, শতকরা ২৩ জন বৈদেশিক নীতি সমর্থন করে না, ৫৫ জন সমর্থন করে আর শতকরা ১২ জনের কোন স্থির বক্তব্য নেই। শতকরা ৪৪ জন যে এই শাসনের প্রতি তাদের

সমর্থন ঘোষণা করেনি এটও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে এই ভিয়েৎনাম যুদ্ধে। লক্ষ লক্ষ সৈন্যও নিয়োজিত হয়েছে। কম্যুনিজম রোধ করবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক ফ্রন্টের সমুন্নয়ন করার চেষ্টা কি একবারও করেছে? ভিয়েৎনাম সমস্যা যে শুধু সামরিক সমস্যা নয় একথা যুক্তরাষ্ট্র বোধহয় এখনও বুঝতে পারেনি। ভিয়েৎকঙদের হাতে এখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিকাংশ এলাকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, জনগণের উপরও তাদের প্রবল প্রভাব। সুতরাং শুধু বেয়নেট দিয়ে ভিয়েৎনাম সমস্যার সমাধান করা যাবে না। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে স্বীকার করে তাদের সঙ্গে আলোচনার বসলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

সম্প্রতি উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো-চী-মীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনকে এক পত্রে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকা যে জেনেভা চুক্তি মানতে চায় না সে বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেছেন। International control commission-এর সভাপতি রূপে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভারতের ভূমিকার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গ্রেট ব্রিটেন

দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া সরকার তাদের বর্ণবিদ্বেষ নীতির জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিন্দাভাজন হয়েছে। পৃথিবীর সভ্য সমাজ একে বিধাহীনভাবে ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু যারা এই নীতিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করছে আর তলে তলে নিজেরা এই নীতি অনুসরণ করছে তারা আরও বেশী জঘন্য অপরাধ করছে। ইংরেজ জাত যারা সভ্যতার বড়াই করে তারাও আজ ঘোমর ঘেরে কালো আদমীর উপর অত্যাচার সুরু করেছে। সম্প্রতি কলকাতার এক দৈনিক সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, লণ্ডনে পাঠরত কয়েকটি যুবকের উপর কয়েকটি টেডি বয় মারমুখী হয়ে উঠে। তাদের অপরাধ তারা কালো। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। এবিষয়ে লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এমন বিক্ষিপ্ত ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। অফিসে রাজপথে, বাসে ভারতীয়দের লক্ষ্য করে নানারূপ কটু বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা হয়। অনেক সময়ে অজানা পথের সন্ধান করতে গিয়েও কৃষ্ণাঙ্গরা অবথা অপমানিত হ'ন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের প্রতি মন্তব্য করাও হয়ে থাকে। বিশ্ব রাজনীতিতে 'বৃটিশ সিংহে'র আজ আর কোন স্থান নেই। সব দেশ থেকেই তাদের লেজ গোটাতে হয়েছে। তাই বোধহয় বীর পুরুষেরা আজ নিরীহ ছাত্রদের উপর অত্যাচার করে তাদের গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

আভা পাকড়াশী

শীতের বেলা শেষ। এখন গরম পোষাক তুলে ফেলে গরমের জন্য নরম পোষাক চাই। ছুইয়ে বসন্ত সমীরণ, তু নহে সুখেরই জীবন—কারণ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম রয়েছে ঐ বসন্তের পেছনে। রয়েছে দারুণ বসন্ত রোগের ভয়। কিন্তু এখন আকাশে বাতাসে বসন্তের ফুল ফোটানর খেলা। পাতা ঝরানর বেলা। ফুল নয়নের শোভা, সুশোভিতা নারীও নয়নমনলোভা। তাই আসুন আমরাও ফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাজি। ফুল যত সাদা তার গন্ধ তত মনোরম। বেল, জুঁই, রজনী-গন্ধা! সবুজে সাদায় কেমন সুন্দর লেগেছে!

গরমের দিনে উৎকট চড়া রংএর শাড়ী না পরে যদি অমনি সাদার মধ্যে সবুজ ডুরে টাঙ্গাইল বা সাদার ওপর হাল্কা রংয়ের ছাপা শাড়ী ব্যবহার করেন সুন্দর দেখাবে। ময়লা হবার ভয় থাকলে হাল্কা রং বেছে নিন। গোলাপী, হাল্কা বাসন্তী, অতসী রং কিম্বা অপরাজিতা। চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী···। আমাদের গরম দেশে অমনি হাল্কা রং ব্যবহার করলে গরমও কম লাগবে। আরামও পাবেন।

এর একটা বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। কালো রং সূর্যের তাপ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বেশী টানে। লালও কম যায় না। আবার হলদে তাপ ফিরিয়ে দেয়। সাদা তাপ টানে অনেক দেরীতে।

গরমের সময় সুতি শাড়ীই ভাল। ঐ মুর্শিদাবাদী, কাশিরী, টেরেলীন, টেরিকট সব আবার আগামী বছরের শীতের জন্য তুলে রেখে দিন। যে কোন হাল্কা রংয়ের ছয়গজ তয়েল কিনে শাড়ী করতে পারেন। আঁচলায় আর পায়ের কুঁচিতে লেস বসিয়ে বৈশিষ্ট্য আনুন। ঐ রংয়েরই লেস বসান ব্লাউজ করুন। একটি ম্যাচ করা ব্যাগ হাতে নিয়ে চটি পায়ে চলুন, দেখুন কি চমৎকার লাগবে। পুরোন শাড়ীর ভাল পাড়ও ঐভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

এসময় ছুঁচের কাজের লাক্ষ্ণৌ-এর চিকন শাড়ীগুলিও বেশ আরাম দায়ক আর সুন্দর। অমনি কাজ করা ব্লাউজ পরুন ঐ সঙ্গে, বেশ একটি আভিজাত্য এনে দেবে আপনাকে। আপনার ঐ ফুরফুরে হাল্কাটীর চেয়ে মজবুতও হবে। আব্রুও থাকবে।

ঐ আব্রুর কথা বলতে গেলে প্রথমে ব্লাউজ এর কথায় যেতে হয়। যত গরম পড়বে উত্তরোত্তর জামা উঠবে ওপর দিকে আর হাতার স্থান নেবে কিতে। বলতে গেলে শুনতে হবে যারে, এইতো ক্যামান। বুঝলাম ক্যামান! আব্রু বা কতীর কথা বাদ দিলেও মানাচ্ছে কিনা সেটা তো দেখতে হবে। একেবারে হাড়বের করা একটি রোগা মেয়ে যদি অমনি হাতকাটা পিঠ কাটা ব্লাউজ পরে কেমন দেখায় তাকে! আবার বিপরীত, যদি উত্তর তিরিশা একটি থের থল থলা মহিলা শরীরের সমস্ত মেদ মাংস প্রকট করে অমনি জামা পরেন। কেমন লাগে দেখতে! তাই বলছি একটু রোগা মেয়েরা পাতলা তংয়ের বেশ ফুঁচি দেওয়া টিলে জামা পরুন। বা লেশ বসান বড় হাতের জামা ব্যবহার করুন। যাঁরা স্বাস্থ্যবতী তাঁরা ম্যাগিয়া হাতা পরতে পারেন বা চওড়া কাঁধ ঢাকা স্লিভলেশ, কিন্তু হাতা শূন্য বা পিঠ শূন্য জামা কোন ক্রটীশীল মহিলারই পরা উচিত বলে মনে হয় না।

বরং একটু খাপি সাদা আস্তি বেছে নিন। যাতে বাহু ভিজলেও বে-আব্রু না হয়। আর তারই রকমফের ব্লাউজ পরুন। একটু এম্ব্রডারী করা বা লেশ বসান বেশ কোমর অবধি নীচু ব্লাউজ পরুন। যে কোন ফিকে রং শাড়ীর সঙ্গে সাদা ভাল মানাবে। কিম্বা শাড়ীর সঙ্গে রং মিলিয়ে লেস কিনে তলায় লাইনিং দিয়ে তার ব্লাউজ করুন। যে কোন পার্টিতে পরে যেতে পারবেন! ব্লাউজ-এর কোমরের দিকে টাইট দিন ফিগারটি সুন্দর দেখাবে। গোরা রোগা তাঁরা সব সময় ছোট গলার জামা পরবেন। হাতের তলারদিকে বা গলায় যদি লেশের ফুঁচি বা কাপড়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে লাগিয়ে নেন নতুন ক্যামানও হবে মানাবেও সুন্দর। যাঁদের স্বাস্থ্য ভাল তাঁরা বড় গলার জামা পরতে পারেন।

এবার পেটিকোট এর কাটএ আসি। এখন দেখি একেবারে বোল কি ২ ছয়কাটের টাইট পেটিকোট এর খুব চলন হয়েছে। কাপড়ওপরা হয় খুব টাইট করে। হয়ত এতে চলা ফেরার সুবিধে হয় কিন্তু শরীরটি সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে উঠে দুই বিভক্ত এর জায়গায় দুই পাঁচাই ঘটায় বেশী। আবার ঐ মানানর প্রশ্নও আছে। অমন টাইট করে পেঁচিয়ে কাপড় পরা রোগা মেয়েদের মনে হয় একটি সচল সম্বল রেখা। ওরা যদি বেশ বড় ঘেরের এক কাটের সায়া পরেন তার ওপরে আলগা করে একটু বড়া মাড় দেওয়া কাপড় পরেন তাহলে ভাল দেখাবে। দরকার মনে হলে আচলটিকে কাঁধের কাছে ব্লাউজের নীচের থেকে একটি পিন দিয়ে আটকে নিতে পারেন।

অন্যেরাও একটু আঁচল বড় রেখে ঐ আলগা ভাবে শাড়ী পরলে ক্ষতি কি! বেশ তো সুন্দর দেখায়। আব্রু আর শালীনতাও বজায় থাকে তাতে।

আর একটি কথা, বেশী পাতলা রঙীন শাড়ী পরতে হলে তার নীচে ঠিক সেই রংএর সায়া ও ব্লাউজ ব্যবহার করবেন। এতে করে শাড়ীটি খুলবে ভাল আর আপনাকেও মানাবে ভাল।

এবার মুখটিকে কোমল প্রসাধনে সাজিয়ে আর যেটি ঘিরে ঠাণ্ডা রং-এর শাড়ীটি সুষ্ঠুভাবে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ুন, দেখবেন ঐ বসন্তমুক্ত সজতোটা ফুলটির মতই লাগবে আপনাকে।

মৃণাল বাহুর সন্ধানে

সুরঞ্জনা সেন

সৌন্দর্য কি শুধু মুখে? নৃত্যের নানা মুদ্রা প্রকাশিত হয় আঙুলের সাহায্যে। আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যোড় হাতে নমস্কার ক'রে। দেবতাকে অন্তরের প্রার্থনা জানাই একই ভাবে। বিবাহের অন্য নামই তো পাণি গ্রহণ। লেখনী চালনা, ছবি আঁকা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে আরম্ভ, সূচিশিল্প, রান্না, এবং যন্ত্র পরিবেশন, উপহার বা উপকারে হাত বাড়িয়ে দেয়া সব কিছুরই অবলম্বন হাত। প্রেম, স্নেহ, শুশ্রূষা—কিছুই হাতের সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হয় না। হাত কখনো লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এমন যে হাত তা সুন্দর হওয়া চাই বইকি। অনেকের হাত এমনিতেই ভারি সুন্দর। দারুণ আকর্ষণীয়। যাদের তা নয়, তারাও কিছু একটু চেষ্টা করলেই হাত দুখানিকে মসৃণ এবং সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন।

সব পরিশ্রমের মূলেই হাত। কত কাজই না তাকে করতে হয়। নানা রকম ময়লা পরিষ্কার থেকে শুরু ক'রে মেজে ধোয়া, গৃহসজ্জা, টাইপ করা, বাগান করা, চুল বাঁধা, প্রসাধন ইত্যাদি বিচিত্র, বিভিন্ন কাজ।

এমন যে পরিশ্রমী হাত, তার যত্ন কিন্তু আমরা প্রায়ই নিই না। অথচ, মনে রাখবেন দেহের অন্যান্য অংশের ত্বকের চাইতে হাতের ত্বক অনেক বেশি যত্নের দাবী রাখে। হাত দুখানিকে শুধু খাটিয়েই নেবেন? তাদের একটুও পরিচর্যা করবেন না?

আপনি যে-কোনো জীবিকার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকুন কিংবা যে-রকম কঠোর কাজই করুন না কেন, নিয়মিত যত্ন নিলে আপনার হাত দুখানি নিশ্চয়ই কোমল, মসৃণ, এবং সুন্দর থাকবে; দিন কয়েক যত্ন নেবার পরেই দেখবেন লোকের সামনে বেশ গর্বিতভাবে আপনার হাত দুখানি রাখতে পারছেন।

হাতে লাগাবার জন্য বর্তমানে বহু হ্যাণ্ড-লোশন বা ক্রিম পাওয়া যাচ্ছে। জল লেগে বা অন্যভাবে আমাদের হাতের যে স্বাভাবিক স্নেহজ তৈল নষ্ট হয়ে যায় তার স্থান পূরণ ক'রে ওই সব ক্রিম বা লোশন। ময়লা পরিষ্কার বা ওই ধরণের কোনো কাজ করার আগে হাতে একটু ক্রিম লাগিয়ে নেবেন।

হাতের যত্ন নিতে গেলে নখের যত্নও নেয়া চাই। নখ যদি রুক্ষ বা পাণ্ডুটে হয় তবে এমন সব খাবার খাবেন যাতে ভি ভিটামিন থাকে। নখের স্বাস্থ্য উদ্ধার অবশ্য একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

সুন্দর হাত সদ্য-ফোটা একগুচ্ছ ফুলের মতো। হাত শুধু আপনার কাজ ও জীবিকার অবলম্বন নয়, রূপেরও প্রকাশ। তাই শুধু মুখের নয়। হাতেরও যত্ন নিন।

সুন্দরী হতে চান ?

সে'নালি রায়

এ-কথা ঠিক সুন্দরী হয়ে সকলেই জন্মায় না ; তবে চেষ্টা করলে অনেকেই রূপ-রঙ্গ আয়ত্ত করতে পারেন। অবশ্য, এর জন্য চাই ধৈর্য্য এবং সাধনা।

সুন্দরী হতে হ'লে প্রথমেই আসে ফিগার বা অবয়বের সৌষ্ঠবের কথা। সত্যিকারের তন্বী হতে গেলে যেমন খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রতিদিন নিয়মিত শরীর-চর্চা। প্রত্যহ অন্ততঃ দশ মিনিট সহজ কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার। দাঁত মাজা যেমন জরুরী, তেমনি এই অভ্যাসটিকে জরুরী ব'লে মনে করবেন। অভ্যাসটি অব্যাহত রাখবেন সারা জীবন। ফল পেতে কতদিন লাগবে তা বলা শক্ত। ব্যক্তি বিশেষের শরীরের গঠনের উপরই তা নির্ভর করবে। কারো পক্ষে দু'মাসই যথেষ্ট, আবার অনেকের বেশি সময় লাগতে পারে। সৌষ্ঠব আয়ত্ত করার সংক্ষিপ্ত কোনো রাস্তা নেই। কাজেই ধৈর্য হারালে চলবে না।

অবয়ব (ফিগার) সুগঠিত হবার পর নজর দিতে হবে ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিকে। ত্বক হবে যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি কোমল সজীব ও স্নিগ্ধ। ত্বকের পরিচর্যা সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা 'গল্প ভারতী'র পাতায় আগেই বলা হয়েছে।

এরপর সুন্দর ক'রে তুলতে হবে চোখ। আমাদের দেশে কাজল বা সুর্মার প্রয়োগেই অবশ্য মেয়েদের চোখের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। তবে পাশ্চাত্য মেয়েদের দেখাদেখি ভ্রূ আঁকার রেয়াজও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। প্রায় সব স্টেশনারী দোকানেই আজকাল ভ্রূ আঁকার পেন্সিল কিনতে পাওয়া যায়। মুখের গড়ন অনুযায়ী ভ্রূ আঁকলে মেয়েদের রূপ যে অনেকখানি বাড়ে সে তো বলাই বাহুল্য। তবে তার জন্য আগে এঁকে দেখতে হবে কোন ভ্রূতে আপনাকে মানায়। বহু নিতে হবে চুলেরও। আর কোন ভঙ্গীতে খোঁপা বাঁধলে বা বিনুনী করলে আপনাকে মানায় তা বের করতে হবে। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে নারীর নানা সৌন্দর্যের মধ্যে কেশের সৌন্দর্য একটি। এ কথাটি যেন ভুলে যাবেন না।

আমাদের দেশের মেয়েরা আগে পান খেয়ে ঠোঁট দুটিকে লাল টুকটুকে ক'রে তুলতো। প্রাচীন কাব্যে এরকম ঠোঁটের বর্ণনাও পাই প্রচুর। বর্তমানে ওদেশের দেখাদেখি অনেকে মেয়েরাই লিপষ্টিক ব্যবহার ক'রে থাকে। এটা অস্বাভাবিক অভ্যাস। অনেক সময় দেহের পক্ষেও অহিতকর। তাম্বুলরাগ অনেক বেশি স্বাভাবিক ও সুন্দর বাস্থ্যেরও অনুকূল।

যে কথাগুলি বলা হলো তা হয়তো অতি সাধারণ। তবু এইভাবে অভ্যাস ক'রে তুললে অল্প দিনের মধ্যে দেখতে পাবেন আপনিও সত্যি সুন্দরী হয়েছেন।

স্নান ঃ একটি আশ্চর্য প্রসাধন

শিপ্রা রায়

শ্রাবণের ধারা-স্নানে শ্যামল হয়ে ওঠে তরু-লতা। শিশির-স্নানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বনে-উপবনে ফুল। তেমনি, মানুষও সুন্দর হয়ে ওঠে স্নানের পরে। স্নান নিয়েই একটি প্রসাধন। কিন্তু কী উপকরণ ব্যবহার, আর কী ধরণের স্নানে আপনার সৌন্দর্য বাড়ে তা হয়তো আপনার জানা নেই। জানেন কি যারা সুলাঙ্গিনী তারা স্নানের সাহায্যে তন্বী হতে পারেন? স্নান রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়াকে সাহায্য করতে পারে। ভিটামিন-সমৃদ্ধ জলে শুয়ে থাকাও কত স্বাস্থ্যকর। শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে স্নানের সমকক্ষ আর কিছু নেই। বিনিদ্র রাত্রির পরে প্রত্যূষে স্নান এক আশ্চর্য শুশ্রূষা।

জল খুব একটা গরম থাকলে, যদি তাতে গায়ে ছ্যাঁকা লাগলে, তা দিয়ে স্নান করবেন না। কারণ তাতে আপনার স্বাভাবিক দেহজ তৈল, যা আপনার ত্বকে সঞ্চিত রয়েছে, নষ্ট ক'রে দেয়। গরম জল ব্যবহারে চামড়া কুঁচকে যেতে পারে। বাচ্চাদের স্নান করাবার আগে যেমন জলের উষ্ণতা পরীক্ষা ক'রে দেখেন তেমনি নিজেও স্নান করার আগে জল কতখানি উষ্ণ দেখে নেবেন। আর উষ্ণতা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাইলে থার্মোমিটার দিয়ে স্নানের জল পরীক্ষা ক'রে নিতে পারেন। জলের উষ্ণতা যেন থাকে ১০০—১০৫ ডিঃ ফাঃ। জল যদি কঠিন (hard water) হয় তবে তাতে ছোট এক চামচ সোহাগা মিশিয়ে নেবেন। ত্বক সুরভিত করতে চান? তাহলে সাবান একটু সুগন্ধি তৈল গায়ে মেখে স্নান করবেন।

যাদের দেহের ত্বক এমনিতেই শুষ্ক তারা তো বটেই, তাছাড়া শীতের দিনে সকলেই সপ্তাহে অন্তত একবার এক চামচ অলিভ-অয়েল কিংবা বাদাম তেল গায়ে মেখে স্নান করবেন। যাদের ত্বক শুষ্ক ধরণের তারা প্রতিদিনই স্নানের আগে ওই দুটি তৈলের একটি গায়ে মেখে নেবেন। যে-রকম তৈলই আপনি ব্যবহার করুন না কেন, তা থেকে উপকার পেতে হ'লে জলে গা ডুবিয়ে গা ম্যাসেজ করা দরকার। যেন ছোট-ছোট বৃত্ত আঁকছেন এমনি ভাবে পায়ের গোড়ালী থেকে ঘাড় পর্যন্ত সমস্ত শরীর ম্যাসেজ ক'রে নেবেন। কবোষ্ণ জল আপনার দেহের রোমকূপগুলি উন্মুক্ত ক'রে দেবে, আর ম্যাসেজ করলে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হবে, ফলে আপনার দেহ-ত্বক সর্বদাই থাকবে কোমল এবং সুন্দর।

স্নানের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সাবানের ভূমিকা নিশ্চয়ই বিশিষ্ট। কিন্তু কোন সাবান আপনার দেহের পক্ষে সব চাইতে উপযোগী তা আপনাকেই আবিষ্কার করতে হবে। এর জন্য হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। তা লাগুক না। যাদের শরীর এমনিতেই তেল-তেলে তারা যে সাবান ব্যবহার করবেন, যাদের দেহ-ত্বক শুষ্ক তারা নিশ্চয়ই সে সাবান ব্যবহার করবেন না। সুগন্ধি প্রসাধন ব্যবহার করলে যাদের ত্বকে নানা উপসর্গ দেখা দেয় তারা একেবারে সাধারণ সাবান ব্যবহার করবেন। ত্বকের প্রকার ভেদে যে সাবান শুধু ময়লা পরিষ্কার নয়, রোগ বীজাণু ধ্বংস করবে। ত্বককে সজীব করবে সেই সাবান বেছে নিন। যাদের দেহ-ত্বক শুষ্ক তারা ক্রিম সোপ বা বেবী সোপ ব্যবহার করবেন।

———

চলতি দুনিয়া

আমেরিকায় বন্ধ্যা রমনীদের কিট

আমেরিকায় সম্প্রতি এমন একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যা সেবনে বন্ধ্যা রমণীরাও সন্তানবতী হবেন। আর সেই ওষুধের জন্য আমেরিকান মহিলাদের লগ্ন কিট পড়ছে রোজ। এই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য এক একজন নারীকে তিন চারটি কি পাঁচটি সন্তানও এক সঙ্গে প্রসব করতে হতে পারে। তা জেনেও কিন্তু ওই মহিলারা পিছু পা হচ্ছেন না। সন্তানহীনতা তাদের বিবাহিত জীবনকে এমনি দুঃখময় ক'রে তুলেছে। সেই দুঃখের অবসান ঘটাতে তারা কৃতসংকল্প। ওই অভিনব ওষুধ আবিষ্কার করেছেন ইতালির একজন চিকিৎসক পিয়েত্রো ডোমিনি। ওষুধটি ব্যবহারের বিপদই হলো একসঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম দিতে হতে পারে। ব্রিটিশ চিকিৎসকরা অবশ্য দাবী করছেন যে তারা ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম ; মানে, একসঙ্গে যাতে কেবল একটি সন্তানই হয় তার ব্যবস্থা তারা করতে পারবেন। ক্যাথলিক চার্চ এই ওষুধকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের দেশে এখন চলেছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা আর আমেরিকার বন্ধ্যা মেয়েরাও চাচ্ছে মাতৃত্বের গৌরব।

রুপালী পর্দায় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন

ঠিক যেন একটি বোমার বিস্ফোরণ। যে বিস্ফোরণ শেষ হতে সময় নেয় অনেকখানি। রুপোলী পর্দায় চুম্বনের দৃশ্যটি চলেছিলো পাক্কা ছিয়াশী সেকেণ্ড। দর্শকরা তো হতবাক। অবশ্য, সিনেমা জগতের এক মুখপাত্র জানালেন যে রুপালী পর্দায় এটাই সব-চাইতে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন নয়। তবে হ্যাঁ, চোখ-ধোঁধা রেখে চুম্বন সব চাইতে বেশি সময় ধ'রে এই প্রথম সিনেমার পর্দায় দেখা গেলো।

পুরুষদের জন্যও গৃহবিজ্ঞান !

গৃহ-বিজ্ঞান জানা শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদের পক্ষেও প্রয়োজন। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর হোম্যাল এডুকেশন-এর অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে রাজাসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান

শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা হওয়ার জন্য প্রত্যেক পুরুষের গৃহ-বিজ্ঞান জানা একান্ত কর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই সত্যটি এ-যাবৎ অবহেলিত হয়েছে।

স্বামীর উপর বেশি কর্তৃত্ব খাটাতে যাবেন না :

শিশুকে বেশি শাসন করলে সে নিতান্তই ভীরু এবং মো-বেচারা হয়ে পড়ে। সে হয়ে পড়ে নাজুক। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই তার থাকে না। ঠিক তেমনি স্ত্রী যদি স্বামীর উপরে সব-সময়ে বেশি কর্তৃত্ব ফলাতে যায় তাহলে তার পরিণাম হয় বিষময়। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন স্বামী হয়তো স্ত্রী-র আবদার মেনে নিতে পারেন; কিছুদিন পরেই তিনি যখন বুঝতে পারেন যে স্ত্রী-র দাস হয়ে পড়ছেন তখন হয় তিনি নিতান্তই নির্জীব, ছন্নছাড়া জীবে পরিণত হন, নয়তো স্ত্রী-কে ত্যাগ করেন। মোটকথা, জীবনে বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশঃ ভোঁতা হ'য়ে আসতে থাকে। স্ত্রী-রা মনে রাখবেন বেশি কর্তৃত্ব ফলানো স্বার্থপরতারই নামান্তর।

ভাগ্যবান স্বামী

বস্টন-এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রদূত আমের জন্য বেঁচে গেছেন। যখন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন তার স্ত্রী তখন গলায় ইলেকট্রিক তার জড়িয়ে সুইচ টিপে দেয়। স্বামীর সৌভাগ্য স্ত্রী আর্থ কানেকশন করতে ভুলে গিয়েছিল। তাই স্বামী বেচারা শেষপর্যন্ত বেঁচে গেছেন।

বিয়ের হিড়িক

আমেরিকার খ্যাতনামা দৈনিক 'আলি আহমার' জানাচ্ছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিবাহ নিষিদ্ধ ক'রে দিচ্ছেন এ-রকম একটা গুজব শুনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গ্রামে বিয়ের হিড়িক প'ড়ে গেছে। ছেলের বাবারা নগদ টাকার পরিবর্তে প্রমিসরি নোট নিয়েই ঘরে ছেলের বউ আনছেন। একমাত্র একটি এলাকাতেই একমাসে হাজার তিনেক বিয়ে হয়েছে। কয়েক জায়গাতে তো বিয়ের সার্টিফিকেটের কাগজই ফুরিয়ে গেছে।

মেয়ের নাম সুনা

বাগদাদের এক মুদী দোকানী মেয়ের নাম রেখেছেন সুনা। মেয়েটি জন্মেছে ১ই ফেব্রুয়ারী। চন্দ্রপৃষ্ঠে নবম সুনার গৃহ অবতরণের দু'দিন পরে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনব উপহার

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য টোকিয়ো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এক অভিনব উপায়ে অভিনন্দন জানাবে ব'লে স্থির করেছে: টোকিয়ো শ্রীমতী গান্ধীকে উপহার দিচ্ছে একটি মেয়ে হিপোপোটেমস। আগামী ২৯শে মার্চ নাগাদ সেটি আসবে কলকাতায় পৌঁছবে।

বাসে মেয়ে ড্রাইভার

ড্রাইভারের অভাবে লণ্ডনের অনেক এলাকায় বাস-সার্ভিস চালু রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই, সেখানকার বাস ইউনিয়নের নেতারা মিলে স্থির করেছেন কয়েকটি রুটের বাসে মেয়ে ড্রাইভার নিযুক্ত করা হবে।

ফ্রান্সে ফলের রসের চাইতে মদ অনেক সস্তা

ব্যাপক হারে মদ্যপান করাটাই ফরাসীদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ। সেখানে সুরাপানের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবছর প্রায় ২০,০০০ হাজার লোক অকালে প্রাণ হারায়। এজন্য ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবও ওদেশে খুবই বেশি। তবু সুরার, বিশেষ করে বিয়ারের, চাহিদা ওদেশে দিন-দিনই বেড়েই চলেছে। এর কারণ, ফ্রান্সের কোনো কাফেতে এক গ্লাস মদ যে দামে বিক্রি হয় তার চারগুণ দামে বিক্রি হয় এক গ্লাস ফলের রস। সস্তায় পাওয়া যায় বলে লোকে তাই মদে আকণ্ঠ ডুবে থাকে অর্থাৎ জেনে শুনে আত্মহত্যা করে।

আমেরিকায় ১৩ বছর বয়সে মদ্যপান সুরু

আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন আইনের বাধা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার প্রায় ছেলে-মেয়েরা ১৩ বছর থেকে সুরাপানের সু-অভ্যাসে লিপ্ত হয়। এর পরিণামও হয় খুবই বিষময়।

বিউটি ইনস্টিটিউট

নর-নারীকে কী করে সুন্দর ক'রে তোলা যায় এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রুশ সরকার মস্কোতে 'বিউটি ইনস্টিটিউট' নামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রসাধন বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরণের সংস্থা এই বোধহয় প্রথম স্থাপিত হতে চলেছে। মুখ আর দেহের রূপ লাবণ্য বৃদ্ধিই হবে ওই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। খবরটা শুনে পৃথিবীর সৌন্দর্য-রসিক আর সৌন্দর্য পিপাসুরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

আর ভয় নেই এবারে বেত্রাঘাত পরীক্ষায় পাশ

ছেলেকে ফ্রান্সের একটি কঠিনতম পরীক্ষা পাশ করাতে গিয়ে ছেলে শুদ্ধ বাপ আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে। আগামী ১৫ই মার্চ শুনানী।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ছেলেটির কব্জিতে গ্রামোফোনের মোড়া একটি ট্রান্সমিটার সেট লুকানো ছিল আর বাবা পরীক্ষা হলের ঠিক নীচে গাঁঠা বই নিয়ে একটি মোটর গাড়িতে বসা। নিজের নিজের ট্রান্সমিটার সেট মারফৎ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদান চলছিল। বাপ ছেলের কাছ থেকে প্রশ্ন জেনে নিজের সেট মারফৎ ছেলেকে উত্তর পরে শোনাচ্ছিলেন।

পুণ্যজীবনস্মরণী

বসন্তকুমার পাঠক

অবস্থা কোনদিনই স্বচ্ছল ছিল না। তার ওপর তাঁর ছিল যাযাবরের জেলে যাওয়া এবং জেলের বাইরে এসে আবার জেলে যাবার তোড়জোড় করা। শ্রীকৃষ্ণপুরুষা যে অনহনীয় দুঃস্থতার মধ্যে দিনযাপন করছে এ সংবাদ রাখবার তাঁর সময় কোথায়?

আর তেমনিই ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। স্বামীর দেশ সেবায় এতটুকুও বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নি কোনদিন, নিজের অভাব অনটন পুরুকস্তাদের অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে তাঁকে বিমনা করতে চাননি। হাসিমুখে সহ্য করেছেন সেই অপার সাংসারিক দুঃখ আর মনোবেদনা।

ভাল আহার বা জামা কাপড় তো দূরের কথা, ছেলেমেয়েদের অসুখে চিকিৎসা করাবার মতো সামর্থও তাঁদের ছিল না। বিনা চিকিৎসায় একটি শিশুকন্যা মারা গেল।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। আর ললিতা দেবীও তাঁর কাছে সামান্যতম অনুযোগ করেও তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার প্রয়াস পাননি। অর্ধাশনে উপবাসে কাটিয়েছেন হাসিমুখে, স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে আর ভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রাণের আকুতি জানিয়ে।

এক ভারতীয় নারীর চারিত্রিক মহিমায় এ এক আশ্চর্য উদ্ঘাটন।

লালবাহাদুর জেলে আটক, সেখানে বসে খবর পেলেন, স্ত্রীর যুরিসি হয়েছে, সেরে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর পুষ্টিকর আহার্যের প্রয়োজন, বিশেষ করে দুধ তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

ললিতা দেবী জেলে গেছেন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। লালবাহাদুর বললেন, তোমায় রোজ দুধ খেতে হবে পুরো এক গেলাস করে। শরীরের প্রতি অবহেলা করা চলবে না। তুমি পড়লে, ছেলেমেয়ে, আমার বুড়ো মা—এদের দেখবে কে!

মনে মনে বিষাদের হাসি হাসলেন ললিতা দেবী। রোজ এক গেলাস করে দুধ খাবার সঙ্গতি কোথায়? মুখে বললেন? আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমি ভাল আছি।

—না, না। ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। দুধ তোমায় খেতেই হবে। যেমন বললাম, রোজ পুরো এক গেলাস। কেমন, আমার কথা রাখবে তো?

স্বামীর মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করে স্ত্রী বললেন, রাখবো।

ঘরে ফিরলেন ললিতা দেবী। স্বামীর কাছে কথা দিয়েছেন, সে কথা রাখতে হবে বৈকি! মুখেচোখে বার করলেন একটি ছোট্ট গেলাস, কচি ছেলের জন্য যা দুধ খাবার গেলাস। ব্যস। সমস্যা মিটে গেল। সেই ছোট গেলাসের এক গেলাস দুধ খেতে লাগলেন ললিতা দেবী।

কয়েকদিন পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি শুধোলেন, কেমন, রোজ দুধ খাচ্ছো তো?

মাথা নাড়লেন ললিতা দেবী।

—এক গেলাস পুরো?

—হ্যাঁ, এক গেলাস পুরো।

শুনে তাঁরী খুসী হলেন লালবাহাদুর!

• • • •

দেশ স্বাধীন হল। লালবাহাদুর মন্ত্রী হলেন। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরম। আশুতোষের সর্বত্যাগীর সংসার-চেতনা জাগল না। যাকে বলে—আখের গুছিয়ে নেওয়া—সে ধার দিয়েও গেলেন না তিনি। বহু সতীর্থ সহকর্মী দিব্যি পাঁসালো হয়ে উঠল। তাঁদের গাড়ী হল বাড়ী হল ব্যাঙ্কে টাকা জমল। কিন্তু লালবাহাদুর যে ফকির সেই ফকির!

আর কি আশ্চর্য, সুখের দিনেও স্ত্রীর কাছ থেকে একদিনের জন্যেও তিনি পেলেন না কোন তাগিদ, কোন খাঁচ্‌কা, কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা!

আজ শুনে বিহ্বল বোধ করছি যে, বাড়ী তো দূরের কথা, একফোঁটা জমিও নেই তাঁর, এমন কি জীবনবীমা পর্যন্ত নেই। ব্যাঙ্কে জমা টাকা তো নেই একটিও, উল্টে দেনা, কাজের সুবিধার জন্যে একটি পুরণো মোটর কিনেছিলেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার করে, সে ধার শোধ দেওয়া হয়নি।

আজকের এই স্বার্থান্বেষী দেশনেতা, সুবিধাবাদী জনসেবক, অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী আর কালোবাজারী পুঁজীবাদীদের ভীড়ে, সর্বব্যাপী নীতিবোধহীনতার যুগে লালবাহাদুরের মতো পুরুষ, ললিতা দেবীর মতো নারী—বহু মহামানবের দেশ এই ভারতবর্ষেই সম্ভব, অন্য কোথাও নয়।

• • • •

কেতাব তিনি বেশী লেখেননি, বক্তৃতাও অবশ্য করেননি, চিঠিপত্রও বেশী নেই।

তাঁর একটি চিঠি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেই একটি চিঠির মধ্যেই তাঁর মহৎ স্বরূপ প্রকাশিত।

১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে লালবাহাদুর এক সরকারী কর্মচারীকে লিখছেন—"আমরা কংগ্রেসকর্মীরা যেরকম দ্রুতবেগে অবনতির দিকে নেমে চলেছি তা খুবই ভয়াবহ। জেলায় জেলায় সরকারী শাসনব্যবস্থা দ্রুত নিম্নগামী। এইরকম অবস্থায় আমরা যদি বাইরে এসে কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের পদত্যাগ সার্থক হতে পারে।"

নিজের সাংসারিক অসুবিধা এবং দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে লালবাহাদুর লিখছেন—"আমি এখনও আমার বাড়ী ছাড়িনি। তবে শীঘ্রই আমরা একটা ছোট বাড়ীতে চলে যাব। আহারের দিক থেকে আমরা তরকারী এবং দুধ খাওয়া ত্যাগ করেছি। আমরা নিজেরাই আমাদের কাপড়চোপড় সাফ করতে আরম্ভ করেছি। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে যে সাহায্য এবং সহযোগিতা পাচ্ছি তা খুবই

আন্তরিক এবং তার তুলনা হয় না। তাঁর কাছ থেকে আমি যে শক্তি ও সমর্থন পাচ্ছি তাতে মনে হয় আমরা একপ্রকার চালিয়ে নিতে পারব।..... গান্ধীজীর কথা মনে হলে চোখে জল আসে। আরাম এবং সরকারী পদের মোহ আমাদের গ্রাস করেছে। সরকারী পদে সেবা ও আত্মনিবেদনের প্রেরণা নেই। গান্ধীজীর ত্যাগ ছিল চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ।"

• • • •

ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়েই মানুষটির পরিচয় আমরা পাই। ১৯৪৮ সাল। তিনি তখন উত্তর প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পি. ডব্লু. ডি'র লোকেরা একদিন তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁর ঘরের একটা জায়গা খুঁড়তে লাগল। কি ব্যাপার? না, ঘরে একটি তাপনিবারক ঠাণ্ডা পাখা লাগানো হবে। ছেলেমেয়েরা খুব খুশী। অসহ্য গরমে তারা এই ঘরে আরাম পাবে।

লালবাহাদুর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ব্যাপার জেনে বললেন, না, ঠাণ্ডা পাখা লাগাবার দরকার নেই। অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। এরপর তারা যখন এলাহাবাদে গিয়ে থাকবে তখন ছেলেমেয়েরা গরম সহ্য করতে পারবে না।

চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। একদিকে দারিদ্র্য, অপরদিকে বৃটিশ রাজশক্তি। দ্বিমুখী সংগ্রাম। এই সময় একটি ঘটনা তাঁর জীবনে বড় বেদনাদায়ক। তিনি তখন জেলে। সে সময় তাঁর একটি এক বছরের মেয়ে টাইফয়েডে মারা যায়। পয়সার অভাবে ললিতাদেবী তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

• • • •

১৯৫৩-৫৪ সাল। তিনি তখন রেলমন্ত্রী। সাসারামে চলেছেন মিটিং করতে। পরণে ছিল জওহরকোট। সাসারামের প্রচণ্ড গরমে সেই কোট আর গায়ে রাখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কোট ধোলবারও উপায় নেই। কারণ তল্লাটার সার্টের কলারটা জীর্ণ শতছিন্ন। কোটের নীচে থাকলে তার সে দশা চোখে পড়ে না। সুটকেসে আরও যে দু-তিনটে সার্ট আছে তাদেরও সেই অবস্থা। তাহলে এখন কি করা?

তাঁর একান্ত-সচিব সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি ঝটিতি সার্টগুলি নিয়ে এক দর্জির কাছে গেলেন এবং সেগুলি সারিয়ে নিলেন। দর্জিটি ভাবল, কোনো গাঁও থেকে কোনো গরীব-গুর্বো লোক এসেছে এ শহরে, এগুলি তারই সার্ট। কিন্তু যে লোক সার্ট সারাতে এনেছে সে এসেছে একটা মস্ত মোটর গাড়ীতে। দর্জিটি কৌতূহলী হয়ে ড্রাইভারের কাছে গেল। তারপর যখন শুনল যে যাঁর সার্টগুলি সে মেরামত করল তিনি একজন দিল্লীর মন্ত্রী, তখন দর্জির দুচোখ বিস্ময়ে কপালে উঠল।

• • • •

নাতি আবদার ধরেছে তাকে একটা নতুন স্লেট কিনে দিতে হবে। মাসের শেষ। নাতিকে বুঝিয়ে বললেন, আর দুদিন সবুর কর বেটা, মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেলেই তোমায় স্লেট কিনে দেব।

এ কোনো কেরাণীর কথা নয়, একজন মন্ত্রীর কথা। যে মন্ত্রীর একমাত্র আয় তাঁর মাসিক বেতন। মস্ত বড় সংসারের সমস্ত খরচ ঐ বেতনে কুলোয় না। তাই সামান্য একটি স্লেট কেনবার জন্যেও তাঁকে পরের মাসের মাইনের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

• • • •

তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি। মহামান্য ব্যক্তি। বহু লোকের সঙ্গে তিনি পান প্রতিদিন বহু গণ্য ব্যক্তির কাছ থেকে। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে তিনি অতিসাধারণ মানুষ। সহজে তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। রেলমন্ত্রীরূপে তিনি কয়েকদিন বোম্বাই-এ ছিলেন কে বাড়ীতে। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কলিং বেল বাজাল। লালবাহাদুর নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। লোকটি তাঁকে চিনল না। সে এসেছে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তার সামনে যে দাঁড়িয়ে তার বেশভূষা এতই সামান্য যে সে ভেবেছে বাড়ীর কোনো কর্মচারী হবে। লোকটি বলল, 'আপনাকে নয়। আমি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' তিনি ভিতরে চলে গেলেন। তারপর তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন লোকটিকে ভিতরে ডেকে আনতে। ঘরের মধ্যে এসে লোকটি যখন বুঝল যে রেলমন্ত্রীই স্বয়ং দরজা খুলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তখন সে আবেগে আকুল হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

লালবাহাদুর ব্যস্ত হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে লোকটিকে তুলে নিজের পাশের চেয়ারে বসালেন।

এমনিই ছিলেন সেই ছোট্ট মানুষটি, চারিত্রিক মহিমায় তিনি ছিলেন হিমালয়ের মতো আকাশস্পর্শী।

এমনি মানুষকেই স্মরণ করে কবি বলেছেন :

সকল কলুষ-তামস হর, জয় হোক তব জয়।
অমৃত বারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়॥

• • • •

পিকাসোকে নিয়ে এই কাহিনী।

একবার পিকাসোকে একটি ছবি দেখানো হ'ল এবং তাঁর মতামত চাওয়া হল।

—অত্যন্ত বাজে, বললেন শিল্পী।

আর একটি ছবি এল তৎক্ষণাৎ।

—ইস্ এতেবারে বাজিল, পিকাসো মন্তব্য করলেন। শেষ ছবিটি এবার আনা হ'ল শিল্পীর সম্মুখে।

—খারাপ, খুব খারাপ, বললেন শিল্পী।

—আরে এযে আপনারই আঁকা ছবি, প্রদর্শক বলে উঠল।

তখনি শিল্পী বলে উঠলেন, ভালো খুব ভালো এ ছবি, এমন ছবি আর হয় না!

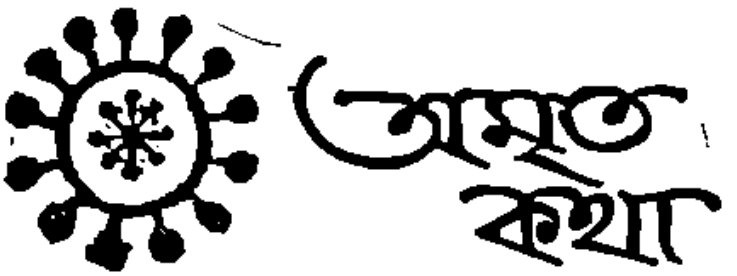

'মথুর এদের অন্ন দাও!'

'বাবা, আমার সাধ্য কী এত বড় অনুষ্ঠান সুষ্ঠু করি।'

'তবে থাক তোমার শিবপুরী। আমি যাবো না।'

'সে কী বাবা, এত বড় তীর্থ দর্শন করবেন না?'

'না মথুর না!'—ঠাকুর কেঁদে ফেললেন।—'এদের অভুক্ত রেখে এদের কেলে কিছুতেই যাবো না আমি। এদের মধ্যেই থাকবো।'

রাণী রাসমণি আমাতা ভক্ত মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর তীর্থ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন,—ভারতের যুগ যুগান্তের অধ্যাত্ম সাধনার ঘনীভূত মূর্তি। সে তীর্থ দর্শন করে ঠাকুর নেমেছেন বিহারের সাঁওতাল পরগণা বৈদ্যনাথ ধামে।

দেওঘরের শিবপুরী পরম তীর্থক্ষেত্র। সে-পথে চলতে চলতে ঠাকুর থামলেন। দেখলেন, উলঙ্গ শীর্ণদেহ সাঁওতাল দল ক্ষুৎকাতর, বুভুক্ষের আলার পথে প্রান্তরে তাদের আর্তকণ্ঠের হাহাকার ধ্বনি। মানুষের ভগবান বিগলিত হলেন। ক্ষুধার্তের হাহাকার তাঁর দয়ার্দ্র-অন্তরকে বেদনা মথিত করে তুললো।

এর মধ্যে কোথায় শিবপুরী?

'এদের অন্ন দাও মথুর! এদের খেতে না দিয়ে কিছুতেই মন্দিরে যেতে পারিনে আমি।'

ঠাকুরের চোখে জল।

ভক্ত মথুর সর্বস্বপণে অন্ন সংগ্রহে ব্যাপৃত হলেন। ঠাকুরের ইচ্ছাই পূর্ণ হলো।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ ভাব ভূমি থেকে সাধারণের মানুষ। তাই হৃদয় ভরা তাঁর প্রেম—সে প্রেম মানুষকে কেন্দ্র করেই ঈশ্বর ভাবমুখী।

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী,—'খালি পেটে ধর্ম হয় না। মোটা ভাত কাপড় চাই। জীবে দয়া নয় এ হচ্ছে ঈশ্বর জ্ঞানে সকলের সেবা।'

অশ্রীগ্রীষ্ম

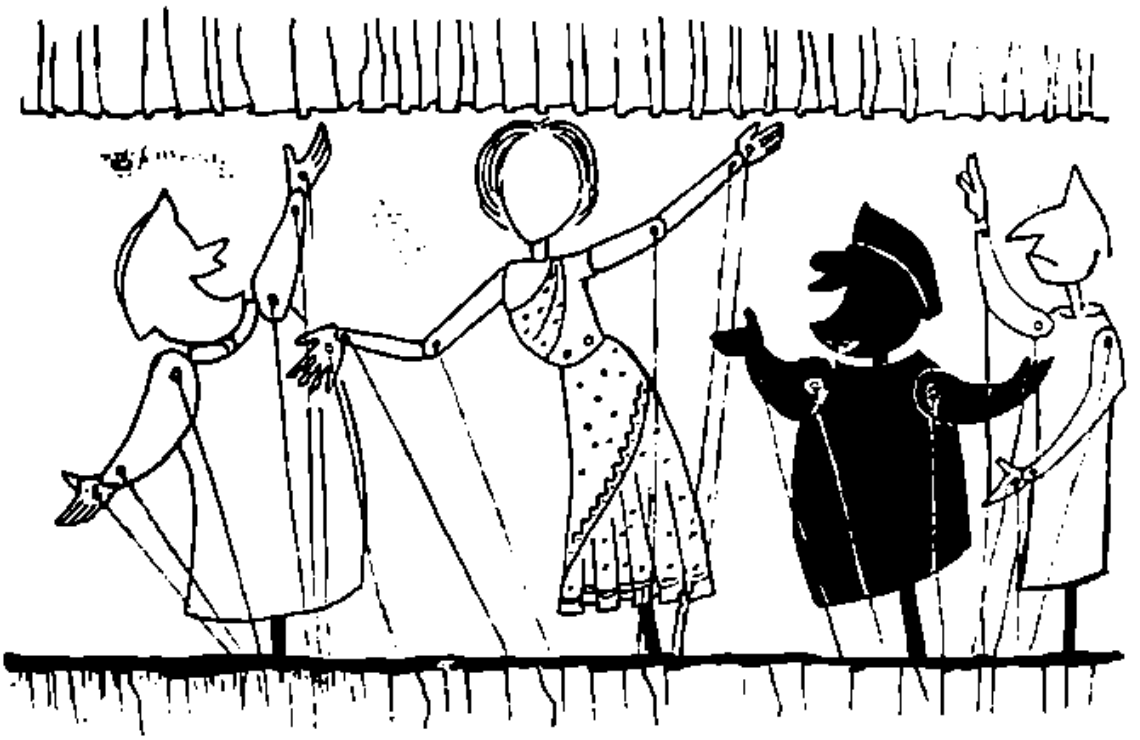

রাজনীতিতে রামলীলা

পরিবার

এদেশে— জন্মনিয়ন্ত্রণ

পরিকল্পনা

অগ্নীশ্বর

ওদেশে—সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল

…তা হয়েছে কি!

যতক্ষণ খাদ্য না এসে পৌঁছায়,

এঁর কাছ থেকে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কিছু শুনুন।

—স্বরাজ্যের সৌজন্যে

শেষ মুহূর্ত

মানুষ যখন চাঁদে নামবে

মানুষের তৈরী এক মহাকাশ-ক্যাপসুল বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম চাঁদে ধীরে অবতরণ করল এ বছরের ৩রা ফেব্রুয়ারী। এ হ'ল চাঁদে মানুষ যাওয়ার পথে এক বড় পদক্ষেপ। সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা এ. পি. এন-এর বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকার এ. ইভলগিন এরই কিছুপরে নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি লেখেন। চাঁদে মানুষ নামানোর পর আর কী কী দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হতে হবে, প্রবন্ধে লেখক তাই দেখিয়েছেন।

মহাকাশ আবিষ্কার-অভিযানে মানুষের সাম্প্রতিকতম সাফল্যগুলি সেই সময়কে আরও কাছে নিয়ে আসছে যখন মানুষ নিজে যাবে চাঁদে আর চাঁদকে মানুষের "বাসোপযোগী" করে তুলতে সুরু করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, বিস্ফোরণের প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে মহাকাশচারীদের বিশেষ কাজে আসবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকাশচারীদের পা দেবার আগেই ঘটানো হবে এ ধরণের বিস্ফোরণ। উদাহরণতঃ, সোভিয়েত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভিংদি পোক্রোভস্কী মনে করেন যে, চাঁদের কাছাকাছি হবার সময় মহাকাশযান থেকে ছোঁড়া হবে ২ কিলোগ্রাম ওজনের এক বিশেষ রকেট। চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে সরাসরি রকেটটি আঘাত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের চলচ্চিত্র ক্যামেরায় এই দৃশ্য ধরা হয়ে থাকবে। দেখা হবে কি ধরণের শব্দের বিস্ফোরণের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে সৃষ্টি হচ্ছে, কি ধরণের ধূলো ও শিলা প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছে। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে উর্ধ্বস্তরের প্রকৃত চরিত্রটি ধরা যাবে।

দুঃসাহসিক পরিকল্পনা :

চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রাথমিকই বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। কতক বিজ্ঞানীর মতে এর ফলে বহু মূল্যবান খনিজ ও আকরাদির সন্ধান পাওয়া যাবে। বিস্ফোরণের দ্বারা মানুষ এগুলি নিষ্কাশিত করতে পারবে।

এরকম দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথাও ভাবা হয়, যখন বিস্ফোরণের দ্বারা চাঁদের এক গোটা পাহাড়কে তুলে পৃথিবীতে এনে ফেলা যাবে। এরজন্য বিস্ফোরণটিকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে। বিস্ফোরণের দ্বারা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে শূন্যে বসিয়ে নেওয়া পাহাড়টি, তখন তা এক মহাজাগতিক গতিবেগ পাবে এবং তখন সেটিকে পৃথিবীতে একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এনে ফেলা হবে, যেমন, কোনও মরুভূমি এলাকায়। উল্কার মতো তা নেমে আসবে। স্বভাবতই, এর ফলে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কিন্তু মহাকাশযানে করে চাঁদ থেকে পাহাড় বয়ে আনবার চেয়ে এইভাবে পাহাড়টিকে নামিয়ে আনা অনেক বেশি লাভজনক হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘরবাড়ী, দপ্তর, মহাকাশ যান ষ্টেশন, রাস্তাঘাট প্রভৃতি করার জন্যও এ ধরণের বিস্ফোরণ কাজে লাগান হবে।

চাঁদে কিন্তু কোনও বাতাসের বাতাবরণ নেই। এই শূন্যতার ফলে বিস্ফোরণের ধরণও বদলাবে। পৃথিবীতে বিস্ফোরণ ঘটলে হাওয়ার তরঙ্গে তা ছড়িয়ে যায় এবং সামনের সমস্ত প্রতিবন্ধককে তা ভেঙে এগোয়। চাঁদে কিন্তু এরকম কোনও বাতাস তরঙ্গের প্রশ্ন নেই। অপরদিকে কোনও বাতাস প্রতিবন্ধক না পেয়ে মহাজাগতিক গতিবেগ নিয়ে বিস্ফোরণের থেকে পদার্থ কণা ছুটে বেরোবে। তাই পৃথিবীতে বিস্ফোরণ হলে যতখানি এলাকা জুড়ে তা বোঝা যায়, চাঁদে তার পরিধি আরও বেশি হবে।

তাছাড়া, চাঁদের বিশেষ তাপমাত্রার প্রশ্নটিও এই সঙ্গে বিবেচ্য। চাঁদে তাপমাত্রার অত্যন্ত তীব্র পরিবর্তন ঘটে। দিনে +১৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তা রাতে −১১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। এর ফলে আমাদের প্রচলিত বিস্ফোরক পদার্থের অনেক কিছুই চাঁদে অকেজো হবে। যেমন ডিনামাইট জ্বলবে না, ত্রুটিল গলে যাবে, অ্যাজোনাইট বিভক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, চাঁদে বিস্ফোরণ-বিশেষজ্ঞরা বেশ কঠিন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। কিন্তু, আমরা আগে থেকেই অনেক কিছু জেনে নিতে পারব এবং তাই-ই হবে এ সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রধান সহায়। এবং এইভাবে মানুষের চাঁদে যাওয়াকে আমরা ত্বরান্বিত করে তুলতে সমর্থ হব।

চাঁদের আত্মকথা

সৌরজগতে আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী রহস্যাবৃতা চাঁদ আমাদের গ্রহের অধিবাসীদের অনেক অনেক আগে থেকেই আকর্ষণ করে এসেছে। এত কাহিনী, এত উপকথা, কাব্য-গাঁথা, লৌকিক-বিশ্বাস আর কোন জ্যোতিষ্ককে ঘিরে গড়ে ওঠেনি—এমন কি স্বয়ং সূর্যদেবকে নিয়েও নয়। তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, মানুষের সৌরজগত বিজয়ের অভিযানে গবেষণার কাজ চাঁদকে নিয়েই সুরু হয়েছে।

চন্দ্র অভিযানের যে পর্ব চাঁদে স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন বসিয়ে, তা সুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সালে প্রথম সোভিয়েত লুনিক পাঠিয়ে। ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী লুনিক ৯ সে পর্বের সকল সমাধা করেছে। এব্যাপারে আমরা এখন সবাই নিঃসংশয়। মহাকাশের প্রথম যে 'মাটিতে' মানুষ পা রেখে সে 'মাটি' চাঁদের দেশের 'মাটি'। সে দিন কবে? বোঝাই যাচ্ছে খুব শীঘ্রিরই। মহাকাশচারী ও বিজ্ঞানীদের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের আগে অবশ্য পৃথিবীর এই উপগ্রহটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য হবে।

বিজ্ঞানীরা এখন কোন কোন ব্যাপারে তথ্য করছেন? কী সমস্যায় ওঁরা সম্মুখীন হচ্ছেন? সমাধানই বা হচ্ছে কিভাবে?

মোটামুটি তিনটি মূল সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। প্রথমেই একটা জটিল সমস্যার কথা বলা চলে। সে সমস্যা চাঁদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্পর্কে। অর্থাৎ চাঁদের আয়তন, ওজন, চাঁদের পৃথিবী আবর্তনের চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে। দ্বিতীয় সমস্যা আমাদের জানা তথ্যাদির ভিত্তিতে চাঁদের ভৌগলিক গঠন নিরূপণ করা। অর্থাৎ চাঁদের উপরিতল এবং গর্তের সংখ্যার তাপ কত, আবহাওয়ার ঘনত্বের পরিমাণ কি, চাঁদের পাহাড়গুলির চরিত্র কি, চন্দ্রপৃষ্ঠের অসমতা কি প্রকারের ইত্যাদি।

আর সবশেষের সমস্যা যা নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে তা হল চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠন ও তার উৎপত্তি বিশেষ করে অন্ধকার ও আলোকিত অংশ যা 'সাগর' ও 'মহাদেশ' বলে পরিচিত, সেই বিষয়ে।

চাঁদের দেশ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করতে গেছে, মানুষ অমিতবিক্রমে ও গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার রহস্যগুলি উন্মোচন করে চলেছে। এইভাবে, আমাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহের পৃথিবীর কক্ষ পরিক্রমার গতিবেগ সম্পর্কে এতদিনে ভালভাবেই জানা গেছে। দেখা গেছে এই গতিবেগ অত্যন্ত জটিল অথচ তার কোন ব্যতিক্রম নেই। চন্দ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা রকমের বক্তব্য রয়েছে। তথ্যের অভাবে এখনও আমরা সঠিক বক্তব্যটি স্থির করতে পারিনি।

পরস্পর বিরোধী বক্তব্য

চন্দ্রের গঠনের অর্থাৎ 'সাগর' ও 'মহাদেশ' ও অন্যান্য গঠনগুলির বিষয় আরও বাস্তব ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। বহু বছর ধরে দুটি বক্তব্য—উল্কা ভিত্তিক ও আগ্নেয়গিরি ভিত্তিক বক্তব্য এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধীতা করছে। উল্কা ভিত্তিক বক্তব্য হল একটি বড় একটি ছোট উল্কার মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই চন্দ্রপৃষ্ঠের এই অসমতার সৃষ্টি। চাঁদে আবহাওয়া মণ্ডলী না থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উল্কাপিণ্ডগুলি চাঁদে গিয়ে আঘাত করছে। যে উল্কাপিণ্ডগুলি "গত" লক্ষ বছর ধরে চাঁদে আঘাত করছে তা যদি সারা চাঁদের ওপর সমানভাবে করে থাকে তবে সমগ্র চন্দ্র এক সেন্টিমিটার পুরু একটি স্তরে পরিণত হবে।

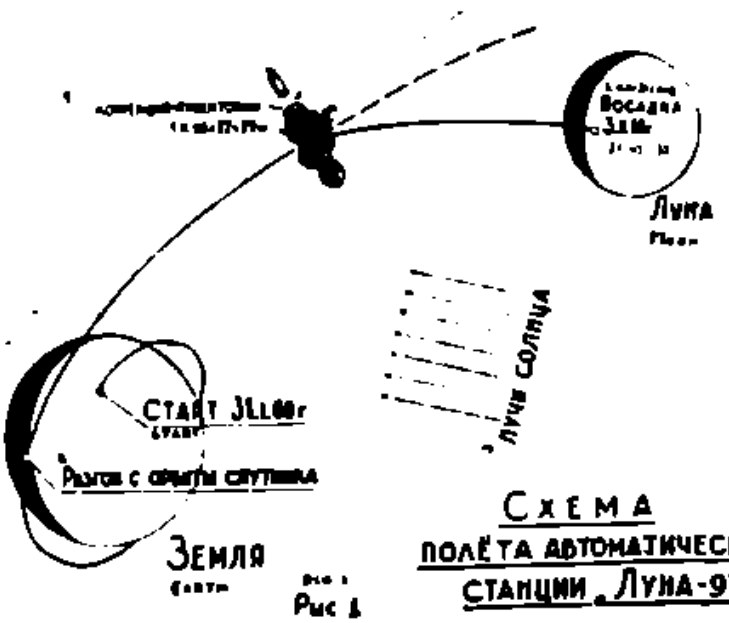

Рис 1

Схема полёта автоматической станции „Луна-9"

আগ্নেয়গিরি ভিত্তিক বক্তব্য হল, বহুদিন পূর্বে চাঁদের পিঠে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের ফলেই বর্তমান গঠন সম্ভব হয়েছে। এখন কে ঠিক? আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, উভয় বক্তব্য সম্পর্কেই আমাদের এমন কোন অনুমান নেই যা খণ্ডন করা যায় না। সময় ও জ্ঞানের অগ্রগতির ওপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন আমাদের মহাকাশ প্রতিবেশী বায়ুমণ্ডল। সেখানকার অবহাওয়ার

ঘনত্ব আমাদের গ্রহের আবহাওয়ার তুলনায় বহু লক্ষ গুণ ক্ষীণ। এর জন্যেই চাঁদের রাত ও দিন এর মধ্যে তাপ মাত্রার পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। সেখানে রাত ও দিন দুই সপ্তাহ ধরে এক নাগাড়ে চলে।

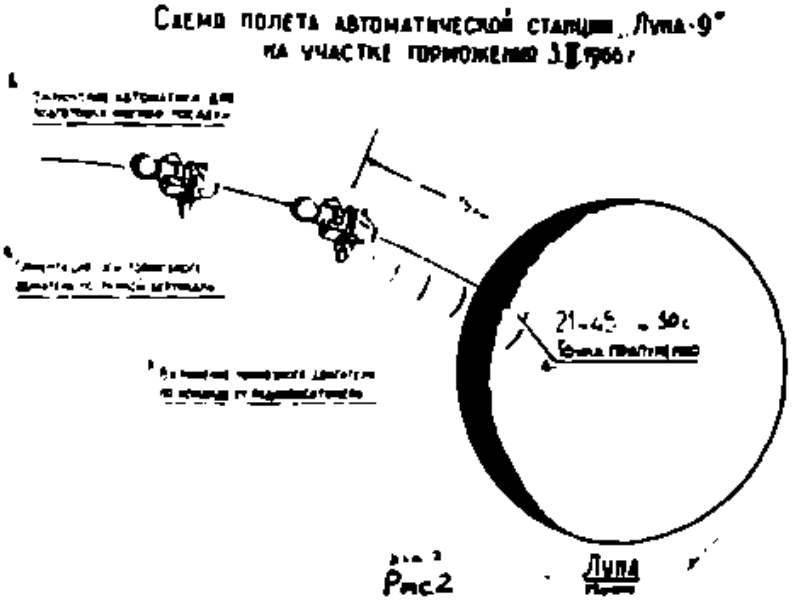

Рис 2

বেতার পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমিত হয় যে, চন্দ্র 'সাগর' ও 'মহাদেশ'গুলি একই ধরণের রাসায়নিক বা অনুরূপ পদার্থে গড়া। উদাহরণ স্বরূপ, চন্দ্রদেহের সর্বোচ্চ স্তরটির দেড় মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রায় একই ধরণের পদার্থ। এর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়নি। এই পদার্থ কি হতে পারে:

ধূলা বা একধরণের সচ্ছিদ্র পদার্থ, স্পঞ্জের মতো কি? বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে চন্দ্রপৃষ্ঠের পদার্থ মোটামুটি আগ্নেয়গিরির ভস্ম, ব্যাসল্ট ও এই জাতীয় শিলা।

চন্দ্রপৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য

চন্দ্রপৃষ্ঠের এই সর্বোচ্চ ও ছিদ্রযুক্ত স্তরের নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যক্রমে আমরা জানতে পেরেছি। এই স্তরের ঘনত্ব হল ৩ থেকে ৩ সেন্টিমিটার। এর নিচের স্তরের থেকে এই স্তরটির বিদ্যুৎ শক্তিবাহী ক্ষমতা দেড় থেকে দুগুণ বেশি। স্বভাবতই, রাসায়নিক ও খনিজ আকরিক গঠনেও দুইটি স্তরের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরটির বিদ্যুৎ শক্তিবাহিতা উল্কাখণ্ডের মতোই। এ থেকে এই ধারণাই করতে হয় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের এই সর্বোচ্চ স্তরটি অনবরতই মহাশূন্যাগত উল্কাবর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে। এই স্তরের পদার্থ কি দিয়ে গঠিত? রাসায়নিক ও খনিজ কি কি পদার্থ এতে রয়েছে?

চাঁদের "বেতার কণ্ঠস্বর" যা এসে পৌঁছায় তা এ সম্পর্কে বেশ কৌতূহলদীপক। বিভিন্ন শিলাস্তরে বেতার-তরঙ্গ কিভাবে প্রতিধ্বনিত হয়, তা থেকে এ সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ করা গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে "বেতার তরঙ্গে"র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ও তার পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠনের রূপ কি হতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠের এই শিলাগঠনকে "চান্দ্রিক" বলতে পারি। এর মধ্যে শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ হল সিলিকন অক্সাইড, ১৫-২০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও শতকরা ২০ ভাগ পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। আমরা এটাও সাব্যস্ত করতে পেরেছি যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের 'রেডিও-অ্যাকটিভ' পদার্থের ঘনত্ব পৃথিবীপৃষ্ঠের থেকে ৫-৬ গুণ বেশি। স্বভাবতই, চাঁদে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। সেজন্যই সম্ভবতঃ চাঁদে এতো বেশি ও এতো বড় বড় আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায়।

বিগত ৩-৪ বছর ধরে মোস্কো ইন্সটিটিউটের জ্যোতির্বিদরা চন্দ্র থেকে আগত বেতার-তরঙ্গগুলি ২০টি বিভিন্ন তরঙ্গমালায় পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন: এগুলির দৈর্ঘ্য ০·১ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার। এ পর্যন্ত এরকম ৩০ হাজার তরঙ্গ মাপা হয়েছে। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে এইটুকু বলাই যায় যে, যারা সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পা দেবে তাদের পক্ষেই সমস্যাটির সমাধান আগে করা সম্ভব। চাঁদে এক মহাকাশবিজ্ঞানী অভিযাত্রীদল নামাবার সম্ভাবনা আজ আর সুদূর পরাহত নয়, তা আজ মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার আয়ত্বেরই মধ্যেই এসে গিয়েছে, বলা যায়।

আউট্‌ডোর স্যুটিং

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাইরে সিনেমার ছবি তুলতে যাওয়া যে কী ঝক্‌মারি কাজ যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা বুঝবেন না। লেখক-ডিরেক্টার ফ্ল্যাহার্টি সাহেব সেকথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন—'লুসিয়ানা ষ্টোরি' ছবি করতে গিয়ে। ছবিখানি হয়েছিল অসাধারণ।

অসাধারণ হয়েছিল তাঁর অধ্যবসায়ের গুণে। সে ছবি তিনি তৈরি করতে গিয়েছিলেন একটি পেট্রোল কোম্পানীর হয়ে। আমেরিকার খুব দুর্গম প্রদেশে—নদী আর জঙ্গলের মাঝে—মানব সভ্যতা যেখানে এখনও গিয়ে পৌঁছোয়নি, সেইরকম জায়গায় দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন একটি ডকুমেণ্টারী ছবি তুলতে।

দিন-দশেকের প্রোগ্রাম। রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি জায়গাটা আগে দেখে এসেছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল মনোরম। নদীটা ছিল মুখরে ভর্তি। আর গাছে গাছে ছিল রং-বেরংএর নানারকমের পাখী। চারিদিকে নাম-না-জানা ফুলে ফুলে ভরা আগাছার জঙ্গল, আর ফাঁকা জায়গায় ফুটেছিল মস্ত বড় বড় পদ্মের ফুল। ফুলগুলো যেমন বড়, তার পাতাগুলোও তেমনি।

সে তো আমাদের দেশের ছবি তোলা নয়! আমেরিকার পেট্রোল কোম্পানীর টাকা। পৃথিবী দেখুক—কত কষ্ট করে আমরা পেট্রোলের সন্ধান করি। শুধু এটি দেখাবার জন্যে যত টাকা খরচ হয় হোক্।

জঙ্গল পরিষ্কার করে ছোট বড় নানারকমের তাঁবু পড়লো। তাঁবুর আসবাবপত্র চলে গেল আগেই। অতগুলি মানুষকে সেখানে থাকতে হবে, খেতে হবে, কাজ করতে হবে, ঘুমোতে হবে। কোথাও যেন কোনও খুঁৎ না থাকে। কারও যেন এতটুকু কষ্ট না হয়! এমনকি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তারের তাঁবু গেল, ওষুধপত্র গেল। তাঁবুর ভেতরেই ছোট-খাটো একটি হাসপাতাল তৈরি হলো যার অপারেশন্ টেবিল পর্যন্ত!

জেনেটার বসলো। ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে। শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশখানা নানারকমের গাড়ী ঘন-ঘন যাওয়া আসা করতে লাগলো। আজ যা ছবি তোলা হবে পরের দিন তার প্রিণ্ট্ গিয়ে পৌঁছোবে সেই জঙ্গলে। প্রোজেক্সান্-তাঁবুতে বসে বসে তাই দেখবেন সবাই। এডিটার গেছেন সঙ্গে। সেইখানে বসেই কাটা হবে, জোড়া হবে, ভাল না লাগলে ফেলে দেবেন, তারপর আবার নতুন করে তোলা হবে ছবি।

ডকুমেন্টারী ছবি। পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কেউ নেই। ডিরেক্টার সাহেব নিজে পছন্দ করে জংলী মানুষদের ধরে এনেছেন। তাদের দিয়েই কাজ করাতে হবে। তাদের আচার-ব্যবহার অন্যরকম, চাল-চলন খাওয়া-দাওয়া—সভ্য মানুষদের সঙ্গে কোনোটাই মেলে না, তার ওপর ভাষা পর্যন্ত কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা। ইংরেজিতে কথা বললে কথাও বোঝে না, ইসারায় বুঝিয়ে দিতে হয়।

প্রোগ্রামের দিন ক্রমশ বেড়েই যেতে লাগলো। দশ দিনের জায়গায় প্রথমে হলো পনেরো দিন পনেরো দিনের জায়গায় একমাস। শেষ পর্যন্ত পুরো তিনটি মাস অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ছবি তুলে এনে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি তৈরি করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'লুসিয়ানা ষ্টোরি।'

নদীর তীরে আগাছার জঙ্গলে গোছা গোছা রঙিন ফুল ফুটে আছে। ফুলের গুচ্ছ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সেই ফুলের পাপড়ি সরিয়ে তার ভেতর থেকে পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছে একটি খরগোস এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। নদীর ধারে ধারে চলতে লাগলো। নদীর বেশি কাছে যাবে না। জলে আছে কুমীর, নদীর তীরে আছে পিছোল্ পলি-মাটি। কাদা লাগবে তার কর্শা গায়ে।

ফ্ল্যাহার্টি-সাহেব বললেন, 'এমনি একটি খরগোসের ছবি চাই।'

খরগোসের অভাব নেই। দলে দলে খরগোস বেরোচ্ছে জঙ্গলের ভেতর থেকে, কিছুদূর ছুটে গিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে।

ছোট ছোট ব্যাটারি লাগানো নানারকমের ক্যামেরা (তুল' ফুটের) রয়েছে সঙ্গে। একজন ক্যামেরাম্যানকে নিযুক্ত করা হলো এই কাজে। সে শুধু লক্ষ্য রাখবে কখন খরগোস বেরোয়।

বেরিয়েছে খরগোস্। ডিরেক্টার বললেন, 'চালাও ক্যামেরা।'

রৌদ্র ছিল অনুকূল। ক্যামেরা চলতে লাগলো। খরগোসটি বেরিয়ে এলো কেশের আড়াল থেকে। চলতে লাগলো নদীর ধারে ধারে। একটা কুমীর রোদ পোয়াচ্ছিল নদীতীরের পলিমাটির ওপর শুয়ে। খরগোসটি তাকে দেখতে পেয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারেনি ওদিকে আর একটা কুমীর শুয়ে আছে। খরগোসটি একেবারে পড়লো গিয়ে তার মুখের কাছে। সেই পড়া, কুমীরটি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে তাঁর দাঁতওলা মুখটি হাঁ করে টুপ্ করে মুখে পুরে নিলো বেচারা খরগোসটিকে, তারপর শাঁড়াশির মত মুখের ভেতর চেপে ধরলো তাকে।

খরগোসের মুখটি ছিল একটুখানি বেরিয়ে। বাঁচবার জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টা তার! কিন্তু বাঁচা তার হলো না। কুমীরের কস্ বেয়ে তাজা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়লো পলিমাটির ওপর। খরগোসটিকে তখন সে চিবিয়ে গিলে ফেলেছে।

ক্যামেরা কিন্তু তখনও চলছে।

ফ্ল্যাহার্টি সাহেব সে করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'বন্ধ কর, বন্ধ কর ক্যামেরা। এ দৃশ্য আমি রাখতে পারবো না ছবিতে।'

ক্যামেরাম্যান বললে, 'কেন?' এ তো আপনার ডকুমেন্টারী ছবি। ছবিটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।'

ফ্ল্যাহার্টি বললেন, 'কী চমৎকার হয়েছে? সবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণ!'

ক্যামেরাম্যান বললে, 'তাই তো হয়ে থাকে। এই তো প্রকৃতির নিয়ম।'

'কিন্তু—' বলে কি যেন ভাবলেন রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। তারপর বললেন, 'ডকুমেন্টারী ছবি আমি তৈরি করছি সত্যি। কিন্তু ভুলতে পারছি না আমি সাহিত্যিক, শিল্পী। প্রকৃতিকে হুবহু অনুকরণ করতে আমার মন চায় না। দুর্বলকে এমন করে সবলের বুকের ভেতর ঠেলে দিতে আমি পারবো না। খরগোসটা পালাবে।'

ক্যামেরাম্যান হেসে বললে, 'খরগোস তো আপনার আর্টিষ্ট নয়। সে আপনার কথা বোধহয় শুনবে না।'

ফ্ল্যাহার্টি বললেন, 'আখো চেষ্টা করে।'

এই চেষ্টা করতে গিয়ে ক্যামেরাম্যানকে কম হাঙ্গামা হতে হলো না।

ডকুমেন্টারী ছবি, ইচ্ছে করলে কুমীর আর খরগোসের ছবি তিনি না দিলেও পারতেন। কিন্তু মাথায় যখন ঢুকেছে তখন দিতেই হবে।

ঠিক তাঁর মনের মত ছবিটি তুলতে চারদিন লাগলো।

তারপর একদিন পদ্মপাতা আর প্রচুর পদ্মপাতার ছবি তুললেন। পদ্মপাতার ওপর জলের ফোঁটা দিয়ে খুব যত্ন করে তার 'ক্লোজ আপ্' নিলেন। তাঁরই পাশে একটি তাঁতি পোকা দুটি পাতার মাঝখানে জাল বুনছিল। লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। ক্যামেরাম্যানকে বললেন, 'এই ছবিটা নিতেই হবে।'

ছবি নেওয়া তখনও শেষ হয়নি, কোত্থেকে হঠাৎ বড় একটা মেঘ এসে সূর্যকে দিলে ঢেকে। আলোর 'কন্টিনিউইটি' থাকবে না। ক্যামেরাম্যান বললে, 'এ মেঘ সহজে সরবে না। আজ থাক্। ছবিটা কাল শেষ করলেই চলবে।'

পরের দিন লোকেশনে গিয়ে দেখে—কোথায় সে পদ্মপাতা, আর কোথায় তাঁতি-পোকা! তার সে জালও নেই, সে পদ্মপাতাটাও উল্টে একেবারে দুমড়ে গেছে। রাত্রে নাকি ঝম্‌ঝা ঝড় এসে পদ্মবন তছ্‌নছ্ করে দিয়ে গেছে।

আউট্‌ডোর শুটিংএ এই রকম বিড়ম্বনা সহ্য করতেই হয়। গল্প-কাহিনীর ছবি হলে বিপদ হয় আরও বেশি।

ইংলণ্ড থেকে র‍্যাল্‌ফ্ কীথ আসামের চা বাগানে এসেছিলেন ছবি তুলতে। সেটিও ডকুমেন্টারী ছবি। কাহিনীচিত্র নয়।

এসেই তাঁর প্রথম বিপদ হলো লোকজনের ভাষা বোঝেন না। তার ওপর আর-একটা জিনিস তাঁর চোখে খুব নতুন বলে মনে হলো। সেটি হলো গিয়ে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা। দেখলেন ঝাড়ুদারেরা এক জাত, ধোবার আলাদা জাত। আবার ধোবী যারা তারা শুধু কাপড় কাচবে। তারা এসেছে আর এক সম্প্রদায় থেকে।

তিনি খুব বড়াই করে লিখেছেন একজন ঝাড়ুদারের পক্ষে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে বসে খাবার কোনও বাধা নেই। অথচ এই ভারতবর্ষে এসে দেখলেন—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তেমনে খাওয়া দাওয়ার বাছবিচারটাই হলো সবচেয়ে বেশি। একজন 'পানি-পাঁড়ের' জাতে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, নইলে তার হাতে জল কেউ খাবে না।

চা-বাগানের একটা কুলি-আতের মেয়ে একদিন বসে বসে চা বাছছিল, সেই সময় আমি তাকে ছুঁয়ে ফেলেছিলাম। আমি সাহেব হলে কি হবে—ক্রিশ্চান তো! মেয়েটার চা খাওয়া আর হলো না। কাপের বাকি চাটুকু তখুনি সে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে কাপটি ভাল করে জলে ধুয়ে দোকানীর হাতে তুলে ফিরিয়ে দিয়ে এলো।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ের দরকার ছিল ছবিতে। ছেলেমেয়ে না বলে যুবক-যুবতী বলাই উচিত। তাদের বিয়ে হবে। তারপর একটি ছেলে হবে। বিয়েতে তাদের সিঁথিতে সিঁদুর পরতে হয়। কিন্তু অবিবাহিতা কোনও মেয়েই রাজী হলো না সিঁথিতে সিঁদুর দিতে। আমি তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বলেছিলাম এটা তো আর সত্যিকারের বিয়ে নয়। এটা হচ্ছে শিরে নকল অভিনয়। ছুটি শেষ হবামাত্র সিঁদুর তুমি মুছে ফেলবে।

কিন্তু না, কিছুতেই না।

তার ওপর ছেলেটা ছিল একজাতের, মেয়েটি ছিল আর-এক জাতের। অভিনয়ের বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হতে তারা রাজী হলো না।

শেষে একজন আমাকে বললেন, 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতর দেখুন। পেয়ে যাবেন। এদেশে শিক্ষিত যারা, লেখাপড়া যারা শিখেছে, তারা ওই অশিক্ষিত ছোটজাতের মানুষগুলির চেয়ে অনেক বেশি উদার।'

সেই চেষ্টাই চলতে লাগলো। উঁচু জাতের শিক্ষিত একটি ছেলেও পেলাম, মেয়েও পেলাম। কিন্তু সমস্যা বাধলো বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে। তাদের নিজেদের বাচ্চা ছিল না। বাচ্চা একটি পেয়েছিলাম চমৎকার দেখতে। কিন্তু সে বাচ্চাটি ছিল এমন একটি মেয়ের যে-মেয়েটি ছোট জাতের। সেই ছোট জাতের বাচ্চাটিকে নিজের ছেলে বলে চালাতে সে রাজী নয়। ছেলেটিকে কোলে নিতে হবে, আদর করতে হবে—ছিঃ, ছিঃ, তা আমি পারবো না। এই বলে ঘৃণায় বারকতক নাক সিঁটকে সেই যে চলে গেল মেয়েটি, সে আর কাজ করতে এলো না। দু'দিন কাজ করেছিলাম তাকে নিয়ে। বাধ্য হয়ে আমি নিজে গেলাম মেয়েটির বাড়ীতে। টাকার লোভ দেখালাম। কিন্তু মেয়েটির দাদা তেড়ে আমাকে মারতে এলেন। বললেন, 'আমি মশাই জানি। আপনাদের মতলব কি আর বুঝি না ভেবেছেন? জাতজন্ম সব একাকার করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটিয়ে করে নিয়ে নিজেদের বলতাবি করতে চান। ছবি করতে তো আসেননি, এসেছেন ওই মতলবে, তা আমি জানি।

দাদার ভয়ে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখাই করলে না।

শিক্ষিতের আশা ছেড়ে দিতে হলো। ওরা খুব বেশি বোঝে, খুব বেশি জানে।

[ক্রমশঃ]

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭১ বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

Regd. No. C3643

12 APR 1968

একটি সুপরিচিত নাম

লক্ষ্মী ঘি

এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর

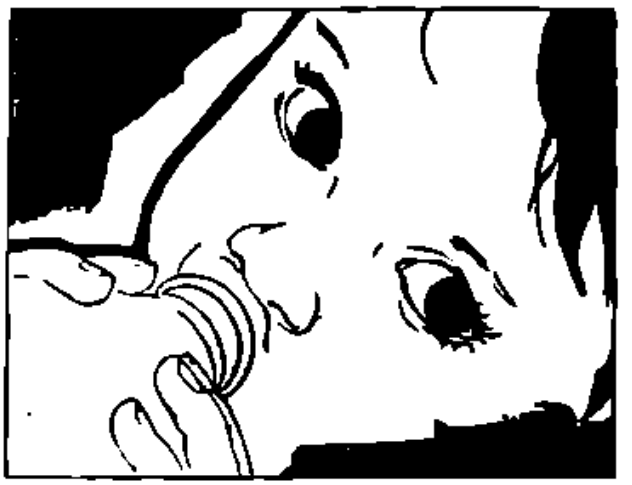

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
মার্চ ১৯৬৬, MARCH 1966

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ	:	প্রভাত মুখোপাধ্যায়
উপলব্ধি	:	বিভূতিভূষণ গুপ্ত
কোম্পানী আমলের কাহিনী	:	অরবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অভিনেত্রীর জীবন সংগ্রাম	:	শীলেশপল চট্টোপাধ্যায়
গুপ্তচর কাহিনী	:	উৎপল ভাদুড়ী
বিশ্ব-সাহিত্য	:	ঘুল—ডানিয়েল কর্কারী
		অনুবাদ—গৌরীশঙ্কর দে
অশান্ত পৃথিবী	:	মলিনীরঞ্জন মিত্র
পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটে গেল	:	সংযোজন

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা—সডাক পনের টাকা

ক

গল্পভারতীর পরবর্ত্তী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ ঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায়

সদ্য কাশ্মীর থেকে ফেরা প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকের রোমাঞ্চকর বাস্তব অভিজ্ঞতার অপূর্ব কাহিনী। লেখক প্রত্যক্ষ দেখেছেন, নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর হানাদারদের অত্যাচার, তাদের প্রতিরোধে কাশ্মীরীদের মরণপণ লড়াই। চমকের পর চমক। দুর্লভ রচনা।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মহাজীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলীর শেষ অধ্যায়—অপরূপ ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন জীবনী-সাহিত্যে নূতন পথের দিশারী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

কোম্পানী আমলের কাহিনী ঃ অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুপ্তচর কাহিনী ঃ সুপর্ণ রায়

চলচ্চিত্রের নূতন আঙ্গিক ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সিনেমার আউটডোর শুটিং পর্য্যায়ে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালকের অভিজ্ঞতালব্ধ মনোরম ভঙ্গীতে লেখা বিচিত্র কাহিনী। চলচ্চিত্রানোদীদের জন্য একটি অপূর্ব রচনা।

একটি বিচিত্র রচনা ঃ উমাপদ মুখোপাধ্যায়

এ ছাড়া বহু নতুন নতুন ফীচার, নতুন রসের গল্প, বলিষ্ঠ আলোচনা, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র ও অনেক ছবি।

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকলে তাড়াতাড়ি ডাকবিলি করা যায়

ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকলে ডাকবিলি করতে দেরী হয়

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

DA-65/611 Bengali.

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

CF-163 BEN

সুস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

ব্যথাবেদনা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৪টি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অরুচিভাব কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

2 এর কাছে রাখুন

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিনের এন্টাস্থ থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

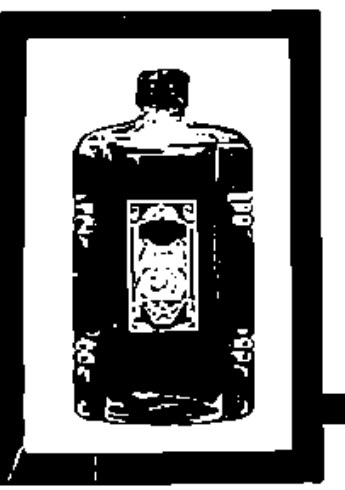

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৭৯৯

কোম্পানী আমলের কাহিনী—ইংরেজ সমাজ : ফ্রেস্টি-স-এর প্রণয় ও বিবাহ
—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩১

গুপ্তচর কাহিনী—উৎপল ভাদুড়ী ৮৩৭

উপলব্ধি—বিভূতিভূষণ গুপ্ত ৮৪৮

অভিনেত্রীর জীবন সংগ্রাম—নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায় ৮৫৭

পুরাতন পাতা ৮৫৮

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়। সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায় রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর হিমসার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

হিমসার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া ৮৬০

বিশ্ব-সাহিত্য

প্রেমের স্পন্দন—মূল : ডানিয়েল কর্কারী : অনুবাদ—গৌরীশংকর দে ৮৬৩

সাহিত্য সংবাদ ৮৬৬

পাঠক পাঠিকার কলম ৮৬৮

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৮৬৯

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রাম দুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন : ৩৫-১৪৫০

৫, ৬ হেয়ার স্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯৯

১৪, হেয়ার স্ট্রীট

(মহিলা বিভাগ)

পাথা

২৮; যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেন সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইণ্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ধাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম মাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যান—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৪/৬, নিউ মার্কেট; দেশবন্ধু—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ রুক্মদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল বাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ ধরাবাম ক্ষেত্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, পরশচন্দ্র-দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৩-২৯৩৩

এই সংখ্যায়

৫

মেয়ে মজলিশ ৮৭৩

রান্না না কান্না—মাতা পাকড়াশী ৮৭৪

ক'টী নিরামিষ রান্না—জয়া দেবী ৮৭৭

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ৮৮১

অশান্ত পৃথিবী—নলিনী রঞ্জন মিত্র ৮৮৪

পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটে গেল

[প্রচ্ছদপট : ম্যাকসিম্ গর্কী ও রোমা রোলাঁ]

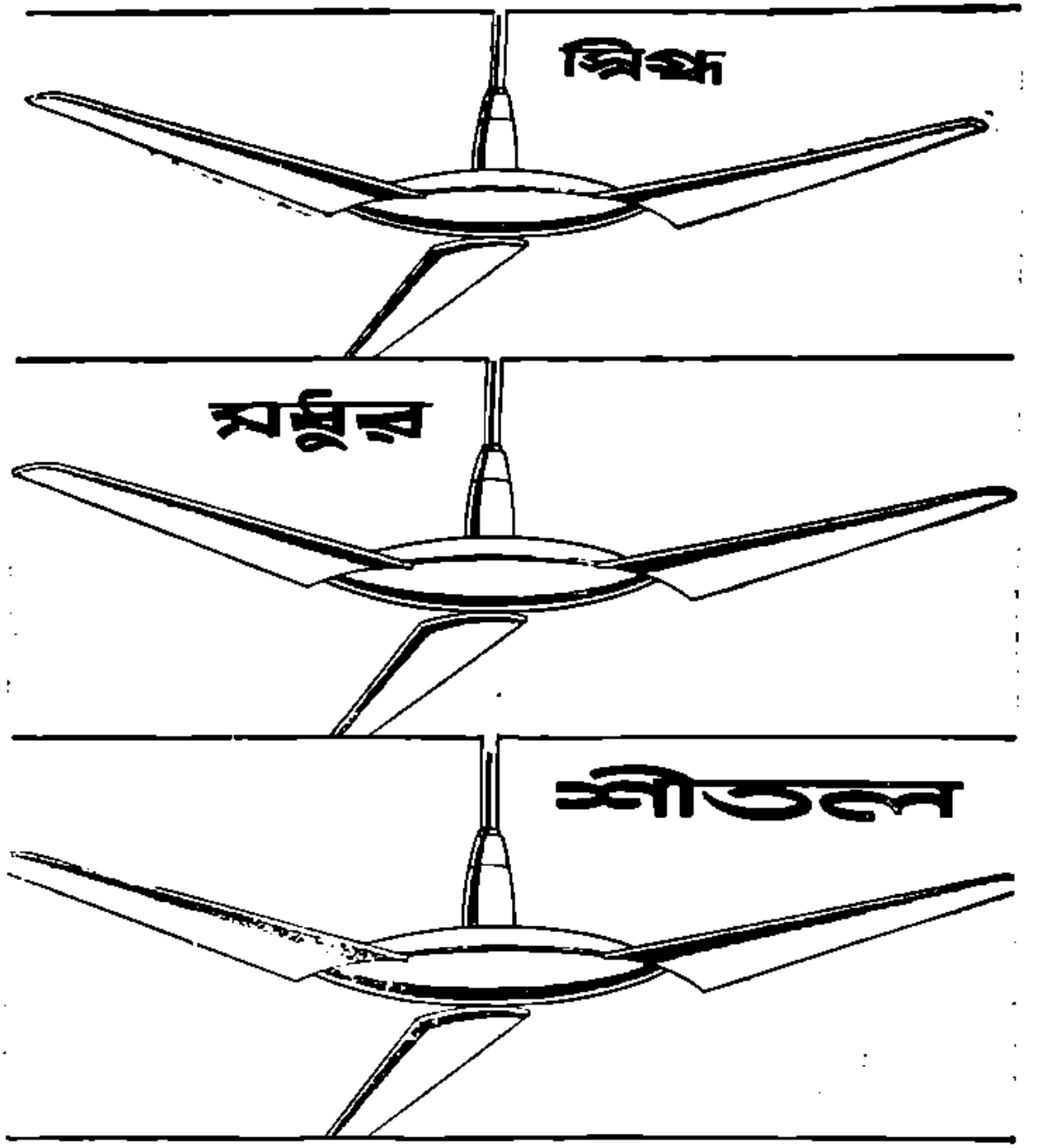

"EVERREST" G.E.C. সিলিং ফ্যান

সাগর পারের হাওয়ার মতো ঝরঝরে

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

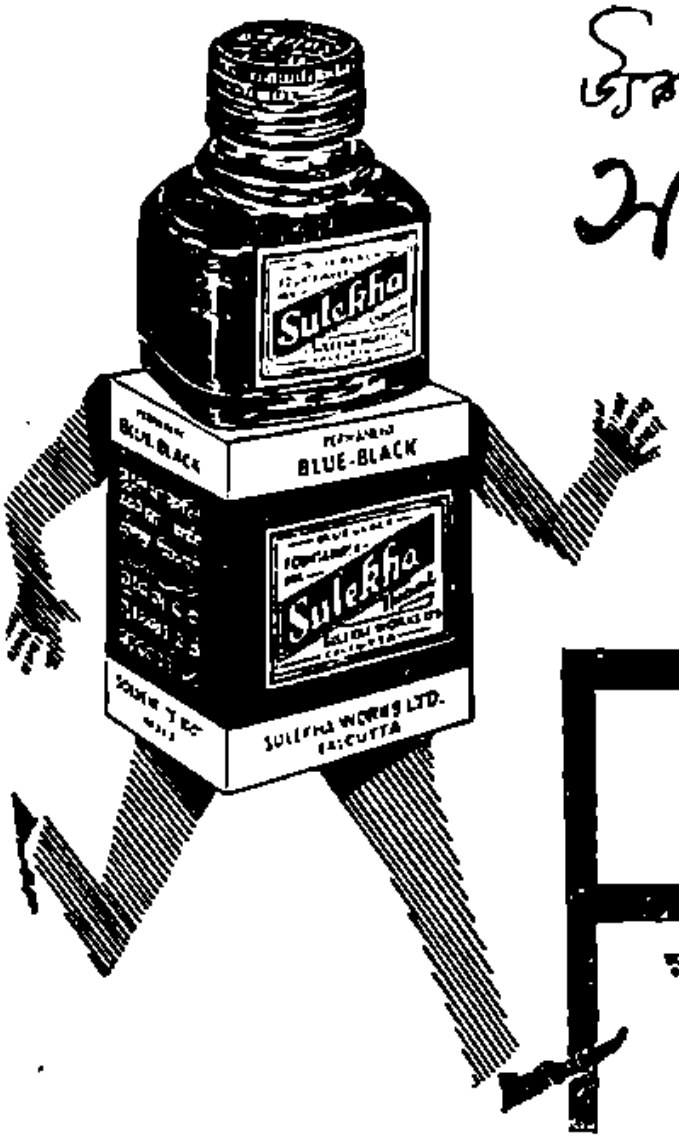

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের প্রতীক

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম-এল সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশতৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে ছবি তুলতে গিয়ে ঘটনাচক্রে গত ভারত-পাক্ লড়াই প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তাঁর সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী—কাশ্মীর রণরঙ্গ—পৌষ সংখ্যা থেকে বেরুচ্ছে। এই সংখ্যায় হানাদারদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ, বারো বছরের কাশ্মীরী কিশোর আলীর আত্মদান, হানাদারদের উর্যুপরি আক্রমণ আর কাশ্মীরের রাজনীতি চক্রের নেপথ্যকাহিনী... ...

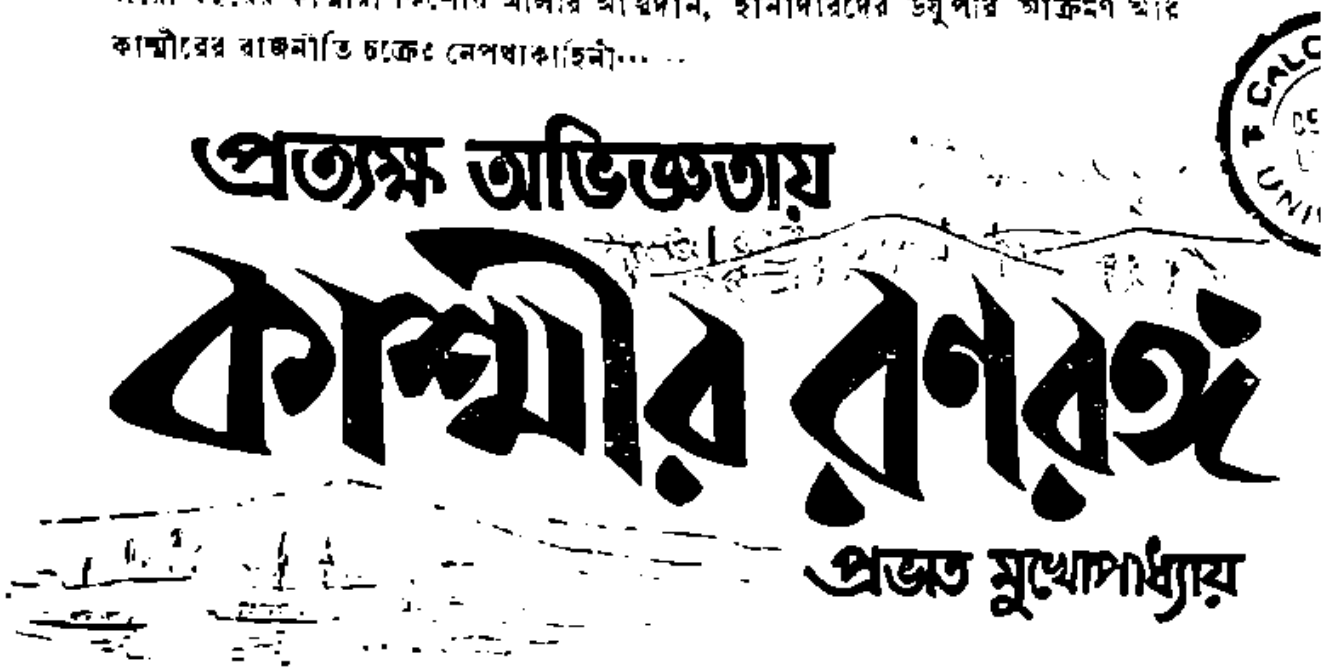

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দশ ।

তেসরা সকাল

সাজাহানের দেওয়া নাম 'গুলমার্গ' মানে ফুলেফুলের কানন। সত্যিই তাই। ফুলেফুলে এখানকার প্রখর প্রকৃতির প্রদীপ্ত প্রত্যুত্তর। শীতকালের কটা মাস বাদ দিয়ে, সারা বছর তারা আপন আনন্দে ফোটে আর, রূপ রং আর সৌরভের অসীম ঔদার্য্যে, পাহাড়ের ওপর এই সমতল ভূমিকে নৈমিষারণ্য বানিয়ে রাখে। মহারাজার এটা ছিল গ্রীষ্মাবাস, সাহেবদের হুইজারল্যাণ্ড। ছোট বড় বাংলো, ফলের বাগান আর রঙিন ফুলের ঝাড় চারিদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে, আপন ইচ্ছে মত। অসীম সৌন্দর্য্যের চরম অরাজকতা। সম্রাট সাজাহান এখানে আসতেন কবিদের নিয়ে, মহারাজরা আসতেন কামিনীদের নিয়ে, বহু সাধু আর সাধক এসেছেন করক নিয়ে, সাহেবরা আসতেন কাচ্চবাচ্চা নিয়ে আর শেখ আবদুল্লাহ এসেছিলেন কারাবরণের দিন গুণ কমিশন নিয়ে।

ফকীর মহম্মদ এলো ভোরবেলা কাশ্মীরের পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। ও প্রকৃতির কোলে মানুষ, আলোর সঙ্গে দিন বাঁধা, সাহেবি আদব কায়দা কিছুই জানেনা। খোঁজ খবর নিয়ে ও গিয়ে হাজির হল নেভর সাহেবের বাড়ী। বেডটির সবেই ঘুম ভাঙ্গে তখন, বিছানা ত্যাগ তো দূরের কথা। এই অসময় সাহেবের কাছে আসার গ্রাম্য বেয়াদপি শাস্তি সইবে কেন? ফকীরকে সে আমলই দিল না। ব্যস্ত হ'য়ে ফকীর যখন সলা উঁচু করল, তখন ভেতর থেকে হুকুম এলো, 'দারকে ভাগা দো'। ব্যথাহত ফকীর গেল নিকটের চৌকিতে পুলিশবাবুর কাছে। ব্যাপারটা শুনে সে ওকে

নিয়ে গেল, জানাশোনা এক সেপাইর কাছে। সে শুনল, বুঝলও ব্যাপারটা সবই, কিন্তু এমন তার সাহস নেই যে সাহেবের কাছে ওকে পৌঁছে দেয়। ফকীরকে সে চা দিল, আর নটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। নটার পর মেজর সাহেব এলেন, সেলাম নিলেন, কাগজ সই করলেন, সহকারিদের নিয়ে সভা করলেন তারপর ফকীরের আশার সংবাদ শুনে বললেন, কাল আসতে বল, আজ কিছু ব্যস্ত। ব্যর্থ হ'য়ে ফকীর মহম্মদ ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু যাওয়া তার হল না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সে পেছন ফিরে তাকালো, কি মনে হল কে জানে, ব'সে পড়ল পাশের চিনার গাছের তলায় আর কাঁদতে লাগল, ছেলেমানুষের মতন। গেটের সেপাই জিজ্ঞেস করল, অমন ক'রে সে কাঁদছে কেন? ফকীর আবার সব বলল। সে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে। ক্যাপ্টেন কোহলি ওকে পৌঁছে দিলেন খোদকর্তার কাছে। শোনা যায় বড় সাহেব নাকি সব শোনার পর বলেছিলেন:

"রোগাস্! হ'তেই পারে না। তুষ ময়দানের পেছনে, খাগ পাহাড়ের ওধারে আমাদের বড় পাহারা আছে! সেখান থেকে একটা মানুষ আসতে পারে না, হাজার মানুষ তো দূরের কথা!" ক্যাপ্টেন কোহলি যখন টাকার বান্ডিলের কথা তুললেন তখন সাহেব টেবিল চাপড়ে বললেন:

"স্যালর! ওকে আটকে রাখো আর সহজে যদি সত্যি কথা না বলে তো শক্ত হাতে ওকে শাস্তি দাও!" তারপর যা হ'য়েছিল ব'লে শোনা যায় তা এমনই অবিশ্বাস্য যে ভাবতেও লজ্জা করে, দেখা তো দূরের কথা। কোহলি সাহেবের পেড়াপিড়িতে বেলা এগারোটা নাগাদ সাহেব নাকি নিমরাজি হ'লেন!

"যেতে পারো," সাহেব বললেন, "কিন্তু পুরোপুরি তোমার নিজের দায়িত্বে! যদি সত্যি না হয় তাহ'লে শাস্তি পাবে।"

"সঙ্গে লোক?"

"নিতে পারো, বেশী নয়, জনা পঁচিশ। ভেড় যখন ব'য়েছ মেষে এসো!"

কথাটা শুনে ফকীর নাকি হেসে ব'লেছিল:

"পঁচিশজন হজরত? ওরা যে কম ক'রে দু'হাজার। দেখা ঠিকই হবে কিন্তু দেখে আর আসা হবে না!"

আসেও নি কেউ ফিরে। পঁচিশজন সেপাই, ক্যাপ্টেন কোহলি, ফকীর মহম্মদ, কেউ না। ফকীরের কঙ্কাল তবু পাওয়া গিয়েছিল, অন্য কারো চিহ্ন পর্যন্ত মেলেনি।

ওদের বিনিময়ে যা আমরা পেয়েছি তার নাম কাশ্মীর।

সাহেব সাহেবের বাড়ী হল ডল লেকের ধারে, জায়গাটার নাম গাগরিবল। ওঁর বাড়ী পেরিয়ে যাঁহাতেই যে ছোট্ট কাঠের বাড়ী তার মালিক ছিলেন কাদের মিঞা। উনি ছিলেন হাঁজি, অর্থাৎ হাউসবোটের মালিক। প্রথম পাকিস্তানি হামলায় উনি যখন মারা যান তখন ওঁর বড় ছেলে মহীউদ্দিনের বয়স ন' বছর। পুরো সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ও সেল ওদের হাউসবোটের হাল ধরতে আর ভাইকে দিল স্কুলে ভর্তি ক'রে। তাই লেখাপড়া করল না, বললে ও হাঁজি বাচ্চার কম্ম নয়। অন্য হাঁজিরা হেসে বললে, কেমন বলিনি আমরা? বাপ ঠাকুদ্দার পথ নে।

মহীউদ্দিন অত্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ কিন্তু হাঁজিদের কথা শুনে ওর গা জ্বলে গেল! গোপনে আরম্ভ করল পড়াশোনা। সারাদিন নৌকা চালায় আর ভাড়াটেদের হুকুম খাটে আর তাদের দিন

শেষ হ'লেই আরম্ভ হয় ওর ব্যাকুল সাধনা। সারা শীতটা কাজ নেই, খুব সুবিধা, লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়ে দেয় সময়। এইভাবে আট বছর দুরুহ সাধনার পর একদিন সবাই অবাক হ'য়ে দেখল, মহীউদ্দিন হাঁদি কেবল ম্যাট্রিকই পাশ করেনি, সরকারি দপ্তরে কাজও পেয়েছে। নূর মহম্মদ ওয়ানি ন' খানা বোটের নাম করা হাঁদি। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে নূর হাঁদি নিজের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিল ঘটা ক'রে। সে রকম ঘটা নাকি ও পাড়ায় অনেক বছর ঘটেনি।

মহীউদ্দিনের কাজটা খুব বড় নয় কিন্তু দায়িত্ব অনেক। ও হল রাজস্ব বিভাগের পাটওয়ারি। জমির মালিকানা যখন হ'লে ওর মতামত চাই সবার আগে, মাপ নিয়ে ঝগড়া হ'লে ওই সেটা আদায় করে। অনায়াসে ডিক্রি করা যেমন ওর হাতে, আবার খাজনা মাপ করাও ওরই হাতে।

বক্সি যখন কাশ্মীরের সর্বময় কর্তা ও তখন চাকরিতে প্রথম ঢোকে, বক্সিরই আমলে। আসলে কিছুই নয়, হাঁদি সম্প্রদায়কে হাতে রাখার একটা বন্দোবস্ত চালু। ওরা ভালো মানুষ অত সব বোঝে না, তাই মহীউদ্দিন ওঁকে শ্রদ্ধা করত নিজের বাপের মতন। সেই সুযোগ নিয়ে বক্সি সাহেবের শালা যখন ওর এলাকায় ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করলেন ও তখন তাঁকে বেধে তাড়িয়ে দিল। সেই রাগে বক্সিসাহেব ওকে পাঠিয়ে দিলেন হাজিপীরের কাছাকাছি বীরুতে। ওকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শালাবাবুর কাজ সারলেন আর এই অবসরে মহীউদ্দিনের শ্বশুর যখন ওকে ফিরিয়ে আনবার দরবার করল, তখন উনি উদার আনন্দে রাজি হলেন।

মহীউদ্দিন যখন আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো, যানবাহন বিভাগের নিম্নতম কেরানী, বক্সী সাহেবের ঐ শালাবাবু তখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের (কাশ্মীরের জাতীয় কংগ্রেস আজকাল ওর নাম হ'য়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।) সেক্রেটারি। মহীউদ্দিন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে এসেই চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করল, এই দিন দুপুরে ডাকাতি চলবে না, চলবে না, চলবে না। সবাই বারণ করল, বললে, দুটি সন্তানের বাপ হ'য়েছিস্, কি করবার বাপু চেঁচামেচি ক'রে? ও বললে, কি হবে? আমায় খুন করবে? করুক! আমিও তো বাপ মরা ছেলে মানুষ হ'য়েছি। ওরাও হবে। শালাবাবুর ষড়যন্ত্রে মহীউদ্দিন আবার বদলি হ'য়ে চ'লে গেল বীরু।

ন' তারিখে ছিল উরস্-এর মেলা। মহীউদ্দিনের বড় সন্তান, সাত বছরের কচি ছেলে করুণ বাপকে নিজের হাতে চিঠি দিয়েছিল চ'লে আসতে, হাত ধরে যাবে মেলা দেখতে। মহীউদ্দিন সাতদিনের ছুটি নিয়েছিল তিন থেকে দশ, আর সন্তানদের জন্যে কিনেছিল এক শিশি লজেন্স সঙ্গে নিয়ে যাবে ব'লে, তিতিমত অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল শ্রীনগর থেকে। বুড়ী মার জন্য আনছিল এক শিশি মধু। হাট্টা ক'রে ওর সহকারি লস্করদার লাল বাহাদুর জিজ্ঞেস করেছিল, বিবির জন্যে কি নিলে? মহীউদ্দিন সযত্নে সুরে ব'লেছিল, বিবি কি আর সহজে ছাড়ার মানুষ, কেনা জিনিষে তার মন ওঠে না, সে চায় এমন জিনিষ যা কেবল আমিই দিতে পারি তাই মনে করেছি একবার দেব একটা মেয়ে।

বীরু থেকে বেরিয়ে মাইল চারেক হাঁটা পথে এলে তবে বাস পাওয়া যায়। পথটা পুরোই পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে আসে। মহীউদ্দিন মনের আনন্দে চ'লে এলো মাইল দুয়েক। সেখানে এক পাহাড়ি নদী পেরোলো কাঠের ঝোলানো পুল ধ'রে। তারপর একটু ওপরে উঠে মোড় ঘুরলেই হাজিপীর। এখানে, দুই পাহাড়ের কোলে খুব খানিকটা মাঠ। ওপর থেকে মহীউদ্দীন মাঠটা

থেকে থমকে দাঁড়াল। এই মাঠে যে এমন ভারি মেলা বসবে এ খবর তো ও পায়নি! অবাক কাণ্ড! বক্সির আমলে এ ধরণের যে-সরকারি কাজ দু চার বার হ'য়েছিল, ঠিকই কিন্তু সাদেক সাহেব তো সে ধরণের মানুষ নন। মনে মনে ও ঠিক ক'রে নিল শ্রীনগর যখন যাচ্ছেই তখন ওকে না জানিয়ে ওর এলাকায় এই সব বে-আইনি কাজ নিয়ে একটা হৈ-চৈ করবেই! সাদিক সাহেব সরকারি কাজের মর্ম বোঝেন, তাছাড়া শালা শোষণের বরদাস্ত নেই। মনে মনে মহীউদ্দিন অভিযোগের কাঠামোটা পর্যন্ত নক্সা ক'রে নিল।

আরও একটু নিচে নেমে আরও খানিকটা অবাক হল! মেলা নয়, কারবার মেশিনগান আছে। তাহ'লে? সোজা পথেই ও চ'লে যেতে পারত কিন্তু ওর এলাকায় এমন কাণ্ড? খোঁজ না নিয়ে যায় কি ক'রে? তাছাড়া অভিযোগ করতে হ'লে কারণটা সঠিক জানাও দরকার। কে ওরা? কি চায়? কেনই বা এসেছে ওর এলাকায় ওকে না জানিয়ে? সোজা পথ ছেড়ে ও নিচে নামার পথ ধরল, রাগে গর গর করতে করতে। রাগের আরও একটা মস্ত কারণ হল এই ফুল খাঁড়িয়ার মাঠের ধারে কাছে যত সব যেনো জমি চাষ নিয়ে মামলা মকদ্দমার শেষ ছিল না। সন্ধি সিমানার বারো আইনের মধ্যে ব'লে এখানকার পুরোণো বাসিন্দারা ছেড়ে গিয়েছিল প্রথম আক্রমণের পর। আর নতুন যারা এসেছিল বেশরোয়া অংশী মানুষ। ও এসে মামলা থামিয়ে সিটমাট করার পর আর বছর দুই হল ফসল ফলছে। নিচের বেয়াদপ লোকগুলো তারই ওপর ঝুড়ে ব'সেছে। এতে শুধু লোকগুলোর ক্ষতি নয়, কাশ্মীরের ক্ষতি।

মাঠের ধার পর্যন্ত নামতে না নামতেই ওকে ঘিরে ধরল, একেবারে অচেনা অজানা মানুষগুলো। মহীউদ্দিন চালাক মানুষ, একচোখ দেখেই বুঝল ওদের মতলব ভালো নয়। ওরা কিন্তু আদরে আর আপ্যায়নে ওকে অস্থির ক'রে তুলল, পারলে যেন মাথায় তুলে নাচে! ওকে নিয়ে লোকগুলো উঠে গেল পাহাড়ের কোলে একটা গুহার মধ্যে। সর্দার ব'সে চিঠি পড়ছিলেন। লোকগুলো আলাপ করিয়ে দিল, ইনি আমাদের মোড়ল আর এই হল এ তল্লাটের হাকিম, মহীউদ্দিন। আর এক প্রস্থ আপ্যায়নের ঝড় ব'য়ে গেল। মহীউদ্দিন বুঝল, ও শক্ত হাতে পড়েছে, সহজে ছাড়া পাবে এমন আশা কমই।

কিন্তু গেল। মোড়ল সর্দার স্পষ্ট ভাষায় দয়া ভিক্ষা চাইলেন। বললেন, আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা ওঁরা, পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে পালিয়ে এসেছেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার সব ছেড়ে, হিন্দুস্থানী প্রাচুর্যে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন ব'লে! বাধা দিয়ে মহীউদ্দিন বলল:

"তাহ'লে এতো বন্দুক কামান কিসের?"

"এগুলো?" সর্দার বলল, "আমাদের সায়েস্তা করবে ব'লে পাকিস্তানি সৈন্য এসেছিল। আমরা সদলে তাদের ঘেরাও ক'রে কেড়ে নিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল, আবার যদি সৈন্য আসে, ল'ড়ে যাবো, কিন্তু শোনা গেল এবার ওরা নাকি আসছে হাজারে হাজারে। পেরে ওঠা যাবে না ব'লে পালিয়ে বাঁচলাম!"

এক মিনিট চুপ ক'রে কি ভাবল মহীউদ্দিন, বলল: "আমায় কি করতে হবে?"

"দয়া!" সর্দার বলল, "দয়া করতে হবে।"

"কি?"

"আমাদের পথ দেখিয়ে নেওয়ার লোক এনে দিতে হবে!"

"কেন?" মহীউদ্দিন জানতে চাইল, "এখান থেকে বারামুলা তো সোজা পথে যাওয়া যায়!"

সর্দার একটু থমকে গেল, কিন্তু এক পলক হেসে বললে: "বারামুলায় যাওয়া আমাদের চলবে না, বিপদ আছে।"

"কিসের?"

"বারামুলায় যে সব অত্যাচার হ'য়েছিল গত পাকিস্তানি আক্রমণে সে তো আপনার জানাই আছে..."

খুব জানা আছে মহীউদ্দিনের। ওর বাবা তখন ছিলেন উলার হ্রদের হাউস বোটে। তাড়াটে সাহেবরা পালিয়েছিল ওকে ফেলে আর পাঠানরা ওর হাউস বোটে আগুন লাগিয়েছিল ওকে তার মধ্যে বন্ধ ক'রে। মনটাকে সেই স্মৃতির জ্বালা থেকে সরিয়ে আনল মহীউদ্দিন বললে: "হ্যাঁ, আছে, কিন্তু তাতে আপনাদের ভয় কি?"

"সে অত্যাচারের কঠিন নিষ্ঠুরতা আজও কেউ ভোলেনি আর সেই জন্যই আমাদের কেউ ক্ষমা করবে না, খুন করবে!"

"তাহ'লে?"

"আমরা চাই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পন্টার পৌঁছোতে। সেখান থেকে আমরা যাবো সামরিক সাহেবের কাছে, নিজেদের উৎসর্গ করব ওঁর সেবায় আর দেশের কাজে।" মহীউদ্দিনের পা জড়িয়ে ধরল সর্দার, বললে:

"দয়া করুন হাকিম সাহেব, আমাদের বাঁচতে দিন। আমরাই তারপর যাবো হাজিপীর পেরিয়ে আজাদ এলাকাকে সত্যিই আজাদ ক'রে আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে উদ্ধার ক'রে আনতে!"

উঠে গেল, সর্দার, নিয়ে এলো টাকার বাণ্ডিল, বললে, "নিয়ে যান টাকা যা আমাদের আছে, সব। আমাদের দেশ গেছে মান গেছে, সংসার গেছে সবই যখন গেছে তখন টাকা থেকে কি হবে। আরও চাই আরও দেব"। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার ক'রে বলল সর্দার—"নিয়ে এসো যার যা আছে, সব দিয়ে দাও হাকিম সাহেবকে এক্ষুণি।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই লোক ছুটল টাকা আনতে।

হাসতে হাসতে মহীউদ্দিন বলল: "আমি চলমুখোর নই যে টাকা নিয়ে তবে সাহায্য করব!" কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর পায়ের কাছে ভারতীয় নোটের পাহাড় জমে উঠল। দু একটা তার মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে মহীউদ্দিন বলল: "এ যে দেখছি সব ভারতীয় নোট!"

সর্দার বললে, "হ্যাঁ! নিমকহারাম সব দেশেই আছে। এগুলো সব মাড়োয়ারিদের টাকা পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে ছিল, আমরা লুঠ করেছি।"

"ওঃ!"

"তাহ'লে আর দেরি নয় হাকিম সাহেব! বাছা বাছা লোক আনুন এমন সব লোক যারা রাত্রে দেখে বেড়ালের মতন, আর পথ চিনে নেয় কুকুরের মতন শুধু গন্ধে!"

"হুম্!" উঠে পড়ল মহীউদ্দিন। সর্দার কুর্নিশ করার ছলে গুঁজে দিল কয়েকটা একশো টাকার নোট ওর পকেটে, বললে:

"বাচ্চাদের জন্যে আমাদের নজরাণা!"

বেশ একটু রাগ ক'রেই ও ফেলে দিল নোটগুলো, বললে: "দয়া যখন ইচ্ছে হয় আমি দান করি, বিক্রি করিনা!"

গট গট ক'রে বেরিয়ে গেল মহীউদ্দিন একদম বেপরোয়া। তার প্রাণে অনেক জিদ, প্রাণ হারানোর নয়, পৌঁছোতে না পারার! কিন্তু সে নিয়ে ভাবনা করলে কাজ হবে না, কাজ নষ্ট হবে!

এবার আর হাঁটা নয়, রিতিমত ছুটে চলল মহীউদ্দিন। রাত হওয়ার আগে খবরটা পৌঁছে দিতে না পারলে কাজ হবে না কিছুই। রাতারাতি কোথায় সটকে পড়বে কে জানে? তখন আবার ওদের ধরাও হবে শক্ত। সঙ্গে ওদের যখন অত হাতিয়ার তখন লুঠতরাজ তো করতেই পারে! বকসির লুঠতরাজের পর সবে দেশটা সাদিকসাহেবের আমলে স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে যদি আবার হয় অরাজকতা, তাহ'লে লোকরা না খেতে পেয়ে প্রাণে মরবে! চক্ষের নিমেষে পাহাড় পেরিয়ে বাস ধরল আর সোজা গেল বারামুলা। গভীর উত্তেজনার ও খেয়ালই করেনি যে চারজন ওর পেছু নিয়েছে সেই পাহাড়ের কোল থেকে।

'বরাহ মূল' কথাটার অপভ্রংশে হল বারামুলা। কাশ্মীরি হিন্দুরা কিম্বদন্তি শুনে আসছে যে এইখানেই নাকি ভগবান শ্রীবিষ্ণু বরাহ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের কথা জানিনা কিন্তু যে সব ভাগ্যবান সাতচল্লিশের হানাহানি অত্যাচার উত্তীর্ণ হ'য়ে আজও বেঁচে আছেন তাঁদের কথা হল যে পাকিস্তান এখানে পঞ্চরও অক্ষম হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো গত বারের হানায়। সে ক্ষত এখনও আছে জায়গায় জায়গায় আর সব চেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে আছে সেই চায়ের দোকানের সামনে কাঠের থামে। শুধু সহীদ বললে শেরওয়ানিকে অপমান করা হয়। উনি অবতার!

মহীউদ্দিন বারামুলায় নামল সন্ধ্যার ঠিক আগে আর সোজা গেল পুলিশ সাহেবের বাড়ী। ওর জীপের খবর নিয়ে যে সব খোঁজ লস্কর হয়েছিল আগের রাত্রে তারই সূত্র ধরে ওকে যেতে হয়েছিল শ্রীনগর, কাজেই মহীউদ্দিন পুরো সংবাদটা জানালো থানাদার। থানাদার সাহেবের অপেক্ষায় সংবাদটা ফেলে রাখল, রাত এগারোটা পর্যন্ত! না যদি রাখত তো ছুত খাবিরার থানাদাররা সময়মত স'রে পড়তে পারত না। তিনশো পঞ্চাশ টন সোনা বাহন নিয়ে স'রে পড়া সহজ কথা নয়। তাও সম্ভব হয়েছিল ঐ থানাদারের ভুলের জন্য।

আবার বাসে উঠল মহীউদ্দিন। ও যদি শ্রীনগরের বাসে উঠত তাহ'লে এ যাত্রা ও বেঁচে যেত, কিন্তু ওর কর্তব্য পালনের নেশাই ওর কাল হল। ও উঠল পট্টানের বাসে। খবরটা ওখানকার থানাতেও দিয়ে যাওয়া দরকার। ও জানে লোকগুলোর লক্ষ্য হল পট্টান। তাও ও বেঁচে যেত যদি না চৌকের চায়ের দোকানে ব'সে চা খেত। ঐ যে আধ ঘণ্টা দেরি হল তার মধ্যেই একটা বাস বেরিয়ে গেল। ও গিয়ে উঠল শেষ বাসটায়। ও এখনও লক্ষ্য করেনি যে চারটে লোক ওর সঙ্গে জোঁকের মতন লেগে আছে।

পট্টান বাস পৌঁছোলো রাত নটায়। নেমে পড়ল মহীউদ্দিন। সামনেই থানা। ও সব কথা তাদের সবিস্তারে জানিয়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। থানাদার বলল, রাত্রে ওখানেই খেয়ে যেতে কিন্তু মহীউদ্দিন সারাদিন কিছুই খায়নি, মনটা কিছু ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তাই ঠিক করল, রাতটা ও বসজিদেই থাকবে। সকালে ওকে ওখানেই পাওয়া গেল মৃত। মাথায় গুলি মেরে ওকে মেরে ফেলে

দেছে কেউ। চিনার গাছের তলায় যে বুড়োটা সারারাত জেগে কাটায় সে বলতে চায়জন লোককে সে দেখেছিল অনেক রাতে মসজিদে যেতে আর একটু পরই বেরিয়ে আসতে।

নিজে ম'রে মহীউদ্দিন কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

শ্রীনগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড় ঘেরার ওপারে হল বুদ্ধাকারবাদ আর তারই প্রায় কাঁধ ঘেঁষে হল টিথওয়াল। গত হানাহানি যুদ্ধে এখানে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে আর গত আঠারো বছর ধ'রে যত জায়গায় গুলগোলা চলেছে তার মধ্যে ঐ এলাকাতেই বলতে গেলে সব চেয়ে বেশীও। এই অঞ্চলের প্রাধান্য অনেকখানি কারণ সেই আর কার্গীল যাওয়ার পথ এইখান দিয়েই। এই সব নানান কারণে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের সতর্কতা এ অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী।

টিথওয়াল থেকে যদি শ্রীনগরের দিকে সরে আসা যায় তাহ'লে প্রথম আর সামরিক কারণে প্রধান বড় ঘাঁটি হল ওরেজ। সন্ধি সীমান্ত থেকে ওরেজ হাঁটা পথে আসতে লাগে প্রায় পুরোদিন কারণ অনবরত পাহাড় উঠতে আর নামতে হয়। পাখীওড়া পথে দূরত্ব হল ছ মাইল, কম কিছু বেশী কিছুতেই নয়।

ওরেজ খুব একটা বড় জায়গা নয়, গ্রামও নয় আর শহরও নয় দুয়ের মাঝামাঝি। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য ছাড়া এখানে আর বড় একটা কিছু নেই। একে বড়াই ক'রে বলবার মতন আছে হাবা খাতুনের আজব গল্প। হাবা খাতুন ছিলেন সত্যিই চাষীর মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই ওর জীবনের ধারা ছিল একেবারে আলাদা। যে বয়সে মেয়েরা পাড়াময় হৈচৈ ক'রে বেড়ায় সেই বয়সে উনি ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকতেন আর একটু যেই বয়স হল সাংসারিক কাজে মাকে সাহায্য করার, দেখ তো না দেখ উনি বেরিয়ে যেতেন গ্রামের বাইরে, গিয়ে বসতেন ঝর্ণার পারে কি ক্ষেতের ধারে আর আপন মনে গাইতেন গান। আজই গ্রামের মধ্যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার রীতি নেই চার শো বছর আগে তো ছিলই না, কিন্তু হাবা খাতুন তা শুনবেন কেন। গ্রামের পীরের কাছে উনি গিয়ে বসতেন যখন তখন আর বলতেন কবিতা শুনব। একদিন দেখা গেল উনি নিজেই ছড়া কাটছেন।

বাপের তো মাথায় বাজ পড়ল। উনি ন' বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন গ্রামের এক চাষির সঙ্গে। সে যেমন গরীব তেমনি গোঁয়ার। মুক্ত বিহঙ্গমের মতন যে মেয়ে মানুষ হ'য়েছে, সংসারের শৃঙ্খল পরে সে হ'য়ে উঠল শোকাচ্ছন্ন। একে গোঁয়ার স্বামী তায় আবার হজ্জাল শাশুড়ি। ওর আর বেদনার শেষ নেই। সারাদিন ও কাঁদে আর চোখের জলে কবিতা বানায় আর এমনই তরা বেদনার ভাষা যে মেয়েদের মুখে মুখে সেগুলো ঘুরতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দেখতে দেখতে বছর সাত আটের মধ্যে প্রায় সারা কাশ্মীর গাইতে আরম্ভ করল। ওর মুখে মুখে বানানো গান। ওর যত নাম হয়, শাশুড়ির তত হয় রোষানল আর স্বামীর তত বাড়ে অত্যাচার।

একদিন রাজা ইসুফ শাহ শিকার করতে বেরিয়ে গিয়ে পড়লেন তাঁদের গ্রামের ধারে। ওকে এক ঝর্ণার ধারে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে ছড়া কেটে জানতে চাইলেন ও কে? ছড়া কেটেই উনি উত্তর দিলেন রাজাকে। রাজা তো মুগ্ধ। এতো রূপ আর এমন গুণ যে মেয়ের সে কিনা সামান্য একটা চাষীর বৌ? রাজা ওর স্বামীকে দিলেন চার ঘড়া মোহর আর চেয়ে নিলেন হাবা খাতুনকে। গ্রামের মেয়ে হল রাজার রাণী।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আকবর বাদশাহ-র সৈন্য এলো আর রাজা হলেন বন্দী। রাণী

হাবা খাতুন বহুদিন ব'সে রইলেন স্বামীর পথ চেয়ে তারপর একদিন শুনলেন তাঁর স্বামী মারা গেছেন। বন্দী অবস্থায় বাংলা দেশে যেদিনই হাবা খাতুন রামপোষাকে ছেড়ে পরলেন সেদিন আর চ'লে গেলেন ওয়েজ। পথে পথে উনি ঘুরতেন আর ঘুরে ঘুরে গান গাইতেন প্রেমের গান, বিরহের গান, প্রকৃতির গান। দারা কাশ্মীর আজও সেই গান গেয়ে যান কাটে, জল আনে, মন জানাজানি করে। অলিখিত কবিতার এতোখানি প্রচার আর এমন লম্বা টানা জীবন আর কোন দেশে অন্য কোন কবির ভাগ্যে ঘটেছে কি না আমার জানা নেই।

এরই কবিতা শুনে মেহজুর একদিন কাশ্মীরি ভাষায় লেখা আরম্ভ ক'রে অমর হন আর ১৯৬৩ সালে যখন উনি মারা যান পুলওয়ামা তহসিলে, সেই বছর ওয়েজের এক গরীব ঘরে জন্ম গ্রহণ করে আরো রাখা।

আল্লাহ রাখার বাবা একজন গরীব চাষী। পর পর ছটি ছেলে মেয়ে মারা যাওয়ার পর যখন ওর স্ত্রী আবার আসন্ন প্রসবা হ'লেন তখন স্বামী স্ত্রী মানত করলেন যে ছেলে যদি হয় তো তাকে আল্লাহতালাকে দিয়ে দেবেন। ছেলে যখন হল তখন সবাই বলল, দিয়ে তো দিবি কিন্তু আল্লাহের নামে দিলে ওকে নেবে কে? অতএব উপায়? অনেক গবেষণার পর ঠিক হল যে যতদিন না আল্লাহতালার মর্জি হচ্ছে আর উনি মেহেরবানি ক'রে কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছেন ততদিন ছেলেটা হবে দেশের আর দশের, আর ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবে ওর চাষী বাপ। আল্লাহর নামে ওকে রাখা হল বলে ওর নাম হল আল্লাহরাক্ষা, ডাক নাম অলি!

অলি তো অলিই, কিছুতেই ঘরে থাকে না, দিনরাত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মাঠে বনে আর গান গায় হাবা খাতুনের। ওয়েজের সকলের কণ্ঠে সারাদিন ওঁর গান শুনে শিখতে অলির সময় লাগেনি। তেরো সকালে উঠেই ও প্রথম গান ধরল হাবা খাতুনের শেষ বয়সে লেখা সুন্দর গান 'ওগো, আমি তোমারই, এ পরদেশে, পরবাসী হ'য়ে ঘুরে ঘুরে আমার যে আর দিন কাটেনা, এবার তুমি তোমার কাছে যাওয়ার পথ আমায় ব'লে দাও!' বাপের সেদিন মেজাজ বড় খারাপ, গান শুনে ক্ষেপেই অস্থির। রেগেমেগে বললে, আদিস্ কেন এখানে, গেলেই তো পারিস্ তোর আল্লাহের কাছে! হাসতে হাসতে বারো বছর বয়সের অলি বললে, তাই তো যাব। সময় হল ব'লে।

মার কাছ থেকে ছুটো বাবরখানি চেয়ে নিয়ে অলি বেরিয়ে গেল রোজই ও যেমন যায়। পাহাড় বেয়ে ও নেমে গেল সেই নিচে, যেখানে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে ব'সে ও হাবা খাতুনের গান গায়। ওয়েজের সবাই বলে কি যে পাগল ছেলে ওটা তার ঠিক নেই, আবার সবাই ভালোও বাসে খুব। স্বভাব বড় ভালো, সর্বদাই হাসে আর কেউ যদি কখন কোন কাজ করতে বলে তো খুসী মনে করে! দিয়েই ছুটে নেমে যায় সেই নিচে ঝর্ণার ধারে! একলা এমনি ক'রে থাকতেই না কি ও ভালোবাসে!

আজ ও নিচে নেমে দেখল ঝর্ণার দু ধারে অনেক লোক আর এমন ভাষায় কথা বলে যা ওর বুঝতে খুব কষ্ট হয়। লোকগুলোর কাঁধে বন্দুক আর মুখে গালাগাল! হারামজাদা ছাড়া কথাই বলেনা। ঐ বয়সের অন্য কোন ছেলে হ'লে ভয়েই পালাতো, অলির প্রাণে ভয়ডর নেই ও সোজা নেমে গেল ওদের মধ্যে। ওরা বুঝি ওকে ছেড়ে বাঁচল। একজন ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেল নিজের ক্যাম্পে আর হাতে দিল ট্রানজিস্টার। রিভিয়ত গান শোনা যায়। ও অবাক হ'য়ে দেখল।

লোকটা হাসল। বললে, "ওপরে কি সেপাই আছে?"

ও হাসল কিন্তু করে। বললে, "দেখিনি তো!"

"বাঃ এই যে তুমি এলে ওপর থেকে!"

অলি আবার হাসল। বললে, "আমি তো এলাম এই দিক থেকে আর সেপাইরা থাকে ঐ দিকে!" আসলে, আসবার সময় ও সৈন্য ঘাঁটির পাশ দিয়েই এসেছে আর দেখেও এসেছে তাদের কুচকাওয়াজ। খুব ভালো লাগে ওর দেখতে; রোজ তাই ঐ পথ দিয়েই আসে। সেপাইরাও ওকে চিনে নিয়েছে। একদিন যদি কোন কারণে ও না যায় ঘাঁটির দিকে তো দুচার জন ওর খবর নিতে আসেই, ও ওদের গান শোনায় আর ওরা ওকে যখন যা হাতের কাছে পায় দিয়ে যেয় সন্দেশ, টফি, চুইংগাম, যা হক একটা কিছু। আজ যে চুইংগাম দিয়েছিল সেটা বার দুয়েক ভালো ক'রে চিবিয়ে অলি বললে, "যাবে ওদের সঙ্গে দেখা করতে?"

লোকটা বললে, "না থাক। আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে, আজ আর গল্প করার সময় নেই!"

অলি আবার কি ভাবল, বললে, "কোথায় যাবে তোমরা?"

"উরির দিকে।"

"ও!" বলে অলি আবার উঠে যাচ্ছিল ওপরে।

লোকটা ডাক দিয়ে বলল, "এই শোন।"

ও আবার নেমে এলো: "কি?"

"তুমি ঠিক জানো সেপাইরা আছে ঐ দিকে?"

"তাই তো থাকে। দেখবে এসো।"

"আর, এদিক দিয়ে উরি যাওয়া যায়? জানো?"

"হুম্ জানি। যাওয়া যায়।"

"কোন দিক দিয়ে?"

"যে দিক দিয়ে আমি এলাম। এসো, আমি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি!"

লোকটা বলল, "এখন নয়। তুমি গান শোন, আমরা একটু পরে যাবো!"

"আচ্ছা।"

সন্ধ্যার ঠিক একটু আগে ওদের যাত্রা শুরু হল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অলি আর ওর পেছনে চলেছে শ খানেক হানাদার। ঘাঁটির কাছাকাছি এসে ও বললে, তোমরা দাঁড়াও, আমি চট ক'রে ওপরে গিয়ে দেখি কেউ আছে কিনা। ওপরে ও খবর দিয়ে আবার নিচে নেমে বলল, "না কেউ নেই, চল!"

ওরা ওপর থেকে অবাক হ'য়ে দেখল শ' খানেক লোক উঠে আসছে ওপরে আর সকলের কাঁধে বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সাজ সাজ রব আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই দু'দলের মুখোমুখি। হানাদারদের প্রথম গুলিতেই অলি হল নিহত।

বারো বছরের ছোট্ট শিশু একবার শুধু ডাক দিয়ে গেল, "ইয়া আল্লাহ!"

আল্লাহতালার ছেলে ফিরে গেল তাঁরই কাছে। রেখে গেল কাশ্মীর।

গুলমর্গ-এর তলায় নেমে সামনের পাহাড়, উঠলেই নিচে দেখা যায় শ্রীনগরের এয়ারপোর্ট। সন্ধি-সীমান্ত থেকে পাহাড় বেয়ে উঠে এলে গুলমর্গ দশ মাইল আর গুলমর্গ থেকে এয়ারপোর্ট ঐ পাহাড়ী পথে আরও কম অর্থাৎ সন্ধি-সীমান্ত থেকে কম বেশী কুড়ি মাইল এলেই এয়ারপোর্ট। গত পাকিস্তানি হানায় সমর শ্রীনগর অভিমুখী হানাদারদের দল যখন বারামুলায় আটকে গেল তখন জিন্নাসাহেবের নতুন একদল হানাদার পাঠিয়েছিলেন এই পথে এয়ারপোর্টটা হাত করার বাসনা নিয়ে; আর তাদের সঙ্গেই হয়েছিল ভারতীয় সৈনিকদের প্রথম যুদ্ধ এয়ারপোর্টের এক মাইলের মধ্যে।

এই এলাকাটা বড়গাম তহশিলের অন্তর্ভুক্ত আর মেহবুব সাহেবের বড় শালা শাহ আবদুল আজিজ হ'লেন এখানকার, যাকে বলা হয় কার্ভে পিটিয়েন। থাকেন বটে এক হারিয়ে যাওয়া কোণে কিন্তু হ'লে কি হবে, মানুষটা এমনই জনপ্রিয় যে, এ এলাকার প্রত্যেক লোকটা ওঁর প্রিয়জন বিশেষ ক'রে গুলাম কাদের। গুলাম হল শাহজীর বন্ধু আবদুল আহাদের ছোট ছেলে, বয়সে ওঁর চেয়ে কম ক'রে চল্লিশ বছর ছোট। শাহজীর মুখে গল্প শুনেছি, গুলাম যেদিন জন্মায় সেদিন উনি খুশী হয়ে এমন হাঁকি লাফিয়ে উঠেছিলেন যে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ছুট দেয় আর উনি খুব থেকে সোজা হালপাতাল দুখানা ভাঙা পা নিয়ে। আবদুল আহাদ যখন ওঁকে দেখতে গেলেন হালপাতালে তখন শাহজী এমন জোরে ওঁর পিঠে চাপড়ে ছিলেন যে শাহজীর ডান হাতের কব্জি দিন সাতেক প্লাষ্টার করে রাখতে হয়। এই সব নানান কারণে শাহজী ব'লেছিলেন, বড়গামের কেউ যদি আমায় হারাতে পারে কখন তো ঐ শালা গোলাম কাদের!

সেই জন্যেই বোধহয় কাদেরের সেই ছেলেবেলা থেকেই শাহজীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ঠিক পিঠোপিঠি দুই ভায়ের মতন। শাহজীর ভালোবাসার জোরেই যে এমনটা হ'য়েছে তা নয় কাদেরও ওঁকে যথেষ্ট ভালোবাসে আর ভক্তি করে, তবুও পায় আবার ঝগড়াও করে। শাহজী ভালো ঘোড়ায় চড়েন দেখে ও সাত বছর বয়সেই ঘোড়ার পিঠে সার্কাস করতে আরম্ভ ক'রে দিল। শিক্ষাটা যদিও শাহজীর তবু ঈর্ষা আটকায় কে? দেখে শুনে শাহজী বললেন, শালা হারামজাদা, জানে কিনা আমার বুড়ো হাড় তাই আমায় শোক দেখায়! হেমন্তের এক রঙিন দুপুরে কাদের শাহজীর গোটা কয়েক পাকা চুল তুলে এমন আরাম দিল যে শাহজী ওকে যা চাইবে তাই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। কাদের চাইল স্কুলে পড়ার খরচ। আর দেখতে দেখতে ও ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে ফেলল। শাহজী বললেন, শালা কম হারামি, আমারই মাথায় হাত বুলিয়ে আমার চেয়ে বেশী পাশ দিয়ে ফেললে!

পঁচিশে পা দিয়েই কাদের বিয়ে করল, ফতিমাকে। মেয়ে তো নয়, পরী। আরিগ্রামের লোক ব'লে দেশ যদি তো কাশ্মীর আর মেয়ে যদি তো ফতেমা। বিয়ের ঠিক আগে 'মেহদি-রাতে' যেদিন ওকে সাজানো হল সেদিন সব মেয়েরা নজর না লাগার ভুরু কাটল একবার ক'রে, শাহজীর বৌ ভুরু কাটলেন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বার চারেক! সবাই বললে, ওমা, এ কি! বাদি বললে, বুড়োটাকে তো চেনোনা ফাঁক পেলেই নজর মারবে। আর বিয়ের পরই কাদের বললে, শাহ চাচা এবারও তুমি হারলে, আমার বৌ খবসুরৎ, তোমার বৌ বুড়ি।

ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই কাদের লেগে গিয়েছিল দেশের কাজে মীরকাসেমের চেলা হ'য়ে।

বড়গাম গ্রাশন্যাল কনফারেন্স-এর ও ছিল এক পাতা! এমনই ওর নাম ডাক যে নাইবার খাওয়ার সময় নেই। মীরকাসেম ওকে ছাড়া এক পা চলেন না, এক পলক না দেখলে, চোখে অন্ধকার দেখেন। তাই, ন্যাশন্যাল কনফারেন্স নাম পালটে যেদিন ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস হল সেদিন ও হ'য়ে গেল বড়গাম শাখার সেক্রেটারি। সংবাদটা শোনামাত্র শাহচী ছুটে এলেন আরিগামে আর নিজের কানের লেহুরে হানাদারি বুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন—বহুই তুই সেক্রেটারি হ না শালা, দেশের কাজে আমার মতন এমন 'পরম বীর চক্কর' কখন তোর ভাগ্যে জুটবে না! যতই তুই আমায় হারা, এই একটা জায়গায় তোকে হারতেই হবে।

হাসতে হাসতে গুলাম কাদের বললে, "তা যা বলেছ চাচা! আমাদের সেপাইদের এমন কড়া পাহারা যে হানাদার তো দূরের কথা পাকিস্তানি হাওয়া পর্যন্ত আটকে যায়!"

শাহচাচা হাসতে হাসতে ঘর কাটিয়ে বললেন, "সেই জন্যেই হাড়ে বাতাস লেগেছে!"

ন' তারিখে শ্রীনগরে অনেক হাঙ্গামা। ঐ দিনে শেখ আবদুল্লাহ গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন ব'লে তাঁর চেলা চামুণ্ডারা ঐ দিনটায় হরতালের ব্যবস্থা করেন। বক্সির আমলে বছর কয়েক ওটা বেশ জোরদার হ'য়েছিল কিন্তু ষাট সাল থেকে আর হয়নি—দু' চারটে দোকান বন্ধ থাকত এই যা। হঠাৎ শোনা গেল এ বছর নাকি হরতাল আবার হবে এবং শেখ সম্প্রদায় না কি এমন তোড়জোড় করছে যে শ্রীনগরের বেশ্যা পল্লীতেও কারবার বন্ধ থাকবে পুরো দিন। প্রথমটা কেউ এ সংবাদ বিশ্বাসই করেনি কিন্তু হরতালের দিন দশেক আগে বক্সির শালাবাবু যখন পুরো একটা হারেম নিয়ে গুলমর্গ চ'লে গেলেন, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা তুলে, তখন সরকারি মহলে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। তার ওপর ছিল উরস্-এর মেলা জয়ীর সাহেবের মাঠে। ঐ মেলাটা মস্ত ব্যাপার। কম ক'রে আড়াই লাখ লোক জমা হয় খাজা ইয়ারির ঐ মাঠে। ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান সব! সারা শহর খালি ক'রে সবাই যায় উরস্-এ আর সারাদিন সেখানে কাটিয়ে বাড়ী ফেরে সন্ধ্যায়। এদিকে জোর হরতালের ষড়যন্ত্র আর ওদিকে উরস্-এর মেলায় আড়াই লাখ লোক সামলাবার ব্যবস্থা, কর্তাদের তো মাথায় হাত! সরকারি মহলে অনেক পরা মন্ত্রণার পর ঠিক হল হরতাল হক ক্ষতি নেই, কিন্তু কোন রকম গণ্ডগোল যেন কিছুতেই না হয়!

সব শুনে গুলাম কাদের বললে, "কিন্তু যে হরতাল পাঁচ বছর বন্ধ ছিল সেটা হঠাৎ এমন ঘটা ক'রে এবার ওরা করছে কেন?"

সেটাও ঠিক কথা। গণ্ডগোল অবশ্যই একটা বাধানোর ইচ্ছা। কিন্তু···কি? কাশ্মীর কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা মীরকাসেম সাহেব বললেন, অত ভাবনার দরকার কি। হরতাল যাতে না হয় সরাসরি সেই ব্যবস্থা করলেই তো হয়! গুলাম কাদের বললে, তাই হবে! আমি কথা দিতে পারি অন্ততঃ বড়গাম তেহসিল থেকে একটা লোকও হরতালে সামিল হবে না!

তেসরা সারাদিন তহসিলের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে এই মিটিংই করেছে গুলাম কাদের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মিনিট সে থামেনি কেবল কথা আর কথা কি হবে, কেন হবে, কেমন করে হবে! যাতে জাতীয় জীবনে বড়গ্রামের চিরকালীন সুনাম সর্বতোভাবে বজায় থাকে! এই ভাবে

মিটিং করতে করতে সে সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে গিয়ে পৌঁছল শাহজীর বাড়ী উটরা গ্রামে। যে স্কুল বাড়ীটায় তার আগের দিন সকালে কলেরা অন্ন-নিয়ন্ত্রণ শিবিরে গেছে মেয়েদের, সেইখানেই ও ছেলেদের তালিম দিল, দরকার হ'লে দেশের জন্যে মরতে হবে! আর বোম্বাগো হরতাল বন্ধ করার জন্যে কি কি করা দরকার! মিটিং শেষ ক'রে শাহজীর সঙ্গে ও হেঁটে গেল মেহবুব সাহেবের আখরোট গাছ পর্যন্ত ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে করতে।

শেষ কথাগুলো শাহজীর বেশ মনে আছে। শাহজী বুঝি ব'লেছিলেন। "যা মনে হচ্ছে, হরতালের নাম ক'রে ওদের হাঙ্গামা বাধাবার ইচ্ছে!"

"সেটা আমারও সন্দেহ, কিন্তু বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না হাঙ্গামাটা কি! ছোটখাটো কিছু যে নয় তা বোঝা যাচ্ছে শালাবাবুর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার বহর দেখে। পঞ্চাশ হাজার তাও আবার হরতালের ঠিক দশদিন আগে।"

হেসে শাহজী বললেন: "গুণ্ডা ভাড়ার টাকা!"

"কাশ্মীরে যে কটা আছে" গুলাম বললে, "সবই প্রায় মজুরবন্দি!"

"ঐ শালা বক্সি আর তার শালাবাবুকে কিছু বিশ্বাস নেই! হয়ত পাকিস্তান থেকেই নিয়ে আসবে ভাড়াটে গুণ্ডা।"

"কেমন ক'রে? পাহারা নেই?"

"কেন?" শাহজী বললেন, "বক্সির আমলে যে সব লোককে জঙ্গলের ঠিকা উনি ডেকে ডেকে দিয়েছিলেন তারা তো সব কটা রীতিমত হাতিয়ারবাজ। তাদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদি আসে?"

"ও দু চারজন লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে পারে তাতে ক্ষতি নেই…"

বাধা দিয়ে বললেন শাহজী, "দু চারজন? বলছিস্ কি? আঠারোজন ঠিকেদারের দু হাজার মাইল জঙ্গল, দশজন ক'রে এলেও তো প্রায় দু'শো হল!"

"সে পারবে না" গুলাম বললে, "আমাদের সৈন্যবাহিনীর যে কড়া পাহারা!"

"ও তুই যাই বল কাদের, কিছু বিশ্বাস নেই ওদের! তোর চাচি বলছিল উরস্ এ যাবে পুরো খানদান নিয়ে। আমি ভাবছি পাঠাবোনা। ও হাঙ্গামা একটা হবেই!"

"কখ্খনো নয়!" সদর্পে বললে কাদের, "খুদারকসম্ চাচা, কিছু হবে না, আমার জান্ কবুল! আমার জান চ'লে যাবে তবু হাঙ্গামা হবে না!"

"এতো বেমাক্ ভালো নয় শালা" হেসে বললেন শাহজী, "হেরে যাবি!"

"কবে হেরেছি তোমার কাছে চাচা?" হেসে বললে কাদের।

মাথার টুপিটা খুলে চাচা কাদের পাশের বুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন, "এর কাছে। হারিস্ নি তুই?"

"খুদার যদি মেহেরবানি থাকে চাচা, তাহ'লে তোমার ঐ পরম বীর চক্করকেও আমি হারিয়ে দেব! এ তুমি দেখে নিও!"

তরতর ক'রে নেমে গেল কাদের। অনেক ডাকলেন চাচা, "শুনে যা, খেয়ে যা, চাচির সঙ্গে দেখা ক'রে যা!"

কিন্তু কাদের আর দাঁড়ালো না। সময় কৈ? আজ তেসরা, ৯' তারিখের আর

ছ'দিন বাকি। তাছাড়া, ঐ জঙ্গলের কথা ওর মনে রয়েছে। কালই দল ক'রে লোক পাঠাতে হবে ওদব জায়গায় নজর রাখবার জন্যে! ঠিকই বলেছে চাচা শালাবাবুর দল সব পারে! কথাটা কাল কাসেম সাহেবকে বলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ওসমান দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে ওপারের পাহাড়টায় উঠতে আরম্ভ করল। সব ঠিকাদারদের ও ঠিক মতন চেনে না, তবে সবচেয়ে খতরনাক্ হল খালেদ মিঞা। গত হামলার ও হামাদ'রদের সঙ্গে সামিল ছিল চুপিচুপি এ কথা সবাই জানে। পাকিস্তানি ফৌজ যখন মিটল ও তখন বেমালুম রেখে সরে পড়ল। ১৮৬১ সালে শালাবাবু যখন হাসপাতাল কনট্রাক্টরদের কর্তা হলেন আর বক্সি ব্রাদার্স হলেন দু'কোটি টাকার মালিক তখন দেখা গেল খালেদ মিঞা আবার শহরে এসে ঘোরাঘুরি আরম্ভ ক'রেছে শালাবাবুর সঙ্গে! মুখ্যমন্ত্রীর নতুন আসনে ব'সে বক্সি যখন ব্যবসায় মাথা গলালেন ভায়েদের বেনামিতে, তখন সাহেক সাহেব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন চোরাই কারবারের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রতিবাদ জানালেও প্রত্যক্ষভাবে ঝগড়া করলেন না। মুখোমুখি ঝগড়া হল যেদিন বক্সি সাহেব ওপর-পড়া হ'য়ে পীর-পঞ্জল এলাকার বড় জঙ্গলটা খালেদ মিঞাকে সঁপে দিলেন আর সঙ্গে দিলেন চারখানার জায়গায় ষোলটা নতুন পারমিট! বক্সি সাহেব কতা চাইলেন কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হ'য়েই গেছে!

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই কাদের পথ হাঁটছিল, এ পাশ ও পাশ নজর ছিল না। কিন্তু কবরস্থানকে ভয় পায়না এমন লোক কাশ্মীরে নেই। দিনের বেলা হ'লে তবু এক নজর দেখেই এগিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু রাতে আর সেটা হওয়ার উপায় নেই। ভয় যতই বুজরুক ভূত আছে কিনা ভালো করে দেখতে হয়। কাদের দেখল দু'নজর—মনে হল কেউ যেন ব'সে আছে চুপটি ক'রে! কাদের আর থামল না, হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেল। পরের মোড়ে গিয়ে মনে হল দেখা উচিত ছিল। সত্যিই ভূত না ওরই দেখার ভুল? আবার ফিরে গেল কাদের, প্রাণটা প্রায় হাতে ক'রেই। গিয়ে দেখল কেউ নেই। যাক্ তাহ'লে ভুলই দেখেছিল ভূত নয়। ফিরে আবার পা বাড়াবে তখন লক্ষ্য করল, কে যেন হেঁটে যাচ্ছে উটরার দিকে। সন্দেহ হল। যেই হক পথ দিয়ে নিশ্চয় যায়নি, গেলে দেখা হতই। আর এতো রাত্রে এতজন পথ হাঁটবে এমন নির্ভীক কাশ্মীরি দু'চারটেই আছে। লোকটা তাহ'লে কে? হাঁক মেরে দেখবে কি না ভাবছে, লোকটা চট ক'রে নেমে গেল রাস্তা থেকে নিচে। ফিরতেই হল কাদেরকে, লোকটা কে জানতেই হবে। ও যখন পাহাড়ের এ মাথায় এলো তখন লোকটা দুধ-গঙ্গার ওপর দিয়ে হন্ হন্ ক'রে হাঁটছে। ওপরে উঠলে বোঝা যেত ও গ্রামের লোক। ওপরে সে উঠল না। কাদেরের সন্দেহ আরও গভীর হল, কে লোকটা? কোথায় যাচ্ছে। কাদের পাহাড়ের এ পার দিয়ে চলল চুপি চুপি লোকটার ওপর চোখ রেখে!

উটরা গ্রাম পেরিয়ে নদীটা যেখানে বাঁক ঘুরেছে সেইখানকার পাক-মতি বেয়ে লোকটা উঠতে আরম্ভ করল ওপরে। এ পাশের পাহাড়ের ওপর থেকে কাদের দেখল, ওপারের মসজিদে আলো জ্বলছে। হাতঘড়ি দেখল। রাত তখন নটা। এ আর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কাশ্মীরি গ্রামে রাত নটা মানে রাত্তিরের চেয়ে নিঝুম। দেখতেই হবে খোঁজ নিয়ে। কাদের নেমে গেল। সন্তর্পণে, বেড়াল চালে, নিঃশব্দে। ধরা না দিয়ে যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। যা দেখল, ওর চক্ষু চড়ক গাছ জনা পঞ্চাশ লোক জমা হ'য়েছে। কাঁধে তাদের রাইফেল, প্রায় সকলেরই। আর এখানে ওখানে

বন্দুকগুলো মাথার মাথায় ঠেকা দিয়ে রাখা আছে চুপ ক'রে। সর্বনাশ। কাদের ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। একেবারে এয়ারপোর্টের বাটিতে! পথ দিয়ে পনেরো মাইল বলেও পাহাড়ের গা দিয়ে হাঁটলে, এখন থেকে এয়ারপোর্ট ছ সাত মাইলের বেশী নয়।…

রাত্তিরে দু'দলে যে সংঘর্ষ আরম্ভ হল, সেটা চলেছিল সাতদিন আর হানাদারদের গুলিতে যে মানুষটা প্রথম মরেছিল তার নাম গুলাম মহম্মদ কাদের। বয়স তিরিশ। বিধবা মা আছে, বিধবা বৌ আছে আর আছে দু'বছরের ছেলে।

সাহনী বললেন: "শালা হারামজাদা শেষ পর্যন্ত আমায় হারিয়ে গেল। আমি বুলেট মাথায় নিয়েছিলাম ও নিল বুকে। আমি বাঁচিয়েছিলাম গ্রাম, ও বাঁচিয়ে গেল কাশ্মীর!"

॥ এগারো ॥

তেসরা বিকেল

গাড়ী এলো না, ফকায়া নিজে এলো, প্রায় সাড়ে পাঁচটা। ঠিক তিনটে থেকে অধৈর্য প্রতীক্ষার পর তখন সবে আমি অশেষ নিরাপায় ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে, একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে সোফার ওপর কাগজ পড়ছিলাম। আমার পোষাক দেখে ও হেসেই অস্থির। হওয়ারই কথা, কারণ ওর লাল কাশ্মীরি সিল্কের জোব্বাটায় ওকে মনে হচ্ছিল দস্তু কোটা পদ্ম। আমি কথা হারিয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গিয়েছিলাম। সামনের চেয়ারে না ব'সে ও কার্পেটে বসল, বললে:

"দেরি হল; দোষ কিন্তু আমার নয়, ধরজির!"

"অর্থাৎ?"

"তিনটের সময় দেওয়ার কথা ছিল, পাঁচবার তাগাদা দিয়ে তবে সোওয়া পাঁচটায় পাওয়া গেল।" পেছনে ছড়িয়ে দেওয়া হাতের ওপর দেহের ভর দিয়ে ফকায়া হেসে বসল। ওর অজস্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমায় বাস্তবাবে সচেতন ক'রে দিয়ে। আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, ও অতিথি-সৌজন্যে বলল:

"মতামতটা শোনা যাক!"

"এখানে নয়," আমি বললাম উঠতে উঠতে, "এতোখানি সৌন্দর্য একটা ঘরে ধরছেনা।" তারপর মেহগুনির টাইপ করা জীবনীটা ওর দিকে এগিয়ে বললাম, "এটা ততক্ষণ উল্টে দেখো, আমি পোষাকটা বদলে আসি।" দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, "হঠাৎ যদি দেখো কোকলা দাঁতের একটা বুড়ো ঘরে এসেছে…"

বাধা দিয়েও বললে:

"সর্বনাশ, সে আবার কে?"

"ভাইয়াজী, বলরাজের তন্ত্রীপতি।"

"চিনব কি ক'রে?"

"খুব সোজা।" আমি বললাম, "মাথা ভরা টাক্ আর গালে ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বড় কালা।"

"চেনা গেল। তারপর?"

"বেয়াদব বোবা মনে নেও, নাহলে কথার চোটায় পাগল বানিয়ে ছাড়বেন!"

সোফাকে বদলে এসে দেখলাম, মেহবুবের জীবনীটা সোফার ওপর খোলা আছে ও জানলার ধারে, শুদ্ধ। পড়ন্ত বিকেলের প্রায়ান্ধ আলোকে ওকে মনে হল অত্যন্ত অসহায়; পুড়ে যাওয়া মোমবাতির নিচে প'ড়ে থাকা মোমের মতন হতাশার স্তূপ। ডাকতে গিয়ে আর ডাকা হল না, কিছু বলতে গিয়ে কথা হারালাম। হাতটা ওর তোলা ছিল জানলার ওপর, মাথাটা হেলানো ছিল হাতের ওপর, কোমরের কাছটুকু ভাঙা। আমার সারা শরীর বেয়ে নব জাগরণের সাড়া শুনলাম, অজানা ভয়ের গভীর আশঙ্কা, যেমন শুনেছিলাম হেচেল্লিশে দিল্লীর রায়টে—যাইকোলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সেদিন ছিল মরণের ভয়। আজ নিজেকে হারাবার ভয়। একলা ঘরের এই সচেতন শুব্ধতায় দৈহিক সত্তা উর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার ক'রে বলল, এতো বড় বাড়ীর এতোখানি নির্জনতায় অতোখানি সৌন্দর্য্য আমার কিছুতেই সইবে না। নিবিড় আকাঙ্খা আর গভীর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে অস্পষ্ট বললাম:

"আমি কিন্তু তৈরি।"

রুকায়া এমন চমকে গেল, যেন আমি ওর অসীম নিরবতাকে অসভ্য রকম আঘাত ক'রেছি। এবার ওর চেয়ে থাকার পালা; আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। ওর অনিমেষ দৃষ্টিতে অসহায়ের আর্তনাদ। একটা হালকা উত্তপ্ত শিহরণ আমার পা থেকে আরম্ভ হ'য়ে শরীরের মাঝ পথে এসে করুণা ভিক্ষা করল।

ও জানলার পর্দাটা ধরে বলল:

"চল।"

"কোথায়?" মেহবুবের জীবনীটা মুড়ে রাখতে রাখতে ও বলল:

"ফুলের প্রাচুর্য্য যদি চাও, সালিমার আছে, পাইনের বন যদি চাও হারওয়ান আছে, পাহাড় যদি চাও শঙ্করাচার্য্য আছে আর"···একটু থেমে, খুব আস্তে বলল, "আপত্তি যদি না থাকে তো আমার বাড়ী আছে।"

"এমন জায়গা নেই কিছু যেখানে কাছে লোক থাকবে অথচ আমরা একলা?"

রুকায়া হাসল, বলল:

"আমাকে এতো ভয়?"

মেহবুবের জীবনীটা ওর হাত থেকে নিতে নিতে বললাম:

"তোমাকে নয় নিজেকে। চল।"

জীবনীটা ছাড়ল না। কিশোরী ভঙ্গিমায় মাথা নেড়ে বলল:

"যদি না যাই?"

"তাহ'লে, আর হয়ত যাওয়াই হবে না।"

"কি হবে?"

"বিপদ।"

ও জীবনীর কাইলটা টেনে ধ'রেছিল। এবার টানটা হালকা করে কাছাকাছি স'রে এসে বলল : "সত্যি ?"

নিজেকে কিছু সামলে নিয়ে বললাম :

"আর ভাইরাজী যদি এসে পড়েন তাহলে ওঁর গল্পের গুঁতোয় প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ !"

"সর্বনাশ !" জীবনীটা ছেড়ে দিয়ে বললে, "তাহ'লে পালানো যাক !"

"চল।" ও পাশে হাঁটছিল, আমি পেছিয়ে বললাম : "তুমি আমার সামনে সামনে চল।"

"কেন ?"

"তোমার সৌন্দর্য্য সত্যিই আর সইছে না।"

শ্রীনগরকে বিলাম ঘিরে আছে কিশোরী-কোমরে চন্দ্রহারের মতন। নদীর দুধারে বাঁধ আর উজান বেয়ে চলেছে আমাদের বাঁধনহারা শিকারা। ও অনেক খুঁজে এটা ঠিক করল নামটা ভালো ব'লে 'ইভনিং মেলডি' আমি বললাম, শাহানা। আনত সন্ধ্যা, অকূল নদীর জল আর অচিন্ত্য আবেশে, ঐ সুরটাই মনের মধ্যে গুন গুন করছিল তার কারণও আছে। বহুকাল আগে সাহানার সঙ্গে এমনি এক সন্ধ্যায় আর এমনি এক শিকারায় এমনি ভাবেই ভেসে গিয়েছিলাম ভরা যৌবনের জোয়ারে। নবীন বয়সের মূল্যবোধে তখন তার দাম দিই নি। আজ মনটা কিছু বেদনায় ম্লান হল —ঐ সুরের মতন। রুকায়া পরম আরামে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল পেছনের বালিশে মাথা দিয়ে। আমি পাশে ব'সে দেখলাম ষ্টেট ব্যাঙ্ক, লোই অফিস, শ্রীনগর ক্লাব সব একে একে পেরিয়ে যাচ্ছি ; কোথায় তা জানিনা, কেন, তাও জানিনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা জলে ফেললাম। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সেটা নিভে গেল। আকাশের বহু দূর বরফালো, একটা দুটো তারা উঠল, পারে কিছু আলোও জ্বলল। যেতে যেতে দেখলাম বড় বড় হাউসবোটে আলো জ্বলছে, ট্রানসিস্টার বাজছে, দরের দোতলাও খোলা হয়েছে। আর দেখলাম ছোট ছোট ডুঙ্গায় জাপানী পুতুলের মতন কাশ্মীরি শিশু অবাক হ'য়ে আমাদের দেখছে।

রুকায়া পাশ ফিরে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল :

"কিছু কথা বল।"

"কি ?"

"যা ইচ্ছে।"

"যেমন ?"

"যেমন, তুমি কে, তুমি কি, তুমি কেন ?"

"শক্ত প্রশ্ন, সহজে বলা মুস্কিল। এক জীবনের অভিজ্ঞতা এক কথায় বলি কেমন ক'রে ?" আসলে ও প্রসঙ্গ আমি এড়িয়ে যেতেই চাইছিলাম। তার অনেক কারণ আছে। জগৎ জোড়া রাজনৈতিক জুয়াখেলায় মানুষ মরছে। আমি মানুষের অংশ। সাংসারিক গতির স্বার্থ সংঘাতে, সন্তান থেকেও হারিয়েছি। তারা আমার অংশ। তাই নিজের দিকে তাকালেই জীবনের বিরুদ্ধে আমার জমাট অভিমান বিভীষিকার মতন আমায় পেয়ে বসে।

রুকায়া ছোট্ট করে জবাব দিল :

"উহু।"

হেসেই তখন বলতে আরম্ভ করি,

"আমি সংসারের উদ্বাস্তু। কৃপার মুষ্টি ভিক্ষা কারো কাছে চাইব না বলে উঁচু গলায় আদর্শের আকিং খাই আর চাপা গলায় আর্তনাদ করি। জীবন কাটাই মিথ্যা অনুহাতে। এখানে এসেছি তারই কিছু অন্বেষণে। পাবোনা কিছুই তাও জানি।"

আমার দিকে না তাকিয়েই ও বলে :

"তোমার কাছে সবই তাহ'লে মিথ্যে ?"

"সব। এই নদী, নৌকো, সন্ধ্যা। পুরো জীবনটাই। আরও যদি তোমায় সত্যি কথা শোনার সাহস থাকে—তাহ'লে শোন তুমিও। তোমার সৌন্দর্য, তোমার সান্নিধ্য সব।"

ও ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় অনিমিষ দেখে বলল :

"তাহ'লে এসে কেন ?" ও মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিল।

"মনটাকে যখন বাঁচার অনুহাত দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি তখন দৈনন্দিন জীবন বলে মিথ্যাটাই বা মন্দ কি ? তাই এসেছি, কথা বলছি, ভালোও লাগছে তোমাকে।"

ও না তাকিয়েই বলে :

"মিথ্যা তো বটেই।"

"সত্যিই যা বলি কোন লাভ্সে ? আজ এই মুহূর্তে আমরা অনেকখানি কাছাকাছি আছি। ভালো লাগছে। কাল যখন কাজ ফুরোবে, তখন দুপথে চলে যাবো। ভুলেও যাবো। আসলে, ভবিষ্যতের ভয়ে আমরা অসহায় ব'লেই এই বর্তমানটুকুর প্রতি আমাদের এতো আকর্ষণ।" ওর কাছে স'রে ওর কাঁধের ওপর মুখটা রেখে বলি :

"তাই নয় কি ?"

রুকায়ার হাতখানা ছিল জলের ওপর প্রকাণ্ড পূর্ণিমা চাঁদের প্রতিফলের ঠিক মাঝখানে। অন্ধ স্পর্শের শিহরণে ওর হাতটা কেঁপে উঠল। ও বলল :

"তোমার মতন ক'রে একটা জিনিষ আমিও বুঝতে চাই।"

"কি ?"

"এই জীবন—এই তার আরম্ভ। অন্তহীন সৌন্দর্যকে পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিক সাধনা দিয়ে আমরা জীবন শুরু করি, মনে করি এটা অসীম, নিঃশেষ, অথচ পরিপূর্ণ। হঠাৎ কার ধাক্কাধেয়ালের ধাক্কায় সব ভেঙে তছনছ হ'য়ে যায়। আমার সে ক্ষতিতে কারো কিছু যায় আসে না। ওরা যে অচেতন তা নয়, ওরা আসলে বোঝেই না যে আমি ওদের কারণে অকারণ কি হারালাম। বোঝা উচিৎ।" থেমে আবার বলে : "আসলে, আমি নিজেই বুঝি না, সেটা কি, সেটা কেন ! তুমি বলতে পারো ?"

ওর মাথার চুল থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছিল। হাতের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললাম :

"তোমার স্বামীর কথা বলছ, না ?"

রুকায়া মাথা নাড়ল, "শুধু স্বামী নয়।" রুকায়া বললে, "শেষ আবদুল্লাহও !"

"সে কি ! বলত, শুনি।"

"শেখ আবদুল্লাহ যেদিন স্বাধীনতার পতাকা তুললেন, আমি সেইদিন বোর্খা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম কামালের ডাক শুনে!"

"আর পরদিনই গেলে বারামুলায়, সেবার কাজে!" অবাক হ'য়ে তাকাল আমার দিকে। গালে ঠোঁটের স্পর্শ লাগল।

মুখটা নামিয়ে ও বললে:

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"আবদুল্লাহ ওয়ানি আমায় বলেছে।"

"ও!"

চুপ ক'রে গেল ফকারা। তাড়া দিলাম।

"তারপর?"

"আমি ওকে বাঁচিয়েছিলাম ওর স্ত্রী আর মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে দিয়ে! সেই কথাই ও তোমায় বলেছে কিন্তু ওর জন্যেই যে আমি আমার নিজের মৃতদেহ কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা ও জানেনা।"

"কি ক'রে?"

থেমে থেমে আর থেকে থেকে ফকারা বলল:

"ওকে পুলাওয়ামা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমি আর কামাল ফিরছিলাম হেমন্তের প্রথম পূর্ণিমাতে। পামপোরের কাছে এসে দেখলাম পথের দুধারে জাফরাণ ফুলের বাগে তোমরা বল বন্দন কাদন। আমার পঞ্চদশী মনের পরিকীর্ণ আনন্দে হাততালি দিয়ে কামালকে বললাম জীপটা থামাতে। জ্যোৎস্না রাত্রে জাফরাণ ক্ষেতের গানই শুনেছিলাম, দেখিনি কখন। আমি আত্মহারা হ'য়ে দেখছিলাম ঐ ঐশ্বরীক সৌন্দর্য্য, কামাল জীপ থেকে নেমে বললে, এসো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন নেমে গেলাম। তিন দিন তিন রাত পৈশাচিক দুষ্কৃতির মধ্যে আমি ওকে দেখেছিলাম পৌরুষময় পুরুষের মতন। ভক্তি আর শ্রদ্ধায় মন আমার পরিপূর্ণ ছিল।

"ও আমার হাত ধ'রে নিয়ে গেল প্রান্তরেখার পানে, পাহাড়টা যেখানে প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন ছিল। ঘন নীল আকাশের তলায়, নিশীত নিলীমায়, আধো-নীল জাফরাণ ফুলগুলো পূর্ণযৌবনের প্লাবনে ভাসছিল। ও আমার গাল দুটো ধ'রে মুখখানা তুলে ধরল, শুধু বলল, 'ফকারা।' চোখ দুটো আমার জলে ভেসে গেল। আমি কিছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম ওর শক্ত মুঠোয় আমার জীবনটা ও ধ'রে রাখুক, চাঁদের মায়া যেমন ঐ ফুলগুলোকে ধ'রেছিল। অব্যক্ত আনন্দে আমি অসহায়ের মতন ওর বুকে মাথা রাখলাম।"

গভীর নিশ্বাসের ঘন অবসাদ উত্তীর্ণ হ'য়ে ফকারা বললে:

"আমার আধ-কোটা জীবনের সেইটাই ছিল প্রথম আর শেষ পূর্ণিমা।"

"তারপর?"

"শেখ আবদুল্লাহ মেয়টাকে বানালেন নয়া কাশ্মীর আর আমরা দুজন ঘর বাঁধলাম নদীম অঞ্চলে। কামাল হল ডালগেট মিলিশিয়ার মস্তবড় কর্তা। আমার কোলে এল সন্তান। তারপরই আরম্ভ হল পরিবর্তনের ঝড়। ইউ এন ও-তে গেলেন শেখ সাহেব, ফেলে এলেন তাঁর পেয়ওয়ানি

আর নিয়ে এলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। কামাল বদলে গেল, একেবারে অন্য মানুষ। যে মানুষের মনটা ছিল ফুলের মতন কোমল, সে চ'ড়ে উঠল পাথরের মতন কঠিন। কিছু জানতে চাইলেই বলত, নিমকহারাম! খুদা পর্যন্ত নিমকহারাম!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কার কথা বলছ?" কামাল জবাব দিল না, উঠে চ'লে গেল। তখন বুঝলাম, লোকটা আর কেউ নয়, শেখ আবদুল্লাহ।

"অনেক রাত্রে যখন ও মিটিং ক'রে বাড়ী ফিরল, মনের বেদনায় চুর হ'য়ে তখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। কামাল বললে, শালা নিমকহারাম, বেইমান। ওরই কাছে শুনলাম, রাজার আমলে একবার না কি মন্ত্রীর হুকুমে চালের মন বেঁধেছিল পাঁচ টাকা থেকে ছটাকা। সেই রাগে এক বুড়ি মাঝপথে রাজার গাড়ী থামিয়ে নিজের জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল রাজাকে। তিনি সেইদিনই নাকি মন কমিয়ে করেছিলেন চার টাকা মণ। অথচ চালের দর যেদিন বারো আনা থেকে হল এক টাকা সের আর এক অসহায় বুড়ি গেল শেখ সাহেবের কাছে দরা চাইতে, উনি তাকে চড় মেরে চ'লে গেলেন মেডোস্ হোটেলে ডিনার খেতে বৃটিশ রাজদূতের সঙ্গে। পরদিন কামাল বললে, এর চেয়ে গ্রামে গিয়ে পাকিস্তানি চর ধরা অনেক ভালো। ও চ'লে গেল বন্দুক কাঁধে আর আমি ব'সে রইলাম বাচ্চা কোলে।"

"তারপরই এলেন আমেরিকা থেকে আইসাই স্টিভেনসন্ আর আরম্ভ হল শেখ সাহেবের নতুন প্ল্যান। সাহেব তাই যখন সাবধান করতে গেলেন ভারতীয় নেতাদের। ওরা ওকে ভাবলে রাশিয়ার চর। পণ্ডিতজী ব'লে দিলেন আমেরিকা আমাদের মিত্র; ভয়ের কিছু নেই। অথচ সবাই জানে স্টিভেনসন্ কি ব'লেছিলেন।"

"কি?"

"ব'লেছিলেন, তোমরা স্বাধীন হও, আমরা স্বীকার ক'রে নেব। বৃটেনও করবে। সুইটজারল্যাণ্ডের মতন তোমরা হবে নিরপেক্ষ। আমরা দয়া দেব তোমাদের। তোমরা শুধু দেখে এখানে যেস্। হিন্দুস্থান? মানতে বাধ্য হবে তোমাদের স্বাধীনতা। পাকিস্তান? ভয় নেই, আমরা সামলাবো! কি ভাবে সেইটা পাকিস্তানের কাছ থেকে জানতে গিয়েই উনি ধরা পড়লেন স্বাধীনতা ঘোষণার আগে শুলমার্গে শেষ মিটিং করার সময়।'

"বক্সি ছিলেন ওঁর ডান হাত। শেখ সাহেবকে যখন শুলমার্গে বন্দী করা হল। বক্সি তখন উপমন্ত্রী ঘর সাহেবের বাড়ীতে বন্দী। সাহেবভাইকে বলা হল, উনি রাজি হ'লেন না। উনি বোঝালেন দুজনকেই যদি সরানো হয় তাহ'লে পৃথিবী বলবে এটা ভারতের ষড়যন্ত্র। তার চেয়ে ডান হাতকে যদি সরিতে বসানো যায় তাহ'লে সবাই বুঝবে শেখেরই ষড়যন্ত্র। বক্সি সাহেব রাজি হলেন। আরম্ভ হল যেন নতুন অধ্যায় আর আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলাম, কাশ্মীরে প্রথম হ'য়ে।"

কথার মাঝখানে কখন যে আমরা সোজা হ'য়ে ব'সেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে ওর হাতখানা আমার হাতে ধরাই ছিল। ইতিমধ্যে আমরা উজান বাইতে বাইতে শ্রীনগরের সীমানা ছাড়িয়ে এসে পড়েছি সিভ কারদের সামনে, নদীটা যেখানে মোড় ঘুরেছে আর বন্যার খাল শুরু হয়েছে। দুধারে আর শান বাঁধানো বাঁধ নেই। উঁচু মাটির ঢিপি। চাষখানা বেশ বড় হ'য়ে

মাথা আকাশে ঝুলছে আর ভরা জ্যোৎস্না নিকারার পাশ দিয়ে এসে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। হিসেব ক'রে দেখলাম। নৌকাটা ডান দিকে বাঁধলে ওটা ওর পা থেকে মুখে উঠে আসবে। লোভ হল। জিজ্ঞেস করলাম :

"কখন ফিরতে চাও ?"

"যখন তুমি চাইবে।"

"যদি না চাই ?"

ও হাসল, বললে "মিথ্যার প্রতি এতো মোহ কেন ?"

আমিও হেসেই বলি, "দৈনন্দিন জীবনে একটু আনন্দের তাগিদ !"

নৌকাটা ধারে বাঁধা হল। মুখ বাড়িয়ে দেখি ঠিক ওপরেই বনরাজদের মস্ত বাগান। ও ঘড়িটা কাৎ ক'রে মুখ বাড়াতেই ভরা জ্যোৎস্নার নীল আলো ওর কাঁধে, কালো ঘন বাদামি চুল আর লাল ঠোঁটের মাঝখানে ঠিকরে পড়ল। লোভ আরও বেশী হল। বললাম :

"সুন্দর বাগান !"

"কি হয় ?"

"ফলের গাছ অনেক আছে।" থেমে বলি, "ফুলের কথা জানিনা !"

ও দুষ্টুমি ভরা হেসে বলল, "চল, দেখে আসি।"

খানিকটা বালুর চর তারপরই একটু চড়াই। ওর নরম হাতটা আমি শক্ত মুঠোয় ধ'রে উঠে গেলাম ওপরে। জনহীন প্রান্তরে এতোখানি জীবনের কোলাহল কখন আগে অনুভব করিনি। দু' বিঘে জমির ওপর ছড়ানো বাগান। আপেল আর আলুচা গাছের সারির মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড লম্বা পপলারের সারি। তাদের সাদা সাদা ডালগুলো যেন জ্যোৎস্না ভরা আকাশটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা হাঁটছি, হাত ধ'রে, পাশাপাশি।

রুকায়া ঠাট্টা ক'রে বললে :

"সামনে সামনে হাঁটি ?"

আমি একটানে ওকে অনেকখানি কাছে এনে ওর হাতটা ঠোঁটে রেখে বলি :

"যদি পারো !"

ও পারল না। আরও কাছে স'রে এলো। আমি আরও একটু কাছে টেনে এনে কোমরটা জড়িয়ে ধরলাম। আমাদের পায়ের তলায় ঘন সবুজ ঘাস আর ওপরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে আলো সে মাঠে এসে পড়ছে তার মায়ামিছিল কোন শিল্পীরই জানা নেই। চারিধারে এমন নিবিড় নিস্তব্ধতা যে আমাদের পায়ের শব্দও যেন সসম্ভ্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণের নিরঞ্জনা পৃথিবীর রংটাই শুধু নিংড়ে নেয়নি। শব্দও সব খানিয়ে দিয়েছে। আমরা যেন পৃথিবীর ছাড়িয়ে গেছি !

বুড়ো চৌকিদারের ছোট্ট কাঠের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাবার আমলের বুড়ো ব'লে ওর ওপর কোন বাধ্যবাধকতার বেড়াজাল নেই। ও যখন ইচ্ছে থাকে, যেখানে ইচ্ছে যায়। এমন কি গাছের ফলও ইচ্ছে হলেই ফলায়। দেখা গেল ওর ঘরে তালা ঝুলছে। আটটার সময় ও ঘরে নেই ? রুকায়া বলল :

"অবাক কাণ্ড !"

বুড়োর খাটটা গাছের তলায় টাঙ করানো ছিল। ও সেটা পেতে বসতে বসতে বললে :

"সহরের বাইরে সাতটার পর যে জেগে থাকে সে হয় রোগী না হয় চোর!"

ওর পাশে বসতে বসতে আমি বললাম :

"তাহ'লে আমরা?"

"সহরের বাইরে আছি। সাতটার পর আছি আমার জেগেও আছি।"

"তাই তো ভাবছি সারাক্ষণ। আমরা কি?"

আমি পা দুটো তুলে বসলাম ওর মতন, ও আমার হাঁটুর ওপর গালটা রেখে বলল :

"আর আমাদের নিয়ে কেনই বা এই সমারোহ?"

আমি আলতো ভাবে হাতটা রাখলাম ওর মাথার ওপর কপালটা ছুঁয়ে। ও আমার হাতটা টেনে নিল ঠোঁটের ওপর।

"ভেবে লাভ কি?" ও বললে।

"বুঝতে চাই। জানতে চাই। আমিও জীবনটাকে পেতে চাই আর সকলের মতন সহজ আনন্দে। উপভোগ করতে চাই অসীম উৎসাহে। কেন পারিনা?"

"তোমার স্বামীর ওপর ক্ষুব্ধ অভিমানে।"

"ভুল ভুল!"

ও বললে, আমার হাতটা দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে। আমার প্রতি কোন দুর্বলতা কখনই তার ছিল না। আজও নেই। সে আমায় পরিকীর্ণ পঙ্কশয্যাতে উজাড় ক'রে দিয়েছিল। ভালোবেসে নয়। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর অসহায় দুর্বলতায়। কাশ্মীরের চেয়ে কাউকে সে বেশী ভালোবাসে না। বন্দুকের চেয়ে বড় বন্ধু তার কেউ নেই।"

"তাহ'লে?"

"তাই তো জানিনা। কত লোক, কত ভাবে কত আবেদন জানিয়ে গেছে আমায় এখানে, বিলেতে, আমেরিকায়। মন আমার কখন সায় দেয়নি।"

"কেন?"

ও ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করল।

"তুমিই বল!"

জবাব দেওয়ার আগে আমি ওকে আমার দিকে ঘোরালাম। আমার পা থেকে ও কোলের ওপর গড়িয়ে এলো। পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো ওর চোখে পড়ল।

"বোধ হয় ··"

থেমে গেলাম।

"থামলে কেন?"

"বলাটা বোধ হয় উচিত হবে না।"

"আমি শুনব।"

"বোধ হয় প্রথম পাওয়ার আগে প্রাণে তোমার চাওয়ার স্পন্দন ছিল না। কিম্বা হয়ত তোমার মধ্যে এমন একটা গভীর সুপ্ততা আছে যা সব কিছুই মলিন ক'রে দেয়। নয়ত একটা

মিথ্যা থেকে আর একটা মোহে যেতে তোমার মন চায়না। আর নয় তুমি ফির। রাসমোহন কাকে বলে জানোনা।"

ওর গাল দুটো ধ'রে মাথাটা তুলে বলি :

"এবার বল কোনটা ?"

"তুমিই বল।"

"জানিনা।"

"তাহ'লে জেনে নাও !"

আমি জানতাম। আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা জানতাম যে এইটাই তার একমাত্র পরিণতি। ঘরে ওকে প্রথম দেখার সময়, তারও আগে, গত রাত্রে খাওয়ার ঘরে এবং তারও আগে উটবার বুল বাড়ীর সামনে ওর দৃষ্টিতে যে ইশারা ছিল, আমার চোখের সামনে ওর চোখ দুটো তুলে এনে দেখলাম তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। মেয়েদের মজিয়া দৃষ্টি নয়, মধুলোভের মনোলোভা চেয়ে থাকা ; কিছুটা জল ভরা, বেশীটা ভাপসা। মুখ চোখ ওর টানা টানা কঠিন তবু কমনীয় ; পরিষ্কার, পবিত্র, পরিপূর্ণ। ঠোঁট দুটো ভেতর দিকে অল্প চাপা, তাতে চোখ দুটো আরও কিছু বড়, আরও কিছু বোজা। সারা দেহ ছেয়ে আবেশ ছড়াল আমার, কণ্ঠ থেকে কোমর পর্যন্ত, দমটা যেন বন্ধ হ'য়ে এলো। বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে কিছুতেই পারলাম না যে "হাঁ, তবে তাই হবে, আমি নিজেই জেনে নেব···আজ, এখন, এই মুহূর্তে।

অস্পষ্ট নিজেকে বলতে শুনলাম।

"তাই ?"

ও আভাসে হয়ত বোঝালো;

"হাঁ।"

এইটাই হল তাহ'লে আমাদের জীবনের সমারোহ, প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ, নিয়তির বিধান। আমাদের দশা টানা ক্লেদাক্ত অতীতে আমরা যা কিছু পাইনি তার সব ক্ষোভ নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দেব পাওয়ার পরিপূর্ণতায়। এইটাই হবে রিক্ত ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে হবে আমাদের বিরলো বিদ্রোহ। হক ক্ষণিক, তবু কষাহীন আবেশে আর পরিনির্বাণীর আনন্দে আমরা সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে এই মুহূর্তের অসীম সত্যকে উপলব্ধি করব।

স্নেহের এমন তীব্র দাহন আগে কখন দেখিনি। অন্তরের এই অবিমিশ্রিত আকাশকুসুম আগে কখন কল্পনাও করিনি। মনের এই আকীর্ণ আবেগ, আগে কখন অনুভব করিনি। সান্নিধ্যের এতোখানি সম্পূর্ণতা আগে কখন উপলব্ধি করিনি। সব মিলিয়ে কি সৃষ্টি করলাম অধৈর্যতায় অন্তরঙ্গ হ'য়ে অসত্যকে পাওয়ার ঐকান্তিক সাধনা ? আস্তে আস্তে ধাগান হারালো, জোৎস্না হারালো, কাশ্মীর হারালো, আমরা হারালাম আর হঠাৎ এক সময় মনে হল জীবনটাই বোধ হয় হারিয়ে গেল।

একটু যখন শীত শীত ক'রে ঘুমটা ভেঙে গেল, চোখ খুলে দেখি চাদরটা প্রায় মাথার ওপর।

বাঁ হাতের ওপর মাথা দিয়ে আর মুখটা আমার বুকের ওপর গুঁজে ফকারা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের সারা দেহের ওপর ফাটা জ্যোৎস্নার মায়া জাল বেছানো। ওর ঠোঁটের পাশে একটা ছোট কাটার ওপর এক বিন্দু জমাট বাঁধা রক্ত আর ঘোলাটা বুকের কাছে অল্প ছেঁড়া।

"এবার ওঠো, অনেক রাত।"

ফকারা ছেলেমানুষের মতন মুখটা আরও একটু গুঁজে দিয়ে গুণ গুণ ক'রে বলল :

"শীত করছে।"

"বাড়ী যেতে হবে না?"

"না।"

"ঘুমোও তা'হলে।"

তখন ও চোখ মেলে চাইল। ঠোঁটের কোণে সতৃপ্ত মনের অল্প আভাস মেয়া হাসির ইশারা। রক্তবিন্দুটা তারই যেন বিজয় পতাকা। ভার-মুক্ত দেহ, তাই দৃষ্টিতে কোন ওজন নেই, চোখে থাকাটা ওর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চুলের একটা গুচ্ছ কানের এ পাশ দিয়ে গলার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে, ওর সালোকা পরিতৃপ্তির তলায় নিজের স্বাক্ষর লিখেছে। ও শুধু তাকিয়ে রইল। যেমন ইচ্ছে করার মতন, যা ইচ্ছে বলতেও পারি, তারি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে।

অনেক কথা মনে ভীড় ক'রে এলো। কিন্তু ভীড় ঠেলে একটাই কথা মুখে এলো :

"জেনেছি।"

"আমিও!"

"তাহ'লে তুমি আর আমার জানার সঙ্গে মিলিয়ে নি।"

"তুমি বল।"

"সারা জীবনের বাস্তিতে তুমি পেয়েছ এক মুহূর্তের সত্য।

"ঠিক উলটোটা।" ফকারা বললো, "জীবনটাই মিথ্যার মুহূর্ত। এটাই আমার সত্যের ইতিহাস।

ওর বাড়ী যখন আমরা পৌঁছোলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা। খাঁসাল বারান্দায় খাঁচায় বন্দী বাঘের মতন পায়চারি করছিল। ওর দিকে অবাক হ'য়ে তাকাল। ও আরও অবাক হ'য়ে অস্পষ্ট বললে :

"তুমি? কখন এলে?…আলাপ করিয়ে দি…"

বাধা দিয়ে কাসাল বললে :

"আমি জানি। কিন্তু আজ তো সময় নেই ভাইজান, কোন একদিন শুছিয়ে গল্প করব।"

ওকে বললো : "শিগ্‌গীর চল। ভয়ানক বিপদ।"

"কি হল?"

"পুরোটা জানিনা, তবে পাকিস্তান সেক্টরটাকে ঘিরে ফেলেছে চারিদিক থেকে। কি ভাবে আর কতটা এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খোঁজ খবর চলছে সারা রেশ জুড়ে।" আমায় বললো, "আসবেন একদিন, অনেক কথা আছে। বাড়ীতে পাবেন না আমায়। কোথায় পাবেন আমি নিজেই জানিনা। খুঁজে নিতে হবে। বেরোন কিন্তু!"

"নেব।"

খেতে দিয়েছিলাম। খাওয়া আর হল না। গাড়ী ছুটল, উর্দ্ধশ্বাসে। স্বাধীনতার সংগ্রামে আরও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে, কাশ্মীর ঘুমিয়ে রইল আমাদের পথের দুধারে।

॥ বারো ॥

তেসরা রাত্রি

গতকাল রাত্রে গেটের মাথায় পুলিশ ছিল, আজ সশস্ত্র সৈনিক। একজন নয় একদল। আগের বারেই শুনেছিলাম প্রায় প্রতিদিনই সাদেক সাহেবের জীবন হানির প্রচেষ্টা হয়, কখন ওঁর বাথরুমে টাইম বম্ রাখা হয়, কখন মোটরের তলায় মাইন। উনি কিছু তোয়াক্কাই কখন করেন না। আজ ওঁর গেটে পাহারার বহর দেখে বোঝা গেল, বিপদ বেশ বাড়।

কামাল সাহেবের সঙ্গে আছি বলে আমি ওদের সন্দেহের বাইরে তো বটেই, সেলামেরও যোগ্য। পাহারা ব'সেছে মিলিশিয়ার। মিলিটারি শ্রীনগরে নেই বলা যায় না, তবে যা আছে তা যৎসামান্য। বিপদ যতই আসুক আর যে ভাবেই আসুক, সরাসরি সেটা শ্রীনগরে আসতে পারেই না এটাই ছিল না কি সেনাদপ্তরের সদম্ভ উক্তি। সেটা যে কত ভুল তা বোঝা গেল দুদিনের মধ্যেই। পার্লিয়ামেন্টে এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছিল তখন মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন, সবই আমরা জানতাম, কারণ কিছু ছিল বলে কথা কিছুই বলিনি! এটা যে কত বড় মিথ্যার প্রহসন তা বলার সাহস আছে, তাও নেই। এ যেন ঠিক অলঙ্করে আমাদের চৌকিদার সর্দার কর্ণাইল সিংয়ের মতন। রেডিও ষ্টেশনের গেট পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল একবার। কর্ণাইল সিং তখন সেখানে উপস্থিত। ওকে প্রশ্ন করলাম। দেখলে যখন দাউ দাউ করে পুড়ছে তখন ডাকোনি কেন কাউকে? ও বললো, ডাকব, কি করে সাহেব? পাশের ষ্টুডিওতে যে প্রোগ্রাম হচ্ছিল! ওখানে তো কথা বলাই বারণ।

আমার আর রুকায়ার দৌড় বারান্দা পর্যন্ত। ঘরে চাপা কণ্ঠে জোর কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বেরিয়ে আসছে, ছুটকো ছাটকা দু কথা কানে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। শ্রীনগরের যত বড় বড় মাথা সব ঐ ঘরে ঘন ঘন নড়ছে। বাইরে থেকে ওদের কথার যেটুকু শোনা যায় তার বেশীর ভাগই ট্রাঙ্ক কলের চিৎকার—হ্যালো দিল্লী, হ্যালো বারামুলা, হ্যালো শ্রীনগর···হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। লোক আসছে অনবরত। সব বড় বড় কর্তা। কেউ হোম, কেউ মিলিশিয়া, কেউ কর্ণেল, কেউ কাসজওয়ালা। যে যাচ্ছে সে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর রুকায়া বারান্দার কাসজওয়ালাদের ভীড় ঠেলে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হ'য়ে এসে আমাদের একটি সন্ধ্যার যে একান্ত সান্নিধ্য, এই অজানা আশঙ্কার গভীর অন্ধকারে তার সবটুকুই হারালো, একদম নিঃশেষে। কথাও আমাদের কেড়ে নিয়েছে কাশ্মীর। হঠাৎ এক সময় রুকায়া বলল:

"নাঃ এই অনিশ্চয়তার অসহ্য যন্ত্রণা আর সইছেনা। তুমি দাঁড়াও। আমি আসছি।"

রুকায়া যখন যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো তখন সামনের ভীড় আপনা থেকেই দু আধখানা হ'য়ে

গেল। মনে মনে হাসলাম। সামনে যত বড় বিপদই থাকনা কেন, পেছনে যদি সুন্দরী কোন মেয়ে থাকে তাহলে পুরুষের সোলুপ দৃষ্টি তাকে ঘিরে থাকবেই। সেইজন্যেই বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান নেই, নইলে মানুষ মারার অত বড় যন্ত্র পৃথিবীতে আর কি আছে?

কলায় ফিরে এলো মফিক সাহেবকে নিয়ে। তাঁরই কাছ থেকে জানা গেল, যে কাশ্মীরের চারিদিক থেকে বিপদের চিৎকার আসছে। প্রায়তঃ বলা যায় যে, উনিশ শো সাতচল্লিশে পাকিস্তান যেভাবে হানাদার পাঠিয়েছিল এবারের ব্যবস্থা হুবহু না হ'লেও অনেকটা অনুরূপ। জানা গেছে যে, ক্যাপ্টেন কোহলির অধীনে যে পঁচিশজন সৈনিক কর্তার মহম্মদের সঙ্গে সকালে গেছে তুস ময়দানে তাদের একজনও ফেরেনি এখনও পর্যন্ত। তাদের ফেরা উচিত ছিল পাঁচটার আগে। তুস ময়দানের তিন মাইল এদিক পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগ ছিল রেডিওতে। বেলা একটায় সেই যে সংযোগ ছিন্ন হয়েছে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। ওখানকার বড় কর্তা সেই থেকে অনবরত চিৎকার করছেন লোক পাঠাও, লোক পাঠাও। কোহলির মতন বিচক্ষণ অফিসার যখন সময়মত ফেরেনি তখন কোন বড় রকমের বিপদ অবশ্যই আছে।

ওদিক থেকে সংবাদ এসেছে টিথওয়াল এলাকার। আর ওরেজে হানাদাররা উঠে এসেছিল একেবারে সৈন্য শিবিরে, সেখানে আন্দাজ পঞ্চাশ জনের যে প্রথম দল এসেছিল তাদের মধ্যে মারা গেছে আন্দাজ ত্রিশজন। বাকি লোকগুলো আবার নেমে গেছে নিচে। ওদের পুরোভাগে ছিল যে ছোট্ট ছেলেটি সে প্রথম গুলিতেই মারা গেছে আর গ্রামের লোক তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে বলে নিচে নেমে গিয়ে দেখেছে সেখানে দ্বিতীয় দল এসে হাজির হয়েছে প্রায় আরও পঞ্চাশ। গ্রামবাসীরা সৈন্য সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই ওদের সঙ্গে লড়ছে, ওপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে। হানাদার রাইফেল, স্টেন আর ব্রেন্ গান নিয়ে অনবরত চেষ্টা করছে ওপরে উঠে আসবার কিন্তু নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের গড়িয়ে ফেলা পাথরের ধাক্কায় বারে বারেই তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ওপারের পাহাড়ে উঠে গেছে বহু হানাদার আর সেখান থেকে অনবরত গুলিবর্ষণ করছে এ পাহাড়ে গ্রামবাসীদের ওপর আর সৈন্য শিবির তাক্ ক'রে। আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য তাদের সঙ্গে লড়ছে। আমাদের ঘাটির ডান দিক বাঁ দিক সামলাবার লোক নেই। গ্রামবাসীরা যদি তাদের ঐ পাথর গড়িয়ে ফেলা বন্ধ করিয়ে দ'রে যায় তাহ'লে ওরেজের পতন অবশ্যম্ভাবী! আর ওরেজ যদি যায় তাহ'লে ঐ এলাকাও চ'লে গেল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কজন মরেছে এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি আর আপাততঃ জানা সম্ভবও নয় কারণ, যারা মরছে তারাও ঐ পাথরের মতন গড়িয়ে পড়ছে নিচে আর দু একটা হানাদারকে সঙ্গে নিয়ে যে যাচ্ছে না তাও নয়। একমাত্র ভরসা হল ওখানকার গ্রাম মুড়ো জালালউদ্দিনের কথা। সে বলেছে ওরা শেষ পর্যন্ত লড়বে। যতক্ষণ কারুর তহশিলের একটা লোক বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা হানাদার ওপরে উঠবে না। তারপর কি হবে তা কেউ জানে না কারণ সেটা খোদাতালার মর্জি।

পুলিসসাহেব খবর দিয়েছেন বারামুলা থেকে। মহীউদ্দিন পাটোয়ারি এসে যা তথ্য জানিয়ে গেছে তাতে দুশু খারিয়ার ময়দানে লোক আছে কম ক'রে দেড় হাজার। উনি একশো জন লোকের একটা পার্টি নিয়ে নিজে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সামরোতা করতে কিন্তু তাতে ওঁর নিজের যতই বিপদ থাক, বিপদ বেশী বারামুলার। হাজিনীর অঞ্চল থেকে যারা এসেছে তারা সম্ভবতঃ সবাই

খুশ খারিয়ার ময়দানে জড় হ'য়েছে ; কিন্তু উরি ? সেদিক থেকে যদি কোন সমাবেশের সংবাদ আসে তাহ'লে কে সামলাবে ? ছোট সাহেব রাজি কিন্তু লোক কোথায়। তাছাড়া, উনি জানালেন, ওদিক থেকে যদি কোন আক্রমণ হয় তাহ'লে পথে পড়বে মোহারা পাওয়ার হাউস। সেটার যদি সামান্য ক্ষতিও হয় তাহ'লে সারা শ্রীনগর অন্ধকার! গতবার এইটাই তারা ক'রেছিল। এখন হুকুম? জানা গেল, তাঁকে হুকুম দেওয়া হ'য়েছে খুশ খারিয়ার পানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে। উরি অঞ্চল থেকে যদি কেউ আসে তখন দেখা যাবে!

সহজভাবে ওঁর যাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই এলো দীন মহম্মদ, সোজা শ্রীনগর, সরাসরি সাদেক সাহেবের বাড়ীতে।

গেটের লোক তাকে গলা ধাক্কা দিল। যেখানে ওপরওয়ালাদের অনবরত আনাগোনা সেখানে দীন মহম্মদের মতন দীন দরিদ্রের তো আসাটাই অন্যায়। সকাল থেকে সারা পথ দীন মহম্মদ ছুটতে ছুটতে এসেছে, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সোজা শ্রীনগর। গেটের কাছে এসে সে আর দাঁড়ালোনা, সাদেক সাহেবের নাম অতি কষ্টে অত্যন্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়ে গেল। সবাই বললে, ও পাগলা ভিক্ষে চায়। অমরনাথ বলল, মিলিশিয়ার মস্ত সাহেব ; তিনি ওকে ওখানে ঐভাবে পড়তে দেখে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডিস্গাষ্টিং !' সেই সময় সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হোম্ মিনিষ্টার দুর্গা দয়। দীন মহম্মদ তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললে :

"হুজুর কাশ্মীরকে বাঁচান !"

উনি হেসে ওকে সরিয়ে বললেন, "সেই জন্যেই তো যাচ্ছি !"

ঐ মুমূর্ষু মানুষটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বললো :

"একলা তো পারবেন না হুজুর, সেখানে তো কম ক'রে দু হাজার লোক আর দুশো লরী বোঝাই গোলাবারুদ !"

চমকে উঠলেন দুর্গা দয়। বললেন, "কোথায় ?"

"খুশ মার্গের ময়দানে !"

"কি ক'রে জানলি ?"

"আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি !"

"কখন ?"

"আজ সকালে সেইখান থেকেই আসছি ! আপনি কি সাদেক সাহেব ?"

"না।" বলে ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন দুর্গা দয় একেবারে খাস্ মহলে। ওরই কাছে জানা গেল, খুশ মার্গে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের কথা আর জানা গেল, হিন্দুস্থানি রক্ষাকর্তাদের আরও অদ্ভুত মনোবৃত্তির কথা।

অন্যান্য সব জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্য আর মার্কিনী মারণাস্ত্র এসেছে অজানা অন্ধকারে কিন্তু এই এলাকায় সব এসেছে সরাসরি লরীতে, সকলের চোখের সামনে দিয়ে টাকার সকলকে অন্ধ করে আর মুখ বন্ধ করে। ওই বলল, যে 'চেনারি' অঞ্চলের ঠিকাদার ওদের পুরো গ্রামের সব চাষীদের মাঠ ইজারা নিয়েছিল প্রত্যেককে দুশও টাকা দাদন দিয়ে, ধান পাকবার অনেক আগে। তারপর, মাঠে কাজ করতে গেলেই ওদের নাকি ঠিকাদারের লোক খেদিয়ে দিত, বলত, হুমাস এখন এসব মাঠ

আমাদের, যেমন ইচ্ছে চাষ করব, তোদের তাতে কি? জমির মায়া ছাড়তে না পেরে যারা জোর করত, প্রাণের মায়া ক'রে তাদের পালাতে হত, আমাদের সেপাই আর সৈন্যদের ঘুনকিতে। ধনে তো কেবল ওদের ধন নয়, সন্তানও। তাই, মাঠ ছেড়ে সব থাকতে পারবে কেন? যে দু চারজন প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে রাতবেরাতে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে যেত ক্ষেতগুলো, তারা দেখত, অনেক লোকের আসা যাওয়া, অনেক লরীর আনাগোনা আর সারারাত ধ'রে মোট নিয়ে মানুষদের পাহাড়ে ওঠা নামা।

গত অমাবস্যার অন্ধকারে ওর সঙ্গে কত্তা গিয়েছিল মাঝরাতে তার মাঠ দেখতে। এবার অনেক আশা নিয়ে আর অনেক খরচা ক'রে কত্তা সারের সঙ্গে চায়ের পাতা মিশিয়েছিল ফসল ভালো হবে ব'লে। তাই দেখতে গিয়েছিল আর থাকতে না পেরে। দূর থেকে ভালো ক'রে দেখা যাবে কেন? চুপি চুপি মাঠের ধারে গিয়ে দেখে, ইয়া আল্লাহ ফসল তো নয় মোটা মোটা, মস্ত পুই, ঠিক বকরি-ঈদের জন্য অনেক আদরে পোষণ করা বকরার মতন। অধীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই কথাই যখন ও দীন মহম্মদকে বলেছিল আর লোভ ক'রে লতা ধিকিয়ে দেওয়ার মতন শোকে হা হুতাশ করছিল তখন খানদশেক লরী সোজা ঢুকে গেল ওর ক্ষেতের মধ্যে। তাই দেখে কত্তা এমন বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল, যেন লরীগুলো ওর সারা খানদানকে চাপা দিয়েছে। ব্যস্ এতোদিন যে সব সেপাই কেবল শুঁতোর ভয় দেখতো তারা দমাদম গুলি ছুঁড়লো চারিদিকে। নেহাৎ অন্ধকার ছিল তাই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ওরা পালিয়ে এলো এক দৌড়ে একেবারে গ্রামে!

পরদিন রাত্রে কত্তা বলল, চ' দেখে আসি কত ক্ষতি হল আমাদের ক্ষেতগুলোর। দীন মহম্মদ বললে, ক্ষেপেছিস্, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যা হওয়ার তাতো হ'য়েই গেছে, এখন আল্লাহ আল্লাহ কর। রসুলিল্লাহর মর্জি হ'লে সামনের ফসল তোর আরও মোটা হবে বেটাকে ছাড়িয়ে তোর বিবির মতন! তা যদি হয়, কত্তা বললে, লাঙলটা বুকে চেপে প'ড়ে থাকব! তুই ঠিকই বলেছিস্ জমিন থাকলে আর জান থাকলে ফসলের ভাবনা কি!

বুঝে যাই বলুক, মন মানবে কেন? খবসুরৎ বিবি আর ভালো ফসল, শালা, খোওয়াবেও ছাড়েনা। মাঝরাতে কত্তা ঠিক এসে হাজির, বললে, খোদার কসম নিচে আর নামবোনা, পাহাড়ের ওপর থেকে দেখেই চ'লে আসব। দীন মহম্মদের বৌ তখন সবে দড়ি বিছিয়েছে। সে তো ক্ষেপেই আগুন অথচ কত্তাও ছাড়বার ছেলে নয়। শেষকালে অনেক সাধ্য সাধনার পর বৌর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া গেল, আর কখন না যাওয়ার কসম কবুল করে। ঘর থেকে বেরিয়েই দীন মহম্মদ বললে, দিলি শালা সব মাটি ক'রে! আজ পাঁচদিন বৌটা কাছে যেঁষতে দেয়নি, খোদার কসম্! কত্তা হেসে বলল, তা যা বলেছিস্! বিকেলে বৌটাকে যেই বললাম, চ' ভেড়াগুলো গুনে গেঁথে তুলে আনি খামারে, সে তো আমায় মারেই আর কি? বললে, ইয়া আল্লাহ, সকাল থেকে তিনবার তো হল ভেড়া গোনা, আবার? দরকার নেই বাপু দু গণ্ডা টাকায়, আর কখন জমিন ইজারা দিলে জেনানাও খান দশেক ইজারা নিস্। আমার একার কম্ম নয়!

দুজনে ওরা উঠে গেল পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখে পাক্কি পাওয়ার মানুষ কত্তা নয়; বললে, চল, নিচে যাই। ব্যস্ একবার, আর কোনদিন যাবোনা, আল্লাহর কসম্! বাধ্য হ'য়ে নিচে নামতে গিয়ে ওরা দেখলো মোট মাথায় অনেক লোক সার বেঁধে ওপরে উঠে আসছে আর সঙ্গে তাদের বন্দুক-

কাঁধে সেপাই। কে আসছে? কি আনছে? আর কোথায়ই বা যাচ্ছে! লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে ব'লে ওরা এক গুহায় ঢুকল পাহাড়ের গায়ে। ইয়া আল্লাহ! এ যে একেবারে গোলাবারুদের গুদাম। লোকগুলো ও পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওধারে চ'লে গেল। ওরা ঘুরে ঘুরে দেখল গুহার পর গুহা গুদাম হ'য়ে আছে গোলা বারুদ আর বন্দুকে। পাহাড় পেরিয়ে ওরাও এলো এপাশে। ধুধু ময়দান ভর্তি-খালি লোক আর লোক। কতাকে নজর রাখবার জন্য বসিয়ে রেখে সেই যে ছুটতে আরম্ভ করল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, পথে কোথাও আর পিশাব করতেও থামেনি!

এদিকে খবর এসেছে বড়গাম থেকে। খবর দিয়েছে এয়ারপোর্টের নাইট ওয়াচম্যান, নসীরউদ্দিন। ও বললে, ঘণ্টা খানেক হল ভাই সাব গুদাম কাদের এসেছিলেন পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে, কেন ও জানেনা। তার অল্পক্ষণ পরেই এয়ারপোর্টের ক্যাম্প থেকে সব সেপাই বেরিয়ে গেছে দল ক'রে বড়গামের দিকে আর মিনিট কয়েক হল গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছুটা দূর থেকে। কতদূর থেকে? নসীরউদ্দিন বললে, তা হবে কোশ দু'চার। আর কজন লোক আছে এয়ারপোর্টে এখন? ও বললে, তাহবে জনা দশেক। দুজন মিস্ত্রী, দুজন ওরা নাইটওয়াচম্যান আর ছ সাতজন সেপাই। তবে ভয় নেই, সকলের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার আছে—ওদের দুজনের হাতে লাঠি, মিস্ত্রিরা নিয়েছে হাতুড়ি আর সেপাইদের হাতে তিন শো তিন নম্বর রাইফেল তো আছেই! যে কজনই আসুক ওরা মুকাবলা করতে কসুর করবে না কিছুতেই।

বড়গাম থেকে সংবাদ এলো আরও মারাত্মক। উটরা গ্রামের মধ্যে ওরা জমিয়ে ব'সেছে কম ক'রে শ দুয়েক লোক। সামনের পাহাড়ে হিন্দুস্তানি ফৌজ জমা হয়েছে অনা বুড়ি। তিনজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে; গুদাম কাদের সবায় আগে। বাদিক পাহাড়ের তলা দিয়ে লোক আসছে আরও কম ক'রে হাজার খানেক। সারা গ্রামে গিস্ গিস্ করছে হানাদার। যেন মেলা বসেছে। লাইট মেশিন গান্ আর হাতে বোমার ফোয়ারা ছুটছে আর কিছুলোক দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে ও পারের পাহাড়ের তলায় পৌঁছে গেছে। হিন্দুস্তানি ফৌজ প্রাণপণ লড়ছে কিন্তু তিন শো তিন নম্বর রাইফেল দিয়ে সামলাবে কতক্ষণ? ওরা সামনের পাহাড়ের হানাদারদের সঙ্গে বেসামাল যুদ্ধছে আর পাহাড়ের ঠিক নিচে যেসব হানাদার জমা হয়েছে তাদের সঙ্গে ওপর থেকে লড়ছে গাঁয়ের লোক, বড় বড় পাথর গড়িয়ে।

আর ঘণ্টার মধ্যে আবার খবর এলো উটরা গ্রাম ওরা দখল ক'রে গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। ক্ষেতের ওপর ওদের তাঁবু পড়ছে, খাবারের জন্য লুঠতরাজ হচ্ছে আর যারা সাহায্য করছে প্রাণের ভয়ে তাদের ওপর টাকার বৃষ্টি পড়ছে! এদিকে, দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে যে সব লোকগুলো এ পাহাড়ের তলায় এসেছিল তারা গ্রামবাসীদের পাথর বর্ষণে ওপরে উঠতে না পেরে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। কিছু পাহাড় ঘুরে ও পাশে গেছে ওপর উঠবার জন্য আর বেশী গেছে দুধ-গঙ্গার ওপর দিয়ে এয়ারপোর্টের পানে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে। আরিগামে ওদের না আটকালে এয়ারপোর্ট সামলানো শক্ত হবে।

রাত একটা নাগাদ বড় ধরণের বিপদের সংবাদ এলো গুলমার্গ থেকে। এনেছে ফকীর মহম্মদেরই গ্রামের লোক, সম্পর্কে ওর চাচাতো ভাই। ফকীরকে সে সৈন্যসমেত ওপর যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল কি ব্যাপার। জানতে পেরে সে ছুটেছিল পাহাড়ে পাহাড়ে সবাইকে সতর্ক করার জন্যে।

বেলা চারটের সময় সে যখন ফিরে যাচ্ছিল নিজের মাঠে তখন হঠাৎ দেখল, নিচে থেকে উঠে আসছে একদল লোক আর সঙ্গে আসছে ফকীরের বৌ আর দুদিনের ছোট ছেলেটাকে। ব্যাপারটা দেখে তার যত হল ভাবনা তত হল ভয়। একবার ভাবল গিয়ে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার? কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। আড়াল থেকে ওদের ওপর দৃষ্টি রেখে ওপরে উঠে দেখল বর্ণার ঠিক নীচে জনা কুড়ি পশিম সেপাই নেমে পড়ে আছে আর ফকীরের বৌকে তারা নিয়ে যাচ্ছে মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে। পাঁচটা পর্যন্ত সে মাঠের ধারে ছিল। আরো থাকত যদি না পাহাড়তলির লোকগুলো দলে দলে এদিক ওদিকে ছিটকে পড়তে আরম্ভ করত। ওদের দলে দলে এদিক ওদিক যাওয়া দেখে বুঝল ওর দিকে আসলেও তাহ'লে আর দেরি নেই। সেই ভয়ে ও পালিয়ে সোজা এসেছে সংবাদ দিতে। ফকীরই না কি ওকে বলেছিল, কাশ্মীর আমাদের, বাঁচাতেই হবে, যেমন ক'রে হক।

আসবার সময়ও যখন বাবা মাধবির জিয়ারত পেরিয়ে খোবি ঘাটের দিকে আসছিল তখন ও নিজের চোখে দেখেছে কম ক'রে শ' দুয়েক লোক আর খচ্চরের পিঠে অনেক 'সামান' নিচে নামছে। ঐ পাহাড়ি পথে 'পাট্টান' খুব বেশী হ'লে তিন ঘণ্টার পথ। পাট্টান থেকে শ্রীনগর পিচ ঢালা পথে আঠারো মাইল। এইখানেই পাহাড়ের শেষ আর উপত্যকার শুরু। একবার যদি ওরা পাট্টান পৌঁছে যায় তাহ'লে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যাবে, আর ধরা সহজ হবে না। পাট্টান থেকে চার মাইল দূরে আছে 'মিত্রগুণ্ড'। ওটা রাজার আমলে ছিল শ্রীনগর আগলাবার সৈন্য ঘাঁটি। এখনও সেটা ঘাঁটি, তবে নামমাত্র। সোজা পথে যদি ওরা যায় তাহ'লে হয়ত আটকানো যাবে কিন্তু তা কি ওরা যাবে? এতক্ষণ থেকে বোঝা গেল টন্‌মার্গ দিয়েও ওরা ভেতর ঢুকেছে আর সোজা নেমে আসছে শ্রীনগরের দিকে।

জীবনের সব থামে শুধু সময় থামে না। দেখতে দেখতে রাত দুটো বাজল। লোকের আসা যাওয়া থামেনি। ঘন ঘন সৈন্য দপ্তরের বার্তাবহ লোক আসা থামেনি। টেলিফোন তো কান থেকে নামেইনি। সারা সন্ধ্যা আর সারা রাত পর্যন্ত ছোট ছোট যে সব খবর এসেছে সেগুলো মুখে মুখে সাজিয়ে দেখা গেল যে মাথার ওপর এতোবড় বিপদ কাশ্মীরের ইতিহাসে কখন আসেনি আর কাশ্মীরবাসীরা এমন একাগ্র মনে কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। বাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা, চেয়ার টেনে যে বসব তাও ভুলে গেছি। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল, ভেতর থেকে। সচকিত হয়ে ঘুরে দেখি সাহেবরা সব সদলবলে বেরিয়ে এসেন ঘর থেকে। সবার পেছনে কামাল সাহেব। উনি আমাদের দিকে চলে এলেন বারান্দার কোণে, ফকীরকে বললেন, ও যেন বাড়ী চলে যায় আর কাল সকালে সময়মত আসর সংগ্রামে নিজের দায়িত্বটা তাইজানের কাছ থেকে বুঝে নেয়। আভাসে যা বললেন তাতে বোঝা গেল, আসর সংগ্রামটা সহজ নয় এবং সহজে থামবার তো নয়ই। পাকিস্তানে এর প্রস্তুতি বহু দিনের আর পরিধিটি অনেকখানি। আরও বোঝা গেল বড় একটা কিছুর এটা ব্যাপ্ত পূর্বাভাষ।

কথা বলতে বলতে কামাল সাহেব আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। উনি ফকীরের সঙ্গে কথা বলছিলেন আর আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম কোন ভাষায় ওঁকে ব্যক্ত করা যায়। সুপুরুষ বললে সব বলা যায় না। সাধু পুরুষ বললে অনেকখানি বলা হয় কিন্তু হয়ত ওঁর বীরত্বটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায়। দেখতে দেখতে মনে হল উনি আসলে ও দুটোর কোন একটা নন। এক সঙ্গে দুটোই তার সঙ্গে বীর পুরুষও। ভালো লাগল ওঁকে। চেহারায় জৌলুস নেই ঠিকই কিন্তু বিরাটকায়

গৌরবের একটা বিশাল জ্যোতি আছে। এখন বোঝা গেল, আসবার সময় ওঁর চারিধার ঘিরে যে কঠিন গাম্ভীর্য্য গাড়ীতে থম থম করছিল সেটা কোন বেদনার নয়, ব্যক্তিগত বিরক্তিরও নয়; বিপদের পরিমাণটা সঠিক ভাবে না জানার অসহিষ্ণু অধৈর্য্যতা। এখন বিপদের সবটা না হ'লেও বেশীটা জানেন তাই ভাবনার বোঝা নামিয়ে উনি ভারমুক্ত।

রুকায়ার সঙ্গে কথা শেষ ক'রে উনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, যেন কতদিনের জানাশোনা। রুকায়া কাশ্মীরি ভাষায় কিছু একটা ব'লে চ'লে গেল। তখন দ্বিতীয় হাতখানা উনি আমার অন্য কাঁধে রাখলেন। খুব সহজ ভাবে বললেন:

"আপনার সঙ্গে আলাপটা আমার বাকি র'য়ে গেল।"

"ফিরে আসুন। হবে।"

উনি আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দাড়ী কাটিয়ে হেসে উঠলেন। এ পাশ ও পাশ থেকে লোক ঘুরে তাকালো। বললেন:

"বন্দুক নিয়ে যারা খেলা করে তারা যাওয়ার জন্যে তৈরী থাকে কেবার কথা জানে না।"

"বেশ তো, আমি বলি, "কাল কোথায় থাকবেন বলুন, আমি নিজেই যাবো আপনার কাছে!"

"থাকবো শত্রুর মুখোমুখি। কোথায় তা জানিনা।"

"কি ক'রে জানা যাবে?"

"আমিই খবর দেবো। কাল নয়, কোন একদিন।"

"আমার কিন্তু থাকার মেয়াদ অল্প। কাজ অনেকটাই হ'য়েছে। যেটুকু বাকি আছে সেটা সারতে দিন চারেকের বেশী লাগবে না। হ'য়ে গেলেই চ'লে যাব।"

উনি আবার হাসলেন, সেই আগের মতন ক'রে বললেন:

"যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়?"

"আমার তো পিছু টান নেই!"

ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে উনি ছোট্ট ছেলের মতন দুষ্টুমি ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন:

"নেই? ঠিক ক'রে বলুন তো? দিল সাফ ক'রে বলুন!"

ওঁর কথা এমন সহজ, এমন সরল আর এতোখানি স্পষ্ট যে লজ্জায় মনটা আমার কেঁচোর মতন কুঁকড়ে গেল। উনি যে কি বলতে চাইছেন সেটা তো আমি বুঝি কিন্তু বলি কি ক'রে?

"আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।"

অল্প হেসে বললেন:

"বুঝছেন ঠিকই, বলবার সাহস নেই।"

থেমে, আবার হাত দুটোকে মুঠোর মধ্যে সাদরে ধরে বললেন: "কৈ বাৎ নেই। আজ থাক, আর একদিন ও কথা হবে যখন আমায় আপনি আরও একটু চিনবেন, আমাদের জীবনটাকে আরও একটু জানবেন আর রুকায়াকে আরও একটু বুঝবেন। চলি।"

আমরা দুজনে যখন বারান্দার এ কোণে এলাম তখন রুকায়া ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বোঝা গেল ও আমাদের কথা বলবার সুযোগ ক'রে দিয়ে আড়ালে ছিল, কথা শেষ হবার অপেক্ষায়।

কামাল সাহেব ঘুরে বললেন : "তোমার জন্যে গাড়ীটা রইল, ইনি তোমায় বাড়ী পৌঁছে আসবেন।"

"এতো রাত্রে আবার ওঁকে কেন?" রুকায়া বললে, "আমি একলাই চ'লে যেতে পারব।"

"পারবে জানি। সারা পৃথিবী তুমি একলা বেড়িয়েছ, কখন আমার মনে এতটুকু ভাবনা হয়নি।"

"তাহ'লে?" রুকায়া প্রশ্ন করল, "আজ এতো ভাবনা কিসের?"

এক পলক অনিমেষ ওর দিকে তাকিয়ে আর দুহাত ওর সামনে মুঠোর মধ্যে ধ'রে কামাল সাহেব বললেন :

"ভাবনা তোমার জন্যে নয়, আমার জন্যে।"

ওঁর কথায় এতো করুণ আবেদন যে রুকায়া রাজি হল।

"আচ্ছা!"

ইতিমধ্যে সবাই চ'লে গেছে। এখানকার এতো চাঞ্চল্য এক মুহূর্তে সব শেষ। অখণ্ড নীরবতা ভেদ ক'রে কামাল সাহেবের জীপ গর্জন ক'রে উঠে উল্কার মতন যেন উবে গেল। সিঁড়ির ধাপে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। ও এবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"আমারও ইচ্ছে ছিল তোমায় ঘ'রে নিয়ে যাবো!"

"তাহ'লে আপত্তি করলে কেন?"

"ও দেশের জন্যে লড়তে যাচ্ছে।" রুকায়া বললে, "তাই সন্দেহের বোঝা সঙ্গে দিতে চাইনি। সেটা অন্যায় হত।"

"সন্দেহ?" হেসে বললাম, "তার কোন অবকাশই ওর মনে নেই। চল। যাওয়া যাক।"

"একটা জিনিষ দেখে যাও।"

ও আমায় মিটিং ঘরে নিয়ে গেল। দেয়ালজোড়া কাশ্মীরের প্রকাণ্ড ম্যাপখানা ছোট ছোট লাল ফ্ল্যাগে ছেয়ে আছে, এদিক থেকে ওদিক।

"কি ব্যাপার?"

"যেখানে ওদের পৌঁছোনোর সংবাদ পাওয়া গেছে, সেখানে ঐ চিহ্ন দেওয়া হ'য়েছে।"

পরীক্ষা ক'রে দেখলাম দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দেখা গেল বৃত্তাকারে সারা কাশ্মীরে লোক ঢুকছে, সাত জায়গা দিয়ে—নিচে পুঞ্চ মার্গ থেকে আরম্ভ ক'রে, পুঞ্চ, ওলমার্গ, টনমার্গ, হাজিপীর, উরি, টিথওয়াল হ'য়ে ও মাথায় কারগিল পর্যন্ত। যাকে ব'লে রীতিমত সাত পাকে বাঁধা! লোক সংখ্যার হিসেব স্পষ্ট ভাবে কোথাও কিছু লেখা নেই তবে ঐ ফ্ল্যাগের উপরই যে কাটাকাটি তাতে আন্দাজ করা যাচ্ছে কম ক'রে হবে ওরা চার হাজার তো বটেই। কাগজে অবশ্য বলা হয়েছিল বারো শো!

এতো দুঃখেও হাসি পেলো। আঠারো বছর ধ'রে যে দেশ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এতো আন্দোলন আর পাকিস্তানের সঙ্গে দৈনন্দিন গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি তার নিরাপত্তার এই ব্যবস্থা? ভারতের সামরিক খরচা কেউ জানেনা কারণ ওটা গোপন তথ্য কিন্তু শাসন ব্যবস্থার মধ্যের এই বিরাট ফাঁক এলো কোত্থেকে আর কেমন ক'রেই বা? মনে পড়ে গেল কোন এক উচ্চ পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষের

হাইতাশ। গত লড়াইয়ের সময় পণ্ডিতজীর হুকুম থেকে তাঁর সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল যে-গুলি যেন এমনভাবে ছোড়া হয় যাতে কোনমতেই বুলেট পাকিস্তানের সীমানায় না পড়ে! অর্থাৎ শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের হতভাগা সৈনিককে হিসেব করে নিতে হবে:—(১) যেখানে দাঁড়িয়ে সে গুলি ছুঁড়ছে সেখান থেকে পাকিস্তানের সীমানা কত দূর, (২) বুলেটটা যদি শত্রুর গায়ে না লেগে সোজা বেরিয়ে যায় তাহ'লে কোথায় গিয়ে সেটা পড়তে পারে এবং (৩) যদি ওপারে গিয়ে বুলেটটা পড়ার এতোটুকু সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তাকে হিসেব মাফিক কতটা আন্দাজ পৌঁছোতে হবে এবং (৪) যদি কোন কারণে গুলিটা গিয়ে পড়েই আর তার ফলে চাকরি যায় তাহ'লে কি করবে?

পণ্ডিতজী মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায় আন্তর্জাতিক বৈঠকে বসবার অধিকারও আমরা পেয়েছি অনেকখানি তাঁরই কারণে এটাও ধ্রুব সত্য, কিন্তু বন্ধু কজন পেয়েছি ভাববার কথা। তাঁর পরমতম বন্ধু মাউন্ট ব্যাটেন কি ক'রেছেন কাশ্মীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাঁর বন্ধু আমেরিকা কি করেছে, আলসাই রিভেনশনের কাশ্মীর ভ্রমণ আর তার পরই শেখ আবদুল্লাহর কার্যাকলাপ তার সাক্ষ্য। দারা আরব কি করেছে গত যুদ্ধের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাঁর বন্ধু চীন তাঁর জীবিতকালেই বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছে আর তাঁর বন্ধু ইন্দোনেশিয়াও গত যুদ্ধেই তাঁর বন্ধুত্ব সুদ সমেত আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতের সীমানায় যদি আদি তাহ'লে উড়িষ্যার কোটিপতি বিজু পট্টনায়েক আছেন তারই অক্ষয়কীর্তি! ১৯৪৭ সালে ইনি প্লেন উড়িয়ে আর সাম্রাই ফ্লিনিংয়ের কন্ট্রাক্ট নিতেন দিল্লী শহরে। আজ উনি কোটিপতি। মোরারজী দেশাই ওঁর অনৈক্য সৃষ্টি। প্রতাপ সিং তো ম'রে বেঁচেছেন এবং সবাই জানে, ম'রে বাঁচিয়েওছেন। আরও ওদিকে গেলে মহানুভব শেখ আবদুল্লাহ যিনি আজ জেলে, মহাপ্রাণ বক্সি গুলাম মহম্মদ যিনি হকি ষ্টিক হাতে বাসের আড্ডায় তাড়াটে ডাকতেন ১৯৪৬-এ, আর কোটি টাকার মালিক হ'য়ে বসলেন কুড়ি বছরের মধ্যে। আজ তিনি তাঁর নাতনীর সমবয়সী খুরসিদ বেগমকে নিয়ে খোস্ মেজাজে আছেন পাকিস্তান থেকে কম ক'রে পনেরো হাজার বরজামাই আনবার পর। ওঁরই অমর সৃষ্টি কৃষ্ণ মেনন আর জেনারেল কল যাঁরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় খাকি হাফ প্যান্ট পরিয়ে আর বাটার জুতো পায়ে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিলেন হিমালয়ের ন'য়ে যাওয়া ঠাণ্ডায় লড়াই করতে। সেই পনেরো দিনে কম ক'রে তিরিশ হাজার সৈন্য যে আমাদের ম'রেছিল, এটা আমার সৈন্যদের মুখে শোনা কথা, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তিরিশ না হ'য়ে যদি ষাট হত ক্ষতি ছিলো, না, যদি সৈন্যরা আমাদের যুদ্ধ ক'রে মরত। তারা বেশী মরেছিলো নিউমোনিয়া আর ফ্রস্ট বাইটে। বলা বাহুল্য, এটাও সৈন্য মহলের কথা, আমার নয়।

এ হেন পণ্ডিত নেহরু যদি দেশের শাসনভার ছেড়ে বিশ্বমৈত্রীর সংঘে যুগে জীবন কাটাতেন তাহ'লে কাশ্মীর নিয়ে এই হাঙ্গামা আমাদের আজ কিছুতেই হত না। দেশ ভাগ হওয়ার আগেই সর্দার প্যাটেল স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছিলেন। পারেননি শুধু কাশ্মীরকে। তার কারণ কাশ্মীর নয়, উনি নিজেও নয়—পণ্ডিত নেহরু। মহারাজা রাজি ছিলেন, সর্দারজী রাজি ছিলেন, ছিলোনা শুধু বৃটেন আর মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে ছিলেন না আমাদের পণ্ডিতজী। কাশ্মীর নিয়ে ওঁর দুর্বলতা তবু মারাত্মক ক্ষমা করা যায়, কিন্তু সামরিক বিভাগে অযথা হস্তক্ষেপ অসহ্য।

শুধু তাই নয় কমাণ্ডার। সারা জীবন অহিংসা নীতি জোর গলায় প্রচার ক'রে আর চীনের সঙ্গে পঞ্চশীলের ছেলেখেলা ক'রে যার খাওয়ার পর উনি জেনারেল থিমায়াকে নাকি বলেছিলেন, "যুদ্ধ জিনিষটা আর আমায় শিখিও না, তোমার চেয়ে ওটা আমি ভালোই জানি।" কথাটা হয়ত অতিরঞ্জন ঠিকই কিন্তু ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটির পরই যে জেনারেল থিমায়া ইস্তফা দিয়েছিলেন এটা স্বীকৃত ইতিহাস!

কৃষ্ণা চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। ও বললে:

"আজ আর দুঃখ ক'রে লাভ কি! বিপদ যখন মাথার ওপর তখন সেই নিয়ে ভাবাই ভালো। আড়াইটে বাজল। চল।"

॥ পরবর্তী সংখ্যায়: লড়াই শুরু হল ॥

• • • •

স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সারা ভারতে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে ঠিক সেই সময়ে পাঞ্জাবে আমিরসানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটিকা বয়ে যায়। মার্শাল আইনে তখন সংবাদ আদান-প্রদান একেবারেই বন্ধ। ঠিক এই মহা সংকটকালে সরলা দেবী চৌধুরানীই তাঁর মামুল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় গোপনে লোক মারফৎ সেই অমানুষিক অত্যাচারের সকল কাহিনী পত্র লিখে জানিয়ে দেন।

সেই সংবাদ পড়ে কবি দুঃখে ও ক্ষোভে চার পাঁচ দিন প্রায় অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন। তারপর সেই নৃশংসতার প্রতিবাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জ প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে যে পত্র লেখেন তা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই পত্রের কিয়দংশ……

"The disproportionate severity of the punishments inflicted upon unfortunate people and the methods of carrying them out, are without any parallel in the history of civilised Governments… These are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due reverence and regret to release me of my title of Knight hood."

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজ সমাজ ঃ হেস্‌টিংস-এর প্রণয় ও বিবাহ

সে-সময় ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসতো একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। টাকা। নিজেদের দেশে যারা ছিল "নিকামাই দজ্জি" তারাই সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে এদেশে আসতো আর কিছুদিনের মধ্যেই লাট-বেলাট বনে গিয়ে দুশকেট ভর্তি টাকা নিয়ে দেশে ফিরতো।

বিলাতে প্রবাদ চালু হয়েছিল যে, ভারতে একটা "প্যাগোডা" গাছ আছে, সেটা নাড়া দিলেই নাকি মোহর পড়ে। সত্যিই সে-সময় ইংরেজদের ধারণা ছিল, ভারতে সোনা রূপো জলের দরে বিকোয়। টাকার পাহাড় আছে এদেশে। এ বিষয়ে মেকলে সাহেবের একটি লেখার মধ্যে পাওয়া যায়—"তখন ভারতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের বড় অদ্ভুত ধারণা ছিল। তারা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করত যে, ভারতের পথে পথে শ্বেত পাথরের অট্টালিকা, সেইসব অট্টালিকার ঘরে ঘরে স্তূপাকার মণিমুক্তা সোনারূপো। যেসব ইংরেজ ভারত থেকে টাকা লুটে দেশে ফিরতো তাদের নতুন নাম হত ন্যাবোব (Nabob), অর্থাৎ নবাব। এদের মধ্যে বেশির ভাগই নামহীন গোত্রহীন শ্রেণীর মানুষ। দেশে তারা কোনদিনই কদর পায়নি। কিন্তু ভারত থেকে ধনশালী হয়ে ফিরে তারা বড় ঘরে বড় সমাজে মেশবার অধিকার পেতো আর টাকার জাঁক দেখাতো। এমন কি দেশে ফিরেও তারা হুঁকো টানার অভ্যাস ছাড়তে পারতো না, অনেকেই বড় বড় গড়গড়ায় সোনার নল লাগিয়ে তামাক খেতো আর তাই দেখে দেশের লোক তাজ্জব বোধ করত। থ্যাকারের একাধিক উপন্যাসে এদের কথা আছে।"

টাকা রোজগারই ছিল তখনকার দিনে এদেশের ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্যে তারা যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পিছপাও হত না।

হেস্‌টিংস-এর জীবনী লেখক ট্রটার বলেছেন, ১৭৬২ সালে পাটনায় হেস্‌টিংস দেখেছিলেন, প্রায় প্রতি গলীতেই গলীবাসীরা ইংরেজ ব্যবসাদার আর তাদের অনুচরবর্গের অর্থ সংগ্রহের ভয়ে পালাচ্ছে, দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করছে। লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, সময় সময় জোর অবরদস্তি করে ইংরেজ কুঠিয়ালরা দেশের লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। এসম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থে অনেক কাহিনী পাওয়া গেছে। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কথা তো আমরা সকলেই জানি।

সে-সময় এদেশে ইংরেজদের আয়ও যেমন ছিল প্রচুর, ব্যয়ও ছিল তেমনি অতিরিক্ত। কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য প্রতাপশালী ফ্রান্সিস সাহেব বাড়ি ভাড়া দিতেন একশো পাউণ্ড। বাড়িতে চারজন মাত্র লোক, তাদের জন্যে চাকর বেয়ারা ছিল একশো দশজন।

ফ্রান্সিসের আত্মীয় মাক্‌রাবি এক পত্রে লিখেছে, চাকরগুলো সব কুড়ের বাদশা। সারা দিনই তারা কাজে ফাঁকি দেয়। তাদের কাজ তদারক করবার জন্যে আবার একজন সরকার আছে।

এমনি ধরণের ব্যয়-বাহুল্য দেখে কোম্পানীর কর্তারা ১৭৭৪ সালে হুকুম জারি করেন যে, জুনিয়ার সিভিলিয়ানরা প্রত্যেকে একজনের বেশি বাবুর্চি আর দুজনের বেশি চাকর রাখতে পারবে না। ঘোড়া কিম্বা বাগানবাড়ী রাখতে পারবে না আর তাদের পোষাক পরিচ্ছদ বথাসম্ভব সাধাসিধে পরতে হবে।

তখন অনেকে আবার ক্রীতদাসদাসী রাখতো। তাদের কেনাবেচার বিজ্ঞাপন কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হত।

একবার কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দারা কমিটি করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চাকরদের মাইনের হার ধার্য করে দেয়। ধনীরা চাকরদের বেশি মাইনে দিতে পারে। যারা ধনী নয় তারা তত মাইনে দিতে পারে না, ফলে তারা চাকর পায় না, মহা অসুবিধা হয় তাদের। তাই স্থির হয়, যে-হারে চাকরদের মাইনে বেঁধে দেওয়া হল তার চেয়ে বেশি যদি কেউ দেয়, তাহলে সে-ব্যক্তি আদালতের বিচার পাবে না আর তার ধনমান রক্ষার জন্যে কোম্পানী দায়ী থাকবে না।

চাকরদের সম্বন্ধেও হুকুম হল, তারা না জানিয়ে কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি পাবে। অর্থাৎ, অমুক পাড়ায় অমুক সাহেব দশটাকা বেশি মাইনে দেবে বলেছে, অতএব বাইল তোমার চাকরি, আমি চললাম অমুক সাহেবের কাছে—এ আবদার বা জুলুম চলবে না।

১৭৭৮ সালের এক পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়, অনেক ভৃত্যকে এই ধরণের অপরাধের জন্যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। শাস্তির নমুনা এই রকম :—

এন্‌ড্রারসন নামে এক সাহেব নালিশ করলে যে, তার ক্রীতদাসী পালিয়েছে। তাকে ধরা হল। শাস্তি—পাঁচ বেত এবং মনিবের কাছে পুনঃপ্রেরণ।

জন রিংওয়েল নালিশ করলে, তার বাঁদুনি না বলে চলে গেছে এবং তার জায়গায় যে-লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাকে রাস্তায় ধরে ঠেঙিয়েছে। শাস্তি—দশ বেত আর চাকরি থেকে জবাব।

কাপ্তেন ষ্ট অভিযোগ করলে, একজন গাড়ি মেরামতওয়ালা তার গাড়ি মেরামত করে দেবে বলেছিল। কিন্তু করে নি। শাস্তি—দশ জুতো।

কর্ণেল ওয়াটসনের নালিশ বড় মজার—রামসিং বেতন নিয়েছে ছুতোর বলে, কিন্তু আসলে সে নাপিত। শাস্তি—দশ বেত এবং ঢোল বাজিয়ে কুলিবাজার প্রদক্ষিণ।

জেকব জোসেফের নালিশ, তার বাবুর্চি একটা পিতলের ঘটি আর শিলনোড়া চুরি করেছে। শাস্তি—যতদিন না সে জিনিষ ফেরৎ দেয় ততদিন হরিণ বাড়ির জেলে বাস।

কাস্টওয়াল অভিযোগ জানালে, তার খেদমতি খালি বোতল চুরি করেছে আর পল্লীর এক দোকানীকে সেগুলো বিক্রি করেছে। শাস্তি—খেদমতির দশ বেত, ক্রেতা দোকানী ভজরামের বিশ বেত আর দুজনকে গোরুর গাড়িতে চড়িয়ে শহর ঘোরানো এবং ঢোল বাজিয়ে তাদের অপরাধের ও শাস্তির কথা প্রচার করা।

শাস্তি যে কেবল ভৃত্যদেরই হত এমন নয়। ইংরেজ মনিবরাও সময়ে সময়ে শাস্তি ভোগ করত। চাকরকে প্রহার করবার অপরাধে জনসন নামে এক সাহেবের জরিমানা হয়। জরিমানা না দেওয়ায় এবং আদালতে হাজির না হওয়ায় তাকে বেশ কিছুদিন শ্রীঘর বাস করতে হয়েছিল।

• • • •

তখন ইংরেজ কেরানীরা সকাল সন্ধ্যায় আপিস করত। দুপুরবেলা বিশ্রাম।

ভোর বেলায় প্রায় সকলেই হয় পায়ে হেঁটে না হয় ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরুতো।

খাওয়া দাওয়া আর মদ্যপানের বহর ছিল এলাহি। প্রচুর খেতো তারা। রক্ত মাংসে-মাছ ডিম-তরকারি, তত মদ। ফলে প্রায়ই তারা অসুখে পড়ত। অত খাওয়া সহ্য হবে কেন?

ইংরেজ মেয়েরা পর্যন্ত ষোড়শ ষোড়শ মদ খেতো সারাদিন ধরে। আর পড়ে পড়ে ঘুমুতো সারাদিন।

সন্ধ্যার পর আবার তারা চাঙ্গা হ'ত। তখন সেজেগুজে বেড়াতে বেরুতো।

বেড়াবার জায়গা ছিল দুটো, লালদীঘি আর পুরণো কেল্লার মাঠ। যারা অবস্থাপন্ন তারা গাড়ীতে চড়ে বেড়াতো। বাকিরা সব পায়দল।

অনেক মহিলাকে গাড়ি হাঁকাতে দেখা যেতো। গাড়ির আরোহী পুরুষ ভিতরের সীটে বসে ঝিমোতো। সে বড় মজার দৃশ্য!

তখনো পর্যন্ত টানাপাখার প্রচলন হয়নি। অতএব গ্রীষ্মকালের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

কলকাতা তখন জলাজঙ্গলে ভর্তি। মশা-মাছি পোকা-মাকড়ের রাজত্ব। সেই সঙ্গে নানা অসুখের অবাধ আধিপত্য।

টাকা রোজগার করতে এসে ইংরেজ কুঠিয়ালরা মাকের জলে চোখের জলে হ'ত কম নয়।

টানাপাখা চালু হবার একটা গল্প আছে।

একজন কিরিঙ্গি কেরানী কেল্লায় বসে কাজ করতে করতে গরমে আর মাছির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে, ক্যাম্প টেবিলের উপরকার ক্যাম্বিশটা তুলে কড়িকাঠে টাঙিয়ে দিয়ে তার নীচে একটি ছাদা করে দড়ি বেঁধে চাকরকে সেটা দোলাতে বললে, তাই থেকে টানাপাখার উৎপত্তি।

সে-সময় ইংলণ্ডে জুয়া খেলার খুব রেওয়াজ। সুতরাং এদেশবাসী ইংরেজরাও যে জুয়ায় আসক্ত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

জুয়া খেলায় ফ্রান্সিস ছিলেন মহা ওস্তাদ। জুয়া খেলে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছিলেন।

তখন ইংরেজ সমাজে পরস্পরকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে জুয়া খেলার ধুম করবার চেষ্টা করা হত। বারওয়েল সাহেব ফ্রান্সিসকে করায়ত্ত করবার জন্যে এই উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু ফল হয়েছিল উলটো। শেষ পর্যন্ত বারওয়েলই ফ্রান্সিসের কাছে দেনদার হয়ে পড়েছিলেন।

কলকাতা শহরের স্বাস্থ্য তখন যাকে বলে একেবারে মারমার কাটকাট। মড়ক মহামারি লেগেই আছে!

ডাক্তার বদ্যিদের বারো মাসই মরসুম। ভিজিট এক মোহর। তাও ভাল ডাক্তারদের পাওয়াই যায় না, এমনি তাদের কদর-বাহুল্য। কাজেই হাতুড়েরাও দিব্যি গজিয়ে উঠল।

বর্ষা যদি নামল, ব্যস, তাহলে আর রক্ষে নেই। ঘরে ঘরে ইংরেজ মেয়ে-পুরুষ জ্বরে কোঁকো করত। শেষকালে তারা স্থির করলে বর্ষাকালে তারা কেউ আর "সাদা জল" পান করবে না। কারণ কলকাতার জল থেকেই যত রোগের উৎপত্তি, অতএব "লাল পানিই" হল তাদের একমাত্র পানীয়। দিনরাত তারা "লাল পানী" খেতো।

বর্ষাকালে যারা জ্বরের হাত থেকে রেহাই পেতো তারা আনন্দে ভোজ দিত। একটা বর্ষা তারা টিকে গেল। কম কথা নয়!!

১৭৮০ সালের আগস্ট মাসের সংবাদপত্রে দেখা যায়, অনেকে গলা ফুলে জ্বরে পড়ছে আর দু'চার দিনের মধ্যেই পটল তুলছে।

১৭৭৯ সালে ২২শে অক্টোবর বিচারপতি হাইড লিখছেন—"প্রধান বিচারপতি ইম্‌পে জ্বরাক্রান্ত, তাঁর গলা ফুলেছে। বিচারপতি রেসবার্ড'ও অসুস্থ, তাঁর জ্বর হয়েছে। আমারও জ্বর হয়েছিল, তবে আজ একটু ভাল আছি। তাই আদালতে এসেছি।"

এত কষ্ট করে ইংরেজরা তখন যে এদেশে থাকতো, টাকা রোজগারের দিক থেকে তার ফল অবশ্য তারা পেতো।

যারা কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরতো, বাকি জীবন তাদের আর টাকার ভাবনা ভাবতে হত না।

সার ইলাইজা ইম্‌পে পাঁচ বছর চাকরি করবার পর লিখেছেন—"কোন বছরই আমি ৪০০০০ টাকার বেশি জমাতে পারিনি।"

বছরে ৪০ হাজার টাকা জমাতেন তিনি। তাহলে পাঁচ সাত বছরে কত হয় হিসেব করে দেখুন। সেই টাকা আর সেই সঙ্গে আরও অনেক সোনাদানা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেছিলেন।

• • • •

সেই সময় ভারত-প্রবাসী ইংরেজ সমাজে মহিলাদের মধ্যে সব প্রধান ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের পত্নী মিসেস হেস্টিংস।

মিসেস হেস্টিংস-এর পূর্ব ইতিহাস হেনকক্ নামে এক ইংরেজ কেরাণীর পত্রে প্রথম জানা যায়।

১৭৭২ সালে ইম্‌হফ নামে একজন জার্মান সৈনিক কাজের খোঁজে ভারতে আসে। লোকটি ছবি আঁকায় পটু ছিল। অন্য কোন কাজ না পেয়ে এখানে কিছুদিন ছবি আঁকার ব্যবসা করে দিন গুজরান করে।

মিসেস হেস্টিংস এই জার্মান সৈনিকের ঘরণী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী এক জাহাজে হেস্টিংস-এর সঙ্গে ভারতে আসেন।

মাদ্রাজে হেস্টিংস মিসেস ইমহফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। হেস্টিংস কলকাতায় এলে ইমহফ-দম্পতীও তাঁর সঙ্গে আসেন। তারপর ইমহফ স্ত্রীকে কলকাতায় রেখে ১৭৭৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে চলে যায়। মৃত্যুলোক বলে ইমহফ যথেষ্ট টাকার লোভেই স্ত্রীকে হেস্টিংস-এর হাতে সঁপে দিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এই সময় হেনকক লিখেছে—"শ্রীমতী দেখতে সুশ্রী, বুদ্ধিমতী, চতুরা, বয়স প্রায় ছাব্বিশ।"

কিন্তু ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সিস লিখেছিলেন—"শিগগিরই হেস্টিংস-এর বিয়ে হবে। পাত্রীর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি একজন জার্মান পটুয়ার পত্নী বলে পরিচিত। তাঁর সেই 'কথিত' স্বামীর ঔরসজাত অনেকগুলি সন্তানও আছে। তবে তিনি অনেকদিন হেস্টিংস-এর স্ত্রীরূপে বাস করছেন। তিনি লোক মন্দ নন। এক সময় দেখতে সুশ্রীও ছিলেন। কল্যাণকর, বিচারপতি ইম্‌পে।"

১৭৭৭ সালের জুলাই মাসে খবর আসে মিসেস ইমহফ বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পেয়েছেন। তারপর ৮ই আগষ্ট হেসটিংসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। পাত্রীর জন্ম সন ১৭৪৭। সুতরাং সে সময় তাঁর বয়স তিরিশ। হেসটিংস-এর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ।

হেসটিংস-এর প্রণয় ও বিবাহ সম্বন্ধে প্রায় সত্তর বছর আগে একটি পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সেটি ভারী সুন্দর। হেসটিংস-এর প্রণয় ও বিবাহের ব্যাপারে মেকলে সাহেব একটি কাহিনী

প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা বিবরণটি সেই ইংরেজি রচনার মর্মকথা। সেই বর্ণনাটি হুবহু নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"ডিউক অফ গ্রাফটন নামক জাহাজে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হেসটিংস ভারতে আসিতেছিলেন। সেই জাহাজে ইমহফ নামক একজন জার্মান যাত্রী ছিলেন। তিনি আপনাকে 'ব্যারণ' (Baron) বলিয়া পরিচয় দিতেন। দুঃস্থ হইয়া চিত্রকরের ব্যবসায়ে ভারতে সহজপ্রাপ্য অর্থের লাভাশায় ভারতে আসিতেছিলেন। ব্যারণের পত্নী তাঁহার সহিত আসিতেছিলেন। এই প্রতীচ্যদেশসম্ভূতা যুবতী দেখিতে সুন্দরী, তাঁহার মানসিক অনুশীলন ছিল, তাঁহার ব্যবহারও চিত্তাকর্ষক। তিনি তাঁহার স্বামীকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি হেস্টিংস-এর কথাবার্তায় আকৃষ্টা ও তাঁহার প্রতি হেসটিংস-এর মনোযোগে তুষ্টা হইতেন। ভারতযাত্রী জাহাজে যেমন আন্তরিক বন্ধুত্ব বা বিষম শত্রুতার সঞ্চার হয় তেমন আর কুত্রাপি হয় না। সুদীর্ঘ-কালব্যাপিনী জলযাত্রা স্বভাবতই বড় একঘেয়ে ও বিরক্তিকর। সে সময়ে যাহা হউক একটা কিছু ঘটিলে সে একঘেয়েমি দূর হয়—তা সে আর একখানা জাহাজের আগমনই হোক, একটা হাঙ্গর বা একটা বিহঙ্গম নূতন গোচরই হোক, আর একটা লোক জাহাজ হইতে জলেই পড়ুক। কেহ কেহ অত্যধিক আহার করিয়া সময় কাটায়। কিন্তু অনেকেই কলহে বা প্রেমক্রীড়ায় (flirting) সময় কাটায়। দুই-এরই সুবিধা প্রচুর। যাত্রীরা অনেক সময়েই একত্র থাকে। আপনার কোটরে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন অন্য যাত্রীদের সঙ্গত্যাগের উপায়মাত্র নাই। ভোজন, ব্যায়াম সবই একত্র, তাহাতে একজন যাত্রী ইচ্ছা করিলেই সহযাত্রীদিগকে বিরক্ত করিতে বা সন্তুষ্ট করিতে পারে। জাহাজ ভিন্ন অন্যত্র সমাজে যেসকল দোষ বা গুণ হয়ত বহুদিন অজ্ঞানিত থাকিত, তাহা অনেক সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা বিপৎপাতে প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ব্যারনেস্ ইমহফের সহিত হেসটিংস-এর সাক্ষাৎ হয়,—উভয়েই অসাধারণ রমণীবাসনাপন্ন। হেসটিংস অকৃতদার। ব্যারনেসের স্বামী আত্মসম্মানজ্ঞানহীন; পত্নী তাহাকে ঘৃণা করিতেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল—হেসটিংস পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্যারনেস রমণীসুলভ কোমলতা সহকারে অনিদ্রায় তাঁহার বহু শুশ্রূষা করিলেন। জাহাজ মাদ্রাজে পঁহুছিবার পূর্বেই হেসটিংস ব্যারণেসের প্রণয়াসক্ত হইলেন। তাঁহার প্রেম, তাঁহার ঘৃণা, উচ্ছ্বাসিলাষ প্রভৃতিরই মত প্রবল, কিন্তু স্থির, গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ; তাহা বিলম্বে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইমহফ সব শুনিয়া অর্থলোভে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পত্নী বিবাহ বিচ্ছেদের নালিশ করিলে তিনি তাহার সব সুবিধা করিয়া দিবেন। স্থির হইল, বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া গেলে হেসটিংস ব্যারনেসকে বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তানগণের পালনের ভার লইবেন।

ইহার পর যেকলে বলিয়াছেন, মহাসমারোহে হেস্টিংস-এর বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। কলিকাতার ইংরাজ সমাজের শত্রুমিত্র সকল পদস্থ ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণকার বলেন, ক্লেভারিং তখন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাবশতঃ বিবাহে আসিতে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। হেস্টিংস নাছোড়বান্দা হইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসেন। এই টানা-হেঁচড়ায় ক্লেভারিং অসুস্থ হইয়া পড়েন। কয়দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বার্তা পাওয়ার পরই জাপানের পরাক্রমশালী কোয়ান্টুং বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে প্রতিরক্ষারত শক্তিশালী সুসজ্জিত লালফৌজের সাইবেরীয় ডিভিশন পূর্বপ্রান্ত থেকে স্থানান্তরিত করে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়োজিত করা হ'ল। যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল—১৯৪১ সালের নভেম্বরে মস্কোর উপকণ্ঠে এবং ১৯৪২ সালে ভোলগা তীরে স্তালিনগ্রাডে নাৎসীবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি প্রতিহত হল, শুরু হল তাদের পিছু হটার পালা।

বারবারোসা প্ল্যান—হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্নের দুকের সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটির কথা নাৎসী জার্মানীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনই জানতো। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরিকল্পনাই ছিল এই হিটলারের এই প্ল্যান। কবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করা হবে তার একেবারে ঠিক ঠিক দিনক্ষণও পরিকল্পনাটিতে নির্ধারিত করা হয়েছিল। অত্যন্ত গোপন এই প্ল্যানের আবার গোপনতম অংশ ছিল এই তারিখটি।

জার্মানী থেকে সহস্র সহস্র কিলোমিটার দূরে টোকিওতে বসে কঠিন গোপনতার শক্ত আবরণ ভেদ করে দুর্জ্ঞেয় সেই তারিখটি সংগ্রহ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন সমসাময়িককালের ইতিহাসের বিস্ময়—রিহার্ড জোর্গে।

রিহার্ড জোর্গে জন্মী জাপান ও নাৎসী জার্মানী সম্পর্কে এমন অসংখ্য মূল্যবান তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন যে পশ্চিম দুনিয়ার রাষ্ট্র গোয়েন্দাপ্রধান ও কূটনীতিবিদদের কাছে তা চমক লাগিয়ে দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জোর্গেকে নিয়ে পশ্চিমী দেশসমূহে নানা চাঞ্চল্যকর ও কল্পকাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। জোর্গে কে, কি তার আসল পরিচয়, কি করে তিনি এমন সমস্ত অসাধ্যসাধন করলেন—এই সব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না খুঁজে তাঁরা জোর্গেকে চিত্রিত করলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক অতিমানব হিসেবে। জোর্গেকে কেন্দ্র করে অনেক রাজনৈতিক অপপ্রচারও চালান হয়।

টোকিওতে জার্মান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাচি রিহার্ড জোর্গে সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘদিন নানা কারণে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে ছিল। মাত্র কিছুদিন আগে এক নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে জোর্গেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান—অর্ডার অব লেনিন—উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং সেই সময়েই সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর আসল পরিচয় ও প্রকৃত রূপটি সোভিয়েত ও পৃথিবীর জনসাধারণের সম্মুখে সর্বপ্রথম তুলে ধরা হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের কোন ব্যক্তিকে এইভাবে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা এবং সেই ব্যক্তি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পেয়ে "জাতীয় বীরে" পরিণত হওয়ার অনুরূপ ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

বিভিন্ন দেশে জোর্গেকে নিয়ে যাঁরাই কিছু লিখেছেন তাঁরা তাঁর চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে একটা বিষয়ে একমত হয়েছেন—ইতিহাসে পরিচিত অন্যান্য গুপ্তচর বা এজেন্টদের সাথে জোর্গের বিরাট পার্থক্য ছিল। কেউ বা তাঁকে বলেছেন "দার্শনিক এজেন্ট", কেউ বলেছেন "আদর্শবাদী এজেন্ট," কেউ বা প্রশ্ন তুলেছেন "সত্যিই, কে এই রিহার্ড জোর্গে?"

জোর্গের যে পরিচয়টি সুপরিচিত সেটি হল—জার্মান সংবাদপত্র "ফ্রাঙ্কফুর্টার জিটুং"এর টোকিও প্রতিনিধি, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ রিহার্ড জোর্গে, জাপানে জার্মান দূতাবাসের প্রেস-অ্যাটাচি জোর্গে, টোকিও'র জার্মান কলোনীর বিশিষ্ট নাৎসী হের জোর্গে।

জোর্গের নিজের মুখ থেকে তার কাহিনী শোনা যাক। ৩৫ বছর আগে সেভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর কমরেডদের এক সভায় জোর্গে বলেছিলেন :

"আমি রিহার্ড জোর্গে, জাতিতে জার্মান ; জন্ম আমার দক্ষিণ ককেশাসের আজারবেজান-এ, ১৮৯৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর। আমার বাবা ছিলেন বাকুতে এক জার্মান তেল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, আর মা ছিলেন রুশ, এক রেলশ্রমিকের কন্যা। আমাদের পরিবার ছিল বিপ্লবী ঐতিহ্যপূর্ণ এক পরিবার। আমার পিতামহ এবং তাঁর ভাইরা ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।"

১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লব সফল হয়নি। ফ্রেডরিক আলবার্ট জোর্গে, রিহার্ডের পিতামহ, ছিলেন সেই বিদ্রোহে বাভেন অভ্যুত্থানের নেতা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সেই সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফ্রেডরিক আলবার্ট জোর্গে সেই সময়ে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং কার্ল মার্কস্-এর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে তিনি জেনারেল কাউন্সিলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমেরিকায় অবস্থান-কালে তাঁর পুত্র অ্যাডলফ জোর্গে আমেরিকার তৎকালীন শিল্পোন্নয়নের আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় তিনি মার্কসের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

রিহার্ড জোর্গে হলেন অ্যাডলফের পুত্র। বিপ্লবীর দৌহিত্র ও ব্যবসায়ীর পুত্র। রিহার্ডের পরিবারে তাই সমসাময়িক কালের দুটি প্রধান ধারা, ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন, উভয়েই প্রতিফলিত হয়েছিল।

রিহার্ডের নিজের কথায় ফিরে আসা যাক—"আমার বয়স যখন তিন বছর, আমাদের পরিবার তখন রাশিয়া থেকে জার্মানীতে ফিরে আসে। বার্লিনে উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হই, কিন্তু স্নাতক হতে পারিনি—প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের আগে রাজনীতির প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। রাজনৈতিক কারণেই নয়, ব্যক্তিগত কারণেই আমি সৈন্যদলে ভর্তি হই। তিনবার আমি আহত হই। হাসপাতালে একজন আমাকে বেআইনী পত্র-পত্রিকা পড়তে দিয়েছিল।"

গুরুতরভাবে আহত হওয়ার জন্য ১৯১৬ সালে রিহার্ডকে যখন সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল তখনও তিনি কমিউনিষ্ট হননি। কিন্তু যুদ্ধই শেষ পর্যন্ত তাঁকে কমিউনিষ্টে পরিণত করল। ১৯১৮ সালেই আমি কিয়েলে সোস্যাল ডিমোক্রাটিক সংগঠনের সদস্য ছিলাম। সেখানে নাবিকদের মধ্যে একটা সংগঠন আমি গড়ে তুলি। নাবিক বিদ্রোহের সময় আমি বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম।" এর পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"কিয়েল থেকে আমি যাই হামবুর্গে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি আমার গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য পড়াশুনা করি এবং সমাজবিদ্যায় ডক্টরেট উপাধি লাভ করি। হামবুর্গ থেকে হাচেনে গিয়ে আমি সহ-অধ্যাপক হই। সেখানে এক বর্ষীয়ট কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য আমাকে বরখাস্ত করা হয়। হাচেনের কাছাকাছি খনিতে তখন আমি কাজ নেই। সেখান থেকেও আমার কাজ চলে যায় এবং হলাণ্ডে গিয়ে সেখানে এক খনিতে কাজ নেই। ১৯১৯ সালে আমি জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেই। ১৯২০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত আমি সলিডারেন-এ পার্টি পত্রিকায় সম্পাদনা করেছিলাম। ১৯২০ সালে কাপ প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দমন করার সংগ্রামে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম।" ১৯১৮ সালে কিয়েলের বিপ্লবী সংগ্রাম এবং কাপ-এর শ্রমিকদের সংগ্রামের তাৎপর্য পৃথিবীখ্যাত জার্মান কমিউনিষ্ট নেতা আর্নেষ্ট থেলমান তাঁর লেখায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

"১৯২৫ সালে আমি মস্কোতে আসি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক হই। কমিউনিষ্ট পার্টিতে (বলশেভিক) যোগ দিয়ে আমি পার্টির কাজ করতে থাকি।"

পার্টি সভ্যপদের দলিলটি জোর্গের আজও সোভিয়েত ইউনিয়নে সুরক্ষিত রয়েছে।

পার্টি কার্ড নং—০০৪১২২৭
যোগদানের তারিখ—মার্চ, ১৯২৫
যে সংগঠন কার্ড প্রদান করেছে তার নাম—খামভনিকি জেলা,
মস্কো সংগঠন।

বিদেশের কমিউনিষ্টদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সময় তাঁদের সকল আশা-আকাঙ্খার প্রতীক, তাঁদের সংগ্রাম ও জয়ের প্রতিভূ। জোর্গের সাথে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আর একটি অতিরিক্ত বন্ধনও ছিল—সোভিয়েত ইউনিয়ন হ'ল তাঁর মার স্বদেশ।

মস্কোতে গিয়ে জোর্গে কাজে প্রেরণা পেয়েছিলেন। জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম বই "মূলধনের সঞ্চয় ও রোজা লুক্সেমবুর্গ" রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সময় প্রকাশিত হয়। আরো দুটি বই-এর পাণ্ডুলিপি এই সময়েই তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯২৯ সালে জোর্গে তাঁর পার্টি-সেলে আত্মবিবরণ প্রদান করেন। তিনি তখন নিজের আত্ম-জীবনী লিখে দেন এবং এক প্রশ্নপত্রের লিখিত উত্তর দেন। জোর্গের সেই লেখা থেকেই ওপরের উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে।

১৯২৯ সাল—জোর্গের জীবনের নতুন অধ্যায় এই বছরটি থেকেই শুরু হয়—যে অধ্যায়টির ওপরেই বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক-জীবনীকার, গবেষক, রাজনীতিবিদ, লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

জোর্গের সমগ্র অতীতের শীর্ষে রয়েছে ১৯২৯ সালটি। জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হয় কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর কোন বদল হয় না। একই জীবনধর্মে আরো বেশী আত্মবান হয়েই তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়।

বিজ্ঞানী বিশ্লেষণীক্ষমতা, গবেষকের অক্লান্ত অনুশীলন শক্তি, রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টি, কূট-নৈতিকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পণ্ডিত ব্যক্তির সামগ্রিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও আকর্ষণীশক্তি এবং বিপ্লবীর ধৈর্য, ধৈর্য ও লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি—এই সবকিছুর সমাবেশ জোর্গের মধ্যে যিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি হলেন বিশ্বখ্যাত বাজিন—যাঁর অসাধারণ কীর্তিকাহিনী সোভিয়েতে আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। লালফৌজের ইনটেলিজেন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বাজিনের প্রভাবই জোর্গের ওপর সর্বাধিক ছিল। বাজিন শুধু রিহার্দের কাজই ছকে দেননি, তাঁর দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। জোর্গে দীর্ঘদিন ধরে বাজিন শিল্প ঘরোকিচের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে কাজ করেছেন, সেই সাহসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কিত একাধিক বইতে "অ্যালেক্স" বলে বর্ণিত হয়েছেন; অর্থাৎ তাঁর আসল পরিচয় তারা জানতো না।

১৯২৯ সালে রিহার্দে জোর্গে সাংহাই-এ প্রেরিত হলেন দুরূহ ও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে। রিহার্দকে বলা হ'ল, "আপনার প্রধান কাজ হবে জার্মান মহলের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত শিকড় প্রোথিত করা।" পরের কয়েক বছর ধরে চলল এই কাজের প্রস্তুতি।

• • • • •

১৯৩৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জাপানের ইয়াকোহামা বন্দরে জাহাজ থেকে নামলেন পাতলা গড়নের সুদর্শন এক ব্যক্তি। দুটি নীল চোখ তাঁর বুদ্ধিদীপ্তিতে উজ্জ্বল। যে জার্মান পাশপোর্টটি তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খুলে দেখালেন তাতে তাঁর নাম লেখা রয়েছে—রিহার্ড জোর্গে, বয়স ৩৮। আরও একটি পরিচয়পত্র তিনি দেখালেন, সেটি হ'ল সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কার্ড।

বহুল প্রচারিত জার্মান সংবাদপত্র "ফ্রাঙ্কফুর্টার জিটাং"-এর প্রতিনিধি ও একজন ন'ৎসী'র ছদ্মবেশের আড়ালে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশিষ্ট এক ইন্টেলিজেন্স অফিসার রয়েছেন, এমন সন্দেহ সেদিন কেউই করতে পারেনি।

জোর্গে ঘটনাচক্রে হঠাৎ সেদিন জাপানে গিয়ে উপস্থিত হন নি। ত্রিশ দশকের গোড়ায়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। মাঞ্চুরিয়া দখল করবার পর গ্রেট চীন দখল করবার ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্য জাপানের জঙ্গী শাসকেরা তৈরি হচ্ছিল। আর পশ্চিমে ঠিক কয়েক মাস আগেই, ১৯৩৩ সালের মার্চে, হিটলার ও তাঁর নাৎসী পার্টি জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার এবং বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার তোড়জোড় তখন থেকেই শুরু হয়ে যায়। ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও আধা-ফ্যাসিস্ত জাপানের মধ্য-উদ্বেজের অন্তত মৈত্রী হতে দেরী হয় না।

সাংবাদিক হিসাবে জোর্গের খ্যাতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ল। টোকিওতে জার্মান দূতাবাসের মিলিটারি এ্যাটাচি অটো'র সাথে ঘনিষ্ঠ হতে জোর্গের কোন অসুবিধাই হ'ল না। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিতে এবং জাপান সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যে অটো বিপুলভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং জোর্গে ও অটোর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠলো। জার্মান দূতাবাসে এবং টোকিও'র জার্মান মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

জাপানে জোর্গের কর্তব্য সাধনের কাজে যিনি তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁর নাম ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ। জাতিতে তিনি ছিলেন যুগোস্লাভ। এবং আদর্শে কমিউনিস্ট। বেলগ্রেডের "পলিটিকা" এবং প্যারিসের "তাঁর" পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে ব্রাঙ্কো সেইসময় ছিলেন টোকিও'র প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত সাংবাদিক। যুদ্ধের আগে ফরাসী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "হাভাস"-এর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। "হাভাসে"র টোকিও প্রতিনিধি অসুস্থ থাকায় "হাভাসে"র কাজও তাই প্রধানতঃ ব্রাঙ্কোই করতেন। বিভিন্ন জাপানী মহলে জোর্গের অনুপ্রবেশের কাজে ব্রাঙ্কোর সাহায্য খুবই কার্যকরী হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই ব্রাঙ্কো জোর্গের সাথে তাঁর পরিচিতির কথা প্রচার করে বেড়াননি।

জোর্গে জাপানে পদার্পণ করার কিছুদিন পরেই আর একজন জার্মান টোকিওতে এসে হোটেলে উঠল। তাঁর নাম ম্যাক্স্ ক্লজেন। ম্যাক্স্, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদলে রেডিও অপারেটারের কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের পর নাবিক জীবনে তিনি ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। নবীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। হামবুর্গে ফিরে গিয়ে তিনি মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন করেন এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

জোর্গের সাথে ক্লজেনের পরিচয় হয়েছিল জাপানে আসার আগেই ১৯২৯ সালে। প্রথম পরিচয়ে ক্লজেন জোর্গের প্রতি আকৃষ্ট হন। জাপানে পৌঁছানোর দিনই সন্ধ্যায় ক্লজেন টোকিও'র জার্মান ক্লাবে উপস্থিত হলেন। সেখানে রিহার্ড জোর্গের দেখা তিনি পেলেন। নিভৃত এক মুহূর্তে

জোর্গে ম্যাক্সকে বললেন, "তোমার সাথে দেখা হয়ে সুখী হলাম। চল কাল জার্মান রেস্তোরা "দেই ফ্রেয়ারমউজ"-এ বসে আলাপ করা যাক।"

এরপর ম্যাক্স্ আর জোর্গের সাক্ষাৎ ঘটে ব্রাঙ্কো স্কুকেলিচ্-এর ফ্ল্যাটে। ম্যাক্স্ সেদিন সেই ফ্ল্যাটে একটা ট্রান্সমিটার বসাল এবং তারই মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর রেডিও অপারেটার হিসেবে ম্যাক্সের দক্ষতা আর এক সংগ্রামে নিয়োজিত হল। সে সংগ্রাম প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার সংগ্রাম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের "কেন্দ্র" এর পর থেকে নিয়মিতভাবে "হান্স্"-এর পাঠান "রামজাই"-এর বার্তা পেতে থাকল। বলা বাহুল্য "হান্স্" ছিল ম্যাক্সের ছদ্মনাম আর "রামজাই" ছিল জোর্গের নাম।

জাপানের জঙ্গী শাসকেরা দেশকে যে সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে, জাপানী বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। দেশপ্রেমিক সেই সব জাপানীর সাহায্য জোর্গে সহজেই পেয়েছিলেন। জোর্গের দলের বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন জাপানী, অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরবৃত্তি নয়, বরং আদর্শবোধ, স্বদেশের বিপর্যয় রোধ করার মহান ব্রত নিয়েই তাঁরা জোর্গের সহকর্মী হয়েছিলেন। জোর্গের সহকর্মী জাপানের এই সব দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল হোজুমি ওজাকি। জাপান সরকারের তিনি ছিলেন সরকারী পরামর্শদাতা এবং তৎকালীন জাপ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনো'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওজাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়ই মার্কস্বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

জাপানে সেই সময় চারিদিকে কড়া পুলিসী বেড়াজাল, বিশেষ করে বিদেশীদের ওপর কড়া নজরের ব্যবস্থা ছিল। জোর্গেও কম সতর্ক নয়। তিনি ম্যাক্স্কে আরো কয়েকটি ট্রান্সমিটার শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসাতে বললেন। জাপানী ইনটেলিজেন্স বিভাগের নজর এড়ানোর জন্য ম্যাক্স্ কয়েকটি শহরের বিভিন্ন দোকান থেকে ভাগ ভাগ করে রেডিও পার্টস সংগ্রহ করলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে বার্তা প্রেরিত হতে থাকলো। আরো কিছুদিন পর ম্যাক্সের স্ত্রী আন্না টোকিওতে এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ম্যাক্স্ তাঁর আসল কাজ গোপন রাখার এক বিস্তারিত ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এমন এক ধরণের ফটোপ্রেট তৈরির এক ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। ম্যাক্স্ এক ধরণের "কপি" করার পদ্ধতির ডিজাইন করলেন—জাপ যুদ্ধবিভাগ তাতে বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করলো। এইভাবে সত্যিকারের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এম. ক্লুজেন অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল—কোম্পানীর জোর ব্যবসা চলতে থাকলো। আন্না ঘরিদ্দারের দেখাশোনা করে ম্যাক্সকে তার আসল কাজ করার বেশী সময় করে দিতেন।

জোর্গে ইতিমধ্যে জার্মান দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাচি অটোর সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন যে, অটোর সমস্ত রিপোর্ট হয় তিনি নিজে লিখে দিতেন বা দেখে দিতেন। "তৃতীয় রাইখের রাজধানীতে পৌছাবার আগেই এই রিপোর্ট আমাদের "কেন্দ্রে" পৌছে যাবে"—এ কথা জোর্গে প্রায় ম্যাক্স্কে বলতেন।

এই অটোই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে ১৯৩৮ সালে জাপানে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত হলেন। জোর্গে এই কড়া নাৎসী অটোকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন যে, অটো রাষ্ট্রদূত

হয়ে জোর্গেকে দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাচি করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করলেন। বেসরকারী কাগজের একজন সাংবাদিককে কূটনৈতিক অফিসের এইরকম এক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা তৎকালীন জার্মান সরকারের রীতিবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অটোর পীড়াপীড়িতে তা সম্ভব হল। সাংবাদিক হিসাবে জোর্গের কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহে তাঁর কৃতিত্বে অটো এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এর জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম করে হ'লেও জোর্গেকে ঐ পদে নিয়োগ করতে চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত জোর্গে প্রেস অ্যাটাচি নিযুক্ত হলেন।

জার্মান গোয়েন্দা দপ্তর, রোমহর্ষক গেস্টাপো সংগঠন জোর্গের খোঁজখবর নিয়ে তৃতীয় রাইখের রাজধানীতে জানিয়ে দিল। ডঃ রিহার্ড জোর্গে সম্পর্কে সবকিছুই তাদের জানা, আপত্তিকর কিছুই নেই। পরে অবশ্য তারা জানতে পেরেছিল, কিছুই তারা জানতো না। উল্লেখযোগ্য যে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের পরামর্শে জোর্গে তাঁর আসল নাম নিয়েই এ কাজে নেমেছিলেন। তাঁর পিতামহ নাৎসী বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও এবং জোর্গের নিজের বিপ্লবী অতীত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিরা তাঁকে নাম পালটাতে বলেননি। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মত্ত নাৎসীদের প্রতিটি লোকের অতীত খুঁজে বের করার ধৈর্য ও সময় নেই।

খুব প্রাচ্যে গেস্টাপো ইনটেলিজেন্সের প্রধান কর্নেল মেইজিসোর-এর সাথেও জোর্গের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তিনিও জোর্গের নাৎসী আনুগত্যে কোনরকম সন্দেহ করতে পারেন নি।

টোকিওতে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সমস্ত "টপ-সিক্রেট" দলিল দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাচি জোর্গের আয়ত্তাধীন হল। রাষ্ট্রদূত অটোর ওপর জোর্গের প্রভাব এমনই ছিল যে তাঁর কাছে গোপন রাখার মত অটোর বিশেষ কিছুই ছিল না। আর এই আস্থা অর্জনের জন্য নিজের বাইরের আবরণটি বিবেকহীন-চরিত্রহীন এক নাৎসী অমানুষে পরিণত করার জন্য জোর্গেকে কি না করতে হয়েছে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এবং যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় জোর্গে ও তাঁর দলের কর্মীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব বার্তা সংগ্রহ করে পাঠাতে পেরেছিলেন। এই সময়ে ম্যাক্স্ এক এক দিন এত হাজারেরও বেশী শব্দ সম্বলিত বার্তা পাঠিয়েছেন।

জোর্গের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাঁর প্রেরিত বার্তায়। ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে জোর্গে জানালেন, ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করছে। জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ জাপানের রাষ্ট্রদূত অটোকে সতর্ক করে দিয়ে যে গোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, সেই বার্তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে জোর্গে পাঠিয়েছিলেন ১৯৪১ সালের ৭ই মার্চ। এই বার্তায় বলা হয়েছিল, জুনের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করা হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে নাৎসীবাহিনী কোথায় কত সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে, কি ভাবে আক্রমণ পরিচালিত হবে ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে জোর্গে বহু বার্তা পাঠিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক কবে আক্রান্ত হচ্ছে সেই তারিখটিও জানিয়েছেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে অমূল্য যে সব সংবাদ জোর্গে পাঠালেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই সময়ের অস্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও স্তালিনের সর্বময় কর্তৃত্বের যুগে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করা হল না। "সন্দেহজনক" মার্কা নিয়ে তাঁর বার্তাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে পরে রইল। শুধু জোর্গের প্রেরিত সংবাদ নয়, অন্যান্য সূত্র থেকেও প্রেরিত হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের সিদ্ধান্তের সংবাদ

স্তালিন আমলে দিলেন না। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রতি স্তালিনের ব্যক্তিগত আস্থার জন্য সোভিয়েত জনগণকে বিপুল ক্ষতিপূরণ দিতে হল।

জাপানী গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যে খাঁচ করেছে—জার্মান দূতাবাসে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। তাদের তৎপরতা বিপুল বৃদ্ধি পেল। আর জোর্গে—এই পরিস্থিতির মধ্যে ধীর, স্থির হয়ে তাঁর ব্রত পালন করে চললেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ খবরাখবর তিনি না জানলেও অনুভব করলেন সেখানকার অস্বাভাবিক অবস্থা। তীক্ষ্ণধী জোর্গে বুঝলেন তাঁর প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্থার অভাব। আঘাত পেলেন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। অটল থেকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে লাগলেন। অপ্রস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের পর একের পর এক গ্রাম শহর দ্বারবার করে নাৎসীবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে জোর্গের বুক ভেঙে যাচ্ছিল। ম্যাক্সকে তিনি বলেছিলেন, "ভেবে দেখ, আমাদের রিপোর্ট বিশ্বাস করে সময় মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কত জীবনই না রক্ষা পেত।"

দলের সকলকে উৎসাহ দিয়ে জোর্গে বলতেন, "ভেঙে পোড়ো না। হয়ত আমরা আর এখান থেকে বেরুতে পারবো না, তাই অন্যের জন্যই আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবো। আর আমরা যদি হারাই পড়ি, তবুও আমরা জানবো, আমাদের সংগ্রাম বৃথা হয় নি।"

জোর্গে তখনও জানতেন না যে তাঁর গ্রন্থের সহকর্মী বাজিন ও ব্রোডিচ্‌কে স্তালিন ব্যক্তি-পূজার আমলের আগে অনেকের মত জীবন দিতে হয়েছে। জার্মান গুপ্তচর জালকৌশল ছেয়ে গেছে—এই যুদ্ধে কত না পরীক্ষিত দেশপ্রেমিককে জীবন দিতে হয়েছে। এই বাজিনই জালকৌশলের সুদক্ষ ইন্টেলিজেন্স বিভাগ গড়ে তোলেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথমাবস্থায়, প্রবীণ বিপ্লবী লাটভিয়ান এই বাজিনকে ক্রয় করার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লকহার্ট কয়েক লক্ষ পাউণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব করেন। বাজিন নিয়েছিলেন, এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উৎখাতের বিরাট ষড়যন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, আর টাকাটা জমা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের তহবিলে। এই বাজিনও স্তালিনের চোখে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত রইলেন না। বাজিনের হাতে গড়ে তোলা অফিসার হওয়ার জন্যও বোধ হয় জোর্গের প্রতি আস্থার অভাব দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল।

জোর্গে প্রেরিত বার্তার মধ্যে দিয়ে এই সময় তাঁর বিশ্বাসের অভাবজনিত ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ ফুটে বেরিয়েছিল। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "ম্যাক্স এত অসুস্থ যে আগের কাজ সে চালিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। সে পাঁচ বছর ধরে এখানে কাজ করছে এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করেছে তা' কঠিনতম স্নায়ুর কোন লোককেও কাবু করে ফেলত। আমি এখন তার কাজ শিখছি এবং আমি নিজেই সে কাজ করবো।

"আমার ব্যাপারে আমি আগেই জানিয়েছি ইউরোপে যুদ্ধ যতদিন চলছে ততদিন আমি আমার ঘাঁটিতেই রয়েছি। কিন্তু এখানে জার্মানেরা বলছে যে, যুদ্ধ শিগ্‌গীরই শেষ হয়ে যাবে। আমার জানা দরকার আমাকে কি করতে হ'বে। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে যেতে পারবো বলে কি ধরে নিতে পারি? আমার বয়স ৪২ বছর হ'ল; আর এই কাজে আমি গত ১১ বছর ধরে রয়েছি। এই ধারাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে একটা স্থায়ী আস্তানায় বাকী জীবন কাটাবার সময় আমার এসেছে। যে বিপুল অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি তাকে কাজে লাগানোর জন্যও এটা প্রয়োজন। আমি আপনাদের

অনুরোধ করেছি, ভুলবেন না বিরামহীন ভাবে একনাগাড়ে আমি এখানে রয়েছি এবং অন্যান্য "সম্মানিত বিদেশী"র মত প্রতি তিন বা চার বছর অন্তর আমি কোন ছুটি নেই নি। এটা সন্দেহের উদ্রেকও করতে পারে।

"আমরা মোটামুটি ভালই আছি, স্বাস্থ্য কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে—

আপনাদের বিশ্বস্ত কমরেড ও সহকর্মীবৃন্দ।"

জোর্গে কাজ করে চললেন এবং তাঁর কাজের গুরুত্ব আগে কোনদিনই বোধ হয় এত বেশী ছিল না।

১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার একমাস পর জোর্গে তাঁর ঐতিহাসিক বার্তা জানালেন—জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর জোর্গের প্রধান কাজ হ'ল জাপানের মতিগতি স্থির করা নির্ধারণ করা। তিনি নিজের চোখে একটা দলিল দেখলেন—সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'তে জাপানের অন্ততঃ ছ'মাস সময় প্রয়োজন। জার্মানীর চাপের মুখে কূটনৈতিক চালের এই ভাষার অর্থ বুঝতে এবং জাপানী সমর অধিকর্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে জোর্গের অসুবিধা হয় নি। তিনি মস্কোতে নীচের এই যথাযথ বার্তাটি পাঠালেন :

"১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ সালে—জাপান সরকার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সশস্ত্রবাহিনী অবশ্য মানচুরিয়ায় থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হ'লে আগামী বছরের বসন্তকালে সামরিক অভিযান শুরু হ'তে পারে।"

জাপানী ঐতিহাসিক আকিরা যুকিওয়ারা ইতিহাস সম্বন্ধীয় জাপানের এক পত্রিকায় জোর্গে ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে দলিলপত্রাদি অধ্যয়ন করে ১৯৬৩ সালে এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করে জোর্গে ও তাঁর সহকর্মী ওজাকির জাপানের তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মধারার খুঁটিনাটি পর্যন্ত নখদর্পণে থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ১৯৪১ সালের ২রা জুলাইতে স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতিতে যে গোপন সম্মেলন হয় তার দলিলপত্র পর্যন্ত জোর্গে ও ওজাকির হাতে এসেছিল। তাঁরা জাপানের 'কানটোকুয়েন প্ল্যানের' কথাও (জাপানের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্ল্যান) জানতেন। ইন্দোচীন দখলের জাপানী পরিকল্পনা এবং বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধে শুরু করার সিদ্ধান্তও তাঁরা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন।

যুকিওয়ারার মতে, শুধু খবর সংগ্রহের ভিত্তিতে নয় "জাপানের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তাঁদের বিপুল জ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষমতার" জন্যই তাঁদের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল।

বার্তা পাঠিয়েই ঘাড়িস্থীল জোর্গে ক্ষান্ত থাকতে পারেননি। তাঁর জাপান সম্পর্কে বিশ্লেষণের যাথার্থ যাচাই করে দেখার জন্য তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মানচুরিয়া সফরেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর মাসখানেকের মধ্যেই, ১৯৪১ সালের ১৮ই অক্টোবর, জোর্গেকে জাপানী পুলিস তাঁর

বাড়ী ৫০, নাগাসাকিমিচি থেকে গ্রেফ্‌তার করল। জাপানী পুলিসের লোকজন তাঁর বাড়ীতে বই-এর পাহাড় দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। গ্রেফ্‌তারের সময় জোর্গের শয্যাপার্শ্বে টেবিলের ওপর খোলা ছিল চিরায়ত জাপানী সাহিত্যে বিখ্যাত কবি রাগ রাগা'র কবিতার বই।

জোর্গের দলের প্রায় সকলকেই জাপানী পুলিস গ্রেফ্‌তার করেছিল। জোর্গের গ্রেফ্‌তার জার্মান দূতাবাসে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করল। জোর্গের গ্রেফ্‌তারে জাপানের অভিযোগ মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে তখনও সম্ভব হয় নি।

যুদ্ধ জয়ের সাফল্যে আত্মহারা জাপানের শাসকেরা দীর্ঘদিন জোর্গের ব্যাপারটি চাপা দিয়ে রাখলো। তারপর বিচার্যবিষয়ের পাকা শুরু হওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে ১৯৪৩ সালে গোপন বিচার-এর অনুষ্ঠান করা হ'ল। জোর্গে ও ওজাকিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল এবং অন্যদের দণ্ডিত করা হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে। ইতিমধ্যে অবশ্য কারাগারের অত্যাচারে ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ এবং আরো কয়েকজন সহকর্মীকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান কবলমুক্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রথম যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভাসিত হয়, সে বছরটি ছিল ১৯৪৪ সাল। এই দিনটিতেই, ১৯৪৪ সালের ৭ই নভেম্বর সুদূর টোকিওতে সুগামো জেলে জোর্গে ও ওজাকিকে হত্যা করা হ'ল।

দীর্ঘ তিন বছর অমানুষিক নির্যাতনের কারাজীবনের মধ্যে বসে জোর্গে তাঁর বক্তব্য ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জার্মানী ঐতিহাসিক ফুজিয়ারা তাঁর প্রবন্ধে জোর্গের বহু বক্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে দিয়েছেন।

জাপানে তাঁদের গোপন কাজের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এই প্রশ্নের জবাবে জোর্গে বলেছেন :

"আমার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত রকম সোভিয়েত-বিরোধী রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ থেকে এবং সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মুক্ত রাখা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।

"সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্য দেশের সাথে রাজনৈতিক বিরোধ বা সামরিক সংঘর্ষ চায় না। আর জাপানকে আক্রমণ করারও তার কোন বাসনা নেই। তাই আমি ও আমার দলের সাথীরা জাপানের শত্রু হিসেবে এখানে আসি নাই। সাধারণ যে অর্থে 'গুপ্তচর' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আমাদের প্রতি সেটা প্রযোজ্য নয়। বৃটেন বা আমেরিকার হয়ে যারা গুপ্তচরের কাজ করে তারা জাপানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল স্থান গুলোই খুঁজে বের করে এবং সেই জায়গায়ই তারা আঘাত করার চেষ্টা করে। আমরা আমাদের সংবাদ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সেইরকম কোন উদ্দেশ্যই পোষণ করিনি। লালফৌজের সদর কার্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান জেনারেল উরিতস্কি যখন ফুলেজের ও আমাকে বিদায়কালীন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছিলেন যে, আমাদের কাজের দ্বারা জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করবার চেষ্টা করতে হ'বে। এবং আমার ইন্‌টেলিজেন্স কাজকর্ম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি দৃঢ়ভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করেছি।"

জিজ্ঞাস্যবাদের উত্তরে জোর্গে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন, কি ভাবে তিনি শান্তি রক্ষার

জন্য চেষ্টা করেছেন, ফুজিওয়ারা তাঁর প্রবন্ধে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় জোর্গে বলেছিলেন, "অবশ্য আমি এটা মনে করি না যে শুধুমাত্র আমাদের দলের প্রচেষ্টাতেই জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিরক্ষা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমাদের কাজের অবদান এ ব্যাপারে রয়েছে। সাধারণভাবে যাদের গুপ্তচর বলা হয়ে থাকে, তাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল এইখানেই—এই আদর্শগত ভিত্তির।"

গ্রেফ্‌তারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জোর্গে যে বার্তাটি মস্কোতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তা হল ; "জাপানে আমাদের ব্রত সফল হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ এড়ান গেছে। মস্কোতে ফিরিয়ে নেওয়া অথবা জার্মানীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

জাপানী ঐতিহাসিক ফুজিওয়ারা তাঁর প্রবন্ধটির উপসংহারে লিখেছেন : জোর্গে ও তাঁর সহকর্মীদের কার্যকলাপের লক্ষ্য শুধুমাত্র তাঁদের গোপনীয় সংবাদাদি সংগ্রহের কাজের অত্যধিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জোর্গে ও তাঁর সহকর্মীরা শান্তির স্বার্থে অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য কাজগুলি করে যাচ্ছিলেন এবং এই কাজে তাঁরা এমন এক অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন যা তাঁদের কাছে সেদিন সমগ্র মানবতার জন্যই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।...তাঁদের মতাদর্শ ও কার্যকলাপ ছিল শান্তিরক্ষার পক্ষেই এক সক্রিয় অবদান। আজ, শেষ পর্যন্ত তা এই মূল্যায়নেরই দাবি রাখে।" এই মতামতের স্বার্থেই আজ আমাদের এবং জাপানী ঐতিহাসিকের সায় দিতে হয়।

ম্যাক আর্থারের ইনটেলিজেন্সের চীফ-অফ-স্টাফ, মার্কিন জেনারেল চার্লস উইলোবি জোর্গে সম্পর্কে বলেছেন : "অসাধারণ রকম সংগতি সম্পন্ন এজেন্ট রিহার্ড জোর্গের নেতৃত্বাধীন দলটি প্রকৃতই বিস্ময়কর কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিল।"

এই বিস্ময়কর কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবিশ্বাস্য শক্তির উৎস ছিল কি, ঐতিহাসিক ফুজিওয়ারা সেটাই বলার চেষ্টা করেছেন। সত্যিই, জোর্গে ছিলেন বিশ্ব-শান্তির এক অক্লান্ত যোদ্ধা।

জাপানের বিখ্যাত 'তামা সমাধিক্ষেত্রে' এক ধূসর গ্রানাইট ফলকে জাপানী ভাষায় লেখা রয়েছে : "যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সারা বিশ্বে শান্তির জন্য যে বীর যোদ্ধা জীবন দিয়েছেন, তিনি এখানে শায়িত রয়েছেন। জন্ম বাকুতে, ১৮৯৫ সালে। জাপানে আসেন ১৯৩৩ সালে। গ্রেফ্‌তার হন ১৯৪১ সালে। ফাঁসী দেওয়া হয় ১৯৪৪ সালের ৭ই নভেম্বরে।"

জোর্গের গুণমুগ্ধ অগণিত নর-নারী আজো জাপানে রয়েছেন। জোর্গেকে ফাঁসী দেওয়ার পর তাঁকে কবর দেওয়া হয় সাধারণ এক সমাধিক্ষেত্রে। তাঁরই অন্যতম গুণমুগ্ধা হাজারো কিশি দীর্ঘদিন ধরে বহু আবেদন নিবেদনের পর জোর্গের দেহাবশেষ সেখান থেকে তুলে নিয়ে 'তামা'-তে পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়।

শুভ্রকেশা কিশি এখনও প্রায়ই জাপানী প্রথা অনুযায়ী রিহার্ডের সমাধিতে গিয়ে পাথরের ফলকে জল ঢেলে দেন, বিছিয়ে দেন ফুল আর জ্বেলে দেন সুগন্ধ ধূপ।

উপলব্ধি

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ঘরে আর বাইরে কান্তি ঘোষালের দুটি রূপ। বাইরে তিনি সাহেব। প্রচণ্ড তাঁর দাপট, কড়া তাঁর মেজাজ। গোটা পৃথিবীটা বারকয়েক ঘুরে এসে তাঁর কর্ম পদ্ধতির ধারা অনেকখানি পাল্টে গেছে। দুনিয়ায় যা কিছু ভাল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সবই তাঁর আশে পাশে দেখতে চান। রাতারাতি এতবড় পরিবর্তন ঘটান যে সম্ভব নয় এ কথা তিনি মানতে চান না। তিনি মনে করেন যে, অসম্ভব ব'লে দুনিয়ায় কিছু নেই। প্রয়োজন শুধু ঐকান্তিক চেষ্টার।

সাংসারিক জীবনে কান্তি ঘোষাল একেবারে পুরোদস্তুর বাঙালী। স্ত্রীকে তিনি করেন, ছেলে মেয়েদের গভীরভাবে ভালবাসেন। আর মুখে তা স্বীকার করেন না। সর্বদা একটা নির্লিপ্ত অনাসক্ত ভাব। যেন কোন কিছুতেই তাঁর এসে যায় না। অথচ দাম্পত্য জীবনের ছোটখাট ত্রুটী বিচ্যুতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

আসলে কান্তি ঘোষালকে যতই লোকে সাহেব বলুক না কেন, রক্ত তাঁর আজও লালই আছে, নীল হ'য়ে উঠেনি। শুধু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মন হয়েছে মাত্র। তাই স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি স্ত্রীর মত ব্যবহারই চান—ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বাপের সম্মান পেলে তাঁর মন ভরে উঠে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই দিকটার কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তারা ওঁর বাইরের রূপটা নিয়েই সরব। এ নিয়ে অবশ্য বলবার কিছু নেই। বাইরে থেকে তারা যা দেখে তাই নিয়েই সমালোচনা করে।

ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি মিডিয়ামে শিক্ষা পাচ্ছে। তোত ইংরেজি বলে। চালে চলনে অতি আধুনিকতার সহজ প্রকাশ। তাছাড়া কান্তি ঘোষাল নিজেও সোয়াকে আমেরিকান কায়দা কর্মে ইংরেজ। এই মানুষটিই অন্দর মহলে প্রবেশ করে সাধারণের চেয়েও সাধারণ হ'য়ে উঠেন একথা কে বিশ্বাস ক'রতে চায়। মোদ্দা কথা ঘোষাল মশাইর অবস্থাটা বড় বিচিত্র। সংসার তাঁর বাইরের জীবনের সঙ্গে ভিতরের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় ক্ষুব্ধ। আবার বাইরের যারা তারা সমালোচনায় মুখর সহজ মানুষটিকে কাছে না পেয়ে।

কান্তি ঘোষাল সবই দেখেন, বোঝেন এবং অনুভব করেন, কিন্তু তাতে তাঁর অভ্যস্ত চলার ধারায় কোন পরিবর্তন ঘটে না। ছকে বাঁধা ঘটাগুলি একই নিয়মে অতিক্রম করে যায়।

এ হেন সাহেবও সেদিন হঠাৎ এক স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বসলেন। নিজেকে যেন খানিকটা প্রকাশ করেই ফেললেন।

শৈবালের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন কান্তি ঘোষাল সস্ত্রীক। আর এই বিয়েবাড়ীকে কেন্দ্র করেই বিনা মেঘে বড় বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল ওঁর অন্দর মহলে।

ফিরে এসে বাড়ীতে পা দিতেই ঝড় উঠল।

স্ত্রী সবিতা একটুখানি বাঁকা হেসে বললেন, শৈবাল তোমার অধীনস্থ একজন কর্মচারী না?

তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?

আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

এ কথার কোন জবাব দিলেন না কান্তি ঘোষাল। কিন্তু সবিতা থামতে পারলেন না, বললেন, শৈবালের বাড়ীখানা দেখলে?

দেখেছি। ছেলে দেখবার মত সুন্দর বাড়ী করেছে শৈবাল।

বাড়ীতে কখানা ঘর আছে জান?

শুনে দেখিনি।

আমি দেখেছি। সর্বসাকুল্যে দশখানা। বাড়ী না ব'লে আমাদের প্রাসাদ বলাই উচিত।

তোমার নজরটা এখনও ছোট রয়ে গেছে।

তার জন্ত তুমি দায়ী।

আমি! আকাশ থেকে পড়লেন কান্তি ঘোষাল। তোমার এ কথার মানে?

খুব সোজা। তুমি বুঝতে চাওনা বলেই কিছুই তোমার চোখে পড়ে না। দুখানি ঘর আর একখানি ছাদ সম্বল ক'রে যাদের বাস করতে হয় তাদের কাছে শৈবালের বাড়ী প্রাসাদ ছাড়া আর কি হ'তে পারে শুনি?

কান্তি ঘোষালের মুখের ভাব যেন ঘনে হ'য়ে উঠল।

সবিতা থামতে পারলেন না। কণ্ঠস্বরে আরও খানিকটা অসন্তুষ্টির বিষ মাখিয়ে বলতে থাকেন, বিলেতই ঘুরিয়ে আন আর আমেরিকাই ঘুরিয়ে আন বিয়ে করা স্ত্রীর যে তোমাদের কাছে কতটুকু মূল্য তা আমার জানা আছে।

কান্তি ঘোষাল ধমকে দিলেন, অত্যন্ত বেশী হ'য়ে যাচ্ছে সবিতা।

সবিতা তথাপি থামতে পারেন না। বলতে থাকেন, নিজের কথা না হয় বলব না, কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা? তারা কি মনে করে তা জান কি?

জ্বলে উঠলেন কান্তি ঘোষাল—জানবার আমার দরকার নেই। আর তোমাকেও বলি যদি অন্ত কোন কথা না থাকে তাহলে দয়া করে সরে পড়ো।

সরে পড়বো! কেন বল দেখি—তোমার ভয়ে নাকি?

যেমন জ্বলে উঠেছিলেন তেমনি হঠাৎই নিভে গেলেন কান্তি ঘোষাল।

বললেন, থাক যেতে হবে না। বরং আরও ভাল ক'রে চেপে ব'সো। তারপর ভেবে চিন্তে বলো আর কি তোমার চাই। নিশ্চয়ই প্রাসাদ নয়। আমার অধীনস্থ কর্মচারী যখন প্রাসাদের মালিক তখন তোমার আগেই রাজপ্রাসাদে না হ'লে সম্মান থাকে না।

সবিতা অল্পেই সামলে নিয়েছেন। বললেন, ঠাট্টা ক'রতে চাও করো, কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের এ বাড়ীতে নিয়ে আসতে লজ্জা পায়।

কান্তি ঘোষাল জবাব দিলেন, আমার দুর্ভাগ্য যে ছেলে-মেয়েরাও তোমারই মত একই পথে চিন্তা ক'রেছে। অনেক দুঃখে আমাকে আজ একথা ব'লতে হ'চ্ছে সবিতা। তুমি যা পেয়েছ অনেক ভাগ্য ক'রে এলেও মানুষ এতখানি পায় না অথচ তোমার সঞ্চয়ের ঝাঁপিতে কিছুই জমলো না। বরং যা ছিল তাও খুইয়েছ। তুমি না পারলে বাইরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, না পারলে ঘরকে গুছিয়ে রাখতে।

সবিতা বাঁকা চোখে তাকালেন। কথা বললেন না।

কান্তি ঘোষালের তা দৃষ্টি এড়াল না তবুও তিনি বলে চললেন, আমার কথাগুলো তোমার ভাল লাগছে না জানি তাহ'লেও আজ তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। শোনাব আর শুনবও। আর শেষ পর্যন্ত যদি একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয় তাহ'লে খুশী হবো।

তুমি বলো আমি শুনছি।

তোমাকে যখন বিয়ে ক'রেছিলাম তখনকার কথা তোমার মনে পড়ে সবিতা?

পড়ে।

সেদিনের সংসারের চেহারাটা একবার চোখ বুজে ভাব দেখি।

চোখ বুজবার দরকার নেই। এমনিতেই দেখতে পাই।

সে সময়ের দিনগুলি কত সুন্দর ছিল।

রাতগুলি আরও সুন্দর ছিল। কিন্তু সে যুগের সে সবটা কি আজও বেঁচে আছে?

বাঁচিয়ে রাখতে পারনি ব'লে মরে গেছে সবিতা। কিন্তু যে বর্তমানের জন্য তুমি অতীতকে সযত্নে ত্যাগ ক'রলে সেই বর্তমানের কতটুকু তুমি নিতে পারলে?

যা ব'লতে চাও স্পষ্ট ক'রে বলো।

পঞ্চাশ্বর টাকা মাইনের সাধারণ একজন কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে একটা কোম্পানীর পরিচালকের স্ত্রীর অবশ্যই প্রভেদ থাকবে—এ কথা অস্বীকার ক'রতে আমি চাই না। কিন্তু তুমি একটাকে পুরোমাত্রায় বর্জন ক'রলে অথচ যার জন্য ক'রলে তাকেও গ্রহণ ক'রতে পারলে না। তুমি না পারলে ককটেল পার্টিতে গিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে, না পারলে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিতে। কিম্বা দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটিয়ে মধ্য পথকেও আশ্রয় ক'রতে পারলে না।

এটা আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ আর এ অভিযোগ যে তোমার মনে একদিনে জমা হয়নি তাও বুঝতে পারছি।

সবিতার কণ্ঠস্বর ভারী আর থমথমে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার মুখর হয়ে উঠলেন, কিন্তু এই যদি তোমার মনের কথা তবে এতকাল চুপ ক'রে না থেকে পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দাওনি কেন? কেন তুমি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তোমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও ছলনা ক'রলে!

ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছলনা করেছি! তুমিও যে আজ নতুন কথা শোনাচ্ছ! কান্তি ঘোষালের কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

নয় কেন···উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন সবিতা, কেন তাদের ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়েছিলে। কিসের জন্ত তাদের অতি আধুনিকতাকে চোখ বুজে প্রশ্রয় দিয়েছো ?

সবিতাকে থামিয়ে দিলেন কান্তি ঘোষাল। বললেন, হয়তো এ ক্ষেত্রে আমার হিসেবে একটু ভুল হ'য়ে গেছে। জীবনের দুটো দিকের পানে লক্ষ্য রেখে আমি এগোতে চেয়েছিলাম। আমার লক্ষ্য ছিল বাইরের দিকে। ভেবেছিলাম তুমি নেবে ভিতরের দায়িত্ব।

তাহ'লে কিসের জন্ত আমাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো। ব'লবে কি ?

কান্তি ঘোষাল আস্তে আস্তে বলতে থাকেন, সত্যকারের জীবন কি তাই বোঝাবার জন্ত। বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, পোষাকটা আসলে দেহ নয়—দেহ থাকে পোষাকের আড়ালে সবিতা। কৃত্রিমতার ঝোলুস চোখ ধাঁধাতে পারলেও মন ভরাতে পারবে না। জীবনের প্রকৃত রূপ ওখানে অনুপস্থিত। ওর দেখা পাওয়া যায় ঘরের শান্ত অনাড়ম্বর নিবিড় পরিবেশে। এই সত্যকে তুমি উপলব্ধি ক'রতে পারবে এই আশাই আমি করেছিলাম।

এসব তোমার মনের বিলাসিতা অথবা দার্শনিকতা। সবিতা রীতিমত জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, মেয়েরা সূক্ষ্ম কথা বোঝে না। তারা স্থূল বস্তুকেই সহজে গ্রহণ করে থাকে। ক'রতে ভাল বাসে। সেই জন্তেই তোমার দারিদ্র্যকেও যেমন গ্রহণ ক'রেছিলাম আজকের প্রাচুর্যকেও ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ ক'রতে চাই। এখানে কোন ফাঁক আর ফাঁকি থাকলে মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে।

চমকে উঠলেন কান্তি ঘোষাল। তিনি নিজের সঙ্গে একই পর্যায় স্ত্রী আর পুত্র-কন্তাদের বিচার করে মস্ত ভুল করেছেন। কথাটা আজ অনুভব ক'রলেন। শুধু অনুভব ক'রলেন না রীতিমত চিন্তিত হলেন।

সবিতা পুনশ্চ সুরু ক'রলেন, আমার কথা ছেড়ে দাও। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে হয়তো তাল রেখে চলতে পারিনি, কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েদের অপরাধ কি ? তারা জন্মাবধি গাড়ী চড়ছে, বড় বড় সমাজে মেলামেশা ক'রছে, আধুনিকতম স্কুল কলেজে শিক্ষা পাচ্ছে—আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাইবার আগেই পাচ্ছে···তারা কেন ভাবতে যাবে তুমি কবে কি ছিলে ? তোমার বড় মেয়ে সেদিনে কি ব'লছিল জান ?

কান্তি ঘোষাল ক্লান্ত ভাবে জবাব দিলেন, তুমি ত আমায় বলো নি।

তুমি হয়তো দুঃখ পাবে তাই বলিনি, সবিতা বললেন, কথাটা উঠেছে বলেই বলছি। দুঃখ ক'রে বলছিল, আমাদের সকলের জন্ত মাত্র দু'খানি শোবার ঘর। আর কুমু ব্যানার্জির একলার জন্তই চারখানা। একটা তার শোবার ঘর, একটা পড়ার, একটা পোষাক বদলাবার, আর একটা···

বাধা দিলেন কান্তি ঘোষাল, থাম সবিতা, থাম। এমনি বড়লোক আমি দিনরাত দেখছি। তোমার কুমু ব্যানার্জির বাবার চেয়ে তারা ঢের ঢের পয়সাওয়ালা লোক। অপ্রয়োজনে প্রচুর অপচয় করেন কিন্তু তা দেখে আমার ঈর্ষা হয়না। দুঃখ পাই। যে দেশে একটু মাথা গোঁজার স্থান নিয়ে এত কাড়াকাড়ি সেখানে এই ধরণের বিলাসিতা শুধু অন্যায় নয় পাপ।

ও --সেই জন্যেই বুঝি তোমার ডালহৌসী-পিলো আর ম্যাটরেসে এত বিরাগ! সবিতার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের ঝাঁজ।

কান্তি ঘোষালের কানে তা খোঁচা মারলেও তিনি গ্রাহ্য ক'রলেন না। বরং স্ত্রীর অনুযোগ যেন নিজেই চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন, কথাটা যে তারেই তুমি ব'লে থাক মিথ্যে বলো নি সবিতা। ঘরের মধ্যে সব কিছু ঘরোয়া হ'লেই আরাম পাই। তাই ঘরে ফিরেই আমি সুট ছেড়ে পুঁথি পড়ি। উদলো গায় মাটিতে বসে বিড়ি খাই। ক্লান্তি বোধ ক'রলে মেঝেতে শুয়ে থাকি।

কান্তি ঘোষাল থামতেই সবিতা কথা ক'য়ে উঠেন, এখুনি থামলে কেন? নিজে হাতে ফুল গাছের পরিচর্য্যা ক'রে বাগান তৈরী করেছ—

সুখের কথা ছেড়ে দিয়ে কান্তি ঘোষাল বলেন, ওটা আমার সবচেয়ে বড়, অ্যাচিভমেণ্ট সবিতা। আমার ঘরের মধ্যে স্বর্গ নেমে এসেছে। সবটাই আমার কৃতিত্ব। চাকর না, মালি না, শুধু আমার দুখানি হাত।

সবিতা বিদ্রূপ করলেন, রাজ প্রাসাদের রাজোদ্যান।

তুমি ঠাট্টার ছলে একটা সত্যকথা বলে ফেলেছো। কান্তি ঘোষাল বললেন, প্রাচুর্য্যের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেতে চাই না বলেই আমার এত সাবধানতা।

তোমার এই উদ্ভট খেয়ালকে অনেকেই পাগলামী বলে তা কি জান তুমি। সবিতা বললেন।

কান্তি ঘোষালের মুখে ভারী সুন্দর একটুকরো হাসি দেখা দিল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন; এ খবর আমার জানা ছিল না সবিতা। এই প্রথম শুনলাম। শুনে ভালই হ'লো। হয়তো এখনও আমার ভুলের একটা প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হবে। যেটার শেষ স্থান নেতায়। কিন্তু আর না সবিতা। তুমি এবারে শুতে যাও।

আর তুমি?

আমি? আমার আজ একলা থাকার প্রয়োজন আছে।

সবিতা আর দাঁড়ালেন না। একটু যেন অসন্তুষ্ট হ'য়েই চলে গেলেন। আর কান্তি ঘোষাল ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারী সুরু ক'রলেন। আজ কিন্তু রজনীগন্ধার সিগ্ধতা ওঁর মনে দোলা দিল না। সোলাপের মাদকতাও তাঁকে আকর্ষণ ক'রতে পারেনি। কান্তি ঘোষাল বেঁচে রয়েছেন বটে, কিন্তু মন তাঁর বহুদূরে চলে গেছে। তাঁর জীবনের প্রথম সুরুতে। সেখান থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রত্যেকটি চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে এসেছেন কান্তি ঘোষাল। তিনি হিসেব করতে বসেছেন; বিচার ক'রতে বসেছেন। বিচার করে দেখতে চান ওঁর অতীত আর বর্ত্তমানের কর্ম্মধারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে। কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রতে গিয়ে কতটুকু তিনি পেয়েছেন আর কতখানি খুইয়েছেন। তাঁর আত্মকুটির উঁচু চূড়াটি যেন আজ তাঁরই মাথার উপর ভেঙে পড়েছে। বাইরে তিনি প্রচুর বালির পলস্তারা লাগিয়েছেন কিন্তু ভিতরটা ছিল অরক্ষিত। সোনা ধরে ভেঙে পড়তেই আজ টের পেয়েছেন। জেগে উঠছেন।

শিক্ষায়, ব্যবহারে চলায় বলায়, জীবনযাত্রার সবদিক থেকেই ওরা আজ দূরে সরে গেছে আর সরে যেতে আপন অজ্ঞাতে সাহায্য করেছেন তিনি নিজেই।

সবিতা বলছেন, সংসারের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ কান্তি ঘোষাল ক'রেছেন সংসারেরও তার বিরুদ্ধে আরও ঢের বেশী অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু যুক্তি বিচারের গোলকধাঁধায় আর তিনি অন্ধের মত পাক খেতে চান না।

সবিতার জন্ত তিনি ততটা ভাবছেন না যতটা ভাবনা তাঁর ছেলে-মেয়েদের জন্ত। যাঁরা কান্তি ঘোষালের অজ্ঞাতসারে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে সরে গেছে।

অনেক ফুল ফুটেছে। নানা জাতের নানা বর্ণের। বিভিন্ন ধরণের সৌরভ ভেসে আসছে। প্রচুর যত্ন নিয়েছেন তিনি প্রত্যেকটি গাছের জন্ত। মুগ্ধ হ'য়েছেন সৌন্দর্যের, তৃপ্ত হ'য়েছেন গন্ধে। ঐ যে অত বড় বড় গোলাপ ফুটে রয়েছে তার পিছনে অনেক চিন্তা অনেক পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে তাঁকে। মাটি পাল্টেছেন, সার বদলেছেন তবেই না মনের মতন ফুল ধরেছে। নইলে শুরুতে যে আকারের ফুল ধরেছিল তাতে কান্তি ঘোষাল হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন বৈকি।

চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে যেন খানিকটা আশার আলো দেখা দিল। আর অপেক্ষা না করে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ পেয়েছেন কান্তি ঘোষাল।

আর বিচুড়ি নয়—এবারে পরমান্ন। যন্ত্রিন রেখে যথাতথ। ছেলে সাজবেন তিনি তাঁর সংসারের ফুল বাগান। আর অনুষ্ঠান নয়। তার সন্তানদের কাঁচা মন নিয়ে খিচুড়িই নয়।

দরেটো নয়, ভায়েসেনও না। একেবারে রায়কৃষ্ণ মিশন। কান্তি ঘোষাল শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে পরম নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়লেন।

• • •

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক টলষ্টয়কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি যে যুদ্ধ ও শান্তির কথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, আপনিই বলুন, পৃথিবীতে সত্যি লোকে কি চায়? যুদ্ধ চায়, না শান্তি চায়।

টলষ্টয় হেসে বললেন—পৃথিবীতে বাস করতে হলে শান্তির চেয়ে বেশী কাম্য আর কি হতে পারে।

—তবে মানুষ যুদ্ধে মেতে ওঠে কেন?

—শান্তির মাহাত্ম্য সহজেই বুঝবে বলে।

—তবে কি দুটোরই প্রয়োজন?

—না, শুধু শান্তির। তবে যে পথে সহজেই শান্তি আসতে পারে, সে পথ ছেড়ে মানুষ ছোটে ভুলপথে। যুদ্ধের ভীষণতা ভাল করে বোঝবার পর যে শান্তি আসে, সেইটেই হোল স্থায়ী শান্তি। পৃথিবীতে অনেক রণতাণ্ডব দেখা গেছে, এবার আসছে শান্তির দিন, মানুষ বুঝেছে শান্তির আশীর্বাদ।

•

অভিনেত্রীর জীবন সংগ্রাম

নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ বিলাস ব্যসন আর সুখ সমৃদ্ধির সপ্তম স্বর্গ থেকে মেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়ে নিঃসঙ্গে ঘরের কোণে দিনযাপন।

ভাবতেই অবাক লাগে।

ফেরা যায়। কিন্তু সোজা পথে নয়। অন্ধকারে ঢাকা চোরা পথের আশ্রয় নিলে আবার সব ফিরে পাওয়া যায়। অন্ত যে কেউ হলে সে পথ ধরতে দ্বিধা করত না। বিপাকে পড়লে অন্ত আর বিচার মানা যায় না। মূল্যবোধের কিছু ঘাটতি হলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয় না। এ সবই করে থাকে।

অভিনেত্রী অ্যানা নীগল কিন্তু সে পথে গেলেন না।

ঝড় উঠেছে। তুফানে তরী ডুবেছে। অকূল পাথার। কিন্তু অ্যানা ভেঙে পড়লেন না। স্বামীর হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সে ধাক্কা সুবিপাকেও ভুলেন না জীবনের মূল্যবোধ।

• • • •

ছোট্ট একটি ঘটনা সেই সময়কার।

একটা চিরকুট, সঙ্গে একটি এক পাউণ্ডের নোট আলপিন দিয়ে গাঁথা। চিরকুটে লেখা—"প্রিয় মিস নীগল, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। বহুদিন ধরে আমি আপনার ভক্ত। আপনি এবং আপনার স্বামী আপনাদের চলচ্চিত্র এবং নাটকাভিনয়ের ভিতর দিয়ে আমাকে বহুদিন ধরে বহু আনন্দ দিয়েছেন। আপনাদের বিপদের কথা জেনেছি। তাই সামান্য কিছু সাহায্য পাঠালাম। দয়া করে গ্রহণ করবেন।"

সেই সময় অ্যানা নীগল এবং তাঁর স্বামী হারবারট উইল কক্স্ একটি ব্যবসায়ে ২৫০০০ পাউণ্ড লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এবং সেবার আদায় উইল কক্স্ মেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মন উদ্‌ভ্রান্ত। মাথার মধ্যে চিন্তার জট পাকাচ্ছে। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ঐ চিঠি আর টাকাটি অ্যানার কাছে পৌঁছল। চিঠিখানির প্রতি বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনে হল এ ত শুধু একটি মানুষের শুভেচ্ছা নয়। এ একটি বিশেষ বার্তা।

চিত্তের সমতা ফিরে পেলেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন।

১৯৬০ সালের কথা তখন তাঁর বয়স ৫২। সন্তান-সন্ততিহীন ১৭ বছরের বিবাহিত জীবন। সে জীবন নিরবিচ্ছিন্ন সুখের। উইল কক্স্ দম্পতির মত সুখী দম্পতি বোধকরি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না এ কথা বলত অনেকেই।

তিরিশ বছর ধরে চলচ্চিত্র এবং মঞ্চে সমান সাফল্যের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন অ্যানা নীগল। সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও অর্থ সৌভাগ্য।

কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। মানুষের চেতনা, মতিগতি ভিন্ন পথে চলেছে। রুচি কোথা থেকে কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যায়। ক্রুর অবিশ্বাস আর রূঢ় বাস্তবতা, খালীনতা, সন্ত্রাস্ততা এবং মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে হটে গেছেন অ্যানা নীগল। ১৯৪৯ সালে তাঁর শেষ ছবি 'হার্ট অফ এ ম্যান' ব্যর্থ হল। ১৯৬০সালে তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয় দর্শককে আকর্ষণ করল না।

• • • •

পাঁচ বছর পরে আজ লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডে একটি নতুন গীতি-নাট্যের উদ্বোধন হয়েছে। নাম "চারলি গার্ল"। এই নাটক দেখবার জন্যে সাড়া পড়েছে। অগ্রিম টিকিট কেনার জন্যে দীর্ঘ লাইন পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে এই গীতিনাট্যের সাফল্য অবধারিত।

নিয়ন আলোয় নায়িকার নাম বড় বড় হরফে জ্বলছে।—অ্যানা নীগল।

অ্যানা নীগলের এ এক অপ্রত্যাশিত ফিরে আসা আর প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত জয়।

সেই সঙ্গে জয় মানুষের নীতিবোধের রুচিবোধের সাহসের এবং সততার।

আজকের এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ী জীবনের জগৎজোড়া উন্মার্গগামিতার সামনে এ এক প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ।

• • • •

বছর পাঁচেক আগেকার কথা। অ্যানা এবং হাবব্যারট তখন থাকেন লণ্ডনের বিলাস পল্লীতে পার্ক লেনের বাড়ীতে। বাড়ী তো নয়, যেন অলকাপুরী। বিলাসবহুল জীবন-যাত্রার বিপুল আয়োজন বন্ধুবান্ধব সমাগমে সে বাড়ী নিত্য মুখর।

বহুদিন ধরে একটানা সাফল্য আর অর্থ পেয়েছেন তাঁরা। অ্যানা নীগল এমন একটি নাম যা প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারিত হয় সর্বত্র।

কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। সেই সঙ্গে মানুষের রুচিও। অ্যানা বুঝতে পারছেন যে তাঁরা ক্রমে পুরনো হয়ে যাচ্ছেন, সরে যাচ্ছেন, লোকের মুখে নামটাই তাঁর সার।

এই সময় এক টেলিভিসন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক প্রস্তাব এলো। দশ হাজার পাউণ্ড দর্শনী। টেলিভিসনে এক বিলাস দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে তাঁকে দর্শন দিতে হবে এবং সেই জিনিষটির সম্বন্ধে প্রশংসা সূচক দুচার কথা বলতে হবে।

অ্যানা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, যে জিনিষ তিনি কোনদিন ব্যবহার করে দেখেন নি বা যাকে তাঁর তেমন ভাল মনে হয় না, সে জিনিষ সম্বন্ধে তিনি কেমন করে এমন প্রচার কার্যে নামবেন।

বিজ্ঞাপনদাতা অবাক হল। এতো সবাই করে। বড় বড় অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পী কেউ তো 'না' বলে না।

তা না বলুক। কিন্তু অ্যানা পারবেন না, নিজের মনের কাছে, বিবেকের কাছে এতখানি খেলো হতে পারবেন না তিনি।

বিজ্ঞাপনদাতা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল। কিন্তু সেই ঘটনা থেকে স্বামী স্ত্রী একটি নতুন পরিকল্পনার সন্ধান পেলেন। নামের জোরে যদি কোন পরিকল্পনাকে সার্থক করা যায় তাহলে অ্যানা নীগলের নাম দিয়ে একটি নাচের ইস্কুল খুললে কেমন হয়।

নৃত্য যে শরীর এবং মনকে সঞ্জীবিত করতে পারে, নৃত্য যে মানুষের মনকে উচ্চতর ভাবলোকে পৌঁছে দিতে পারে—এ বিশ্বাস অ্যানার চিরদিনের। স্বামী হারবার্টও তা জানতেন। বললেন—'এবিষয়ে তো তোমার বিশ্বাস আছে। এবং যখন বিশ্বাস আছে তখন এ পরিকল্পনা ভেবে দেখবার মত।'

ভেবে দেখলেন দু'জনে। এবং অ্যানা রাজী হলেন।

ওঁরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান খুলবেন যেখানে শুধু কম বয়সের মেয়েরাই নয়, বয়স্কা মহিলারাও আসবেন, নাচের মধ্যে দিয়ে জীবনের হারানো দিনকে খুঁজে নিতে পারবেন, নতুন করে আবার জীবনকে অনুভব করতে পারবেন।

ওল্ড বণ্ড ষ্ট্রীটে ইস্কুল খোলা হল। বিরাট আড়ম্বর হ'ল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। লণ্ডনের অনেক বড় বড় লোক সেই প্রতিষ্ঠানে ডিরেক্টররূপে যোগ দিলেন। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'ল না কোনদিক থেকেই। কয়েকমাস ধরে দিনরাত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে অ্যানা ইস্কুলটির সংগঠনের কাজে মেতে রইলেন।

কিন্তু ওঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল। ইস্কুল চলল না, একবছরের হিসাব নিকাশের খতিয়ান নিয়ে দেখা গেল—প্রভূত লোকসান।

কেন এমন হল? তার কারণ নির্ণয় করা গেল না। বোধ করি ইস্কুল এমন পাড়ায় স্থাপিত হয়েছিল যার অতি আভিজাত্য-জনসাধারণকে সেদিকে টানলো না। বোধ করি বিরামকাহনের ঘড়াকড়ি সকলকার ধাতে সইল না।

অনেকে বললে, লোকসান যখন হচ্ছে তখন নৃত্যশিক্ষকদের মাইনে কমিয়ে দেওয়া হোক, লোকজন ছাঁটাই করা হোক, খরচ কমানো হোক।

কিন্তু অ্যানা রাজী হলেন না, খরচ কমাতে ওঁর আপত্তি নেই। কিন্তু ছাঁটাই করে নয় আর শিক্ষকদের মাইনে কমিয়েও নয়। ওঁরা কী অপরাধ করেছে!

মাসের পর মাস লোকসান। এমন করে আর কতদিন চালানো যায়। অবশেষে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টরবর্গ সভা করে ইস্কুলটিকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ইস্কুলটিকে লাটে তুলে দেওয়া হল।

সেই দিনটির কথা অ্যানা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না।

ভেবেছিলেন ডিরেক্টরবর্গ আরো ভাল করে সবদিক বিবেচনা করে দেখবেন এবং কীভাবে লোকসান বন্ধ করা যায় তার কথায় উদ্‌জীবনের জন্যে হয়ত আরও কিছু সময় নেবেন।

কিন্তু তা হ'ল না। ওঁরা আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। অ্যানার কোন কথাই ওঁরা আমল দিলেন না।

সভা থেকে বেরিয়ে অ্যানা যখন পথে এসে দাঁড়ালেন, তখন ওঁর দু'চোখে গাঢ় অন্ধকার। সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। মাথাটা ঘুরছে। সারা দেহ কাঁপছে। বুঝি এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

কোন রকমে বাড়ি এসে পৌঁছোলেন, সারা রাত জেগে কাটালেন। ওঁর জীবনের সঞ্চয় ২৫ হাজার পাউণ্ড সেই নাচের ইস্কুলে ডুবে গেল—দুঃখ সেজন্যে তত নয়। দুঃখ—মানুষের চরিত্রের সেই দিকের উদ্‌ঘাটনে যেদিকটা দেখবার কল্পনা অ্যানা কোনদিন করেননি—টাকার বেলায় বন্ধুত্ব প্রীতি এসব কিছুই খাটে না, টাকা আগে তারপর ওসব হৃদয়বৃত্তি।

কিন্তু, টাকা-সর্বস্ব মানুষ ছাড়াও অন্য মানুষও আছে পৃথিবীতে। এবং আছে বলেই তো

অ্যানা নীলসের জীবনদর্শন আজো বিকৃত হয়ে যায় নি। আছে তাঁর স্বামী, আছে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীরা। তারা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। বিপদ দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

স্বামীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে অ্যানা বলেছেন, আশ্চর্য, আশ্চর্য ভাল লোক এই হ্যারবারট উইল কক্স, তাঁর সহানুভূতির জোরেই তো আজো আমি বেঁচে আছেন। সাহস দিয়েছেন আমাকে, শক্তি দিয়েছেন, স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁর হাহাকারের দিনগুলি।

উইল কক্স নিজে তখন বেউলে। ছবি করতে গিয়ে মার খেয়েছেন প্রচণ্ড। দু'দুটো ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

একদা যাঁর প্রযোজিত ছবি নিয়ে পরিবেশক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো আজ তারা তাঁর নাম শুনে নাক সিঁটকায়!

বেউলে খাতায় নাম লেখালেন হ্যারবারট। আমার কোন কাজ নেই—না ছবিতে, না বা মঞ্চে!

কিন্তু তাহলেও তাঁরা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছোন নি। হ্যারবারটের অনেকগুলি ছবি দেশ-বিদেশের নানা স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছিল এবং তা থেকে টাকাও আসছিল।

তাঁরা নিজেরা কৃচ্ছ্রসাধন করে সেই টাকায় ঘর শোর করে চলেছেন। তাছাড়া গত দু' বছর অ্যানা নীলস নিজের দল নিয়ে বহু সফর করেছেন এবং সেই সব সফরে আশাতীত অর্থ পেয়েছেন। শীত ফুরিয়ে বসন্ত আসছে।

দুঃখের দিনের কথা উঠলে তাঁর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, বলেন, "গহনা বিক্রী করেছি, ভাল ভাল ফার্নিচার বিক্রি করেছি কিন্তু মনে কোন দিন গ্লানি অনুভব করি নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইনি। দেখেছি, কত লোক আমাদের চেয়েও আরও কত অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে হাসিমুখে। দেখেছি, হাসপাতালে কত রোগী অকাতরে তাদের রোগ যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাদের দেখে সান্ত্বনা পেয়েছি, সাহস পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি। ধর্মে বিশ্বাস আছে বলে মনে জোর পাই, অবলম্বন পাই যার সাহায্যে অনেক সংকট পার হতে পেরেছি।"

আরও বলেছেন, "সংকটের দিনে আমি কেমন করে মনের সাম্য বজায় রেখেছি? কাজ। কাজ করে। কাজ আর কাজ! একটুও না ভেবে, অলস চিন্তায় কাল না কাটিয়ে কঠিন পরিশ্রম করেছি। দেখেছি, কাজের মধ্যে জীবনের চরম আনন্দ। এই কাজ করে যারা আনন্দ না পায়, যার কাজ চোরা হয় তাদের জীবন সম্পূর্ণ নয় কোন দিন, জীবনকে পরিপূর্ণরূপে তারা জানল না। আর জানল না, তারা কি হারালো! এই জীবনের প্রতি মুহূর্তে আছে অসীম সম্ভাবনা, সুযোগ আর জীবনদর্শনের আনন্দ! কাজের মধ্যে দিয়েই তাদের পাওয়া যায়। অলসবিলাসে বিকর্মা যারা তারা সে সবের কিছুই জানে না, জীবনের পরম অর্থ, পরম তাৎপর্য, পরম প্রাপ্তি তাদের কাছে চিরদিন নাগালের বাইরেই থাকে।"

তাঁর শেষ কথা তিনি বলেছেন—"চার্লি গার্ল গীতিনাট্য সফল হয়েছে। প্রচুর পয়সা আসছে। দেনা শোধ করতে পারবো। তারপর? তারপর যখন বসন্ত আসবে, তখন আমি আর হ্যারবারট চলে যাব গ্রামে। সেখানে গিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল মাঠ আর বনের মধ্যে দু'জনে বেড়াবো। পাখীর গান শুনবো, কচি ঘাস তুলে বুনো হরিণদের খাওয়াবো। গ্রামের কুটিরের সামনে বসে বাড়ীর বুড়িগিন্নীর সঙ্গে গল্প করব।"

পুরাতন পাতা

আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন খুব বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদিগের মধ্যে সামাজিক পংক্তি ভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা একটা মোটা মূলী বাঁশের উপরে দশ পনের জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিত। কলাপাতায় খাদ্যাদির পরিবেষণ হইত, আবদুকাঁসার বা পিতলের ঘটীতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটী হইতে চারি পাঁচজন মিলিয়া পান করিত। একবার এই জমিদার জাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া, প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র পিঁড়ি পাতিয়া, গ্লাস সাজাইয়া করজোড়ে গলদশ্রীকৃত-বাসে বসিতে অনুরোধ করিলেও ইঁহারা নড়িলেন না। তখন তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে ইহা জানিবার জন্য তিনি অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া কহিলেন যে, "তুমি আমাদিগের অপমান করিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে; আমরা গরীব, তোমাকে যখন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখন তো এইরূপ পিঁড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে আমাদের আর সামাজিকতা চলে না; আমরা তোমাদের বাড়ীতে আর জল-গ্রহণ করিতে পারি না।" জমিদার মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে যে তিনি স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। পরে প্রাচীন রীতি অনুসারে মূলী বাঁশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল।

বিপিনচন্দ্র পাল

গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন। যাঁর কবিতায় ধর্ম নাই, প্রাণ নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে? যাঁর কবিতায়, গানে, রচনায় ধর্ম আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির বৈশিষ্ট্য আছে তাহাকেই বলি মহাকবি। আমি আমার "নারায়ণ" পত্রিকায় দেখাইয়াছি কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এইভাব বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা জাগিয়া উঠে, আবার মলিন হইলে গিরিশ যোগে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গানে আমরা জাতীয়তা পাই, বাঙ্গলার প্রাণ পাই, দেশের একটা স্বরূপ মূর্তি দেখিতে পাই আর ধর্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাই।

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই। কলা-কলাই, ইহার অপর মহৎ উদ্দেশ্য নাই এই যাহাদের অভিমত তাঁহারা ঘোর অত্যবাদী, ভারতবর্ষের 'কালচার' সম্বন্ধে তাহাদের বলিবার অধিকার নাই। ধর্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য, যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকই মারাইয়া ফেলেন। এই বৈশিষ্ট্যেই গিরিশচন্দ্রকে যশের অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা বা সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। তিনি দেশবাসীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া দেশীয় ভাবে, খাঁটি দেশের ভাষায়, দেশের্বাজনায় বসিয়াই দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন, দেশবাসীর প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই গিরিশ মহাকবি—দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। দেশ দেবী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্য জাতি এই যাদুমন্ত্রে আসিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় আমাদের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। তখনই তাহারা গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে, বুঝিতে পারিবে তিনি কত বড়।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

• • •

মেক্সিকোর অরণ্যে যারা শিকারে বা কাজে যেত, তারা প্রায়ই অল্পস্বল্প একপ্রকার কঠিন জ্বরে। সে জ্বর একবার ধরলে কোন ঔষধেই সারত না।

এ জ্বরের জন্যে কি করা যায় এই কথাই তখন চিকিৎসকমহলে চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল।

এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হলে, গবেষণা করতে হলে চাই সুস্থ শরীর,—চাই আত্মোৎসর্গের প্রেরণা।

জোসেফ কনরাড্ নামে একটি যুবক তার দেহভরা স্বাস্থ্য আর অটুট জীবনীশক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

—এতে তোমার জীবন যেতে পারে জান?—দৃঢ়স্বরে বললেন চিকিৎসকের দল।

—আমি সব সময়েই প্রস্তুত। আমার জীবন দিয়ে যদি আর্তের উপকার করতে পারি,—সেইটেই আমার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিষ।

—তুমিই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাগরিক। তুমিই উজ্জ্বল করলে দেশ ও জাতির মুখ।

জোসেফ কনরাড্ প্রাণ দিলেন বটে, কিন্তু সেই দুঃসাধ্য জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার হল।

চলতি দুনিয়া

ক্যামেলিয়ার দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একখানি সবুজ পান্নার মতো দ্বীপ ওশিমা। জাপান-এর ওই দ্বীপ গ'ড়ে উঠেছে একটি আগ্নেয়গিরির বুকে। টোকিয়োতে চুকতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে ওই দ্বীপের দিকে। দ্বীপের পাহাড়গুলিতে বছরের একটা সময়ে ফুটে থাকে রাশি-রাশি ক্যামেলিয়া ফুল। এই জন্যই ওশিমার আরেক নামই হলো ক্যামেলিয়ার দ্বীপ। ফুল যখন ফোটে তখন প্রজাপতির সঙ্গে-সঙ্গে বহু লোকও চলে আসে দ্বীপে। দ্বীপের রমণীরাও ক্যামেলিয়ার মতো অবকাশরঞ্জিনী। দ্বীপের মেয়েদের কালো চুলের খ্যাতি ওই অঞ্চলে সুবিদিত। ক্যামেলিয়ার তেলে তারা কেশ সিক্ত করে। নানারকম নাচ দেখিয়ে মেয়েরা মনোরঞ্জন করে পর্যটকদের। কালো চুলের ফাঁকে উঁকি দেয় ক্যামেলিয়া।

যে-কোনো রঙের দেশ

মুখের চেহারা স্বাভাবিক রেখে একেবারে বদলাবার আবার খুশিমতো আগেকার মুখ ফিরে পাবার উপায় এখনো বেরোয়নি। তবে চুলের চেহারা বদলাবার উপায় জার্মানীতে সত্যি-সত্যি উদ্ভাবিত হয়েছে। সেখানে এখন মেয়েরা খুশিমতো কালো কিংবা লাল চুলের অধিকারিণী হতে পারেন।

অতিথি-গৃহ

সবুজ গাছপালায় ঘেরা একটি প্রাসাদোপম বাড়িকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন ক'রে সাজিয়েছে পৃথিবীর বিশিষ্ট অতিথিদের বাসগৃহরূপে ব্যবহারের জন্য। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে উঠবেন ওই সুসজ্জিত বাড়িটিতে। পরিচয়-অপরিচয়ে ঘেরা বাড়িটি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৌতূহলের হবে। প্যানসিলভানিয়াতে অবস্থিত ওই বাড়িটির সঙ্গে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জড়িত। ওই 'ব্লেয়ার হাউস'-এর একটি ঘরে বসেই আব্রাহাম লিঙ্কন দাসমুক্তির ঘোষণার প্রথম খসড়াটি রচনা করেছিলেন।

পাথরে প্রাণপ্রাম

যা কিছু প্রাচীন আমাদের দেশে তাই যেন অবহেলিত। য়ুরোপে কিন্তু মৃত্যুকে জীবনে রূপান্তরিত করার সাধনা চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে ঐতিহাসিক প্রাচীন গৃহগুলির

সংস্কার করে তাদের নতুন জীবনীশক্তি দেবার উদ্যোগ চলেছে, চলেছে অতীতকে সংরক্ষণের চেষ্টা।

বিবাহিতেরাই বেশি সুখী

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক অভিনব গবেষণা চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অবিবাহিত পুরুষ বা নারীরা বিবাহিতদের চাইতে সুখী অনেকের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং বিবাহিত ব্যক্তিরাই অনেক বেশি সুখী এবং তারাই বেশি সামাজিক এবং দেহের ও মনের সজীবতা তাদেরই বেশী।

এবারে আমাদের দেশে রেলে মেয়েদের জন্য নতুন ব্যবস্থা

মেয়েরা বিপদে পড়লে কিংবা তাদের প্রয়োজন হলে জানাবার জন্য কয়েকটি ট্রেনে মেয়েদের কামরায় একটি নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুইচের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা টিপলে গার্ডসাহেবের কামরায় সঙ্গে-সঙ্গে একটি ঘণ্টা বেজে উঠবে। তা ছাড়া যে কামরাটি থেকে মহিলাটি সুইচ টিপেছেন তার গায়ে একটা লাল বাতিও জ্ব'লে উঠবে। পেকল টানার পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থাটি নিশ্চয়ই অনেক ভালো।

লণ্ডনে কৃষ্ণাঙ্গিনী পুলিশ

লণ্ডনে এতদিন যে সব মেয়ে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করতো তারা সকলেই ছিলো শ্বেতাঙ্গিনী। সম্প্রতি বার্বাডস এবং ভারত থেকে কিছু কৃষ্ণাঙ্গিনী তাদের দলে যোগ দিয়েছে। ওই শহরের লোকদের চোখে প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা অভিনব বলেই মনে হয়।

অদ্ভুত হাঁচি

দশ সপ্তাহ হলো জুন ক্লার্ক নামে একটি মেয়ে হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে হেঁচেই চলেছে। আগে প্রতি পাঁচ থেকে বারো সেকেণ্ডের মধ্যে একবার সে হাঁচতো, এখন দুতিন মিনিটে একবার হাঁচে। তার এই হাঁচির রোগটা নাকি হয়েছে কিডনীর গোলমালের জন্য।

রাস্তার মাঝখানে সন্তান প্রসব

মিচিগানে একেবারে বড়ো রাস্তার উপরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মিসেস সুলিভান নামে এক মহিলা রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি "সাহায্য করুন", "সাহায্য করুন" ব'লে চেঁচিয়ে ওঠেন। উল্টো দিকেই ছিলো থানা। কয়েকজন পুলিশ অফিসার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছুটে এসে দেখেন এই ব্যাপার। তারা অবশ্য ভদ্রমহিলাকে যথাসাধ্য সাহায্যই করেছিলেন।

কিসের নাইট ক্লাব

নাইট ক্লাব বা ওই ধরণের গোপন সমিতির প্রকৃত জীবনের ছবি যে-সব ফিল্মে দেখানো হয় অবিলম্বে তা বন্ধ করা হোক—মাদ্রাজের এসেম্বলীতে সম্প্রতি এই ধরণের একটি প্রস্তাব এসেছে।

প্রস্তাব এসেছে কংগ্রেসী এবং বিরোধী উভয় দলের কাছ থেকেই। খুবই ভালো প্রস্তাব সন্দেহ নেই। প্রস্তাবটি যেন কার্যকরী হয়।

প্রদীপের নিচেই অন্ধকার

ইয়াঙ্কী সভ্যতা দিন-দিন যে রসাতলের দিকেই চলেছে তার এক চাঞ্চল্যকর এবং ভয়াবহ চিত্র পাওয়া গেলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোয়েন্সাদেরই রিপোর্ট থেকে। হাডসন ইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি রাস্তা এবং পার্ক সন্ধ্যার পরে হ'য়ে ওঠে ভয়ংকর নারকীয়। পতিতা এবং তার দালালদের উপদ্রবে পথচারীদের পথ চলাই সেখানে দুষ্কর। পতিতার শোষণ ফলে বহু ব্যক্তি প্রাণও হারায় দালালদের হাতে। রাহাজানি, মারপিঠ ইত্যাদি তো লেগেই আছে। বহু যুবক, যুবতীর পোশাক পরে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। যুবতীরা ঘুরে বেড়ায় যুবকের ছদ্মবেশে। তাদের ভিতরে অনেকে আবার পেশাদার সমকামী। মাতলামো ইত্যাদি তো সে-সব অঞ্চলের অতি সাধারণ ঘটনা। পুলিশ এবং আইন অগ্রাহ্য ক'রে ওই অঞ্চলে এই সব বিকৃত-রুচি এবং সমাজ-দ্রোহী নর-নারী নানারকম অসামাজিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আমেরিকার চিন্তাশীল সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কৃত্রিম অলংকারের জনপ্রিয়তা

হীরা চিরকালের জন্য—এ-রকম প্রবাদের সঙ্গে আমাদের অনেকেই পরিচিত। তাছাড়া এ-রকমও শোনা যায় যে হীরার চাইতে বড়ো বন্ধু আর মেয়েদের নেই। সত্যি কি তাই? হীরা এবং খাঁটি সোনা নিশ্চয়ই ভালো সঞ্চয়। সামাজিক প্রতিপত্তিরও প্রতীক; কিন্তু এদের নিয়ে ঝামেলাও কি কম? হীরা বা সোনার গয়না চুরি যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে; এদের রাখতে হয় অতি ঘরে। এই সব অসুবিধার জন্যই বোধহয় ইদানীং য়ুরোপে নকল জড়োয়া গহনা-শিল্প দিন-দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। পাখি, প্রজাপতি, পাতা ইত্যাদির আকারে তৈরী অভিনব এবং বিচিত্র অলংকার য়ুরোপীয় ললনাদের চোখে নেশা ধরাচ্ছে। আমাদের দেশেও নকল গয়নার আদর দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। এই ধরনের গয়না ব্যবহারে মেয়েদের রূপ বাড়বে অথচ চোর-ডাকাতের ভয়, হারানোর বা বড়ো কোনো ক্ষতির ভয় একেবারেই নেই।

প্রাণের স্পন্দন

মূল : ডানিয়েল কর্কারী
অনুবাদ : গৌরীশঙ্কর দে

[আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশিষ্ট লেখকদের একজন ডানিয়েল কর্কারী। দরিদ্রদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন ব'লে দারিদ্র্যের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই অনুভবের স্বাক্ষর তাঁর প্রতিটি গল্প। সাধারণ মানুষই তাঁর কাহিনীর নায়ক। তাই তাঁর গল্পের আবেদন পাঠকদের কাছে এত বেশি।]

যাত্রার দলটির সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে আয়ার্ল্যাণ্ডের যে শহরটিতে এসে হাজির হলুম তার আয়তন বা গুরুত্ব এ ক' বছরে মোটেই বাড়েনি। কোনো রকমে টিঁকে আছে শহরটা। এখানে এসে আমাদের দলটির রোজগার সামান্যই হচ্ছিল।

স্থানীয় একজন বেহালা বাদককে আমাদের দলে নিতে হলো। সব বিষয়েই সে আমাদের থেকে পৃথক। বয়েস তার ষাটের উপর। তবু যেন দেহে ধনকে আছে যৌবন। শক্ত-সমর্থ শরীর। তবে লোকটি একটু চিলে-চালা স্বভাবের। সব সময়েই কী যেন চিন্তা ক'রেই চলেছে। আমরা বাকি সকলেই কৃশ, বয়েসজাণী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তার মুখে কিন্তু সর্বদাই হাসি। কথা বলে ফিস ফিস ক'রে। পুরোনো সরজাম বিক্রেটার ভবনটির যেখানে ভাওলা পড়েছে। ভিতরে স্যাঁতস্যাতে ভাব বিশ্রী একটা গন্ধ। সে-সব দিকে কিন্তু তার একেবারেই লক্ষ্য নেই। বাজাবার সময় আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে, আড়ষ্ট হ'য়ে আসে আঙুল। রসিদ-পত্রের ব্যাপার নিয়ে ম্যানেজার তেলে-বেগুনে জ্ব'লে ওঠেন, হাঁপানীর টান বাড়লে কণ্ডাক্টারের মেজাজ হয়ে ওঠে তিরিক্ষি। বুড়ো বেহালা বাদককে এ সবের কিছুই বিচলিত করতে পারে না।

মহড়ার প্রথম দিনই আবিষ্কার করলুম তার বাজনা বেসুরো হচ্ছে। এর সঙ্গে হলো খানেক

বাজালেই যে আমার বাজনার বারোটা বেজে যাবে! আমরা দু'জন আবার বসেছি পাশাপাশি। কণ্ডাক্টার থেকে-থেকে আমাদের দিকে কটমট ক'রে তাকাচ্ছেন। হয়তো ভাবছেন আমিই ভুল বাজাচ্ছি। আমার সঙ্গীটির মুখে অপরাধী ভাব একদম নেই। অমন যা-তা বাজিয়েও একটা লোক মুখে কী ক'রে হাসি রাখতে পারে! নিজেই জানিয়েছে বছর তিরিশেক হ'রে নাকি বেয়াজ ক'রে আসছে। ওই যদি তার নমুনা হয়! মাঝে-মাঝে বলছে, "সঙ্গীতের ভিতরে থাকা চাই প্রাণের স্পন্দন।" ধীরে-ধীরে তার বেসুরো বাজনা আর অদ্ভুত ধরণের ছড় চালানোও আমি মেনে নিলুম।

আমাদের কণ্ডাক্টার একটু নির্দয় প্রকৃতির লোক। হাপানীতে ভুগে ভুগে কুঁচকে গেছে শরীর। উনি এখন সব-সময়েই চোখ রেখেছেন আমাদের দুজনের দিকে। চেষ্টা করছি আমার বাজনার আড়ালে বুড়োর ভুল সুর ঢেকে দিতে। আমরা যে একই জীবিকার সূত্রে বাঁধা। দ্বিতীয় দিনে কিন্তু তার বেসুরো বাজনা ঢেকে রাখা গেলো না। কণ্ডাক্টার নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন আমাদের দুজনের মাঝখানে। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কে ভুল বাজাচ্ছে। বুড়োকে আচ্ছা বকুনি আর বারবার হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে তিনি নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। তাঁর সেই হুঁশিয়ারী শোনালো সাপের হিংস্র শিসের মতো। রাত্তিরে পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো। বুড়ো একেবারেই আবোল তাবোল বাজিয়ে যাচ্ছিলো। যবনিকা পতনের পর শুরু হলো আরেকটি নাটক—সেই ব্যক্তিগত ট্রাজেডী বার্ধক্যের, ক্রমশঃ ক্ষমতা হারানোর। কণ্ডাক্টারের গালাগালির কোনো জবাব কিন্তু বুড়ো দিলে না। ছেঁড়া এক কালি পশমের কাপড় দিয়ে বেহালাটা ঢেকে এবং বাক্স-বন্দী ক'রে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

এর চাইতেও গুরুতর বিস্ফোরণ ঘটলো পরের দিন মহড়ার সময়। বুড়ো আর আমিই সকলের আগে মহড়াতে হাজির হয়েছিলুম। কণ্ডাক্টারের স্ট্যাণ্ডে আটকানো রয়েছে গোটা যাত্রার পালাটার স্বরলিপি। বুড়ো পাতা উল্টে যাচ্ছিলো। কোথায় কী রকম বাজাতে হবে তার নির্দেশ পেন্সিল দিয়ে সমস্ত বইটির প্রতিটি পাতায় লেখা রয়েছে। বিশেষ ক'রে ওই লেখাগুলিই মন দিয়ে পড়ছিলো বুড়ো। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো সে বুঝি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভ্রূ সামান্য কুঁচকাচ্ছে, যেন মজা পাচ্ছে, অবাক হয়ে গেছে। মুখে কিছুই বলছে না।

একটু পরেই কণ্ডাক্টার এসে পড়লেন। মহড়া শুরু হলো। ছড় টেনে চলেছি। হঠাৎ শুনতে পেলুম কণ্ডাক্টারের বাজখাই গলা: "বেরিয়ে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান।" গলা শুনে মনে হলো ভদ্রলোক রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি। বুড়ো উঠে দাঁড়ালো। পশমের কাপড়ে বেহালাটা জড়িয়ে নিয়ে দু'ধারের সারি-সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে চ'লে গেলো বেরবার দরজার দিকে। গেলো আস্তে-আস্তে। সমস্ত ঘরটা একেবারে চুপচাপ। পা যে ফেলছে তার শব্দ পর্যন্ত শুনছি না। আমরা অসহায় ভাবে তাকিয়ে দেখছি তার চ'লে যাওয়া। কণ্ডাক্টারের চেয়ারের কাছে পৌঁছে আরেকবার সে তাকালো পাতা-খোলা স্বরলিপির বইয়ের দিকে; আঙুল বুলিয়ে আরেকবার দেখে নিলো পেন্সিলের লেখা নির্দেশ। তারপর ছোট একটা শব্দ ক'রে হেসে উঠলো।

বুড়োর এই চ'লে যাওয়াতে মনে যে কী কষ্ট পেয়েছিলুম তা বলবার নয়। ওই বুড়ো বেহালা বাদককে খুলে বলেছি আমার জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা। ব্যক্তিগত যে-সব অনুভূতি নিজের কাছেই এতদিন অস্পষ্ট ছিলো তার কাছে বলতে গিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। সে শুধু বলেছিলো "প্রাণের স্পন্দনই সঙ্গীতের জীবন।" তার কথা শুনে ধারণা হয়েছিলো: পৃথিবীতে যে দুঃখের অস্তিত্ব তা কেবল মধুর ধ্বনিতে রূপান্তরিত হবে ব'লে। সে রাতে যাওয়ার সময় বুড়োর কথাগুলি বারবার মনে পড়ছিলো।

সেই রাত্তিরেই ঘটলো একটা অসাধারণ ঘটনা। কণ্ডাক্টার হাজির হতে পারেননি। তার ইংপানীর টান বেড়ে গেছে। মনে হলো আমাদের আজকের রাতের মজুরিটা মার যাবে। ম্যানেজার তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘূর্ণাবাত্যার মতো। স্টেজের তলায় আমাদের কুঠুরিটাতে এমন হট্টগোল শুরু হয়েছে কান কালা হওয়ার উপক্রম। আমি একধারে সটকে পড়লুম। দেখি রেলিংয়ের বাইরে বুড়ো। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করলে: "ব্যাপার কি?" তাকে ব্যাপারটা খুলে বলছি এমন সময় ম্যানেজার উপরে এলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "মিঃ মেন্টন, আজ রাতে পরিচালকের ভার আপনি কি দয়া ক'রে নেবেন?"

আমার পক্ষে প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই দারুণ লোভনীয়। আমি হয়তো রাজীই হয়ে যেতুম। কিন্তু আমাদের বাজনার ধরনটি ছিল তাদের বিপক্ষে। আমাদের দলপতির অবস্থাও মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ম্যানেজার যখন কথা বলছিলেন দেখলুম বাজিয়েরা যে যার আসনে গিয়ে বসছে। দেখে সত্যি লোভ হচ্ছিল। তবু ইতস্তত করছি দেখে বুড়ো বেহালাবাদক ম্যানেজারের হাত থেকে কণ্ডাক্টারের ব্যাটনটা এক রকম জোর ক'রেই কেড়ে নিলে। ধীরে-ধীরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো কণ্ডাক্টারের নির্দিষ্ট আয়গায়।

• • • •

সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা কিছুতেই ভুলবার নয়। সুরের জগতের চাবি যেন বুড়োর হাতে। আমাদের সামনে একটু একটু ক'রে খুলে যাচ্ছে যাদু-রাজ্যের তোরণ। সমস্ত বাজনদের ভিতরে বিরোধ দূর হয়ে এক আশ্চর্য ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। যে অমরীর নাচের সুরগুলি বাজিয়ে বাজিয়ে আমরা একঘেয়ে আর প্রাণহীন ক'রে তুলেছিলুম আবার সেগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। যবনিকা পড়লো, সঙ্গীতের মূর্ছনাও এক সময়ে থামলো। তবু শেষ হ'য়েও শেষ হলো না সেই অলৌকিক আনন্দের রেশ। চলে যাবার আগে বুড়ো সুরের পাহাড়ের দিকে সংকেত ক'রে বললো: "যা প্রাণের স্পন্দন তা-ই সঙ্গীত।"

সাহিত্য সংবাদ

আগে থেকে জানি ভিতরে গুলি নেই, শুধু ফাঁকা আওয়াজ করা হবে, তবু শব্দ শুনে আমরা লাফিয়ে উঠি। কেন? সত্যি, কোনো বিপদের ভয় তো ছিলো না; আর ভেবে চিন্তে যে লাফিয়ে উঠেছি তা-ও নয়। আসলে, চিন্তা করার সময় পাইনি। শব্দ শুনেই লাফিয়ে উঠেছিলুম। হঠাৎ বিকট কোনো শব্দ হ'লে আমরা লাফিয়ে উঠি। চোখে ধুলো-বালি পড়বার উপক্রম হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। নাকের মধ্যে ধুলো ঢুকলে হাঁচি।

শরীরের এই সব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলা হয়, 'কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' বা শুধু 'রিফ্লেক্স'। এর জন্য কোনো তালিম নিতে হয় না। শারীরিক এই সব প্রতিক্রিয়া সহজাত। একটি নবজাত শিশু আর একজন বয়স্ক মানুষ—দুয়েরই দেহ একভাবে সাড়া দেয়। জন্মের পর থেকেই আমরা এই ভাবে সাড়া দিয়ে থাকি। আর সাড়া দিই ব'লেই পারি বেঁচে থাকতে।

রিফ্লেক্স হলো সেই শারীরিক ক্রিয়া যার জন্য চিন্তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা রিফ্লেক্স নিয়ে বহু চিন্তা ভাবনা করেছেন। এই বিষয় নিয়ে সব চেয়ে বেশি চিন্তা করেছেন রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইভান প্যাভলভ। প্যাভলভের জন্ম ১৮৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। জন্ম রাশিয়ার রিয়াজান নামে একটা ছোট গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন গ্রামের একজন পাদ্রী। প্যাভলভ যাতে উচ্চ শিক্ষা পান সেই বিষয়ে তাঁর মা-বাবা বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। ভবিষ্যতে নিজের কর্ম-জীবন নির্বাচনের ব্যাপারেও ছেলেকে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। প্যাভলভকে বিজ্ঞানের দিকে উৎসাহী ক'রে তুলেছিলেন তাঁর এক পাদ্রী-শিক্ষক।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল অব ন্যাচারেল সায়েন্স-এর ছাত্র হলেন প্যাভলভ। এই সময়ে 'দি রিফ্লেক্সেস অব দি ব্রেন' নামে একখানা বই তাঁর হাতে পড়ে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে লেখা। বইখানা প'ড়ে প্যাভলভের জীবনের মোড় ফিরে গেলো। তিনি ঠিক করলেন শারীর-বিজ্ঞান জানবার জন্য ডাক্তারী পড়বেন। ১৮৭৯ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক-ডিগ্রি লাভের পর তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে একটি ল্যাবোরেটরী খুললেন। সেখানে তিনি শারীরক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করবেন।

ল্যাবরেটরীটা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের। এ যেন চাল নেই ওরোদ্দাল নেই নিধিরাম সর্দার

শোচের অবস্থা। সহকারী নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব খরচই জোগাতে হয় নিজের মাইনে আর থেকে। তবু দ'মে যাওয়ার পাত্র প্যাভলভ নন। মনের জোরে তিনি কাজ ক'রে যান। কিছুদিন পরে নিজের এলাকায় সুনামও ছড়িয়ে পড়লো। একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মেডিকেল অ্যাকাডেমীতে কার্ডিওলজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে মস্ত এক পরীক্ষাগার স্থাপিত হলো। তার দায়িত্ব দে'য়া হলো প্যাভলভকে।

শরীরের পরিপাক ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলেন। ১৯০৪ সালে তিনি পেলেন নোবেল পুরস্কার। প্যাভলভ দেখালেন যে, পরিপাক ক্রিয়া আর স্নায়ু-তন্ত্রের মধ্যে আছে এক গভীর সংযোগ। তিনি মনে করতেন শরীরের সমস্ত রকম কার্য-কলাপই নিয়ন্ত্রিত হয় স্নায়ু-তন্ত্রের দ্বারা।

অপরিসীম ধৈর্য, উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাস—এই ছিলো প্যাভলভের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পরিপাকক্রিয়া সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেও, প্যাভলভের পৃথিবী-জোড়া নাম কিন্তু 'কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' সংক্রান্ত চিন্তার জন্য। কুকুরের উপরে পরীক্ষা চালিয়ে কী ভাবে তিনি কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন তা আজ অনেকেরই জানা।

তাঁর পরীক্ষা থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন। এ সত্য আজ প্রমাণিত যে শুধু কুকুর বা ওই ধরণের কোনো ইতর প্রাণীকেই নয়, মানুষের মতো উচ্চ পর্যায়ের জীবকেও তার পূর্ব অভ্যাস ভুলিয়ে দিয়ে তার মধ্যে নতুন কোনো অভ্যাস গ'ড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ ক'রে শিশুর মধ্যে। কুকুর, বিদ্যুৎ চমকানো, বা সমুদ্র দেখে মা-বাবাকে ভয় পেতে দেখলে শিশুও স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পাবে। আর তারা ভয় না পেলে শিশুও পায় না। তেমনি শিশু আবার মা-বাবার উপরে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মাটিতে গড়াগড়ি দিলেই যদি সে দেখে মা-বাবা তার ইচ্ছা পূর্ণ করছে, তবে শিশু বারবার তাই করবে। প্যাভলভের আবিষ্কার শিক্ষা-জগতে যুগান্তর এনেছে।

• • •

ম্যাকবেথ লেখার পরে সেকস্পীয়ার ভাবলেন: "এ বইখানা চলবে না। রেখেই বা লাভ কি। একে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।"

বন্ধু বেকনকে মনের কথা বলে বইখানা পড়িয়ে শোনাতেই তিনি বললেন: "দাও ও বইখানা। আমিই পুড়িয়ে ফেলে।"

কিছুদিন পরে সেকস্পীয়ার জিজ্ঞাসা করলেন: "বইখানা পুড়িয়েছ?"

বেকন বল্লেন: হাঁ, পুড়িয়েছি, তবে তোমারটা রেখে আর সব নাটকগুলোকেই।"

এই বলে বেকন হাসতে লাগলেন।

•

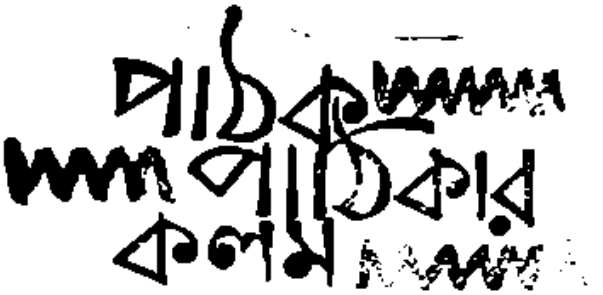

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনাদের মাঘ সংখ্যাতে "ব্যাপার যা চলছে" বিভাগে মহাজাতি সদন সম্বন্ধে চক্রপাণি মহাশয় যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

সত্যিই, মহাজাতি সদনের অবস্থা দেখে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হয়।

নেতাজীর স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এই সদনকে যে বিরাট মর্য্যাদার আসনে বসিয়েছিল তা আজ ধুলোয় লুটিয়েছে।

এখানে এখন শুধুই নাচ, গান, থিয়েটার, রং-তামাশা।

অবশ্য, ভালো গান নাচ বা নাট্যাভিনয় জাতির জীবনে প্রয়োজনীয়, কিন্তু মহাজাতি সদনের আদর্শ ভিন্ন ধরণের।

নেতাজী পরিকল্পনা করেছিলেন এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মনীষীরা এসে সমবেত হবেন, নানা লোকহিতকর ও সমাজ কল্যাণমূলক আলোচনা করবেন, বিদেশ থেকে আসবে জ্ঞানী গুণী শিল্পী ও মানবসেবী চিন্তাশীল মানুষ, তাঁদের আলাপ আলোচনা ও ভাষণের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন কথা শুনে প্রেরণা লাভ করব।

কিন্তু কোথায় সে সব ?

মহাজাতি সদন আজ একটি নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটে নাচঘর মাত্র।

মহাজাতি সদনের এই যে আদর্শচ্যুতি এর জন্য দায়ী কারা? দায়ী অবশ্যই এর বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালকমণ্ডলী।

মহাজাতি সদন জাতীয় সম্পত্তি। এর সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের দাবী, মহাজাতি সদনের কলঙ্ক মোচন এবং সেজন্য পরিচালনার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

ইতি—

শ্রীসরোজকুমার সিংহ

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল তা বড় হরফে ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে। এ তো সামান্য বিক্ষোভ নয়, এ ঐতিহাসিক বিপ্লব। এর চেহারা আলাদা, চরিত্র আলাদা। যুগসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ইতিহাস আর সর্বরিক্ততার উপস্থ আর্তধ্বনিই এই উপপ্লবের মধ্যে শোনা গেছে।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে। সেই সময় সেদেশের শাসনকর্ত্রী মন্ত্রীকে ডেকে একদিন জিগ্যেস করলেন, "রাস্তায় গোলমাল কিসের?" মন্ত্রী বললেন, "জনতা বিক্ষোভ করছে।" রাণী প্রশ্ন করলেন, "বিক্ষোভ করছে কেন?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "দিনের পর দিন তারা রুটি পাচ্ছে না, তাই।" রাণী বললেন, "রুটি পাচ্ছে না! বেশ তো, তারা কেক খাচ্ছে না কেন?"

তিনি নারী তাই রুটির বদলে কেকের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুরুষ, তাই তিনি আমাদের ভাতের বদলে কাঁচকলা খাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা চাই, সাধারণভাবে বাঙালী পুরুষানুক্রমে যা খেয়ে বেঁচেছে, লেখাপড়া শিখেছে, দেশের ও দশের কাছে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, যুগে যুগে নানা কীর্তি অর্জন করেছে, সেই আহার—দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন। সরকার এই সামান্য আহার্যটুকুও জোগাতে পারেন না। আমাদের অতীব দুর্ভাগ্য যে আমাদের সরকার আমাদেরই দেশের লোকের কাছে আজ অপরিসীম বিদ্রূপ অশ্রদ্ধা আর বিরাগের পাত্র! অন্য কোন স্বাধীন দেশে এরকম পরিস্থিতি চালু থাকা সম্ভব হ'ত না।

সরকারী তাস অনুসারে মার্চ বিক্ষোভ নাকি কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কারসাজি। বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তর পর্যন্ত যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সম্প্রতি ফেটে পড়েছে তা একটি বা দুটি রাজনৈতিক দলের কাজ নয়, তা হচ্ছে নিখিল বাংলার বঞ্চিত উপেক্ষিত উৎপীড়িত নিরাশাজর্জর অবিচারে লাঞ্ছিত উপেক্ষিত জনমানসের পুঞ্জীভূত মর্মদাহের বহিঃপ্রকাশ। দেওয়ালের গায়ে এই রুদ্র প্রকাশের বার্তা অনেকদিন আগেই লেখা হয়েছিল। সরকার তা দেখেও দেখেন নি।

ঐ সব নিজীব দুঃস্থ দুঃখী সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোর কতটুকুই বা ক্ষমতা, শাসনযন্ত্রের দুর্বহ নিষ্ঠুর রথচক্রের সামনে রুখে দাঁড়াবার শক্তি তাদের কোনদিনই হবে না।

ফরাসী বিপ্লবের আগে রুশবিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে সেই সব দেশের শাসক গোষ্ঠীরাও ঠিক এমনি মনোভাব নিয়েই তাদের অত্যাচারের আগ্নেয়রথ দেশবাসীর বুকের ওপর দিয়ে চালিয়েছিল।

আমরা যা বললাম, তার সমর্থন আছে, দেশের রাজনৈতিক জীবন ও চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর লেখায়।

বহুদিন পূর্বে দুটি লেখার মধ্যে তাঁর এই সত্যদর্শনের চরম প্রকাশ দেখা গেছে। সেই দুই লেখায় আশ্চর্য ভাবে আজকের কথাই যেন ধ্বনিত হয়েছে!

১৯৩২ সালের ৭ই অক্টোবর তিনি কন্যা ইন্দিরাকে এক পত্রে প্রসঙ্গক্রমে লিখছেন—"মানুষের চেতনা, জ্ঞানবাহিনী, ভাবাবেগ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা—এইসব থেকে বিপ্লবের উদ্ভব হয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় লোকেরা নিজেদের মতের বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে, বিরোধী পক্ষের লোকেরাই ঐ বিপ্লবকে সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধী পক্ষ কারা? যারা বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং যারা সেই অবস্থার পরিবর্তন চায়। সর্বব্যাপী অসন্তোষ এবং বিরাগ, এরই ফলে বিরোধী পক্ষ বড় হয়ে ওঠে, আন্দোলনকারী আসরে দেখা দেয়। কিন্তু হাজার হাজার লোক যে সহসা সরকার বিরোধী কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয় তা শুধু মাত্র কোন একজন বা দু'জন আন্দোলন-নেতার কথায় নয়। বেশির ভাগ মানুষই নিরাপত্তা চায়। যেটুকু তার আছে, তা হারাতে চায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় যে তাদের জীবন-যন্ত্রণা দিন দিন বেড়ে চলেছে, জীবন অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠেছে তখন তারা ক্ষেপে ওঠে, এমন কি যারা অতিমাত্র দুর্বল তারাও ঝুঁকি নেয়। হয় এসপার না হয় ওসপার। এই সময় যদি কোন আন্দোলন-নেতা তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তো তারা তাকে অনুসরণ করে, তখন আর তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে অনেক আইনজ্ঞ রাজনীতিবিদ সংবিধানের কথা তোলেন। সংবিধান-সর্বস্ব মনোভাব নিয়ে তাঁরা সকল সমস্যার আলোচনা করেন। তাঁরা ভুলে যান যে আইন বলুন আর সংবিধানই বলুন, মানুষের জন্যেই তারা তৈরী হয়েছে।

সংবিধানের চেয়ে মানুষ বড়। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কুটীরবাসী দরিদ্র নাগরিকদের জন্য রাজনীতির প্রথম ও শেষ কথা কী?—তা হচ্ছে ক্ষুধার্তের জন্যে আহার, তাদের জন্যে মানুষের মোগ্য বাসস্থল। এই কাজ যে সরকার সম্পন্ন করতে পারেন না সে সরকার বিপ্লবের সম্মুখীন হন—ক্ষুধার্ত জনতা জেগে ওঠে, (যেমন উঠেছিল ফরাসী দেশে), এবং তখন সেই জনতা প্রতিশোধ চায়, প্রতিশোধ নেয়।"

আর একটি রচনায় (১৯৪০ সালের বাংলা মন্বন্তরের পর ১৯৪৬ সালে লেখা। Glimpses of World History দ্রষ্টব্য।)

জওহরলালজী লিখে গেছেন—"বাংলার অবস্থা দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, খাদ্য সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার উভয়েই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমলাতন্ত্রও সমান অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছে। বহুদিন ধরে এই সমস্যা তাঁদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে, তারপর কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অনবরত সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে, চূড়ান্ত

অবাবস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে সরকারী মহলে দুর্নীতি আর ঐক্যের অভাব। দেশের জনগণ ও সরকার উভয়ে একযোগে মিলেমিশে যদি না কাজ করেন তাহলে কখনই কোন বড় রকমের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে তা হয়নি। সহযোগিতার পরিবর্তে সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর হেষারেষি এবং সংঘাত দেখা দিয়েছে···।"

"What Bengal has shown is a Complete collapse of both the Central and Provincial Governments···"

"No big problem can be ultimately solved without full co-operation between the people and the Government of a country···"

"Foolish people in authority blind to everything that does not fit in with their ideas imagine that revolutions are caused by agitation···"

"Tens and hundreds of thousands of people do not move to action merely at the bidding of an agitator···"

"When economic conditions make life intolerable then even the weak are prepared to take risks···"

"Politicians forget the human being for whom constitutions and laws are made. Politics for the dwellers of our millions of mud huts and town slums means food for the hungry and clothing and shelter for the poor · "

পণ্ডিত নেহরুর উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি শোনার পর আর কি কোন কথা বলার প্রয়োজন আছে ?

• • • •

"আমাদের দেশে আইন আছে, কিন্তু বিচার নেই, এদেশের আইন বড়লোকদের বেলায় ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় না, এদেশে দুর্নীতির বড়ই বাড়াবাড়ি আর লাল ফিতার ফাঁসে গরীবদেরই বেশি হায়রানি হয়।"

আমি যদি এই কথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষা আইনের বিধি ধারা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে।

কিন্তু ওপরের কথাগুলি বলেছেন আমাদেরই দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, এবং তিনি যে-সে লোক নন—তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বোস।

সম্প্রতি নাগপুর বোটারি ক্লাবের এক আলোচনা সভায় তিনি ঐ মন্তব্য করেন। আলোচনার বিষয় ছিল—'আইন বনাম বিচার'।

ঐটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি আরো মারাত্মক সব অভিযোগ তুলেছেন, বলেছেন, ভারতে কোন শহরে কোন মন্ত্রী সফরে বেরুলে, বহু লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

তিনি প্রশ্ন করেছেন, ব্রিটেনে অথবা আমেরিকায় এ ধরণের ঘটনা ঘটা সম্ভব কি ?

তারপর তিনি দুটি উদাহরণ দিয়েছেন যার তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তিনি বলেছেন, ব্রিটেনে একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি একবার রাস্তায় গাড়ী চালাবার সময় ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করাতে একজন সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে ২৫ পাউণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, অথচ, তিনি জানেন, ভারতে একজন মন্ত্রীর মোটরে চাপা পড়ে জনৈক পথচারী মারা যায়, কিন্তু অপরাধীর কোন শাস্তি হয় না।

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি !!"

• • • •

পাশ্চাত্য দেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতকে সাহায্য করবার জন্যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কিছু সংবাদে গত সংখ্যায় পরিবেশন করেছি। এ সংখ্যায় একটি কৌতুকাবহ খবর জানাই। খবরটি এসেছে হলাণ্ড থেকে। সেখানে এক গায়ক ভারত সাহায্য তহবিলে অর্থ তোলবার জন্যে এক একক গানের আসরের আয়োজন করেন। এই আসরে তিনি গান গেয়েছেন—এক নাগাড়ে বিরামহীন সাড়ে বারো ঘণ্টা।

এক মিনিটও না থেমে সাড়ে বারো ঘণ্টা ধরে গান গেয়ে চলা—সহজ কথা নয়। ফুসফুসের জোর আছে বটে।

গায়কটির নাম রবার্ট রবিন। বয়স ৩৩। নাইট ক্লাবে গান গাওয়া তার পেশা। তার ম্যানেজার বলেছেন, রবার্ট আর পাঁচ ঘণ্টা গান চালিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু ম্যানেজার তা করতে দেন নি। এই গান পরিবেশনের জন্যে রবার্ট মোটা দক্ষিণা পেয়েছে এবং দক্ষিণার সব টাকাটাই সে "ভারতের জন্য খাদ্য" ভাণ্ডারে দান করেছে।

এই বিরামহীন গানের সময় রবার্ট আধ ঘণ্টা অন্তর কলের রস এবং দু'ঘণ্টা অন্তর কিছু কিছু সন্দেশ খেয়েছিল।

রবার্ট রবিনকে ভারতবাসীর মনে রাখা উচিত।

• • • •

পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার চেহারাই আলাদা। ইতিপূর্বে খৃষ্টজন্মদিনের পুণ্যদিনে পাশ্চাত্যের মেয়ে পুরুষদের মদ্যপানের বহর আর আনুষঙ্গিক বেলেল্লাপিরি এবং দলে দলে বেহেস্তে গমনের এক চমকপ্রদ খতিয়ান দিয়েছিলাম। সে ব্যাপারে অগ্রণী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি একটি খতিয়ানে সেই দেশের অপরাধ অনুষ্ঠানের যে বিবরণ বেরিয়েছে তাও কম চমকপ্রদ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি কুড়ি মিনিটে একটা করে ধর্ষণ, প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা করে ডাকাতি, প্রতি তিন মিনিটে একটা করে মারপিট জখম, প্রতি মিনিটে একটা করে মোটর গাড়িতে চুরি এবং প্রতি আটাশ সেকেণ্ড অন্তর একটা করে চুরির ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত রকমের অপরাধ আছে তার অনুষ্ঠানে মার্কিনীদের সমকক্ষ জগতে আর কেউ কোথাও নেই। এই সব অপরাধ ঘটায় যে-টাকা খোয়া যায় তার পরিমাণ বছরে তেরো হাজার কোটি টাকার সমান।

সভ্যদেশের 'সভ্যতার' নমুনা দেখে প্রাণ পুলকিত হয় !!

:———

রান্নাঘর

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, রান্নাঘর হলো এক মস্ত বড় রসায়নাগার। বাস্তবিক স্বাদ এবং গন্ধের মিশ্রণে বিচিত্র স্বাস্থ্যকর তৈরী হয়ে আসে এই রান্নাঘর থেকেই। আমাদের দেশে মেয়েদের নানা সংস্কৃতির মধ্যে একটি হলো রন্ধনবিদ্যা। এ বিদ্যা যে কত বড়ো তার প্রমাণ মা দুর্গার অন্য একটি নাম অন্নপূর্ণা। তৃপ্তি, আনন্দ আর স্বাস্থ্যের উৎস ছিলো এই রান্নাঘর। বাড়ির ঠাকুর ঘরের মতোই রান্নাঘরও ছিলো অত্যাবশ্যকীয় একটি অঙ্গ। আর তার কর্তৃত্ব ছিলো গৃহলক্ষ্মীদের হাতেই। সেখানে বসে তারা কত রকমের আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাবারই না তৈরী করতেন। এতে যেমন জিনিসপত্রের অপচয় কম হতো, খরচ সংক্ষেপ হতো, তেমনি মেয়েরা নিজেরা তো আনন্দ আর তৃপ্তি পেতেনই, পরিবারের অন্য সবাইও স্বাস্থ্য ও আনন্দ দুইই পেতেন ও বেড়ে উঠতেন এই আনন্দের মাঝখানে।

পশ্চিমের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই সেই রান্নাঘর অবহেলিত হয়ে পড়লো। আমাদের দেশেও অনেকেই নির্ভরশীল হয়ে পড়লো ঠাকুর চাকর, হোটেল রেস্তোরাঁর উপর। গৃহলক্ষ্মীদের কেন্দ্রবিন্দু খসে পড়লো, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য গেলো, জিনিষ-পত্রের অপচয় হতে লাগলো। অভাব অনটন—স্বাস্থ্য ও আনন্দের অভাব সবই দেখা দিল একসঙ্গে। খেয়ে আর সে তৃপ্তি নেই, রন্ধনশিল্পের মত একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প নষ্ট হবার উপক্রম হলো। সৌভাগ্যের বিষয়, শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও আজ আবার মেয়েরা রান্নাঘরের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। আজ তাই সারা দুনিয়ায় শোনা যাচ্ছে "Back to the kitchen". এই আন্দোলন যত তাড়াতাড়ি আর যত ব্যাপকভাবে সফল হয় ততই মানুষের মঙ্গল।

রান্না না কান্না

আভা পাকড়াশী

ঘরকরনা করতে গেলে রান্না না জানা থাকলে মহা বিপদ। প্রথম প্রেম নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায় সবুজ মাঠে, সেখানে আছে চিনেবাদাম, নয়তো ঝালমুড়ি, বড় জোর আইসক্রীম। তারপর রেস্তোরাঁ, পর্দা ঢাকা ঘরে অমলেট, কাটলেট, চা, কফি, শুধু গুন গুন কথা, প্রিয়র বিলাসিতায় প্রিয়ার মৃদু আপত্তি। কিন্তু এই প্রেম যদি শেষ পরিণতি পর্যন্ত যায় মানে বিবাহ হল। তারপর আসে দুটি প্রাণীর একমন একপ্রাণ একতা দেখাবার পালা। পুরুষ বাইরে থেকে সামগ্রী আনবে, নারী সেই সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করবে তবে আসবে সেই সংসারে পূর্ণতা। শুধু মনুষ্য জগতে কেন পশুপক্ষী জগতেও এই প্রথার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু নারী যদি নিজেই সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হয় তবে সেই সাধের বিবাহ-বন্ধন দুদিনেই উদ্বন্ধনের রূপ নেবে। নিজে না শিখলে অন্যকে শেখানও যায় না। নুনে পোড়া বা কড়ায় ধরা রান্না খেয়ে দুদিনেই সেই সাধের সংসার সং-সার হয়ে উঠবে। প্রিয়র বচনের মধু ফুরিয়ে গিয়ে শেষে ছলই কোটাবে। তাছাড়া নিজের অপারগতার লজ্জা অনুশোচনা, জিনিষের অপচয়ে অভাব বৃদ্ধি। শ্বশুর শাশুড়ী থাকলে তাঁদের বিদ্রূপ ভাজন হতে হবে। বেশ চালাক চতুর কর্মিষ্ঠকর্মা একটি জা বা ননদ থাকলে তো কথাই নেই—সেই কাজাই সার হবে তখন। সেইজন্য যদি একটু হাত পাকিয়ে রাখেন রান্নার তবে আর আপনাকে পায় কে!

দাদার বন্ধুকে (চট করে প্রীত করে চাই কি প্রণয়ের ফাঁদে ফেলতে পারেন), স্বামীর বন্ধু খুশী হলে অবশ্য তিনি নিজেই খুশী হবেন। আর তার খুশীতে আপনার খুশীর মাত্রা বাড়বে। ছেলে-মেয়েরাও খুশী হবে নিত্য নতুন মুখ বদলে। আর বৃদ্ধ শ্বশুর বা শাশুড়ীকে হস্তগত করার একমাত্র উপায় তাঁদের অন্ন দিয়েই তাঁদের কাবু করা, মানে তাঁদের সময়ের রান্না রেঁধে তাঁদের বাইয়ে বশ করা।

এবার আসুন গুরুজনদেরই আগে তুষ্ট করার কাজে লাগা যাক। ওঁদের বলা একটি ছড়া আছে:

"আগে অম্বল শেষে ভাজা,
সেই হল বাঙালীর রাজা।"

পাতে আগে অম্বল না দিলেও অম্বল চাখতে হয়, তাই আগে রাঁধতে হয়। আর ভাজা চাই গরম গরম তাই শেষে ভাজাই প্রশস্ত। সুতরাং অম্বল দিয়েই সুরু করি। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ—যত দেশ তত রকম রান্না।

পূর্ববঙ্গে শীতে টক পালং-এর অম্বল খুবই উপাদেয়।

টক পালং শাক-এর অম্বল:

উপকরণ—টক্ পালং শাক আধকিলো। চিনি বেড়শো গ্রাম। একটু হলুদ বাটা। সামান্য নুন। পাঁচফোড়ন। দুপলা তেল। একটি শুকনো লঙ্কা। এক ছোট চামচের এক চামচ আটা।

প্রণালী—শাকটি বেশ করে ধুয়ে শুধু গোড়াটুকু বাদ দিয়ে টুকরো করে কেটে নিন। এবার কড়ায় দেড়পলা তেল দিয়ে উনুনে চড়ান। শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে সামান্য পাঁচফোড়নের সঙ্গে ফোড়ন দিন। সঙ্গে সঙ্গে শাকগুলি দিয়ে দিন। হলুদ বাটা একটু দিন। নুন দিন এক চিটে। একদম জল দেবেন না। নাড়তে নাড়তে শাক সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার চিনি দিন। শুকশুকে হয়ে এলে নামাবার আগে ঐ আটাটুকু ছড়িয়ে দিয়ে আধপলা তেলটুকু দিয়ে নামিয়ে নিন।

রাঙা আলুর অম্বল—(শান্তিপুর)

উপকরণ—রাঙা আলু আড়াইশো গ্রাম। কাঁচা তেঁতুল বড় সাইজের আটটি। চিনি দেড়শো গ্রাম। পাঁচফোড়ন। একটু হিং। নুন। তেল দু'পলা। শুকনো লঙ্কা দুটি। একটু হলুদ বাটা।

প্রণালী—রাঙা আলু খোসা ছাড়িয়ে মোটা আলু ভাজার মত করে কুটে নিন। তেঁতুল জলে সেদ্ধ করে কাথ বার করে নিন। ছাঁকনি বা ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নেবেন। একটু পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা আর হিংটুকু শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিয়ে কাগজে মুড়ে রাখুন। এবার কড়ায় তেল চড়ান। একটু পাঁচফোড়ন দিয়ে রাঙা আলু ছেড়ে দিয়ে ভাজতে থাকুন। হলুদ বাটা একটু দিন। নুনটুকু দিন। বেশ লালচে হয়ে এলে একটু জল দিন। রাঙা আলু অল্প সেদ্ধ হয়ে গেলে তেঁতুল দিন। চিনি দিন। শুকশুকে হয়ে এলে নামিয়ে ঐ গুঁড়ো মশলা ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকা দিন। কিসমিস দিলেও খুব ভাল হয়।

বেগুনের অম্বল—(ওড়িশাড়া)

উপকরণ—ভাল বেগুন আধকিলো। পাকা তেঁতুল (বিচি ছাড়ান) দেড়শো গ্রাম। চিনি দুশো গ্রাম। পাঁচফোড়ন। বাটা হলুদ। শুকনো লঙ্কা। হিং। নুন। কিসমিস পঞ্চাশ গ্রাম। তেল চারপলা।

প্রণালী—বেগুন বেশ ছোট ছোট করে কাটুন। একটুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। কিসমিস ধুয়ে নিন। আগের মত মশলা ভেজে গুঁড়ো করুন। এবার কড়ায় একটু বেশী করে তেল চড়িয়ে পাঁচফোড়ন দিন। বেগুন জল থেকে তুলে সামান্য নুন আর হলুদ মাখিয়ে ভাল করে ভাজুন। লালচে হয়ে এলে তেঁতুল গোলা ঢেলে দিন। অবশ্যই বিচিগুলো বার করে নেবেন। এবার চিনি দিন। বেগুন একদম সেটে যাবে না। তেঁতুল আর চিনিতে বেশ চটচটে পাক হবে। এবার নামিয়ে ভাজা মশলা দিন। কিসমিস, তেঁতুল গোলা দেবার আগে দেবেন। এটি ভাল করে রাঁধলে কিসের অম্বল কেউ ধরতেই পারবে না।

ইলিশ মাছের বা রুই মাছের অম্বল—(বর্তমান)

উপকরণ—এক কিলো ইলিশ মাছ। আড়াইশো গ্রাম পাকা তেঁতুল। চিনি বা গুড় আধ কিলো। সর্ষের তেল আধকাপ। মেথি। নুন। হলুদ বাটা।

প্রণালী—মাছ বেশ করে ধুয়ে কুটে নিন। রুই মাছ হলে ভেজে নিন লাল করে। ইলিশ হলে কাঁচা থাক। তেঁতুল জলে গুলে কাথ বার করুন। এবার তেল চড়ান, মেথি ফোড়ন দিন। মাছ

গুলি সাজিয়ে দিন তেলের ওপর। তেঁতুল গোলা ঢেলে দিন। হলুদ বাটা, নুন কিন্তু আগেই মাছে মেখে নেবেন। এবার ফুটে উঠলে মিষ্টি দিন। একটু চটচটে মত হলে নামিয়ে নিন।

এবার অম্বল থাক। এখনো কত অম্বল বাকি রইল—পোস্তর অম্বল, আমড়া, জলপাই, কচুর শাক—থাক সে পরে হবে। এবার তরকারি। মাছ মাংসের একটা নিজস্ব স্বাদ আছে কিন্তু নিরামিষ তরকারি ভাল হয় শুধু রান্নার গুণে। সুতরাং সেটাই আগে রপ্ত হওয়া দরকার।

নারকোল কুমড়ি—(পূর্ববঙ্গ)

উপকরণ—বেশ মাঝারি সাইজের একটি কাঁচা চাল বা পানি কুমড়ো। নারকোল একটি। পাঁচফোড়ন। তেজপাতা। জিরে, গোলমরিচ, আদা, লঙ্কা, হলুদ বাটা। তেল চারপলা। সামান্য ঘি। দুচামচ আটা। একটু মিষ্টি। নুন।

প্রণালী—চাল কুমড়ো ছাড়িয়ে বেশ সরু সরু করে কুটে নিন। নারকোল কুরে নিন। কড়ায় জল দিয়ে ঐ কোটা কুমড়ো একটু ভাপিয়ে নিয়ে জল ফেলে দিন। এবার কড়ায় তেল চড়িয়ে তেজপাতা, পাঁচফোড়ন দিন—বাটা মশলা সব দিয়ে নাড়াচাড়া করে আগে ভেজে কুমড়ো ঢেলে দিন। বেশ শুকনো শুকনো হয়ে এলে মিষ্টি দিন। আটা ছড়িয়ে আবার ভাজুন। অর্ধেক নারকোল দিয়ে দিন। ঘি দিন চায়ের চামচের চার চামচ। এবার বেশ শুকিয়ে এলে নামিয়ে কোন পাত্রে একটু ছড়িয়ে রাখুন। ওপর থেকে বাকি নারকোল কোরা ছড়িয়ে দিন।

মরিচের ঝোল—(পূর্ববঙ্গ)

উপকরণ :—লাউডগা মানে লাউশাক বা কুমড়োশাক, সিম বশটি, বরবটি বশটি, বেগুন মাঝারি হলে দুটি, আলু দুটি, মুলো চারটি, (কড়ায়ের ভালের) ঝোলের বড়ি বারটি, কাঁচালঙ্কা বিশ বাইশটি। কালোজিরে, নুন, মিষ্টি। সর্ষের তেল আধ কাপ। হলুদ বাটা একটু।

প্রণালী—শাক ডাঁটা বেশ করে ধুয়ে কুটে নিন। তরকারিগুলি লম্বা লম্বা সরু সরু করে কুটুন। লঙ্কাগুলি চিরে নিন। এবার কড়ায় সব তেলটুকু ঢেলে দিন। অন্ততঃ চায়ের চামচের ডেড় চামচ কালোজিরে ফোড়ন দিন। ঝোলা তরকারি আর কাঁচালঙ্কা সব দিয়ে একটু ভাজুন ওপর থেকে শাক ডাঁটা সব দিয়ে নুন দিন। নেড়ে-চেড়ে হলুদ গোলা জল ঢেলে দিন। বড়ি দিন। চাপা দিয়ে সেদ্ধ করুন। সামান্য একটু মিষ্টি দেবেন। অম্ল ঝোল থাকতে নামিয়ে নিন।

মাবড়ার তরকারী—(রংপুর)

উপকরণ—কুমড়ো, ঝোড়, মুলো, বাড়া আলু, আলু, বড়ি, জিরে, লঙ্কা, গোলমরিচ, গরমমশলা, ঘি, তেজপাতা, আদা বাটা, নুন, মিষ্টি, একটু আটা, তেল প্রায় এক কাপ। পাঁচফোড়ন।

প্রণালী—সমস্ত তরকারিগুলি ভাগে ভাগে সুমো সুমো করে কুটুন। সব তরকারি সমান ভাগ হবে। কোনটা কম বা বেশী নয়। এবার জিরে, গোলমরিচ, লঙ্কা, গরমমশলা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিন। ঐ গুঁড়ো মশলা বড় চামচের দুচামচ হবে। এবার কড়ায় তেল চড়ান। তেল-

পাতা পাঁচফোড়ন, কোড়ন দিয়ে তরকারিগুলি বেশ লাল করে ভাজুন। আদা বাটা, নুন আর মিষ্টি দিন। বেশ ভাজা ভাজা করে সামান্য জল দিন। তরকারি সেদ্ধ হবে অথচ গলে শাক হবে না। একটু আটা ছড়িয়ে আর বড় চামচের দুচামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে নামান। গুঁড়ো মশলা দিন। ভাজা বড়ি ভেঙে আধভাঙা করে ওপর থেকে দিয়ে চাপা দিন।

পালং শাকের ঘন্ট—(খাস কলকাতা)

উপকরণ—পালং শাক আধ কিলো। মাঝারি বেগুন একটি। বাড়া আলু চারটি। মূলো চারটি। আলু বড় সাইজের হলে দুটি। ঝোলের বড়ি আটটি, ভাজার বড়ি বড় চামচের চার চামচ। তেল আধ কাপ। তেজপাতা। পাঁচফোড়ন। ঘি বড় চামচের দুচামচ। জিরে, গোলমরিচ, আদা, লঙ্কা, হলুদ বাটা। চিনি বড় চামচের এক চামচ। নুন।

প্রণালী—শাক ধুয়ে টুকরো করে কাটুন। সোড়া থাকলে ঝুড়িয়ে নিন। বেগুন, বাড়া আলু, মূলো, আলু, সব চুমো চুমো করে কাটুন। কিন্তু খুব ছোট ছোট কোটা হবে। এবার কড়ায় তেল চড়িয়ে আগে বড়িগুলি ভেজে আলাদা রাখুন। এবার তেজপাতা, পাঁচফোড়ন কোড়ন দিয়ে তরকারিগুলি ভাজুন। বাড়া আলু, মূলো, আলু, একটু ভেজে তারপর বেগুন দেবেন, তাতে ভাজা ভাল হয়। এবার সব বাটা মশলা, নুন, চিনি দিয়ে দিন। বেশ করে নেড়ে চেড়ে ভাজুন। এবার শাক দিয়ে চাপা দিন। জল মোটে দেবেন না। যদি দেখেন তরকারির চেয়ে শাকের পরিমাণ বেশী তাহলে শাক ভাপিয়ে জল বার করে নিয়ে তবে ঘন্টে দেবেন। ঝোলের বড়ি দিয়ে দিন। জলটুকু মরে এলেই আটা আর ঘি দিয়ে বেশ করে ভাজুন। ভাজাভাজি হলে নামিয়ে ভাজা বড়ি গুঁড়িয়ে ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। এতে কড়াইশুটিও দিতে পারেন।

কটি নিরামিষ রান্না

অন্না দেবী

সঙ্কটের যুগ পড়ছে। খাদ্য সঙ্কট, সময় সঙ্কট, অর্থ সঙ্কট, সুতরাং সব সংক্ষেপ করো। ব্যয় সংক্ষেপ, সময় সংক্ষেপ, মানুষের রুচিও যেন এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হ'য়েছে। সেনসর বোর্ডের কাঁচি যেন আমাদের রসনা আর উদর উভয়কেই সংক্ষিপ্ত করতে উদ্যত। আমরা মেয়েরাও এই কাঁটছাটের পাল্লায় পড়ে আমার হাতায় লম্বে হাতের রান্নাটিও বাদ দিয়ে হাত ধুয়ে বসে আছি। কিন্তু সেকালে বাড়ীর গৃহিণীর পক্ষে হেঁসেল থেকে বিদায় নেয়াটা ছিল তাঁর কর্তৃত্বের উপরে আঘাত। যাঁর হাতে সংসারের হাল তাঁর হাতে সকলের মাথা। মাথা পেতে সবাই তাঁর ব্যবস্থা মেনেও চলত, না হলেই অশান্তি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উদরে তারপর হৃদয়ে। তাঁরা জানতেন ঔদারিক পুরুষকে জয় করে তাঁর হৃদয়েশ্বরী হতে হলে আগে উদরেই অভিযান চালাতে হবে। সেই অভিযানের মূলে ছিল হাতা বেড়ি খুন্তি এবং খাদ্য সম্ভার। আজ যদি আমরা তাঁদের সেই

সেকালের রান্নাঘরে ঢুকে দুই একটা তালিকা নিয়ে নিজেদের প্রিয়জনদের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হতে ক্ষতি কি? সেকালের মা, ঠাকুমারা ক্যালরির মাপ বা ভিটামিনের গুণাগুণ বিশেষ জানতেন না, তবে যা জানতেন তা আজ আমরা জানিনা। কিন্তু তখনকার মেনু আরম্ভ হত শুক্ত দিয়ে। তেতো পিত্তনাশক। আর আগে কুটনো। পরে বাটনা। শেষে রান্না—এই ছিল ধরো। এবারে কটি রান্নার কথা বলি—

উচ্ছের শুক্তো

কাঁচ কলা দুটি। মুলো দুটি। উচ্ছে আটটি। আলু একটি। বেগুন একটি। সিম্ ছয়টি। সমস্ত ভাঁটা চড়াছি। (হলে ভাল, না হলে নয়) কড়ায়ের ডালের বড়ি আটটি। সরিষা বাটা, আদা বাটা, ধাঁধুনী বাটা, তেল, ঘি, ফোড়ন।

প্রণালী—উচ্ছে লম্বা লম্বা করে কেটে আলাদা করে রাখুন। এবার বাকি অন্য সব সবজি ঐ রকম লম্বা ভাবে কুটে ভাগে ভাগে রাখুন। সরষে, আদা, ধাঁধুনী বেটে নিন। কড়ায় তেল চড়িয়ে আগে বড়ি কটি ভেজে নিয়ে তুলে নিন। এবার উচ্ছেগুলি ও কাঁচকলায় হলুদ মাখিয়ে লালচে করে ভেজে নিয়ে আলাদা রাখুন। আবার তেল চড়ান—এবার পাঁচফোড়নের সঙ্গে সরষে মিলিয়ে ফোড়ন দিন। অন্য সবজিগুলি কড়ায় দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভাজুন। ভাজা ভাজা হয়ে এলে সরষেটি জলে গুলে মিলিয়ে রাখবেন। সরষের জল দিয়ে দিন। নুন দিন। সেদ্ধ হতে দিন। আধা সেদ্ধ হয়ে এলে ঐ ভাজাভাজি, কাঁচকলা, উচ্ছে সব দিয়ে একটু ফোটান। একটুখানি আটা জলে গুলে তরকারিতে দিন। মাখা মাখা হয়ে এলে ঘি দিন। নামিয়ে আদা বাটা আর ধাঁধুনি বাটা দিন। উচ্ছের শুক্ত তৈরী হল।

এবার হল ডাল। এরও কত রকম-ফের আছে। কিন্তু শুক্তোর পরেই ডাল পরিবেশনের নিয়ম। সুতরাং তাতেই আসি। নিমন্ত্রিতদের অন্ত ছোলা আর মুগ এই হল প্রশস্ত। কিন্তু ডালের একটি পুরাণো রান্না নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

ডাল ফেলাম তরকারী

মটর ডাল আড়াইশো গ্রাম। দুটি মুলো। ছোট আলু আটটি লাউডগা। ছোট ছোট বেগুন ছয়টি। কাঁচা লঙ্কা বার চৌদ্দটি। কালোজিরে, ফোড়ন ও ঘি। একটু চিনি।

প্রণালী—ডাল ধুয়ে চড়িয়ে দিন। মুলো চাকা চাকা করে কেটে নিন। লাউডগাও টুকরো করুন। আলু আস্ত থাক আর বেগুনেরও বোঁটা ফেলে দেবেন থেকে একটু চিরে নিন। কাঁচা লঙ্কা সব কটি চিরে নিন। ডাল সেদ্ধর প্রথমে কাঁচালঙ্কা, মুলো আর আলু দিন, ইচ্ছে হলে ডুমো ডুমো করে লাউও দিতে পারেন। একটু পরে ভাঁটা আর বেগুন দিন। না হলে বেগুন বেঁটে যাবে। ডাল কেটে নরম হয়ে এলে নামাবেন। নুন ও ঐ সেদ্ধর সঙ্গে দেবেন। এবার কড়ায় একটু বেশী পরিমাণে ঘি দিন—কালোজিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ডাল সাঁতলে দিন। নামাবার আগে আর একটু ঘি আর সামান্য হিঙ দিয়ে নামিয়ে ঢেকে রাখুন। ডাল ফেলান তরকারি হল।

এবার শাক ভাজা—

এতো পাতের পোড়ায় থাকবেই।

মেথিশাক ভাজা—

বেশুন ছোট ছোট করে কেটে শাক কুচিয়ে নিয়ে আলাদা রাখুন। তারপর কড়ায় তেল চড়িয়ে পাঁচফোড়ন দিয়ে বেশুনগুলি লাল করে ভেজে তুলে নিয়ে পরে আবার তেল দিয়ে শাক ভাজুন। সামান্য নুন, মিষ্টি আর লঙ্কা দেবেন। একেবারে ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে বেশুনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। (ছুট শুকনো লঙ্কা তেলে ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে) ঐ ভাজা শাকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবেন।

ভাতের সঙ্গে ভাজা প্রথম তাই চাই।

পোরের ভাজা—

উপকরণ—বেসন একশো গ্রাম। সামান্য কালোজিরে। সাদোতিল, একটু খাবার সোডা, নুন, লঙ্কা, বেশুন বা আলু, তেল, নুন।

প্রণালী—বেসনের মধ্যে একটু তেলের ময়ান দিন। এবার খাবার সোডা, নুন, হলুদ, লঙ্কা বাটা, তিল, কালোজিরে সব বেশ করে মিশিয়ে জল দিয়ে ঘন করে গুলে বেশ করে কেটিয়ে নিন। এবার আলু বা বেশুন পাতলা চাকা চাকা করে কেটে ঐ গোলায় ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজুন। পোরের ভাজা হল।

এছাড়া মোচা বা এঁচোড়ের চপও খুব সুন্দর হয়। কিম্বা বাঁধাকপির চপ। সেইটাই বলছি।

বাঁধাকপির চপ—

বাঁধাকপি ছোট সাইজের একটি, আধকাপ ছাড়ান কড়াইশুঁটির দানা। গুটি সেদ্ধ আলু, (সরষে মশলা, জিরে, গোলমরিচ, শুকনো লঙ্কা, একসঙ্গে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিয়ে টেবিল চামচের চার চামচ হবে।) নুন একটু ঘি। ভাজবার মত তেল আর আধকাপ মুড়ির গুঁড়ো বা ক্র্যাম। এককাপ গোলা বেসন। একটু খাবার সোডা। সামান্য আদা বাটা।

প্রণালী—বাঁধাকপি কুচি কুচি করে কেটে নুন মজিয়ে নিন। কড়াইশুঁটিও সেদ্ধ করে নিন। এবার আলুর সঙ্গে চটকে নিন। কড়ায় তেল চড়িয়ে এই বাধা তালটি বেশ করে ভাজুন। সঙ্গে নুন আদা বাটা দিয়ে দেবেন। ভাজা হয়ে এলে (যেন সেদ্ধ বাঁধাকপি বা কড়াইশুঁটি সঙ্গে পাক না হয়ে যায়) ঐ গুঁড়ো মশলা দিয়ে নামান চপ গড়ে নিন। এবার একটু সোডা দিয়ে বেসন ঘেঁটে গোলা করুন। ওতে ডুবিয়ে মুড়ির গুঁড়ো বা ক্র্যাম মাখিয়ে সাদাচে করে ভাজুন।

মিশ্রাষিষ ডিমের ডালনা—

উপকরণ—ছানা আড়াইশো গ্রাম, আলু এক কিলো, জিরে, গোলমরিচ বাটা, আদা বাটা, হলুদ, লঙ্কা আর সরষেমশলা বাটা একটু ঘি আর তেল, নুন, মিষ্টি।

প্রণালী—আলু সেদ্ধ করে চটকে নিন। সঙ্গে একটু রান্না ভাত এই বড় চামচের দুচামচ মত চটকে নেবেন। নুন আর একটু লঙ্কা আর সামান্য আদা বাটা দিন ওতে। এবার ছানার মধ্যে হলুদ, লঙ্কা, সরষেমশলা বাটা, নুন মেখে নিয়ে, ঘিয়ে সামান্য নেড়ে চেড়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে ঐ বাধা আলুর মধ্যে ছানার পুর দিয়ে ঠিক ডিমের আকারে গড়ুন। তারপর একটু শুকনো ময়দার ওপর

গড়িয়ে নিয়ে লাল করে ভাজুন। এবার ঘিয়ে, গোলমরিচ বাটা, আদা বাটা, হলুদ, লঙ্কা বাটা সব তেলে ভেজে ডালবার ঝোল দিন। সঙ্গে বড় বড় করে আলু কেটে তেলে ভেজে নিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে নামাবার আগে ঐ নিরামিষ ডিমগুলি দিয়ে নামাবেন। গরমমশলা বাটা দেবেন। ঘি দেবেন। ঠাণ্ডা হলে আলতো করে তুলে পরিবেশন করবেন।

প্রায় পাত সাঙ্গ হয়ে এসেছে। ভাত বা লুচি সব কিছুতেই এগুলি চলে। তবু একটি পোলাউ প্রসঙ্গ আনি।

কমলালেবুর জরদা—

উপকরণ—দুটি ছাড়ান কমলালেবু। ভেতরের সেই কোয়াগুলিও ছাড়ান হবে। দু-কিলো দুধ, পাঁচশো গ্রাম ভাল সুগন্ধি আতপ চাল, কিস্‌মিস্ পঞ্চাশ গ্রাম। একটু ঘি ও একশো গ্রাম চিনি। চারটি লবঙ্গ ও তেজপাতা।

প্রণালী—ঘি চড়িয়ে তেজপাতা, লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে চাল কটি ভেজে নিন। অবশ্য আগেই ধুয়ে শুকিয়ে নেবেন। একটু ভাজা গন্ধ বেরুলে দুধ ঢেলে দিন। চাল সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি দিন, কমলা লেবু দিন, কিস্‌মিস্ দিন আবার একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। বেশী মিষ্টি হবে না কিন্তু বেশ ঝরঝরে হবে ভাতগুলি, লেটে যাবে না। এই হল কমলালেবুর জরদা।

এবার মিষ্টিতে আসি। নাকি অবশ বাকি রইল।

তরকারির অম্বল—

উপকরণ—কাঁচা তেঁতুল দশটি। বাঙা আলু আধখানা, মুলো আধখানা, বেগুন আধখানা, তেল, ফোড়ন, চিনি। একটু হলুদ বাটা আর নুন।

প্রণালী—রাঙা আলু, মুলো, বেগুন সব ছোট ছোট করে কাটুন। কড়ায় তেল চড়ান। সরষে, পাঁচফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা মিশিয়ে ফোড়ন দিন। এবার তরকারিগুলো দিয়ে ভাজুন। হলুদ বাটা আর সামান্য নুন দিন, জল দিয়ে দিন, ফুটে উঠলে একটু পরে তেঁতুল দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি দিন। মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। তরকারির অম্বল হল।

এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ।

চলির পায়েস—

উপকরণ—আতপ চাল একশো গ্রাম। নারকেল আধমালা। ছোট এলাচ গুঁড়ো, বড় চামচের দু-চামচ কেওড়া, চিনি চারশো গ্রাম, দুধ দুকিলো, মালা বড় চামচের দুচামচ।

প্রণালী—চাল আগের দিন ভিজিয়ে দিন। পরদিন নারকেল কুরে নিন। দুধ চড়ান। ফুটতে থাকলে লম্বা আকারের পান্তুয়ার মত খুব ছোট ছোট করে ঐ চাল বাটার চবি তৈয়ারী করে নিন। সঙ্গে অবশ্যই মালাটুকু মিশিয়ে নেবেন, এবার দুধে ছাড়ুন। সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি আর কিস্‌মিস্ দিন। হয়ে গেলে নামিয়ে এলাচ গুঁড়ো আর কেওড়া দিন। চবির পায়েস হল। ইচ্ছে হলে চবিগুলি ভেজেও নিতে পারেন। এখন আমাদের যত সাধ আছে তত সাধ্য নেই, এই দুঃখ। তবু আমাদের পুরাতনকে মনে রাখার চেষ্টা বজায় থাক।

অগ্নীশ্বর

নাগানৃত্য

……নৃত্যেরই তালে তালে

আরে মরে গেছে যে
না, না এখনও মরেনি
জরুরী অবস্থা

ব্যঙ্গচিত্র

দাদু,—আর এক গ্লাস হোক্,

"হিন্দুস্থান টাইমসের সৌজন্যে"

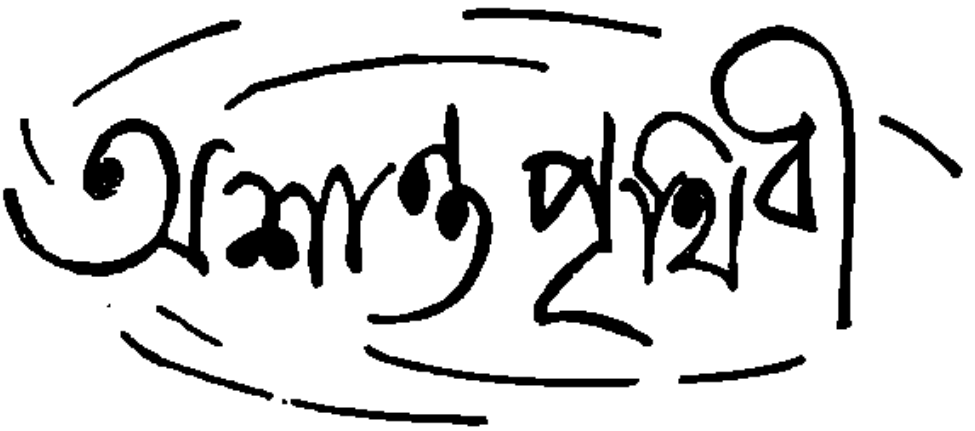

ঘানা

নলিনীরঞ্জন মিত্র

১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ড কোষ্ট 'ঘানা' নাম নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। নতুন আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা ডঃ নক্রুমা ঘানা রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা হন। প্যান আফ্রিকানিজম্-এ উদ্বুদ্ধ ডঃ নক্রুমা সারা জীবন ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। প্রগতিবাদী ডঃ নক্রুমা আফ্রিকাকে মধ্য যুগের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে নতুন সভ্যতার আলোকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অবসানের পন্থা উদ্ভাবন করবার জন্যে তিনি এশিয়া অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা তখন কোন্ দিকে ঘোরে কেউ বলতে পারে না। এশিয়া পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্বে তিনি যখন পিকিং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে সমগ্র পৃথিবী তাঁর পদচ্যুতির সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঘানায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল। ঘানার একমাত্র রাজনৈতিক দল কনভেনশন পিপলস্ পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল। সংবিধান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দেশ শাসনের জন্য মুক্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমগ্র ক্ষমতা এখন সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর হাতে। অশান্ত আফ্রিকার এই এক বছরে পর পর কয়েকটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল। কিন্তু ঘানার এই পটপরিবর্তন একটু আশ্চর্য বই কি, যখন ডঃ নক্রুমা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঘানার সকল রাজনৈতিক দলকে দমন করে প্রেসিডেন্ট নক্রুমা একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। বোধহয় প্রেঃ নক্রুমা একটু অসহিষ্ণু, অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র আফ্রিকাকে একসূত্রে বাঁধতে কিন্তু তাঁর নিজের আসনই যে তখনও বালির

যাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করেনি। পরন্তু তাঁর নীতির ফলে দেশ দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর দেশকে দ্রুত পশ্চিমী প্রভাব মুক্ত করতে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অশিক্ষিত ও পুরাতন গোষ্ঠীভুক্ত সমাজকে একদিনে আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। জাতিকে দুর্নীতি মুক্ত করতে গিয়ে তিনি যথেচ্ছ পরিমাণে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। বিরোধী নেতাদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেছেন। এমনকি মতের অমিল হলেই মন্ত্রীদেরও পর্যন্ত কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। বিচারকদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতাও তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। এক বৃটিশ পত্রিকা তাঁকে Mr Verwoerd ও Ian Smith-এর সঙ্গে তুলনা করেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, একনায়ক নক্রুমার যতই দোষ থাকুক তিনি ছিলেন নতুন আফ্রিকার পথ প্রদর্শক। আফ্রিকার ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা অসম্ভব। তাঁর আদর্শ আফ্রিকার নব্য সমাজ কোনদিনই বর্জন করতে পারবেন না।

ঘানার নতুন সরকার বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য উন্মুখ। ভারতকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি জানাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে। আদিস আবাবার O. A. U-এর অধিবেশনে নতুন সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, কেনিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র নতুন ঘানাকে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা, এই অধিবেশনে ঘানার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

ডঃ নক্রুমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছিল। অবশেষে তিনি পিকিংয়ে উপস্থিত হয়ে ঐ দেশের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেছেন। ডঃ নক্রুমার বন্ধু পিকিং সরকার এখনও পর্যন্ত নীরব।

পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী তাঁর পদচ্যুতিতে বিশেষ খুশী। অনেকে অনুমান করছেন, লণ্ডনে এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এবং বৃটিশ চক্রান্তের ফলেই ঘানার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

সিরিয়া :

সামরিক অভ্যুত্থানের প্রতিযোগিতায় আরব দুনিয়া আফ্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। গত ১৭ বছরে সিরিয়ার ন'বার ক্যু ঘটেছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ব্যাথাপন্থীদের ক্যুর ফলে ব্যাথ পার্টির মডারেটপন্থীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী করা হয়েছে। উগ্রপন্থী দল ব্যাথ নামের বিরোধী বলে পরিচিত ক্ষমতা দখল করেছে। এ কোন আদর্শগত সংঘর্ষ নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য সিরিয়ার এই অভ্যুত্থান। ব্যাথ পার্টির অভ্যন্তরে এই রেষারেষি, দলাদলি বহুদিন থেকে চলছে। এই অভ্যুত্থানের ফলে আরব জগতে যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হ'তে চলেছিল তা কিছুটা ব্যাহত হল। কায়রো-দামাস্কাস বন্ধুত্বের মূলেও এ এক কুঠারাঘাত হানলো।

ইন্দোনেশিয়া :

ইন্দোনেশিয়ায় গত অক্টোবর মাসে যে উনটুং-এর নেতৃত্বে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণপন্থীদল এই অভ্যুত্থান দমন করে এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। সেই থেকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ক্রমাগত অশান্তির সংবাদ আসছে। ইন্দোনেশিয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য পিকিংপন্থী নেতাদের দমন চলছে পূর্ণ উদ্যমে। জাকার্তার চীনা দূতাবাস ও কনসুলেট উন্মত্ত ছাত্রদল কর্তৃক কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছে। মধ্যজাভায় কয়েকদিন গৃহযুদ্ধও ঘটে গেছে। জেনারেল উনটুংকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অবস্থা যখন প্রায় শান্ত হয়ে এসেছিল ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীসভা থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Nasution-কে অপসারণ নিয়ে গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ১৪জন নতুন মন্ত্রীকে বহাল করাও ছাত্রদের মনঃপুত হয়নি। এ ব্যাপার নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ ও তাদের উপর গুলি চালনা এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল কমিউনিষ্ট বিরোধীদল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। খুব সম্ভবতঃ এরা পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি পাচ্ছে। এদিকে প্রেঃ ডঃ সুকর্ণ ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবন্দ্রিও কমিউনিষ্টদের প্রতি এতটা কঠোর হতে নারাজ। সরকার তাই ছাত্র আন্দোলন বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছে।

ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল। কারণ চীন বিরোধী আন্দোলন প্রেঃ সুকর্ণের ক্ষমতাকে কমিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করছে। আমেরিকার পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে নিজ গোষ্ঠিভুক্ত করবার সুযোগ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হচ্ছে। অপর পক্ষে চীনের পররাষ্ট্র-নীতি চরম ব্যর্থতা লাভ করেছে ইন্দোনেশিয়ায়। সাথে চীনের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া উচিত যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতাকে সাম্যবাদ শিক্ষা দিলেই কোন দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন বহুদিনের ব্যাপক প্রস্তুতি। জনগণ প্রস্তুত না হলে বা চাইলে কোন দেশে বলপূর্বক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। খবরে আরও প্রকাশ যে, প্রেঃ সুকর্ণ সকল ক্ষমতা জেনারেল সুহার্তোর হাতে সমর্পণ করেছেন। তিনি নামে মাত্রই প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং তাঁর নামেই সকল নির্দেশ জারী করা হবে। এর প্রত্যুত্তরে কয়েকদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা জেঃ সুহার্তোর হাতে সমর্পণ করেন নি। তিনি এখনও পূর্ণ ক্ষমতায় আসীন এবং একমাত্র এ্যাসেমব্লি ও ঈশ্বরের নিকট জবাব-দিহি করবেন। সৈন্যবাহিনীর অনুগতে যাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন এ সংবাদে তাঁরা কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার সর্বশেষ সংবাদ আরও নাটকীয়। পিকিংপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবন্দ্রিও ১৪জন মন্ত্রী কার্যতঃ বন্দী। সৈন্যবাহিনীর প্রহরাধীনে ডঃ সুকর্ণকে বোগোরে পাঠানো হয়েছে। সৈন্য-বাহিনী এখন পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা আশা করবো ইন্দোনেশিয় ঘটনাবহুল নাটকের এখানেই যেন যবনিকা পতন ঘটে।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক
২৭১ বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পশ্চিম বঙ্গে যা ঘটে গেল

পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার জন্য মর্মাহত

—ইন্দিরা

নয়াদিল্লী, ৮ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, দেশে যখন খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তখন যদি বিরোধীরা মনে করে থাকেন যে, তাঁরা দেশে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারবেন তাহলে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তাঁদের সঙ্গে আমি ঐকমত হব না।

পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

হরতালের সমর্থনে

কলকাতা, ৮ই মার্চ—সর্বশ্রী গোপাল ব্যানার্জি (সি পি আই), নিখিল দাস (আর এস পি), এস চৌধুরী (সি পি আই), নরেন দাস (এস এস পি), রণজিৎ ধর (এস ইউ সি), দিলীপ রায়চৌধুরী (ডব্লু পি আই), শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য (বলশেভিক পার্টি), অমর বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক—মার্কসিষ্ট) গৌরাঙ্গসুন্দর সিংহ (আর সি পি আই) ও যতেন রায়চৌধুরী (সি ইউ সি) আজ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দেশের সমস্ত মানুষের সম্মুখে যে চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন আগামী ১০ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে সংযুক্ত বামপন্থী দলগুলি দেশের সকল মানুষকে সেই চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দেবার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে পুলিস ও রাজ্য সরকারের সকল প্রকারের উস্কানী সত্ত্বেও জনসাধারণ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী যাদুনীতি ও অযাচিত লাঠি চার্জ, গুলীচালনা এবং ওষুধের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সংহতভাবে তাঁদের ক্রোধকে ভাষা দেবেন।

আগামী ১০ই মার্চ সকাল ৬টা থেকে ১১ই মার্চ সকাল ৬টা পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করা হবে। সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল থেকে অবশ্য অত্যাবশ্যক সার্ভিসগুলি বাদ পড়বে।

প্রেসনোট বলেন:—২৪-পরগণা ও নদীয়া জেলায় গুরুতর গুণ্ডামী চলেছে এবং কলকাতাতেও কতকগুলো সরকারী বাস ও ট্রাম পুড়েছে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটে কল্যাণগড় ও শান্তিপুরে। এই দুই জায়গায় জনতা মিলিটারির বেশী অফিসে ও অন্যান্য ভবনে আগুন লাগায়। কুলসমূহের জেলা ইন্সপেকটরের অফিস, সমবায় ভাণ্ডার, মিউনিসিপ্যাল অফিস, স্টেট ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, রাজ্য সরকারের জনৈক মন্ত্রীর বাড়ী প্রভৃতি কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এসব জায়গায় জনতা রেল ষ্টেশনও আক্রমণ করে।

যুগান্তর—৯।৩।৬৬

No Meeting Ground With Opposition : Sen

By a Staff Reporter

West Bengal's Chief Minister, Mr. P. C. Sen, reiterated on Wednesday that there was now no meeting ground with the Opposition.

He told reporters that Opposition members had deliberately disrupted the proceedings of the Assembly and their behaviour amounted to an invitation for their suspension. The Speaker had shown commendable patience and had given them a long rope before he took action against them.

Asked by a reporter whether he would issue any appeal in connexion with today's hartal, he said with a smile: "To whom ? To you ?"

Statesman—9. 3. 66.

বনগ্রামে পাঁচশত নরনারীর অনশন সত্যাগ্রহ

খাদ্যের দাবীতে ও পুলিশের দমন নীতির প্রতিবাদে দিকে দিকে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ

বসুমতী

৯।৩।৬৬

কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে এক সন্ত্রাসের আর বিভীষিকার রাজত্ব চলিতেছে।

পুলিশ ও সৈন্যদল ঘরে ঘরে ঢুকিয়া নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করিতেছে। দশ বার বৎসরের শিশুরাও এই গ্রেপ্তার ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইতেছে না।

এদিকে কর্ফ্যুগ্রস্ত কার্ফুর ফলে কৃষ্ণনগরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। হাট-বাজার দোকান-পাট বন্ধ। বহু বাড়ীতে উনুনে হাঁড়ি চাপিতেছে না। ক্ষোভ আর ঘৃণায় মানুষ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে।

কার্ফু শিথিল

রবিবারের বিরতিহীন কার্ফুর পর সোমবার ইহা ৬ ঘন্টার জন্য শিথিল করা হয়।

যাদবপুরে

সংবাদপত্রের স্ট্যাণ্ডে এসিড বাল্ব নিক্ষেপ

একজন নিহত ও দুইজন আহত : অপর একটি সংবাদপত্রের এজেন্ট গ্রেপ্তার।

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সোমবার সকালে যাদবপুরে কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রের (বসুমতী নহে) গাড়ীতে এ্যাসিড বাল্ব নিক্ষেপের ফলে ঐ সংবাদপত্রের তিন জন কর্মী আহত হন পরে একজন হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ এই ব্যাপারে অপর একটি সংবাদপত্রের (বসুমতী নহে) স্থানীয় এজেন্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বসুমতী

৯।৩।৬৬

সরকারী নীতি বিক্ষোভের মূলে

—অজয় মুখোপাধ্যায়

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মতে, রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর "মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারী নীতিরই।" তিনি মনে করেন, এজন্য কোন রাজনৈতিক দলের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করা অন্যায়।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন : সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ যখন খাদ্যশস্যে ঘাটতি তখন রাজ্যে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সমর্থনীয়। সেই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করতে গিয়ে এমন কতকগুলি সরকারী অব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তাতে বহুক্ষেত্রে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। এইসব কারণে যারা বিক্ষোভ করছে তাদের সঙ্গে শান্তভাবে মিষ্ট ব্যবহারে সমস্যা সমাধানের সাধ্যমত চেষ্টা করলে, এমন কি চেষ্টা করার আশ্বাস দিলেও অনেক সময় ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। তা না করে দম্ভভরে কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি ও গুলি চালানো এবং বালককে পর্যন্ত হত্যা করাকে আর যাই বলা হোক গণতান্ত্রিক সুশাসন বলা চলে না।

যুবামন্ত্রী বিধানসভার বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা "ভেঙ্গে দেওয়াও" শ্রীমুখোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ। তিনি বলেছেন "এটা খুব ভুল হয়েছে।" আইনসভার ভিতরে ও বাইরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

যুগান্তর

৯।৩।৬৬

'রাজ্যের অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস'!

'কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে' পুলিশ ও মিলিটারীরাজ সম্পর্কে গত সোমবার দৈনিক বসুমতীর প্রথম পৃষ্ঠার মর্মস্পর্শী রিপোর্টগুলির পাশে একটি ছোট্ট খবর আছে, যে খবরটি অন্ধকারের মধ্যে যেন হীরার টুকরার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! রবিবার দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা জিজ্ঞাসা করেন—"রাজ্যের অবস্থা কি?" মুখ্যমন্ত্রী সহাস্যে উত্তর দেন—"ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!!" কারণ, কোথাও কোন গোলযোগের সংবাদ নাই। যদি ঘাস্থসংকটে বিপন্ন বাংলার ইতিহাস কেহ কোনদিন লেখেন, তবে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তিটি নিশ্চয়ই স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। হয়তো ভবিষ্যৎ আন্দোলন-কারীরা গুলীবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ নদীয়া জেলার ভগ্ন প্রাচীরে লিখিয়া রাখিবেন—"অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!" আমরা ইতিহাসের সেই বিখ্যাত গল্পটি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিব না—রোম যখন পুড়িতেছিল, নীরো তখন বাঁশী বাজাইতেছিলেন! কারণ, পশ্চিমবঙ্গের শাসকেরা এখনও রোমক সম্রাজ্যের সেই দণ্ডপাণি সম্রাটের রেকর্ডের কাছে পৌঁছিতে পারেন নাই—যদিও খাদ্যের দাবিতে সেকালের রোমে শিশুবধ হইয়াছিল কি না—এতখানি বিস্তৃত তথ্য আমাদের জানা নাই। দেশের অবস্থা দেখিয়া আমাদের দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে। অবশ্য অন্ধকারে ভূতুড়ে নাচ! কারণ গ্রাম বাঙ্গলা হইতে পুত্রহারা মায়েদের বুকফাটা কান্না শুনিতেছি। একে একে নুরুল ইসলাম, আলী হাফেজ, কালু মণ্ডল, আনন্দ হাইত প্রভৃতি কোথায় গেল! ক্ষুধায় মরিল, না, গুলী খাইয়া মরিল! কিশোর আনন্দ হাইতের মা বসুমতীতে প্রকাশিত নিহত পুত্রের ফটো দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—'ওরে আনন্দ ফিরে আয়!' হে শোকার্ত বঙ্গজননী, আনন্দ আর ফিরিবে না। পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে আনন্দ বিদায় লইয়াছে, যেখানে গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হইয়াছে এবং সেই কবরের পাশে অন্ধকারে মিলিটারির ছায়ামূর্তি পদচারণা করিতেছে।—আনন্দ, নুরুল প্রভৃতি কিশোরেরা সেই গণতন্ত্রের কবরে শায়িত। আর শাসকেরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার গর্বে গৌরবান্বিত। না, কোন বিচার নয়, তদন্ত নয়, পুলিশী হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিকার নয়। হে শোকার্ত জননী, আনন্দ সত্যই বিদায় নিয়াছে। এই পশ্চিমবঙ্গে আনন্দ আর ফিরিবেনা!

সত্যই, অবস্থা আজ ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, মুখ্যমন্ত্রী!!

সামনে ১০ই মার্চের হরতাল। অতএব শনিবার শেষ রাত হইতে আবার পুলিশী অভিযান শুরু হইল—বাড়ীতে বাড়ীতে রায়পত্নীর সন্ধান, ট্রেড ইউনিয়নের অফিসে অফিসে হানা,—আইনসভার ১৪ জন সদস্য গৃহ হইলেন, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ছাত্রনেতা প্রভৃতি সহ মোট ৩৪ জনকে।

বসুমতী—৯।৩।৬৬

আজ সারা বাংলায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল

সরকার কর্তৃক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ: উভয় পক্ষে জোর প্রস্তুতি

দৈনিক বসুমতী ১০।৩।৬৬

কংগ্রেস কর্মীদের
খাদ্য আন্দোলনে জড়িত না হবার নির্দেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৯ই মার্চ—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কংগ্রেসকর্মীরা ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগতভাবে সাম্প্রতিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে কোন প্রকার আন্দোলনে জড়িত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে "উপযুক্ত ব্যবস্থা" গ্রহণ করা হবে।

আনন্দবাজার ৯।৩।৬৬

'বাংলা বন্ধ'

আজ চব্বিশ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল

আহ্বান, প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ বৃহস্পতিবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য হরতাল,—বাংলা বন্ধ। রাজ্যব্যাপী এই সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচী নিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও বামপন্থী দলগুলির সংযুক্ত ফ্রন্ট। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এবং কংগ্রেসবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল এই কর্মসূচী সমর্থন করেছেন।

এই হরতাল উপলক্ষে কলকাতা ও রাজ্যের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বুধবার সরকারী মহলে তৎপরতা দেখা যায়। রাইটার্স বিল্ডিংসে রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঘনঘন বৈঠক বসে,—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা হয়। কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বুধবার পর্যন্ত কলকাতা ও রাজ্যের সর্বত্র প্রায় পাঁচ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৭।৩।৬৬

শ্রীকৃপালনীর অভিমত

এ অবস্থায় শ্রী জি, বি, কৃপালনী বলেন, না খেয়ে লোকে ৬০।৭০ দিন বাঁচতে পারে। অনাহার থেকে রোগের উদ্ভব হয়। অনাহারজনিত পীড়ায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা কি সরকার জানাবেন?

যুগান্তর

১০. ৩. ৬৬

দোহাই, শান্তির পতাকা যেন উড্ডীন থাকে

বামপন্থী দলসমূহ ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে যে হরতালের ডাক দিয়েছেন তা আরম্ভ হওয়ার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী। এই প্রবন্ধ লেখার সময় চারিদিকে একটা "কি হয়", "কি হয়", অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। ২৪ ঘণ্টার এই হরতাল শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি লাভ করে সে বিষয়ে একটা গভীর উৎকণ্ঠা লক্ষ লক্ষ সাধারণ, শান্তিপ্রিয় সংসারী মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রবল ও অনমনীয় ভেদ নিয়ে দুই পক্ষ যখন পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, ক্রোধ ও দম্ভ যখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করে তখন প্রায়শঃই ঘটনার গতি কারোর আয়ত্তে থাকে না। অসংখ্য সাধারণ, নির্বিরোধ মানুষ আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করছেন, পশ্চিমবঙ্গে আজ আমরা যেন কতকটা এই রকম অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছি।

উদ্যোক্তারা শান্তিপূর্ণভাবে এই হরতাল পালনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীও আশা প্রকাশ করেছেন যে, শান্তি রক্ষিত হবে। আমরাও এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের কামনাকে ভাষা দিয়ে এইটুকু বলতে পারি যে, এই হরতাল যেন কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন রেখে না যায়। কোথাও কেউ যেন কোন রকম প্ররোচনার সৃষ্টি না করেন। গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার স্বীকৃত। হরতাল জনসাধারণের হাতের একটি অনুমোদিত অস্ত্র, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে ১৬ বৎসরে কলকাতায় আরও ২৪ বার সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল হয়েছে। প্রবল উত্তেজনা ও আশঙ্কার কারণ থাকলেও অতীতে হরতালের কলকাতার মানুষ অনেক সময়ই শান্তির পতাকা তুলে রেখেছে। ১৯৬১ সালের যে মাসে যখন পুলিশের গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে হরতাল হল তখন কারো কারো আশঙ্কা ছিল এই হরতাল উপলক্ষ করে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধতে পারে।

এই আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে যে হরতাল হয়েছিল সেই হরতালেও শান্তি অটুট ছিল। আমরা আশা করব, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আবার সেই গৌরবজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে।

যুগান্তর ১০.৩.৬৬

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত। অবস্থার অবনতি ঘটলেই তলব করা হইবে। বুধবার রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, রাজ্য সরকার মিলিটারী কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বৃহস্পতিবার হরতালের দিন রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী একটী বৈঠকে ব্যস্ত।

বসুমতী
১০. ৩. ৬৬

বামপন্থী ফ্রন্ট থেকে
আজ পূর্ণ হরতাল ঘোষণা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৯ই মার্চ—আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে 'বাংলা বন্ধ'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। যুগান্তর
১০. ৩. ৬৬

হরতাল সম্পর্কে

বামপন্থী দলসমূহ ১০ মার্চ, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বাত্মক হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছেন তা সফল করার জন্য বামপন্থীরা যেমন চেষ্টিত হয়েছেন, তেমনি এই অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা করছেন।

ইতিমধ্যে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী সদস্যগণ এই হরতালের আওতা থেকে বিভিন্ন পার্টিগুলিকে ও বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এর আগে হরতালের আহ্বানকারীরা দমকল, এম্বুলেন্স, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সংবাদপত্র, হাসপাতাল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিকে হরতালের আওতা থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

হরতালের দিন কলকাতায় বাস ও ট্রাম বেরুবে কিনা আজ বুধবার সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। তবে মঙ্গলবার যতদূর জানা যায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ সেদিন কিছু কিছু বাস যাতে চালানো যায় তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

হরতালের দিন যাতে কংগ্রেস পক্ষের সদস্যগণ বিধানসভায় হাজির থাকতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দল তার তোড়জোড় শুরু করেছেন। প্রকাশ, কংগ্রেস সদস্যদের বিধান সভা ভবনের নিকটবর্তী রাজভবনের মন্ত্রিনিবাসগুলিতে বুধবার রাত্রি থেকে রাখার আয়োজন করা হচ্ছে।

যুগান্তর ৯।৩।৬৬

For Peace

Hartals in Calcutta have on the whole, not a bad history. They generally pass off peacefully. But today's hartal is so different, different not merely because of its scheduled duration—from 6 A.M. (Thursday) to 6 A.M. (Friday)—but mainly because of the events of the past few days. What had happened in West Bengal, the Prime Minister told the Rajya Sabha did create a feeling of disturbance all over West Bengal and a sense of instability in the country. They have also created a lot of fear in the minds of the common people, we would add. Forcible

closure of educational institutions, burning of public property, Section 144 Cr. P.C., preventive arrests under the D.I.R., heavy massing of armed police force—all these not only cause inconvenience but breed fear. With unerring womanly instinct the Prime Minister said : "It is the poor people who suffer, and it is India which suffers". Does more suffering await the poor people of Calcutta and of the rest of West Bengal ?

Amrita Bazar Patrika 10. 3. 66.

চিঠিপত্র

'খাদ্য' ও 'কেরোসিন' তেলের দাবীতে আজ বাংলা দেশের দিকে দিকে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার পরিণাম ভয়াবহ। গত ৪ঠা মার্চ শুক্রবার কলকাতা এবং বিশেষ করে কৃষ্ণনগরে যে প্রবল গণ-বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বহুলক্ষ মানুষের আর্তনাদ অবশেষে যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরিত লাভার মত সর্বনাশা বিস্ফোরক রূপে প্রকাশ হয়েছে। ক্রমাগত বিক্ষোভ ও নাশকতামূলক কার্যের ফলে সরকারের ও সাধারণ মানুষের সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি হয়ে চলেছে। বুলেটের দ্বারা এই আন্দোলনকে দমন করতে গেলে তা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ তিনি অবিলম্বে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের নীতি বর্জন করে আলোচনা নীতিতে আসুন। তিনি সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের এবং সমস্ত ছাত্র সংগঠনের নেতাদের ডেকে শান্তভাবে এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং সর্বাত্মক বিক্ষোভের অবসান করুন। —হেমন্তকুমার হালদার, বাদ্যবেড়ীয়া হুগলী। যুগান্তর

Army Called Out In W. Bengal

Trains And Stations Burnt Down, Tracks Removed

13 Killed In Firing, Curfew Clamped

By Staff Reporter

Wanton destruction of railway property, mob-police clashes and calling in of the Army in many areas marked Thursday's 24-hour hartal in West Bengal. The Army moved into parts of Calcutta where disturbances broke out after dusk, in the 10-mile stretch of the Rishra-Konnagar area, and Asansol belt. Armed police detachments from outside the State took up positions in Khardah (24-Parganas) and in several other parts of the State.

—Statesman 11.3.66

সারা বাংলায় পূর্ণ হরতাল

বৃহস্পতিবার অধিক রাত্রে কলিকাতায় মিলিটারী তলব করা হইয়াছে। স্বতস্ফূর্ত সর্বব্যাপী হরতালে অচল পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে জনতার প্রচণ্ড বিক্ষোভ : কলিকাতা সহ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুলিশের ব্যাপক গুলীবর্ষণে বহু লোক হতাহত :

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় কেন্দ্রের উদ্বেগ

নয়াদিল্লী, ১০ই মার্চ : পশ্চিমবঙ্গে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এখানে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে আজ এখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হয়।

প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যদের লইয়া এক বিশেষ জরুরী বৈঠকে মিলিত হন এবং পরে তাঁহার পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠকে

কলিকাতা ও উহার শহরতলীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি লইয়া গভীর আলোচনা করেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রতি মুহূর্তে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দার সহিত যোগাযোগ করিতেছেন এবং শ্রীনন্দা তাঁহার সহকর্মীদের পরিস্থিতির কথা জানাইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবার পর সৈন্য বাহিনী তলব করায় রাজধানী ও সরকারী মহলে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছে।

P.T.I ১১।৩।৬৬

কলিকাতায় মিলিটারী তলব

নানাস্থানে ষ্টেশন ও ট্রেণে আগুন : বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া কারফিউ : মিলিটারীর হাতে ছয়টি রেল ষ্টেশন : শুক্রবার সমস্ত লোকাল ট্রেণ চলাচল বন্ধ : কলিকাতার বাহিরে উপদ্রুত অঞ্চল সমূহে আজ আবার হরতাল পালনের আহ্বান। বসুমতী ১১।৩,৬৬

হরতালের সাফল্যে অভিনন্দন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বৃহস্পতিবার হরতাল সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু, এম-এল-এ, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির কলিকাতা জেলার সম্পাদক অধ্যাপক বিনয়েন বসু, প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়, সি-এস-ইউ-এর রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীমিহির ভট্টাচার্য, ভারতীয় বলসেভিক পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপল্টু দাশগুপ্ত, সারা ভারত ডি-এস-ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীরুক চক্রবর্তী, সংযুক্ত বিধান সভার রাজ্য কমিটির পক্ষে শ্রীনাথানিয়েল মুর্মু, এম-এল-এ, সংযুক্ত ছাত্র সমাজের পক্ষে শ্রীদিবাকর গুহ রায় প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অভিনন্দন জানাইয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি রাজ্য কমিটি, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির রাজ্য দপ্তর প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ হইতে বাস, কেরোসিন ও বিভিন্ন স্থানে পুলিশী গুলীচালনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী পূরণ না হওয়া সত্ত্বে আন্দোলন চালাইয়া যাইবার আবেদন জানাইয়া বিবৃতি প্রদান করা হয়।

বসুমতী ১১, ৩, '৬৬

যা ঘটেছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

হরতাল ও ধর্মঘটের দিনে বৃহস্পতিবার যা ঘটেছে :

ট্রেন ও ষ্টেশন আক্রমণের বহু ঘটনা : পুলিশ ও জনতার মধ্যে অন্ততঃ ১৪টি স্থানে ধণ্ডযুদ্ধ।

জনতার হাতে ১ জন পুলিশ অফিসার নিহত এবং অর্ধশতাধিক পুলিশ আহত।

পুলিশের গুলীবর্ষণে হিন্দ মোটর এলাকায় ৩ জন বিষড়ায় ৩ জন, কোন্নগরে ১ জন, বড়দহে ২ জন, আসানসোলে ২ জন নিহত। সঠিক ভাবে জানা সম্ভব না হলেও আহতের সংখ্যা শতাধিক।

আসানসোল, উত্তরপাড়া, বিষড়া, কোন্নগর, হিন্দ মোটর, রামরাজাতলা, কল্যাণী রোড, দমদম, বড়দহ, গোবরডাঙ্গা, রাণাঘাট, সোদপুর, আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, ফালাকাটা, মালদহ এলাকায় ট্রেন আটক, ট্রেনের বগী ও বাসে অগ্নিসংযোগ, সরকারী অফিসে হানা ও কাগজপত্র নষ্ট ও বিবিধ ধরনের হাঙ্গামা।

কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে পথ অবরোধ, পুলিশ ভ্যানের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ, জনতা ও পুলিশে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ কর্তৃক লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ, গ্রেপ্তার প্রভৃতি। কলকাতায় পুলিশের গুলীবর্ষণে দু'ব্যক্তি নিহত হয়েছে। যুগান্তর ১১, ৩, ৬৬

জন-জীবন বিপর্যস্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১২ই মার্চ, হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটের পর আজও কলকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। দিনে যানবাহনের অভাব, আর সন্ধ্যা না হতেই কার্ফু মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করছে। সব চাইতে চাপ পড়েছে বাজারের উপর। ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে বাজারের কাঁচা জিনিষের বিক্রেতারা মাল আনতে পারছেন না। এই সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরাও জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে। তরকারি, শাকপাতা, মাছ, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম বেশ চড়ে গেছে। কলকাতার একটি ব্যবসায়ী সংস্থা জানিয়েছেন যে, সরিষার তেলের দাম কুইন্টল প্রতি ২০ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান চলাচলের অসুবিধার বাইরে থেকে সরিষা বা সরিষার তেল আনা যাচ্ছে না বলেই নাকি দাম চড়ছে।

আজ নিয়ে তিনদিন সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। কলকাতা সহর ও সহরতলীতে মাত্র ২।১টি জায়গায় ছাড়া বাস-ট্রাম চলছে না, ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ীকেও অনেক জায়গায় রুখে দেওয়া হচ্ছে বা ইঁটপাটকেল ছোঁড়া হচ্ছে। সন্ধ্যার পর এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী, ডাক্তারের গাড়ী বা সংবাদপত্রের গাড়ীও কোন কোন জায়গায় রেহাই পাচ্ছে না। জনসাধারণ যান-বাহনের অভাবে অত্যাবশ্যক কাজের জন্য লরী বা টেম্পোতে চড়েও যাতায়াত করছেন। কোন কোন অঞ্চলে কিছু লোক টেম্পো ও লরী চলাচলে বাধা দিচ্ছে। ফলে তারা মাল বইতে রাজী হচ্ছে না।

যুগান্তর ১১।৩।৬৬

হরতালের দিনে বাংলা উত্তাল !
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগ্নেয় উদ্গীরণ
মহানগরীতেও মিলিটারি, ঝাঁকে ঝাঁকে
গুলি : গ্যাস : মৃত্যু

আনন্দবাজার পত্রিকা ১১।৩।৬৬

WEST BENGAL IN GRIP OF VIOLENCE
Curfew in city areas, suburbs : Army called
Stations and trains set ablaze : 16 killed in firing : S-I. done to death
Nanda distressed at W. Bengal situation

NEW DELHI, Mar. 11.—The Home Minister Mr. G. L. Nanda, said in the Loke Saba today that those who were responsible for the "Bengal Bundh" yesterday must have been well aware of the possibility of the situation going out of their control despite their professed air of keeping it peaceful, and of its resulting in loss of lives and destruction to public property.

Amrita Bazar Patrika 11. 3. 66

HARTAL OVER

Though the hartal call met with spectacular success in many respects, yet it left a furrow of blood and fury, taking a toll of 16 lives, all in police firing, and injuring hundreds of others. Added to this, was a police officer who lost his life in mob violence.

Amrita Bazar Patrika 11.3.66

Restore Order

What have been happening in Calcutta and the surrounding industrial areas since Thursday beggar description. Whether the political parties which gave the hartal call anticipated that things would go so completely out of their control may be doubted. They, too, can have nothing but abhorrence for such diabolical scenes that are being enacted on the streets

Amrita Bazar Patrika 11.3.66

Calcutta and in railway stations and an inexpressible sense of horror at so much bloodletting. Trams and buses have practically gone off the streets ; following several acts of incendiarism, train services have been suspended ; streets whether in Calcutta or in other towns are wholly unsafe ; schools and colleges are closed ; offices and factories are all but closed and large areas are curfew-bound. In brief, there is a complete breakdown of all essential services. To add to the loss of life and property which is colossal, a heavy pall of fear weighs down on all people. It is an intolerable state of things. Yet all this suffering and loss are self-inflicted. Despite the energetic measures that are being taken for the maintenance of law and order there is a feeling of helplessness in the minds of all peace-loving people at this sudden upsurge of violence, senseless violence, in practically the whole of West Bengal.

Yet it will not do to give way to fear and helplessness at this hour. There is enough of sanity and courage left among our people to allow this state of things to continue indefinitely. This shall not pass—should be the battle cry. When the house is on fire no householder thinks of prestige, he thinks only of how the fire can be extinguished and of what can be saved from the flames. The Government, the Opposition parties and all non-party men of influence must get together and think out how this drift towards chaos can be arrested and normal conditions restored. Amrita Bazar Patrika 12. 3. 66.

Caution

Curfew from 6 p.m. to 6 a.m. was imposed for seven days from Thursday in 11 municipalities of the Hooghly district.

The municipalities are Uttarpara, Kotrong Konnagar, Rishra, Serampore, Baidyabati, Champdani, Bhadreswar, Chandernagar, Chinsura and Bansberia.

The whole of Barrackpore subdivision, Jadavpur, Behala and Metiaburuj Police Station areas were also brought under curfew orders from 8 p.m. to sunrise. It was not mentioned for how many days curfew orders would remain in force in these areas of 24-parganas.

Amrita Bazar Patrika 11. 3. 66.

Violence Spreads in Calcutta

MOB FURY RISES : CITY LIFE PARALYSED

By a Staff Reporter

Friday was even more turbulent than the Hartal of Thursday in Calcutta and districts where at least 15 people were killed and more than 30 injured in a series of clashes between angry mobs and the police.

'Everything ablaze after dusk'

P. M.'s PEACE APPEAL

NANDA'S AIRDASH TO CALCUTTA TODAY

From Our Special Correspondent

New Delhi, Mar. 11.—Prime Minister Indira Gandhi today appealed to Opposition leaders, particularly those from West Bengal, to lend a helping hand in resolving the crisis in West Bengal.

Amrita Bazar Patrika
12. 3. 66

They want PM to mediate

By a Staff Reporter

Distinguished citizens of Calcutta addressed a telegram to Prime Minister Mrs. Indira Gandhi on Friday urging her personal presence in the city and her intervention to bring the disturbed city life to normalcy. Amrita Bazar Patrika 12. 3. 66

Mob Violence Continues

At Least 12 Die In Calcutta And Suburbs

By a Staff Reporter

The army moved into the Behala and Jadavpur areas of Calcutta on Friday as fresh disturbances were reported from widespread areas on the fringes of the city, mostly in 24-Parganas district, and from several sectors in the city itself and from Howrah. The police fired at several places, both in Calcutta and 24-Parganas, but the number of people killed could not be ascertained. A moderate estimate put the figure at 12.

The main targets during the day were post offices, thanas, mobile police vehicles, tram and State bus goomties and milk milk distribution kiosks.

Statesman 12. 3. 66.)

Memorandum to Nanda

By Staff Reporter

The combined "failure" of the West Bengal Government, its food policy and of the Congress organisation has led to the "present uprising by the students and the people" of the State, said a memorandum submitted by the West Bengal Congress Workers' Conference to the Union Home Minister, Mr. Nanda, in Calcutta on Saturday.

Four Congress M.L.A.'S—Mr. Ajoy Kumar Mukherjee, Mr. Rajani Kanta Pramanick, Mr. Mahendra Nath Mahato and Mr. Sushil Kumar Dhara were the signatories to the memorandum.

The Ministers, including the Chief, the statement alleges, have taken an escapist attitude all along, adopted a very obdurate and uncompromising stand, and none of them visited any place of actual occurrence even in their home district to probe the truth of public complaint or to allay it. And this has resulted in a crisis when the Army and police from other States had to be requisitioned and indiscriminate death and destruction perpetrate.

Hindusthan Standard 12. 3. 66

'Bundh' Rocks Bengal

Pitched battles, firings, curfew in some suburbs

Army Called in

CALCUTTA HOTS UP WITH SUNDOWN

Delhi Reviews State Situation

From Our Special Correspondent

New Delhi, March 10.—The situation in West Bengal was reviewed at the highest Government level here today.

The Home Minister, Mr. G. L. Nanda, who is in constant touch with the West Bengal Chief Minister, is reported to have apprised his Cabinet colleagues of the happenings in the State in the wake of the hartal.

Cabinet members are also reported to have expressed their concern at the deteriorating situation in the State.

The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, also conferred with her senior colleagues where a reference to the incidents in West Bengal was made.

Hindusthan Standard 11.3.66

শুক্রবারের কলিকাতা আরো অশান্ত

সরকারী সম্পত্তির ওপর আক্রমণ

৮টি থানায় কার্ফু : সৈন্যদের হাতে বেহালা, বেলঘরিয়া : ১৫ জন নিহত

যুগান্তর ১২।৩।৬৬

নন্দ আজ কলকাতায় আসছেন

সুব্রহ্মণ্যম সঙ্গে থাকবেন

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব

—নন্দ

(দিল্লী অফিস থেকে)

১১ই মার্চ—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ আজ কলকাতা যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের বলেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটা মীমাংসা আনার ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই আমি কলকাতা যাচ্ছি।'

সাংবাদিকরা শ্রীনন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অচলাবস্থা অবসানের জন্য আপনার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি?'

যুগান্তর ১২।৩।৬৬

নিরপেক্ষ তদন্ত-ত্রিগুণা সেনের দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১২ই মার্চ—আজ রাজভবনে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডের ডঃ ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের কাছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানান। তিনি বলেন, "সরকারের মন যদি নিরপেক্ষ থাকে আর হাত নির্মল থাকে, তাহলে কেন তাঁরা এর তদন্ত করবেন না? বর্তমানে খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত সকল বন্দীর মুক্তির দাবী জানিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল শ্রেণীর নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে "মিলিত খাদ্য পরিকল্পনা" গ্রহণের আহ্বান জানান। দেশের সমস্ত মানুষকে খাদ্য পরিস্থিতিতে স্ব স্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এই বোধ জাগ্রত করার জন্য শ্রীসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

বসুমতী ১২।৩।৬৬

কলকাতায় কর্মব্যস্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সংকটত্রাণের সূত্র সন্ধান

মীমাংসার আশা

আনন্দবাজার ১২।৩।৬৬

স্থির-অস্থির দোলাচল নগরী : বিস্ফোরণ, গুলিবর্ষণ, নৈশ উত্তেজনা

আনন্দবাজার ১২।৩।৬৬

হিংসা ছাড়লে কথা

—মুখ্যমন্ত্রী

পঃ বঙ্গে পুলিসী তাণ্ডবের নিন্দা

লোকসভায় মুলতুবী প্রস্তাব ঃ
রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী
মীমাংসার পথ খোলা রাখতে হবে

নব

আন্দোলন ও হরতালের অধিকার আছে, কিন্তু হিংসা নিন্দনীয়

আইনসভা যথার্থভাবে চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়
কংগ্রেস কার্যালয় আক্রমণেই প্রমাণ বর্তমান আন্দোলন খাদ্যের নয় রাজনীতির
—মুখ্যমন্ত্রী

যুগান্তর ১২।৩।৬৬

রাজ্য সরকারের উপর দোষারোপ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ—গতকাল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হাঙ্গামার জন্য বিরোধী সদস্যরা আজ রাজ্য সভায় সরকারকে দায়ী করেন।

স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী শ্রীনন্দলাল হাতি হাঙ্গামা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে সব দল বা লোকের প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা লোককে এ কথা বলতে পারেন যে, তাঁদের অভিযোগ যাই হক না কেন সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট করে তার প্রতিবিধান হবে না।

শ্রীবিজেনলাল সেনগুপ্ত (নির্দলীয়), অধ্যাপক মুকুটবিহারী লাল (পি এস পি), শ্রীজিমুতবাহন (সমাজবাদী) ও শ্রীপি, কে, কুমারন (কমু) প্রভৃতি বিরোধী নেতারা বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা বাতিল ও পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান।

যুগান্তর ১২।৩।৬৬

Main target Railways

By A Staff Reporter

The Bungla Bundh call, like a giant road block, brought the normal business in the State on Thursday to a complete standstill. Hartal was peaceful in most districts excepting Hooghly, Burdwan, Jalpaiguri and 24-Parganas. The west bank of the Hooghly, the industrial hot-point, was vitally shaken. There were several cases of arson, police firing and quick death. Twelve men, at least, died on the day. Curfew was clamped on 11 Municipalities in Hooghly and also at Asansol.

Hindusthan Standard
12. 3. 66

Disturbances pre-poll stunt : Indira

From Our Special Correspondent

New Delhi, March 12.—The Prime Minister, Mrs, Indira Gandhi, told Indian and foreign correspondents here today that disturbances in Bengal and Kerala were more in the nature of Opposition movements seen in previous pre-election years.

Hindusthan Standard
12. 3. 66

Sen ready to meet left leaders

By A Staff Reporter

Chief Minister Mr. P. C. Sen said on Friday that he was prepared to talk to leftist party leaders on the issues underlying the current agitation in the State provided they abandoned violence.

Amrita Bazar Patrika 12. 3. 66

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ও সেন-মন্ত্রিসভার অপসারণ দাবী

সংসদে তুমুল বিক্ষোভ : লোকসভায় ওয়াক-আউট : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিরোধীদের সহযোগিতা কামনা

বসুমতী ১২।৩।৬৯

এই রক্তস্নান থেকে উদ্ধার চাই

শেষ পর্যন্ত গভীরতম আশঙ্কার কথাই সত্য প্রমাণিত হল। হরতালের দিন শান্তিতে কাটে নি : বরং এই উপলক্ষে বলতে গেলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গুলী, রক্তপাত, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসের যে প্রলয়কাণ্ড ঘটছে তার নজীর খুব কমই পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের এমন খুব কম জেলাই আছে যেখানে বৃহস্পতিবার কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেনি। ট্রেন, রেলপথ, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত পুলিশের গুলীতে ১৬টি প্রাণ নষ্ট হয়েছে এবং একজন কর্তব্যরত পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরও জনতার রোষে প্রাণ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সময় মৃতের ও আহতের সংখ্যা কত দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, একদিন এই আগুন নিভবে, আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসবে, কিন্তু পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত, অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু। সব মিলে এক কথায়, জীবনটাই অনির্দিষ্ট। পথ ঘাট, পুলিশ, মিলিটারী ও রুষ্ট জনতার করতলগত বাজার বসছে না, অফিস-কাছারি বন্ধ, যানবাহনও বন্ধ এবং সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় সুবুদ্ধি ও বৈর্যশীল বিবেচনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে।

আমরা মনে করি, ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দেওয়া উচিত হয়নি। একটা জেদের প্রাচীর দায়ী রাজ্যে দুটি প্রবল প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করছে। যদি এই অন্তরায় না থাকত তবে একটা আপোষ মীমাংসা হয়ত সম্ভব হত। বিশেষ হরতাল উপলক্ষ করে যখন একটা ব্যাপক শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল তখন এই আশঙ্কা দূর করার জন্য সব চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

যুগান্তর ১২।৩।৬৯

Letters to the Editor

Sir,—We are two foreign guests in your country, and have spent the past three months living in the home of Indian friends in Calcutta. This has afforded us more than the typical tourist glimpse of life in India as we have been able to share and experience the effects of the grave situation here. We have thus been able to feel at first hand the impact of the present food crisis, the students riots, the closing down of schools and colleges, and the degrading conditions which the proud Bengali people are being forced to suffer.

In these columns on March 9-10 it was particularly obvious that only one section of thought had been given the privilege of voicing its opinions, and this was the more shameful in that these were people who supported authority and condemned every form of student agitation. What else can people do in such distressful circumstances? It is only natural that people anywhere when denied all fundamental democratic rights will resort to violence as the only means of making their protest heard.

We have read reports by your leading economists, scientists, and professors, and have some reason to conclude that there is sufficient food available in India this very moment to enable her adequately to feed all her populations, even allowing for the 25%

eaten by rodents. This food is being denied to the people of India because of the inefficient system of ration zoning, which applies to only 5 to 6% of the population, and because of the unscrupulous hoarding and black marketing which are allowed to flourish.

We would like to hear more protests against police brutality and the denial of elementary rights to students such as the right to education as well as the democratic right to demonstrate. India claims to be the world's largest democracy. Let this title not be such a farce.—Yours, etc., GLORIA MELTZER and VALDA OGDEN.

Statesman 12. 3. 66

বাইরে যখন দেশের লোকে গুলী খাইতেছে, রক্ত ঝরিতেছে, সরকারী সম্পত্তি আগুনে পুড়িতেছে, তখন হরতাল উপলক্ষে লক্ষপতি শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তের গৃহে, কংগ্রেস ভবনে এবং রাজভবনস্থিত মন্ত্রিভবনে নিশি-যাপনের সঙ্গে কংগ্রেসী এম-এল-এ'দের জন্য নাকি লাঞ্চ, ডিনার ও মুর্গীর রোস্টের ঢালাও ব্যবস্থা হইয়াছে।

বসুমতী—১৩।৩।৬৬

সরকার নিম্নতম দাবীও মানছেন না

শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

কলকাতা, ১৩ই মার্চ—শ্রীএন, সি, চ্যাটার্জি, শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শ্রীদীনেন ভট্টাচার্য, শ্রীবিভেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ও শ্রীভূপেশ গুপ্ত আজ রাত্রে এক বিবৃতি দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের সর্বনিম্ন দাবীও সরকার মানছেন না।

যুগান্তর ১৩।৩।৬৬

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ কলকাতায় এসে নিশ্চয়ই মনে করেছেন যে, শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এখানে একটা গভীর আগ্রহ রয়েছে। দুইটি যুদ্ধরত শিবিরের মধ্যে পড়ে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়বে, এটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক অবস্থা নয়। বিশেষ করে বার বার আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য মিলিটারী ডাকা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। যথাসত্বর শীঘ্র এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই। আমরা পুনরায় আশা ও ভরসা করব নন্দজী দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার আগে রাজ্য সরকার ও বামপন্থী দলগুলির সহযোগিতায় সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সূত্র প্রস্তুত করে যেতে পারবেন।

যুগান্তর ১৩।৩।৬৬

পশ্চিমবঙ্গে গণহত্যার তদন্ত দাবী

ত্রিবান্দ্রম, ১২ই মার্চ (পি টি আই)—কেরলের খাদ্য আন্দোলনের জন্য শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ দায়ী, এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি, সি, সেন যে উক্তি করেছেন, তাহা "দায়িত্বহীন" এবং এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে কেরল বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের সদর দপ্তর থেকে আজ এক বিবৃতি প্রচার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে গণহত্যা

খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে এই বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে "গণ-হত্যার" যথোপযুক্ত তদন্ত, পশ্চিমবঙ্গের অধি-বাসীদের জন্য অবিলম্বে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের দাবী জানান হয়।

যুগান্তর ১৩।৩।৬৬

Government Condemned by CPI

From our Special Representative

New Delhi, March 11—The Central Executive of the Communist Party (Rightists)

has condemned what it describes as "a veritable reign of terror let loose in West Bengal" and has also criticized the Central Government for giving "blanket support" to the State Government.

In a detailed resolution adopted here today, the executive says that the Defence of India Rules have been used on an unprecedented scale in the last three weeks in the State and nearly 50 people, including some students, have been killed as a result of firing.

The resolution demands immediate release of those arrested under the DIR and withdrawl of all pending warrants, judicial inquiry into police firing and other excesses; discussion with leaders of all Left Opposition parties to find a remedy for the present state of affairs; and adequate supplies of rice and other foodgrains to the state.

Statesman 13. 3. 66

Leaders will be freed

By A Staff Reporter

The Chief Minister, Mr. P. C. Sen, announced on Sunday the Government decision to release Left Opposition leaders and appoint a high power three-man commission to go into the causes which led to the recent disturbances.

Hindusthan Standard 14.3.66

Commission To Inquire Into Disturbances

W. Bengal Legislators And Other Being Freed

Sen Likely To Meet Opposition Leaders Today

By Our Special Representative in Eastern India

The dialogue between the Government and the Opposition of which is widely believed to be one of the factors contributing to the current disturbances in Calcutta and elsewhere is expected to be resumed today at 11 a.m. when the Chief Minister, Mr. P. C. Sen, meets leaders of the Opposition parties in the State legislature.

To facilitate this, Mr. Sen ordered on Sunday evening the release of all legislators (12 M L As and six M L Cs), arrested under the DIR in connexion with the disturbances, and revocation of the unexecuted warrants of arrest issued against several others. Twelve non-legislator Leftist leaders, detained after March 5, will also be set free this morning.

Statesman 14.3 66

ULF NOT SATISFIED WITH DECISIONS

By a Staff Reporter

Mr. P. C. Sen's announcement in Calcutta on Sunday of the West Bengal Government's decision to appoint a high-power commission to inquire into the causes of the recent disturbances and other connected issues and to release the DIR prisoners detained since March 5 generally failed to satisfy the United Left Front leaders.

The ULF hard-core met and scrutinized the announcement soon after it was made. They later issued a statement which did not seem to have taken any specific notice of the announcement. But ULF had now dropped from their list of demands their basic demand—a judicial inquiry.

Individually, each of the parties represented on the Front reacted bitterly, also because their demand for the release of political prisoners immediately without any discrimination whatsoever" had not been conceded.

All of them were much apprehensive of these "several thousands' who had been arrested in connexion with the movement.

The reaction was so bitter that some ULF leaders even questioned the propriety of the Opposition M.P.s to negotiate with the Union Home Minister. If Mr. Nanda and others were serious about effecting a settlement they could have directly talked to the ULF leaders. The method they adopted was rather "extra-ordinary" they said.

The ULF statement referred to the silent procession taken out on Sunday and to the "indiscriminate arrests, gross violation of sanctity of homes and savage beating of all and sundry, including women and children" which it was alleged, were continuing.

SIX DEMANDS

The statement listed six demands which included the withdrawal of restrictive orders like those under Section 144 Cr PC and the curfew, withdrawal of the Army and armed police from all areas, reopening of educational institutions, supply of kerosene and food in scarcity areas and acceptance of the alternative food policy as enunciated by the ULF.

The ULF warned that unless the demands were met, it would have "no alternative to calling for even mightier struggles".

The four Opposition M.P.s. Mr. N. C. Chatterjee, Mr. Bhupesh Gupta, Mr. Tridib Chowdhury and Mr. Dwijen Sengupta, met the Union Home Minister twice on the day. At the last meeting, which was held in the evening, the opposition team also included two Forward Bloc leaders, including Mr. Hemanta Basu, and two PSP leaders Mr. Bidyut Basu and Balailal Das Mahapatra.

The opposition leaders' attitude was generally stiffer on the day than on the previous day, it was stated. Some demanded that Mr. P. C. Sen must resign if it was desired to restore normal conditions in the State. Mr. Nanda retorted equally vehemently that if this was the attitude then it was better that the Government-Opposition dialogue was immediately ended.

At one stage, Mr. Nanda was said to have suggested that Mr. P. C. Sen should be present at the meeting. The consensus was according to three M. P. present at the meeting, that "condition have not been created for talks with the Chief Minister. They also maintained that Mr. Sen had insulted the Opposition in West Bengal by refusing to talk to them. Statesman 14-3-66

সূচনা : সুবোধ মল্লিক উদ্যান ॥
মোহানা : দেশবন্ধু পার্ক

উদ্বেল জনতরঙ্গে রাজপথে মৌন-প্লাবন

আনন্দবাজার—১৪।৩।৬৬

তদন্ত কমিশন গঠন ও ৩০ জন বামপন্থী নেতার মুক্তি

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তরূপে শ্রীনন্দার প্রচেষ্টার ফলাফল ঘোষণা

বসুমতী ১৪।৩।৬৬

বিক্ষুব্ধ মহানগরীতে ঐতিহাসিক মৌন মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সমুদ্রের মতই বিরাট মহান, কিন্তু সমুদ্রের সরব গর্জন ইহাতে ছিল না। ইহা ছিল অন্তর্গর্জনা—এক মহামৌন মহাশব্দের মহান্ মিছিল।

শহীদ দিবসে কলিকাতা মহানগরীতে অবিস্মরণীয় যে মৌন মিছিলটি বাহির হয়, বৃদ্ধ অথচ শোকনম্র পদধ্বনি ছাড়া তাহার কোন সরব অভিব্যক্তি ছিল না, তবু তাহার ভাষা ছিল অতি সুস্পষ্ট, আবেদন ছিল অন্তরস্পর্শী।

বসুমতী ১৪।৩।৬৬

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

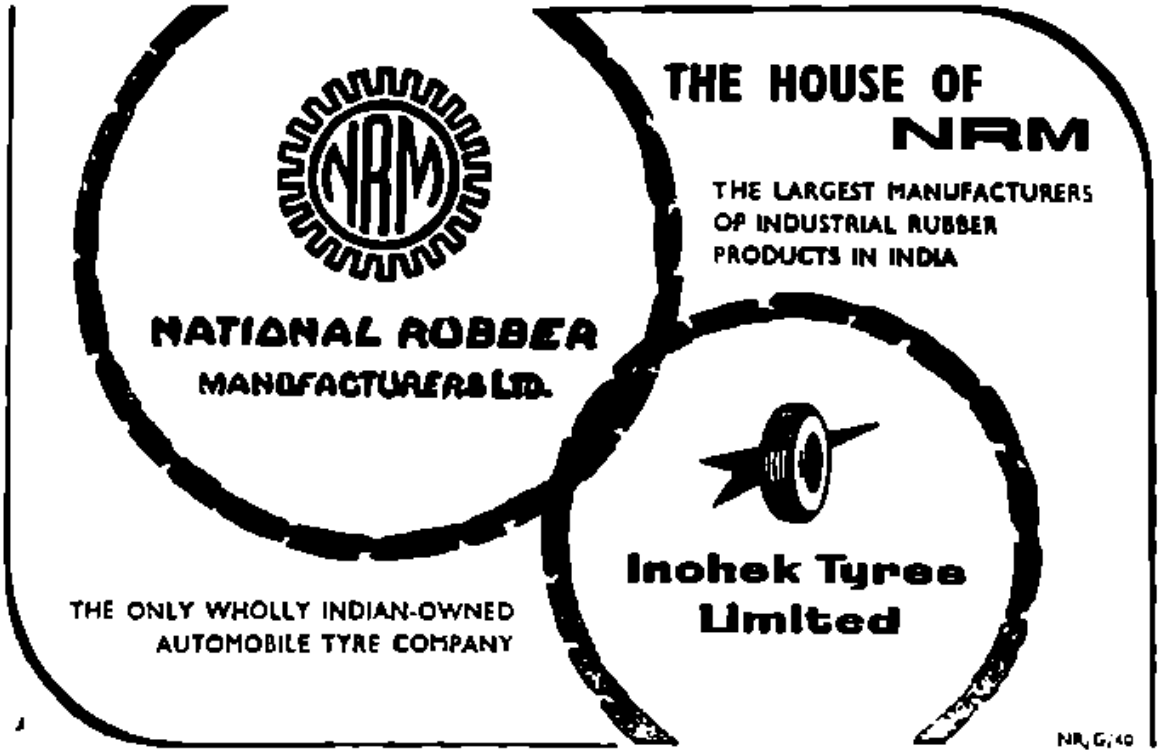

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

সংস্কৃতি সিরিজ

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির তথা বাঙলার মন্দিরগুলির তথ্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। আর্ট প্লেটে ৬০টি ছবি। [১৫·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তর এই বইটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত বিষয়ের মর্মকথার প্রাঞ্জল পরিবেশন। [৭·৫০]

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকবির জীবনবেদের সরল ব্যাখ্যা। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। [২·৫০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ সম্বলিত ও সম্পাদিত। পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম আকর-গ্রন্থ।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
[illegible]টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

একশ' কোটি অতিক্রম করেছে

ভারতে এত অধিক সংখ্যায়
এর আগে কখনও বিক্রী হয়নি

ভেবে দেখুন : একশ' কোটি—তার মানে দশ লক্ষের হাজার গুণ। প্রতি মাসে ধূমপানকারীরা এতগুলি সিগারেট খাচ্ছেন—তার মানে দিনে ৩৩,৩৩৩,৩৩৩টি। অন্য যে কোন দুটি ব্রাণ্ডের সিগারেটের মোট বিক্রির পরিমাণের চেয়েও ঢের বেশী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চারমিনারের সুন্দর নিজস্ব গন্ধ···আমেজভরা অপূর্ব সুস্বাদ। আর দেশজোড়া সুনামের সঙ্গে অন্য কোন সিগারেটের তুলনাই হয় না।

চারমিনারের জুড়ি নেই—
ভারতের সেরা সিগারেট।

দি উজীর সুলতান টোবাকো কোম্পানী লিমিটেড

ভারতের সেরা সিগারেট তৈরী করছেন

CMVB—11—A BN

লাইব্রেরীতে রাখার মতন বই।

সবেমাত্র প্রকাশিত।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের
আধুনিকতম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

অর্চ্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

আধুনিক কবিতার আর একখানি
উল্লেখযোগ্য বই—

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

সাগর আকাশ

দাম—২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন বিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুন্দর, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৯৮

Cover printed by—
RASTICK ART PRESS, CALCUTTA-12

Regd. No. C3643

24 JUN '66

একটি সুপরিচিত নাম

লক্ষ্মী ঘি

এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর

LG-3/65

একবিংশতিতম বর্ষ।
দশম সংখ্যা
চৈত্র। ১৩৭২

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

গল্পভারতী

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ
প্রভাত মুখোপাধ্যায়
জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কোম্পানী আমলের কাহিনী
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গুপ্তচর কাহিনী
হুপর্ণ রায়
বিশ্ব-সাহিত্য
অন্তরীক্ষে

সকাল সন্ধ্যায়

লিলি
বিস্কুট
না হলেই নয়।

লিলি বিস্কুট কোঃ প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৩

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
চৈত্র ১৩৭২, APRIL 1966

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য রচনা কাশ্মীর রণরঙ্গ, অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের তথ্যপূর্ণ—কোম্পানী আমলের কাহিনী, "রবীন্দ্রনাথ", "শিল্পাচার্য্য নন্দলাল ও রবীন্দ্রনাথ" [সচিত্র] এক অচিন্তনীয় সৃষ্টি "আমার সোনার বাংলা", [সচিত্র] সিনেমা আউটডোর স্যুটিং পর্য্যায়ে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দের অভিজ্ঞতালব্ধ মনোরম ভঙ্গীতে লেখা বিচিত্র কাহিনী—চলচ্চিত্রের মুক্ত আঙ্গিক। এ ছাড়া বহু নতুন নতুন ফীচার, নতুন রসের গল্প, বলিষ্ঠ আলোচনা, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র ও অনেক ছবি।

গ-ভারতী

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা—সডাক পনের টাকা

ক

একটা দিনের তরেও কাগজ ছাড়া ! ভাবতে পারেন ? ... না !

ইস্কুলের ছোট্ট ছেলে, মা, বাবা, শিক্ষক, গবেষণা-কর্মী,
দেশনেতা, ইঞ্জিনীয়ার—সকলেরই কাগজের দরকার।
তাছাড়া শিল্পদ্রব্যের প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্যে
কাগজের নিত্য নতুন কত কী প্রয়োজন।

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ খরিদ্দারদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে—
সবচেয়ে পাতলা কাগজ থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে পুরু বোর্ড
পর্যন্ত—বহু বিচিত্র ধরনের কাগজ আর বোর্ড তৈরি ক'রে থাকে।

ROHTAS

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ডালমিয়ানগর (বিহার)

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্প শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ওস্তাদ অসরাম বলেন

"ল্যাম্পটা

Osram

হলে আপনারই লাভ"

খেলা বা কাজ যা-ই হোক, আলোর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কি বাড়ীতে, কি অফিসে, অসরামই হচ্ছে ঠিক ল্যাম্প। কারণ এই ল্যাম্প টেঁকে অনেক দিন, আর আলোও দেয় অনেক বেশী। অসরামের পেছনে রয়েছে জি.ই.সি.—যারা ল্যাম্প ও আলোর ব্যাপারে বিশ্বে নেতৃস্থানীয়। কাজেই যে ল্যাম্পের ওপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন, সেই ল্যাম্পটিই কিনুন

G.E.C আপনার গ্যারান্টি

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং, অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

GEC/G/71

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

CF-1 63 BEN

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

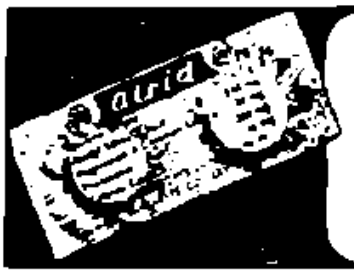

মাথাধরা, ব্যথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড ৫টি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অস্বস্তি কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান — সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

ছেলের কাছে রাখুন

ওষুধ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রবমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেম সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম শ্রেণীর পরিধেয় হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই দেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রয়িৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এস, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, গায়ালাল আগরওয়াল; বহাদীর স্টোর্স; মন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল রাধেশ্যাম; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ হরারাম গেঞ্জী; জয়রুক অয়োরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮০

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ে—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের এন্টাস্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৮৮১

গুপ্তচর কাহিনী—

হাওয়াই দ্বীপের রূপসী—সুপর্ণ রায় ৯২১

বিয়ের মালিক—আনন্দ ভট্টাচার্য্য ৯২৫

বিশ্ব-সাহিত্য

সাগর থেকে ফিরে—মূল : জন ম্যাসে ফিল্ড

অনুবাদ—গৌরীশঙ্কর দে ৯৩০

প্রতিদিনের *প্রতিটি প্রহর প্রতিটি মুহূর্ত*

ভারতীয় রেলপথ অব্যাহত-গতি। প্রতিদিন চব্বিশঘণ্টা ১২,০০০ ইঞ্জিন, ৩২,০০০ যাত্রীবাহী কামরা এবং ৩,৫৫,০০০ মালগাড়ী নিয়ে প্রায় ১০,০০০ ট্রেন লৌহবর্ত্মের সুবিস্তৃত ও জটিল রেখা-জালের ওপর দিয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি পরিক্রমারত। ভারতীয় রেলপথ দেশের বৃহত্তম জাতীয় সংস্থাগুলির অন্যতম। তার সুবিস্তৃত রেলপথ, স্টেশন, কারখানা, ইঞ্জিন, গাড়ী ইত্যাদিতে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৩,০০০ কোটি। প্রগতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং এক সংহত সমাজের সংযোগ সাধনের জন্যেই এই বিনিয়োগ।

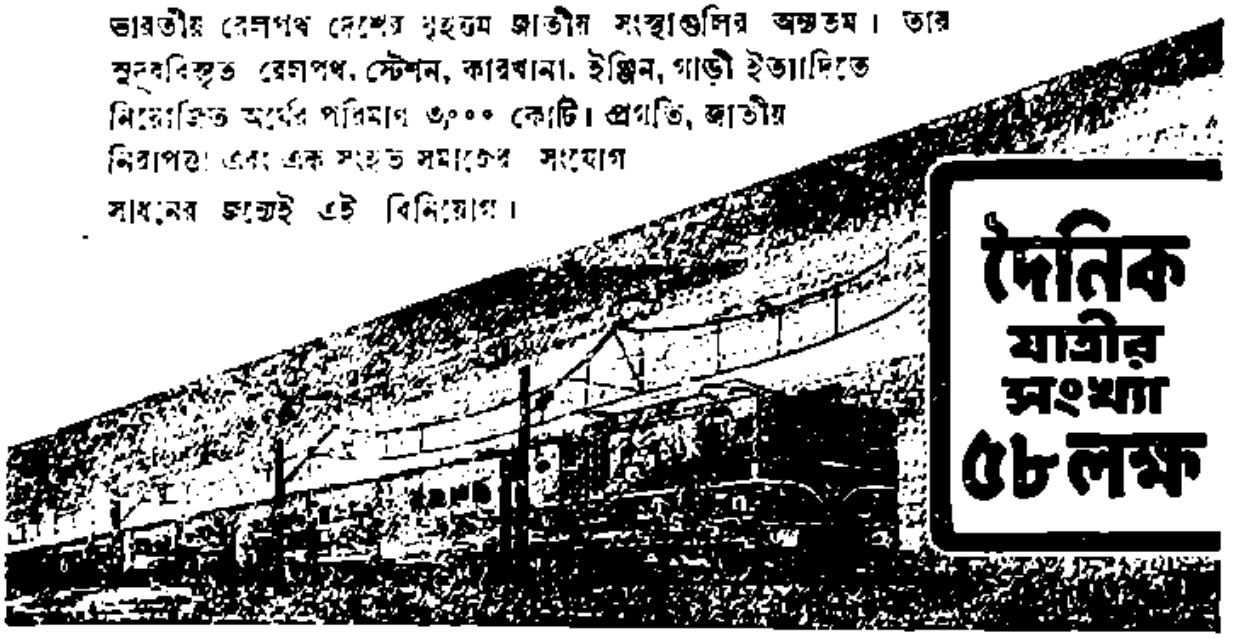

দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ

মাল পরিবহণ

১৯৫০-৫১ সালে পরিবাহিত মালের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৮৫-৮৬ সালে তার বর্দ্ধিত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টন-এ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় রেলের মাল পরিবহণ ক্ষমতা অনেক বেশী।

যাত্রী

১৯৫০-৫১ সালের ১১৮ কোটি ৫০ লক্ষ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪১০ কোটিতে পৌঁছেছে।

প্রতিরক্ষা

দেশের ৩৯টী অবস্থায় ভারতীয় রেলপথ তার দায়িত্বভার আশাতিরিক্তভাবে প্রমাণ করেছে। যেমন ১৯৬২-তে তেমনি ১৯৬৫-৭৪ রেলপথগুলি প্রতিরক্ষার সমস্ত পরিবহণ প্রয়োজন তৎপরতার সঙ্গে ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছে।

ভারতীয় রেলপথ

জাতির সেবায় ১১৩ বছর

IRF-3M3-66

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই দেশকালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাঙ্গার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ

মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ৯৩৪

শিথিল কবরী বাঁধিও—আভা পাকড়াশি ৯৩৬

মুখ পদ্মের বৃন্ত—নীলিমা দে ৯৩৮

কোম্পানী আমলের কাহিনী—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৩৯

রোমা রোঁলা— ৯৪৬

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৯৪৮

জীবন নাট্যের অশান্ত নায়ক—সংবাদিক ৯৫৩

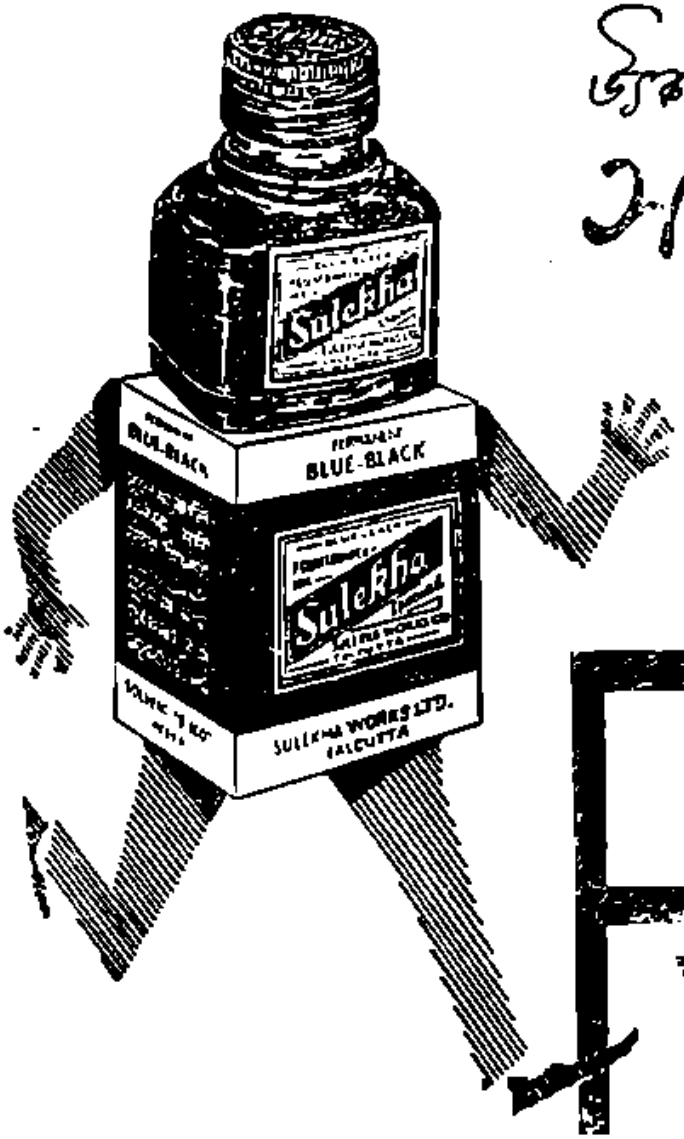

উৎকর্ষ ও উপযোগিতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ঝরঝরে
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এইচ.এস. সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

এক এক দিন—রজত রায়চৌধুরী ২৫৬

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৬১

চলতি দুনিয়া ২৭০

বর্ণান্তর—বীথি বসু ২৭৩

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ২৭৭

অশান্ত পৃথিবী—নলিনীরঞ্জন মিত্র ২৮০

খেলা ধূলা— ২৮৩

শেষ মুহূর্ত্ত— ২৮৬

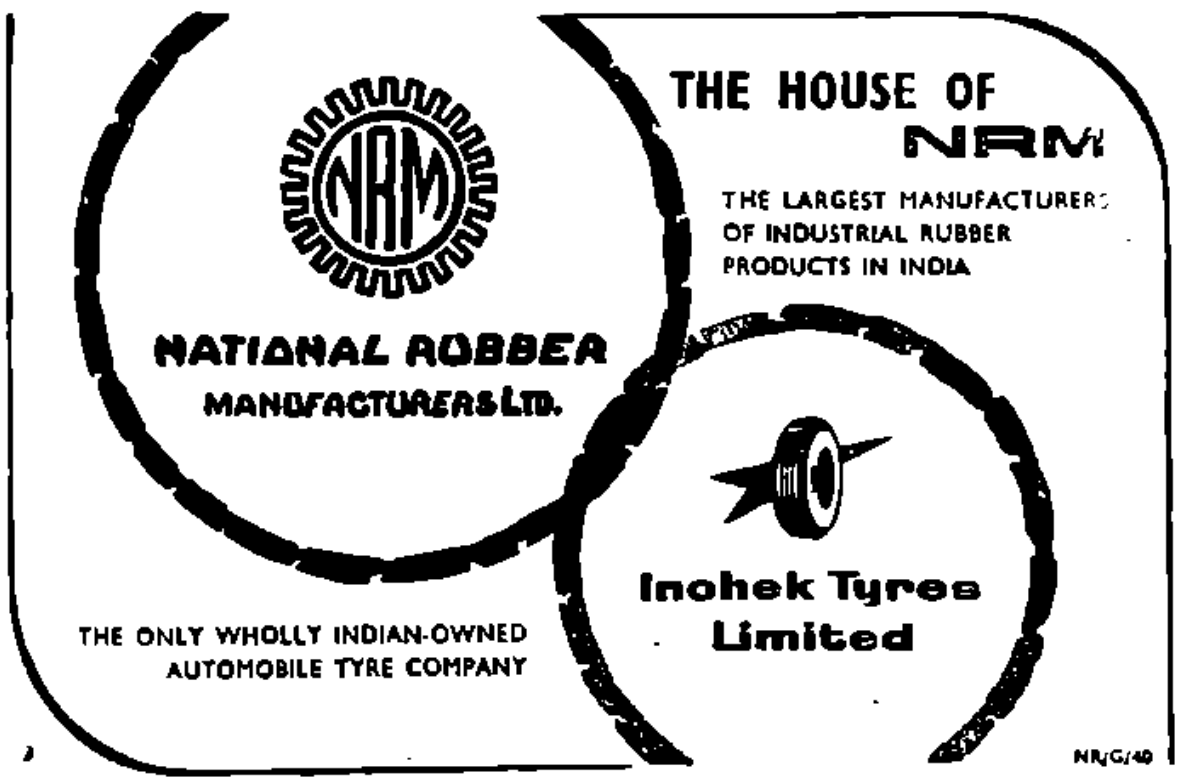

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

কাশ্মীর রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলেন লেখক। বর্ণনা করলেন অপরূপ রসাশ্রিত অলঙ্কৃত ভাষায়। আর সেই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করলেন কাশ্মীরি নরনারীর অনেক আশ্চর্য বীরত্ব কাহিনী, হানাদারদের পৈশাচিক অত্যাচারের অনেক রোমহর্ষক গুপ্ত কার্যকলাপ। কাশ্মীরি-রণরঙ্গ শুধু এক প্রামাণিক ইতিহাস নয়—এ এক অপূর্ব সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়
কাশ্মীর রণরঙ্গ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ তেরো ॥

ছোউটা সারাদিন

ঘুমোবার আগে অনেক ভেবেছিলাম রুকায়ার কথা রসরাজকে কি বলব, কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি। কিছুই বলতে হল না, ও বুঝে নিয়েছিল ঠিকই, না হ'লে কালকের কথা জিজ্ঞেস না ক'রে ও সোজাসুজি কাশ্মীরের কথাটা পাড়ত না। ওরই কাছে জানা গেল, যে শ্রীনগরে কার্ফু জারি হয়ে গেছে বিকেল চারটে থেকে সকাল আটটা। এটা রেডিওর সংবাদে। তার মানে বেরোনো যাবে কিন্তু ফেরানো যাবে না। মনটা তাই একটু বিগড়ে গেল। গভীর অবচেতনায় নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল আজও ভেসে যাই এদিক ওদিক যেখানে হয়। তাই যদি না থ'কবে তাহ'লে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতে বসব কেন শ্রীনগরের কাছাকাছি অথচ লোকালয়ের থেকে দূরে রুকায়াকে নিয়ে যাওয়ার মতন জায়গা কি কি আছে?

চায়ের টেবিলে ব'সে পাকিস্তানি চক্রান্তের কথা আলোচনা করা গেল। ভাইয়াজী কানে কম শোনেন ঠিকই কিন্তু শুনেছেন অনেক কথা। ওঁরই কাছ থেকে জানা গেল, যে এই হাজার হাজার হানাদার অংশবার মূল কারণ কেবল পাকিস্তান একলা নয়, কাশ্মীরেরও কিছু লোক আছে তাদের সবার মাথা হ'লেন দুজন—বকসি গুলাম মহম্মদ আর শেখ আবদুল্লাহ। আরও যাঁরা যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন বকসি সাহেবের শালা'বাবু।

একে একে ধরতে গেলে সবার আগে হলেন শেখ আবদুল্লাহ। আজও কেউ সঠিকভাবে

আমেনা ওঁকে অমন হঠাৎ ছাড়া হল কেন! কেউ বলেন, ওটা পণ্ডিতজীর আরও একটা বোকামির চূড়ান্ত, কেউ বলেন, ওটা রুকমেদন সাহেবের ষড়যন্ত্র লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আর নন্দা সাহেবকে ফাঁদে ফেলবার প্রচেষ্টা। কাশ্মীরিরা বলেন ওটা বক্সি সাহেবের বদমাইসি। উনি যখন দেখলেন যে ভারতের পয়সায় ওঁর, ওঁর পা'লার আর ওঁর গুষ্টির পকেট এতো ভরেছে যে রাখবার আর জায়গা নেই আর সেই নিয়ে গণ্ডগোলের সীমাও নেই তখন তাক্ বুঝে ঐ বোমাটি ছাড়লেন। উনি ঠিকই জানতেন যে শেখ সাহেবকে চাড়লেই উনি স্বাধীনতার ধুয়ো তুলবেন আর সেই ঝড়ে লোকে ওঁর টাকা হজমের কথাটা ভুলে যাবে। ভুলে ঠিক না গেলেও, লোকে ভাববার অবকাশ পাবে না। হলও তাই। এ বিষয় সাদেক সাহেবের প্রচুর আপত্তি ছিল কিন্তু বক্সির ছিল ভারতীয় সরকার মহলে অগাধ প্রতিপত্তি। ওঁর আপত্তি তাই ধোপে টিকল না এবং একদিন মহাসমারোহে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন লক্ষ লক্ষ লোকের কাঁধে চেপে। কাশ্মীরে সেইদিনই হল ভারত বিরোধী দলের প্রথম সদম্ভ আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ছাড়া যখন হ'য়েছে তখন উপায় নেই। মীর কাসিম সাহেব মন্ত্রিপদ ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে গ্রামে—শেখ আবদুল্লাহের উসকানির বিরুদ্ধে ঘর সামলাতে। ওঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাস ছয়েক পর দেখা গেল শেখ সাহেবের সাধারণ মিটিংয়ে আর লোক হয় না। তিনি মাঠ ছেড়ে ঢুকলেন মসজিদে আর আরম্ভ হল প্রতি শুক্রবার নমাজের আগে তাঁর স্বাধীনতার বাণী প্রচার।

এই সময় কাশ্মীর সরকার আরও একবার উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন ওঁকে বন্দী করার ব্যবস্থায়—অপরাধ রাজদ্রোহ। ভারত সরকার আবার বাধ সাধলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ধরা চলবে না, নজর রাখো। ওঁকে আবার ধরলে পাকিস্তান চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে বিশ্ব মাথায় করবে। বাধ্য হ'য়ে কাশ্মীর সরকার চুপ ক'রে গেলেন আর কাশ্মীরবাসী ওঁর কথা শুনতে লাগল। হিটলারের একটা উপদেশ ছিল, মিথ্যে কথাকে যদি সত্যি ব'লে চালাতে চাও তাহ'লে সেটা বাড়িয়ে আর বড় গলায় বল। শেখ সাহেবও তাই আরম্ভ করলেন। বক্সি সাহেবের যত কুকীর্তি উনি সব চালিয়ে দিলেন ভারত সরকারের নামে আর কাশ্মীর সরকারের বদনামে। যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝল কিন্তু জনসাধারণ কবে কোন জিনিষটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রেছে? কাশ্মীরের লোক বলতে আরম্ভ করল, তাইতো! তাহ'লে?

হিটলারের কথা যেমন সত্যি, ফ্রয়েডের কথাও তেমনি কম সত্যি নয়। ফ্রয়েড বলেছেন, মন যদি ময়লা হয় তাহ'লে মুখের কথায় একদিন না একদিন তা প্রকাশ হ'তে বাধ্য। হলও তাই। এমনি যারা এক জনসভার মিটিংয়ে শেখ আবদুল্লাহ মহা সমারোহে ঘোষণা করলেন এলজিয়ার্সে যা ঘটেছে, কাশ্মীরেও তা একদিন ঘটবেই অর্থাৎ গোরিলার দেশ ছেড়ে যাবে আর শাসনতন্ত্রের পতন ঘটবে। আর আসবে পাকিস্তানি! এটা আজ নয়, অনেক আগেকার কথা—ওঁর বিদেশ যাওয়ার ঠিক আগে! কাশ্মীর সরকার আবার বসলেন, এইই ধরার অপূর্ব সুযোগ। ভারত সরকার ধরলেন নাইই উল্টে বড় রকমের 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' দিয়ে দিলেন হজ করতে যাওয়ার জন্যে। ওঁর পাসপোর্টের ব্যাপারটাও রীতিমত হাস্যকর। আমরা যখন দরখাস্ত করি পাসপোর্টের জন্যে আর তাতে যদি ভুল থাকে একটা ছোট্ট কমার তো ছুটে-বেড়াতে হয় ছ'মাস। ওঁর পাসপোর্টের আবেদন জন্মস্থানের জায়গায় লিখলেন "স্বাধীন কাশ্মীর!" পাসপোর্ট কেরানী শেখ সাহেবের এই বিচিত্র "স্বাধীনতা" মানতে রাজি হননি এবং আবেদন পত্রটি ফেরৎ দেয় ফলে শেখ সাহেব 'চাই না তাহ'লে'

বলে হাত গুটিয়ে নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মহলে যেন বাজ পড়ল। কেরানীটির চাকরি যোল মতে বাঁচল আর শেখ সাহেবের পাসপোর্ট তাঁকে লোক মারফৎ কাশ্মীরে পৌঁছে দেওয়া হল !!

শেখ সাহেবের হজ যাত্রা আর আমাদের তারিণী খুড়োর মা মরা এক জিনিস। তারিণী ছিল আমার এক কেরানী। সে একবার 'মা মরেছেন' শ্রাদ্ধ করতে হবে বলে ছুটি নিল। বছর তিন চার পরে তার আবার মা মরলো এবং আবার শ্রাদ্ধের জন্য দরখাস্ত এলো। খোঁজ ক'রে জানা গেল যে প্রথমবার তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মরেছিল আর দ্বিতীয়বার সে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রেছিল। শেখ সাহেবের মেমসাহেব স্ত্রী আছেন তাঁর হজের নামে তিনি লাফির হ'য়েছিলেন এদিকে পাকিস্তান আর ওদিকে এলজিয়ার্স। এটা তাঁর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল কারণ ষড়যন্ত্র সবটা চিঠিতে বা লোক মারফৎ হয় না। এখানে ব'লে রাখা ভালো এবং দরকার যে সাহেবসাহেব এই পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতেন না।

শেখ আবদুল্লা'র সঙ্গে ছিলেন আফজল বেগ। শেখ না হয় কোরাণ আউড়ে বক্তৃতা করেন বলে হজের দাবী করতে পারেন কিন্তু আফজল বেগ? তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন বেশ জোর গলায় বলতেন আমি 'কম্যুনিষ্ট', ধর্ম মানিনা। হঠাৎ তাঁর ধর্মভাব হল কেন আর ভারতই বা তাঁকে যাওয়ার জন্যে পাসপোর্ট দিলো কেন? কেউ কেউ জোর গলায় বলেন, পাসপোর্ট দপ্তর পনেরো লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছিল! দপ্তরের বড় কর্তা কি বলেন আমার ঠিক জানা নেই।

ঠিক যাওয়ার আগেই যে লোকটা 'কাশ্মীরে এলজিয়ার্সের অবস্থা হবে' বলে শাসিয়ে যায় এবং ফিরেই যে লোকটা পাকিস্তানি হুবহুবৎ, আর চীনের চাউ এন লাই-র সঙ্গে দেখা করে এবং যে লোকটা দেশে ফেরার অল্পদিনের মধ্যেই কাশ্মীরে এতো বড় একটা কাণ্ড ঘটে যায়, সে লোকটা আর যাই হক, ঠিক নির্দোষ নয়। আরও একটা তাজ্জব ব্যাপার হল, যে লোকটা কাশ্মীরের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতো উৎসাহী সে কাশ্মীরের এতো বড় বিপদে একটা কথা বলেনি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তো দূরের কথা! আজ উনি বন্দী আছেন। কবে দেখা যাবে ভারতের দুর্মতি হ'য়েছে আর উনি মুক্তি পেয়েছেন!

ওঁর পরই হলেন বক্সি গুলাম মহম্মদ। ছোট্ট ক'রে বলতে গেলে, হকিষ্টিক হাতে বাস স্ট্যাণ্ডে লোক ডাকার পরই উনি ছিলেন খাদি ভাণ্ডারের কেরানী। ১৯৩৯ সালে যখন শেখ আবদুল্লা মুসলীম কনফারেন্স নাম বদলে ওটা করলেন ন্যাশন্যাল কনফারেন্স আর সাদেক সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়া কাশ্মীরের পরিকল্পনা পেশ করার জন্যে মিটিং ডাকলেন তখন আবার হকিষ্টিক হাতে বক্সি হ'লেন ভলেন্টিয়ারদের নেতা। সেই থেকে উনি ছিলেন শেখের ডান হাতে বলে বডিগার্ড। ১৯৪৬এ যখন 'কুইট কাশ্মীর' আন্দোলন হল তখন শেখের সঙ্গে উনিও গেলেন জেলে আর জেল থেকে বেরিয়েই হ'য়ে বসলেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর কাজ হল—মনে হয় মন্ত্রণা দেওয়া। উনি নাম করলেন মন্ত্রণা দেওয়ার। পিটিয়ে কাকে সোজা করতে হবে—ডাকো বক্সি সাহেব, মেরে কাউকে ঠাণ্ডা করতে হবে, ডাকো বক্সি সাহেব—এইটাই ছিল ওঁর রেওয়াজ। ওঁর সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

গুণ্ডামিতে ওঁর পাকা হাত দেখে সবাই বলতো, পুলিশে যা। কথাটা মন্দ নয়, মনে ধরল। উনি চাকরির দরখাস্ত ক'রে ইন্টারভ্যু পেলেন। মহারাজের মন্ত্রী কাক সাহেবের খাঁটি বিলেতি শাল। তখন ওখানকার পুলিশ সাহেব। তিনি ইংরেজিতে দু'চারটে প্রশ্ন করলেন, বক্সি সাহেব মাথা

নাড়লেন, জবাব দিলেন না। তখন সাহেব শেষ করলেন, বাপু হে, ঠিক ক'রে বল দেখি তুমি কি পারো? বাপু সাহেব রাজকীয় ইংরেজিতে বললেন, "থ্রি ডে আই রিট, ইউ রিকাম মাই স্যালা!"

এ হেন বক্সি সাহেব হলেন উপপ্রধান মন্ত্রী আর ডাকাবুকো মানুষ ব'লেই বোধহয় উনি হ'য়ে উঠলেন পণ্ডিত নেহেরুর পেয়ারের লোক। এখনও অনেকের মত যে পণ্ডিত নেহেরু যদি ওঁকে আমল না দিতেন তাহ'লে ওঁর এবং সেই সঙ্গে কাশ্মীরের আজকের দুরবস্থা হত না। কথাটা বোধহয় ঠিক। সাতচল্লিশে আমি যখন কাশ্মীরে ছিলাম তখন উনি ছিলেন অন্য মানুষ। বহুদিন আমরা কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে একসঙ্গে ঘুরেছি, উঠেছি ব'সেছি, কখন একথা মনে হয়নি যে উনি টাকার কাঙাল হ'য়ে উঠবেন।

শেখ আবদুল্লা ধরা পড়ার পর উনি হ'লেন প্রধানমন্ত্রী আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ওঁর পতন। পাওয়ার এলো আর এলো পয়সার লোভ। আমাদের কংগ্রেস মন্ত্রীমহলে এ বিষয় উনি একক নন। মাদ্রাজ ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই টাকা-খানানো মন্ত্রী বহু হয়েছেন, আছেন এবং থাকবেন। দুঃখের কথা যে ওঁকে হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিতজী নাকি ওঁকে কথাটি বলেন নি।

টাকা-খানানোর পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। ভারত সরকার টাকা দিতেন যাতে কাশ্মীরে চাল বিক্রি হয় দু'আনা সের। হতও তাই, কেবল কাগজ কলমে। কেনা দাম পড়ত, চার আনা সের, ভারত সরকারকে হিসেব দিতেন আট আনা সের। আর বাজারে চাল বিক্রি হত আট আনা সের (রসিদ চাইলে দেখা হত দু'আনা সের)। অর্থাৎ বক্সি ব্রাদার্স সের প্রতি ভারত সরকারের কাছ থেকে পেতেন চার আনা আর মার্কেট থেকে পেতেন চার আনা। এ ছাড়াও ছিল চিনির ব্যবসা আর ছিল কেরোসিন তেলের ব্যবসা। কাশ্মীরের জন্যে যে সব চিনি আর তেল যেত, শ্রীনগরের বাজারে তা ঠিকমত পাওয়া গেলেও আর কোথাও কখন পাওয়া যেত না, কারণ বেশীটাই চ'লে যেত আজাদ কাশ্মীরে!

সে যাওয়ার পথ ক'রেছিলেন উনি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, নিজের মনের মতন ঠিকাদার রেখে। সারা কাশ্মীর ভর্তি জঙ্গল। উনি বাছা বাছা জায়গায় নিজের পছন্দমত ঠিকাদার রেখেছিলেন বাছা বাছা প্রো-পাকিস্তানি আর ইচ্ছে মত তাদের দিয়েছিলেন লরীর পারমিট। এই নিয়েই সাদেক সাহেবের সঙ্গে ওঁর প্রথম ঝগড়া হয় সে কথা আগেই শুনেছি। বাইশজন বড় ঠিকাদারের সাতাত্তরটা লরীতে কাঠ আসত আর লরী বোঝাই ক'রে ক'রে আজাদ কাশ্মীরের জন্যে চাল যেত, চিনি যেত, কেরোসিন যেত। এই যাওয়া আসার ব্যাপারে ওঁর ডানহাত ছিলেন শালা আর ভাই আর মেহরও ছিলেন কয়েকজন নাম করা মাড়োয়ারি বংশের ছেলেরা—যারা ঐসব জিনিষ চালান দিত কাশ্মীরে। বলাবাহুল্য, এই মাড়োয়ারিরা বিরল ব্যবসাদার! লয়ালও শুনেছি!

রাজ্যভার ছেড়ে বক্সি সাহেব যখন ব্যবসার মন দিলেন আর বিশেষ ক'রে ঠিকাদার নিযুক্ত করার ব্যাপারে হ'য়ে উঠলেন হিটলার তখন সাদেক সাহেব গেলেন দিল্লী আর ফিরে এলেন তন্ত্রভাবে 'বিতাড়িত' হ'য়ে। শেখ আবদুল্লার পর নিজে প্রধানমন্ত্রী না হ'য়ে উনি প্রথম ভুল করেছিলেন। এবার দ্বিতীয় ভুল করলেন মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে। উনিই ছিলেন বক্সির একমাত্র প্রতিবন্ধক। ওঁর মন্ত্রীত্ব ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্সি হাতে চাঁদ পেলেন আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দেখতে দেখতে লাখপতি হয়ে উঠলেন ক্রোড়পতি।

সত্যিই ক্রোড়পতি! খুরসিদ নারীর একটি নাবালিকাকে প্রথমে ক্রোড়ে বসিয়ে এবং ন' মাস পরে তার পতি হ'য়ে। খুরসিদ শুনেছি এক আমি অফিসারের তিন তলার কনিষ্ঠতমা। ওঁর মা একজন কৃতি মহিলা। শোনা যায় যে স্বামী মারা যাওয়ার পর উনি প্রথমদিন তাঁদের সমবেত কোপ মারার ঘাড়টা ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে কেঁদে। নিজে কোপ মেরে এবং মেয়েদের দিয়ে কোপ মারিয়ে তাঁর দিন কাটছিল এক রকম মন্দ নয়। এমন সময় তাঁর ভাগ্যাকাশে উদয় হ'লেন বক্সি সাহেব বাদের পারমিট নিয়ে। কথায় বলে, শকেটে টাকা থাকলে চোখটা যায় উটতি ছুঁড়ির দিকে। ওঁর প্রথম নজর গেল পড়তি নারীর দিকে। বাদের পারমিট নিয়ে উনি বসবাসের পারমিশন পেয়ে গেলেন।

দিন যত যায় মায়ের আশা তত বাড়তে থাকে। কিন্তু বাদের পারমিট আর লম্বীর লাইসেন্সে যখন তাঁর আঁচল ভরল, তখন হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে আঁচলের টানটা কমেছে। বক্সি সাহেব যাই যাই করছেন। উনি মেয়েকে এগিয়ে দিলেন পথ আটকাবার কাজে এবং মাস তিনেক পরে বার ক'রে দিলেন হলিয়া—হয় বিয়ে কর, আর না হয় খেসারৎ দাও, কন্যা সন্তানসম্ভবা! বক্সি সাহেব বাধ্য হ'য়ে বিয়ে করলেন।

নামে কামরাজ হ'লে কি হবে লোকটা একেবারে অ-কংগ্রেসী আর ব্রহ্মচারী। উনি গেলেন ক্ষেপে। মোরারজী দেশাই, বিজু পট্টনায়েক প্রমুখ কিছু লোক ইতিমধ্যেই ওঁর প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছিলেন—এবার তাঁর সঙ্গে জুটলেন বক্সি। হল কামরাজ প্ল্যান। বক্সি সাহেব ইতিমধ্যে পণ্ডিতজীকে ম্যানেজ করলেও কামরাজের সঙ্গে ঠিক পেরে ওঠেন নি—তাই প্ল্যানের কথা শুনে ভাবলেন কামরাজকে জব্দ করার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। উনি মাথা নেড়ে বললেন, "আহা সাহেব কি প্ল্যানই ক'রেছেন। আমিও যে একজন আদর্শ কংগ্রেস কর্মী এবং দেশের সেবক, এইবার তার প্রমাণ দেব—এই নিন্ আমার রেজিগনেশন্।" কামরাজ বললেন, "সে কি ক'রে হয়? তুমি তো এখনও চার আনার সভ্য নও!" বক্সি সাহেব তক্ষুণি চার আনা দিয়ে মেম্বার হ'য়ে গেলেন। কামরাজ জানতেন, মেম্বার না হ'লে রেজিগনেশন পত্র যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে, কারণ ঐ প্ল্যানটা ছিল কংগ্রেস কর্মীর প্রতি প্রযোজ্য। বক্সি সাহেব খুশী হ'য়ে কাশ্মীর ফিরলেন আর কামরাজ খুশী হ'য়ে কানে তুলো দিলেন।

বক্সি ভেবেছিলেন ওঁকে ছাড়া কাশ্মীর চলবে না, অতএব কামরাজ প্ল্যানটা ওঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সাতদিন পরও যখন দিল্লী থেকে কোন উচ্চবাচ্য হল না ঐ নিয়ে তখন বক্সি সাহেবের টনক নড়ল। কামরাজ কানে তুলো দিয়েছেন, কথাটি বললেন না। বাধ্য হ'য়ে নতুন প্রধান মন্ত্রীর সন্ধান আরম্ভ হল এবং পালাবাবু হ'য়ে দাঁড়ালেন প্রার্থী। কামরাজ বললেন 'অসম্ভব'। ভারত সরকার বললেন 'সাবেক সাহেব', বক্সি বললেন 'অসম্ভব'। অতএব মিটমাট হল 'সাদিক'।

মাস দুয়েক সাদিক সানন্দে বক্সি সাহেবকে গুরু মানলেন। ওঁর কথায় ওঠেন বসেন। কিন্তু যে যার লক্ষ্যে সেই হয় রাবণ। সাদিক উলটো সুর ধরলেন। বক্সি সাহেব আর পাত্তাই পাবেন না। পালাবাবু তখনও ভাশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারি। তিনি তো ক্ষেপেই অস্থির। আবার আরম্ভ হল ষড়যন্ত্র। কোন রকমে যদি সাদিককে হটানো যায় কিছু হট্টগোল ক'রে তাহ'লে বক্সি আবার ফিরে আসতে পারেন।

এই সময় বক্সি সাহেবের নিষ্ঠাবান ধার্মিক মা ছিলেন অসুস্থ। তাঁর হল অসুখ আর ডাক্তাররা ছাড়লেন হাল। উনি আর ভালো হওয়ার নন। মারা যাওয়ার দিন দুয়েক আগে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যদি হজরতের চুলটা একবার দেখা যায়। সেটা তো রীতিমত অমূল্য। হজরত বলের মসজিদে লোক যায় সেটা দেখতে আর দেখে আল্লাহতালার তুষা কুড়োতে। মাসে একদিন সেটা বড় মোল্লাহ সাহেব তোলে ক'রে নিয়ে তোষাখানার বারান্দায় দাঁড়ান আর নিচের মাঠে হাজার হাজার লোক—হিন্দু মুসলমান, শিখ সব হাউ হাউ ক'রে কাঁদে! এতো বড় পবিত্র জিনিষ কাশ্মীরে আর নেই।

বক্সি সাহেব মাতৃভক্ত ছেলে, লোক পাঠালেন কাশ্মীরে—আনো হজরতের চুল, মা দেখবেন। চুল এলো শনু আনলেন খালাবাবু। মা চুলটা মন ভ'রে দেখে চোখ বুজলেন। শালা ভণ্ড'দল চুলটা দেখে চোখ টিপলেন। মাসখানেক পরে একদিন সংবাদ র'টে গেল, হজরতের চুল চুরি!

শুধু শ্রীনগর নয় সারা ভারতে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে লোক এলো দুদিনের মধ্যে। শাসনতন্ত্র হায় মেনে হাল ছাড়ল। ন্যাশনাল ছিল দু কেরতা—হিন্দুর নামে অপবাদ দিয়ে সামন্তদিনকে অকর্মণ্য প্রমাণ করা হবে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। প্রথম যেদিন 'মাতম' শুরু হল সারা শ্রীনগর জুড়ে সেদিন দেখা গেল, শুধু মুসলমানই নয়, সঙ্গে আছে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, সব। আরও একটা খবর বাতাসে রটল—বক্সি সাহেবের মার অসুখের সময় ওটা গিয়েছিল শনু তারপর আর কেউ ওটা দেখেনি। ব্যস্ জনতা ক্ষেপেই অস্থির। বক্সি ব্রাদার্সের যত সম্পত্তি সব পুড়তে আরম্ভ হল। এদিক থেকে সারা ভারতের সেরা বুদ্ধি ওখানে গিয়ে হাজির আর সাতদিনের মধ্যে হজরতের চুল পাওয়া গেল মসজিদের বাগানে।

এখন প্রশ্ন হল, কে নিয়েছিল? কে বের করল ওটা? আর কেইই বা রাখল ওটা বাগানে? শালবাহাদুর শাস্ত্রী গিয়ে বললেন, আমরা জানি কে নিয়েছিল। তারপর যদি বলতেন, "কিন্তু বলব না" তাহ'লে অন্য কথা ছিল। উনি ভুল ক'রে বলে বললেন 'বলব, দিন পনেরো পর যখন সব মিটে যাবে।' উনি আজও তাঁর সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেননি বলে কাশ্মীরিদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, এই চুরির ব্যাপারে ভারতের কোন বড় একজন কেউ জড়িত। প্রশ্ন হল কে? ওঁরা বলেন, এই চুরির কিছুদিন আগেই নাকি কৃষ্ণমেনন ওখানে গিয়েছিলেন এবং বক্সির কাছে ছিলেন। কেন তা তিনিই জানেন। আরও একটা গল্প শোনা যায় যে, বক্সি নাকি ভারতের সঙ্গে একটা রফা ক'রেছিলেন এই বিষয়। উনি নাকি ব'লেছিলেন যে কে নিয়েছে যদি বলা না হয় তাহ'লে উনি নাকি ওটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই জন্যেই নাকি কে নিয়েছিল সেটা ভারতীয় শাসনতন্ত্র কখনও প্রকাশ করেনি।

প্রকাশ না করার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, তবে কথা দিয়ে সেটা না রাখার ফলে ভারতের সুনাম যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বহু নির্যাতীত কাশ্মীরি ভারতের ওপর আস্থা হারিয়ে আজ পাকিস্তানের দিকে পাল্লা ভারি করেছে। বক্সি আজও কাশ্মীরে বর্তমান এবং বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি বহু অর্থ আত্মসাৎ করার অজস্র জলজ্যান্ত প্রমাণ আছে। এ কথা সবাই বলেন, অথচ ভারত কেন যে কোন উচ্চবাচ্য করে না তা কেউ বোঝে না। লোকে বলে, বিরল মাদ্রোয়ারি সম্প্রদায় ঐ ব্যাপারে জড়িত ব'লেই ভারত সরকারের এই চাক চাক গুড় গুড়। আরও শোনা যায়,

এবং সেটা আরও অনেক বেশী জলঙ্গিত যে বহু খনামধন্য কাউন্সিল পরিষদ এবং কম ক'রে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পার্লিয়ামেন্টের বহু নামকরা সভ্যও নাকি এই বক্সি ষড়যন্ত্রে সামিল আছেন। যাঁদের নাম হয়ত অকারণেই এ প্রসঙ্গে শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন বিহু পট্টনায়ক, রেড্ডি সাহেব, এ. কে. আলবা এবং সিনহা মেহসাহেব। আরও শোনা যায় যে, বক্সি সাহেব বেশ লম্বা চওড়া একটা তালিকা আর সঙ্গে তার পাঁটে কত লাখ টাকা উঠেছে তার সঠিক হিসেব দাখিল ক'রে পণ্ডিতজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ছেলে মেলে তিনি একলা যাবেন না। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা জানবার সম্ভাবনা একজন নেই, কারণ এসব ব্যাপারে মুখ খুলতে মহত্ত্ব লাগে। আমাদের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীতে সেইটাই নেই।

॥ ষোল ॥

পাঁচ আর ছয়

চার তারিখের রাত থেকেই এমন গুজবের ঝড় শুরু হল যে, মনে হল কাশ্মীর তো গেছেই, ওদিকে বোম্বের কেপ কমোরিণ পর্যন্ত ভারতও গেছে। কারফ্যু আরম্ভ হ'লে কি হবে, লোক আসা যাওয়ার বিরাম নেই। বলাবলি করে, হ'য়ে গেছে রাত আটটার সময় কালা ভাইয়াজীও কানে মাফলার জড়িয়ে রওনা দিলেন। উস্কানি দিল বুড়ো চাকর বাজার ঘুরে এসে। সে বিচক্ষণের মতন মাথা নেড়ে বললে, কারফ্যু তো আছে ঠিকই কিন্তু সহরে সেটা মোতায়েন করার মতন পুলিশ কৈ? রাতে হিসেব ক'রে দেখা গেল নিরপেক্ষবাদী হিরো আর তাঁর আমি ছাড়া সবাই কারফ্যু দেখে আর কাশ্মীরের খবর জেনে এসেছে। আমি জোর করলে বলরাজ বোধহয় রাজি হত কিন্তু যাওয়ার সময় যে অবর আমরে রুকায়া আমায় যেতে বারণ ক'রে গেছে তারপর যাওয়া মানে নিজের কাছে নিজেই ছোট হ'য়ে যাওয়া।

ভাইয়াজীর কাছে তাঁর খেয়ালখুশী মতন খবর শোনার পর যখন শুতে গেলাম, রাত তখন প্রায় বারোটা। এয়ারপোর্ট অঞ্চলে গুলির আওয়াজ সারাদিনই থেকে থেকে শুনেছি কিন্তু রাত্রে সেটা কমে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মনে হল ভাইয়াজীর খবরটা তাহলে ঠিকই। উনি সংবাদ শুনেছিলেন যে, আর সব জায়গা ছেড়ে সরকার ঐ এলাকাটা কামানের চিকনি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছেন কারণ মাঝরাত থেকে সৈন্য নামবে এয়ারপোর্টে। অবাক কাণ্ডকারখানা। যে দেশটা আঠারো বছর ধরে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বিরোধ-কেন্দ্র সে দেশটাকে সেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে শেষকালে প্লেনে ক'রে সৈন্য আনতে হল শেষ মুহূর্তে? এ যেন ক্যানসার রোগের কোন রকম চিকিৎসা না ক'রে শেষ সময়ে ভগবানের কাছে করুণা ভিক্ষা।

পরে রুকায়ার কাছ থেকে জানা গেল সৈন্য আসেনি, সারারাত ধ'রে এসেছিল আর্মড পুলিশ সারা ভারতবর্ষ থেকে।

পাঁচই সকালে রেডিওতে খবর পাওয়া গেল, কারফ্যুর বদলে জারি হয়েছে 'মার্শাল ল' অর্থাৎ

পুরোপুরি মিলিটারি ব্যবস্থা, দেখলেই গুলি চলবে। বাজার ইত্যাদি করার জন্য সাতটা থেকে দশটা খোলা। তার আগে আর তারপর পথে বেরুলেই বিপদ। বুড়ো চাকরটা বাজার থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে জানালো পথের মোড়ে মোড়ে রাইফেল হাতে লোক দাঁড়িয়ে গেছে! হায়—রামজী, এখন কি হবে?

আমারও ঐ একই প্রশ্ন, কি হবে? 'মার্শাল ল' যখন জারি হ'য়েছে তখন প্লেন বন্ধ, বাস বন্ধ অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও আর আমাদের শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই—যতদিন না যাতায়াতের পথ খোলে। কাশ্মীরাজী কান খাড়া ক'রে কথা শুনছিলেন, কিছু বলেননি। হঠাৎ বলে ফেললেন:

"হয়েছে।"

"কি?"

"কেন মার্শাল' হল!" ওঁর থিওরিটা শোনা যাক।

"কেন?"

"ওরা নিশ্চয় খবর পেয়েছে যে হানাদার শ্রীনগরে হাজির হ'য়েছে! নইলে কারফ্যুই থাকত। কেবল পুলিশ দিয়ে সেটা মোতায়েন করার ব্যবস্থা করত। ওরা সব লোক সরিয়ে দিল বাইরের লোক আটকাবার জন্য।"

ঠিক সেই সময় সবেগে ঘরে ঢুকল, বুড়ো চাকর। সে নিচের ভাড়াটের রেডিওতে সংবাদ শুনে এসেছে পাকিস্তানি আর এক রকম "আজাদ কাশ্মীর রেডিও" থেকে। তারা নাকি সংবাদে বলেছে।

"সারা কাশ্মীরে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। শুধু শ্রীনগর নয় কাশ্মীরের প্রত্যেক অংশে স্থানীয় লোকরা এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, হিন্দুস্থানী সৈন্য আজ্ঞা লুঠ ক'রে সব অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে শ্রীনগর রওনা হ'য়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামবাসী এই বিদ্রোহে সামিল আছেন এবং তাঁরাই আছেন বিদ্রোহীদের পুরোভাগে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, কাশ্মীর সরকার যে কারফ্যু চালু ক'রেছিলেন, শ্রীনগরের বিদ্রোহী জনতা তা অস্বীকার করায়, সরকার 'মার্শাল ল' জারি করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিরীহ, নির্জাতিত কাশ্মীরিদের রক্তে শ্রীনগর লাল হ'য়ে গেছে। পাছে সরকারের এই কুকীর্তি ধরা পড়ে যায় তাই সব লাশ ঝিলামের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

তারপরই এক বক্তা জোর গলায় সারা কাশ্মীরকে এই নবজাগরণের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সভাতর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

"ভাই সব, হিন্দুস্থানের নিষ্ঠুর জুলুম আর কাশ্মীরি কুত্তা সরকারের কামড় খেয়ে তিলে তিলে প্রতিদিন মরার চেয়ে এই জন-আন্দোলনে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।"

আর তারপরই ছিল এই সব বড় বড় কথা জোর গলায় বলার পেছনের আসল সত্যটুকু।

"কাশ্মীরের নব-জাগরিত বিদ্রোহীরা ঠিক ক'রেছেন, যে সব গ্রামবাসীরা তাঁদের এই সংগ্রামে যোগ দেবেন না, অথবা সাহায্য করবেন না তাঁদের স্ত্রী বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে কুকুরের মতন গুলি করা হবে এবং দরকার হ'লে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

যাতে তাঁরা সময়মত সাবধানে হ'তে পারেন তাই এই সাবধনতার বাণী প্রচার! পাকিস্তান জিন্দাবাদ! আমরা আশা করি বারামূলায় গত নব-আগরণের সময় যে অত্যাচারের নমুনা বিদ্রোহী কাশ্মীরিরা দিয়েছিলেন তা কুত্তা কাশ্মীরিরা আজও মনে রেখেছেন। এবারকার অত্যাচার গতবারের চেয়ে কম তো হবেই না। বেশীই হবে। আল্লাহ্ হো আকবর!"

যেমে, বোধহয় বার কয়েক গাঁজার দম দেওয়ার পর বক্তা আবার বলেছেন:

"আমাদের মাইক্রোফোন যদি এখন আমরা নিয়ে যেতে পারতাম শ্রীনগরের মধ্যে, তাহলে আপনারা শুনতে পেতেন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আকুল ক্রন্দন। তাদের কুত্তা বিল্লির মতন গুলি ক'রে তাদের বাড়ী ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ তারা মনে প্রাণে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী। আমরা আরও সংবাদ পেয়েছি [কোথা থেকে তা ভগবানই জানেন!] যে স্থানীয় হিন্দুস্থানী সৈনিক এবং কুত্তা কাশ্মীরি পুলিশের ক্ষমতায় কুলোয়নি ব'লে সারা হিন্দুস্থান থেকে সৈন্য আনা হয়েছে এবং [ডাল] কুত্তা হিন্দুস্থান সরকার মনস্থ করেছেন যে, কাশ্মীরের প্রত্যেক নরনারীকে কত্তা ক'রে তারা হিন্দুদের এনে এনে কাশ্মীরে বসাবে। বিদ্রোহী কাশ্মীরিরা লড়ছে। তাই সব, আপনারাও লেগে যান। প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কাশ্মীরকে বাঁচান!"

সবিশেষ বিচলিত বুড়ো চাকর কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলরাজের হাত দুটো চেপে ধ'রে বলল:

"কি হবে?" বলরাজ কিছু অসহায় বোধ করল। ঐ লম্বা চওড়া মানুষটা পাঠানের মতন শক্ত হ'লে কি হবে, মনটা ওর মেয়েদের মতন নরম। ও জীবন-ভোর ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, অনাহারে থেকেছে, কাঁধে কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে দরজায় দরজায় ফিরি ক'রে বেড়িয়েছে আর বম্বে সহরে স্টুডিও স্টুডিও ঘুরে এক্সট্রার কাজ ক'রেছে কিন্তু মনটাকে এখনও চোখের জলের বিরুদ্ধে বাঁধতে শেখেনি। ওর ঠোঁট কাঁপার বহর দেখে মনে হল বোধহয় বুড়োর হাতখানা ধ'রে ও নিজেই এবার কেঁদে ফেলবে! বুড়ো আবার বললে:

"হায় রাম, কি হবে!"

"রান্না! এবার রান্না হবে!" বলে, ওকে রান্নাঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে ভাইয়াজী বললেন, "বেকুফ! যুদ্ধ হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে আর কাঁদছেন উনি! হানাদারদের হাতে মরবার আগে দেখছি আমাদের না খেয়েই মরতে হবে!" বৃদ্ধ চাকরের পেছনে পেছনে রান্নাঘরে ঢুকলেন আর আমরা সোফায় পা তুলে ব'সে রেডিও শোনায় মন দিলাম।

যুদ্ধের সময় খবর শোনার অদ্ভুত এক মজা আছে। অভিজ্ঞতা আছে ব'লে জানি সব খবর থাকেনা। সাধারণতঃ পরাজয়ের খবর কমানো থাকে আর বিজয়ের ঘোষণা একটু বড় গলায় বলা হয়। প্রথমটা পলিসি, দ্বিতীয়টা যে সংবাদ পড়ে তার সাধারণ অনুভূতি। খবর যা শুনলাম তা কানে যা শোনালো তার সঙ্গে মনে যা গেল, তার অনেক তফাৎ। বোঝা গেল [এবং পরে জানা গিয়েছিল] যে আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় নাহ'লেও, আশাপ্রদ নয়। হানাদাররা এক জোট হ'য়ে আর কোথাও লড়ছে না, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অত্যন্ত সুচতুর গেরিলার মতন গোপন আক্রমণ

চালাচ্ছে। ওদের প্রথম ও প্রধান আক্রমণ হল সৈন্য গতিবিধি বন্ধ করার প্রচেষ্টায় যত সব ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া আর একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রীনগর! যে খবরটা সত্যিই ভাল লাগলো, সেটা হল বড়গামের বিষয়।

"আমাদের আর্মড পুলিশ হানাদারদের হটিয়ে দিয়ে গেছে একেবারে বড়গাম তহশিলের শেষ প্রান্তে এবং ওদের কোণঠাসা করেছে উটরা গ্রামের পাহাড়ে। ঐখানকার গ্রামবাসীরাও ওদের সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।"

[পরে জানা গেল, ঐ গ্রামবাসীদের অসাধারণ সাহসের কথা। যখন সামনের পাহাড়ে আমাদের সৈন্য ঘাঁটিতে হানাদাররা প্রায় ঘিরে ফেলেছে এবং যে দুজন সৈন্য তখনও প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল তারা নিহত হয় আর কি, তখন এ পাহাড় থেকে চিৎকার ক'রে গ্রামবাসীরা বলতে থাকে যে, ওধার থেকে ভারতীয় সৈন্য আসছে! তাই শুনে হানাদাররা আবার উটরা গ্রামের পাহাড়ে সদল বলে ফিরে আসে—ফলে ও পাহাড়ে আমাদের দুজন সৈন্য বেঁচে যায় আর ইতিমধ্যে আরও আমাদের সৈন্য এসে পড়ে। এই মিথ্যা খবর প্রচার করার জন্য উটরা গ্রামের দুজনকে হানাদাররা গুলি ক'রে মারে।

এ পাহাড় আর ও পাহাড়ে যখন আবার নতুন ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন গ্রামবাসীরা রাত্রের অন্ধকারে ঘড়িতে পাথর বেঁধে পাথরগুলো ভারতীয় সৈন্য মারার অজুহাতে নিচে গড়িয়ে দেয় আর নিচে থেকে ভারতীয় সৈন্য সেই ঘড়িতে বন্দুক গুলি ইত্যাদি বেঁধে দিলে, ওরা ঘড়ি টেনে টেনে সেগুলো ওপরে তুলে নেয়। এই ভাবে তিন রাত গুলি বারুদ আর বন্দুক তোলার পর গ্রামবাসীরা হানাদারদের আক্রমণ করে এবং সেই অবসরে আমাদের ভারতীয় সৈন্য ওপরে উঠে যায় আর হানাদারদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। এই সংগ্রাম চলে সাতদিন এবং হানাদার ধরা পড়ে সাতাশ জন। গ্রামবাসীরা মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় মৃত্যু দিয়ে। ধৃত হানাদারদের হত্যা করা ভারতীয় নীতি বিরুদ্ধ বলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে এই নিয়ে বেশ খানিকটা গণ্ডগোল হয়।]

বাকি সব খবরই মন খারাপ ক'রে দিল। মাগামে হানাদাররা যে ত্রিশটা বাড়ীতে আগুন দিয়েছিল—এখন জানা গেল তাতে লোক মারা গেছে প্রায় একশো জন। তার মধ্যে প্রায় আশীজনকে মারা হ'য়েছে পুড়িয়ে আর বাকি মারা হয় গুলি ক'রে যেহেতু তারা মুসলমান হ'য়েও হিন্দুদের আশ্রয় দেয়।

সত্তরজন জমজের মধ্যে মোগল আমলের সিদ্ধ পুরুষ বাবা পীরদিনের যে মকবরা আছে ওলরাগ থেকে পালিয়ে গিয়ে কিছু হিন্দু সেখানে আশ্রয় নেয়। ঐ পাহাড়ে অবস্থিত হানাদাররা সে খবর পেয়ে মকবরায় যায় তাদের মারবার জন্যে। আশ্রিত হিন্দুদের আর্তনাদে আকৃষ্ট হ'য়ে অল্প দূরে ফকিরদের যে আস্তানা আছে সেখান থেকে ফকিররা ছুটে আসে এবং গুলির সামনে বুক পেতে দেয়। আমাদের আর্মড পুলিশ যখন সেখানে পৌঁছোল তখন দেখা গেল তিরিশজন ফকিরের মধ্যে পঁচিশজন মারা গেছেন, দশজন আহত এবং বাকি নিরুদ্দেশ। হিন্দু একজনেরও কিছু হয়নি।

খবর পাওয়া গেল যে, পট্টনের ধারে যে ব্রীজ আছে তার ওপর হানাদারদের আক্রমণ চলেছে সারাদিন কিন্তু দুপক্ষের বহু লোক মরলেও ব্রীজটাকে ওরা কিছু করতে পারেনি। বারামুলার সঙ্গে শ্রীনগরের যোগাযোগ এই ব্রীজের ওপর দিয়েই। ওদিকে চেনারি ব্রীজের ওপরও আক্রমণ থেকে

থেকেই হয়েছে কখন দিনে, কখন রাতের গভীর অন্ধকারে কিন্তু সেখানে আমাদের ষোলজন পাহারাদার সাধারণ পয়েন্ট থ্রি ও থ্রি রাইফেল দিয়েই তাদের প্রায় ষাটজনকে আটকে রেখেছে। আমাদের পক্ষে লোক মারা গেছে পাঁচ জন।

আমাদের কমতর আক্রান্ত হয়েছে অনন্তনাগের কাছে—তার মানে ওরা শুধু কাশ্মীর যোগাযোগটাও কেটে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। ওটা যদি ওরা কোন ভাবে করতে পারে তাহ'লে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ থাকে আকাশ দিয়ে। পথ আটকানো তবু শক্ত কিন্তু বানিহাল টানেল যদি আটকায় তাহ'লেই অবস্থা কহিল।

সে পথ আটকাবারও চেষ্টার কথা জানা গেল পরদিন ছ' তারিখ সকালে [অবশ্য কেবার পরে এলাহাবাদের আমর্ড পুলিশের হাবিলদার রামলোচন সিংয়ের কাছে আরও অনেক খবর পাওয়া গেল যা বেতারে জানান হয়নি। ও'র সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল পুঞ্চর পাহাড়ের আক্রমণের সময়—কিন্তু সে গল্প পরে।] সব চেয়ে বড় খবরের ইশারা পাওয়া গেল ছ' তারিখ সকালের খবরের শেষ অংশে। শ্রীনগরবাসীদের সাবধান ক'রে দেওয়া হল, অতিরিক্ত প্রয়োজন ছাড়া ওঁরা যেন কোন ক্রমেই বাড়ীর বাইরে না যান। কারণ স্বরূপ বলা হল যে, হানাদারেরা সাধারণ পোষাকে আছে। তাই জন সাধারণের সঙ্গে তারা সহজেই মিশে যেতে পারে। অতএব জন সাধারণ যেন খুব সাবধান হন এবং অচেনা মানুষকে বাড়ীতে স্থান না দেন। কারণ এলো ছোট্ট কথা :

"আমি স্থান চাইনা, শুধু দেখা করতে এসেছি।" ঘুরে দেখি রুকায়া আহমেদ। পরণে পালোয়ার কামিজ, মুখে মৃদু হাসি আর সারা দেহে যৌবনের উজ্জ্বল জোয়ার।

"তুমি ?" অবাক হ'য়ে বলি, "তোমার তো সাহস কম নয়।"

বলরাজ উঠে দাঁড়ালো, বললে, "এমন সাহসের উপমা আছে কৃষ্ণ-লীলায়! রাধা নাকি অভিসারে যেতেন বড় বড় কাঁচ' পায়ে পায়ে দলন ক'রে।"

লজ্জার বেশ কিছু মালিমা দেখা দিল রুকায়ার গালে। যে সময়টুকু ও নিল নিজেকে সামলাতে তারই মধ্যে চোখের একটা মৃদু ইশারা ক'রে বলরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রুকায়া বলল :

"যাবেন না, কথা আছে !"

"আমার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। অনেক।" তারপর চোখ গিলে বললে, "কাজের !"

বলরাজ ব'সে পড়ল, বললে, "সুন্দরি মেয়েদের সঙ্গে আমার যত কাজের কথা তা হয় পর্দার আড়ালে নয়, ওপরে। ওটা আমার ভাগ্যের লিখন। বলুন।"

"ভেতরকার যা খবর" রুকায়া বললে, "তাতে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে।"

"কি রকম ?

"সরকারি মহলের একটা সন্দেহ শ্রীনগরেও কিছু গণ্ডগোল হওয়ার ইঙ্গিত আছে। আজ নয় কাল হবেই। মার্শাল ল সেইজন্যেই।"

বলরাজ বললে, "সেটা আমাদের আশ্বাস।"

"তাহ'লে ?"

"উপায় কি ? হয় যদি হবে।"

"আপনারা আমার সঙ্গ…"

বলরাজ কথা শেষ করতে দিল না, বললে, "তা কি ক'রে হয় ?"

"কেন হয় না ?"

হঠাৎ দেখি বলরাজ একেবারে অন্য মানুষ, ও বললে, "কি ক'রে হয় ? গ্রামে গ্রামে নিরীহ, নিরস্ত্র নির্বল লোক মরছে পিঁপড়ের মতন প্রতি দিন প্রতি মিনিটে—দেশের জন্যে ধর্মের জন্যে—কৈ তারা তো পালাচ্ছে না ? তারা বুক পেতে দাঁড়াচ্ছে উলটে ভাবুন তো একবার ? পাথর দিয়ে তারা রুখছে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে ! সারা পৃথিবীতে এর তুলনা আছে ব'লে আমার জানা নেই—এটা সম্ভব একমাত্র এইখানের মাটিতে। এই কাশ্মীরে। আজ যদি আমি পালাই। কাল আমি ঐ হীন দরিদ্র অভুক্ত মানুষগুলোর সামনে দাঁড়াব কোন মুখ নিয়ে ?"

কতায়া মাথা নিচু করল।

বলরাজ বলে চলে, "আজ এই যে ওরা শূন্য হাতে আর অসীম সাহসে বুক পেতে দাঁড়াচ্ছে আর হাসতে হাসতে মরছে কাদের জন্যে ? এটা কার খামখেয়ালের খেলা ? ভেবেছে কেউ কখন ? আপনার আমার মতন হীন স্বার্থপর মানুষদের পাপের বোঝা ওরা বইছে ! আমরা এই দেশটা নিয়ে জুয়ো খেলছি আজ আঠারো বছর। যখন গেলাম তখন মাটির ছেলে ঐ মকবুল শেরওয়ানিদের জন্যে গেলাম আর তারপর কি করলাম ? পঙ্গপালের মিশান উড়িয়ে চলে গেলাম শান্তি আর মৈত্রীর বাণী শোনাতে সারা পৃথিবীকে আর এই সব হতভাগাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে গেলাম এক দল হীন, নীচ, পাষণ্ড মানুষের হাতে—যারা দিল্লীতে দরবার ক'রে লাখপতি হল আর কাশ্মীরিদের জন্যে পাঠানো চালের টাকায় কোটিপতি হল।… যারা বাসের পারমিটে মেয়ে মানুষ নিয়ে মাতলামো করল আর মাড়োয়ারিদের মাথায় তুলল ! দোষ শেখ আবদুল্লাহর নয়, বক্সি গুলাম মহম্মদেরও নয়, দোষ ঐ দিল্লীর বাদশাহদের যারা সাদা টুপি মাথায় দিয়ে সাদা সাজে আর কালো বাজারে ক্ষমতার খেলা করে যারা দেশের হীন দরিদ্রদের লাথি মারে আর সাদা চামড়ার পা চাটে।…দোষ আপনার, আমার যারা ওদের সঙ্গ করি ঐ সব চামারদের।" সতীর উত্তেজনার অতর্কিত অবসাদে ও চুপ ক'রে যায় একপলক। তারপর ঘুরে বসে :

"মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছে করে জানেন ? একবার শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে ঐ সব কটা পাষণ্ডকে চুলের মুঠি ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দি একসঙ্গে একটা দালাবাজের সামনে—তবে যদি বোঝে যে ওদের আসল শত্রু কি ! এই আঠারো বছর ধরে আমরা যতখানি সং সঙ্গ নিষেধের প্রচার করি ততখানি সংসঙ্গ দিয়ে যদি এ দেশটাকে সাজাতাম তাহ'লে ঐ গ্রামের লোকগুলো অমনি ক'রে পিঁপড়ের মতন মরত না। শুধু পাকিস্তান কেন, সারা পৃথিবী এক সঙ্গে আক্রমণ করেও আমাদের কিছু করতে পারত না।" তারপর মিনতির সুরে ওর হাত দুটো ধরে বলল :

"দোহাই আপনার, আজ আর আমায় পালাতে বলবেন না। তার চেয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে দাঁড়াই ঐ সব সত্যিকার মানুষগুলোর পাশে যারা দুশ্চরিত্র দেশনেতাদের পাপের বোঝা মাথায় ক'রে মৃত্যু বরণ করছে…যাদের আমরা বলি অশিক্ষিত গ্রামের চাষা… তাদের রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্ত মিশিয়ে, চলুন ধন্য হই।"

ও আর দাঁড়ায় না রাগে অপমানে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রুকায়ার চোখেও দেখি তখন জলের যেন বন্যা নেমেছে। কোন কথা না ব'লে রুকায়া সামনের সোফায় ব'সে পড়ল আর হাতদুটো মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভেবেই পেলাম না আমার চোখে জল এলোনা কেন? আমার মনটা কি মরে গেছে, না এই দোরো সন্তাহার থেকে থেকে আমিও নিঃশেষে হারিয়ে গেছি? হয়ত বা এতো দেখেছি আর এতো শুনেছি ঐ সব বড় বড় মাথাওয়ালাদের কুকীর্তি যে ওদের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'য়ে গেছি। মনে পড়ে গেল লাট যন্ত্রণা সভার নায়করা সভ্য সুলতান আলমেদের সোনাগাছিতে রাত্রিবাসের কথা, বেপরোয়া রামমনোহর লোহিয়ার ট্রেন যাত্রার কথা, বাংলা দেশের বেপরোয়া নেতা আর মন্ত্রীমহলের অনন্ত সমস্তের গুরুধুনি খাওয়ার কথা, খুশে টিকির সংবরণের কষ্টার্জিত হওয়ার গল্প। মনে পড়ে গেল বলরাজের কাছ থেকে শোনা ওর ওয়ার্ডা আশ্রমের অযত্ন অভিজ্ঞতার কথা, বিলেতে থাকা কালিন কৃষ্ণমেননের কথা, উড়িষ্যার মনোরমা কালচারাল অফিসারের চাকরি পাওয়ার কাহিনী। আর মনে পড়ল এই বাংলা দেশেরই এক মহিলা মন্ত্রীর···থাকগে সে সব কথা, ভাবতেও ঘেন্নায় আমার মতন নিতান্ত একটা রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষেরও গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি সাধুপুরুষ এমন ধৃষ্টতা আমার নেই কিন্তু ওদের কুকীর্তির তুলনায় আমি মহাপুরুষ একথা জোর গলায় বলতেও আমার বাধা নেই। ওরা দেশের দায় আর দারিদ্র মাথায় নিয়ে গোটা দেশটাকে পথে বসিয়েছে। আমি দেশের কথা একবার একটুখানি ভেবেছিলাম ব'লে চাকরি ছেড়ে পথে নেমেছি। আমি যদি সাধারণ মানুষ হই ওরা অসাধারণ অমানুষ।

রুকায়া উঠে দাঁড়াল; চোখ দুটো ওর লাল টক্‌টকে। কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কাছে থেমে গেল; ঘুরে বললে:

"কাল তুমি আমার মুখ চেয়ে কথা দিয়েছিলে বাইরে যাবে না। তোমার সে প্রতিজ্ঞা থেকে আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।"

"কেন?" বলরাজের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে রুকায়া বললে:

"ঐ মানুষটাকে কখন একলা ছেড়ো না!"

রুকায়া চ'লে গেল আর কিছু বললো না। রেডিওতে তখন মেহদ্দুরের লেখা একটা গান গাইছে কেউ একজন। দুটো লাইন কানে এলো:

"রাউন হু লাবুন রাম বুদ্ধু রায় সরদুম দিল
অদ্ধ নার গুনওনম্ থোকছে সন্তাই ওয়ানেই ক্যা।"

[যখন আমি জানতে পারলাম যে রাবণকে আমার জয় করতে হবে তখন মনটা আমার রামের মতন শক্ত হ'য়ে গেল, আর জীবনের যত ভয় ভ্রান্তি সব সন্তার মতন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।]

। পনেরো ।

সাত সারাদিন

বৃটিশ-ভারতের অক্ষয় কীর্তি, সাম্প্রদায়িক ভাতন নীতির দৌলতে কারফ্যুর অভিজ্ঞতা আমার অনেক, কিন্তু 'মর্শাল ল'র দৌরাত্ম্য জীবনে এই প্রথম। প্রথম দিন থেকেই ওটা প্রকাণ্ড একটা প্রশ্নচিহ্নের মতন মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। কাল থেকে একটা বিশ্রী রকম অধৈর্য্য উৎকণ্ঠা এসে যোগ দিয়েছে, বিশেষ করে রেডিওতে আকারণ বাইরে না যাওয়ার সতর্কবাণী শোনার পর থেকে। সেটা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল, অজানা মানুষকে বাড়ীতে স্থান না দেওয়ার জরুরী ঘোষণার পর। এতদিন সকলেরই মুখে মুখে সারাদিন ছিল গুজবের ঝড় আর বিপদের আলোচনা। হঠাৎ সেটা থেমে গিয়ে নেমে এলো বিভৎস একটা মৃত্যুর আতঙ্ক।

বিপদ যত বড়ই হক না কেন, সামনা-সামনি তার চেহারা তবু এক রকম। প্রাণ বাঁচানোর প্রকৃতি মানুষের এমন প্রবল যে, হয় সে পালিয়ে বাঁচে আর না হয় সে মরে বাঁচে। বিপদের আশঙ্কাটা অন্য রকম। ভয় থাকে ভাবনা থাকে কিন্তু মনটাকে তৈরি ক'রে নেওয়ার একটা চেষ্টাও থাকে। কিন্তু সেই আশঙ্কা সম্বন্ধে ঘন ঘন সতর্কবাণী দিয়ে মনটাকে যখন সচেতন ক'রে দেওয়া হয় তখনই হয় আসল ক্ষতি। ওটা আর আশঙ্কা থাকে না, হ'য়ে ওঠে একটা বিভৎস আতঙ্ক! তখন অতীতের যত ভুল ভ্রান্তি বর্ত্তমানের যত দুশ্চিন্তার আর ভবিষ্যতের একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সব এক সঙ্গে জঞ্জালের মতন জড়িয়ে মানুষকে করে অন্য পদার্থ আর মনটাকে শুকনো চামড়ার মতন দুমড়ে কুঁচকে করে একাকার। যুদ্ধটা তখন আর দু'দলের সংঘর্ষ থাকে না, হ'য়ে ওঠে অবধারিত মৃত্যুর একটা অতল গহ্বর, আমার জীবনের শেষ, আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি। যখন ভাবনা কল্পনার জালে জড়িয়ে বাঁচবার এতটুকু পথও পায়না তখন হঠাৎ এক সময় মনটা মৃত্যুর মধ্যে একটা সার্থকতা খুঁজতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয় ওটা আমার দেশভক্তির শোভাযাত্রা, আদর্শের একটা পূর্ত্তি, জীবনের একটা সুন্দর এবং পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিগতভাবে সব দুঃখ বেদনা থেকে পরিত্রাণ।

এইসব নানান ভাবনার মাঝে মাঝে, উৎকণ্ঠা আর অধৈর্য্য আতঙ্কে ছোট ছোট কথায় রাগ হয়, ছোটখাটো ব্যাপারে বিরক্তি আসে, আবার তারই মধ্যে কিছু একটার সূত্র ধ'রে সারা জীবনের ব্যাপ্তিতে শেষ মুহূর্তটা ভাবতে বসি, কিম্বা ঐ বিভৎস পরিসমাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অতীতটাকে উল্টে পাল্টে ভাবতে চেষ্টা করি, আমার থাকায় অথবা না থাকায় কোথায় কার কতখানি লাভ, কতটুকু ক্ষতি। সোফায় বসি, বারান্দায় যাই, জানলায় দাঁড়াই, বোধহয় দেখবার চেষ্টা যে বিপদটা আর কতদূর কিন্তু কোথাও মনের স্থিরতা পাই না, ভাবনার অবসাদে আসে, আরামটা যেন হারাম হ'য়ে ওঠে। ছোট শব্দ, এতটুকু কারো উঁচু গলার কথা, কিম্বা হয়ত, অনেক দূরে কোন কুকুরের চিৎকারে মনটা হঠাৎ চমকে ওঠে, আর কল্পনাটা তীতির কালো ঘোড়া হ'য়ে বেলামাল ছুটতে ছুটতে যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সেটা আবার সেই, অনেক আগেই বহুবার ভাবা, মৃত্যুর গহ্বর।

রান্নাঘরে অকারণ জল খেতে গিয়ে দেখি, ডালের হাঁড়ি উপরপিয়ে ফুটছে আর বুড়ো চাকরটা গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। সামনের বারান্দা পেরিয়েই ভাইয়াজীর ঘর। ভাবলাম, বুথা ছাই, ভেবে আর কি হবে, তার চেয়ে ওঁর ঘরে রেডিও শোনা যাক। ভাইয়াজী দেখি সারা

গালে সাবান লাগিয়ে ক্ষুর হাতে জানলায় দাঁড়িয়ে। খুরে বললেন, মানে, দেখছিলাম! আবার ফিরে আসি বাইরের ঘরে। বলরাজ এসে বসে আছে সোফায় আর বছরিনের খুরোনো, বহুবার পড়া কাগজখানা নতুন ক'রে উল্টে যাচ্ছে। আমি আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। ভয়ে দিশাহারা, ভাবনায় অস্থির। বলরাজ বললে, ইচ্ছে করছে এক ছুটে গিয়ে দেখে আসি বিপদ কোথায়, কতখানি, কখন। ও কাগজটা সময়ে ভাঁজ করতে থাকে আর আমি হঠাৎ এক সময় বিছানায় শুয়ে পড়ি, একটুখানি আরামের জন্যে, একটুখানি নিশ্চিন্তে ভাববার জন্যে।

কি হবে? পারবে না ঐ সহজ গ্রামবাসীদের মতন সামনে ছুটে যেতে? ওদের মতন উত্তাল আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে? মৃত্যু? সে তো আছেই একদিন, না হয় আজই হল। মনে পড়ল, বহুকাল আগে দিল্লীতে গুলি ক'রে কুকুর মারা হত। কুকুর? কি যেন মেটারলিঙ্কের নাম? ঐ যে থিয়েটারের নাটকে কুকুর কোলে নিয়ে তাকাতাকা কথা বলে···আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য বিশ্বাস। চমৎকার লেগেছিল ওর অভিনয়। ছবিতে করে না ও হাঁ, তুলসী ভালো হয়নি ছবিটা। কার যেন ছবি?···অসিত সেন। চলাচল···সিগারেট ধরাই, অমিয়ে ভাবতে হবে। জীবনের ওটা একটা অমর পরিচ্ছেদ। পোড়া কাঠিটা কোথায় পড়ল, কে জানে! কাঠের বাড়ী, বলরাজ খুব রাগ করে। হাঁ, অসিত। আঙুল ঘ'রে ওপরে থাকি। বসন্ত, অসিত, যোষেফ হীত, তপন···লাখো মানুষ রাতারাতি কত বয়সে যায়। কিসের মোহ? যারা দু মুঠো অন্নের জন্য দেহের বেসাতি করে প্রকাশ্যভাবে, তাদের আমরা বলি বেশ্যা। যারা কালোবাজারি টাকা ভাঙ্গে রেখে আর বড় হোটেলের দরজায় দু নট ডিস্টার্ব, এর নোটিশ ঝোলায় কিন্তু স্বামীর বিছানায় স্বামীর বন্ধুকে শুইয়ে বলে, ভালোবাসি—তাদের কি বলে?··· দেবী···আচ্ছা, মদ খেয়ে যারা বৌকে মারধোর করে, তাদের আমরা বলি অসভ্য। ইতর। যারা কারণ থাকলেও করে না?···তারা কাপুরুষ।

আমি কাপুরুষ নই। দর্শনের মোহাই দিয়ে আর আদর্শের অস্ত্র ক'রে নিজেকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমি ভীতু নই, ভয় পাবো না। হানাদাররা যদি হামলা করেই তো ঝাঁপিয়ে পড়ব। বলরাজ ঠিক কথাই বলেছে। ওরাই সত্যিকার মানুষ, ঐ গ্রামের চাষীরা। কিন্তু পাড়ার আর সবাই যদি ভয়ে পালাতে আরম্ভ করে? তারা তো বলরাজের কথা শোনেনি? নানান রকম যুক্তি দিয়ে মনটাকে বোঝাতে চেষ্টা করি কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। ভাবনায় বোঝা কিছুতেই আর কমে না। কমেই না। হাতে সিগারেটটা জ্বলছে। তারই আগুনের ওপর চোখ রেখে চুপ ক'রে আবার প্রথম থেকে ভাবতে আরম্ভ করি।···

তখনই প্রথম গুলির আওয়াজ শুনলাম।

ভোর তখন সাড়ে চারটা।

একটা গুলির আওয়াজে একখানি কলরব আরম্ভ হবে ভাবিনি। সমস্ত পাড়াটা যেন একসঙ্গে আর্তনাদ চিৎকার ক'রে উঠল। প্রত্যেক বাড়ীর প্রতিটি মানুষ যেন আমারই মতন অধৈর্য্য আশঙ্কায় ঐ গুলির আওয়াজেরই অপেক্ষায় ছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে জানলায় গিয়ে দেখি সব বাড়ীর দরজা জানলা ঝপ ঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিপদটাকে ওরা বুঝি ঐ ভাবেই জীবনের বাইরে রাখবে। বুড়ো চাকর, ভাইয়াজী, বলরাজ সব এসে দাঁড়ালো।

গোলা-গুলির শব্দ তখন আকাশ চ'রে ফেলেছে।

নিচে থেকে ভাড়াটে ভদ্রলোক দুটি ঝাঁটতে ঝাঁটতে ছুটে এলেন পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে, কি হবে? এবার কি হবে? কি ক'রে পালাবো? কোথায় পালাবো? কিছু একটা করা যায় না?

চারিদিক থেকে ঐ একই চিৎকার। বলরাজ চুপ ক'রে রইল। ভদ্রলোক দিশাহারা হ'য়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। ভাইরাজী আর থাকতে না পেরে সজোরে তার গালে চড় বসিয়ে দিলেন। উনি বিছানায় ব'সে পড়ে বললেন, মেরে ফেল, তোমরা আমায় মেরে ফেল, শুধু দয়া ক'রে ওদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও! আমার যা টাকা আছে সব নিয়ে আমায় তোমরা বাঁচাও।

বাইরে তখন চিৎকার উঠেছে গোলা-গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে:

"আল্লাহু হো আকবর!"

পালটা জবাব আসছে আরও জোরে, সদীপ্ত হুঙ্কার:

"কাশ্মের জিন্দাবাদ"

"হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!"

ঘুরে দেখলাম বলরাজ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ভাইরাজী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। নিচের ভদ্রলোক ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছেন নিঃশব্দে। চিৎকার করার সাহসটাও যেন আর নেই। উনি নিঃশব্দেই নিচে নেমে গেলেন। অস্পষ্ট স্বরে বলরাজ বলল:

"আরম্ভ হল তাহ'লে।"

"হ্যাঁ!"

ঘুরে দাঁড়ালাম জানলার দিকে পেছন ক'রে। আর আতঙ্ক নেই, ভাবনার বোঝা নেই। বলরাজ বললে:

"চল চা খাওয়া যাক।"

আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ সামনের বাড়ীই দেখছিলাম, অন্য দিকে লক্ষ্য করিনি। এইবার দৃষ্টি গেল। মাঠের ওপারে পপলার আর চিনার গাছগুলোর ওপর দিয়ে ধোঁওয়া দেখা গেল। বলরাজ এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

"বোধ হয় রামবাগ ব্রীজের ধারেই।"

"তবে কি ওরা বড়গাম থেকে এলো?" হিসেব করে দেখলাম মনে মনে।

"তা যদি হয় তাহ'লে এয়ারপোর্টটা বোধ হয় গেছে।"

"নাও হ'তে পারে" বলরাজ সিগারেট ধরিয়ে বললে, "গুলমার্গ থেকে পাহাড় বেয়ে এদিকেও নামা যায়। তাছাড়া, এয়ারপোর্ট পেরিয়ে যদি ওরা আসত তাহ'লে রাত্রে গুলির আওয়াজ নিশ্চয় শোনা যায়।" যুক্তিটা মনে লাগল। সারা রাত্রির অখণ্ড নীরবতার পর যখন এই আক্রমণ তখন নিশ্চয় তাইই হবে।

"তা না হ'লে" বলরাজ বলল, "ওরা হয়ত আগেই সহরে ঢুকেছিল, যার জন্যে ঐ মার্শাল ল' আর ঐসব জরুরী ঘোষণা।" ভাইরাজী ইতিমধ্যেই তবল ডেকার কাঁচের গেলাসে রীতিমত ফুটন্ত চা নিয়ে হাজির। হেসে বললেন:

"আমি তৈরি!"

"তাই দেখছি!"

"বুঝলেন না!" ভাইয়াজী যেন ফুৎ ক'রে বললেন, "যদি পাড়াটা অ্যাটাক্ হয় তাহ'লে লড়তে লড়তে গায়ের জন্যে মন কেমন করলে তো চলবে না!" খেয়ে দু চুমুক খেয়ে বললেন, "সকালে চা না খেলে আমার কেমন যেন ফুৎ হয় না—তা ও লড়াইই হক আর সোটা হাতে ছোঁটাই হক!"

পাড়াময় যে আতঙ্কের আর্তনাদ উঠেছিল, সেটা থেমেছে। বিপদটা আর এখন বিভীষিকা নয়, ওটা এখন সামনে; চোখে দেখা না হ'লেও মনে একটা আন্দাজ যেন সকলেরই হ'য়ে গেছে। এখন আপন আপন চিন্তাধারায় বরং ওটাকে সামলানোর মহলা কল্পনা।

গুলির আওয়াজ বরাবর চলছিল। মেন রোড আর অটোমেটিক রাইফেল। মাঝে মাঝে চিৎকার আসছিল, হুঙ্কারে তার অবাবও আসছিল। হঠাৎ তারই এক ফাঁকে শোনা গেল নতুন শব্দ। ভাইয়াজী আনন্দে ছুটে গেলেন। সামনের মাঠ-পারের রাস্তা দিয়ে কম ক'রে খান কুড়িক লরী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর মাঠের এ পারের কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঢুকে গেল অনেক সেপাই, বন্দুক সামনে ধরে। আমাদের বাড়ীর পেছনে তিন সার বাড়ী, তারপরই কলেজ। তারই ধারে বরাবর জল বওয়া খাল। লোকগুলো সেই দিকেই গেল।

বুড়ো চাকর ঘরে ঢুকল বড় ধরণের একটা মই নিয়ে। তিনতলার ওপর কাঠের ছাদ আর তারও ওপরে টালু টিন। ঐ কাঠ আর টিনের ছাদের মাঝখানের যে আয়গাটা, সেটায় সাধারণতঃ ঘর গরমের জন্যে জ্বালানি কাঠ রাখা হয়। ধারে একটা জানালাও আছে। মই রেখে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকে গেল। এখন দেখি ওর আর সাহসের অন্ত নেই অথচ শুরুর শুনে এসে ওইই সকলের আগে কেঁদে বলেছিল, এখন কি হবে! ওপর থেকেই ও চিৎকার ক'রে ডাক দিল।

"শিগগীর দেখে যান!"

যে বিপদের চেহারা দেখবার জন্যে সারারাত বিছানায় শুয়ে বসে ছটফট করেছি, এখন সেটা কাছে এবং জানা বলে আর দেখার উৎসাহ আমার তো নেইই, বলরাজেরও নেই। ভাইয়াজীতো চা খেয়ে তৈরি হচ্ছেন, হয় লড়াই আর না হয় সোটা। বলরাজ বললে:

"কি?"

"লড়াই। রামবাগ ব্রীজে।" ভাইয়াজী বড় ধরণের চুমুকের পর চাখনা দিয়ে বললেন:

"সেইজন্যেই এতো জোর আওয়াজ!" উনি উঠে চ'লে গেলেন।

ব্রীজের ওধারে হানাদার আর এধারে আমাদের আর্মড পুলিশ আর সাহায্য করছে পাড়ার লোক। আমাদের বাড়ীর পেছনে বন্যাখালের ওধারে জনা তিরিশ হানাদার আর এধারে গরীব কুলি মজুর। জানা গেল, সারারাত ধরে ওরা এসেছে ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে একটি একটি ক'রে আর ভোর রাতে চেষ্টা করেছিল খাল পেরিয়ে আসতে। কলেজের চাপরাশি গিয়েছিল প্রাতঃকৃত্য সারতে, সেই প্রথম দেখে এবং তারই চিৎকারে ছুটে যায় এন. সি. সির ছেলেরা হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে। কিছু রাইফেলও তার মধ্যে ছিল। আমাদের সামরিক বিভাগ ভাবতে পারেননি যে ওরাণির বাগের খাল পেরিয়ে আক্রমণ করতে পারে তাই পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ছিল শুধু ব্রীজের এধারে। তার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ওটা হল একটা

ব্রীজ, তাহলে অনেক অসুবিধা ; দ্বিতীয়তঃ ওটা হল শ্রীনগরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের একমাত্র যোগাযোগ, রাস্তাটা পরিষ্কার রাখতে হলে ওটায় পাহারা রাখা বিশেষ দরকার। সব চেয়ে বড় কারণ হল ব্রীজ থেকে মাইল দেড়েক গেলেই আমাদের নিউ সেক্রেটারিয়েট। ওটাকে বাঁচাবার জন্যে এটা হল, যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে, ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। এই দু'মাইল এলাকা ঘিরে ওদের এক সঙ্গে আক্রমণের সময় ছিল চারটে। আরটা ঠিক একই সময় হয়েছিল। কিন্তু এন. সি. সির ছেলেদের পাল্টা আক্রমণে ওরা আর খাল পেরিয়ে আসার সাহস পায়নি। ছেলেদের আরও সুবিধে হ'য়ে গেল এপারে, খালের কিনারায় পাথরের চিপি থাকার জন্যে। রাস্তাটা বাঁচাবার জন্যে ঐ পাথর ফেলা হয়েছিল সপ্তাহ খানেক আগে। রাস্তাটা তৈরি হ'য়ে যাওয়ার কথা ছিল বছরখানেক আগে। কন্ট্রাক্টরের গাফিলতি আমাদের বাঁচিয়ে দিল। এখানে ছেলেরা ওদের আটকে রাখে ঘণ্টাখানেক, তারপর সংবাদ পেয়ে আর্মড পুলিশ আসে ঘণ্টা খানেক। গুলি চলেছিল সারাদিন।

ওদিকে, ব্রীজের পাহারা পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে কোন আক্রমণ হতে পারে, কারণ আগের দিনের খবর ছিল যে হানাদারদের হটিয়ে নিয়ে যাওটা হয়েছে বড়গামের শেষ সীমায়। ওরা যে গুলমার্গ থেকে নেমে বন্যাখাল ধরে সোজা চ'লে আসতে পারে এই সহজ সামান্য কথাটা বলরাজের মতন আর্টিস্টের মনে হ'লেও যুদ্ধ যাদের অন্ন সংস্থান তাদের কেন মনে হয়নি তা বোঝা দুষ্কর। বন্যাখালের ওপার এপার দুপার দিয়েই হানাদাররা এসে ওদিকের পাহারা ঘাঁটির ওপর গুলি চালায়। আমাদের দুজন লোক মারা যাওয়ার পর প্রায় দুশ' গ্রামবাসী ছুটে বেরিয়ে আসে আর আরম্ভ হয় দেশের নামে আল্লাহর বিরোধীতা। সেই ডাকই আমরা শুনেছিলাম। ওপর থেকে বুড়ো চাকর চিৎকার ক'রে বলল :

"মেশিনগান্, ওরা মেশিনগান্ চালাচ্ছে।"

"কোথায় ?"

পেছনে তাকিয়ে দেখি দোতা নয়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ভাইয়াজী। পরনে ওঁর হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ইয়া মোটা একটা পোয়েটার মাথায় বাঁদুরে টুপি আর পায়ে চটি। ওঁর ঠিক পেছনে নিচের ভাড়াটে। তাঁরও পরনে হাফপ্যাণ্ট আর হাতে রাইফেল। এইমাত্র যে মানুষটা হাত-পা ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিল তার এই প্রস্তুতির বহর দেখে বোঝা গেল মানুষ আমরা এখনও মরিনি, দেশের মাটির মায়া আমরা এখনও ভুলিনি। আমাদের মন্ত্রীবর্গের নৈতিক অবনতি আমাদের আত মেরেছে কিন্তু মনুষ্যত্ব ভোলাতে পারেনি। প্রথম কাজায় আধুনিক ভারতের যত ক্লেদ সব মুছে দিয়ে সনাতন ভারতের স্বাধীন মানুষ আপন সত্তায় জেগে উঠেছে। হানাদারদের পেছনে বৃটেন আছে, আমেরিকা আছে। আমাদের পেছনে আছে সোজা মেরুদণ্ড। তাই কাশ্মীর আজও আমাদের। ওঁকে দেখে আমারও মনে হল আমি কাপুরুষ নই, আমি পুরুষ। মহাপুরুষ। ইচ্ছে হল, ওঁর বন্দুকটা নিয়ে ওঁকে বসিয়ে রেখে আমিও বেরিয়ে যাই খালের ধারে কি ব্রীজের ওপর।

দু'দলে যুদ্ধ চলল সারাদিন খালটাকে মাঝখানে রেখে। মাঝে একবার হানাদারদের একটা দল হিটকে বেরিয়ে এসেছিল খাল পার হ'য়ে এপারে আর যুদ্ধ হ'য়েছিল রবীন্দ্রভবনের ওপাশে ট্রাভিয়ামের মধ্যে। সেটা আমার ঘরের জানলা দিয়ে গলা বাড়ালেই দেখা যায়। ঘণ্টা দুয়েক এ

বাড়ী ও বাড়ীর লোক এসে দেখে গেল। আর যখন পারা গেল না ঐ ভীড় সামলাতে তখন ভাইয়াজীই বুদ্ধি দিলেন। বললেন, ভাল্লা, কথায় হবেনা, তুমি কাৎ হ'য়ে সামলাও অর্থাৎ শুয়ে পড়। অসুস্থ হওয়ার ভান কর, আর প্রয়োজন মাফিক কাতরাতে আরম্ভ কর। শেষ পর্যন্ত তাই করতে হল। তাতেও যখন লোক ঠেকানো যায়না তখন মশারিটা ফেলে দিলাম।

কাশ্মীরের মতন জায়গায় দিন দুপুরে মশারি ফেলে শুয়ে আছি সুস্থ মানুষ এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে তারই একটা হিসেব করছি মনে মনে। বন্ধ জানলা সার্সি ভেঙে ঝন ঝন ক'রে প'ড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মশারিটা যেন কে সজোরে তুলিয়ে দিল। উঠে দেখি দুটো খিঁ ও খিঁ বুলেট! বলরাজ এসে খাটটা সরিয়ে দিল দুই জানলার মাঝখানে, বললে, কাবা কলকাতায় ফিরে কোরো আর ভাইয়াজী বুলেট তুলে ব্যাগে নাচ আরম্ভ করলেন। আজও সেটা ভাইয়াজীর ঘরে রাখা আছে ওর মাথার কাছে ছোট্ট টেবিলের ওপর। বুড়ো চাকরটা সেইযে ওপরে গিয়ে বসেছে তাকে আর নামানোই গেলনা আরও বুলেট আসার ভয় দেখিয়েও না।

সে শুধু বললে, "হামরা তো চিরকালই করেছি, খুবটা দেখবোনা?

সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে চারাঘারারা ঘটে গেল; গুলিও কিছু কমে এলো। কিন্তু কতক্ষণই বা? সারাদিন পর বুড়ো চাকরটা নেমেছে, আকাশকাটা চিৎকার এলো কিছুদূর থেকে। হরাৎ, আচমকা। এটা মাঠের ধারেও নয়, খালের পারেও নয়, অন্য কোথাও, কিন্তু কোনখানে? জানলা দিয়ে দেখা যায়না, বাইরে যাওয়ার উপায় নেই অথচ মনটা আনচান করছে। জানতে চাই কাদের আর্তনাদ! ভাইয়াজী রাস্তা টপকে চলে গেলেন বলরাজের শ্বশুর বাড়ী আর খবর আনলেন, এবারকার চিৎকারটা সেক্রেটারিয়েটের ওধার থেকে আসছে। আর, ওটা দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে।

পরে জানা গেল ওটা ছিল বাটমালুতে সেক্রেটারিয়েটের পেছনে। বাটম'লু মানে হল—ভাত খেওয়ার মালিক—যাকে বলে অন্নদাতা। ওখানে বহুকাল আগে এক ফকীর এসে বাস ক'রেছিলেন। সবাই তাকে বলত বাবা দাউদ। তিনি ছিলেন মুক্তি আর শুরু মানতের নন্দ ঋষিকে আর লালদেদকে। নন্দ ঋষি হ'লেন শেখ নূর মহম্মদ আর লালদেদ ছিলেন লালেশ্বরী—আর এক মস্ত দেবী—যেমন ফকীর। বাবা দাউদ ছিলেন হিন্দু মুসলমানের পয়গম্বর। কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই আজও তাঁকে মনে প্রাণে পুজো করে। ওঁর মারা যাওয়ার প্রায় দুশোবছর পর মহারাজার এক সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন শের আলি, তাঁর মারা জীবনের সঞ্চয় সব উজাড় করে দিয়ে ওখানে মসজিদ বানালেন বাবা দাউদের নাম করে। তখনই জায়গাটার নাম হল বাটমালু। আগে ছিল শাণ্ডবুক। বাবা দাউদের ঐ পাড়ায় যারা থাকে—কি হিন্দু কি মুসলমান বছরের পনেরো দিন তারা মাছ মাংস ডিম কিছু খায়না। বাবা দাউদ নাকি বলতেন, প্রাণী হত্যা কোর না। ওটা মহাপাপ। তিনি নিজে ছিলেন শাকাহারি। সেই জন্যে বাবা দাউদের দেহাবসানের দিন ওখানে যে মেলা হয় তার এক মাস এদিক ওদিক মাছ মাংস ডিম বিক্রি হয়না আর আগে পরে পনেরো দিন সবাই নিরামিষ খায়। এই বাটমালুর নাম সারা কাশ্মীরে সকলের মুখে মুখে। ওদের কথায় বলে, নেই ভাত তো বাটমালু যা। এমনই প্রসিদ্ধ নাকি বাবা দাউদের মকবরা যে হিন্দুই হক আর মুসলমান, শিখই হক আর বৌদ্ধ, দেশের দিক দিক থেকে আসে সবাই বাবা দাউদের ছুয়া চাইতে। সবাই নাকি পায়ও। এখানে যে শ' চারেক বাড়ী আছে তা ছোট বড় মিলিয়ে আর সাম্প্রদায়িক বাদ বিচারও নেই। সব জাতই আছে।

ভোরবেলা যখনই ওরা শুনল, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা "আল্লাহ হো আকবর" আর "কাফের জিন্দাবাদ" অমনি ওরা এক জোট হ'য়ে মসজিদে বসল সতর্ক পাহারায়। পথে থাকবে না, কারণ সাহিবসাহেবের হুকুমে মার্শাল ল আর সাহিবসাহেবকে ভালোবাসে বাবা দাউদের পরই। মসজিদটা ওদের পাড়ার মাঝ বরাবর। তাছাড়া ওখান থেকে সেক্রেটারিয়েট যাওয়ার পথের ওপর নজর চলে। সারাদিন ওরা পালা ক'রে পাহারা দিয়েছে, কিছু হয়নি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন গুলিগোলার শব্দ ক'মে এলো তখন বোধহয় সতর্কতা একটু শিথিল করেছিল। তার অল্প পরেই যখন অন্ধকারটা একটু ঘন হ'য়ে নামছে তখন ওরা লক্ষ্য করল হানাদারদের—পেছনের ফেউ পেরিয়ে সব দল ক'রে যাচ্ছে সেক্রেটারিয়েটের দিকে। প্রথমে ওরা কিছু বলেনি, কারণ সামনাসামনি যুদ্ধ করলে মশামাছির মতন ওরা মরত। হানাদাররা যখন এগিয়ে গেল তখন ওদের ব্যবস্থা মর্টার থেকে আরম্ভ হল সাদা বন্দুকের গুলি, ইট পাটকেল, যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণ। হানাদাররা একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল বাড়ী, ছাদ, মসজিদ লক্ষ্য করে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে লড়াই চলার মধ্যে সংবাদ পেয়ে এসে পড়ল আর্মড পুলিশ। তখন আরম্ভ হল আর এক নতুন পর্যায়। হানাদাররা বাধ্য হ'য়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ লড়ল পুলিশের সঙ্গে আর অন্যভাগ বাটমালুর লোকদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত যুঝতে না পেরে ওরা লাগিয়ে দিল আগুন।

চারশো বাড়ী, কাছাকাছি, পাশাপাশি, আর সবই প্রায় কাঠের। যে দল লড়ছিল পুলিশের সঙ্গে তারা লড়তে লড়তে ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক আর যারা লড়ছিল লোকদের সঙ্গে তারা তাক ক'রে রইল বাড়ীগুলোর ওপর। লোকেরা যে আগুন নেবাবে তার পথ নেই। বাড়ীর বাইরে এলেই গুলি খেয়ে মরতে হয়—আর বাড়ীর মধ্যে থাকলে আগুনে পুড়ে মরতে হয়। এখন আর শুধু পাড়ার লোকদের নিজেদের বাঁচার সমস্যা নয়, সংসার বাঁচানোর সমস্যা—ছেলে মেয়ে স্ত্রী, বুড়ো মা বাপকে বাঁচানোর সমস্যা। পাকিস্তানি হানাদার কাশ্মীর নিতে এসে নিতে আরম্ভ করল কাশ্মীরবাসীর জীবন।

দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা উঠল আকাশ ছেয়ে, মনে হল হয়ত বা আকাশ ছাড়িয়েই যাবে। বাবা দাউদের মকবরা, শের আলির তৈরী মসজিদ আর কাশ্মীরিদের বাড়ী, সব একসঙ্গে জ্বলতে আরম্ভ করল। চারিদিকে ভীত আতঙ্কিত অসহায় শিশু আর নারীর আর্তনাদ, বাটমালু পুরুষদের জীবন সংগ্রাম, আর হানাদারদের অনবরত গুলি আর সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহ হো আকবর' চিৎকার—সব মিলিয়ে যেন শয়তানদের সরাবখানায় সতীত্বের বলি। ওদের গুলিতে মানুষ মরল, আগুনে পুড়ে মানুষ মরল, আর মরল, দেশভক্তির অপরাধে। দেশের মাটি তাদের প্রাণ ব'লে।

রাত দুটোর সময় জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সারা আকাশটা লালে লাল হ'য়ে গেছে আর সহস্র মানুষের আকুল আর্তনাদে সারা পৃথিবীটাই বোধ হয় কাঁপছে। আগুনটা যখন আর সহজে থামবার নয় তখন হানাদাররা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গিয়ে মিশে গেল জনতার মধ্যে। তারা জানতো এবার আরো সৈন্য আসবে। কারার ব্রিগেড আসবে আর সবাই মিলে আগুন নেভাবার কাজে মন দেবে। তখনই হবে গ্রীনবয় চোকার সুবর্ণ সুযোগ। হলও তাই, কিন্তু সুবিধে কিছুই হল না।

ওরা নিরীহ মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারল। ওরা পুলিশের ওপর অন্ধভাবে মধ্যে আত্মগোপন ক'রে গুলি চালালো আর কারার ব্রিগেডের ওপর ফেলল হাতবোমা।

আর এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে একটা দল গেল সহরের দিকে। সেক্রেটারিয়েটের সব পুলিশ এসেছে আগুন নেভাতে, এইটাই ছিল মাস্তরাতের অনুমান। সংবাদটা তখন কে ছড়িয়েছিল জানা যায়নি। তবে শোনা গেছে ওটা ছিল হোম মিনিষ্টার গুর্খা দলের যুদ্ধ কৌশল। তিনি নাকি মারফৎ ঐ খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে নক্সালরা হানাদারেরা সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করে। ছাদের ওপর আর যেটা পাচিলের ঠিক এ ধারে উনি রেখেছিলেন আর্মড পুলিশ। কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড় করিয়ে। কাঁধে যদি ওরা পা দেয় তাহ'লে ফিরে যেন একটাও না যায়। যায়ও নি। এই একটি রাত্রে মারা গিয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো লোক। তার মধ্যে হানাদার ছিল প্রায় একশো কুড়ি।

রাত দুটোয় আর একদল শ্রীনগর ঢুকবার চেষ্টা করল, পুব দিকে পামপোরের কাছ দিয়ে। ওখান দিয়ে আসার সোজা পথ ছল সৈন্যঘাটির সামনে দিয়ে। ওরা তাই ও পথটা এড়িয়ে আসবার চেষ্টা করল, খানিকটা এসে পঞ্চোচোর্যা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কারণ তলাতেই সাহিক সাহেবের বাড়ী। সেটাও ওদের পক্ষে মস্ত বড় আকর্ষণ। সেখানকার ব্রীজে যে পাহারা ছিল তা সামান্যই, কারণ ওদিক দিয়ে আসাটা বেশ খানিকটা অসাধ্য সাধন। তবু যখন ওরা এলো তখন ঐ পাহারা পুলিশই ওদের সামলে নিল।

আর শেষ রাত্রে আক্রমণ হল বলরাজদের বাগানের পাশ দিয়ে। ওখান দিয়ে সোজা মাইল খানেক এলেই যেতার কেন্দ্র। তার ওপর ওদের যত রাগ তত বিদ্বেষ। শেখ সাহেবের আমলে ওটা ছিল ওঁর হাতের পুতুল—যেমন নাচাতেন তেমনি নাচতো। নক্সালরা চাঁদনা পরিচালনা হওয়ার পর থেকে সে নিজেই হাল ধরেছে মুঠো করে। শালাবাবুকে একদিন ও নাকি ঘাড় ধরে বারই ক'রে দিয়েছিল ষ্টেশন থেকে। রাগটা তাই ওঁরও কম নয়।

বাগানের পাশ দিয়ে বন্যাবাস পেরিয়ে আর ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ওরা এসে পড়েছিল নতুন পুলের কাছ বরাবর। ওটা যে বেশ শক্ত ঘাঁটি তা হানাদাররা ভাবতে পারেনি। ওখানে যুদ্ধ হয়েছিল ঘণ্টা খানেক। এখানেও বেশ মজার খেলা খেলেছিল বারো জন পাহারা পুলিশের মধ্যে দু' জন। যে দু' জন পাহারার ছিল তারা কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাবার পরই পেছিয়ে যাওয়ার তান করে। বাকি দু' জন ইতিমধ্যেই নদী পার হ'য়ে গিয়ে পড়েছিল হানাদারদের পেছনে। ওরা যখন বিজয়-উল্লাসে এগিয়ে আসে তখন পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে এদের পনেরো জনকে খতম করে আমাদের পুলিশ।

পরদিন সকাল বেলায় যখন আমরা দাঁড়ালাম তখন নতুন সূর্য্য উঠছে। সারাদিন আর সারারাত ধ'রে চারদিক থেকে যে আক্রমণ হ'য়েছিল শ্রীনগরের ওপর—আমাদের আর্মড পুলিশ, গ্রামের লোক, এন. সি. দির ছাত্র আর যোধদের বাধা ঘাটদের দুয়া—তা আটকে দিয়েছে পুরোপুরি। বাটমালু অবশ্য তখনও ঘাউ ঘাউ ক'রে পুড়ছে। আট তারিখ সারাদিন ধরেই পুড়েছিল—অর্থাৎ দু' দিন দু' রাত।

আট তারিখের সকালে আর তারপর সারাদিন ধান পাহারের ধানক্ষেত খুঁজে পাওয়া গেল

বহু মুণ্ডহীন দেহ। যুদ্ধে যে সব কাশ্মীরীর আহত হ'য়েছিল, পাছে তারা ধরা পড়ে আর সব ফাঁস ক'রে দেয় তাই তাদের মাথা কেটে আর হাতের উল্কি শুদ্ধ চামড়া কেটে নিয়ে হানাদাররা গা ঢাকা দিয়েছে। পরে জানা গেল, এইটাই ছিল তাদের বাঁধা ব্যবস্থা। হয় তারা হিন্দুস্থানী সেপাইর হাতে মরবে আর না হয় মরবে নিজেদের লোকদের হাতে। মরা মারতে হবে আর না হয় মরতে হবে। আহত হওয়া চলবে না কিছুতেই।

সাত তারিখে সারাদিন আর সারারাত যেন ছিল মৃত্যুর সঙ্গে শ্রীনগরের লড়াই। আমরা স্তম্ভিত আবেগে জানলায় দাঁড়িয়ে ওদের মরণের সঙ্গে লড়াই দেখেছি আর আকাশ জুড়ে দেখেছি মৃত্যুর লেলিহান শিখা। বহু দূর থেকে ভেসে আসা অসহায় জনতার আকুল আর্তনাদ আমাদের কানে এসেছে আর নিজেদের নৈতের অসীম বেদনা প্রাণে পেয়েছে। আমরা ভারত ভাগ ক'রেছি, আমরা কাশ্মীর নিয়ে জুয়া খেলেছি। একটা লোকের একটা দুর্বলতার জন্যে এতোগুলো লোক একসঙ্গে মরল। সেই আঠারো বছর আগে ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের যে ঝগড়া হ'য়েছিল তার পর যদি পণ্ডিতজী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেও লাহোর যেতে না দিতেন তাহ'লে আজ এই কাণ্ড কিছুতেই হত না। সর্দারজীর কথামত পণ্ডিতজী সহজেই ওঁকে আটকাতে পারতেন। কিন্তু আটকাননি। তখনই উনি ফিরাকে কথা দিয়ে এলেন প্লেবিসাইট হবে এবং কাশ্মীর কেসটা ইউ. এন. ওতে যাবে। ব্যস্ তারই ফলে আজ আমাদের হাজার হাজার নিরীহ নরনারী মরছে। আরও মরবে। আজ পণ্ডিতজীও নেই, সর্দারজীও নেই, আছে শুধু ওঁদের ভুল। আর আমরা দিচ্ছি সে ভুলের মাশুল।

আজাদ কাশ্মীর রেডিও তখন বলছে :

"শ্রীনগর আজ জেহাদ সৈন্যের হাতে। হিন্দুস্থানী ফৌজ তাদের ভয়ে শ্রীনগর ছেড়েছে। এসেছিল আর্মড পুলিশ। তাদের সংকটাকে কোতল ক'রে আজাদ ফৌজ আমাদের পতাকা উড়িয়েছে রেডিও ষ্টেশনে, সিভিল সেক্রেটারিয়েটে আর সাদেক হুসেনের বাড়ীতে। স্বাধীন শ্রীনগর আজ আনন্দে নাচছে। আল্লাহ্ হো আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাইয়াজী রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিলেন। অবাক কাণ্ড! কি হল তাইয়াজীর?

"কিছু না," উনি বললেন, "কাল সারাদিন লাঠি হাতে কেটেছে খালাসের জন্যে, লোটার কথা মনেই ছিল না। দেরে আসি!"

॥ ষোল ॥

৯ তারিখ সকালে

আট তারিখের সকাল থেকে আর কোন সাড়া শব্দ নেই, কেবল জানলায় দাঁড়ালে রোদ ভরা আকাশেও বারুদের কটু গন্ধ পাওয়া যায়। আজ নিয়ে দু'রাত আর তৃতীয় দিন। কাল রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝেই অন্তর দলিত আর্তনাদ বেশ মাইল ঘুরেও শোনা গেছে। আজ আর কোন

আওয়াজ নেই। বোধ হয় সরকার ব্যবস্থা ক'রে তাদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। মার্শাল ল' পুরোপুরি চালু আছে বলে লোক ঘরে বন্ধ। শুধু তো নেইই, সংবাদও সিমিত। যা কিছু টুকরো টাকরা আসছে, সবই রেডিও মারফৎ। শ্রীনগরের মধ্যে যা পাশে কোন তাকাবার নেই, যা কিছু সব দূরে দূরে। এদিকে বড়গাম ওদিকে বারামুলা—তাও ছ'টাকাটা আক্রমণ, বড় রকম কিছু নয়। কোথাও ট্রাক, কোথাও কনভয়। রেডিওতে একটা খবর পাওয়া গেল কিছু বন্দীর। তাদের নাকি জেরা ক'রে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেল যে, গত তিনমাস ওদের স্বাই অকলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে। ওদের মধ্যে অনেকের বেশী রকম পাকিস্তানি সৈন্যের স্থায়ী জোয়ান—কেউ তিন বছর, কেউ ছ' বছর, কেউ কেউ বারো বছরও আছে। বাকি লোকদের ভর্তি করা হয়েছে ছ'মাস থেকে তিন মাস আগে—আর ওদের এমন ভাবে রসদ ভাগ করা হয়েছে যাতে বেশীর ভাগই জানাশোনা অথবা আত্মীয়স্বজন আছে এমন এলাকায় ঢোকে। ওদের ব্যবস্থা ছিল ২৭ জুলাই থেকে চুকবার আর পাঁচ তারিখের মধ্যে যে যার ঘাঁটিতে ব'সে যাবে। শ্রীনগর আক্রমণের তারিখ ছিল নয়।

বারো বছর আগে এই ন' তারিখে শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলে ওঁর সমর্থনকারীরা এবং সমর্থনকারীরা ঐ দিনটা হরতালের ব্যবস্থা করতেন। সারাদিন সারা সহরের দোকান পাট বন্ধ থাকে আর দুপুর থেকে শ্রীনগরের শেষ প্রান্তে রণবীর সাহেবের মাঠে উরস্-এর মেলা বসে দু' থেকে আড়াই লাখ লোকের। এই রণবীর সাহেবের মাঠ চল খাদা ইয়ারিতে। ওদের পরিকল্পনা ছিল যে এই হরতালের সময় ওরা শ্রীনগরে ঢুকবে এবং সারা সহর যখন বন্ধ থাকবে মেলা নিয়ে তখন ওরা শ্রীনগরের তিনটে ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে সহরটা দখলে নেবে। ওদের বলা হয়েছিল এবং বোঝানো হয়েছিল যে সারা কাশ্মীর ওদের অভ্যর্থনার জন্য মালা হাতে ব'সে আছে—দলাটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে, গুলির আর দরকারই হবে না। এসে যা দেখেছে তা একেবারে বিপরীত ব্যাপার। সহযোগিতা তো পায়ই নি ওরা উলটে পেয়েছে লড়াই। খাবার ওদের সঙ্গে দেওয়া হয়নি, ওদের খাওয়ার জোগাড় করতে হয়েছে আর বেশীর ভাগ সময় না খেয়ে ওদের সামনে এগোতে হয়েছে। ওদের সঙ্গে না আছে কোন ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা আর না ছিল কোন সাপ্লাইর ব্যবস্থা। অল্প অল্প নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের ক'রে নিতে হবে আর খুব বেশী অসুখ হ'লে মাথাটি কেটে বস্তুটি ফেলে চ'লে যাওয়া হবে। আরও ঠিক ছিল শ্রীনগর দখল করার পর সিকুরিটি ফোর্স আসবে উড়ো জাহাজে। তার জন্যে লোক এবং সরকারি লৌকিকতার ব্যবস্থা নাকি সব তিন তারিখ থেকেই তৈরি ছিল। ওদের দিনপঞ্জী ঠিক করাই ছিল আর আজাদ কাশ্মীর রেডিও-র কাছে তার অনুলিপি ছিল। ওয়ারলেসে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল তাই দিনপঞ্জী বদলালেও অগ্রগতিটা ঠিকই থাকবে অথবা আছে এই সংবাদটাই ওরা পেয়েছিল।

ওদের সব আন্দাজই ঠিক ছিল কেবল একটা জিনিষ ওরা ভাবতেই পারেনি—কাশ্মীরি মুসলমানদের ধর্মজ্ঞান। ধর্মটাকে ওরা আজও মনে প্রাণে মেনে চলে বলেই নিয়মকানুনটি কাকে বলে ঠিক জানেনা। একবার যাদের ওরা বন্ধু বলে মেনে নেয় তার জন্যে জান কবুল। এইটাই কোরাণ-শরিফের আসল শিক্ষা আর নিরক্ষর হ'লেও ওটাই ওরা মনে প্রাণে জানে। সেইজন্যেই যখন শেখ আবদুল্লাহ কোরাণ শরিফ পাঠ করার পর গান্ধীজী আর পণ্ডিতজীকে প্রকারান্তরে গালাগাল দিতেন

তখন সাধারণ কাশ্মীরি খুশী দিত। সেইজন্যেই খোলা ময়দানে তাঁর স্বাধীনতার মর্ম প্রচার বন্ধ ক'রে শেখ আবদুল্লাহকে মসজিদে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। আবার এই একই কারণে চিরকালের হিন্দুস্থান-বিরোধী মাসুদী আর ইদ্রিসীরা ভারতের চুল চুরি যাওয়ার সময় হিন্দুস্থানের সপক্ষে দাঁড়িয়ে শোকযাত্রার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আর শালাবাবু যখন 'চুলটা আসল নয়' বলে আন্দোলন আরম্ভ ক'রেছিলেন তখন এরাই এসে শপথ ক'রে কিছু জনতাকে শান্ত ক'রেছিলেন। ধর্ম এঁদের কাছে জীবনের মূল আর সত্যের সাধনা, রাজনীতির ধাপ্পাবাজি নয়, সৈশাচিকতার হুঙ্কারও নয়। বরঞ্চ কাশ্মীরি হিন্দুদের সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক মানুষ ব'লে থাকে। একটা প্রবাদ আছে, সাতটা সাপ মরলে তবে একটা কাশ্মীরি হিন্দু হয় আর সাতটা কাশ্মীরি হিন্দু মরলে তবে একটা কাশ্মীরি পণ্ডিত হয়। এই কথার সূত্র ধ'রেই বলরাজ আরও একটু বিস্তারভাবে জানতে চাইল, পণ্ডিতজী আর সর্দার প্যাটেলের মনোমালিন্যের কথা।

ওটা আমাদের জাতীয় জীবনের লজ্জা ইতিহাস, ভাবতেই আমার খারাপ লাগে, তবু বলতে হয়।

মাউন্টব্যাটেনের সংবাদ বিভাগের কর্তা অ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসনের মতে—

(১) "জুনে কাশ্মীর যাওয়ার সময় থেকেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে বুঝিয়ে ছিলেন এবং নিজের সমস্ত আধিপত্যের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, অ্যাকশেসনের আগে মহারাজা যেন যে ক'রে হক, রেফারেণ্ডাম নির্বাচন অথবা প্লেবিসাইট জেনে নেন তাঁর প্রজাদের ইচ্ছে।"

(২) "যখন সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ এলো তখন মাউন্টব্যাটেন বলেন যে, সৈন্য পাঠানো যোকামোর চূড়ান্ত হবে। তবুও যখন ভারত সরকার জোর করলেন তখন উনি বললেন, যে অ্যাকশেসন্ আমরা স্বীকার ক'রে নেব কিন্তু শর্ত থাকবে যে পরে জনমত সরকারি ভাবে জানা হ'লে তবে অ্যাকশেসন পুরোপুরি কার্যকরী হবে।...এই নীতি পণ্ডিত নেহেরু সর্বতোভাবে স্বীকার ক'রে নেন এবং তিনি নিজেই এটা সরকারি ভাবে প্রস্তাব করেন।

এরপর দিনপঞ্জীতে যোগানো সুবিধা :

২৯ অক্টোবর ১৯৪৭

মাউন্টব্যাটেন গেলেন সকাল বেলায় পণ্ডিতজীর বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে সর্দার প্যাটেল ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং খোলাখুলি ভাবে সব কথা আলাপালোচনা হল। প্যাটেলজী স্পষ্ট জানালেন যে, তাঁর এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যদের মতে ৩১-এ অক্টোবর লাহোরে যে যৌথ ডিফেন্স কমিটির মিটিং আছে তাতে পণ্ডিতজী কিম্বা মাউন্টব্যাটেন কারওরই যাওয়া উচিৎ নয়। মাউন্টব্যাটেন বললেন, যাওয়া অবশ্যই উচিত, না গেলে সৌজন্যহানি তবে। সর্দারজী আবার জোর দিয়ে বললেন যে কাশ্মীরে যতদিন যুদ্ধাবস্থা থাকবে ততদিন সৌজন্য অসৌজন্যের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ হানাদার নামে মাত্র পার্বত্যজাতি, আসলে পাকিস্তানেরই সৈন্য। পণ্ডিতজী সর্দারজীর বিরোধিতা করে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে লাহোর যাওয়াই ঠিক করলেন।

মিটিং থেকে ফিরেই মাউন্টব্যাটেন মিঃ মেনন ও কে সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথা বলেন। কি কথা হয় তার সরকারি কোন কাগজ নেই তবে আন্দাজ করা যায় যে, পাছে সর্দারজীর সঙ্গে আবার আলোচনার ফলে পণ্ডিতজী মত বদলে ফেলেন সেই ভয়ে তার আগেই ওটা পাকা ক'রে ফেলারই এটা প্রচেষ্টা।

মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে, পণ্ডিতজী আর সর্দারজীর মধ্যে কোন মতান্তর হ'লে গান্ধীজীকেই ওঁরা মধ্যস্থ মানবেন। অতএব জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পরই উনি আজ যান গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজীকে উনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, মিটিংয়ে ওঁদের যাওয়া উচিত কারণ বন্ধুভাবে যুদ্ধ মেটানোই যুক্তি-সঙ্গত। গান্ধীজী স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন ওঁর মতামত—ফলাফল ভগবানের হাতে। ভারতীয় সৈন্য যদি সব শেষ হ'য়ে যায় আর শেখ আবদুল্লাহ যদি ওঁর হিন্দু মুসলমান শিখ সহিসদের নিয়ে মারাও যান যুদ্ধে তো তিনি অন্ততঃ এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবেন না। ভারতের পক্ষে সেটা হবে সাম্প্রদায়িক মিলন ও মৈত্রীর অনবদ্য উদাহরণ।

৩০এ অক্টোবর

ভারতীয় ডিফেন্স কমিটির মিটিং হল এবং তাতে সর্দারজীর মতবাদ টিকলোনা। অনেক তর্কাতর্কির পর কমিটি পণ্ডিতজী এবং মাউন্টব্যাটেনের লাহোর যাওয়া সমর্থন করলেন।

সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে সর্দারজীর গোপন আলোচনা হয়—কি কথা হয় তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি, তবে সর্দারজী নিশ্চয় এমন জোর দিয়ে ওঁর মতবাদ প্রকাশ করেন যে মিটিংয়ের পরই পণ্ডিতজী মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখে মিটিংয়ে না যাওয়ার কথা জানিয়ে দেন। অজুহাত অবশ্য দেন অসুস্থতার। অসুস্থ উনি অবশ্যই ছিলেন না, থাকলে দুদিন অনবরত উনি সর্দারজীর সঙ্গে বিরোধিতা ক'রে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত হ'তেন না, এবং লাহোর যাওয়া স্থির করতেন না। কেউ কেউ বলেন যে, সর্দারজী নাকি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পণ্ডিতজী যদি যান তাহলে সর্দারজী মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন।

৩১এ অক্টোবর

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার মিটিং হয় লাহোরে। সরকারি ভাবে যেটুকু জানা গেছে সেই মতে মাউন্টব্যাটেন নাকি জিন্নাকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের পরিস্থিতি এবং বুঝিয়ে দেন যে, যেভাবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠছে তাতে হানাদারদের পক্ষে শ্রীনগর চোকা অসম্ভব।

তখন জিন্না প্রস্তাব করেন যে, দু' দলই সৈন্য অপসারণ করুক ওখান থেকে। মাউন্টব্যাটেন যখন জানতে চাইলেন পার্বত্য হানাদারেরা স'রে আসবে কেন? তখন জিন্না বললেন, আপনারা যদি সৈন্য অপসারণ করেন তাহ'লে আমিও ওদের সরিয়ে আনব।

[এতোদিন পর্যন্ত কিন্তু সরকারি ইস্তাহারে এবং জিন্না জোর গলায় ব'লে এসেছেন যে, ওরা পার্বত্য হানাদার। ওদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের কোন যোগাযোগ নেই !!]

এই প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে "ইউ. এন. ও'র মধ্যস্থতায় প্লেবিসাইট করা হক।

সর্দারজী যে ইউ. এন. ওতে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। উনি কোনদিনই চাননি যে আপোষে নিষ্পত্তি হক। উনি চেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানি হানাদার নাম নিয়ে যারা এসেছে তাদের মেরে তাড়ানো হক। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, উনি এবং বলদেও সিং কাশ্মীর থেকে ফিরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে এবং ভারতীয় ডিফেন্স কমিটিকে স্পষ্টভাবেই

জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান বেতারে নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি করছে, বেতারে তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাশ্মীরে নাগরিকদের ওপর বর্বরের মতন অত্যাচার করেছে আর বেতারে তারা কাশ্মীরি মেয়েদের জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে এখনও বেআবরো করছে তাতে প্লেবিসাইটের প্রশ্ন তো ওঠেই না, মিটমাট করার প্রচেষ্টারও কোন কারণ নেই এবং ইউ. এন. ওতে আবেদন করার তিনি সর্বতোভাবে বিরোধী।

সর্দারজী এবং রক্ষামন্ত্রী সর্দার বলদেও সিংয়ের এই স্পষ্ট প্রতিবাদ সত্ত্বেও "আইজেনহাওয়ারের বুধরক্ষার জন্য" ২২এ ডিসেম্বর পণ্ডিতজী ইউ. এন. ওতে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারই বোঝা মাথায় নিয়ে আজও আমরা মরে আছি!

কথায় কথায় অনেক রাত হল, বোধহয় সাড়ে দশটা। আজও সারাদিন আমরা ঘরে বন্দী। শুতে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ঘরে এলেন ভাইয়াজী, অত্যন্ত এক শুভ সংবাদ নিয়ে রেডিওতে জানানো হয়েছে যে, কাল থেকে মার্শাল ল' রদ করা হয়েছে তবে সাতটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত কারফ্যু জারি থাকবে। তাছাড়া উরস্-এর মেলা হবে এবং হরতাল হবে না। স্পষ্ট বোঝা গেল শ্রীনগরের ওপর হানাদারি বন্ধ শেষ হ'য়েছে।...

সতেরো

ন' তারিখ সারাদিন

আন্দাজে বোঝবার উপায় নেই, বলা আরও মুস্কিল, তবে মনে হল উরস্-এর মেলায় কম ক'রে লাখ খানেক লোক তো হবেই হবে। কিছু কম কিছু বেশী। ওদের অকৌর্য আনন্দের কলোচ্ছ্বাসে বরণী মুখর। আকাশ যেন আরও ওপরে উঠেছে, হরি পর্বতও কিছু পেছিয়েছে। কোথায় গেল কালকের বিভিষিকা? মনে হল মার্শাল ল'টা বোধহয় ছিল না। ওটা আমার মনের ভুল। এদের এই আত্মহারা পরমোৎসব দেখে কে বলবে, যে এই দুদিন আগে এই এরাই আতঙ্কে আর্তনাদ ক'রেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে। শরতের আকাশে যে মেঘের খেলা তাও বোধহয় এর তুলনায় মন্থর।

ফকারা বললে, এদের মধ্যে হানাদারও অনেক আছে এটা সরকারের কড়া সন্দেহ। তাই দেখবার পাহারার ব্যবস্থাও কিছু কম নয়। থাকে আর নাই থাক হানাদার, কিন্তু তাদের ভয়? সেটা গেল কোথায়? ফকারা হেসে বললে, কাশ্মীরের লোক যাদু জানে, মন্ত্রবলে উবে গেছে। আমারও তাই মনে হল। কলকাতা, দিল্লীর কথা জানি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা মিটবার বহু পরেও যে-পাড়ায় গেলেই গা-টা যেন ছম্ ছম্ করত। এরা সত্যিই ওদের ঐ আকাশেরই মতন নির্মল। এই ঘনঘটা, জমাট মেঘে সব অন্ধকার আর এই বজ্রকে বুকে বুকে নিয়ে শুরু আবেশে ধ্যান মগ্ন। বজ্রের কষাঘাত থামতে না থামতেই বিস্তীর্ণ নীল আকাশ আলোর বিভূতি ছড়ায়। কালকের বেদনা উত্তীর্ণ হ'য়ে ওরা অবতীর্ণ হয়েছে আজকের আনন্দে। অতীতের বোঝা এতটুকু নেই,

ভবিষ্যতের ভাবনাও নেই। আল্লাহর নামে ওরা অন্ধ বলেই ওরাই আলোয় চোখ রেখে, জীবনকে ওরা জয় করেছে।

"তার কারণ কি জানো?" রুকায়া ভীড় ঠেলে যেতে যেতে বললে, "তার কারণ আমাদের নৈসর্গিক নিবিড়তা। এখানে প্রকৃতির এমন প্রাণস্পন্দন যে আমাদের থামবার উপায় নেই, আমরা কেবলই এগিয়ে চলি—লক্ষ্যের পথে নয়, দুহাতে নিজেদের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে। সভ্য জগতে তোমরা মিথ্যার কলঙ্কিত। এই বিস্তীর্ণ পরিবেশে আমরা সত্যের মধ্যে সমাহিত।"

"বোধ হয় তাই।"

"আরও একটা কারণ আছে", রুকায়া বললে, "আমাদের চারিধারে এতো পাহাড় যে নিজেদের বড় বলার না আছে আমাদের সাহস, না আছে দুষ্টতা। প্রয়োজন হ'লে যেমন আমরা ওদের মতন নীরব হ'তে পারি। তেমনি আবার ওদের মতন বিরাটভাবে অটলও হ'তে পারি। আঠারো বছরে দু' দুবার সে প্রমাণ আমরা দিলাম। তাই না?"

ছোট্ট একটা "হ্যাঁ" বলে ভীড়ের মধ্যে আমরা হারিয়ে গেলাম।

ধুলাধূসরিত মুখখানা ঝর্ণার জলে ধুয়ে মেখি রুকায়া একটা পাথরের তলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে। আমরা হজরীর সাহেবের মাঠ পেরিয়ে এসে ব'সেছি সকেদা সারির তলা দিয়ে ব'য়ে যাওয়া ঝর্ণার ধারে। ভীড় অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। অনেকখানি জুড়ে। ধুলো ঝাড়াও হ'য়ে গেছে কিন্তু কলরবের স্পন্দন এখনও কানে আছে। তিনদিন ওকে নিয়ে অনেক কল্পনার জাল বুনেছি ব'লে আজ যেন আর কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে মন চাইছে না। ওর পাশে বসতে বসতে বললাম:

"কি হল?"

"জল দেখে মনটা জলে উঠল।"

"হঠাৎ?"

"বাটমালুর কথা ভেবে!"

"সত্যিই তো," ওর হাতখানা ধ'রে খেলা করতে করতে বললাম, "সে গল্প তোমার শোনা হয়নি। আরও মনে পড়ল। সে দিন তুমি এসেছিলে ডাকোনি কেন?"

"গিয়েছিলাম তোমায় নিয়ে গিয়ে কিছু দেখাবো ব'লে।"

"ডাকলে না কেন?"

"মায়া হল। যা অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে।"

"দেখেছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?" ও আমার হাতের ওপর গালটি রেখে বলল:

"লোভ হল।" খেমে বললে চোখে চোখ রেখে, "খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু!"

"বোধহয় তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছিলাম ব'লে।"

"সত্যি?"

"হয়।"

"কি ভাবছ?"

"অত কথা। তুমি কোথায়। কি করছ। কেমন আছো।" আমার হাতের ওপর ও ঠোঁট বোলাতে বোলাতে বলল, "ছিলাম বাটমালুতে। করছিলাম সেবা। ছিলাম আমি তোমাকেও ভুলে।"

ওর মুখখানা তুলে ধরলাম, ভালো ক'রে দেখব ব'লে। বললাম, "এতো কি কাজ তুমি করলে?"

"দেখবে?.. চল।"

যেতে একটু দেরিই হল। তবু গেলাম।

বাটমালুর ধারে ছোট্ট একটা টিলা আছে। তারই ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম হানাহানির নৈশাচিক তাণ্ডব লীলা। আমাদের পায়ের তলায় বাটমালু পড়েছিল ঠিক যেন আধ-পোড়া মৃতদেহ। তার চেয়ে বিভৎস। তিন শো বাড়ি, দেড়শ' লোক। শিশু আর মেয়েই বেশী। দু'চারটে কুকুর ঘুরছে, কিছু শকুন উড়ছে আর দু'চারটে লোক কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখন তোলে; কখন দেখে আর কখন ফেলে। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায়। বোধহয় আল্লাহ্ যো আকবর কথাটার মানে জানতে চায়।

আমরা নিচের দিকে তাকালাম। চুপ ক'রে রইলাম। পেটের মধ্যে কেমন যেন পাক দিতে আরম্ভ করল। কথা বলার কারণ ছিল না। প্রয়োজনও না। শুধু বাটমালু নয়, শ্রীনগর নয়, হিন্দুস্থান পাকিস্তানও নয়, পুরো পৃথিবীটাই যেন ধ্বংসে দাঁড়িয়ে আছে; মানুষ এমন জঘন্য হ'তে পারে, নৃশংস হ'তে পারে এটা যেন ধারণাই করতে পারছে না। ক্ষমতা, আধিপত্য, শক্তি, স্বার্থ এইসব কুৎসিত জিনিসগুলো সমস্ত জগতটাকে এমন একটা কদর্য জালে জড়িয়েছে যে মানুষের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধ'রেছে; তার আত্মা পর্যন্ত পচে খসে পড়ছে। এই কুষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে এমন আশা যদি কিছু থাকে, তো সে অল্প। নিজেকে মানুষ ব'লে ভাবতে লজ্জা লাগছিল। আমরা আর মানুষ নই, বিকৃত বিকলাঙ্গ পচে খসে যাওয়া মৃতদেহ।

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় মনে হল কণিকা আমার পাশে নেই। তাকিয়ে দেখি ও পাশ ফিরে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি:

"কি দেখছ?"

ও হেসে বলল, "দেখ। ক্ষেতের ওপর কে যেন সোনার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।"

"ধান।" হেসে বলি "কাটবে কে?"

ও বললে, "কেন? ধানের ক্ষেত।"

"তারাতো শেষ হ'য়ে গেছে।"

"না।" ও বললে, "মানুষ শেষ আছে কাশ্মীরের শেষ নেই। দেখনা, গাছ কাটলে ঠিক তারই পাশে আবার নতুন চারা গজিয়ে ওঠে? গাছের শুকনো পাতা ঝিরেই তো নতুন গাছের সার হয়। আমরাও তাই। নিত্যপ্রলয় আছে বলেই তো নবীনের জন্ম।"

অবাক হ'য়ে তাকাই, বলি, "ভাবতে পারছ কি ক'রে?"

"এইটাই যে প্রকৃতির শিক্ষা। কালকের ঝরা পাতা, আজকের শুকনো ডাল কোথায় যায় কেউ যা জানে। প্রকৃতি তাই বলতে থাকে সামনে তাকাও। সমুদ্রের মায়ায় মন ভ'রে নাও। বুঝেছ?"

"না!" ও হাতটায় হেঁচকা টান দিয়ে বললে: "তুমি যে পরদেশী। আও চল। আজ তোমায় ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

যেতে যেতে বললাম,

"কে জানে, হয়ত তোমরাই ঠিক। মন না চাইলেও মানতে হবে—সব কিছু ওদের পাশবিকতা, তোমাদের পরিপূর্ণতা। মাঝখানের যাযাবরটাও।"

ঘাটমালু ছাড়িয়ে বাইরের দিকে এলেই কাঠের পুল পড়ে। তারই পাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী আছে। সেইটাই ছিল ক্যাপ্টেন শের আলির বাড়ী। উনি মারা গেছেন কিন্তু ওঁর ছেলে মাঝে মাঝে এসে এ বাড়ীতে থেকে যায়। সেটা খুব সহজ কথা, কিন্তু শক্ত হ'য়ে ওঠে যখন জানা যায় যে, শের আলির ছেলে মেজর নাসেরের আজি পাকিস্তানের সৈন্যাধ্যক্ষ। কাশ্মীর নিয়ে যখন এতো কড়াকড়ি তখন ওঁর আসার ওপর আর কিছু না হক অন্ততঃ কড়া নজর রাখা নিশ্চয় উচিত ছিল। সরকারি বহলের কথা হল যে, নজর রাখা হত ঠিকই কিন্তু ধর্মের নামে ওঁর আসাটা যে শুধুই বাজে এটা বোঝা যায়নি। নজর যেটা ছিল সেটা হয় কড়া ছিল না আর না হয় নজরানাটা বেশী ছিল—কারণ এই বাড়ীতেই পাওয়া গেছে প্রায় পঁচাত্তর টন গোলাবারুদ।

সহজেই প্রশ্ন ওঠে, সহরের সীমানার মধ্যে এতো মাল আসে কি ক'রে? আনলোই বা কে আর রাখলোই বা কখন? এ প্রশ্ন বহুবার বহুভাবে আমি বহুলোককে ক'রেছি কিন্তু প্রকারান্তরে প্রায় সকলেই উত্তরটা এড়িয়ে গেছে। ফকায়া গাড়ীতে যেতে যেতে যা জানে সেইটুকুই বলল। ওরই কাছে শুনলাম:

বর্তমান হানাদার আক্রমণের ব্যাপারে গোয়টার অনেকখানি পড়েছে বক্সির ওপর এবং ভারতের পক্ষে সেটা ক্ষমাহীন কলঙ্ক—বর্ডার পাহারায় নিযুক্ত তিনজন সামরিক বড় অফিসারের ওপর। শোনা যায় যে ব্রিগেডিয়ার অনন্ত সিং—যিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন তিনিই নাকি ছিলেন সে দলের নেতা। আরও যে দুজনের নাম উল্লিখিত হয় তাঁদের মধ্যে একজন হিন্দু এবং অন্যজন খৃষ্টান। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা কাশ্মীরিদের মধ্যেও যেমন শুনেছি সামরিক বিভাগের কর্মচারিদের মধ্যেও তেমনি শুনেছি। বিশ্বাস করতে অবশ্যই মন চায়না কিন্তু না ক'রেই বা উপায় কি? অবশ্যের ঠিকেদার যতই ষড়যন্ত্র করুক আর যতই লরী চালাক, সৈন্যবাহিনীর সতর্কতায় শৈথিল্য না থাকলে হাজার দশেক লোক আর সাড়ে সাতশো লরী অস্ত্রশস্ত্র সমেত শ্রীনগর চ'লে আসা সম্ভব ছিল না। শ্রীনগরের মধ্যেই পাওয়া গেছে পঁচাত্তর লরী—আরও কম ক'রে পঞ্চাশ লরী ওরা ব্যবহার করেছে আর কিছু না কিছু ক'রে কুড়ি লরী এখনও লুকোনো আছে। অস্ত্র আবার চাল নয়, চিনিও নয় যে চুপি চুপি আনা যায়। এসেছে হেনশান্ এপশান্ সাইট মেশিন-গান্। তাছাড়া হাত বোমা তো আছেই। কম ক'রে লাভ আট আনায় দিয়ে এতো জিনিষ যখন এসেছে আর সারা কাশ্মীরে যখন ছড়িয়েছে তখন একদিনে হয়নি এবং এক জনের জন্যে হয়নি।

পাহারায় যারা থাকে তারা চোখ বোঁজে সাধারণতঃ দু কারণে হয় ঘুমের জন্যে আর না হয় ঘুঁষের জন্য। সামরিক বিভাগ দোষ দেন কাশ্মীরি মিলিশিয়ার ওপর। তারা বলে, ভেলারে ভেলা বর্ডার তো পাহারা দাও তোমরা—আমাদের দোষ কোথায়ন? কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আগে চোর বাড়ীতে ঢুকবে তবে সে বাক্স ভাঙবে!

তর্কের খাতিরে, ও বললে, না হয় স্বীকারই করা গেল যে ন' মো মাইল সীমান্ত রেখার সব জায়গায় গার্ড দেওয়া সম্ভব নয়—যদিও, ওরা যে সব জায়গা দিয়ে ঢুকেছে তা আমরা জানি এবং ঠিক সেই জায়গা দিয়েই যে গতবারেও ওরা এসেছিল তাও সবাই জানে। আর এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল, যে কাশ্মীর মিলিশিয়া সতর্ক ছিল না—তাহ'লেও রইল আমাদের ভারতীয় সামরিক ইন্টেলিজেন্স—সংক্ষেপে কথায় যাদের আমরা বলি সি. আই. ডি। তারা কি করছিল? বর্ডার গার্ড শুধু সৈন্যরাই দেয় না, ওরাও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ওরা রাখেনি কেন? আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বিদেশে সি আই. ডির। শুনেছি তারা নাকি তোমাদের গ্রামের সচ্ছ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা রিভলবারের সন্ধান পেতো; সিলিমার বালিশের মধ্যে সেলাই ক'রে রাখা বোমা বের করত, আর তার চেয়ে বড় কথা। যারা এই সব কাজ করত, তারা সাহেব নয়। এদেশেরই সাধারণ লোক। তখন যদি অতো শক্ত কাজ সম্ভব হত, আজ এতো সহজ কাজটা শক্ত হ'য়ে উঠল কি ক'রে? আমরাই সেদিন পেরেছি—আজ পারি না কেন? দোষটা ঠিক কার?

হেসে বললাম: "আবার সেই গোড়ার প্রশ্ন!"

"সত্যি!" ও-ও হেসেই বললে, "ওর আর শেষ নেই!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

আমি তখন বললাম, "যুদ্ধের জগত থেকে ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এসে বল, কামাল কোথায়? কোন খবর জানো?"

"না।"

"খবর নেয়নি কিছু?"

"কখন তো নেয়না।"

জবাবটা ছোট কিন্তু সুরটা সকরুণ। ওর কোলের ওপর হাতখানা রাখা ছিল। তাতেও যেন গভীর হতাশা। আঙুলগুলো শিল্পীর স্বপ্ন, এতো সুন্দর। ওর বিয়ের আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলাম:

"আরো একটা আরো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?"

"প্রশ্ন না ক'রেই অনেক কিছু জেনেছো—যা আমি নিজেও জানতাম না কোনদিন। আজ হঠাৎ দ্বিধা কেন? বল।"

"কামালকে কতদিন তুমি কাছে পাওনি?"

দ্বিধাহীন জবাব দিল, "ন' দশ বছর। বারোও হ'তে পারে।"

"কেন?"

ডান হাত দিয়ে ও নিজের কপালটা ঢুঁচকে ধরল। কিছু ভাবল।

আমিই তখন বললাম:

"ইচ্ছে না হ'লে জবাব দিও না।"

"ভাবছি। ভাষা পাচ্ছি না।"

"ভাসা ভাসাই বল না হয়।"

"কামাল আমার স্বামী কিন্তু সংসার আমি মানিনা। বিয়ের পরেই কাছে চাওয়ার মূলে ছিল আমার তীক্ষ্ণ নিরেখন। তারই ভিত্তিতে যখন ভালবাসাটা দ'ড়ে উঠল, তখন ও ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছে। কাছে আসত কিন্তু ভালোবাসার মোহে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। সেটা আমার সইল না। তবু আপত্তি করিনি। আশা ছিল, হয়ত কোন একদিন দ'য়ে যাবে। যেত ও, হয়ত ও বুঝত, কিন্তু ও ওর স্বভাবটাই জানতো, আমার অভাব কোনদিনও বোঝেনি। একদিন, বোধহয় মনের মেঘা ছিল বলেই ও মনের কথাটা মুখে আনল, বললে, "তুমি একটা কাঠের পুতুল।" থেমে গেল, চকায়া, কিন্তু আবার ভাবলে, তারপর বললো :

"সেবার মনে হল, হ'য়ত সেই জন্যেই ও ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছে। আসলে, দোষটা আমারই। আমি অস্বাভাবিক। কঠিন। তুমি যা বলেছিলে—হিম। তাই নিজেকে সরল ক'রে দেখবার জন্যে একদিন আমি নিজেই চ'লে গেলাম ওর কাছে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওর স্পর্শটুকুও সহ্য হল না। ওর উত্তেজনার তীব্রতা দেখে একটাই উপমা মনে পড়ল। সেই সাতচল্লিশের রাতে বারামুলার বাজারে একটা কালো কুকুরকে দেখেছিলাম মরা শিশুর মাংস খাচ্ছে। বাড়ী ফিরে বমি করলাম। সেদিনই সব শেষ হয়ে গেল।"

বাড়ীতে এসে শোনা গেল কামাল এসেছিল, একটা ছোট্ট চিঠি লিখে চ'লে গেছে। আর ছেলে গেছে ঠাকুমার কাছে দু'দিন থেকে আসবে বলে। কামালই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে, পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে। চিঠি নয় কয়েকটা কালির আঁচড়। নামটা লক্ষ্যহীন কিন্তু ডাকটা আমাকে। ও আছে শান্তিপুরের কাছাকাছি নওগাম এলাকার এক পাহাড়ে। আমায় সেখানে যেতে বলেছে, যত শিগ্‌গীর সম্ভব, কারণ এখন ওখানে থাকলেও, কবে আবার সরতে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, ওখানকার এক পাহাড়ে হানাদাররা আস্তানা গড়েছে। আজ চারদিন ও তাদেরই আগলে আছে। চকায়া আন্দাজে বললে, জায়গাটা আন্দাজ চল্লিশ মাইল, পাহাড়ী এলাকা ব'লে যেতে লাগবে তিনঘণ্টা।

"যাবে কাল?"

"আমি?···কোন দুঃখে? কথা ওর তোমার সঙ্গে।"

হেসে বললাম, "কিন্তু বিষয়টা তুমি।"

"কি ক'রে জানলে?"

এবার বেশ জোরেই হাসলাম, "স্বামী যখন স্ত্রীর বন্ধুকে আড়ালে ডাকে তখন উদ্দেশ্য ঐ একটাই। আমার জীবনে ও বহুবার ঘটে গেছে।"

"তাহ'লে তো আমার যাওয়া আরও অনুচিত।"

"কেন?"

"ও কি বলবে জানি না। তুমি কি বলবে তাও জানিনা।"

"আমি জানি।"

"কি বলবে?"

"যা ও জানতে চাইবে। যতটুকু বা যতখানি। যাবে?"

ও আবার সেই একই উত্তর দিল, "না।" তারপর বললে, "আর তুমিই বা যাবে কেমন ক'রে? ওখানে তো ডাল ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।'

"যদি পাঠায়?"

"তাহ'লে যেও।" বল, ভীড়ের মধ্যে গায়ে লেগে আছে। কাপড়টা বদলে আসি।"

রুকায়া ঘরে গেল, আমি বারান্দা ছেড়ে বাগানে নামলাম। কাশ্মীরের এই বড় দায়, ঘরে কিছুতেই থাকা যায় না। না শীত, না গ্রীষ্ম। প্রত্যেক ঋতুরই একটা মন ভোলানো ডাক আছে। বসন্তের তো কথাই নেই। ফুলগুলোর রামধনু-রঙের বাহার, সৌরভের মিষ্ট আবেশ, প্রজাপতির শাশ্বত আকর্ষণ। এখানে ছিল ও ছাড়াও, ঝর্ণার একটানা সুর, আজও সন্ধ্যায় ঝিল্লির আনন্দ গান আর পপলারের পাতায় পাতায় অল্প বাতাসের মৃদু শিহরণ। আরও ছিল নীল আকাশে একটা মাত্র তারা, কিছু দূরে দুটো নাম-না-জানা পাখী, আরও দূরে প্রকাণ্ড পাহাড় আর তার কোলে এক রাশ তুলোর মতন ধবধবে মেঘ। আমি গিয়ে বসলাম বাগানের এক কোণে, বড় পাথরটার হেলান দিয়ে। নিচে ছোট বড় বাড়ি, বাকিটা ধানক্ষেত, সবটাই কে যেন সোনার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। লোকে বলে সুইজারল্যাণ্ড, আমি বলি শ্রীনগর। পাথরটার ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে রুকায়া বললে :

"আসব?" হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"আড়ালে কেন? এসো।" ও সামনে এসে দাঁড়ালো। দমটা আমার বন্ধ হ'য়ে গেল। প'রে এসেছে ওর সেই লাল জোব্বা। মাথায় বেঁধেছে রুমাল, কানে ওদের ঝোলানো ঘুংরো আর বেণী বাঁধা চুলের ওপর রুপোর ঝাঁপা।

"চুপ ক'রে থেকো না, লজ্জা করছে। কিছু বল।"

কথা আমার জোগালো না, তাই বললাম :

"পুরাণো কথা, নতুন করে, পুরোপুরি কাশ্মীরি।"

"উহু" আমার পাশে বসতে বসতে বললে, "হেনা রাতের কাশ্মীরি মেয়ে।"

"সেটা আবার কি?"

"হেনা রাত হল সব হারাধোয় রাত। ওটা আমাদের বিয়ের একটা পর্ব—যেমন তোমাদের ফুলশয্যা!"

আমি দুষ্টুমি ক'রে বললাম, "কি হয়?"

"যৌবনের জোয়ার আসে আর জীবনের শুরু হয়!"

"তার আগে কি যায়?"

ও ছেলেমানুষের মতন হাসল, বললে, "সাহেব হলে কফি আর কাশ্মীরি হ'লে কাবা, চা যদি চাও পাবে না কারণ চায়ের নেই, ছেলের-সঙ্গে গেছে।"

"চাই না কিছু।" ওর হাতখানা ধ'রে বলি, "শুধু চুপ ক'রে বোস।" এই অপূর্ব সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার অনৈক্য সৌন্দর্য মিলিয়ে প্রকৃতিকে আমার প্রণামটা জানিয়ে দি।"

তক্ষুনি ও দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, "এখানে বসে প্রকৃতির যা দেখা যায় তার ওপর কৃত্রিমতার ছায়া আছে। এমন জায়গা আছে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানের রাজ দরবার দেখা যায়।"

"সত্যি? কোথায়?"

"কাছেই। এসো দেখাচ্ছি।"

বাগান পেরিয়ে, ওদের বাড়ীর পেছনের ছোট্ট পাহাড়টার ওপরে উঠলাম। ওপাশে নামলাম কয়েক পা। উঁইঢো গাছের সারি দেওয়া ছোট্ট মাঠ। তারই কিনারায় ও আমায় নিয়ে গেল। বললে:

"দেখ। এই আমার সব পেয়েছির দেশ।"

এতোটুকু পথ পেরিয়ে এতোখানি অন্য জগতে যে আসা যায় তা যেন ভাবাই যায়না। খানিকটা পাহাড় গড়িয়ে নেমে যাওয়ার পর ছোট বড় কয়েকটা ক্ষেত, আপন খেয়ালে এলোমেলো ছড়ানো। তার প্রান্তে মেঠো পথ, পপলারের সারি, ছোট ছোট লাল ছাদ দেওয়া দু একটা ঘর। তারও ওদিকে পিচ ঢালা কালো রাস্তাটা চলে গেছে এঁকে বেঁকে যখন যেদিকে ইচ্ছে ঘুরে। তার পাশে প্রকাণ্ড ডল লেকের এধারটা সন্তের বন। তারই মাঝে মাঝে বন সবুজ জলে ভাসা বাগান আর ছোট্ট দেশলাইর বাক্সের মতন দেখা যায় জলের মাঝখানে মহারাণীর শিব মন্দির। কোন একদিন মহারাণী ঐ মন্দিরে প্রতিদিন এক হাজার আটটা পদ্ম দিয়ে প্রণামী দিতেন শিবকে। তার সবটাই যেন এইখান থেকে। একদম শেষ প্রান্তে, বাঁদিকে হরি পর্বত আর ডান দিকে শঙ্করাচার্য্য। মন্দিরের মাথার ওপর অলোটা মনে হচ্ছে আরও একটা তারা। সব মিলিয়ে আমার চোখের তলায় ছড়ানো আছে পটে আঁকা ছবির মতন। ছবি তবু একবার আঁকা হ'লে শেষ হয়ে যায়। এ ছবি আকাশের খেয়াল খুশীর মতন রং বদলায়। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্নও নয়, এ যেন শিল্পীর কল্পনা।

দেখতে দেখতে চোখে জল এলো। অনেকখানি দুঃখে ধোয়া কান্নার মতন। এ সৌন্দর্য্য দু' চোখে ধরেনা, বুকে গিয়ে বেঁধে। মনে পড়ল, আরো একটা আমি আছি, এ জগত থেকে অনেক দূরে, ট্রাম আর বাস আর লোক আর কালো বাজার আর কক্‌টেল আর মিটিং আর আমিত্বের অন্ধকার জীবনে, সভ্যতার বেড়াবৃত্তির ঠিক মাঝখানে। সে আমি, সর্বহারা নিঃস্ব, নিঃশেষিত, এ জগতের সঙ্গে তার এতটুকু যোগ নেই। আরো একটা আমি আছি, ভবিষ্যতের গর্ভে। সে কাল থাকবে নতুন ক'রে হারিয়ে যাওয়ার অসীম বেদনায়। এটা তার হবে, হয়ত সামান্য সঞ্চয় না হয় স্মৃতির লোভ আর না হয় বহুদিন আগে দেখা আর অনেকখানি ভুলে যাওয়া স্বপ্নের সন্দেহ। রুকায়া সরে গিয়ে বসল সদ্য পপলার গাছটার তলায় মাটির ঢিপির ওপর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। বলল:

"ওদিককার পৃথিবীতে যখন হয়রান হ'য়ে আসে, তখন এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এখানে সময়ের শেষ, স্বর্গের শুরু। এখানে অনন্তের অসীমতাকে দু'চোখ ভ'রে দেখা যায়, মনটাকে যৌন করতে পারলে হয়ত ভগবানকেও ছোঁয়া যায়।"

কথার মাঝখানে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম পপলার গাছে হেলান দিয়ে। ও আমার পায়ের ওপর মাথা হেলিয়ে বলল:

"এই রমিত নিস্তব্ধতা আমার রাজত্ব। এই অসীম শূন্যতা আমার অঙ্গের ভূষণ। এই মাটির ধারা আমার সিংহাসন। এখানে যখন আমি আসি, সবার আগে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আমার প্রণাম

করে।" এতক্ষণ ওর মাথার ওপর আমার হাতে ছিল শুধু স্পর্শের আনন্দ। ও আমার হাতটা চেপে ধরল। তখনই পেলাম আত্মরিকতার অনুভূতি। ও টান দিয়ে আমাকে ওর পাশে বসার আয়গা ক'রে দিল, বললে :

"দূরত্ব আর আমায় সইছেনা।"

ওর কাঁধের ওপর মুখটা রেখে বললাম, "আমার মন কি চাইছে বলব ?"

"বলো।"

"তোমার এই জগতকে আমাদের যৌথ প্রণাম জানাতে।"

"জগৎ নয়," ও বললে, "দেশ। আমার সব পেয়েছির দেশ।"

"আজ শুধু তোমার নয়। আমারও।" তারপর ও হয়ত অস্পষ্ট বলেছিল, হয়ত শুধু চেষ্টাই করেছিল বলতে,

"আমাদের।"···মনে নেই। মনে পড়ছে। বলবার অবসরই পায়নি।

• • • • •

আগে আসার আভাষ দিয়ে চাঁদ উঠল। নিছনি নিরঞ্জনার আমাদের সব পেয়েছির দেশ নিতি নৌবর্ষে সিক্ত-সোনা সুন্দরীর মতন ঘুমকে দাঁড়ালো। হয়ত তাই দেখে তপস্বী তারাগুলোও অধৈর্য্য আনন্দে ছটফট করছে। আমি চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে থাকি বাস্তবের শেষ কোথায় আর কোথায়ই বা স্বপ্নের আরম্ভ ?

স্বপ্নই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ? একটি সন্ধ্যার বিপুল স্বপ্ন বহু রজনীর বিফল ক্রন্দন থেকে মুক্তি। এতে প্রতীক্ষার শেষ না থাক সীমানাতো জানা হল। তাইই বা কম কি ? ভেবে দেখলে এ আমার অনেকখানি পাওয়া। এতদিন ছিল শেষের প্রতীক্ষা। এবার আরম্ভ হল প্রতীক্ষার শেষ।

[পরবর্তী অধ্যায়ে : পুষ্কর অভিযান। যুদ্ধের আরম্ভ : স্বপ্নের শেষ]

হাওয়াই দ্বীপের রূপসী

সুপর্ণ রায়

অলিম্পিক খেলা আসন্ন। আমেরিকার ক্রীড়াবিদরা তার জন্য তৈরী হচ্ছেন। দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের তেল এবং লোহার খনিগুলো খনের আগুনে। পৃথিবীর নানাদেশে শান্তি-সংঘ গজিয়ে উঠছে। এমনি সময়ে, মানে ১২৩৪ সালের ১৫ই আগষ্ট, একটি জার্মান পরিবার এসে হাজির হলো হাওয়াই দ্বীপে। সমুদ্রের বুকে ভাসমান ওই দ্বীপের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে যে-সব বিদেশী পর্যটক এসে হাজির হয় এরা তা নয়। বাবা প্রৌঢ়, মাথার চুলে পাক ধরেছে। বিজ্ঞানের অধ্যাপক। নাম ডাক্তার বার্থাল্ড জুলিয়াস কুয়েন। গোটা পরিবার নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন হাওয়াই দ্বীপে। তাঁর সঙ্গে এসেছে রূপসী রুথ। ডাক্তার কুয়েনের প্রথমা স্ত্রীর মেয়ে।

সুখী পরিবারটি প্রথম থেকেই সকলের মন জয় ক'রে নিলো। এরা হঠাৎ এখানে এসেছে কেন? বাবা, মানে ডাক্তার কুয়েন, জাপানী ভাষা শেখার জন্য বাড়াই আগ্রহী। তাছাড়া, হাওয়াই দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস জানবার জন্য বাবা মেয়ে দুজনেরই সমান উৎসাহ। আদি অধিবাসীদের তৈরী পাথরের বাড়ি দেখে ওরা বেড়ান। অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই দ্বীপের কোথায় কী আছে না আছে মুখস্থ হয়ে গেলো। রুথ ভালোবাসে সমুদ্র-উপকূল এবং জলে নানা রকম খেলা। পরিবারের সবাই অবশ্য ভালোবাসে। সাঁতার কাটা, নৌকা কিংবা জল্পে ক'রে বেড়ানো —এ-সব তো এখন নিত্য-নৈমিত্তিক আনন্দ। ডাক্তার কুয়েনের স্ত্রী অসাধারণ না হলেও বেশ হাসি-খুশী। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলে তাঁর চোখে জল আসে।

রুথ মেয়েটি দেখতে বেশ। ছিপছিপে। ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারে। নাচের জন্যেও বেশ নাম করেছে। প্রতিটি বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠানে সে নিয়মিত হাজিরা দেয়। এর ভিতরেই তার উপর নজর পড়েছে নৌ-বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের।

নাৎসীদের ওরা নাকি পছন্দ করে না। রুথ তো পরিষ্কারই জানায় জার্মানী ছেড়ে চ'লে আসার সময় সে একেবারেই শিশু ছিলো।

ওরা থাকে চমৎকার বাড়িতে। দামী আসবাবে সাজানো; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি। প্রতিবেশীদের ধারণা ডাক্তার কুহেন রীতিমতো ধনী ব্যক্তি। প্রচুর অর্থের সঙ্গে শিক্ষিত রুচির মিলন হ'লে কী হতে পারে তার আদর্শ উদাহরণ ডাক্তার কুহেন এবং তাঁর পরিবার।

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে ডাক্তার কুহেন আরো নির্জন জায়গায় যাবেন ব'লে স্থির করলেন। জাপানী ভাষা মন দিয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন আরো নির্জনতার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে চ'লে গেলেন হনলুলু থেকে পার্ল হারবারে। ওই বন্দরের যুবক এবং নৌ-অফিসারদের গৃহিণীদের কাছে রুথ অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দারুণ প্রিয় হয়ে উঠলো। সে নিজে সুন্দরী। তার উপরে আবার প্রচার ক'রে দিলো কী ক'রে মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়াতে হয় সেই বিদ্যা সে জানে। ১৯৩৯ সালে যখন সে একটি বিউটি পার্লার খুললো সমস্ত মেয়ে বন্ধুরা সানন্দে তার পৃষ্ঠপোষক হলো। রুথের জনপ্রিয়তা অসীমে পৌঁছালো।

হনলুলুতে জাপানের ভাইস-কনসাল একদিন রুথ এবং তার বাবাকে গোপনে ডেকে পাঠালেন। কী সব শলা-পরামর্শ হলো।

দিন কয়েক পরে এক দোকান থেকে রুথ একটা শক্তিশালী বাইনাকুলার কিনলো। ওকে অতবড়ো একটা বাইনাকুলার কিনতে দেখে পরিচিত দু-একজন খুবই অবাক হলো। তবে বড়োলোকের একমাত্র দুলালীর তো কত রকম খেয়ালই থাকে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর জাপানের মধ্যে সম্পর্কের বেশ অবনতি হ'লেও তখনো দু-পক্ষের মধ্যে একটা বিটমাটের চেষ্টা চলেছিলো। আর সেই সময়েই, মানে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর, জাপান অতর্কিতে আক্রমণ হানলো পার্ল হারবারে আমেরিকার নৌ-বাহিনীর উপর।

সমুদ্রের উপকূলে আগাগোড়া অন্ধকার রহস্যময় একটা বাড়ি। ভুতুড়ে ব'লেই মনে হয়। সেই বাড়ির একটা জানালা থেকে কে যেন ক্ষণে-ক্ষণে পাঠাচ্ছে আলোর সংকেত। রহস্যকে আলোকপাতেরই মতো। আর সেই আলোর ভাষা পাঠ ক'রে জাপানী বিমান অবার্থ আক্রমণ হানতে থাকলো লক্ষ্যবস্তুর উপর।

চারদিকে তখন শুধু কোলাহল, আর ঘাউ-ঘাউ আগুন। সবাই যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী কিন্তু সেই সঙ্কটের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ ক'রে চলেছে। তাদের সন্ধানী চোখে ধরা পড়লো সমুদ্র-উপকূলে একটা অন্ধকার বাড়ির জানালা থেকে কে বা কারা যেন শত্রুপক্ষকে আলোর সংকেত পাঠাচ্ছে; আর সঙ্গে-সঙ্গে নির্ভুল নিশানায় বোমা ফেলে চলেছে জাপানী বিমান। নদীর স্রোত ধরে অভিযাত্রীরা যেমন নদীর উৎসে হাজির হয়, তেমনি ওই আলোর রশ্মি অনুসরণ ক'রে তার উৎস জানালাটির কাছে গিয়ে হাজির হলো মার্কিন গোয়েন্দারা।

অন্ধকার কক্ষে তারা ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়লো। অবাক হয়ে দেখলো এক তরুণী জানালা পথে আলোক-লিপি পাঠাচ্ছে; তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মাঝে-মাঝে নির্দেশ দিচ্ছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। এত নিশ্চিত মনোযোগে তারা কাজ ক'রে চলেছিলো যে গোয়েন্দাদের উপস্থিতি তারা

একটুকুও টের পায়নি। তরুণী এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হলো। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার পর সবাই অবাক হয়ে দেখলো তারা আর কেউ নন, ডাক্তার কুয়েন এবং তাঁর মেয়ে রুথ।

রুথ এবং তাঁর বাবা দুজনেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করলো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিলো না। সিগন্যাল সিস্টেমের একটা খসড়া পাওয়া গেলো। দেরাজে আবিষ্কৃত হলো প্রচুর অর্থ। তার মধ্যে জাপানী মুদ্রা অনেক। আশে-পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত খবর পেয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে বেশ কিছু অর্থ হাতিয়ে নিলো। পুলিশ আসার পরে অবশ্য তাদের সরে পড়তে হলো। বাইনাকুলার এবং জার্মান ভাষায় লেখা কিছু নথি-পত্রও পাওয়া গেলো।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার কুয়েনকে সবই স্বীকার করতে হলো। পরিবারটির হাওয়াই দ্বীপে এবং পার্ল হারবারে থাকার কারণ। কেবল জাপান সরকারকে নয়, জার্মান সরকারকেও ডাক্তার কুয়েন এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা বহু দরকারী খবর পাঠাতো। রুথ যে অফিসারদের সঙ্গে অহ-রোশি মেলামেশা করতো, সে যে বিউটি পার্লার খুলেছিলো, সবই এক উদ্দেশ্যে।

অনেক বাড়ির সবাই গান গাইতে পারে, কিংবা ছবি আঁকতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই প্রবণতা থাকে অনেক পরিবারের রক্তে। তেমনি গুপ্তচরবৃত্তির প্রবণতা ছিলো মোটা কুয়েন পরিবারের মধ্যে। মা, বাবা এবং মেয়ে মিলে এক রোমাঞ্চকর অথচ বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো।

দ্বীপে থাকার প্রথম তিন বছরেই তারা পেয়েছিলো ৭০,০০০ ডলার। একবারেই নগদ পেয়েছিলো ১৬,০০০ ডলার। মোট তারা পেয়েছিলো ১০০,০০০ ডলার। এই হলো মার্কিন গোয়েন্দাদের রিপোর্ট। তাছাড়াও, কুয়েন পরিবার নিশ্চয়ই আরো অর্থ পেয়েছিলো। তবে, তার অঙ্ক নির্ধারণ সম্ভব হয়নি।

জাপ এবং জার্মান সরকার কুয়েন পরিবারের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলো তার মূল্য অপরিসীম। অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। পার্ল হারবারে জাপানের যে অপ্রত্যাশিত জয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ক্ষয় তার কৃতিত্ব কি শুধু জাপানের বিমান বাহিনীর? আসলে পার্ল হারবারের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলো রুথ; ঘুঘুড়ে বাড়ির অন্ধকার জানালা থেকে; সাংকেতিক রশ্মির আক্রমণ।

ধরা পড়ার পর ডাক্তার কুয়েন স্ত্রী এবং কন্যাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। তিনি বারবার বলতে লাগলেন সমস্ত ব্যাপারটার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করলো না।

রুথ বললো, সমস্ত অভিযোগ একমাত্র তার বিরুদ্ধেই আনা হোক। বললো, বাবা যা করেছেন তা রুথের কথা মতোই করেছেন। ডাক্তার কুয়েনের স্ত্রী জানালেন, বাইনাকুলারটা তাঁরই কেনা; এবং তিনিই বলনেত্রী।

১৯৪২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রায় বেরুলো। ডাক্তার কুয়েনকে গুলি ক'রে মারা হবে। তিনি রায় শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। রুথেরও বিচার চলেছে। সেই বিচারের রায়ও দিন কয়েকের মধ্যেই বেরুবে। রুথকে তো বাঁচানো দরকার। তিনি মার্কিন সরকারকে জানালেন যে

এতদিন জার্মান এবং জার্মান সরকারের হয়ে তিনি বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছেন। সেই বিশ্বস্ততা নিয়ে তিনি মার্কিন সরকারের পক্ষে গুপ্তচর হতে রাজী আছেন। মার্কিন সরকার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তাঁকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বরং স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন ওই ভাবে তাঁর কিংবা তাঁর মেয়ে, কারুরই জীবনরক্ষা সম্ভব হবে না। মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করা পর্যন্ত হয়ে গেলো। ডাক্তার কুয়েনের কাছে কারাগারের নির্জন কক্ষটা মনে হতে লাগলো উন্মাদাগারের কোনো কক্ষের মতো। রথকেও কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে? রথকে কিন্তু খুব শান্ত দেখালো। দার্শনিক নির্লিপ্তি তার মুখে। মৃত্যুর জন্য ধীর তার প্রতীক্ষা। মনে-মনে এখনো তার আশা শেষ পর্যন্ত বাঁচবার একটা রাস্তা নিশ্চয়ই সে বের করতে পারবে।

ডাক্তার কুয়েন বৃথা ভিক্ষা করলেন। কথা দিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে অক্ষ-শক্তির গুপ্তচরদের যেসব ঘাঁটি আছে তার খোঁজ-খবর জানাবেন। ওই গুপ্তচর-সংগঠন তো ডাক্তার কুয়েনেরই হাতে গড়া। তাই বহু খবরই তিনি দিতে পারবেন। বললেন, রথ একেবারেই নির্দোষ; তাঁর স্ত্রী-ও তাই। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ডাক্তার কুয়েনকে কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলো না। তবে তাঁকে স্বীকারোক্তি করতে বললো। ডাক্তার কুয়েন তাই করলেন। তিনি কী বলেছিলেন তা অবশ্য এখন আর জানার উপায় নেই।

১৯৪২ সালের ২৬শে অক্টোবর ডাক্তার কুয়েনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হলো। পরিবর্তে তিনি পেলেন পঞ্চাশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ডাক্তার কুয়েনের স্ত্রী এবং রথ কিছুদিন অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পেলো। মিসেস কুয়েন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু লোকজন এসে বাধা দেয়ায় তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর 'সৌন্দর্য'-বিপনী যখন নীলামে বিক্রি হয়ে গেলো তখন সুন্দরী রথ সেখানে উপস্থিত ছিলো না।

• • • •

একবার বন্ধুরা আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে অভিযোগ তুললেন: আপনি শত্রুদের সঙ্গে বড্ড বেশী ভালো ব্যবহার করেন, ওতে তারাও পেয়ে বসে।

আসলে শত্রুদের নিপাত করা উচিত, বন্ধুরা পুনরায় পরামর্শ দিল: কথায় বলে যে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

আমি তো তাই করি, বললেন লিঙ্কন অতি উদার হাসি হেসে: আমি শত্রুকে শেষ করে ফেলি তাদের ভেতর থেকে মিত্র জেগে ওঠে।

বিয়ের মালিক

আনন্দ ভট্টাচার্য্য

রোমান সাম্রাজ্যের সময় রোমে বহু ইহুদী বাস করতেন। স্বভাবতঃই তাঁরা যখন বসবাস আরম্ভ করছেন তখন এইসব নতুন আগন্তুকদের বিষয় রোমানদের অনেকেই যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক সব রীতিনীতি রোমানদের মনে বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে। কেননা, বিদেশীদের সব কিছুই যেন রোমানদের বিপরীত ধর্মী বলেই নতুন এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সব ব্যাপারে জানতে খুব উৎসুক হয়ে উঠলেন অনেকেই।

এই রকম বহুর মধ্যে ছিলেন একজন বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত রোমান মহিলা। তাঁর কৌতূহল অগাধ, জানবার ইচ্ছাও প্রবল। তাই তিনি আর থাকতে পারলেন না।

একদিন একটি ইহুদী অধ্যাপককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলেন :—

—আচ্ছা, কতদিনে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন আপনাদের ভগবান?

প্রশ্নটির মধ্যে হয়ত একটু শ্লেষ ছিল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক তাকে বিশেষ আমল দিলেন না। বললেন :

—আমাদের ভগবান! মৃদু হেসে জবাব দিলেন—ছ'দিনে। তারপর তিনি মোসেসের প্রথম পুস্তকে বর্ণিত সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করে শোনালেন ঐ মহিলাটিকে।

মহিলাটি অতঃপর প্রশ্ন করলেন :—

—তারপর থেকে ভগবান কি করেছেন?

—বিয়ের ঠিকঠাক করে বিয়ে দিচ্ছিলেন।

—বিয়ে দিচ্ছিলেন? কার বিয়ে?

—হ্যাঁ। মানুষের বিয়ে।

—আহা! ভগবানের কাজের কি ছিরি! রোমান মহিলাটি হেসে গড়াগড়ি।

—হাসছেন কেন? অধ্যাপকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—হাসব না? কি যে বাজে বকেন আপনারা।

—মানে?

—ভগবান হয়ে কি না বিয়ে দিলেন? সে তো আমিও পারি! মহিলাটি বললেন।

—কি! বিয়ে আপনি দিতে পারেন? ইহুদী অধ্যাপকটি স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ। সেটা এমন আর কি। আমি ইচ্ছে করলেই বিয়ে দিতে পারি।

—আপনি বলছেন কি! বিয়ে দেবার মালিক আপনি?

—হ্যাঁ মশাই। আবার বলছি আমি ইচ্ছে করলেই বিয়ে দিতে পারি!

—ইচ্ছে করলেই·····

—আলবাৎ পারি।

—অত সোজা নয় ভায়ে! আপনি জানেন না যে আপনি কি বলছেন। অধ্যাপকটি অতঃপর মৃদু হাসলেন। আর কি যেন ভেবে মাথা নাড়লেন আপন মনে।

রোমান মহিলাটিও হাসলেন এবং বেশ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

—বেশ তাহলে আমিই আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি বিয়ে দিতে পারি কিনা?

—বেশ। তাই হোক।

অধ্যাপকটিকে অতঃপর মহিলাটি নিজের বাড়ী নিয়ে এলেন।

রোমান মহিলাটি তৎক্ষণাৎ নিজের করণীয় কাজটি ভেবে নিলেন।

সামাজিক দিক থেকে মহিলাটি ছিলেন এক মস্ত ধনী সমাজে সব দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা। প্রচুর জমিজমা ধান চাল গোলার আর অফুরন্ত অর্থের অধিশ্বরী ছিলেন তিনি। এ ছাড়াও তাঁর ছিল কয়েক সহস্র কেনা গোলাম। তখন দাস প্রথার যুগ এবং সে হিসেবে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্যা।

বাড়ী পৌঁছেই তিনি পাঁচশ দাস ও পাঁচশ দাসীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর ইহুদী অধ্যাপকটিকে উদ্দেশ করে বললেন ধনী মহিলাটি—অতঃপর আপনি দেখুন, আমি এগুলো নয় দুটো নয়, পাঁচ পাঁচশটি বিবাহ দেব।

অধ্যাপকটি কোন কথা বললেন না।

কর্ত্রীর আদেশ পেয়ে পাঁচশ দাসদাসী একে একে হাজির হল। তিনি তাদের হুকুম করলেন:—

—তোমরা বিয়ের জন্য তৈরী হও।

ওরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। তিনি আরো বললেন—কালই তোমাদের বিয়ে দেব আমি। আজকের মধ্যে তোমরা সবাই তৈরী হয়ে নাও।

অতঃপর তিনি ওদের মধ্যে থেকে এক একজনকে পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করেদিলেন।

যদিও এই বিয়ে সমাজের 'সামান্যতম, হীনতম ও ঘৃণ্যতম' জীব দাসদের, তবু মহিলাটি এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ জানালেন। এঁদের মধ্যে ইহুদী অধ্যাপকটি বিশেষভাবে যে আমন্ত্রিত হলেন তা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁর এতবড় ও এতগুলি বিবাহের আয়োজন শুধুমাত্র অধ্যাপকটিকে দেখাবারই জন্য যে তাঁরও বিবাহ দেবার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ এমন এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজ ভগবানের বদলে তিনি মানুষ হয়েও করতে পারেন। শুধু তাই-ই নয়, একটি দুটি বিয়ে তিনি দিচ্ছেন না। দিচ্ছেন পাঁচশটি দম্পতির, একহাজার মানুষের একই সঙ্গে।

পরদিন।

ঐশ্বর্যশালিনী মহিলার আদেশে বিবাহের সব আয়োজন রাতারাতি সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হল। বিরাট বিবাহ প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের বড় বড় গাছপালা নানান রঙ বেরঙের আলোয় সজ্জিত করা হল। প্রচুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বহুবিধ সুখাদ্য, সুপেয় ও সুপানীয়ের বন্দোবস্ত করা হল। সব আয়োজন সুসম্পন্ন দেখে মহিলাটি খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর গর্বিত মুখভাবে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল। আত্মপ্রসাদে তিনি খুশী হয়ে উঠলেন।

ধনী মহিলাটির হঠাৎ এধরণের খেয়াল দেখে নিমন্ত্রিত বর্গের সবাই বেশ অবাক হলেন বটে কিন্তু কেউ কিছু বলতে চাইলেন না। কারণ ধনী মহলে এধরণের এক আধটা সখ সাধ প্রায় সবারই হয়ে থাকে। গরজ থাকলে কি না হয়?

ইহুদী পণ্ডিত ভদ্রলোকটি কিন্তু রীতিমত ভাজ্জব বনে গেলেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

রোমান মহিলাটি অত্যন্ত গর্বিতভাবে হাসতে হাসতে অধ্যাপককে বললেন—

—দেখছেন তো মশাই! আমি কেমন প্রচুর বিবাহের আয়োজন করেছি এবং এক্ষুণি তা সম্পূর্ণ হবে।

অধ্যাপক মৃদু মৃদু রহস্যময় হাসি হাসলেন এবং বললেন—বেশ তো। দেখাই যাক না কতদূর কি হয়।

—মানে? মহিলাটি যেন বিরক্ত হলেন।

—মানে খুবই সোজা। দেখি না কটা বিয়ে হতে পারে।

—আপনি এত দেখার পরও একথা বলছেন?

—কিন্তু এখনও তো অনেক বাকি। আগে বিয়ে হোক। অধ্যাপক শান্তস্বরে বলেন।

প্রথামত সেদিন গোধূলি লগ্নে পাঁচশটি দাস ও দাসীর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। এবং যেহেতু তারা কেনা গোলাম সেহেতু তারা কেউই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। বলা চলে না। কারণ এ তাদের মালিকের হুকুম!

বিয়েগুলি হল। এবং অতিথি অভ্যাগতেরা খাওয়া দাওয়ায় মন দিলেন। নববিবাহিত দম্পতিরা অতঃপর তাদের দাস কুঠিরে ফিরে গেল। দাসকুঠি বিবাহ প্রাঙ্গন অর্থাৎ মহিলাটির বাড়ীর কাছাকাছিই।

কিন্তু ওকি!

হঠাৎ এত গোলমাল কিসের?

খাওয়াদাওয়া সমাপনান্তে অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। এবং ওদিকে দাস কুঠিরের গোলমালও তত বাড়তে লাগল। হ্যাঁ ঐ গোলমালটি দাস কুঠিরেই হচ্ছে। কি বিশ্রী গোলমাল। যেন হাজার হাজার কণ্ঠ একযোগে কি এক বিষোক্তে ফেটে পড়তে চায় চাপা অথচ ক্রুদ্ধ গর্জন যেন!

মহিলাটি ঠিক বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি হয়েছে বা হতে পারে! যাইহোক কোন রকমে রাতটি কাটালেন মহিলাটি।

কিন্তু পরদিন সকালে দাসখানার কাণ্ড দেখে রীতিমত স্তম্ভিত ও বাক্যহীন হয়ে গেলেন দাসদের একছত্র কর্ত্রী ধনী রোমান মহিলা।

একি! একি করেছে এরা?

এসব কি হল এদের?

যাদের মাত্র গতরাত্রে বিবাহ হয়েছে এই কি তাদের হাল?

ব্যাপার কি !!

ব্যাপার তা সামনেই।

হাজারটি দাস দাসী কাটকেই আর ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মাত্র একটি রাত্রেই ওরা সবাই বেমালুম পালটে গেল !

কারুর একটি চোখ ওপড়ানো। কারুর বা দুটিই গলে গেছে। কারুর নাক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কারুর হাত, কারুর পা নিশ্চিহ্ন হয়ে এদিকে সেদিকে পড়ে আছে ! কারুর কপালে গভীর কাটার দাগ রক্তে মুখ মাখামাখি কারুর মাথা কেটে খেঁতলে গেছে। বেশ কিছু লোক মরেই পড়ে আছে। রক্তে রক্তে আর টুকরো টুকরো খণ্ড বিখণ্ড হাত পা-এর আংসে দাসখানা যেন ভেসে যাচ্ছে ! যেন কোন যুদ্ধক্ষেত্র !

তাদের কর্ত্রী কিছু বলেছেন কি সবাই যেন কেটে পড়তে চাইল। সবাই যেন আগে কিছু বলতে চায়, বলবেই ! তাদের অনেক কিছু বলার আছে।

হাজারটে দাসদাসী বেষ্টিত হয়ে পড়লেন মহিলাটি। তারা সবাই নিজেদের মধ্যে ধরোখেরি সামরিক বন্ধ করে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগে কেটে পড়ল। কর্ত্রী যেন শুধু সাক্ষী হয়েই রইলেন।

—আমি একে চাই না···

—এ মেয়েছেলেটা আমার স্ত্রী হতে পারে না···

—দেখুন···দেখুন···এ আমার নাকটাই কেটে ফেলেছে···একি আমার স্বামী হতে পারে ?

—আপনিই বলুন স্ত্রী হয়ে স্বামীর হাত ভাঙল কি আক্কেলে? এ স্ত্রী নিয়ে আমি কি করব··· ?

—অসম্ভব ! এ কি মানুষ নাকি ?···

—আজই আমার কপাল ভাঙল—কাল হয়ত পা ভাঙবে ! বাকী জীবন কতটুকু বাঁচব কে জানে ?

—বাপস্ ! কি লোকরে বাবা: ! একে নিয়ে কি ঘর করা যায় ?···

—না···না:···এ মেয়ে তো নয়। সাক্ষাৎ রাক্ষসী···দেখুন আমাকে চিনতেই পারা যাচ্ছে না···

—আমাদের এ বিয়েতে কাজ নেই···এবধিৎ ও ইত্যাকার অভিযোগের বারুদ একযোগে যেন ডুবড়ির অপ্রতিরোধ গতির মত বেরিয়ে আসতে চাইছে ঐ 'ঘৃণ্য জীব' গুলির কণ্ঠ হতে। না··না··· আমরা এধরণের বিয়ে চাইনা···এ অসম্ভব···এ জুলুম···প্রতিকার চাই···বিনীত দীনহীন অপাংক্তেয় 'দাস' দল যেন দুর্বিনীত ও দুর্বার হয়ে উঠেছে। কণ্ঠে তাদের প্রতিবাদ। কে এদের বোঝাবে···আর কি-ই বা বোঝাবে ?

কর্ত্রী হতভম্ব। কোন কথা তাঁর মুখে জোগাচ্ছেন।

হৈ হট্টগোল ··· চেঁচামেচি ··· গালাগালি ··· ধস্তাধস্তি ··· কামড়াকামড়ি আবার যেন আরম্ভ হয় বলে।

এই হল সেদিনকার অর্থাৎ বিবাহের পরদিন সকালের শুভ উদ্বোধন !

কি বলবেন দাসকুলের স্বামীনী ? এরা তো তাঁর কেনা গোলাম। কিন্তু কোন ভাষায় তাদের সান্ত্বনা দেবেন—শান্ত করবেন এই অশান্ত সহস্রাধিক নিরীহ অথচ দুর্দ্ধর্ষ প্রাণীগুলিকে ? তিনি কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

নিজের হাতে তিনি একি করলেন? তিনি যা করলেন তা এমনভাবে অবাস্তব কাণ্ডে পরিণত হল? তাতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এত অজস্র পয়সা খরচ করে লোকজন খাইয়ে তিনি যে লোকগুলির বিয়ে দিয়ে স্বামীস্ত্রী করেছিলেন, এই কি তাদের নমুনা? এই কি তিনি চেয়েছিলেন? এ তারা কি করল?

ক্রমে ওরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

ওদের চীৎকার গালাগালি এমন বীভৎসরূপ ধারণ করল যে মহিলাটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি কিছু বলতে চান। কিন্তু কে তাঁর কথা শুনবে তখন?

শেষে তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। কোন উপায়ে নিজের প্রাণ মান ইজ্জত বাঁচিয়ে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

এসেই তিনি নতুন আদেশ জারী করলেন—তোমরা আগে যে যেমন ছিলে তেমনই থাক। তোমাদের বিয়ে বাতিল করলাম। অতঃপর বিক্ষুব্ধ ধ্বনিগুলি শান্ত হল এবং ধনী মহিলাটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

ইহুদী অধ্যাপকটিকে সসম্মানে তিনি ডাকিয়ে আনলেন এবং পূর্বাপর ঘটনা নিবেদন করে মার্জনা ভিক্ষা করলেন। বললেন—

—আপনি ঠিকই বলেছিলেন পণ্ডিত প্রবর। মানুষের বিবাহ দেবার মালিক স্বয়ং ভগবানই। আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। এবং সত্যি এটা দুরূহ কাজ। ঈশ্বর স্বয়ং ইচ্ছা না করলে মানুষের বিয়ে সম্ভব নয়···

অধ্যাপকটি কোন কথা বললেন না। শুধু মুচকি হাসলেন। সে হাসিতে ভগবানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।

* * *

ভগবান তথাগত অরণ্যে শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন।

চারদিক থেকে গাছ হতে শুকপত্র ঝরে পড়ছে।

দুই অঞ্জলি ভরে শুকপত্র নিয়ে তথাগত জিজ্ঞাসা করেন, এই কি শেষ শুকপত্র।

শিষ্য বলেন, না, অরণ্য জুড়ে রয়েছে শুকপত্র।

তথাগত বলেন, তেমনি জগৎ জুড়ে আছে সত্য। যতটুকু তোমার করায়ত্ত তার বাহিরেও আছে সত্য, সর্বদা স্মরণ রাখবে একথা।

সাগর থেকে ফিরে

মূল : জন ম্যাসফিল্ড
অনুবাদ : গৌরীশঙ্কর দে

সাহিত্যের পাঠক, বিশেষ ক'রে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকদের কাছে জন ম্যাসফিল্ড পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁর জন্ম ১৮৭৮ সালে। ম্যাসফিল্ড মূলতঃ কবি। 'সল্ট-ওয়াটার ব্যালাডস্', 'দি এভারলাস্টিং মার্সি', এবং 'দি ট্রাডো ইন দি বাই ষ্ট্রীট' ইত্যাদি কাব্য-গ্রন্থ তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিলো। কাব্য-গ্রন্থ ছাড়া কিছু উপন্যাসও তিনি রচনা করেছিলেন। সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর উপন্যাস। বর্তমান গল্পটি সেই অভিজ্ঞতা বহন করছে। তাছাড়া ম্যাসফিল্ড শেক্সপীয়র সম্পর্কেও একখানা বই লিখেছেন।

রাত্রিবেলা, বিশেষ ক'রে শীতের রাতে, ঝড়ের রাতে যখন বাতাস গর্জন মুখর তখন মনে পড়ে। পুলকিত হই।

ঝড়ের তাণ্ডবের সময়ও ঘরে বেশ আরামেই থাকা যায়। কিন্তু দিন যখন শান্ত, যখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, পায়ের তলায় মাটি যখন কাদা, সমস্ত পৃথিবীর রং যখন ভেজা ইঁদুরের মতো, বিশেষ ক'রে সেই সব দিনে মনে পড়ে অশান্ত দিনগুলির কথা, উদ্যম আর অভিযানের দিন। এরকম একটি দিন আবার ছাড়িয়ে গেছে অন্য সব দিন। ওই আনন্দের দিনটির কথা ভুলতে পারবো না কখনো।

গ্রেট নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রে পড়া মাত্র আমাদের জলযান ছুটে চলেছিলো যেন হরিণ। সত

চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে ধীরে-ধীরে বাতাসের বেগ বাড়ছে। সমুদ্র সাদা হয়ে উঠেছে। আমাদের জাহাজ যেন এক দুষ্ট আহাম্মক। একদিনে আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি ২৭১ মাইল। তখন এই বেগ আমাদের অবাক ক'রে দিচ্ছিলো। অবশ্য অনেক জাহাজের গতি এর চাইতেও বেশি। কিন্তু আমাদের জাহাজটির পক্ষে ওই গতি সত্যি অবাক-করার মতো ছিলো। বাতাস লেগে অধীর হয়ে উঠেছে পাল। আমাদের ক্যাপ্টেন জাহাজটাকে এমন জোরে চালিয়ে নিচ্ছেন যে জাহাজটা গোঁ গোঁ শব্দ করছে। ওই আশ্চর্য দিনটিতে আমরা কখনো ছোঁ মারছি সামনের দিকে আবার কখনো এক পাশে পেরিয়ে যাচ্ছি অনেকখানি। একবার ডুবে যাচ্ছি নিচে, আবার ভেসে উঠছি ঢেউয়ের চূড়ায়। কাঁপছি থর থর ক'রে। গর্জন করছে বাতাস, গম্ভীর শব্দ ক'রে উঠছে পালে লেগে; আর পালগুলি ফুলে শক্ত হয়ে উঠছে লোহার মতো। বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে সমুদ্র ছুটে-কাটা ক'রে আমরা এগিয়ে চলেছিলুম এছাড়া আর কোনো ভাষায় সেই দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সবুজ গর্জন-চূড়া থেকে পর মুহূর্তে জাহাজটা লাফিয়ে পড়ছে নিচে। এর আগে আমি অতি দ্রুতগামী স্টীমারে চড়েছি। কিন্তু সেদিন পুরোপুরি, পালের জাহাজে যে গতির আনন্দ অনুভব করছিলুম তাতে আমরা প্রচণ্ড হাসি আর কান্নায় ফেটে পড়ছিলুম।

বাতাসের তর্জন-গর্জন, জাহাজের পাটাতনের গোঙানী, পাশ দিয়ে দ্রুত ধাবমান সমুদ্রের শব্দ, সমস্ত মিলে সৃষ্টি হয়েছিলো নৃত্যের সঙ্গী সংগীত যেন। যেন সমুদ্রের বুক চিরে আমরা ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে ছুটে চলেছি। আমাদের যাত্রাপথ আরো ফাঁদা আর চওড়া দেখালো, আর সে পথ নবনী হিংস্রতায় ছুটে এসে মিলিয়ে যাচ্ছিলো পিছে। ছুটে-ছুটে খেয়ে আমরা একটু ক্লান্তই হয়ে পড়লুম। জাহাজের মুখ অন্যদিকে ফিরানো হলো, কিন্তু থামলো না আমাদের গান আর হৈ চৈ। বাতাসের দেবতা ভর করছেন আমাদের উপরে। নাচতে-নাচতে আমরা একজন অন্যকে তখন খুন করতেও পারতুম। মনে আমাদের সুতীব্র উন্মাদ। আমাদের ডুবে পেয়েছে। তখন প্রায় বিশ্বাস ক'রে ফেলেছি আমাদের জাহাজ জল থেকে লাফিয়ে উঠবে, ভাসবে আকাশে, ডানাধারী দেবতার মতো। জাহাজের শীর্ষে অনবরত প্রতিহত হচ্ছে ফুলিঙ্গের মতো জলকণা। আন্তোপান্ত ভিজে উঠেছে সামনের দিককার মাস্তুল। ডেকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। দিনটাও তেমনি চমৎকার। রোদে ঝলমল। ঝকঝকে দিন। আকাশে সূর্য পূর্ণ গৌরবে সমাসীন। আকাশের রং এত নীল যে ভাষায় তা ব্যক্ত করা অসম্ভব। যে দীপ্ত সমুদ্র বিদীর্ণ ক'রে আমরা ছুটে চলেছি সে সমুদ্র কণ্ঠে প্রবাহিত করে গান। যতদূর দৃষ্টি যায় জল শুধু ঝলমল করছে, কাঁপছে। জলের রং নীল, জলের রং সবুজ, রোদ প্রতিফলিত হয়ে এমন উজ্জ্বল যে তাকানো যায় না। কখনো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠছে, কখনো প্রেয়ীবদ্ধ গিরি-শৃঙ্গের মতো। তারপর ফেনিল আক্রোশে ভেঙে প'ড়ে গর্জন করছে। আবার উঁচু হয়ে চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তালে-তালে, ছন্দে-ছন্দে, সুরে-সুরে, গানের মতো সমুদ্রের সেই ক্রমাগত উত্থান। সেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্ম-বলিদানেও অনেকে উৎসাহী হবে। ইচ্ছা হবে তার ভিতরে চ'লে যেতে, তার অংশ হতে, তার তরঙ্গের দ্বারা প্রকৃত আর নিশ্চিহ্ন হতে। সমুদ্র একই সঙ্গে তখন বিস্ময়, গৌরব আর বিভীষিকা। তার সৌন্দর্য অবলোকনই তখন জয়, রাজকীয় উপভোগ।

তার পরদিন আমাদের উন্মত্ত জাহাজ আরো দুর্দম বেগে ছুটে চললো, আরো ভয়ংকর

গল্পবের মধ্য দিয়ে। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি তার কাঁপছিলো আনন্দে। যেন এক আগের, অশান্ত জীবন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। জাহাজটা তখন যেন অমানুষিক, পরিশ্রমের, আধ্যাত্মিক। ভুলে যাচ্ছিলুম আমরা মানুষ। জাহাজটি তখন প্রাণবন্ত, অমর, হিংস্র। আমরা তার পরিষদ, সেবক। আমরা উড়ায় পশ্চাতে ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্র-ধূলি। ওই জাহাজের ভিতরে যে আমরা আছি সেই আনন্দেই আমরা আত্মহারা। আমরা গান গাইছিলুম, চিৎকার করছিলুম আর জাহাজটিকে ডাকছিলুম সমুদ্রের রাণী ব'লে।

মানুষের সব গৌরবই সমাপ্তির রেখা টানতে বাধ্য। আমাদের গৌরবের প্রহরও শেষ হয়ে এলো। দুপুরের ভোজন পর্ব সবে শুরু হয়েছে; কেবিনের দরজা খুলে গেলো। জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ এলেন। যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায়ই আমাদের তিনি ডেকে যেতে বললেন। দেখলুম জাহাজের আগের সেই গতি আর নেই। ক্লান্ত শরীর কোনো রকমে টেনে নিয়ে চলেছে। যে দিক থেকে বাতাস বইছে সে দিকের সমুদ্র যেন মুছে গেছে ঘোড়ো হাওয়ায়। দিগন্ত রেখা এখন আবৃত ধূসর আবরণে। সমুদ্র আর আগের মতো প্রসন্ন নয়, বরং ধূসর, গম্ভীর। তার এখন হিংস্র সৌন্দর্য। বাতাস আর সংগীত নয়, বরং একপাল নেকড়ে কুকুরের গর্জন।

আমরা জাহাজের গতি সংহত করার জন্য পালগুলি শিথিল ক'রে দিতে শুরু করলুম। সেই আদেশই এসেছিলো। যে পাল আগলে করার ভার আমাকে দেয়া হয়েছিলো সেটি যেন বহু মেয়ের মেলায় একখানি ছেঁড়া কাপড়, থেকে-থেকে লাফ দিচ্ছিল আমার মাথার ঠিক একশ ফুট উপরে। বাতাস আমাকে এমন ভাবে ধাক্কা দিচ্ছিলো আর প্রহার করছিলো যে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। আমাকে যেন মাস্তুলের মাথায় হিঁচড়ে টেনে তুলছিলো। টের পেলুম বাতাস কি জিনিস।

তারপর বাতাস এত জোরে আর এমন গর্জন ক'রে বেয়ে এলো যে আমার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। যে পাল শিথিল করার দায়িত্ব আমার উপর সেটা তখন দেখবার মতো হয়েছে বটে। বাতাস ঘোড়ার-বাচ্চার মতো সেটা তখন বাতাসে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। জাহাজের ডেকের উপর দিয়ে বাতাস যখন যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে চাবুক। আর গর্জন করছে যেন ষাঁড়। আমার চোখে এসে লাগছে তিমি মাছের হাড়ের মতো। আমি কাৎ হয়ে পড়ে গেলুম; পাল আমার মুখে এসে আঘাত করলো, এক ঝটকায় খুলে নিয়ে গেলো আমার মাথার টুপি। বাতাস আমাকে পাটাতনের উপর চেপে রাখলো; মনে হলো আমার জামা-কাপড় টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। নিজেকে মনে হলো রাজার মতো, সম্রাটের মতো। পালের পতপত শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলুম। আমার সামনেই রয়েছে প্রধান মাস্তুল। সেটাকে বাগে রাখবার চেষ্টা করছে একজন নাবিক। তার পাশে আরেকজন আরেকটা পাল সামলাতে ব্যস্ত। আর আমার পায়ের তলায় পাগলের মতো লাফাচ্ছে জাহাজটা; আর আমরা হাতকর কয়েকটি খুদে জীব চেষ্টা করছি তার ডেকের উপরকার দড়ি-কাছি সামলাতে। আর ঠিক আমার নিচেই আছে সমুদ্র, চেহারা এখন তার ধূসর, গম্ভীর।

এর পরেই একেবারে চাবুকের মতো আমাদের উপরে এসে পড়লো ঝড়। সমুদ্রকে সে

চেপে ধরলো নিচের দিকে। মুছে দিলো সব দৃশ্য। ধূসর বৃষ্টিধারা, ধূসর মেঘ আর ধূসর আকাশ ছাড়া চোখে পড়ছেনা আর কিছুই। ঠাণ্ডা বৃষ্টি। তুষার-শীতল বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে আমার আত্মার নীল রং পর্যন্ত ধুয়ে গেলো, যখন দিয়ে হাঁটছি সেখানেই ঢাকা হচ্ছে নীল রঙের রেখা। হন্ট' দুই ঘ'রে আমাদের সমানে লড়াই করে যেতে হলো। আবহাওয়া শান্ত হলো কিন্তু তার পরদিন।

সুখ নানা রকম; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই ভালোবাসে উত্তেজনা। ধূসর দিনে, যখন কাদামাটির মধ্যে থেকে ঘাস গ'জে যাচ্ছে, তখন সেই সুখের ছবি আর স্মৃতি হৃদয় ভ'রে দেয় আনন্দে। কারণ তা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই : অতি সাধারণ জিনিস, অতি নগণ্য জিনিস, এমন কি এক ঝলক বাতাসও আমাদের হৃদয় নাচিয়ে দিতে পারে, হোতা সেই চেতনা এনে দিতে পারে যে মহাজীবনের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট অভিনেতা।

• • •

গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিসের মৃত্যুকাল আসন্ন। একটি শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি শিয়রে অপেক্ষমান চিকিৎসক। একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। একটা যেন গভীর নিদ্রা আসছে।

তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে উৎসুক চিকিৎসক প্রশ্ন করেন, কি কষ্ট হচ্ছে, কি রকম বোধ করছেন?

দার্শনিক ডায়োজিনিস বলেন তাঁর উপলব্ধির কথা, কোন কষ্ট নেই, কেবল দুই সহচরের মধ্যে একজন এগিয়ে আসছে, নিদ্রা আসছে মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ বহন করে।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দার্শনিকের মানসিক শক্তি অটুট থেকে যায়।

মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ

আভা পাকড়াশী

চাঁদের চাঁদের মুখ বা পানের মত আনন-এর বর্ণনা সেকালের কবিরা কতভাবে কত ছন্দেই তো করে গেছেন। একালের সাহিত্যিকরাও পেছিয়ে নেই। এঁরা বলেন ওভ্যাল সেপ এর মুখ কিম্বা কাটা কাটা সার্পমুখ। কিন্তু সবাই তো কিছু অমন সুছাঁদ মুখ নিয়ে জন্মায় না। তবে ঐ কোটাতে বা ছাঁদে আনতে চেষ্টা করবেন না কেন!

তরুণী বা কিশোরীরা তো বয়সের ধর্মে এমনিই কিছুটা লাবণ্যের অধিকারিণী। তার ওপর একটু আধটু সুষ্ঠু প্রসাধনের প্রলেপ পড়লেই যেন পরিমার্জিত দেখায়। কিন্তু উত্তর তিরিশদেরই প্রসাধনের প্রয়োজন বোধহয় বেশী। শুধু তাই নয় অপুরুষীর টোল, মেছেতা বা মাকড়সার পায়ের মত সরু সরু রাগ মানে রিঙ্কল্‌স; এগুলিও ওঁদের কম সমস্যায় ফেলে না। পানের ছাঁদের সুছাঁদ মুখও ভেঙে গিয়ে অন্য আকার নেয়। তবে সবচেয়ে আগে ভাঙে মন। মনের অসুস্থতাই ক্লান্তির ছাপ ফেলে মুখে। মুখ হল মনের আয়না। সুতরাং মনের প্রফুল্লতা সহজে নষ্ট হতে দেবেন না। তাহলে মুখে বয়সের ছাপও সহজে পড়বে না। মুখের ঐ রাগ টোল, বা রিঙ্কল্‌স-এর জন্য অধীর চিন্তিত হবারও কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আপনার নিজের জন্য ব্যয় করবার জন্য চাই কিছু সময় আর চাই ধৈর্য, দেখুন সুফল পাবেনই। আমাদের রোজকার ব্যবহার্য বস্তুর মধ্যেই আপনার কঠিন সমস্যার সরল সমাধান লুকিয়ে রয়েছে। শুধু আপনার ব্যবহারের অপেক্ষা।

প্রথমে আপনার চোখের নীচের গালের ওপরের ঐ রিঙ্কল্‌স-এর সমস্যার কথাই বলি।

একটি প্লেটে চাকাচাকা করে শশা কেটে নিন। খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার সমস্ত মুখটি ঢেকে ঐ শশার চাকাগুলি সাজিয়ে দিন। মিনিট পনের এমনি করে রিল্যাক্স করে নিন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

—চায়ের চামচ-এর এক চামচ মধু আর এক চামচ ডিমের কুসুম নিয়ে মুখে প্রলেপ দিন। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

—যাঁদের রিঙ্কল্‌স অনেক বেশী তাঁরা ডিমের সাদা অংশ মুখে মাখুন শুকিয়ে টান ধরার মত হলে ধুয়ে ফেলুন।

—বেশী গরম পড়লে বরফের টুকরো নিন, একটি রুমাল বা সাদা কাপড়ের টুকরোয় জড়ান

এবার ধীরে ধীরে মুখে বুলোতে থাকুন। মুখটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলে বন্ধ করুন। এতে করে মুখের রোদের ছাপ চলে যায়, ব্যাসাচি মরে যায় আবার রিফ্রেসও দেয়ে যায়।

যাদের মুখে একটু বেশী তেল তেলে ভাব তাঁরা ডিমের কুসুমের সঙ্গে দুচার ফোঁটা পাতি লেবুর রস মিশিয়ে নেবেন। কিম্বা লেবু আধখানা করে কেটে রস বার করে নিন, তারমধ্যে একটু ডিমের কুসুম ফেলে ঘণ্টা দু'তিন রেখে দিন তারপর সেটি মাখুন।

যাদের মুখ খসখসে তাঁরা অন্যান্য গুলি ব্যবহার করুন। ঐ সঙ্গে মুখে গরম জলের ভাপ নিন। একটি বড় মুখের পাত্রে গরমজল চালুন। একটি বড় ভারী টাকিস তোয়ালে নিয়ে পাত্রটি তেতরে রেখে মাথার ওপর দিয়ে ঢেকে নিন। গরমজলের পাত্রের ওপর আপনার মুখটি থাকবে। একটুও ভাপ বেরিয়ে যাবে না। সবটাই আপনার মুখে লাগবে। এতে করে লোমকূপের মুখগুলি ভাল করে খুলে যাবে, তৈলবাহী গ্রন্থিগুলি ঠিকমত কাজ করবে। মুখে ব্রণ থাকলেও এইভাবে ভাপ নিলে সেরে যাবে।

মুখে অপুরণীয় টোল থাকলে মুখের ম্যাসাজ করুন। স্নানের সময় হাতে সর্ষের তেল নিয়ে গাল ও মুখের সমস্ত চামড়া ওপর দিকে টেনে টেনে তুলে ম্যাসাজ করুন। আবার রাত্রে শোবার সময়ে একটু নুন না মেওয়া টাটকা মাখন হাতে মেখে নিয়ে ঠিক ঐভাবে ম্যাসাজ করুন। মিনিট তিনেক করলেই যথেষ্ট এবার গরম জলে ছোট তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় জড়ো করে ধরে গালের বা মুখের টোল খাওয়া অংশে চেপে চেপে সেক দিন। এটি নিয়মিত করলে কিছু দিনের মধ্যেই দেখবেন টোলগুলি আবার ভরে উঠছে।

এখন যাঁরা খরচ করতে চান তাঁদের জন্য কিছু বলি। Deep cleansing milk. ব্যবহার করুন। রাত্রে শোবার আগে ঐ cleansing milk এ তুলো ভিজিয়ে সমস্ত মেকআপ তুলে ফেলুন তারপর Anti wrinkle cream দুগালে নাকের ওপরে আর কপালে একটু একটু লাগান। এখন বুড়ো আঙুলে আর মাঝের আঙুল দিয়ে বেশ গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত মুখে ঐটি মাখুন। হাত ওপর দিকে তুলে তুলে ম্যাসাজ করুন। মিনিট পনের পরে মুছে ফেলে শুয়ে পড়ুন।

হঠাৎ কোন পার্টিতে যেতে হলেও আপনার মুখের ঐ ব্রণ টোল বা রিঙ্কল্ নিয়ে মন খারাপ করার কোন দরকার নেই। আপনার গায়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে কাউণ্টেক্স ক্রীম বেছে নিন। রাত্রের জন্য Fluid make-up ব্যবহার করতে পারেন। এগুলি সহজে শুকিয়ে গিয়ে আপনার মুখের রং-এর সঙ্গে মিলে যাবে। আর এই Foundation cream-এর তলায় আপনার মুখের সমস্ত খুঁতও অনায়াসে চাপা পড়ে যাবে। এর ওপর এবার আপনি যথারীতি পাউডার, কাজল, লিপষ্টিক দিয়ে সাজুন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন পাউডার-এর পাফও বেশী চাপ দেবেন না। আলতো ভাবে পাউডার মাখবেন। নাহলে Foundation cream-এর প্রলেপটি তেজে যাবে।

এখনকার ফ্যাসান অনুযায়ী ঐ ফ্যাকাসে লিপষ্টিক ব্যবহার করা বাদ দিয়ে ঘাড় রং-এর লিপষ্টিক ব্যবহার করুন। দেখবেন ঐ লিপষ্টিক-এর চড়া রংই অন্যের চোখ টানবে আপনার মুখের রংয়ের দিকে কারুর নজরই পড়বে না। আর এইভাবে সাজার ফলে আপনার মুখটি নিটোল নিখুঁত হয়ে স্বাভাবিক লাবণ্যে টল টল করবে। আপনার মন খারাপ করার বা দুশ্চিন্তারও আর কোন কারণই থাকবে না।

শিথিল কবরী বাঁধিও

কত ঢংএর কত ছাঁদএর খোঁপাই তো আমরা যুগ যুগ ধরে বেঁধে আসছি। কাটা চুল, ছাঁটা চুল থেকে এখন আবার আমরা সেই অজন্তার যুগে ফিরে চলেছি। সেই দেব-দেবীর মাথার চূড়া করে বাঁধা খোঁপারও রেওয়াজ হয়েছে দেখছি। কিন্তু তেলে তেজালের সঙ্গে সঙ্গে চুলেও আমাদের তেজাল পড়ছে তাই অতবড় খোঁপা হচ্ছে। কিন্তু তেজাল না দিয়ে যদি নিজের চুলেই অত বড় খোঁপা করতে পারি কি আনন্দ হয় তাহলে! অমনি আনন্দ পেতে গেলে চুলের যত্ন করতে হবে, চুলের স্বাস্থ্য দেখতে হবে। তার জন্য একটু সময় আর ধৈর্য্য চাই কিন্তু।

আগেকার দিনে স্নানের আগে বেশ বিলি কেটে কেটে ঘষে ঘষে তেলমাখার রেওয়াজ ছিল—আর ছিল রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোন। তাই নিয়ে কত কাব্যই রচনা হয়ে গেল। তাছাড়া সেই ছোট্ট-বেলাকার রূপকথার গল্প—কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল! ছোট বেলা থেকে যত্ন নিলে অমন মেঘবরণ চুল হয় বৈকি! আর অমনি করে ঘষে ঘষে তেল মাখলে চুল পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নীচের নামেও ঠিক। কিন্তু এখন আমাদের অত সময় কই! অফিসে কাজ করতে হবে নয়তো অফিসের ভাত দিতে হবে, স্কুলে পড়াতে হবে নয়ত স্কুল থেকে আনতে ছুটতে হবে! এই তো ব্যাপার। তবু নিজের মনের খেদ মেটাতে যদি মেয়ের মাথায় মাথাভরা চুল দেখতে চান তবে ছোট থেকেই সেই ছোট্ট মাথাটির যত্ন নিন।

মেয়ের পাঁচ বছর বয়েস হলেই মাথা ছাড়া করে দিন। একটু বড় হলেই তো তার লজ্জা হবে, ঘেন্না হবে, মানে নিজের মত গজাবে। তাই বলছি ঐ বয়েসটিই সবচেয়ে ভাল। একবার ছাড়া করলে হবেনা। পনের দিন অন্তর অন্ততঃ বার তিনেক ছাড়া করে দেবেন। আর ছাড়া করার পর অন্ততঃ সাতদিন এই প্রলেপটি ব্যবহার করুন—এক আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল। নকুন চট পোড়ান ছাই এক কাপ। আধ কাপ কাল কেন্ডতি পাতার রস। এগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে একটি প্রলেপ তৈরী করুন তারপর মেয়ে বা মাতনীর মাথার ছাড়া হবার পর বেশ পুরু করে মাখাতে থাকুন। তিনবার ছাড়া হবে, তিনবারই সাতদিন ধরে অন্ততঃ মাখাবেনই। একবছর ছয়মাস বাদ দিয়ে আবার এমনি তিনবার ছাড়া করে দেবেন। আবার প্রলেপ দেবেন। এই মেয়ের চুলের জন্যে আর ভাবতে হবেনা। দেখবেন কেমন ঘন কালো চুলের অধিকারিণী হয় মেয়েটি।

আজকাল কমবয়েসী মেয়েরা মোটেই তেল মাখেনা। শুধুই শ্যাম্পু করে ফাঁপিয়ে রাখে

চুলগুলি। এতে প্রথম প্রথম ক্ষতি না হলেও পরে চুল ভাঙতে শুরু করবে, শেষে টাক হবে। তার চেয়ে চুলও রক্ষা পায় ক্যান্সারও বজায় থাকে এইটি করলেই ভাল হয় নাকি।

চুলের জন্য খাঁটি নারকেল তেল বা তিলের তেল সবচেয়ে ভাল। অনেকে সুগন্ধী তেল পছন্দ করেন কিন্তু ওতে চুলের উপকার হয়কি!

যাঁরা এমনিতে তেল মাখতে ভালবাসেন না তাঁরা স্নান্পু করার আগে তেল মাখুন। খাঁটি নারকেল তেল একটু গরম করে নিন তাতে একটুকরো কুলো ভিজিয়ে সমস্ত মাথায় বেশ করে তেল দিন। বিলি কেটে কেটে চুলের গোড়ায় তেল দেবেন। আধঘণ্টা অমনিভাবে তেলে ভিজে থাক চুল তারপর স্নান্পু করুন। চুল এতে রেশমের মত নরম থাকবে। আবার চুলের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

কেনা স্নান্পু ব্যবহার করতে সহজ কিন্তু খারাপ। কোন কোন স্নান্পু চুলের ক্ষতিও করে থাকে।

তার চেয়ে ঘরোয়া ভিনিষে স্নান্পু করুন না। ভাল বেসন নিন আধকাপ। ডিমের বেসন সবচেয়ে ভাল। মাথার বিলি কেটে কেটে শুকনো বেসন ছড়িয়ে নিন। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে রগড়ান। তারপর ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। এতে চুল বেশী কষ্ট হবেনা, সেই করবার সুবিধে হবে।

যদি বেশী ফাঁপা চুল পছন্দ হয় তবে রীঠে দিয়ে স্নান্পু করুন। রীঠে দিয়ে মাথাধোয়া সবচেয়ে উপকারি। বারোচারটি রীঠে জল ভেঙে ভেতরের বীচি বার করে নিন। দুতিন কাপ জলে বেশ করে ফুটিয়ে সেদ্ধ করে নিন। রাতে সেদ্ধ করে সকালে আবার একটু গরম করে বেশ করে চটকে নিন। যত চটকাবেন তত ফেনা হবে। এবার ঐ জলটি ছেঁকে নিয়ে ঘষে ঘষে মাথায় মাখুন। চুলগুলি ঝক ঝক করবে।

চুল সুগন্ধি করার ইচ্ছে থাকলে দুচার ফোঁটা আতর ঐ বেসন বা রীঠের জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন।

যাঁরা খুব্বির অত্যাচারে ভোগেন তাঁরা স্নান্পু করার পর আধকাপ জলে দুই চামচ চামচ দুই চামচ ভিনিগার দিয়ে সেই জলটি মাথায় মাখুন তারপর আবার ধুয়ে ফেলুন।

খানিক লেবুর চিকাপাউডারও মাথাধোয়ার পক্ষে ভাল। তবে তেল না মেখে শুধু মাথায় কখনো ওটি ব্যবহার করবেন না।

পাতিলেবুর রসও মাথা বেশ পরিষ্কার করে। চুলের গোড়াও শক্ত হয়।

চুলের যত্ন নিলে সেও আপনাকে সুন্দর করবার রচনায় নিশ্চয়ই সহায়তা করবে। পরে-ভারতীর পাতায় বারান্তরে আবার এই কবরীকে কবলস্থ করার কায়দা জানাবার ইচ্ছে রইল।

মুখ-পদ্মের বৃন্ত

নীলিমা দে

বৃন্তকে অবলম্বন ক'রে ফুটে ওঠে নীল সরোবরের শ্বেতশুভ্র। কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়ে ওঠে তপসীর মুখ। এমন কি, মুখ সুন্দর না হলেও কোনো মেয়েকে সুন্দরী মনে হবে, যদি তার কণ্ঠ হয় শঙ্খের মতো, কিংবা গ্রীবা হয় মরালের উন্নমিত শিবা। গ্রীবা সুন্দর ক'রে তুলতে কিংবা সুন্দর রাখতে হলে শরীরের দিকে নজর দিতে হবে বালিকা বয়স থেকে। বসা, দাঁড়ানো, কিংবা হাঁটা চলার সময় মাথা উঁচু রাখবেন; শরীর সোজা রাখবেন। কুঁজো হয়ে চললে সুশ্রী গ্রীবার অধিকারিণী হওয়া খুবই কঠিন। মনে রাখবেন গ্রীবার সৌন্দর্য প্রায় সবখানিই নির্ভর করে দেহের ঋজুতার উপর। তাই সব-সময় দেহ ঋজু ও উন্নত রাখার অভ্যাস করুন। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবা ও কণ্ঠে ব্যবহার করুন ক্রিম। অনেকে কেবল মুখ ফর্সা করবার জন্যই প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কণ্ঠকে বাদ দিলে মুখের প্রসাধন অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আপনি যদি রোগা হন এবং আপনার কণ্ঠ কৃশ হয় তবে গলায় সূর্যমুখী ফুলের তেল নিয়মিত মালিশ করলে উপকার পাবেন। আবার ঘাড়ে বা গলায় বেশি মেদ জমলে রাজহংসীর মতো গলা আপনি কখনোই আশা করতে পারেন না। সেই পরিস্থিতি হ'লে গলার দু একটি সহজ ব্যায়াম অভ্যাস করুন। যেমন: মুখ ধীরে ধীরে নিচু করে চিবুক বুকের সঙ্গে ঠেকান; আবার ধীরে-ধীরে মুখ তুলুন। এমনি বার কয়েক করুন। অনেকের মুখের চাইতে গলার রং কালো। তাদের উচিত মুখে যে পাউডার মাখবেন তার চাইতে হাল্কা ক'রে গলায় পাউডার মাখা। গলার সৌন্দর্য স্থায়ী রাখার জন্য দরকার মাঝে-মাঝে নরম সাবান গলায় মেখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ ক'রে গলা ধুয়ে ফেলা। এতে গলায় ফিরে আসবে যৌবনের সজীবতা।

আমরা সবাই অভিনেত্রী হবো না, কিংবা শিল্পীর মডেলও হবো না। রাজহাঁসের মতো গলা পাওয়াও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তা না হোক কিন্তু কণ্ঠ ও গ্রীবা যথাসাধ্য সুশ্রী ক'রে তুলতে দোষ কি? শুধু ফুল নয়, ফুলের বৃন্তটিকেও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে বৈকি।

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজ সমাজ

(হেস্টিংস-এর সময় তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের একজন প্রতিপক্ষ ছিল। তিনি ফিলিপ ফ্রান্সিস (পরে স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস) বিদ্যায় বুদ্ধিতে চাতুর্যে লাম্পটো ফ্রান্সিসও কম ছিলেন না।

শাসন ব্যবস্থার নানা ব্যাপারে ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংস-এর প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগত। শেষ পর্যন্ত সেই ঠোকাঠুকি গিয়ে পৌঁছোলো রীতিমত এক দ্বন্দ্বের লড়াইএ, যাকে বলে দ্বৈরথ যুদ্ধ।

সেই সময়কার ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় এক লেখক বলেছেন, কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় মহিলার সংখ্যা বেশি ছিল না। অল্পসংখ্যক যারা ছিল তাদের নিয়ে কাড়াকাড়ি মারকাটারি লেগেই থাকতো পুরুষগুলোর মধ্যে। ফলে নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই নানা কেলেঙ্কারী ঘটত।

গোড়া থেকেই ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংসের ছিল আদায় কাঁচ কলায়, ফ্রান্সিস যেদিন কলকাতায় এসে নামলেন সেদিন থেকেই হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর যত কথাকাটি সুরু।

মেকলে বলেছেন, ফ্রান্সিস প্রভৃতি কাউন্সিলের সভ্যরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁরা শুনেছিলেন যে তাঁদের প্রতি হেস্টিংসের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাঁদের আসাটা হেস্টিংস তেমন পছন্দ করেন নি।

এই রকম একটা পূর্ববিরোধী মনোভাব থাকলে লোকে অল্পেই চটে যায়। ফ্রান্সিসের দল ভেবেছিলেন, তাঁরা জাহাজঘাটা থেকে নেটি নেরিয়ে কলকাতার মাটিতে পা দিলে একুশবার তোপধ্বনি করে তাঁদের সম্মান দেখানো হবে। একুশটা তোপ দাগা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্মান।

কিন্তু তোপ দাগা হল সতেরোবার। অবশ্য হেস্টিংসই সেই রকম আদেশ দিয়েছিলেন। ব্যস! আর যায় কোথায়। একুশের জায়গায় সতেরো।

ফ্রান্সিস রাগে গরগর করতে করতে পাল্টাতে গিয়ে উঠলেন।

ফ্রান্সিস-হেস্টিংস বিরোধের আরও একটা কারণ হল মারাঠা যুদ্ধ। রাঘোবার উপকূলে হেস্টিংস যখন মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন তখন ফ্রান্সিস তাঁকে কোন রকম বাধা দেবেন না এই রকম শপথ করেছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সিস তাঁর কথা রাখেন নি। ১৭৮০ সালে জুন মাসের শেষে ফ্রান্সিস এবং হোরেসার সাথে কাউন্সিলের আর একজন সদস্য এই যুদ্ধে তাঁদের অসম্মতি জানিয়ে গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছে এক নোট পাঠালেন।

হেস্টিংস প্রথমে সেই সময়কার অ্যাডভোকেট জেনারেল সার জন ডে-কে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন ফ্রান্সিস হোরেসারকে হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ না করবার জন্য উপদেশ দেন। সার জন ডে কি রকম উপদেশ বা অনুরোধ পেশ করেছিলেন তা জানা যায় নি, কিন্তু দেখা গেল, তাঁর চেষ্টা একেবারেই ফলপ্রসূ হল না। তখন হেস্টিংস পাল্টা এক মন্তব্য লিখলেন। সেই কড়া নোটে তিনি ফ্রান্সিস আর হোরেসারকে চোখা চোখা কথার বাণে একেবারে যেন মাটিতে পেড়ে ফেললেন।

সে সময় হঠাৎ ফ্রান্সিস অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই হেস্টিংসের সেই মন্তব্য ১৫ই আগষ্টের আগে প্রকাশিত হয়নি।

এদিকে বিলেত থেকে তখনো কোন আদেশ নামা আসেনি। হেস্টিংসের চাকরি থাকবে কিনা, এই আদেশ-নামায় তা জানা যাবে।

সেই সময় দিনরাত হেস্টিংস যেন পাগলের মত সময় কাটিয়েছেন।

চাকরি যদিও বা থাকে তাহলেও ফ্রান্সিসের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবধারিত। কারণ তখনকার দিনে অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের ওই ছিল একমাত্র পথ। নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ তখন হাতাহাতি লড়াই করত। যাক প্রাণ যাক মান। অতএব ফ্রান্সিসও যে সেই পথ নেবেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

হেস্টিংস মনে মনে ভয় পেলেন। তাঁর হাতের টিপ তেমন সুবিধার নয়। ফ্রান্সিস পিস্তল চালাতে ওস্তাদ। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে শিখণ্ডী চলবে না। পিস্তল নিয়ে দাঁড়াতেই হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে হেস্টিংস স্ত্রীকে চুঁচড়ায় রেখে এলেন। তারপর এক ধনী মহাজনের কাছে তিনলক্ষ টাকা ধার করে সেই টাকা পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রীর কাছে। অনেকে মনে করেন, তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গেলে স্ত্রী যাতে অর্থকষ্টে না পড়েন সেই কারণেই হেস্টিংস অত টাকা ধার করেছিলেন। সে টাকা তিনি অবশ্য আর উপুড়হস্ত করেননি।

১৫ই আগষ্ট কাউন্সিলে গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের মন্তব্য প্রকাশিত হল। তাতে ফ্রান্সিসের প্রতি বিস্তর অকথা-কুকথা ছিল। ফ্রান্সিস মিথ্যেবাদী, লম্পট, আত্মসম্মান জ্ঞানহীন, মেয়েমানুষ, কদ্মপ, শিখণ্ড আরও কত কি।

কাউন্সিলের অধিবেশন চলা কালে ফ্রান্সিস কোন কথা বললেন না। মুখ লাল করে বসে রইলেন।

অধিবেশন শেষ হল। তখনো ফ্রান্সিসের মুখে কথা নেই। এক বন্ধু তাকে বললে—কী হে। বিশেষণ গুলো কী রকম লাগল? কোন উত্তর দেবে না?

ফ্রান্সিস বললেন দেব বৈকি। এর তো একটি মাত্র উত্তর আছে। ওরাহ সন্তানকে জিজ্ঞেস করে এলো, ডুয়েল লড়বে কি না? এবং যদি লড়ে, লড়তে তাকে হবেই, তো কোন তারিখে লড়বে? এক সপ্তাহের বেশি সময় দেব না।

হেস্টিংস্-এর রাজী হওয়া ছাড়া উপায় রইল না। স্থির হল ১৭ই আগষ্ট বেলভিডিয়ার সকালে দু'জনে ডুয়েল লড়বেন।

কর্ণেল পিয়ার্স হেস্টিংস-এর এবং কর্ণেল ওয়াটসন ফ্রান্সিসের 'সেকেণ্ড' হয়েছিলেন।

দু'জনেই একই ধরণের পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন।

ঠিক কোন জায়গাটায় এই লড়াই অনুষ্ঠিত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবিষয়ে Echoes from old Calcutta-র লেখক বাসটিড সাহেবের মতই সর্বজনগ্রাহ্য বলে গণ্য হয়েছে।

তাঁর মতে, বর্তমানের আলিপুর রোডের এবং বাড়ির সীমানাভুক্ত বাগানের উত্তর দিকে একটা প্রশস্ত ঘাস জমির উপর এই লড়াই হয়।

লড়াইএর নিয়মানুযায়ী দুজনে একসঙ্গে পিস্তল ছুঁড়েছিলেন। ফ্রান্সিস ছিলেন স্থির নিষ্কম্প। হেস্টিংস্ উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

কিন্তু ফ্রান্সিসের তাক ফসকালো, আর হেস্টিংসের পিস্তলের গুলি গিয়ে লাগল ফ্রান্সিসের ডানদিকের বুকের পাঁজরায়।

ফ্রান্সিস মনে করেছিলেন, আঘাত সাংঘাতিক। তিনি বাঁচবেন না। তাহলে হেস্টিংস্কে হয়ত নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হোতে হবে। তাই তিনি হেস্টিংসকে ডেকে সাবধান ক'রে দিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হলে হেস্টিংসের কী করা উচিত হবে সে সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন।

হেস্টিংস নাকি বলেছিলেন, ফ্রান্সিস যদি মারা যান তাহলে তিনি পুলিসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে একটুও বিলম্ব করবেন না।

একটি মর্মান্তিক ট্রাজেডির সামনে দুই শিথিলচরিত্র ইংরাজ পুরুষের চরিত্রের উজ্জ্বল দিক উদ্ঘাটিত হয়েছিল। দুই আজন্ম বৈরী সেদিন পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আহত ফ্রান্সিসকে প্রথমে আলীপুর থেকে কলকাতায় অর্থাৎ ডালহৌসি স্কোয়ারের কাছে তাঁর বাসায় আনবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক এবং তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন।

সে কারণে তাঁকে নিকটস্থ 'বেলভেডিয়ার' ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং চিকিৎসার সর্বরকম ব্যবস্থা করা হয়।

সুস্থ হোয়ে ২৪শে আগস্ট ফ্রান্সিস নিজের বাড়ী ফেরেন।

ডাক্তার ক্যামবেল এবং হেস্টিংসের নিজস্ব ডাক্তার (ডাক্তার ফ্রান্সিস) ফ্রান্সিসের চিকিৎসা করেন।

ফ্রান্সিস যখন বেলভেডিয়ারে দিন যাপন করছিলেন সে সময় হেস্টিংস্ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস দেখা করেন নি।

* * * *

কোম্পানীর আমলে কলকাতার ইংরেজ সমাজে আসবোলার খুব প্রচলন ছিল।

বড় বড় ভোজে বা নিমন্ত্রণে আলবোলার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিত।

অনেক ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ পত্রে লিখে দেওয়া হত, আলবোলার ব্যবস্থা থাকবে, দয়া করে সঙ্গে আপনার নিজস্ব হুঁকো বরদার আনবেন।

অর্থাৎ সাহেব-মেম নিমন্ত্রণে গেলেন, সঙ্গে গেল হুঁকোবরদার। সাহেবের সামনে আলবোলা বসিয়ে দেওয়া হল। সাহেবের হুঁকোবরদার সাহেবের রুচি মাফিক হুঁকো সাজিয়ে দিলে।

বিবিরাও অনেক সময় আলবোলা টানতেন।

একঘর সাহেব মেম। দশবিশটা আলবোলার অম্বুরি-তামাকের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘর আমোদিত। সঙ্গে হুইস্কি শেরি শ্যাম্পেনের স্রোত বইছে। নরক গুলজার যাকে বলে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যেতো সাহেব মেম আর আলবোলা সব একাকার হয়ে ফরাসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর হুঁকোবরদারেরা কলকের আগুন নিবোচ্ছে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকাও সারলাচ্ছে।

কোম্পানীর আমলে যে সব ইংরেজ মেয়ে-পুরুষ এই শহর কলকাতায় এসে জড় হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের ভিতর ন্যায়নীতি বা ধর্মভাবের লেশমাত্র ছিল না।

সেই সময়কার ইংরাজ সমাজের একটি চিত্র পাওয়া গেছে এক দুষ্প্রাপ্য বাংলা রচনায়। তারই খানিকটা হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই প্রামাণ্য রচনা থেকে পাঠক তখনকার ইংরাজ-সমাজের একটি স্পষ্ট ছবি দেখতে পাবেন।

"তখনকার ভারত প্রবাসী ইংরাজ সমাজে দুর্নীতির কথা বর্ণনীয় নহে।

কলিকাতা রিভিউ পত্রে কোন লেখক বলিয়াছেন,—মোগল সম্রাটদিগের সময়েও ইংরাজ ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আসিয়া স্বজাতীয়দিগের হীন ব্যবহারে মর্মাহত হইতেন। সার টমাস রোর সহিত একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীদিগের সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন, এবং ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ তাহাদিগের সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে যেরূপ অসদ্ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, এই সব খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগকে দেখিয়া তাহারা ভাবাভাবা ইংরাজীতে বলে—"খৃষ্টধর্ম শয়তানের ধর্ম; খৃষ্টানগণ বড় মদ্য পান করে, কুকার্য্য করে, এবং অপরকে মারে ও গালি দেয়।" এই সকল বর্ণনা হইতেই ইংরাজগণের বঙ্গাধিকারের পূর্ব্বেরও ইংরাজ-সমাজের দুর্নীতির কথা জানিতে পারা যায়। কেহ স্বদেশ ও স্বজাতীয়গণের নিকট হইতে দূরে আসিলে কেবল যে তাহার কুকর্ম্মের পথে বিঘ্ন দূর হয়, এমন নহে; পরন্তু তাহার প্রলোভনের পথও প্রশস্ত হয়। ভারতে পদার্পণ-মাত্র ইংরাজগণ স্বদেশের সকল সংযম বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিত; তাহারা মনে করিত, তাহারা এখানে আসিয়া ধর্ম ও নীতির সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার পাইয়াছে। তাই তাহারা পাপের আবরণও আর আবশ্যক বিবেচনা করিত না। দেশে ঘৃণার্জ্জনোপযোগী চরিত্রের ও ক্ষমতার অভাবে এই সকল দেশচ্যুত ইংরাজ ভারতে অর্থের জন্য সকল কুকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিত। তাহারা লোককে ঠকাইত এবং পাপানুষ্ঠানে রত হইত।

হেষ্টিংসের সময়ে কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ পাপের পূতিগন্ধময়। নৈতিক হিসাবে হেষ্টিংসের চরিত্র নিতান্ত নিন্দার্হ। তিনি বহুদিন একজন পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী-রূপে বাস করিয়াছিলেন, এবং শেষে সেই বিচারিণীর সহিত আপনার বিবাহে উৎসবানুষ্ঠানেরও ত্রুটি করেন নাই। যিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহার এই ব্যবহার! ক্লাভিলের পাপপ্রবৃত্তি আরও ভয়ানক। তাঁহার

লালসা মানসিক ক্ষয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ষোড়শবর্ষবয়স্কা মাডাম গ্রাণ্ডকে পাশে লিপ্ত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ঘৃণা করিতে হয়। তখন সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যগণও পরস্পরকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বারওয়েলের সহিত ক্লেভারিংয়ের ও হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বৈরথ-যুদ্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পের নৃশংসতা, অত্যাচার লোভ ও পাপের কথা সর্বজনবিদিত।

এই সময়ের ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের সহিত কেন যে ধর্মযাজকদিগের অহিনকুল সম্পর্ক ছিল, সমাজের এই অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। মুসলমানগণ ভারতে মহম্মদীয় ধর্মের প্রচার করিতেন। পর্টুগীজগণ দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ডাচগণও ধর্মপ্রচার করিতে আগ্রহ দেখাইতেন। স্পেন যখন আমেরিকা জয় করে, তখন খৃষ্ট-ধর্ম-প্রচারই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। কেবল ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদের অধিকারে খৃষ্ট-ধর্মযাজকদিগকে বাস করিতে দিতে চাহিতেন না, এবং তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতে বিশেষরূপ চেষ্টিত হইতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী যখন কলিকাতায় আইসেন, তখন তাঁহাকে লুকাইয়া ভয়ে ভয়ে ধর্ম-প্রচার করিতে হইত; ভয়,—পাছে তাঁহাকে ধরিয়া ইংলণ্ডে চালান করা হয়। তখন যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া কোন কারণ না দেখাইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চালান করিবার ক্ষমতা শাসনকর্তাদিগের ছিল। ইহার ছয় বৎসর পরে যখন মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ড ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা ইংরাজাধিকার ত্যাগ করিয়া ডেনিস অধিকারভুক্ত শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অবশ্য বলা হইত যে, রাজনৈতিক কারণে ধর্মযাজকদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত কারণ স্বতন্ত্র। তখন ইংরাজগণ অর্থলাভের জন্য যথেচ্ছাচার করিতেন; তাঁহাদের চরিত্রও যে ভাল ছিল, এমন নহে (সে সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি), কাজেই ধর্মযাজকদিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধ একরূপ অবশ্যম্ভাবী। তখন ইংরাজ মনে করিতেন, ভারতবর্ষ তাঁর সম্পত্তি; সেখানে তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন; গ্রাম্য কথায়, তাঁহার ছাগ তিনি লেজে কাটিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ধর্মযাজক কিছু না বলিয়া ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার পাপের প্রতিবাদ করিতেন, তাঁহার অর্থলাভের পথ যে পাপপঙ্কিল, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেন;—অর্থলাভলোলুপ যেচ্ছাচারী ইংরাজদিগের তাহা সহ্য হইত না। কাজেই তাঁহারা ধর্মযাজকদিগের উপর নিতান্তই নারাজ ছিলেন। যে সহজাত-সংস্কার আত্মরক্ষা হইতে উদ্ভূত, তাহারই ফলে তৎকালীন ইংরাজ বুঝিয়াছিলেন, ধর্মযাজক বড় ভীষণ পদার্থ। ইহার বহুদিন পরেও "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে কোন লেখক বলিয়াছেন যে, এখনও কলিকাতার বাহিরে কোন ধর্মযাজক ধর্মমন্দিরে না আসার জন্য বা ধর্মযাজকদিগের প্রতি সম্মানের অভাবের জন্য তাঁহার যজমানদিগকে তিরস্কার করিতে সাহস করেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের আর একটি প্রধান ঘটনা এ দেশে সংবাদপত্র-প্রকাশ। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বোল্টস নামক এক ব্যক্তি কাউন্সিল হাউস ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থলে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, কলিকাতায় সকলেই একটা মুদ্রাযন্ত্রের অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। কেহ যন্ত্র স্থাপন করিলে তিনি বিশেষরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এখন প্রকাশযোগ্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থাকাতে তিনি একখানি হস্তলিপিময় পত্র প্রকাশ করিবেন। যে কেহ প্রাতে ঘণ্টা

হইতে বারটার মধ্যে তাঁহার আবাসে যাইয়া উহা পাঠ করিতে বা নকল করিয়া লইতে পারিবেন। এই ঘোষ্টস প্রথমে কোম্পানীর অধীনে কর্ম করিতেন; কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে অল্প দিনে প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। ইহার পর ইনি Interloper অর্থাৎ পরের ভাতে কাটি দেন বলিয়া কোম্পানী কর্তৃক স্বদেশে প্রেরিত হয়েন। পূর্বেই বলিয়াছি, তখন গভর্ণমেণ্ট যাহাকে ইচ্ছা বলপূর্বক ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চালান করিতে পারিতেন।

ইহার একাশি বৎসর পরে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) হিকি নামক এক ব্যক্তি "হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর ২৯শে জানুয়ারি শনিবার গেজেটের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। হিকি সম্ভবতঃ দেশে মুদ্রাকর ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অন্যান্য ইংরাজের মত ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে দেনার দায়ে কারারুদ্ধ হয়েন। কিরূপে তাঁহার কারামুক্তি সাধিত হয়, তাহা জানা যায় না। মুক্ত হইয়া তিনি এই পত্র প্রকাশ করেন। হিকি ব্যবসাদার ও অন্যান্য বেসরকারী ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষসমর্থন করিতেন না, বরং বলিতেন যে, শাসকদিগের স্বার্থের জন্য শাসিতদিগের স্বার্থহানি হইলেও তাহা করা অন্যায় নহে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিবর্গকে—বিশেষতঃ হেষ্টিংসকে ও ইম্পেকে গালি দেওয়ার লোকেরা কুৎসা করার ওজুহাতে ঐ বৎসর ১৪ই নভেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ বিজ্ঞাপন দিয়া ডাকবিভাগ কর্তৃক বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

এই নভেম্বর মাসেই "ইণ্ডিয়া গেজেট" নামক আর একখানি পত্রের প্রকাশ হয়। বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশ যে, গভর্মেণ্ট ডাকবিভাগ কর্তৃক বিনা মাশুলে এই পত্রের প্রচারের আদেশ প্রদান করেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় ভগ্নোদ্যম না হইয়া হিকি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত গালি আরম্ভ করিলেন। তিনি হেষ্টিংসের নাম রাখিলেন—Wrong-head Grand Turk, ইম্পের সাধারণ নাম রাখিলেন Judge Jeffreys, আর বিনামী করিয়া "পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের" ঠিকাদারী করায় তাঁহার আর এক নাম হইল Poolbundy, পাদরী জনসনের নাম হইল Judas Iscariot, পাদরী কিয়ারনাণ্ডারের নাম Mammon, আর তিনি নিজে হইলেন The True-born Englishman

এই কিয়ারনাণ্ডারই এ দেশে প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী। তিনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে আসিয়াছিলেন। এ দেশে আসিবার অল্প দিন পরেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, এবং তিনি কলিকাতার এক জন ধনী য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি চৌঘুড়ী হাঁকাইতেন, আর সমারোহের সহিত ভোজ দিতেন। তবে তিনি খ্রীষ্টানোচিত কার্যও করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে একটি গির্জার ও একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই গির্জাই অধুনা Old Mission Church নামে পরিচিত। কিয়ারনাণ্ডারের উপর হিকির ক্রোধের কারণ এই যে, প্রতিযোগী পত্রের স্বত্বাধিকারীরা তাঁহার নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্রের জন্য অক্ষর ক্রয় করেন।

অবশেষে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে গভর্ণর জেনারল হিকির নামে দুই নম্বর নালিশ রুজু করায় তিনি গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে প্রেরিত হয়েন। প্রতি নম্বরে চল্লিশ হাজার টাকার জামিন দিতে বলা হয়। তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সে যথাসর্বস্ব পাঁচ হাজার টাকা মাত্র

তাঁহাকে হাজতে রাখিয়াও গভর্ণর জেনারেল প্রভৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; কাগজ চলিতে লাগিল। হিকি হাজতে বসিয়া পত্রের সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিচারে শাস্তি হইল, এক বৎসর জেল ও দুই হাজার টাকা জরিমানা। তথাপি কাগজ চলিতে লাগিল। ইহার পর ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে হেষ্টিংস আবার এক নম্বর নালিশ রুজু করিয়া পাঁচ হাজার টাকা "ড্যামেজের" ডিক্রি পাইলেন। তবেই মোটের উপর এক বৎসর জেল ও সাত হাজার টাকা জরিমানা হইল। জরিমানা দিতে না পারায় হিকিকে কারাগারেই থাকিতে হইল। কিন্তু তখনও কাগজ বন্ধ হইল না। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জেনার দায়ে আদালতের হুকুমে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি ক্রোক হইল। তখন কাগজও বন্ধ হইল।

ইহার পর হিকি জেল হইতে মুক্তিলাভের জন্য মধ্যে মধ্যে "সুপ্রিম কোর্টে" দরখাস্ত করিতে থাকেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায়। তাহার পর তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু Bengal Obituaryতে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ না থাকাতে অনেকে মনে করেন, এ দেশের সর্ব্বপ্রথম পত্রের হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

* * *

ভদ্রলোক ছিলেন ডাক্তার, তখন তিনি যুবক, বিবাহ করেন নি, বিবি খুঁজিতে আছেন। খেয়াল হল দুনিয়াটাকে একবার ঘুরে দেখবেন।

একটি জাহাজে চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে ভদ্রলোক তো চলে আসলেন, কিছুই কাজ ছিল না, শুধু খাওয়া-দাওয়া আর মজা করা।

একটি বই লিখতে সুরু করলেন তিনি, হাসির বই। পূর্ণাঙ্গ হাসির উপন্যাস রচনা করতে পারেন কৃতিত্বের সঙ্গে এমন যে কজন মুষ্টিমেয় লেখক এ যুগে আছেন তাদের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন 'ডাক্তার' সিরিজের লেখক ডাক্তার বিচার্ড গর্ডন।

রোমা রোঁলা

মানব-প্রেমিক রোঁলা ১৮৬৬ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। আজ পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর জন্ম শতবর্ষ দিবস পালন করা হচ্ছে। ভারতবাসীর কাছে রোঁলা শুধু সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত নন। ভারতবন্ধু রোঁলা বিংশ শতকের কয়েকজন ভারতীয় মনীষীকে ইউরোপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিনি গভীর ভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন। তাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধ্যান ধারণাকে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন।

যুদ্ধকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। ১৯১৪ সালে ইউরোপে যখন প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন মনীষী রোঁলা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। জেনেভার Journal de Geneva নামক পত্রিকায় তিনি যুদ্ধ বিরোধী কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে শুধু সমস্ত ইউরোপ নয় পৃথিবীর সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় ফলে স্বদেশে তাঁকে খানিকটা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি সেজন্যে ভীত হননি। ইউরোপে তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

মহামতি লেনিন রোঁলার যুদ্ধ বিরোধী প্রবন্ধ পড়ে এতই আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়েছিলেন যে—১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রোঁলার কয়েকটি প্রবন্ধ বিখ্যাত রুশ সাংবাদিক Karpinsky-এর নিকট ছাপাবার জন্য পাঠান। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রবন্ধগুলি ঠিকমত তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। ফলে লেনিনের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তিনি পত্রে Karpinsky-কে জানান যে হয়তো প্রবন্ধগুলি তাঁর অনুপস্থিতিতে অপরের হাতে পড়েছে অথবা খোয়া গিয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি যে কোন প্রকারে হউক যে পত্রিকায় গুলি প্রকাশিত হয়েছে সে পত্রিকা কিনে অথবা পত্রিকা না পাওয়া গেলে লাইব্রেরী থেকে কপি করে, প্রবন্ধগুলি পাঠাবেন। এই থেকেই বোঝা যায় লেনিন রোমার ঐ প্রবন্ধগুলির উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

আজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দী কাল কেটে গেছে। এখনও বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হয়নি বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে আরো সুদূর পরাহত করেছে। শঙ্কা ও দ্বিধাগ্রস্ত এই পৃথিবীতে তাই মানুষ আজ চেয়ে আছে রোমা রোঁলার মত এক মানব-প্রেমিকের দিকে।

মনীষী রোঁলার জীবন ও রচনার মধ্যে মানবতাবোধই বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে।

মানবতাবোধই ছিল তাঁর শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন এমন মানুষ যিনি স্বদেশকে ভালবাসতেন আবার বিশ্বমানবের জন্যে ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাঁর সাধনা শুধু শিল্প-কেন্দ্রিক ছিলনা—ছিল মানবকেন্দ্রিক। তাই ভারতবাসীর নিকট তিনি ছিলেন অতি প্রিয়।

রামমোহনের মত রোমা রোঁলাও স্বাধীনতা-প্রেমিকদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। ১৯১৭ সালে তিনি 'স্বাধীন' রুশ দেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠান। রুশ বিপ্লবকে তিনি ইউরোপের যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও রোঁলা রুশ বিপ্লবের অনেক কিছুই মনে প্রাণে সমর্থন করতেন না তবুও তিনি ছিলেন রাশিয়ার এক অকৃত্রিম বন্ধু।

আজীবন শান্তির পূজারী রোঁলা ফাসীবাদের সঙ্গে কখনই আপোষ করতে পারেননি। বর্তমান পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের তিনি ছিলেন পূর্বসূরী। ১৯৩২ সালে Amsterdam-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেসের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রোমা রোঁলা। রোঁলার রচনায় বাস্তবতাবোধ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত। যা কিছু পুরাতন তাকে তিনি হৃদয়হীনভাবে আঘাত হেনেছেন। তাঁর উপন্যাসে তিনি নতুনের জয়গান গেয়েছেন।

রোঁলা ছিলেন আশাবাদী। জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার আগ্রহ ছিল তাঁর অপরিসীম হুগো, মেজপিয়র ও গেটে ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। টলষ্টয় ছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের আদর্শ। গোর্কির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আজ হিংসা-উন্মত্ত ইউরোপ রোমা রোঁলার মত মানব প্রেমিককেও ভুলতে বসেছে। কিন্তু বুদ্ধ-অশোকের ভারত তাঁর আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চিন্তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

* * *

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় কোন এক নবীন কবির কাব্য সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হোল : হুগলী কলেজের ব চ চ ছাত্র পাত্র ভাল ঘটেন, তাঁহার কবিতা অনেকের অপেক্ষাই উত্তম হয়, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি আত্মরস ভিন্ন অন্য কোন রসের পদ্য প্রেরণ করেন নাই!

একেবারে প্রকাশ্যে অনুযোগ, শ্রদ্ধার উপদেশ, অন্তরসের সাধনাও করতে হবে।

ব চ চ অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাথায় তুলে নিলেন ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ।

মহৎ ভাবোদ্ধর্শের প্রাবন এলো দেশে। আমরা সৃষ্টিকেই জানি, জানি না স্রষ্টার কি অজ্ঞাত পরিশ্রম ছিল সৃষ্টির পশ্চাতে, জানি না সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা কেমন ভাবে একটি প্রতিভার উন্মেষ সাধনে সহায়তা করেছিল।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি এবং পাকিস্তানের সততা সম্পর্কে গত পৌষ সংখ্যায় লিখেছিলাম 'তাসখন্দ চুক্তির মোহে আমরা যেন মনে না করি যে সবকিছুই করতে হয়ে গেছে এবং শয়তানের বদ ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করেছে। মোটেই না, মোটেই না। আয়ুব বলেছেন, 'তাসখন্দ চুক্তিতে এমন কিছু নেই যাতে পাকিস্তানকে কাশ্মীর সম্পর্কে তার মনোভাব বদলাতে হবে। অতএব আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী হবে না।"

দেরী হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে যে মুখোশটা ছিল সেটা খসে পড়েছে। নখদন্ত-আয়ুব সমেত দানব মূর্তিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এবং সারা জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

বিস্ময় কেন? এইজন্য যে, অদ্ভুত-কূটনীতি-পটুতা বেপরোয়া মনোভাব এবং ধমকির সাহায্যে সেই দানব দুদিক থেকে অর্থাৎ দুই বিরোধী শক্তি থেকে অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়েছে—কিছুদিন আগে পাকিস্তানের সামরিক শক্তির যে ফর্দ্দ হয়ে গেল তাতে দেখা গেল যে সে একই সঙ্গে মার্কিন এবং চীনা অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পেয়েছে, প্যাটন ট্যাঙ্কের সঙ্গে ৫৯ নম্বর চীনা ট্যাঙ্ক বাঁকিয়েছে, তাবার জেটের সঙ্গে চীনা মিগ ফাইটার উড়িয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির এই যে বেপরোয়া প্রদর্শনী এটি কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আমেরিকা তো রেখেঢেকে স্তম্ভিত। প্যাটন, তাবারের সঙ্গে টি-৫৯ এবং মিগ-১৯? এরকম তো কথা ছিল না।

আর কথা ছিল না !! পাকিস্তানের কাছে কথার কোনো দাম নেই, চুক্তির নেই কোনো মর্যাদা। তাই ন্যায়নীতির বালাই না রেখে পাকিস্তান সারাদিন রাত ধরে একটি মাত্র কাজ করেছে, তার সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে পাঁচবছরের মধ্যে পাকিস্তান তার সামরিক শক্তি প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি করেছে এবং সর্বাত্মক প্রস্তুতির দিক থেকে সে আজ ৫০০ গুণ বেশী তেজীয়ান।

তাসখন্দ চুক্তি হল। আমরা ভদ্রলোকের মত মুচকুন্দ করে রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়লাম আর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান এগিয়ে এসে অসংখ্য ঘাঁটি নির্মাণ করে ফেলল। কেউটে সাপের মত শত্রুকে পায়ের তলায় পেয়েও তার মাথাটাকে চেপে তাকে শেষ না করে দিয়ে আমরা দিব্যি তাকে

ছেড়ে দিলাম। এইবার সে লক্ষ কথা বিস্তার করে আবার লেখা দিয়েছে। এবার তাকে সর্বরকম মদৎ দিচ্ছে হিংস্র শ্বাপদ। বিষাক্ত সাপের সঙ্গে হিংস্র শ্বাপদের মিতালী ভারতের বিরুদ্ধে। শ্বাপদের বাঁশীতে সাপের ফণা হেলছে দুলছে। সলাপরামর্শ চলেছে, কবে কোন সময় একযোগে ছোবল মারা এবং দাঁত বসানো হবে।

ভারতবর্ষের কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য, তার রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি এবং চিন্তা কি শোচনীয় রূপেই না দুর্বল এবং ভ্রান্ত।

১৯৪৭ সালে একবার ভুল করেও শিক্ষা হোলোনা, ১৯৬৯ সালে আবার সেই ভুল করলাম, ভুলনায় চাণক্যের সেই অভ্রান্ত নীতি—ঋণ এবং শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সেই ভুলের খেসারত দিতে হবে বৈকি। তাদেরকমই দিতে হবে। অসহায়ের মত ভারতের জনগণ ভগবানকে স্মরণ করছে, তাছাড়া আর উপায় কি।

• • •

বাইরে দুই হিংস্র শত্রু ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, আর ঘরে আমরা খেয়োখেয়ি করে মরছি। পশ্চিম বাংলার মুহমুহুর্ত পূর্বাবস্থা। যেমন সরকার তেমনি বিরুদ্ধ পক্ষ। এই আন্দোলন হরতাল এবং সরকারের এই দমন নীতি বা প্রতিরোধ নীতি, এর মূলে আছে কারা, অর্থাৎ কাদের জন্যে দু'দলই লড়াই করছে? দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য। তাই যদি হয় তাহলে তাদের কথা কেউ শুনছে কি? অর্থাৎ সরকার পক্ষ প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বামপন্থীদের সঙ্গে আপোষ রফা করবার জন্যে কিকির খুঁজছেন, বামপন্থীদের কেউ কেউ সরকারের সঙ্গে Hobnob করছেন, তা দেখে অন্য বামপন্থীনেতারা প্রচণ্ড চিৎকার করছেন, আন্দোলন চালাও জোরসে, চালাও হরতাল দিনের পর দিন। হোক হরতাল। দুপক্ষের নেতাদের কোনো ক্ষতি ত' নেই। বিবৃতি দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ, গুলির মুখে লাঠির মুখে এগিয়ে যাক কচি কাঁচা তাজা তরুণ প্রাণগুলো, মরুক কয়েকজন।

আর সরকারের অপদার্থতার ব্যর্থতার কথা বলা একান্তই বাহুল্য। প্রতিটি লোকের মুখেমুখে সরকারের গুণ কীর্তন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে গদি বজায় থাকে। এরই মাঝখানে বাংলার মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষ প্রতিদিন পিষ্ট হচ্ছে। এদের কথা দুপক্ষের কেউই শুনছে না। ইতিহাস যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ইতিহাস নিজেকে বারংবার সৃষ্টি করে এই তত্ত্ব যদি প্রতীয়মান হয় তাহলে সুনিশ্চিতরূপে এই কথা বলা যেতে পারে যে, পশ্চিম বাংলার সেই ঐতিহাসিক মহাক্ষণ বিপ্লবের সপ্তাশ্ব রথ চলতে শুরু করেছে। সেদিন আসবে (কবে আসবে তা জানিনা তবে আসবে নিশ্চয়) যেদিন সেই সর্বগ্রাসী গণ-অভ্যুত্থানের নায়কদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে দুপক্ষকেই অর্থাৎ সরকার এবং সুবিধাবাদী বিরুদ্ধ পক্ষ উভয়কে। সেদিন দু'পক্ষের কেউই নিস্তার পাবে না।

• • •

হরতাল আর বামপন্থী আন্দোলনে সবচেয়ে লাভবান হল কারা। চোখের সামনে দেখছি, কয়েকখানা দৈনিক সংবাদ-পত্র। জনগণকে সরকারের সুকৃতীর কথা জানাবার জন্যে সরকার প্রত্যেকদিন হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন ছাড়ছেন তাঁদের পেটোয়া কয়েকটা দৈনিকপত্রে।

কিন্তু ভাবতে লেগে, কি হাস্যকর এই বিজ্ঞাপন অভিযান। জনতার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস নেই, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংযোগ স্থাপন করবার কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নেই। শুধু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কথার অর্থহীন ফুলঝুরিতে কি কাজ হয় যদি সেই বিজ্ঞাপনের ভাবকে বা বিন্যাসে চিন্তাশক্তির ছাপ না থাকে?

• • •

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী বিশ্ববিজয় করে ফিরে এসেছেন। সবদেশেই তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠেছে। মার্কিন মহাপ্রভুরা ত' বা ক বলে একেবারে ফ্ল্যাট। সংবাদে প্রকাশ প্রেসিডেন্ট জনসন শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে কথাবার্তার পর সহসা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছেন। (Has suddenly become emotional about India)।

নিউইয়র্ক ষ্টেট গভর্ণর, রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান, তিনি শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ খেয়ে যেন একেবারে লুটিয়ে পড়েছেন। মেলসন রকফেলার (উক্ত গভর্ণর) উচ্ছ্বসিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন ইন্দিরা গান্ধী। ও তিনি কমনীয় (lovely), তিনি অনন্যা (unique), তিনি নিবেদিত প্রাণা, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অতিশয় সংবেদনশীল, তাঁর মত নেত্রীলাভ করা যে কোনো দেশের পক্ষেই সৌভাগ্যের কথা।

ব্যস। আর কী চাই!

• • • •

বিদেশীরা, পুরুষ এবং মহিলা, এদেশে আসেন, বাস করেন এবং কেউ কেউ এদেশ সম্বন্ধে বই লিখে ফেলেন। অবশ্য ভুল তথ্যপূর্ণ হলেও, রোপটিক লাগবেনা, মন্ত্রতন্ত্র এই সবের কল্পিত কাহিনী ঢুকিয়ে বেশির বই লেখা হয় ওদেশে তার কাটতি হয় প্রচুর। তা দেখে টাকার লোভে নিত্যনতুন লেখক লেখিকা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই লিখছেন এবং প্রকাশক প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি বিলাতের এক প্রকাশক এমনি একটি বই বার করেছেন। বইটির নাম—টেলস্ অফ ইণ্ডিয়া। লেখিকা—আইরিস ম্যাকক্যার লেন। এই মহিলা নাকি অনেকদিন আসামে ছিলেন এবং সেখানে বসেই ভারতের প্রাচীন কাহিনীর মাল মশলা সংগ্রহ করেন। তাঁর অনেক মুনসিয়ানার মধ্যে একটির উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। রাবণের তেজ পুরুষকার ভদ্রতা সৌজন্য প্রভৃতির বর্ণনা করে শেষকালে তিনি লিখে দিয়েছেন যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত অন্যায় যুদ্ধে বধ করলে—শ্রীকৃষ্ণ। ত্রেতা আর দ্বাপর একাকার। ত্রেতার রাম চলে এলেন দ্বাপরে এবং দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন ত্রেতায়। সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইংরেজের রামায়ণ রচনার নমুনাটি মনে পড়ছে।

• • • •

আপনি যদি ব্রিজ খেলেন তাহলে নিশ্চয়ই জানেন এই খেলায় সেরা ডাক হচ্ছে নো ট্রাম্পের, সেরা হাত হচ্ছে নো ট্রাম্পের হাত। এই না—হুকুমের তাস তাস পাওয়া ভাগ্যের কথা। আচ্ছা, এমন তাস কি পাওয়া যায় যাতে একেবারে ৭ নো ট্রাম্প ডাকা যায়। ধরুন এই ধরণের তাস পাওয়া কি আপনি কল্পনা করতে পারেন—ইস্কাবনের টেক্কা সাহেব বিবি, হরতনের টেক্কা সাহেব বিবি, রুইতনের টেক্কা সাহেব বিবি, চিঁড়েতনের টেক্কা সাহেব বিবি গোলাম। এই ১৩ তাস পেলে ৭ নো ট্রাম্প ঠেকায় কে? কিন্তু এরকম তাস পাওয়া কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। অনেক অসম্ভবের মত এও সম্ভব হয়েছে সম্প্রতি। কানাডার মন্ট্রিল শহরের ব্রিজ খেলোয়াড় কুমারী সারটি ড্যানসিউ এক

খেলায় এইরকম এক স্থান তাস পেয়েছিলেন, খবরটি দিচ্ছেন এক বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

• • • •

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তি হয়েছে। এটি চীনের একটি বড় রকমের কূটনৈতিক জয়। পাকিস্তানকে কব্জায় রেখে ভারতের বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে রেখে ভারতকে ঘায়েল করার জন্যে চীন যে উঠে পড়ে লেগেছে এ তথ্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। যা শক্ত পরে পরে। যুদ্ধ করে দুই পক্ষই কাহিল হয়ে পড়বে, তখন চীনের পক্ষে পাকিস্তানের ঘাড়ে আরও চেপে বসা এবং ভারতকে আরও বিব্রত করা সহজতর হবে।

সম্প্রতি রাওলপিণ্ডিতে লিউ সাও চি এবং আয়ুব-এর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তার কয়েকটি ধারার মর্মার্থ নীচে উদ্ধৃত হল :—

(১) এখন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে চীন পাক যুক্তভাবে লড়াই করবে; ভারতকে তাহলে একসঙ্গে দুটো রণাঙ্গনে লড়তে হবে।

(২) গত সেপ্টেম্বরে চীন যখন হিমালয় প্রদেশে জঙ্গী তৎপরতা চালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সেই সময়ে আয়ুব খাঁ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়ে অন্যায় কাজ করেছেন বলে চীন মন্তব্য করেছে। আয়ুব খাঁ নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং চীনের কাছে নাকে খত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

(৩) পাকসৈন্য বাহিনীকে অতি আধুনিক সমর সম্ভার সজ্জিত করতে চীন সম্মত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯০টি চীনা ট্যাঙ্ক এবং ৭০টি চীনা বিমান চীন কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। আরও সমর সম্ভার নিয়মিত সরবরাহ করা হবে।

(৪) কাশ্মীর উপত্যকায় গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্যে চীন সর্বরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

(৫) গত যুদ্ধ এবং তার পূর্বে কাশ্মীর উপত্যকায় যেসব পাক হানাদার এবং অনুপ্রবেশী কাজে যুক্ত পাক সেনানায়করা ছদ্মবেশে ঢুকেছিল তাদের নেতাদের সঙ্গে চীনানায়ক লিউ সাও চি বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ করেন।

এই পরামর্শের পরে স্থির হয়েছে যে, গেরিলা লড়াই চালাবার জন্যে দু'জন চীনা সমরনায়ক পাক গেরিলা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবেন।

(৬) ভারতের সমস্ত খবর পাকিস্তান চীনকে নিয়মিত সরবরাহ করবে। ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী পঞ্চম বাহিনীর যে হাজার হাজার লোক বাস করছে, এবং কাজ করে চলেছে তারা পিকিং-পন্থী গুপ্তচর বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করবে এবং উভয়ে একযোগে ভারতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা সৃষ্টি করবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে এবং সর্বরকম উপায় অবলম্বন করবে। সেজন্য যতটাকা তাদের লাগে তা সরবরাহ করা হবে।

• • • •

এই পর্যন্ত লেখার পরই এক চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল। ত্রাহস্পর্শ যোগ ঘটেছে। পাকিস্তান চীন আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে নিজো বিদ্রোহী। এবং নিজো বিদ্রোহীদের সঙ্গে পাকিস্তানের

আক্রান্ত হয়েছে প্রগাঢ়। সংগ্রিষ্ট মহল থেকে জানা গেছে যে, মিজো পাহাড় থেকে যেসব বিদ্রোহী পালিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা একহাজার মিজোকে পাকিস্তান চট্টগ্রামের রুমা অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধনীতি ও কৌশল শেখাচ্ছে। রুমা ভারতীয় সীমান্ত ডেমাগিরি থেকে কয়েক মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর ওপারে অবস্থিত। আরও জানাগেছে যে, কয়েকদিন আগে লাংমে ও ডেমাগিরি অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদলের ওপর যে-কটি অতর্কিত আক্রমণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ গেরিলা কায়দায় এবং সেইসব গেরিলা সৈন্যরা যে-সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত আধুনিক।

আমরা আশা করব (কপাল চাপড়ে শুধু আশাই করব) যে আমাদের দেশের রক্ষাকর্তারা উপরে লিখিত ঘটনা পরম্পরা সম্বন্ধে সজাগ আছেন এবং যথোপযুক্ত চিন্তা করে যথোচিত উপায় অবলম্বন করছেন।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ !

• • •

পার্কের কোণের বেঞ্চিটায় বসে তাঁর কবিতার খাতা পড়ছিলেন হুইটম্যান। কিন্তু বইটার নাম কি দেবেন, সেটা ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

ঠিক সেই সময়ে এল তাঁর সামনে দুটি ভাইবোন। বোনের বয়স দশ, ভাইয়ের বয়স সাত।

ভাই ঘাসের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার দিদির গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। দিদি রেগে গিয়ে বললে, ছিঃ নটন, তুমি এসব নোংরা জিনিস নিয়ে খেলা করছ ?

—নোংরা জিনিস আবার কি !—এগুলোও Leaves of grass।

শুনেই হুইটম্যান চমকে উঠলেন, তারপর তাঁর খাতার উপর নামকরণ করলেন—Leaves of grass !

জীবন-নাট্যের অশান্ত নায়ক

—সাংবাদিক

জীবনের এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে নিত্য কত বিচিত্র চরিত্রের প্রবেশ প্রস্থান।

কেউবা শান্ত স্থির স্থিতধী। কেউবা অশান্ত উদ্দাম। কেউবা সিধা পথের পথিক। কেউ বা অন্ধকার সুরঙ্গ পথের যাত্রী।

সম্প্রতি ভারত রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন এক অদৃষ্টপূর্ব বিপরীত ধর্মী বিচিত্র চরিত্রের নায়ক। তিনি রাজা। ১ লক্ষ তাঁর প্রজা। বিপুলায়তন তাঁর রাজ্য। কিন্তু রাজপোষাক তাঁর ছিল না। পরনে গেরুয়া। দীর্ঘ চুল, অযত্ন-বিন্যস্ত শ্মশ্রু। যেন সন্ন্যাসী।

প্রজারা তাঁকে শুধু রাজা বলে মানে না। অবতার জ্ঞানে পূজো করে। প্রজাদের উপর তাঁর প্রভাবের সীমা নেই। তাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনে ১ লক্ষ প্রজা প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত।

কিন্তু কি অদ্ভুত আলো ছায়ায় গুম্ফের চরিত্রের মানুষ তিনি। একদিকে উদার স্নেহশীল প্রজাবৎসল অপরদিকে নিষ্ঠুর খেয়ালী এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য।

এমনি এক চরিত্র ভারতের নাট্যমঞ্চে উদয় হয়েছিলেন ১৯৪৩ সালে। তাঁর নাম প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও, বস্তারের ভূতপূর্ব মহারাজা।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি নাটক সৃষ্টি করেছেন, চমক লাগিয়েছেন।

ভারত-স্বাধীনতার কয়েকবছর আগে তিনি যখন বস্তারের সনি পেলেন তখন তিনি নাবালক। কিন্তু সেই নাবালকের তেজ আর মস্ত দিল্লীর কর্তাদেরও হতচকিত করলে। বস্তারের ওপর কেন্দ্র কয়েকটা বিশেষ নির্দেশ জারী করেছিল। প্রবীরচন্দ্র সেসব হু হু করে উড়িয়ে দিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে দিল্লীতে তলব করলেন। গেলেন তিনি। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ডেকেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে তিনি দিল্লী চষে বেড়াতে লাগলেন এবং কলকাতার মত সর্বত্র হরাজ হাতে যান খয়রাত করলেন।

শেষ পর্যন্ত কর্তাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁদের কথা শুনলেন। শুনে ঘাড় নাড়লেন। বোঝা গেল না তিনি কর্তাদের কথা মেনে নিলেন কিনা। তাঁর কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় সরকার দিনদিন অধিকতর চিন্তিত এবং বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন।

১৯৫৬ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি যখন বস্তার পরিদর্শনে গেলেন তখন প্রবীরচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না।

কি অসহনীয় ঔদ্ধত্য। দিল্লী তাঁকে এক কড়া নোট পাঠিয়ে সাবধান করে দিলে।

১৯৫২ সালে রাজ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে বস্তার মধ্য প্রদেশের একটি জেলায় পরিণত হল।

মহারাজা নির্ধারিত রাজকীয় মাসোহারা পেতে লাগলেন এবং তাঁর নিজের প্রাসাদেই রইলেন।

বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থাকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি।

প্রথম মাসোহারার টাকা যেদিন এল সেদিন সেই সমস্ত টাকাটাই আদিবাসী প্রজাদের মধ্যে তিনি বিতরণ করে দিলেন।

আচারে ব্যবহারে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ভিন্ন জাতের মানুষ ছিলেন প্রবীরচন্দ্র।

কথা বলতেন সব সময় নরম সিল্ক সুরে, নিখুঁত ইংরাজী বলতে পারতেন। নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যাকে বলে একজন উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ, তাই ছিলেন তিনি। অন্যদিকে যেমন জেদী, তেমনি খেয়ালী আর তেমনি বেপরোয়া।

দান করতেন দুহাতে, অজস্র অপরিমিত ছিল তাঁর দাতব্য। কিন্তু সে দান কোনো সংগঠন-মূলক কাজে লাগেনি। তাঁর সেই অবারিত দানে স্কুল কলেজ স্থাপিত হতে পারত, হাসপাতাল তৈরী হতে পারত, আরো নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারত, কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি।

তাঁর রক্তের মধ্যে ছিল যেন লড়াই-এর নেশা, অর্থাৎ কারো কোনো বাধা মানব না, কারুর কাছে মাথা হেঁট করব না, আমি চলব আমার নিজের পথে বাধাবন্ধহীন—এমনি ছিল তাঁর মনোভাব চিরকাল। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতিপদে তাঁর বিরোধ ঘটতে লাগল।

আদিবাসীরা যে দিনদিন অতিমাত্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরই রাজ্যে এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে।

ইতিমধ্যে প্রবীরচন্দ্র কংগ্রেসী দল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস যাতে বস্তার রাজ্যে কোনো আসন না পায় নির্বাচন আসরে তার জন্যে তিনি নানাভাবে আদিবাসীদের মধ্যে নানাকর্মে ব্যাপৃত হলেন। সরকার তাঁকে হুকুম করলেন, বস্তার ছেড়ে চলে যাও। সে হুকুম অমান্য করে তিনি তাঁর প্রাসাদে রইলেন। হাজার দুহাজার তীর-ধনুক-বল্লমধারী আদিবাসী প্রজা দেহরক্ষীরূপে তাঁকে ঘিরে রইল। সরকারের তরফ থেকে কারো সাধ্য হল না তাঁর কাছে পৌঁছোয়।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থের আহ্বানে তিনি দিল্লী গেলেন। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করলেন তা অত্যন্ত বিদ্রোহী-মনোভাবসম্পন্ন।

তারপর হঠাৎ তিনি দিল্লী থেকে অন্তর্হিত হলেন। কিছুদিন তাঁর কোনো পাত্তা নেই। ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর রাজধানী জগদলপুরে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। তার দুদিন বাদে তাঁকে পদচ্যুত করা হোল এবং তাঁর ছোটভাই বিজয়চন্দ্র ভঞ্জ দেওকে গদিতে বসানো হল।

গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রবীরচন্দ্র আপীল করলেন এবং ২৪শে এপ্রিল মুক্তি লাভ করে আবার

নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। সেদিন ১০ হাজার আদিবাসী তাদের "দেবতা"কে ঘিরে সারারাত নৃত্যগীত করেছিল।

প্রবীরচন্দ্রের জীবন-নাট্যের পরবর্তী অঙ্ক যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মধুর। বহুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। তারপর জানা গেল তিনি লণ্ডনেরী হয়েছেন। পাটান রাজ্যের রাজকুমারী অপরূপ লাবণ্যবতী ভবরাজ কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছেন তিনি। বিবাহ অনুষ্ঠান অবশ্য অতি গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল।

কিন্তু যে চিরকাল অস্থির উদ্দাম অশান্ত আর বিদ্রোহী, সংসার তাকে বেঁধে রাখবে কেমন করে। ফিরে এলেন আবার নিজের রাজ্যে। রাজ্য নেই কিন্তু প্রজারা আছে তাঁর। তাঁরা তাঁকে আজও মানে দেবতার মত। এক স্বতন্ত্র বিরাট প্রাসাদে তিনি বাস করতে লাগলেন এবং সর্বসময়ে আদিবাসীদের নিয়ে মেতে রইলেন।

শেষ অঙ্কে আমরা আচম্বিতে শুনলাম বস্তারের লক্ষ লক্ষ আদিবাসী বিদ্রোহী হয়েছে। তারা লড়াই শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে। অদ্ভুত লড়াই। একদিকে রাইফেল বন্দুক, মেশিনগান, কাঁদুনে গ্যাস আর একদিকে আদিযুগের সেই তীর ধনুক আর বল্লম। শতশত আদিবাসী মারা পড়ল। সরকারী বাহিনীর লোকজনও অনেক জখম হল, মারাও পড়ল অনেকে।

তারপর শেষ যুদ্ধ।

কর্তৃপক্ষ প্রাসাদে অবস্থিত প্রবীরচন্দ্রের কাছে খবর পাঠাল গত ২৫শে মার্চ। তারা জানাল যে তারা প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে চায়, তিনি প্রাসাদের অলিন্দে এসে আদিবাসীদের নিরস্ত্র হতে বলুন।

কর্তৃপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে প্রবীরচন্দ্র কয়েকজন সঙ্গীসহ প্রাসাদ সংলগ্ন উন্মুক্ত চত্বরে এসে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল তাঁর ওপর, তাঁর সঙ্গীদের ওপর। শেষ হল নাটকের।

পরের দিন প্রাসাদ কক্ষে প্রবীরচন্দ্রের এবং সঙ্গীদের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

এই ঘটনার প্রসঙ্গে বস্তারের বর্তমান মহারাজা—বিশ্বচন্দ্র ভঞ্জ দেও বলেছেন যে, তাঁর দাদাকে হত্যা করা হয়েছে। এবং পুলিশ বাহিনী কর্তৃক তিনি নিহত হয়েছেন। প্রবীরচন্দ্রের মৃত্যুকালীন ঘটনা তিনি বিবৃত করেছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর দাদার মৃত্যুর অন্তে তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

এক এক দিন

রজত রায়চৌধুরী

সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনেকে মাপি বুঝতে পারে দিনটা কেমন যাবে। হরিপদর ধারণা অন্যরকম। রাতে শোবার সময় সে আন্দাজ করতে পারে পরের দিনের মেজাজটাকে। অথচ তার নিজের মেজাজ এমনিতেই চড়া। আজকাল সেটা আরও চড়েছে। আজই সপ্তমে ওঠে।

এখনও ভোর হয়নি। পরিষ্কার হয়নি আকাশ। সবেমাত্র রাস্তায় জল দিয়ে গেল জলওয়ালা। এইটেই ওঠবার সময়। এইটেই তার ঘড়ি। ঘড়ির দিকে না তাকালেও হরিপদ জানে এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে উঠে পড়ে হরিপদ।

দোকানের নিচের দিকের একটা ঝাঁপ সামান্য একটু ফাঁক করে বেরিয়ে আসে হরিপদ। পায়চারী করে ফুটপাথে কিছুক্ষণ। খক্ খক্ করে কাশে। বিড়বিড় করে বলে, গুরু কৃপা হি কেবলম্।

দোকানের উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা টিউবওয়েল। সেখানে স্নান করে হরিপদ। কাশতে থাকে। জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরে। এ কাশির শব্দ অভয় জানে। সে আর দেরী করে না। উঠে আসে দোকানঘরে। ঝাঁপ খোলে। ঝাড় পোঁছ দেয়। ধূনার ধোঁয়াড় করতে থাকে।

ততক্ষণে স্নান সারা হরিপদর। আঁকে রসকলি আঁকা শেষ। গলার কণ্ঠিটাকে ঠিক করে নিয়ে সে গদীর ওপর গিয়ে বসে। সুস্পষ্টস্বরে বলতে থাকে, গোবিন্দ, গোবিন্দ, গুরু কৃপা হি কেবলম্।

অভয় ধূপুচিটা এগিয়ে দেয়। ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে ভরে যায় দোকানঘর। যথারীতি খাতাপত্রে শিরোনামা লেখে হরিপদ। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধূপুচিটা নিয়ে আসে সান্নায়, বাটখারায়, ক্যাশবাক্সে, গণেশ মূর্তির সামনে, রাধামাধবের যুগল মূর্তির কাছে। এই সময় সে ঘন ঘন স্বর্গীয় আওয়াজ দিতে থাকে।

আর এই মুহূর্তটির জন্যেই যেন অপেক্ষা করে যারা। যে মুহূর্তে হরিপদর কণ্ঠে অবিরাম স্বর্গীয় স্বগতোক্তি বেজে ওঠে, সেই সময়েই সে দোকানে ঢোকে। কপাল অবধি ঘোমটা। হাতের হুকোটার মাথায় বসানো কল্‌কের সে ফুঁ দিতে থাকে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেয় হরিপদ। টান দেয় জোরে জোরে। তারপর অকস্মাৎ অপেক্ষমান মায়াকে লক্ষ্য করে বলে, হারামজাদার এখনও হয়নি।

মায়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। হরিপদ গর্জে ওঠে, মুদির ছেলের চাল করতে একঘণ্টা! হতভাগা চাকরি করবে। কেরানীবাবু হবে। ওসব চলবে না এখানে বলে দিও হারামজাদাকে—

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢোকে অভয়। বলে, চেঁচাচ্ছেন কেন? ক'টা খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে?

—কী? যত বড় মুখ না তার তত বড় কথা। আমার বাড়ি—আমার চেঁচাব। যত খুশি চেঁচাব। জন্মেই বাপের দোকান পেয়েছ—কত ধানে কত চাল তা তো আর জানো না। রাগে গরগর করতে থাকে হরিপদ।

ইতিমধ্যে পাল্লায় এসে বসে অভয়। একটা বড় হাতা দিয়ে সামনের বাদার জিনিসগুলো সে পাহাড়ের আকার দিতে চেষ্টা করে। তারপর হঠাৎ কল করে বলে ফেলে, আজই দাস সাহেবের কাছে যাব। পলকের মধ্যে ফেটে পড়ে হরিপদ। যাও না যেখানে খুশি। এক্ষুণি যাও। বের হও আমার দোকান থেকে। আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে—বলে একটা অশ্রাব্য গালি দেয় হরিপদ।

ভেতরের দরজা দিয়ে উঁকি দেয় মায়া। অভয় হঠাৎ চুপ করে যায়। নিস্পৃহ উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

চাকরি করবে। কেরানী হবে। বাবু হবে। বলতে বলতে গদী থেকে নামে হরিপদ। মুড়ির টিন খুলে দু'মুঠো মুড়ি ছড়িয়ে দেয় রাস্তায়। এবাড়ি সেবাড়ির আশিশ আর অলিন্দ থেকে নেমে আসে গুটিকতক পায়রা। কয়েকটি কাকও। ক্ষণকাল চেয়ে চেয়ে দেখে হরিপদ। তারপর হঠাৎ চলে আসে ভেতরের ঘরে। আসবার সময় কাঁচের বোয়াম খুলে একটা বিস্কুট নিয়ে আসতে ভোলে না।

ঘরটা ছোট। একটা তক্তাপোশ অনেকগুলো ট্রাঙ্ক দিয়ে উঁচু করা। ওপরে মানুষ শোয়। নিচে থাকে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র। বাটের ওপর মশারী টাঙানো। তার মধ্যে ঘুমুচ্ছে অভয়পদর দেড় বছরের ছেলে। হরিপদ মশারী তোলে। দেখে। বাচ্চাটার গাল দুটো টেপে। চুমো খায়। ছেলেটা কঁকিয়ে ওঠে। চোখ খোলে।

তখন তাকে কোলে তুলে নেয় হরিপদ। ও নবাবপুত্তুর! মশারী চাই। খেলনা চাই। আটটা বাজে তবু বাবুর ঘুম ভাঙে না। মুদির ঘরে জন্মেছ, এত বাবুয়ানী কিসের? বলতে বলতে সখ করে অনবরত চুমু খায় হরিপদ। ছেলেটা ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। হরিপদ তখন বিস্কুটটা সামনে এনে ধরে। কান্না থামে। হাত বাড়ায় ছেলেটা।

বেটা নিমকহারাম। বেটা শয়তান। শালা বিচ্ছু। বিস্কুট দেখেই কান্না থেমে যায়। মায়া এসে দাঁড়ায় কাছে। ছেলেটা হাত বাড়ায়।

শালা শয়তান। গর্জন করে ওঠে হরিপদ। কোলে নিলাম, আদর দিলাম, বিস্কুট দিলাম—তবু কান্না! তবু মাকে দেখে হাত বাড়ানো। বাপকা বেটা—শালা শয়তান—বলে দুম্ করে বাটের ওপর বসিয়ে দেয় বাচ্চাটাকে। মায়ার দিকে চেয়ে বলে, খবরদার। কোলে নেবে না। বেটা বজ্জাত। থাকুক শুয়ে।

হরিপদ চলে যেতেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয় মায়া। চুপ চুপ, কাঁদে না। ওই দাদা আসছে। এখুনি মারবে। চুপ।

একজন দুজন খরিদ্দার আসতে থাকে। পাল্লায় তৎপর হয়ে ওঠে অভয়। কিছু পরেই ঠাকুরবাড়ির দৈনন্দিন কর্ম নিয়ে আসে ছোট গোঁসাই। অভয় কর্ম দেখে জিনিস ওজন করতে থাকে। অর্থ থেকে পরমার্থ তখন বড় হয়ে ওঠে। কাম আর প্রেম। কেমন সহজ ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস কবিরাজের। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥

অভয়পদর কথায় আলোচনায় বাধা পড়ে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছোট গোঁসাই বিদায় নেন। আর তখন, ঠিক তখনই কোলে বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে মায়া। হরিপদর সামনে রাখে একবাটি মুড়ি।

হরিপদ ছেলেটাকে টেনে নেয়। গদীর ওপর বসায়। সামনে ছড়িয়ে দেয় একমুঠো মুড়ি। বাচ্চাটা খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। ইতিমধ্যে চা দিয়ে যায় মায়া। এক ফাঁকে অভয়ও সেরে নেয় সকালের চা-পর্ব।

দোকানের সামনে সারি সারি রাখা মশলা আর ডালের বস্তার ওপর রোদ এসে পড়ে। নটা বেজে যায়। আপিসযাত্রী বাবুরা আসতে শুরু করে। হাতের সামনে সিগারেটের বাক্স আর দেশলাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে অভয়। হরিপদ বসে বসে দেখে আর বলে, দেখছিস তো রোজ। নিজের চোখেই তো দেখছিস! এরই নাম চাকরি। হুঁ। চাকরি করব। চাকরি।—আরে হতভাগা চাকরিতে এমন সুখশান্তি পাবি? সাত-সকালে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে দৌড়োও। পেট ভরে খেতে পারবে না। দৌড়ে দৌড়ে হাঁটো, ঝুলতে ঝুলতে ট্রাম-বাসে চলো, তারপরে টুপ করে বাসের তলায় পড়ে মরো—এরই নাম চাকরি। অনেক দেখলাম। অনেক।—খক্ খক্ করে কাশল হরিপদ। চোখ দুটো ছোট করে বললে, তোর কী? ঘরে আছিস, ঘরে বসে খাচ্ছিস। চাকরি করলে এত আরামে থাকতে পারতিস?

এই কলকাতা শহরে হরিপদ এসেছিল কতকাল আগে? কতকাল! মনে পড়ে না। তখন কলকাতায় নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা ছিল। এত লোকজন, এত গাড়ি ঘোড়া, এত হৈ চৈ ছিল না। কিন্তু হরিপদর ছিল অটুট স্বাস্থ্য আর অবিচল নিষ্ঠা। যে নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। অসম্ভব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে সে জীবনে। সকালে বাজারে আলু বিক্রী করেছে, বিকালে পথে পথে মুড়ি-বাদাম। আর অভয় বলে কি না, দোকানদারী করবে না। চাকরি করবে। চাকরি। স্টেটবাসের কনডাকটার। মুখে আগুন চাকরির।

উত্তেজনায় মনের ভাবনাটা ভাষায় রূপ নেয়। অভয়ও হঠাৎ বলে ফেলল, হাজার লোক যদি করতে পারে, আমি পারব না কেন? আমার দোষ কোথায়?

—দোষ! বড়বড় মুখ না তড়বড় কথা। দু'বেলা ভাতের যুরোদ আছে?

—সেইজন্যেই তো চাকরি করতে চাই।

—আরে হতভাগা। ভাতে মাগছেলের ভাত জুটবে? সাধে আমি লেখাপড়া শেখাতে চাইনি। আমি তখনই জানতাম মুদীর ছেলে লেখাপড়া শিখেছ কি, আই, এ পাশ করেছ কি,—বলতে বলতে আগুন নাসা ধাজির মত হঠাৎ ফেটে পড়ে হরিপদ। শালা হারামজাদা। যেমন বাপ তেমন পুত্তুর। ঠাস্ ঠাস্ করে বাচ্চাটার গালে চড় কষিয়ে দেয় হরিপদ। বাচ্চাটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। দোহনের দরজার ফাঁক দিয়ে ঘোমটা ঢাকা একটা মুখ উঁকি মারে।

সমস্ত শরীরে কালি। বাচ্চাটার হাতে-মুখে-সর্বত্র। এক দোয়াত কালি নিয়ে সে নির্বিঘ্নে খেলা করেছে। বাপ-ঠাকুর্দার ঝগড়া তাকে বিন্দুমাত্র বিব্রত করেনি।

অভয় উঠে আসে। ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয়। বলে, ও যদি বুঝতেই পারবে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়—

কথা শেষ হবার আগেই হুঙ্কার দিয়ে ওঠে হরিপদ। তোমার ফেতাবী লেকচার ছাড়ো। আমার সব জানা আছে। যেমন বাপ তেমন বেটা। দুই শয়তান।

হলুদ হাতটা শার্টায় মুছে ছেলে কোলে নেয় মায়া। অভয় গম্ভীর। চুপ করে এসে বসে পাল্লায়। ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হরিপদ রাগে চিড়বিড় করতে থাকে। অভয়পদ এবার আর কথা বলে না। জানে, কিছু বললে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

মিনিট পনেরো বাদে বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে যায় হরিপদ। অভয় ভেতরের দিকে চেয়ে অনুচ্চে বলে, আজই বাপ সাহেবের কাছে যাব। ভেতরের থেকে মৃদু গলার উত্তর আসে, খুব বাহাদুরী হয়েছে। যেমন বাপ তেমন ছেলে। বাপেরও রাগতে ফুরসুৎ নেই, ছেলেরও গোঁসা করতে দেরী নেই।

হরিপদ বাজার থেকে আসবার পর বাপ-বেটায় তর্ক করে। বড়বাজারের উদ্দেশে চলে যায় অভয়পদ।

সাবধানে যাবি। টাকা সাবধান। বারবার সাবধান করে দেয় অভয়পদকে। তারপর স্বস্তিবচন করে। অভয়পদ অদৃশ্য হতেই হরিপদ ডাকে, বৌমা।

মায়া কাছে এসে দাঁড়ায়।

কী ডাল রেঁধেছ?

টক ডাল।

আর?

মায়া কথা বলে না।

হুঁ! ভাজামুগ রাঁধো। বলে ডাল বার করে নেয় টিন থেকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেলা দুটো। হরিপদ তামাক টানে আর কাশে। বিকেলের চশমাটা কানে লাগিয়ে কোনদিন পড়তে থাকে ভাগবত, কোনদিন চৈতন্য-চরিতামৃত।

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল　　যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল যে অনুরাগে　　না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যেছে মসীবিন্দু॥

ইতিমধ্যে একসময় অভয় ফেরে। হিসেব বুঝে নেয় হরিপদ। বাজারদর সম্বন্ধে দু'চারটে কথাবার্তা হয়।

বিকেলের কাঁপ খোলে হরিপদ। অভয় তখন ঘুমোয়। রাত্রি কোলে দোকানের সামনে পায়চারী করতে থাকে হরিপদ। আদর করে বলে, তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়াব, বাসে করে ইস্কুলে যাবি। বড় হয়ে সাহেবদের মতন দোকান খুলবি। হরিপদ ভাতার নাম বদলে নাম দিবি হরিপদ

গ্র্যাণ্ড দল। ছেলেটা হাসতে থাকে, হরিপদ চুমো খায়। ভেতরের দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে মায়া দেখে। মুখে তার প্রসন্ন হাসি।

সন্ধ্যের আগে আবার খেচাকেনার জোয়ার আসে। সেই সঙ্গে আসে নানা খবর। রাজনীতির, খেলার, সিনেমার, পাড়াপড়শীর। চাকর-বাকররা যারা জিনিস খরিদ করতে আসে তাদের মনিবদের বাড়ির সম্বন্ধে চমকপ্রদ সব খবর নেয় হরিপদ। অভয় বিরক্ত হয়। বলে, কী দরকার আপনার অন্য লোকের বাড়ির খবর জেনে?

থাম তুই।

আমি তো থেমেই আছি। ওরা সকলেই আমাদের খদ্দের। যদি কেউ জানতে পারে—

থামবি। গর্জন করে ওঠে হরিপদ। বড় ব্যবসাদার আমার? আমায় ব্যবসা বোঝাচ্ছেন।

অভয় চুপ করে থাকে।

একটুখানি চুপ করে থেকে হরিপদ বলে, শুনলি তো ঘোষালদের ছেলের কাণ্ডখানা। এই নাকি ভদ্রলোকের লেখাপড়া জানা ছেলের ব্যবহার?

অভয় একবার মুখ তোলে কিছু বলবে বলে। তারপর সহসা উঠে ভেতরে চলে যায়।

হরিপদ ধুনার আয়োজন করে। ধূপকাঠি ধরায়। সুতো দুটি তুলে বলে, শুরুকরা হি কেবলম।

দোকান বন্ধ হয় আটটায়। হিসেবপত্র মিলোতে মিলোতে প্রায় দশটা। ঝাড় পোঁছ দিয়ে খেতে খেতে প্রায় এগারোটা।

দোকানের নিচের ঝাঁপটা একটুখানি ফাঁক করে হরিপদ ফুরুক ফুরুক করে তামাকটানে। আর কাশতে থাকে খক্ খক্ খক্। কলতলায় মায়ার বাসন মাজার শব্দ হয়। একসময় তাও থামে। হরিপদ উঠে আসে বিছানায়।

সমস্ত পল্লী তখন নীরব। পেছনের ঘর থেকে মায়ার আর অভয়ের ফিসফিস গলার আওয়াজ ভেসে আসে। ছেলেটা একবার কেঁদে ওঠে। মায়ার গলাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপরেই ছেলেটা চুপ।

হরিপদর চোখের সামনে অতীতের সমস্ত ছবি পলকের মধ্যে ভেসে ওঠে। পাঁচ পাঁচটি সন্তানের মধ্যে জীবিত কেবল অভয়পদ। আর একটাও বাঁচেনি। হরিপদ তাদের বাঁচাতে পারেনি। দেয়ালের দিকে একবার তাকাল হরিপদ। অভয়ের জন্মের পর একবার সস্ত্রীক ছবি তুলেছিল হরিপদ। বিবর্ণ হয়ে গেছে ফোটোটা। তবু হরিপদর মনে হল ছবিটা বড় জীবন্ত। বড় প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সজীব। মনে হল রাণীবালা যেন সত্যি-সত্যিই চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

পেছনের ঘরে চুপিচুপি কথা বলছে ওরা। বলুক। বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠল। হরিপদ হাসল মনে মনে। আবার একটা আসছে। আসুক। তাকেও বাঁচিয়ে রাখবে। হরিপদর জীবনের পুনরাবৃত্তি সে অভয়পদর জীবনে হতে দেবে না। হরিপদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর সে ছেলেকে বকবে না। গালাগাল দেবে না। কাল থেকে। হাঁ, কাল থেকেই।

———

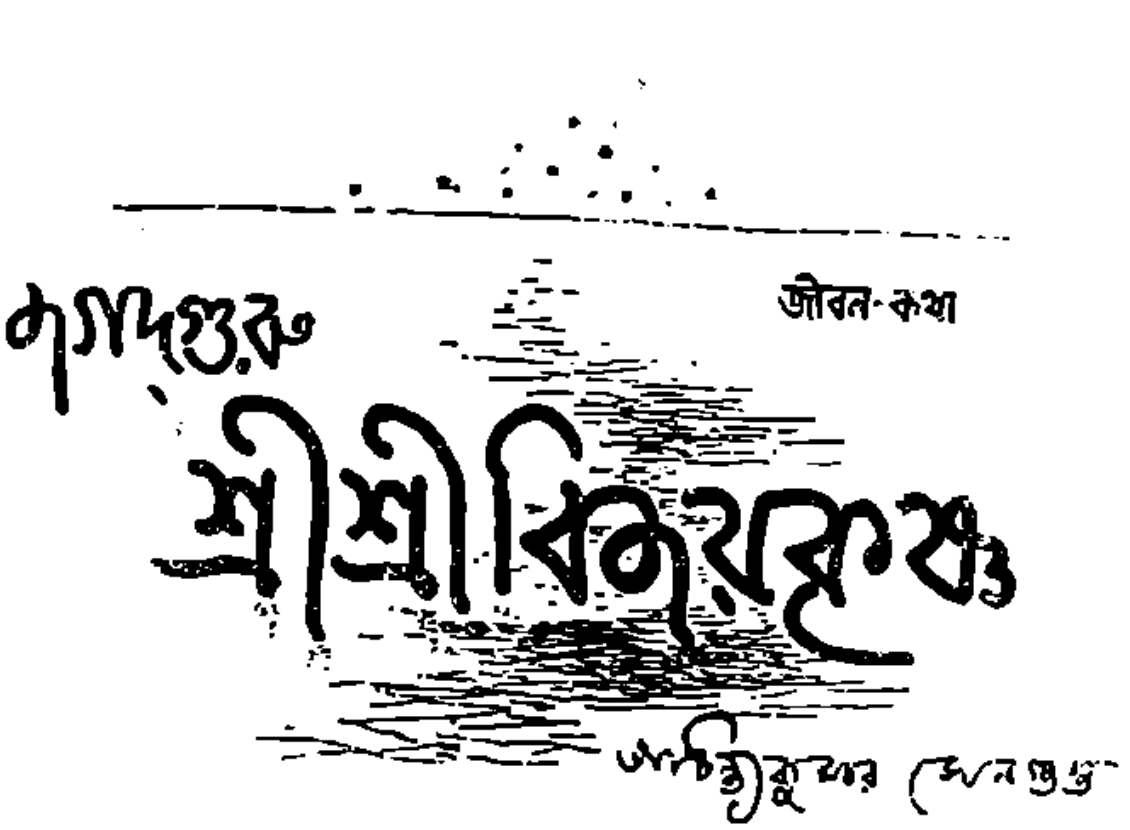

৩৮

যোগীশ্বর-প্রভু বিরচিত 'আশাবতীর উপাখ্যানে' আবার একটু ফিরে যাওয়া যাক।

আশাবতী বললে, এ বনপথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগীশ্বর উত্তর করলেন: কেন মা, মানুষ কি কখনো একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ তিনিই তো সঙ্গে আছেন।

আশাবতী বললে, এ কথা সত্য, কিন্তু যতদিন আমি তাঁকে সর্বস্থানে না দেখি ততদিন মুখের কথায় বইয়ের লেখায় সাহস হয় না। একটি পাঁচ বছরের বালক সঙ্গে থাকলে মনে বল থাকে। পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী বলছি অথচ অন্ধকারে ঐ গাছতলায় যেতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একটা আলো সঙ্গে থাকলে ভয় যায়। জ্যোতির ঘরের মধ্যে আছি, তবু ভয়। অতএব পরমেশ্বর কাছে আছেন মুখে বলা না-বলা সমান।

মা আশাবতী, তুমি যা বললে তা ঠিক। যোগীশ্বর সমর্থন করলেন: ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করে যারা ধর্ম-ধর্ম বলে আন্দোলন করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বেড়ে যাচ্ছে। যারা মুখে পরমেশ্বর বলে অথচ আচরণে নাস্তিকতা দেখায় তারা ভণ্ড ছাড়া আর কী!

উত্তর আশাবতীর মনঃপূত হল না। বললে, কথার সঙ্গে আচরণ না মিললেই যে ভণ্ড হল তা নয়। যে লোক চেষ্টা করেও কথা ও কাজ এক করতে পারছে না, কিন্তু ধর্ম করছে তাকে ভণ্ড বলি কী করে? যে জেনে-শুনে কপট ব্যবহার করে সেই ভণ্ড, সেই চোর, তার দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগীশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললে, হ্যাঁ মা এটাই যথার্থ কথা।

দুজনে মাতাজির আশ্রমে এসে উপস্থিত হল।

মায়ের চরণ ধারণ করে আশাবতী বললে, মা আজ আমার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হল, মা।

মাতাজি বললেন, কেন মা, এত মৈত্র কেন? ভক্তিভরে ভগবানের নাম করো, কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। যতদিন ভগবৎপদারবিন্দমধুরাস্বাদ না হয় ততদিন বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। আর বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হলে সুখ দুঃখ রোগ শোকের হাত থেকেও নিস্তার নেই।

উপায় কী?

ভগবৎ লাভ। জানো তো অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। পরমেশ্বরই অনন্ত আর সমস্ত কিছুই অল্প। সেই অনন্তকে না পেলে আশার বিরাম হবে কেন! দেখ না, শৈশব হতে আমরা বড় জিনিসই ভালোবাসি। কেবল যে বড় ভালোবাসি তাই নয়, বড়কে ভালোবাসি। সুন্দরকে ভালোবাসি, মঙ্গলকে ভালোবাসি, পুরাতনকে ভালোবাসি, ভালোবাসাকে ভালোবাসি। এ সকল বস্তু পাই না বলেই আশা মেটে না, ছুটোছুটি করতেই প্রাণ যায়।

যোগীবর বললেন, শাস্ত্রেও সেই কথাই বলছে। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে। পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় ঘুচে যায়, কর্মফলের ক্ষয় ঘটে।

আহা, কী অমৃত! শুনলেও প্রাণে আশা আসে। ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত প্রাণ সুস্থ হয় না। মাতাজি আশাবতীর দিকে তাকালেন: মা, তোমার নাম কী? তুমি কি বাঙালি?

আশাবতী বললে, এ দুঃখিনীর নাম আশাবতী। বঙ্গদেশেই আমার গৃহ ছিল।

তেরো কি পাঁচ সালের ফাল্গুন, অমৃতযোগের পদ্মবেশ। গত রাত একটা থেকে আজ সকাল দশটা পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গে এই বেশ থাকবে। প্রভু সবাইকে নিয়ে চলেছেন অমৃতযোগদর্শনে।

পথে বড়হাতার মহান্তের সঙ্গে দেখা। সে প্রভুকে এগিয়ে নিতে এসেছে।

মন্দির আজ লোকে লোকারণ্য। তবু ভিড় সরিয়ে প্রভুকে মণিকোঠায় নিয়ে যাওয়া হল। প্রভু ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠলেন, হরিধ্বনির পর হরিধ্বনি তুলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে অজস্র প্রণাম করলেন। কোনোক্রমে একটু বাইরে এসে বাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে, মুখে শুধু হরিজয়নাদ। জয় জগদ্বন্ধু, জয় সদর্শন, জয় মায়ী সুকন্যা, জয় চক্রসুদর্শন—শুধুই জয় জয়। আর প্রণাম, পুনঃপুনঃ প্রণাম, মুহুর্মুহুঃ প্রণাম। সমস্ত পাণ্ডা সেবক দর্শক ভক্ত, আপামর সাধারণ সমস্ত জনগণকে প্রণাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নিচে মুক্তিমণ্ডপের সামনে বসে পড়লেন। ভিড় করে লোক আসতে লাগল প্রার্থনা নিয়ে। কস্মৈচ ঠাকুর কাউকে ফেরালেন না।

পাণ্ডারা পাঁচ শো টাকা চাইল। কপর্দক নেই, তবু প্রভু সম্মত হলেন। ত্রিশ টাকার সিকি দু'আনি ভাঙিয়ে নিয়ে এল সরলনাথ, তাই বসে বসে বিলোলেন প্রভু। কোত্থেকে টাকা আসছে কে জানে। পরে কাউকে পাঁচ কাউকে দশ কাউকে পঁচাত্তর টাকা দিলেন।

রাধাকুণ্ডবাসী বেদী ব্রজবাসী পঁচাত্তরের কম নিতে রাজি হল না।

ঠাকুর যোগজীবনকে জিগগেস করলেন, 'কি, পারবে দিতে?'

'তুমি ইচ্ছা করলেই হয়।' বললে যোগজীবন।

প্রসন্ন স্বরে ঠাকুর বললেন, 'তুই কিছু ভাবিসনে। অন্তরে সন্তোষ রাখলে যা চাইবি তাই হবে।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে পথে যেতে-যেতেই বা কত দান। পটবস্ত্র সাধারণ বস্ত্রই বা কত। যে যা চাইছে তাই পাচ্ছে। শেষে বাকি পয়সা হাতে হাতে দিতে না পেরে পথের মধ্যে লুট দিয়ে দিলেন। যে যা পাও নাও কুড়িয়ে।

বাড়িতে ফিরে এসে সবাই জিগগেস করল এ ব্যাপারের অর্থ কী।

প্রভু বললেন, 'আজ দেখলাম জগন্নাথ গোবিন্দ হয়ে রাখালবালকদের সঙ্গে গোচারণ করছে। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম রাজেশ্বর হয়ে যে যা চাইছে তাই বিলোচ্ছে দুহাতে। আমাকে দেখে হেসে বললেন, আজ যে যা চাইবে তত পাবিরে যে। তাই নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করলাম।'

কিন্তু শুধু একদিন নয় নিত্য চলতে লাগল এই দানলীলা।

জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরের কাছে মানসিক করেছিলেন প্রভু, সেই পূজা দেখতে গেলেন। বললেন, 'মহাবীরের কাছে যে দিন এই পূজা মানস করলাম তার পরের দিনই বাবরবর বন্ধ হল।'

মঠে এক পা-কাটা বাবাজি থাকেন তাকে রেশমী চাদর ও বস্ত্র দিলেন। পূজারীকেও তাই। ভিক্ষিরারাও বাদ পড়ল না। হাত পাতলেই টাকা, পয়সা, বস্ত্র—যেন উৎসবের স্রোত চলেছে। দানের মত আনন্দ আর কোথায়! শুধু যে কে দেয়, কেন দেয়, কী করে এর পরিশোধ হবে, কে তার হিসেব রাখে, কে বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়!

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই করি না। ভিতর থেকে শুধু হুকুম আসে। আমার কী সাধ্য কাউকে কিছু দিই!'

কে একজন বললে, 'গোসাইপ্রভু বড় দান করলেন।'

প্রভু বললেন, 'দান অতল জলে ডুবে যাক।'

সেবায়িরা আশ্রমের দক্ষিণের ঘরটিতে সকাল-সন্ধ্যে অনেক ভক্ত শিষ্য এসে জমায়েত হয়, তাদের গোলমালে কুলদার সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই একদিন নালিশ করল প্রভুর কাছে।

প্রভু বললেন, 'এদিকে ওদিকে আশ্রমে তো স্থানের অভাব নেই, গাছতলায় বসেও তো নাম করতে পারো। নাম করা নিয়ে তো কথা, তা তো যেখানে-সেখানেই হতে পারে। যদি লোক যেখানে মিলেমিশে আনন্দ করছে সেখানে তাদের বাধা দিয়ে নিজের সুবিধের চেষ্টা করতে নেই।'

কুলদা ধাপ মানল না। বললে, 'যদি বলেন তো আশ্রমের দক্ষিণ-পূব কোণে পুকুরধারে একখানা ছোট ঘর করে নিতে পারি।'

'তারপর?' ঠাকুর তাকালেন মুখের দিকে: 'কোথাও চলে যেতে হলে ঘরখানা উইল করে যাবে কার নামে!'

এক কথায় ঘরে গেল কুলদা।

শুনতে পেল প্রভু মহেন্দ্রকে বলছেন, 'ওর কৃপণতা দোষে ওর সাধন-ভজন মাটি হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ও একশো টাকা জমিয়েছে, তা কোনো উপায়ে খরচ করিয়ে দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা। ধর্মার্থীদের স্বভাবে একটিমাত্র দোষ থাকলেই সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।'

কুলদা শুনতে পেল সেই কথা। প্রভুর কাছে এসে বললে, 'কী করে আমার সঙ্কীর্ণতা যাবে বলে দিন। আমি তা হলে হাতের টাকা কটা দান করে ফেলি।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'এখুনি স্নান করবার প্রয়োজন কী? কোনো কাজই সাময়িক উত্তেজনায় করতে নেই। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে সুস্থে করতে হয়। এখন থেকে আর সঙ্গ কোরো না। তুমি যে পথে চলেছ তাতে সঙ্গ নেই।'

আবার বললেন, 'ধনীদের মত যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্যে ভালোবাসছে, হাসছে, মুখের দিকে চেয়ে আছে। রোগে শুশ্রূষা করছে, তাও অর্থের জন্যে। কোনো স্বার্থ নেই, এমন কেউ ভালোবাসতে পারে, তবে সংসারে সেই সুখী। সে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা। সে ভালোবাসাই সুখ। হরিনামই সব চেয়ে সহজ সুখ। নাম করতে করতেই অনুরাগ।'

কুঞ্জ ওর সুস্থই আছে, প্রভু তাকে হঠাৎ বার্লি খেতে আদেশ করলেন। মহাপ্রসাদের বদলে বার্লি কেন বরাদ্দ হল কেউ নির্ণয় করতে পারল না। বোঝা গেল, দুদিন পরে যখন কুঞ্জর জ্বর হল। বিধু ঘোষ বললে, 'এতক্ষণে বুঝলাম বার্লির মহিমা।'

কিন্তু জ্বরকে অগ্রাহ্য করল কুঞ্জ। জ্বর গায়েই নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করল। আর স্নান করেই পড়ল তাঁতি হাতে। জ্বর এতেবারে একশো-পাঁচ। এবার আর বার্লিতে পোষাবে না। ডাক্তার ডাকো।

প্রভু বললেন, 'আমার ইচ্ছে তুমি কোনো ওষুধ না খাও।'

কুঞ্জ একবাক্যে স্বীকার হয়ে গেল। বললে, 'আমারও সেই ইচ্ছে।'

প্রভু শুধু পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। সকালে 'পাকাল মহাপ্রসাদ', বিকেলে 'মহাপ্রসাদ' আর রাতে প্রভুর প্রসাদী আম, ক্ষীর আর মিছরি।

আশ্চর্য, তাতেই সেই প্রবল জ্বর প্রশমিত হল।

কিন্তু এমন অসতর্ক কুঞ্জ, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসল। বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, খুলে গেল দরজা বন্ধ করতে। ফলে আবার সেই ভয়ঙ্কর জ্বর।

তারা বলাবলি করলে: 'কুঞ্জ না বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।'

'বেশ, তবে ডাক্তার ডাকো।' প্রভু সরে দাঁড়াতে চাইলেন।

ডাক্তারে কিন্তু কুঞ্জ রাজি নয়। সে বলতে লাগল, 'না, ডাক্তার লাগবে না। আমি প্রভুর দেওয়া পথ্যেই ভালো হয়ে উঠব।'

কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন বিনা চিকিৎসার অভিযোগ খণ্ডন করে দিতে হবে। প্রভু বললেন, 'না, ডাক্তার ডাকো। আবার বার্লি থাক।'

ডাক্তার বাণীকণ্ঠ ঘোষকে ডাকা হল। সে বসে দেখে-শুনে ওষুধ দিল। কিন্তু কই, রোগ ভালো হয় কই? এক ওষুধ বদলে আরেক ওষুধ দিল, কিন্তু যে জ্বর সেই জ্বর।

এক রাতে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কুঞ্জ। ডাক্তারের কাছে না ছুটে সবাই ছুটল প্রভুর কাছে। বললে, 'কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বুঝি আর বাঁচানো গেল না।'

প্রভু শান্ত মুখে বললেন, 'চিন্তার কারণ নেই। কুঞ্জকে পাকাল খেতে দাও।'

অজ্ঞান কুঞ্জ, পাকালের নাম করতেই কুঞ্জ চোখ মেলল। আর খানি তো খানি, এক হাঁড়ি খেয়ে বসল।

সবাই ভাবল এই কুসুম শেষ খাওয়া।

কিন্তু না, আস্তে আস্তে নামতে লাগল জ্বর। চলল আবার সেই পথ্যচিকিৎসা। পাকাল আর মহাপ্রসাদ আর সেই প্রসাদী আম-ক্ষীর।

কদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে গেল কুসুম।

এই কুসুমই শ্রী কুসুমকুমারী। ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে একেবারে তন্ময়প্রাণা। ইনিই লিখেছিলেন স্বামীকে, 'ঠাকুরের প্রসঙ্গ নাম ও ঠাকুর একই বস্তু। একটি নামে যে আনন্দ তা স্বামী-স্ত্রী-সংসর্গ সুখের সহস্রাংশের এক অংশেও নেই।'

কুসুম সন্ধ্যাকালে রান্নাঘরে গিয়েছে রান্না করতে। গিয়ে দেখল উনুনে আগুন নেই। হাঁড়িতে জল দিয়ে বসাল উনুনে, চাল ছেড়ে দিল। হাঁড়ির মুখ চাকল সরা দিয়ে। এক মুঠো খড় নিয়ে দাওয়ায় ঘষিয়ে উনুনে গুঁজে দিল। তারপর কাঠ গুঁজে দিতে ভুলে গেল। খড়ের আগুন ইন্ধন না পেয়ে নিবে গেল আস্তে-আস্তে। কুসুমের কিছু খেয়াল নেই, সে নামানন্দে সমাধিস্থ।

হঠাৎ কুসুম দেখল প্রভু প্রকাশিত হয়েছেন। বলছেন, 'কুসুম, আজ তোমার ভাত অন্নপূর্ণা রাঁধলেন। তোমাকে আজ আর কষ্ট করে রান্না করতে হল না।'

সমাধি ভঙ্গের পর কুসুম ভাতের হাঁড়ির সরা সরিয়ে দেখল দিব্যি ভাত হয়ে রয়েছে। ঝরঝরে ভাত, ফেনগালা।

বরিশালের উকিল গোরাচাঁদ দাস জিগগেস করল প্রভুকে, 'মশাই এ কি সত্যি? বিনা আগুনের রান্না?'

ঠাকুর হাসলেন: 'এ আর বেশি কথা কী! পঞ্চভূত তো পড়েই আছে, যে যখন যা সিদ্ধ করে। এ সত্য কথা বৈ কি। সত্য বলতে, এ কথাই সত্য। তোমরা এর মর্যাদা দিতে পারবে না, ভাববে প্রশংসার জন্যে কুসু আর তার স্ত্রী এ রটনা করছে। যুগযুগান্তর চলে যাবে, পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার মত এ অনন্তকাল সত্য হয়ে থাকবে। ভগবানের অন্নপূর্ণা-শক্তিই রান্না করেছেন।'

'চিন্তামণী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তামণী, ব্যাভারে তৈ তেমন দেখি।
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে মধ্যাহ্নে দাও অঠর-চিন্তে
ও মা, শয়নে দাও সর্বচিন্তে, বল মা তোরে কখন ডাকি?
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে পঞ্চচাঁদেকে দিয়ে ফাঁকি।'

সেদিন জগন্নাথদর্শন করে প্রভু অনেক স্তবস্তুতি করলেন: 'তুমি যজ্ঞেশ্বর, তুমি কেশব, তুমি নৃসিংহ, তুমি বামন, তুমি কৃষ্ণ, তুমি বাসুদেব। তুমি এক বিগ্রহ, চতুর্ধা বিভক্ত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' অধীর হয়ে বলতে লাগলেন: 'হরিবোল হরিবোল।' পরে পরিপূর্ণ নেত্রে তাকালেন জগন্নাথের দিকে: 'দেখ জগন্নাথদেবের কী অপূর্ব শোভা, নিজের ছটায় নিজেই আলোকিত। তোমরা দীপ দাও কি না দাও, ওঁর কিছুই আসে যায় না। তিনি নিজের আলোয় নিজেই উজল হয়ে আছেন।'

মন্দিরের দীপ নিষ্ণু-নিষ্ণু হয়ে এসেছিল, পাণ্ডারা কী ভেবে সলতে বাড়িয়ে দিল।

ঠাকুর গান ধরলেন :

'জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে বড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়
কখন পার্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি মহুষ বধে করে সভয়,
ব্রজপুরে আসি করে লয়ে বাঁশি ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়॥'

বাড়িতে এক অথর্ব ও অসুস্থ সাধু এসে উপস্থিত। না দেখে শুধু শব্দ শুনেই প্রভু চিনলেন সাধুকে। বললেন, 'এক ঠোঙা চাল ও কিছু পয়সা দিয়ে দাও।'

চাল দেওয়া হল কিন্তু তখনো পয়সা নেই একটাও।

সাধু বললে, 'পয়সা চাই না। একটি ঘটি দিন।'

ঠাকুর শুনতে পেয়ে বললেন, 'আমার ছোট ঘটিটি দিলে হয় না?'

'না, সাধু নতুন ঘটি চায়। দিতে হলে কিনে এনেই দিতে হবে। কিন্তু তাতার পুত।' বললে সারদাকান্ত।

'তাহলে যোগজীবনকে বলে সরলনাথকে বাজারে পাঠিয়ে দাও।' বললেন ঠাকুর, 'সরলনাথ ঠিক বাকি নিয়ে আসতে পারবে।'

'কিন্তু এত অর্থাভাব যে যোগজীবনকে বলতে ইচ্ছে হয় না।'

'এত ভাবনার কী দরকার!' ঠাকুর সরল স্বাচ্ছন্দ্যে বলে উঠলেন : 'সুযোগ এসেছে দান করে ফেল। সুসময় ছেড়ে দিলে আর মেলে না। দুর্যোধন ছেড়ে দিয়েছিল সুসময়, যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আর সেই সুযোগ ফিরে এল না।'

সরলনাথকে সবাই বলে উদাসী সরলনাথ। পুরো নাম সরলনাথ গুহ ঠাকুরতা, বাড়ি বরিশাল, বানরিপাড়া। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী আর সংসার ছেড়ে ঠাকুরের আশ্রয় নেয়, একে নির্ভর করেই ঠাকুর পথ হাঁটেন। ঠাকুরের যজ্ঞযজ্ঞে সরলনাথই প্রধান পুরোহিত। গুরুভক্তিতে নিষ্ঠিচল, সরলনাথের সরল সাধন।

সরলনাথের কাঁধে হাত রেখে ঠাকুর পথ চলছেন, হঠাৎ কাউকে দেখে বলে উঠলেন, 'ওঁকে কিছু দান করো।'

দান করবে সরলনাথের কাছে পয়সা কোথায়? কিন্তু কিছু না দিলে গুরুবাক্য লঙ্ঘন হয় যে। সরলনাথ তখন রাস্তার ধারে মুদি-দোকানের কাছে হাজির হয়ে সরল মুখে বললে, 'দান করবার জন্যে ঠাকুর কিছু পয়সা চাচ্ছেন—'

অম্লান মুখে মুদি দিয়ে দিল পয়সা। তাই সরলনাথ এনে দিল প্রভুর হাতে। প্রভু তা প্রার্থীকে দান করলেন।

কোনোদিন প্রভু এমন জায়গায় এসে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যার কাছাকাছি কোনো

দোকানদারি নেই। না, ঐ দেখা যাচ্ছে একটা পানের দোকান, সেখানে গিয়েই হাত পাতল সরলনাথ। সেই পানওলাই দিয়ে দিল যথাসাধ্য।

কেউ-কেউ আবার সাধ্যের অতীত করে দিল। কী যে ইন্দ্রজাল, ঠাকুর চাচ্ছেন শুনলেই যে যার ঘরই শুধু খোলে না, ক্যাশবাক্সও খুলে দেয়।

ধার করে দাও।

ঠাকুরের আবার কখন ইচ্ছে হবে ধার শোধ করবেন। সরলনাথকে বললেন, 'যাদের থেকে ধার এনেছ তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এস।'

সরলনাথ ভাঁপরে পড়ল : 'আমি কি সকলকে চিনি?'

ঠাকুর বললেন, 'যাদের বলতে বলতে যাবে কে আবার কাছে কত পাও নিয়ে যাও এসে। যে যার বলে দিয়েছে সে ঠিক নিয়ে যাবে দেখো।'

সত্যি, ঘোষণা করতে করতে পথ ধরে চলতে লাগল সরলনাথ। যারা নিজেদের উত্তমর্ণ মনে করছে, নিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাপ্য টাকা। হিসেবে এতটুকুও ভুল করছে না।

মজুমঠে ঠাকুর প্রায় ছ শো টাকার কাপড় বিলোলেন। যে সাতজন কনস্টেবল ও বারোজন ছড়িদার বিরাট লোকসংঘট্ট নিয়ন্ত্রণ করল তারাও খুশি গেল।

পরে সন্ধ্যার কীর্তন সুরু হল। সে কীর্তনে এক সন্ন্যাসী এসে যোগ দিল। ঠাকুরের হাত ধরে নাচতে লাগল উত্তাল হয়ে। যাবার সময় বলে গেল, 'আমি লোকনাথে থাকি, সেখানে এলে দেখতে পাবে আমাকে। কী, চিনতে পাচ্ছ না? আমি শুধু দুধ খাই।'

লোকনাথে পৌঁছে ঠাকুর বললেন, 'সমস্ত পুরী আচ্ছন্ন করে লোকনাথ বিরাজ করছেন। আকাশ-পাতাল জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে।' পরে আবার বললেন, 'লোকনাথ আর জগন্নাথ এক। কখনো জগন্নাথকে দেখবে শুভ্র, কখনো লোকনাথকে শ্যাম।'

সত্যি, সবাই দেখল, মন্দিরের মধ্যে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। ঠাকুর বললেন, 'উনিই লোকনাথ।'

পাণ্ডারা একুশ টাকা চেয়ে বসল। ঠাকুর সরলনাথের মুখের দিকে তাকালেন। আছে?

সরলনাথ বললে, 'পাঁচ টাকা আছে।'

'উপায়?'

'দেখছি।' সরলনাথ তখুনি ছুটল।

দেখল সিংহদ্বারের অদূরে এক দোকান। দোকানী সম্পূর্ণ অচেনা, চেহারাটা অত্যন্ত রুক্ষ। কী ভেবে তার কাছেই হাত পাতল সরলনাথ। ঠাকুর পাণ্ডাদের যেবেন বলে ষোলটা টাকা চেয়েছেন, যদি ধরা করেন—

কত? ষোল টাকা? লোকটা হঠাৎ কোমল হয়ে গেল। অকাতরে বাক্স খুলে দিয়ে দিল টাকা।

বাসায় সেদিন একটি কুমারী কন্যা উপস্থিত। আধঘোমটার সুরে ঠাকুরকে বললে, 'সবাইকে এত বস্ত্র দিচ্ছ আমি বুঝি কেউ নই?'

ঠাকুর সেই দুঃখিনী কন্যাকে এক পলকেই চিনতে পারলেন। বললেন, বিমলীমায়ী!

যোগজীবনকে বললেন, 'ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি কিনে দাও বিমলাদেবীকে। আর দশ টাকার পুজো পাঠাও।'

পুরুষোত্তমের মত খাতির তত বুঝি বিমলাদেবীর নয়। অনেকে তো বিমলাদেবীকে দর্শনই করে না। বিমলাদেবীই যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই কথাই ভুলে থাকে।

আরেকবার দেখা দিয়েছিলেন পাগলিনী ভিখারিনির বেশে। সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন দেখলেন চীরবাসা এক ভিখারিনি আলুলায়িত কুন্তলে ফিরছে পাগলিনীর মত। প্রভু ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'যার যা আছে সমস্ত এই ভিখিরিনিকে দিয়ে দাও। এখন সুযোগ আর না-ও পেতে পারো। পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাদের দর্শন দেবার জন্যে ভিখিরিনির সাজে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। দাও কী আছে।'

দেবার লুট পড়ে গেল। সতীশ তার ধোয়া কাপড়খানিই দিয়ে দিল।

ঠাকুর বললেন, 'যে সব স্থলে ভগবদ্বুদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করেন সেসব স্থলে গেলেই চিত্তের ঘর্ষভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। এটা কি কম কথা?'

'আচ্ছা বিগ্রহ জাগ্রত, তার মানে কী?' কে একজন জিগগেস করল: 'বিগ্রহ কি কথা বলে? হাত-পা নাড়ে?'

'যাদের চোখ-কান আছে,' বললেন ঠাকুর, 'তারা বিগ্রহের হাত-পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন।'

'কিন্তু বৈরাগ্য কী?'

'বৈরাগ্য অর্থ ঈশ্বরে সত্যিক অনুরাগ। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম, ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করলাম। সমস্ত বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হলেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হলেই বুঝবে বৈরাগ্য হয়েছে। মানুষের মরে যাওয়া আর বৈরাগ্য হওয়া এক বস্তু। মরে গেলে আর কি কেউ জিগগেস করে মরে গিয়েছি কিনা? তেমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হলে আর কি প্রশ্ন ওঠে, কী বৈরাগ্য।'

'কিন্তু কর্ম?'

'কর্ম না করলে বৈরাগ্য হয় না। কর্ম যার যেটুকু আছে, আজ হোক কাল হোক, একদিন করতেই হবে। সেটি না করে কারু নিস্তার নেই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্তমধ্যে সব শেষ হতে পারে। না হলে জোর করে কার সাধ্য কর্ম ছাড়ায়। তবে কর্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না।'

'তাপ কী?'

'ভগবৎ দর্শনের অভাবই তাপ। ভিতরে অকর্তা ও বাইরে কাজ, অর্থাৎ অনাসক্ত কাজ—এই মহাপুরুষের লক্ষণ। কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করলেই তাপ যায়। যে মুক্ত-ভক্ত তারই আর তাপ নেই।'

রাস্তায় এক অন্ধ বৈষ্ণবকে ঠাকুর সহসা আলিঙ্গন করে ধরলেন। কী ব্যাপার? আমি যে ওর মধ্যে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুমূর্তি দেখলাম।

যাবাজির বাড়ি রায়বেরিলি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যাবকায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রামেশ্বর। সেখান থেকে পুরী। মানুষের প্রতিমূর্তি, সব সময়েই হাসিমুখ। কে এই অন্ধকে পথ দেখায়, তাকে দেখে এই অন্ধের এত প্রসন্নতা।

মানুষ তো নয় একটি দেবমন্দির।

ঠাকুর বললেন, 'এঁকে বুঝি, চাদর আর একটি ঘটি দাও।' পরে বললেন, 'এ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাই এক-একটি বিন্দু। জগন্নাথদেব মহাপ্রসাদ আর বস্ত্র, এ তিনই এক।'

আবার বললেন, 'মাথা উঁচু করে কখনো ধর্মলাভ হয় না। অভিমান বিষম জিনিস। জটা মালা তিলক দেখিয়া এসব বেশভূষা ধারণ করে যদি বিন্দুমাত্রও প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে সেই মুহূর্তে তা ত্যাগ করবে। না করলে ওরাই সাপ হয়ে দংশন করবে। অন্যান্য অপরাধের পার আছে ধর্মাভিমানের পার নেই। রসনাকে সংযত করবে। রসনা দু কাজ করে। খায় আর বকে। বাক্য-সংযম করবে। জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দেবে। জিহ্বা বশ করবার জন্যে ঋষিরা মৌনী হতেন। লোকের গুণানুবাদ, শাস্ত্রপাঠ, নামকীর্তনে জিহ্বা শুদ্ধ ও ভদ্র হয়। ভদ্র হতে-হতেই সংযত হয়ে আসে। আর লোভ? লোভেই জীবের জড়ত্ব-প্রাপ্তি। ঘুম ত্যাগ করলে খাবার জিনিসে লোভও কমে যায়। মুনি-ঋষিরা লোভ দমন করতে কী কঠোরই সাধনাই না করেছেন। অনাহারে, পলিত পত্রাহারে দিন কাটিয়েছেন। উপর সংযত করা সোজা, কিন্তু জিহ্বা সংযত করাই কঠিন।'

কিন্তু কঠিনতম পথে না গেলে কোমলতমকে পাবে কী করে?

• • •

নাটকটি লিখে নামকরণ নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছেন মরিস্ মেটার লিঙ্ক। অনেক নামই মনে আসছে। কিন্তু নাটকের উপাখ্যানের সঙ্গে ঠিক নাম মেলাতে পারছেন না তিনি। অনেক রাতে ঘুমন্ত শীতে রাস্তা চলতে গিয়ে হঠাৎ তার লম্বা ওভারকোট ধরে কে যেন টানলে।

চমকে উঠে ফিরে দেখেন একটি সুন্দরী তরুণী, শীতে কাঁপছে। বোধহয় কোন নাইট ক্লাব থেকে সবে ফিরছে।

—তোমার কি খুব শীত করছে? মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলেন মেটার লিঙ্ক।

—হাঁ, মনায় বাইরে যে এত শীত তা আমি ভাবতেও পারিনি।

—তবে নিঃসঙ্কোচে এসো আমার ওভার কোটের মধ্যে। এ কোটটা যথেষ্ট বড়। চল, তোমায় গন্তব্যস্থানে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার নামটি কি সুন্দরী। চোখের নীলতারা নাচিয়ে তরুণী একটু হাসলে। তারপর বলে—আসল নাম আমি নিজেই ভুলে গেছি তবে লোকে আমাকে বলে 'মুখার্জি।'

মেটার লিঙ্কের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এতক্ষণে তার নাটকের নাম পেলেন তিনি।

চলতি দুনিয়া

BACHELORS' CLUB (চিরকুমার সভা) প্রেসিডেন্টের আবেদন :

ফ্রান্সে তো ৩,০০০,০০০ অবিবাহিত নারী রয়েছে। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে এখানে পাঠানো হোক এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন 'এসপারোস ব্যাচেলরস ক্লাব'-এর ৭০ বছরের বৃদ্ধ সভাপতি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ওই আবেদন জানিয়েছেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি গ্রামের তিনি মেয়রও বটে। তাঁর অঞ্চলে যে এক হাজার অবিবাহিত পুরুষ রয়েছে তাদের সমস্যা যে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা এ-বিষয়ে তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সমস্যাটি যাতে সকলের চোখে পড়ে এই জন্য তিনি শীঘ্রগিরই (Bachelors') ব্যাচেলরদের একটি 'মেলার' আয়োজন করবেন। ওই মেলায় উদ্বোধন করবেন ব্রিগিটা বার্ডো।

প্রসব-বেদনা লাঘবের অভিনব উপায় :

মায়েদের প্রসব-বেদনা বহুল পরিমাণে লাঘব এবং মাতৃত্ব নারী সহজ ও নিরাপদ করার জন্য ব্রিটেনে একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। লণ্ডনের চিকিৎসকরা ওই পরীক্ষা চালাচ্ছেন আলো নিয়ে। টেলিভিশন সেটের সাইজের একটি ছোট পর্দায় উপর তিরিশ মিনিট ধ'রে আলোকপাত করা হয়। পর্দায় বিভিন্ন আলোর ক্রমাগত আবির্ভাবের দিকে-দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ভাবী মায়েরা মগ্ন-মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে ; তাদের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়।

ভূমিষ্ঠ হবার আগে "মহাকাশের পরিবেশ"

মহাকাশে ভ্রমণের সুযোগ বা সৌভাগ্য এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। তা হোক, এক অর্থে কিন্তু আমরা সকলেই আমাদের জন্মের আগে মহাকাশের পরিবেশে কিছুদিন বাস করেছি। জরায়ুকে বলা চলে মানবজাতির আদি 'স্পেস ক্যাপসুল।' জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার মেরী এলেন আভেরী বলেছেন, গর্ভে অবস্থান কালে ভ্রূণ যখন রসের মধ্যে ক'য়ে ভেসে বেড়ায় তখন তার হৃৎ-স্পন্দন আর মহাকাশযাত্রীর হৃৎস্পন্দনের হার মিনিটে একই রকম। পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থান কালে যে-হার থাক তা থেকে ১৩ গুণ বেশি। তাছাড়া গর্ভের ভিতরে আর রকেটের মধ্যে আছে সর্বদা একই রকম তাপমাত্রা সম্পূর্ণ অন্ধকার, আর তরল পদার্থ। ভ্রূণ আর মহাকাশযাত্রীর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা একই রকম।

কয়লার নতুন সম্ভাবনা :

কয়লা এতদিন আমাদের তাপ দিয়ে এসেছে, নানারকম রাসায়নিক জিনিস সরবরাহ করেছে ; এখন আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জানাচ্ছেন, কয়লা অচিরেই মানুষের ক্ষুধাও দূর করবে। কয়লার ভিতরে যে একরকম ইয়েস্ট আছে (ভোজন-উপযোগী প্রোটিন) তা আমিষ খাদ্যের প্রোটিনের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী আর পুষ্টিকর।

আরো কাঁদুনে গ্যাসের শেল

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে হাঙ্গামার সময় পুলিশকে যে কতবার কত রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ওই গ্যাস শেলগুলি কিন্তু ধার ক'রে আনতে হয়েছে পাশের রাজ্যগুলি থেকে। অসংখ্য সাধারণ মানুষকে দমন করার যোগাওয়াই টিয়ার (কাঁদুনে) গ্যাস তার শেল এখনো তাতে তৈরি হয় না ; বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় এবং তা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। শান্তিরক্ষার জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা চাই।

লণ্ডনের ছাত্রদের কীর্তি

রেগিনা প্রায় আটবছর ধ'রে ছিলো লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়। রেগিনা হলো একটা মেয়ে ঈগল। কিছুদিন আগে লণ্ডনের কয়েকজন ছাত্র চিড়িয়াখানার প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে রেগিনাকে চুরি ক'রে ম্যাকোটারে নিয়ে যায়। জনহিতকর কাজের জন্য লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলবার জন্যই নাকি তারা এই অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

অতিরিক্ত প্রসাধন নয়

একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর ডিরেক্টার এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, মেয়েদের মধ্যে সর্বত্রাসী প্রবল হওয়ার ফলে তার কোম্পানীর উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই কারণে তিনি তাঁর কোম্পানীতে কর্মরত তিরিশজন মহিলা-কর্মীর উপর এই আদেশ দিয়েছেন যে, অফিসের সময়ে তারা প্রসাধন না করে। এই আদেশ বলবৎ হ'লে তিনি আশা করেন তাঁর কোম্পানীর লাভ ১০% ভাগ বৃদ্ধি পাবে। আর লিপষ্টিক এবং চিরুণী কিছুই অফিসের সময় ব্যবহার করা চলবে না।

রামকৃষ্ণ মিশনেরও রেহাই নেই

বর্মী সরকার বিদেশী ধর্ম-প্রচারকদের অবিলম্বে বর্মা ত্যাগ করার হুকুম দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনও সেই হুকুমের আওতায় পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট সুসজ্জিত হাসপাতালটি বর্মী সরকার জাতীয়করণের অজুহাতে বহু আগেই দখল করে নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষের সেবা এবং সংস্কৃতি দুইই আজ রেঙ্গুনে নিষিদ্ধ হলো।

আঠারো শতকের ফরাসী জাহাজে সোনার সন্ধানে

সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে আঠারো শতকের এক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে তিনজন তরুণ ডুবুরী আনুমানিক ২৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা উদ্ধার করেছেন। সত্যি ইনাহী ব্যাপার। ওই সোনা প্রধানত পাওয়া গিয়েছে মুদ্রার আকারে। জানা গেছে, ব্রিটনের কাছাকাছি সাগরে জাহাজটি ডুবে গিয়েছিলো ১৭২৫ সালের ২৬শে আগষ্ট।

বোম্বের জনসংখ্যা

বিশ বছরে বোম্বের জনসংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেছে। আর ১৯৯০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে দিল্লীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। গ্রামের চাইতে শহরেই জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে ব'লে জানা গেছে।

বাঘের বদলে শিকারীকেই।

কটকের কাছে মাণিকপদার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলো একদল শিকারী। ইতিমধ্যে আরেক দল শিকারী আগের দিন রাতে এসে ওৎ পেতে বসেছিলো গাছপালা ঘেরা একটা পুকুরের পাড়ে। এই দল পুকুর পাড়ে যেতেই শব্দ শুনে ওপাড় থেকে শিকারীরা গুলি করতে শুরু করে। ফলে এ-দলের কয়েকজন শিকারী সামান্য আহত হয়।

মেরু অঞ্চলে নারী অভিযাত্রীগণ

১৯জন ইংরেজ এবং ২জন মার্কিনী তরুণীর একটি দল এ-বছরের শেষ দিকে মেরু-অঞ্চল অভিযানে বেরুবে। দলটি পরিচালনা করবেন মিসেস মলি পোর্টার। লক্ষ্য করার বিষয়, ওই দলটিতে একজনও পুরুষ নেই।

গায়কের প্রবেশ নিষেধ

মেক্সিকো সরকার ওই শহরে প্রখ্যাত গায়ক ক্রাস্ত সিনাত্রার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এক আইন জারী করেছেন। কারণ অবশ্য এখনো স্পষ্ট জানা যায় নি। তবে মনে হয় "ম্যারেজ অন দি রকস্" নামে যে চলচ্চিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছেন তার জন্যই ওই সরকারী হুকুম। ওই চিত্রে নাকি মেক্সিকোকে আদিম দেশ ব'লে দেখানো হয়েছে এবং মেক্সিকোর বিচার ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। আর আমাদের ভারতবর্ষকে নিয়ে যারা বিদ্রূপ ক'রে চিত্র নির্মাণ ক'রে তারা কি না আমাদের কাছ থেকেই বাহবা পায়!

মাত্র ১১০ বছরে মৃত্যু

বোম্বে থেকে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেলো, ওই এলাকায় এক মহিলা ১১০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের দীর্ঘজীবনের কথা মনে রাখলে বলতে হয় তিনি বেশ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হয়েছেন। কারণ তাঁর বাবার মৃত্যু হয় ১২৫ বছর বয়সে আর ঠাকুরদা বেঁচেছিলেন ১৫০ বছর বয়েস পর্যন্ত।

মিসেস সুভদ্রাবাঈ অর্জুন সাম্বতের জন্ম ১৮৫৪ সালের পয়লা জানুয়ারী। রত্নগিরি জিলার সমস্থের তালুকাতে তাঁর একমাত্র জীবিত এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বয়েস এখন ৪৯।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুভদ্রাবাঈ নিজের হাতে সংসারের কাজকর্ম তো করতেনই, তাছাড়া বোনা বোনা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কুটীরশিল্প নিয়েও ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেটি তাঁর বিছানার নিচে এক শ টাকা পায়। নিজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় বাবদ ওই টাকা তিনি রেখে গেছেন।

বর্ণান্তর

বীথি বসু

সেদিন ছিল বোধহয় কোজাগোরী পূর্ণিমা। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে মল্লিকাদের ছোট্ট বাংলোটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। সামনের বাগানটা থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি ফুলের গন্ধ। স্বচ্ছ চাঁদের আলো পাহাড়টার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কি যেন রহস্য লুকান আছে ওর মধ্যে। মল্লিকার চোখে আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। স্মৃতির রোমন্থনে ও আজ মশগুল।

হঠাৎ পরিচিত সাইকেলের বেল। নিশীথ বেরিয়েছিল—বোধহয় ফিরে এল। হ্যাঁ নিশীথই ত। গেট খুলে সাইকেল নিয়ে ভেতরে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় সাইকেলটা রেখে বললে—"বাবুরা কি খাওয়া। পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বুঝলে। কিছুতেই ছাড়লে না—টানতে টানতে নিয়ে গেল। আজ আর কিছু খাব না—শুয়ে পড়লাম।

"খাবারগুলো নষ্ট করলে ত!"

"কি করব বল নিরুপায়।"

আর কোন কথা হয় না—নিশীথ চলে গেল ভেতরে—হাতমুখ ধুয়ে পরিশ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেবে বিছানায়। না মল্লিকা এখন কিছুতেই শুতে যেতে পারবে না। আজ সে ভাববে। তাকে আজ পেয়ে বসেছে অতীতের স্মৃতি। এই রকম এক কোজাগরী পূর্ণিমায় অরন্ত চৌধুরীকে সে কথা দিয়েছিল। কাব্য করে বলেওছিল "আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে"। অরন্ত ওর হাতখানা ধরে বলেছিল "সত্যি বলছ মল্লিকা?"

মল্লিকা আরও বলেছিল মাথার ওপর চাঁদ, সামনে রয়েছে গঙ্গা—এরা রইল সাক্ষী। বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার নাম করে অরন্তর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল আউটরাম ঘাটে। গঙ্গার ঢেউ আকাশের চাঁদ আর অসংখ্য তারার প্রতিচ্ছবি নিয়ে নাচছিল। ওদের মনেও লেগেছিল ঢেউ—প্রেমের জোয়ার এসে আছাড় খেয়েছিল ওদের হৃদয় তটে।

"মল্লিকা"

নিশীথ উঠে এসেছে—

"বাইরের হিমেল হাওয়ায় তোমার ঠাণ্ডা লাগবে—সবে অসুখ থেকে উঠেছ আর রাতও যে অনেক হ'ল।"

মল্লিকা ধীর ভাবে জবাব দিলে "যাই।"

যাওয়ার কিন্তু কোন লক্ষণই তার দেখা গেল না। তাতে তার ভাল লাগছে। ওরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। ইতিহাস নিয়ে পড়ছে। অমরের ভাল ছাত্র হিসেবে নাম ছিল তাই অনেক সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে থেকে যখন মল্লিকাকেই বেছে নিয়েছিল বিশেষ বন্ধু হিসেবে তখন অনেকেই বিশেষ করে তার বান্ধবীরা এটা খুসী মনে নিতে পারে নি। অনেক বক্রোক্তি তাকে শুনতে হয়েছে। তা হোক্ তবু ওরা একসঙ্গে গিয়েছে কফি হাউস্, ন্যাশানাল লাইব্রেরী। কতদিন একসঙ্গে সিনেমায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে ধরাও পড়েছে। এ ধরা পড়ায় ছিল সুখ। সন্ধ্যের পর অকারণ দেরী করে বাড়ী ফিরে গিয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মধ্যে ছিল আনন্দ।

"মল্লিকা!"

"উঁ!"

"আর ঠাণ্ডা লাগিও না লক্ষ্মীটি—শরতের হিম, শরীরটাও ভাল নেই তোমার"—নিশীথ আবার উঠে এসেছে।

মল্লিকা মিনতি ভরা চোখ নিয়ে বলে, "আর একটুখানি—তুমি যাও, আমি এখুনি যাচ্ছি।"

"কি হয়েছে বলত তোমার আজ! কি এত ভাবছ?"

"কিছু না—দেখছি দূরের ঐ পাহাড়টা যেমন নিঃসঙ্গ তেমনি প্রাণহীন।"

নিশীথ দেখে নিস্তব্ধ রাতের জেগে থাকা চাঁদের একফালি আলো পড়েছে মল্লিকার মুখে। ওর চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন জড়ানো। ও আর বিরক্ত করে না—এটা যে মল্লিকার সত্যিকথা নয় এটুকু অন্তত বোঝে। আজ তিন বছর বিয়ে হয়েছে ওদের কিন্তু মল্লিকা আজও ওর কাছে অস্পষ্ট। ওর অন্তরের গভীরে কি যেন একটা লুকিয়ে আছে তাকে টেনে বের করে আনা যায় না। বিবাহিত জীবনে ওরা অসুখী নয়—সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী। কর্মজীবনে ও নিজেও আজ প্রতিষ্ঠিত। দার্জিলিঙে নতুন এসেছে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়ে। মল্লিকা ওকে সুখে রাখতে চায় অন্তত চেষ্টার ত্রুটী থাকে না; একটা দিক ওদের শুধু এখনও ফাঁক রয়ে গেছে। ওরা এখনও নিঃসন্তান। মল্লিকা এখনও মা হতে পারেনি। নিশীথ ভাবে মল্লিকার অন্তরের গভীরে তাই কি একটা শূন্যতা থেকে গেছে—তাই কি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে? হঠাৎ একটা নিবিড় মমতা জাগে মল্লিকার জন্যে। নিশীথ পা টিপে টিপে আবার পাশে এসে ডাকে "মল্লিকা"

"একি তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

"না, কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলত? কিসের যেন চিন্তা তোমাকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসে—মা হতে না পারার বেদনাই কি তোমার"—

কথাটা শেষ করতে দিলে না মল্লিকা নিশীথের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "আমার কিছুই হয়নি গো বিশ্বাস করো—চলো ভেতরে যাই"—

সেদিনকার মতো পুরনো স্মৃতির দুয়ারে অর্গল দিতে হ'ল। জোর করে মনকে ছিনিয়ে আনতে হল অমরের কাছ থেকে। নিশীথের হাত ধরে মল্লিকা এগিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

* * * *

সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। দুপুরে মল্লিকা বাড়ীতে একা। বাড়ীর ঝিটাও কিছুক্ষণের

অফে ছুটী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। মল্লিকা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। খবরের কাগজটা সকালেই পড়া হয়ে গেছে। রেডিওটাও খুলতে ইচ্ছে করছিল না। এ সময় সেই একঘেয়ে প্যানপেনে গান। হঠাৎ কি খেয়াল হল বহুদিনের পুরনো একটা এ্যালবাম্ বের করে দেখতে লাগলো। এ এ্যালবামটা ও বার করে না। ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় থাকে। ওর আর অরন্তর তোলা অনেক ছবি এতে রয়েছে। আজ বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে ওর পুরনো দিনের ছবিগুলো কত সুন্দর। সব সময়ে যেন হাসছে। আর আজ? সে যেন একটা কলের পুতুল। সত্যি কি আশ্চর্য্যভাবে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়েছে। কি জানি অরন্ত এখন কি করে? সেবার কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে শুনেছিল ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে কোথায় যেন প্রফেসারি করছে। বিয়ে করেনি নিশ্চয়ই। মল্লিকাকে সে কথা দিয়েছিল মল্লিকাকে না পেলে কোনদিন বিয়েই করবে না। অরন্ত হয়তো আজও একা। ভবিষ্যৎ জীবনে ওকে নিয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। মল্লিকার চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করে—ক্রমে তা ঘনীভূত হয়ে গড়িয়ে পড়ে। হাতে ধরা অরন্তর ছবিটা ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসে।

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া—একি নিশীথ এরই মধ্যে ফিরে এসেছে? আমাটা খুলতে খুলতে বললে, তোমার শরীরটা খারাপ দেখেছিলাম আর অফিসেও আজ তেমন কোন কাজ ছিল না তাই চলে এলুম কিন্তু তোমার হাতে ওটা কার ছবি?…

মল্লিকার খেয়াল নেই তার হাতের মধ্যে তখনও অরন্তর ছবিটা। আরে, এ ছবি তুমি কোথায় পেলে? এ যে আমার বিশেষ বন্ধু অরন্ত চৌধুরী। আমরা বরাবর কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখানে কিছুদিন হল এসেছে প্রফেসারি নিয়ে কিন্তু এ ছবি তুমি পেলে কোথায়?

মল্লিকা ধীরভাবে জবাব দেয়, আমার বন্ধু, একসঙ্গে এম্-এ পড়তাম। টেবিলের ওপর হাত দিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ করে নিশীথ বলে উঠল—কি মজা, আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কালই একবার এখানে আনা চাই।

আনন্দে ভয়ে বিস্ময়ে মল্লিকার সারা দেহে মনে রোমাঞ্চ জাগে। ও কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। মনে মনে ভাবে নিশীথের এত বিশ্বাস? কোন প্রশ্নই কি ওর জাগে না?

পরের দিন সকালে নিশীথ নিজে গিয়ে অরন্তকে সান্ধ্যবেলায় চায়ের নিমন্ত্রণ করে এসেছে। নিশীথ কিন্তু বেশীক্ষণ সঙ্গ দিতে পারবে না, জরুরী কাজে তাকে একটু বেরিয়ে যেতে হবে, ফিরতে কত রাত হবে ঠিক নেই।

মল্লিকা আজ সেজেছে অনেক দিন পর। নিশীথ বলেছে, মল্লিকা সত্যিই সুন্দর। গত বছর বিয়ের তারিখে কচি কলাপাতা রঙের ওপর সাদা জরির ফুল তোলা যে সাড়ীটা নিশীথ উপহার দিয়েছিল মল্লিকাকে সেটাই আজ ও পরেছে। নিশীথ বেশ খুসী হয়েছে। মল্লিকাকে না নিয়ে ও নিজেই পছন্দ করে এনেছিল সাড়ীখানা। কি সুন্দর মানিয়েছে ওকে। মল্লিকার আজ কাজের যেন শেষ নেই। প্রতিটি ঘর সুন্দর করে সাজিয়েছে। সখের তোলা পর্দাগুলো বার করেছে আজ। নিশিথের দুষ্টু দুষ্টু ওর চঞ্চল গতিকে আজ নিরন্তর অনুসরণ করছে। নিশীথ এক ফাঁকে বললে, "মল্লিকা, আজ তোমাকে ছেড়ে আমার একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না।"

মল্লিকা মিষ্টি করে তাকিয়ে একটু হাসলে। নিশীথের সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়। এত সুন্দর হাসতে জানে মল্লিকা।

অরন্তর আসবার সময় এগিয়ে আসছে। মল্লিকা চঞ্চল হয়ে উঠছে। কোথায় বসাবে অরন্তকে? কোন্ কথাটা বলবে প্রথমে? মল্লিকার হঠাৎ মনে হল বাড়ীটা নিস্তব্ধ। নিশীথ বোধহয় বেরিয়ে গেছে। অরন্ত আসবে—পাশে থাকবে ও একা—আবেশে চোখ বন্ধ করে মল্লিকা।

শোবার ঘরে মল্লিকা ঢুকে অবাক হয়ে যায়। নিশীথ বেরিয়ে যায় নি। ঘুমিয়ে আছে বিছানায়। বলেছিল জরুরী কাজ—বেরোতে হবে। এখনই ডেকে দিতে হয়। তা ছাড়া একটু পরেই যে অরন্ত আসবে। মল্লিকা ঠেলা দিয়ে ডেকে দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। নিশীথের মুখে কি অপূর্ব প্রশান্তি। কোন সন্দেহ, কোন কৌতূহলের চিহ্ন নেই ওর মুখে। মল্লিকাকে ও বিশ্বাস করে—গভীর বিশ্বাস।

অরন্তর আসার সময় হয়ে এল—এখন কি করবে সে? মল্লিকা আবার ডাকতে যায়।

না, ডাকতে পারলে না মল্লিকা—তোমাকে ছেড়ে আজ একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না মল্লিকা—কানের কাছে বাজতে থাকে কথাগুলো। গভীর প্রশান্তি আর বিশ্বাস নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশীথ।

ঘুমন্ত নিশীথের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা ভাবে, বেচারা নিশীথ—ঘুমোক ও। অরন্ত বলে না না, ডেকো না ডেকো না।

• • • •

অনেক রাত। নিশীথের ঘুম ভেঙে গেছে। মাথার কাছে মল্লিকা।

"ছি ছি, আমি বিশ্রি রকম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অরন্ত কোথায়? আসেনি?"

"না।"

আসবে না?

"না।"

"কেন কি হয়েছে?"

মল্লিকা শান্তভাবে উত্তর দিলে, "আমি বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম—আমরা বাড়ী নেই, বেরিয়ে গেছি।"

ঘুম জড়ানো চোখে নিশীথ শুধু মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

• • •

"তিনখানা মাটীর চিপি ও খানকতক কাঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তাহা আর পৃথিবীর কোথাও নাই।

একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটীর প্রদীপ, আর বেড়ীর তেল, এই উপাদান সহায়ে দিনরাত পণ্ডিত এদেশেই হয়। —বিবেকানন্দ

অবসরীক্ষণ

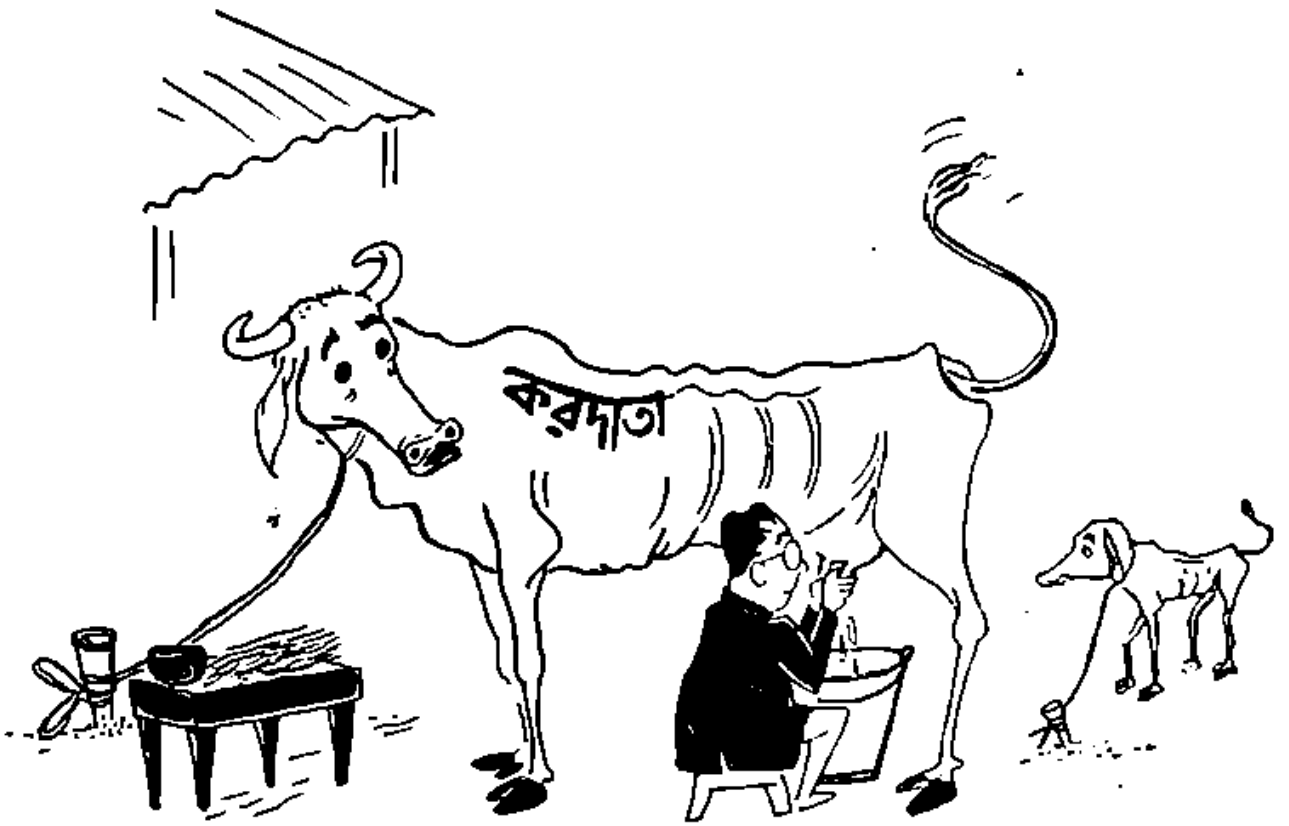

অগ্নীক্ষা

…তুমি বলছো "পেটভরে খেতেও পাইনা"
আর, আমার ঐ কচি ছেলে মেয়ে দুটি—ভাবলে বুক ফেটে যায়।
হায়, আমাদের সোনার বাংলার আজ এই অবস্থা ॥

ব্লুপ্রিন্ট
বিজ্ঞান
সরকার

অশান্ত পৃথিবী

এশিয়া

সলিলীরঞ্জন মিত্র

ভিয়েৎনাম :

আজকের পৃথিবীতে এশিয়া মহাদেশেই অশান্তির ঝড় বেশী করে বইছে। একদিন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এশিয়াকে বলপূর্বক শাসন করেছিল। কিন্তু আজ প্রায় সব দেশই স্বাধীন। তবুও নিস্তার নেই, আমেরিকান অর্থনৈতিক ও মিলিটারী সাহায্যের অক্টোপাস অনেক ছোট ছোট দেশকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে। ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের নামে যে হত্যালীলা চালাচ্ছে তা যে কোন সভ্যদেশের পক্ষে কলঙ্কজনক। ডাঁবেলার দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার মার্কিন বন্ধুকে সাহায্যের জন্যে ডেকেছিল ঠিকই কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের কি সমর্থন আছে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে? এমন কি আমেরিকাবাসীরা কি চায় তাদের সন্তানদের স্বদেশভূমিতে পাঠাতে? তবে কেন এই ধ্বংসলীলা? শুধুমাত্র প্রেঃ জনসনের জেদ মেটাবার জন্যে? পৃথিবীর কোন দেশই এই যুদ্ধকে সমর্থন করে না। ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। ইউরোপের জনমতের মার্কিন নীতির প্রতি সমর্থন নেই। অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় ১৫০০ সৈন্য ভিয়েৎনাম যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি সেখানেও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়েছে। গত ১৬ই মার্চ প্রায় দুহাজার লোকের এক মিছিল সিডনী শহরে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনিতে মেতে উঠে। তাদের শ্লোগান ছিল Make love not war.

বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী জনগণও ডাঁবেলার Ky সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্র আন্দোলন মার্কিন বিরোধী ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের Da Nang ও Hue শহরে Ky বিরোধী আন্দোলন বিশেষ দানা বেধে উঠেছে। সেখানকার বৌদ্ধসঙ্ঘ মিলিটারী শাসনের পরিবর্তে civil constitution চায়। বিদ্রোহী বৌদ্ধ নেতারা যুদ্ধের

অস্তুত প্রস্তুত ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী Ky-র শুভবুদ্ধি উদয় হয়েছে। তিনি গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করতে উৎসুক। বর্তমান ভিয়েৎনামী পরিস্থিতি থেকে এটাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, যুক্তরাষ্ট্রের বেয়নেটের বলে Air marshall Ky ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। জনগণের উপর তাঁর এতটুকুও প্রভাব নেই। এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামী অধিবাসীগণ তাদের দেশে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি পছন্দ করে না। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও ক্রমশ সেখানে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মার্কিন সরকার খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাদের নীতিরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার হয়তো Ky-কে পদচ্যুত করবার কথাও ভাবছে। কিন্তু এক তাঁবেদার সরকারের পরিবর্তে আর এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে কি এই সমস্যার সমাধান করা যাবে? Da Nang ও Hue শহরের ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে বর্তমান সরকার ও তাদের রক্ষক প্রেঃ জনসনের প্রতি ভিয়েৎনামীদের আর আস্থা নেই। ঘরে ও বাইরে ক্রমশ মার্কিন নীতির বিরোধিতা বিরাট আকার ধারণ করছে। এমতাবস্থায় N. L. F কে স্বীকার করে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই সমস্যার সমাধান করা ছাড়া কি অন্যপথ আছে?

ইন্দোনেশিয়া:

এশিয়ার অপর গুটিকা কেন্দ্র ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে চলেছে। গত মাসের শেষের দিকে বহু প্রতীক্ষিত নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে। যদিও এখনও ডঃ সুকর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রধান তবুও বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল সুহার্তোকেই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হয়। যে Nasation-এর পদচ্যুতি নিয়ে বিরাট আন্দোলন ঘটে গেল তিনিও পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। তাকে Crush Malaysia command-এর প্রধান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার যে পুরোপুরি দক্ষিণ পন্থী এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। জার্কাতার সমস্ত চীনা স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চীন থেকে পূর্বের মত প্রতিবাদ পত্রও এসেছে। মালয়েশিয়ার প্রতি তাদের নীতির কোন পরিবর্তন এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ভারতও বর্তমানে নতুন সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু জাকার্তা থেকে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন response পাওয়া যায়নি। কয়েকদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা পুনরায় U. N. O. তে যোগদান করবার কথা ভাবছেন। সুতরাং আশা করা যাচ্ছে যে, অশান্ত ইন্দোনেশিয়া এবার শান্তির নীতি অবলম্বন করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে।

সিরিয়া:

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর পর সিরিয়া বর্তমানে শান্ত। ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করে বাথপার্টির নতুন গ্রুপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। সিরিয়ার গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে বাথপার্টির আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও রেষারেষি। এই পার্টির একদল অন্যদলকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। ক্ষমতার লড়াই ছাড়াও আদর্শগত মতবিরোধও রয়েছে। একদল নাসের পন্থী অন্যদল নাসেরের শত্রু। পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী দলও রয়েছে এই পার্টির মধ্যে। ধর্মনৈতিক দলাদলিও এই রাজনৈতিক দলটিকে কিছুটা পঙ্গু করেছে।

বর্তমানে নাসের বিরোধী ধ্বনি খুব বেশী শোনা যাচ্ছে না। সুতরাং আশা করা যায়, প্রেসিডেন্ট নাসেরের চেষ্টায় হয়তো এই আরব দেশে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে।

পিণ্ডি-পিকিং ঔাঁতাত :

ইন্দোনেশিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশে পিকিং সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা লাভ করবার পর সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রতি তারা বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছে। চীনা রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তান পরিদর্শন ঐ সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাকিস্তান সরকারও তাসখন্দ চুক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে চীনাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। চীনা ও পাকিস্তানী রাষ্ট্র-নেতাদের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে এই উপমহাদেশে পুনরায় যুদ্ধাগ্নি জ্বালাবার চেষ্টা চলছে। এমতাবস্থায় এই উপমহাদেশে শান্তি যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের অগ্রণী হওয়া উচিত, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন তাসখন্দ চুক্তির সাক্ষী তখন তাদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব কিছু কম নয়।

* * *

পাহাড়ের উপরে ভেড়ার পাল চরছে। গাছের ছায়ায় বসে খেলা করছে দু'টি ছোট ছেলে। হঠাৎ একটা কুকুর দাঁ দাঁ ক'রে ওদের দিকে তেড়ে এলো; তার মুখ থেকে ফেণার মতো অবিরাম লালা ঝরছে। ছেলেরা বুঝতে পারলে কুকুরটা পাগল। তারা সবাই দৌড়ুতে লাগলো। ওদের মধ্যে আবার জুপিলের বয়েস সবার চাইতে বেশি। ছোটদের রক্ষা করার জন্য সে ছুটতে লাগলো সবার পিছে। কুকুরটা তাকে ধ'রে ফেললো। জুপিলও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। মার খেয়ে কুকুরটা পালালো বটে কিন্তু জুপিলের নরম শরীরে রেখে গেলো ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন। তাকে ধরাধরি ক'রে বাড়িতে আনার পর সেই ঘাগুলি দেখে মা-বাবা দু'জনেই চুকরে কেঁদে উঠলেন। জলাতঙ্ক রোগে ছেলে নির্ঘাত মারা যাবে। গ্রামের মোড়ল বললো: "অত ভয়ের কী আছে। প্যারিসে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন। সম্প্রতি জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কাছে ছেলেকে নিয়ে যাও।" জুপিলকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো; সে আরোগ্যও লাভ করলো। ওই অভিনব চিকিৎসা প্রণালী যার জন্য জুপিল বেঁচে গিয়েছিল তার আবিষ্কারক হল লুই পাস্তুর।

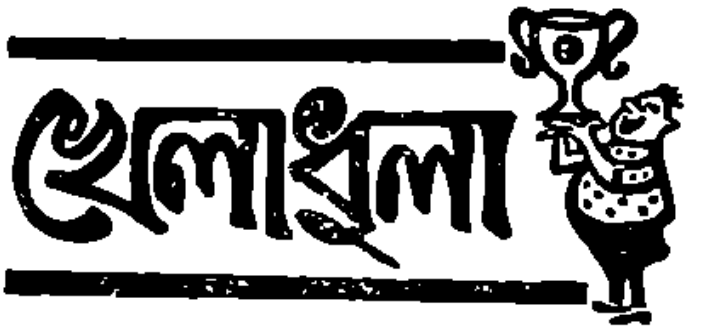

প্রথম ভারতীয় সাঁতারু শ্রীমিহির সেনের দুর্গম পক প্রণালী অতিক্রম

আন্তর্জাতিক মুরপাল্লার সাঁতারের এক নূতন ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি

কটক র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর এবং লণ্ডনে যাবার পূর্বে পর্যন্তও সাঁতার জানতেন না। তবু, ভারতীয় সাঁতারুদের মধ্যে শ্রীমিহির সেন ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী পাক আর বিরাক সানুদ্রিক সর্পসঙ্কুল ২২ মাইল দীর্ঘ জলপথ পক প্রণালী অতিক্রম ক'রে (৫ই এপ্রিল) ক্রীড়াজগতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করলেন। শ্রীসেন ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন। পক প্রণালী অতিক্রম করার ফলে তাঁর এখন দুটি বিজয়-মুকুট।

জলপথটি ২২ মাইল হলে কী হবে! স্রোতের টানে শ্রীসেনকে পথ অতিক্রম করতে হয় ৩০ মাইলেরও বেশি। উত্তর সিংহলের তালাই বাত্তারের কাছাকাছি পুরনো যে বাতিঘর তার সংলগ্ন জায়গা থেকে ৫ই এপ্রিল ভোর রাতে ৫-৩০ মিনিটে শ্রীসেন সাঁতার শুরু করেন। ২৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের পর ৬ই এপ্রিল সকাল ৭টা ১৬ মিনিটের সময় ধনুষ্কোটিতে ভারতের মাটিতে তিনি উঠে দাঁড়ান।

ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের জলরাশি পক প্রণালীতে এসে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রের জল ওখানে সদা বিক্ষুব্ধ। উত্তাল তরঙ্গমালা দীর্ঘ বাইশ মাইল পথ আরো দুর্গম ক'রে তুলেছে। তাছাড়া পূর্ণিমার দিনে সাঁতার শুরু করায় শ্রীসেনকে প্রবল জোয়ারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

জলে নামবার আগে নৌ-বাহিনীর একজন চিকিৎসক ও শ্রীমতী বেলা সেন (সহধর্মিনী) শ্রীসেনের সমস্ত গায়ে তেলসিলন লাগিয়ে দেন। নৌ-রক্ষী দলের কম্যাণ্ডার লেঃ শর্মা শ্রীসেনের কোমরে একটি ছোরা এবং হাতের তাড়ানো ওষুধের থলি আটকে দেন।

২৬ বছর বয়স ব্যারিষ্টার শ্রীসেন সাঁতার শুরু করলে সমবেত দর্শকগণ হর্ষধ্বনি ক'রে তাঁকে উৎসাহিত করেন। যাত্রাশুরু ঘোষণা করা হয় আকাশে তারাবাজী ছুঁড়ে। রাত্রিশেষের পূর্ণ অথচ পাণ্ডুর চাঁদ তখন অস্ত যাচ্ছিল। অস্তগামী চাঁদের ক্ষীণ আলো ভোরের আলো-আঁধারকে আরো মোহনীয় ক'রে তুলেছিল।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তিনটি জাহাজ সুবন্ধা, সাহেদ ও কৃষ্ণন শ্রীসেনের যাত্রাপথে প্রহরীর কাজ করে। একটানা সাঁতারের একঘেয়েমি দূর করার জন্য চারজন ডেলে পানা ক'রে শ্রীসেনের পাশে পাশে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে। আর তাঁর আগে আগে যেছে ছখানা নৌকো। সে-গুলিতে ছিলেন চিকিৎসক এবং অন্যান্য সহকারী কর্মচারিগণ। শ্রীসেনের স্ত্রী মোটর বোট ক'রে শ্রীসেনের পিছনে পিছনে ছিলেন এবং স্বামীকে উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন।

প্রথম পাঁচ ঘণ্টায় শ্রীসেন ৬ মাইল পথ অতিক্রম করেন। প্রবল স্রোতের জন্য পরে তাঁকে ডিং সাঁতার কেটে এগুতে হয়। ২৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট সাঁতারের পর তিনি ধনুষ্কোটিতে ভারতের মাটিতে পৌঁছান। সঙ্গে-সঙ্গে রামেশ্বরম দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ বংশীধ্বনি ও শঙ্খনাদের দ্বারা তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানান এবং তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দেবার আগে শ্রীসেনের

বাংলার দুই বীর সন্তান—মিহির সেন
ও এভারেস্ট বিজয়ী সুব্রত মুখার্জী

বিপদ দেখা দিয়েছিল। একটা বিষাক্ত সাপ তাঁকে তাড়া করেছিল। সেঃ মাইল গুলি ক'রে সাপটিকে মেরে ফেলেন। শ্রীসেনকে বাঁচাতে গিয়ে সেঃ মাইলের গা মাছের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।

অজেয়কে জয় করার সঙ্কল্প নিয়ে পৃথিবীর যে-সব দুঃসাহসী অভিযাত্রী জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন তাঁদের ইতিহাসে মিহির সেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ভারতীয় যুবকদের উদ্দেশে শ্রীমিহির সেন

পক প্রণালীর কনকনে ঠাণ্ডা জলে সাঁতার শুরু করার আগে "আকাশবাণীর" উদ্দেশে প্রেরিত এক বার্তায় মিহির সেন বলেন :

"ভারতের যুবকদের মনে নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলবার জন্য আমি এই বিপদ-সঙ্কুল কাজে ব্রতী হয়েছি। পক প্রণালী সাঁতারের পথে আমার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু আমার যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস পড়বে, ততক্ষণ এই সাঁতারে বিরত হবো না।"

• • •

শ্রীসেনের প্রতি রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন

"পক প্রণালী সাঁতারে অতিক্রম করায় আপনার প্রশংসনীয় সাফল্য, দক্ষতা, সাহস ও বিপুল মনঃসহিষ্ণুতার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

• • •

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাণী

"ভারতের যুবকদের মধ্যে দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে যাবার জন্য যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, শ্রীসেনের পক প্রণালী অতিক্রম তারই একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত।"

• • •

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার বার্তা

"আন্তর্জাতিক সাঁতারের ক্ষেত্রে ভারত পুরোভাগে এগিয়ে গিয়েছে।"

• • •

এয়ার চীফ মার্শাল ও ভারতীয় সন্তরণ সংঘের সভাপতি শ্রীঅর্জন সিংয়ের অভিনন্দন বাণী

"আন্তর্জাতিক দূর পাল্লার সাঁতারে আপনি নিঃসন্দেহে গৌরবজনক স্থান অধিকার করেছেন।"

• • •

শ্রীমিহির সেনের বৃদ্ধা মাতা

"মিহিরের এই সাফল্যে আমি গর্বিত। মিহির যখন পকপ্রণালী সাঁতারে পার হবার জন্য আমার অনুমতি চাইতে এসেছিল, তখন আমি তাকে আশীর্বাদ করে তার সাফল্য কামনা করেছিলাম। সমস্তকাল দারুণ উদ্বেগের মধ্যে আমি সারারাত জেগে কাটিয়েছি। আর ভগবানের কাছে আমার ছেলের সাফল্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছি।"

• • •

মিহির সেনের পিতা ডঃ সেন সাংবাদিকদের বলেন, "পক প্রণালী অতিক্রম নৌবাহিনীর প্রধান এবং মাদ্রাজ সরকারের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য মিহির এই সাফল্য অর্জন করেছে।"

ডঃ সেন আরও বলেন, "মিহির কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। সন্তরণ যাবার আগে পর্যন্ত মিহির সাঁতার জানত না।"

শেষ মুহূর্ত

একাদশ মহারথীর শেষ রথী

নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায়

"শূন্যের সব অটল স্থির
দুর্গরক্ষী ছিল সে সুধীর।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়েছে, বাঙালীর জীবনে নতুন চেতনা এসেছে, জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন মন্ত্রে বাঙালী দীক্ষা লাভ করেছে, এমন সময় এল ১৯১১ সালের সেই ঐতিহাসিক দিন—২৯শে জুলাই। বাঙালী আর এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল সেদিন।

দুর্বল ভীরু সময় বিমুখ বাঙালী সেদিন তার মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যকে প্রতিষ্ঠিত করল আর এক ক্ষেত্রে —ইংরাজদের কেল্লার পাদদেশে ইংরাজদের খেলার মাঠে। একাদশ বাঙালী মহারথী কদিন ধরে পর পর ৪৪ জন শ্বেতাঙ্গরথীর সঙ্গে লড়াই করে শেষ প্রতিযোগী দুর্ধর্ষ মারমুখো সোয়াদলকে হারিয়ে আই. এফ. এ. শিল্ড বিজয়ী হল।

ইংরেজ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে তাদের এই জাতীয় খেলায়, যে খেলা তারা এদেশের লোককে শিখিয়েছে, কোনো ভারতীয় দল তাদের সবাইকে হারিয়ে শীল্ড জিততে পারবে। এ ছিল তাদের কাছে কল্পনাতীত। এ হল তাদের এক জাতীয় পরাজয়। তাই সেদিন যখন সেই অসম্ভব ব্যাপার ঘটল তখন বহু ইংরেজ মাথার চুল ছিঁড়েছিল, বহু ইংরেজ রমণী খেলার শেষে উত্তেজনায় দাঁত দিয়ে তাদের বসন ছিঁড়েছিল।

হোটেলে-হোটেলে ইংরাজ অধিবাসীদের ঘরে সেদিন যেন শোকের ছায়া নেমেছিল।

আর এদিকে মোহনবাগানের সেই জয় জাতীয় জীবনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা নেই।

খেলার মাঠে যে ইংরেজকে আমরা হারিয়ে দিয়েছি এবার দেশের মাঠ থেকেও তাদের হারিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারব, এই দুর্জয় সংকল্প সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল—সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করেছে।

সেদিনকার সেই যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খেলার শেষে মোহনবাগানের অন্যতম খেলোয়াড় সুধীর চট্টোপাধ্যায়-কে আলিঙ্গন করে, কেল্লার দিকে আঙুল বাড়িয়ে, যেখানে 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়ছিল সেদিকে নির্দেশ করে বলেছিলেন, আজকে জিতে ওদের মাটিতে শুইয়ে দিয়েছো, ওখানকার ওটা কবে নামাতে পারবে,—তাঁর সেই কথাগুলো তাঁর একার কথা নয়, সেদিনকার সমগ্র বাংলাদেশের হৃদয়ের কথা।

সেদিনকার সে খেলা তো শুধু খেলা ছিল না। সে যেন মরণপণ লড়াই—দাসত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার লড়াই, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের যুদ্ধ, স্বাধীনতা-যুদ্ধের সে যেন এক মহা অধ্যায়।

তাই সেদিন সেই খেলা জেতার পর লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ যুবা আনন্দে দিশেহারা হয়েছিল, ঘরে ঘরে শাঁখ বেজেছিল, সুদূরস্থীরা পর্যন্ত আনন্দে আবেগে নিজের নিজের বাড়ীতে আনন্দ উৎসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, হপ্তাখানেক কীটন স্ট্রিটে ঢেলে (তখনো মোটরগাড়ির তেমন চলন হয়নি) মোহনবাগানের একাদশ মহারথীর যখন মাঠ থেকে তাঁদের আস্তানা বলরাম ঘোষের গলি অভিমুখে রওনা হলেন, তখন আনন্দরত জনতা গাড়িগুলির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা সারা পথ সেই গাড়িগুলি টেনে এনেছিল, একাদশ মহারথীর পদধূলিতে সারা রাত কলকাতার গলীগুলি মুখরিত হয়েছিল।

সেই একাদশ মহারথীর শেষ রথী, সেই সময়ের অসীম দুর্গরক্ষী সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লক্ষ্যীর্থদের কাছে চলে গেলেন গত ২৯শে চৈত্র।

পরিণত বয়সে তিনি পরলোকগমন করেছেন তাই আমরা শোক করব না। আমরা তাঁর কীর্তি স্মরণ করব, শ্রদ্ধা জানাব, এবং সেই সঙ্গে তর্পণ করব আর যাঁরা তাঁর যোদ্ধার সঙ্গী হয়ে সেদিন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব সেই এগারোটি নাম—

শীতলাল মুখোপাধ্যায় (খোল); সুকুল ও সুধীর চট্টোপাধ্যায় (ব্যাক); নীলমাধব ভট্টাচার্য, রাজেন সেনগুপ্ত ও মনমোহন মুখোপাধ্যায় (হাফ ব্যাক); যামিনী (কাজু) রায়, রাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী (ফরওয়ার্ড)।

সেই একাদশ মহারথীর মধ্যে সুধীরচন্দ্র ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব!

তিনি ছিলেন ক্রিশ্চান। তাই কালীঘাটের প্রসাদীফুল তিনি পকেটে রাখতে পারেন নি বটে, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনায় তাঁর কখনো ছেদ ছিল না।

পোষাক-পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় তাঁর মধ্যে সব সময়ে ফুটে উঠত একটি মার্জিত চকচকে ঝকঝকে রুচির পরিচয়। বুট জোড়া সব সময়ে পালিশ করা, জামাকাপড় সব সময় ধোপদুরস্ত, ছিমছাম ফিটফাট চেহারা। তাঁকে সবাই বলত স্টাইলিশ লেফট ব্যাক।

১৮৮১-১৯৯ সনের তাঁর জন্ম! ফুটবল খেলায় তাঁর আত্মনিয়োগ সম্পর্কে তিনি নিজে যে কথা বলে গেছেন তারই উদ্ধৃতি নীচে দিলাম :—

"ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড় হিসাবে খেলিতাম ভবানীপুরের ময়দানে। আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন হিন্দুস্তান স্ট্যানডার্ড পত্রিকার প্রাক্তন স্পোরটস এডিটর শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর দাদা শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী, যিনি ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বেঙ্গলী ও স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক। সেটা ১৯০১-৮ সনের কথা। ট্রেডস কাপে ন্যাশনালের

সেকট র‍্যাঙ্কে খেলার জন্য আমরা দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী। রায়পুরের সিংহ পরিবারের অরুণ সিংহ অর্থাৎ পরে লর্ড সিংহ এবং আমি। আমি ট্রেডস কাপে চান্স পেলাম না বলে রেগে মেগেই স্কাশনাল ছেড়ে দিলাম। তারপর নাটোরের রাজবাড়িতে বিজয়দাস ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা এবং তাঁরই অনুরোধে মোহনবাগানে আমার যোগদান।"

"মোহনবাগানের বন্ধুরা আমার নাম রাখল 'লাকি' চ্যাটার্জি। কারণ, আমার যোগদানের আগে মোহনবাগান কোনদিন কাপ জয় করেনি। যোগদানের পর ১৯০৯ থেকে পরপর তিন বছর ট্রেডস কাপ জয়। ১৯১১ সালে লর্ড হিনটো কাপ জয়ের পর আমার একটি সুখবর, আমি এম এ পাশ করেছি।"

১৯১১ সালে আমরা প্রথম আই এফ এ শীল্ডে যোগ দিয়ে কিছুই করতে পারিনি। ১৯১০ এ চতুর্থ রাউন্ডে পরাজয়। তারপর ১৯১১ সাল। যার কথা কারোই অজানা নেই। ২৯ জুলাই শীল্ড ফাইন্যাল খেলার দিন দেশশুদ্ধ মানুষের প্রার্থনার জন্যই বোধ করি রোদ ঝলমল আকাশ। বিজয়দাস ভাদুড়ী কালীপুজোর প্রসাদী ফুল বেলপাতা নিয়ে এসে বলল, পকেটে রেখে দে। কিন্তু যেহেতু আমি খৃষ্টান, তাই তা আমি পকেটে রাখতে পারিনি। কিন্তু আমিও প্রার্থনা করে এসেছিলাম। তার ফলও পেয়েছিলাম। বিরতির সময় ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতেছিলাম। খেলার মাঠ থেকে ইউনিফরম গায়ে তাঁবুতে ফিরছি এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন এক ব্রাহ্মণ। তার গলায় পৈতে ঝোলানো, আবক্ষ লম্বিত পাকা দাড়ি। বললেন যা করেছ, তার জন্য দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছি বাবা। কিন্তু এটা তো হল। ওটা হবে কবে। বলেই কোয়ার্ট উইলিয়াম দুর্গের উপর পর পর কয়েক ঘুড়া ইউনিয়ন জ্যাকের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। অর্থাৎ আমাদের জয়ের পর ঐ ব্রাহ্মণ ব্রিটিশ শাসন অবসানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে ঘটনা কোনদিন ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না শীল্ড জয়ের পর নাটোর রাজবাড়িতে ডি. এল রায়ের উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি। ১৯১২ সাল থেকেই আমার ফুটবল জীবনের উপর যবনিকা।"

খৃষ্ট ধর্মের উপাসক শ্রীচ্যাটার্জি প্রথম জীবন থেকেই আদর্শ শিক্ষাব্রতী। মোহন বাগানে খেলার সময় থেকেই তিনি এল. এম. এস কলেজের অধ্যাপক। পরে বেহালায় যে ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। উত্তর ভারত ইউনাইটেড চার্চের জেনারেল এসেম্বলির মডারেটর রাইট রেভারেন্ড চ্যাটার্জি বহু শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতি এবং ফটিশ চার্চ কলেজের পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যানও ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসাপী এবং আদর্শবাদী। ইংরেজীতে 'গুড ক্রিশ্চিয়ান' বলে যে কথাটি আছে, রাইট রেভারেন্ড চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য।

———

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক
২১৯ বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অতীতের এক প্রত্যুষে সহসা। সদম্ভ রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মাদ্রোমাত্র রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় ভগ্ন প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, সসম্ভ্রম, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু···।' ধর্ম ও তরবারি নিয়ে সত্বরই রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলগান উচ্চারণ কর, এবার আর শব্দ পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে মৃতদেহের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে মেশে উঠল বাতাস··· লেলিহান হল চিতার আগুন···

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও জীবন্তকথা শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভ্রমণ ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-101 A BEN

ডঃ সুকুমার সেনের

নট নাট্য নাটক ৪॥

বিখ্যাত অধ্যাপকের সাধনালব্ধ পুস্তক

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের

তিন শতকের কলকাতা ৬৲

তিন শতাব্দী ধরিয়া কলিকাতার জীবন—তাহার নানা বিচিত্র কাহিনী

শম্ভু মহারাজের

হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী

গহন গিরি কন্দরে ৬৲

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

অবধূতের সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ এই সুবৃহৎ ভ্রমণ-কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলীর ২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা সহ

প্রবোধকুমার সান্যালের

নবতম হিমালয় ভ্রমণ

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

আশাপূর্ণা দেবীর

রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

শৈলজানন্দের

শ্রীমান শ্রীমতী ৭৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

সংস্কৃতি সিরিজ

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির তথা বাঙলার মন্দিরগুলির তথ্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। আর্ট প্লেটে ৬৭টি ছবি। [১৫·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তর এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত বিষয়ের মর্মকথার প্রাঞ্জল পরিবেশন। [৭·৫০]

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকবির জীবনবেদের সরল ব্যাখ্যা। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। [২·৫০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ সম্বলিত ও সম্পাদিত। পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম আকর-গ্রন্থ।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

পরিবারের সবাই খুশী

যেসব গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার রক্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুন্দর, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৩৮

অধ্যক্ষ ডাঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস মোঃ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম.বি.এস. (ঢাকা), এম.সি. এস.(আমেরিকা), ঢাকাস্থ সাধনার ঔষধালয় পরিচালনা করিতেছেন।

কলিকাতা কেন্দ্রে ডাঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস মোঃ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

Cover printed by—
GARTECH ART PRESS, CALCUTTA-12

Regd. No. C3643

1 JUL 1968

একটি সুপরিচিত নাম

লক্ষ্মী ঘি

এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
বৈশাখ ১৩৭৩, MAY 1966

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথ" [সচিত্র], রবীন্দ্রনাথ ও "শিল্পাচার্য্য নন্দলাল (সচিত্র)। "আমার সোনার বাংলা", [সচিত্র], ১৯১১ সালের মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের অপূর্ব, হৃদ্রাপ্য, পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ; সিনেমার আউটডোর স্যুটিং পর্য্যায়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বিচিত্র কাহিনী, গুপ্তচর কাহিনী, এ ছাড়া নতুন নতুন ফীচার, রসরচনা, গল্প, কার্টুন ও অফুরন্ত চিত্র।

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
[illegible]

পরিবারের প্রত্যেকের প্রিয় দৈনিক

যুগান্তর

নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে যুগান্তর অনন্য। বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন এই দৈনিকটিকে সব শ্রেণীর পাঠকের কাছে এক পরিবারে বিশেষ সমাদৃত।

পরিবারের প্রত্যেকের প্রিয় সাপ্তাহিক

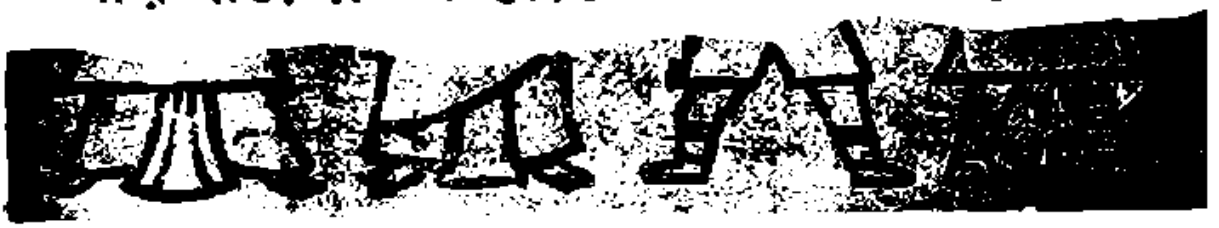

অমৃত

সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, প্রশ্ন ও চলচ্চিত্র সম্বলিত এই ঝরঝরে তাজা সাপ্তাহিকটি সকলেই পড়তে ভালোবাসেন বলে এর প্রচারসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

PROJU-AM/19

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার নং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-৪৯

GJ-1 65 BEN

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড (১৮৯৪-৯৬) দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬-৯৭)

মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে
হলে এই রচনাবলী অপরিহার্য। মূল রচনার সহজ
সরল সুন্দর বঙ্গানুবাদ।

প্রতি খণ্ড : পাঁচ টাকা

বাংলার উৎসব

শ্রীতারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী

১·২৫

বাংলার শিকার প্রাণী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

৩·০০

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য

রচনা : নৃত্যবিদ শ্রীমণি বর্ধন

বাংলার লোক সঙ্গীত ও লোকনৃত্য সম্পর্কে এ ধরণের গবেষণামূলক
বই আগে কখনও বের হয়নি।

মূল্য—২·৯০

স্থানীয় বিক্রয় কেন্দ্র
প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও
মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা
প্রকাশন শাখা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

W. B. (I & P. R.) AD D(918/66

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই দুর্ভাগ্যের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য···

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের একটুখানি থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৯৮৯

টেলিফোনে—অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় ১০১৩

গুপ্তচর কাহিনী—

নিষিদ্ধ শহর ভুতুড়ে শহর—গৌরীশংকর দে ১০১৯

সাতশো বছর পরে সুবিচার—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ ১০২২

আধুনিক পশুশালার জনক কার্ল হেগেনবেক—গৌরীশংকর দে ১০২৫

পুরাতন পাতা ১০২৮

বিশ্বসাহিত্য

একটি পৃথিবীর মৃত্যু—মূল : হিলডেগিমার : অনুবাদ—সুপর্ণ রায় ১০৩০

রূপসী কন্যার কথা...

রূপকথার রূপসী কন্যার সৌন্দর্য প্রচারিত হয়েছে 'মেঘবরণ চুল'-এর বর্ণনায়। সকল যুগেই রূপচর্চায় কেশ-পরিচর্যা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চুলের ঘনত্ব, মসৃণতা ও উজ্জ্বল রং বজায় রাখতে ভেষজ গুণসম্পন্ন, সুবাসিত হিমানীর হিমদার তেলের উপযোগিতা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীকৃত।

হিমদার আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

সাহিত্য সাহিত্যিক—

কার হাতে দীপ কে জ্বালে—নীলাদ্রি সেন ১০৩৫

মেয়ে মজলিশ—

এসো এসো হে বৈশাখ—আভা পাকড়াশী ১০৩৬

শুনুন, একটা অভিনব খাদ্যের কথা বলি সুরঞ্জনা সেন ১০৩৮

সুন্দর স্বাস্থ্যলাভের জন্য মাত্র ৫ মিনিট সময় দিন—রেবা রায় ১০৩৯

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ১০৪১

অশান্ত পৃথিবী—নলিনীরঞ্জন মিত্র ১০৪৭

পাঠক পাঠিকার কলম ১০৫০

খেলাধূলা ১০৫৩

আউট ডোর শ্যুটিং-এর সূত্রপাত—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১০৫৬

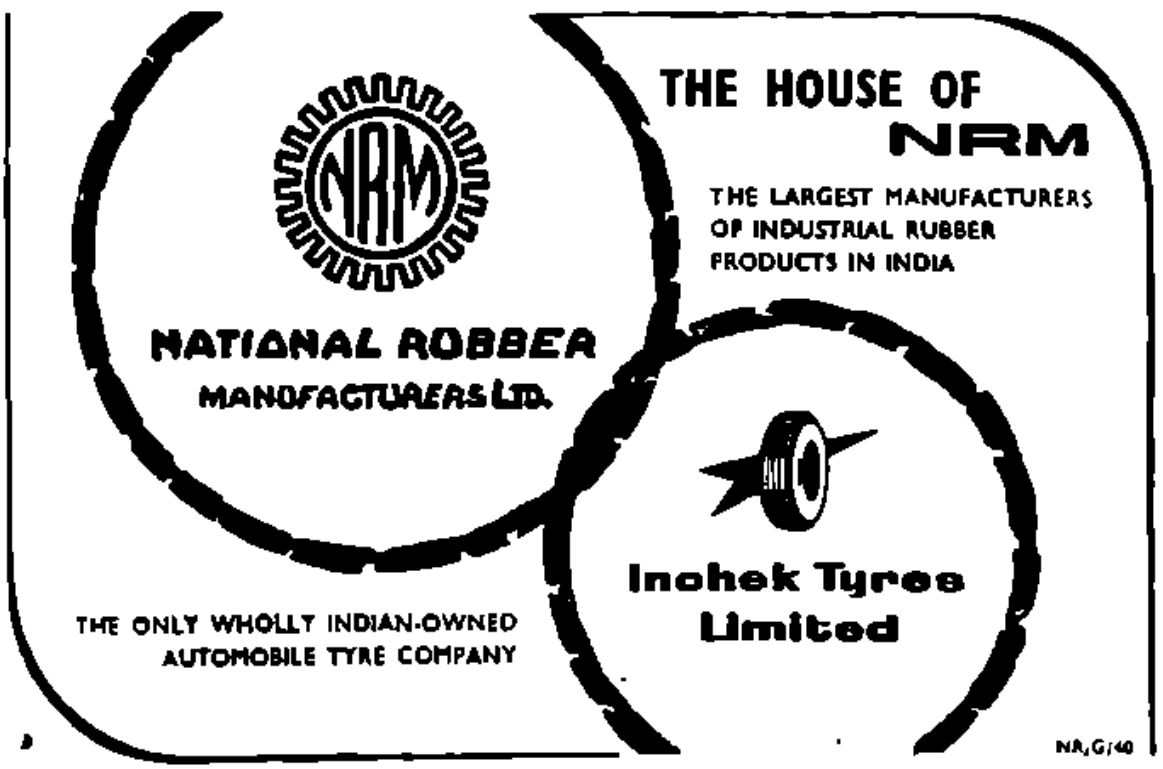

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধ মহাভৃঙ্গরাজ

কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও সত্বরই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া ১০৬০

অন্তরীক্ষে (কার্টুন) ১০৬৪

রবীন্দ্রনাথ (সংযোজন)

পুরানো স্মৃতি টুকরো : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১০৬৯

মহামানবের সান্নিধ্যে—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭৮

বিচিত্রা ও রবীন্দ্রনাথ—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৭৬

ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৮০

রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য নন্দলাল—

নন্দলাল—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮৬

আমার সোনার বাংলা (সচিত্র)

[প্রচ্ছদপট বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড-এর সৌজন্যে]

আপনার স্বামী কি তাঁর ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিয়েছেন ?

ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের মতো কয়েকটি ব্যক্তিগত খরচপত্র হিসেব করে ঠিক সময় দেওয়া আপনার স্বামীর মতো ব্যস্ত লোকের পক্ষে সত্যই বিরক্তিকর। আপনি কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার স্বামীকে সাহায্য করতে পারেন। আজই ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিওতে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলুন— আপনার নির্দেশমত ব্যাঙ্ক ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, বাড়ী ভাড়া, স্কুলের মাইনে বা এই ধরণের সব খরচগুলি ঠিক সময় যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে।

এই ভাবে ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও গৃহিণীদের সাহায্য করে তাঁদের স্বামীদের সাহায্য করতে। এই পুরাতন ও অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কটি গৃহিণীদের আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর সব রকম সুযোগ সুবিধা এনে দিচ্ছে। এই ব্যাঙ্কের মহিলা সহকারীরা চিরন্তন জাপানী রীতিতে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে সব সময় প্রস্তুত।

ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও আপনার সকল সুবিধা করে।

দি ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও

(সী মি ত দা য় ব দ্ধ জা পা নে স মি তি য় ৬ .
২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১ • ফোন : ২২-৩৯২১-২৪

KALPANA 3 11

আপনার
চাই
কাগজ-
আজ
এবং
আগামীকাল

একটা দিনের তরেও কাগজ ছাড়া ! ভাবতে পারেন ? ... না !

ইস্কুলের ছোট্ট ছেলে, মা, বাবা, শিক্ষক, গবেষণা-কর্মী,
দেশনেতা, ইঞ্জিনীয়ার—সকলেরই কাগজের দরকার।
তাছাড়া শিল্পদ্রব্যের প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্যে
কাগজের নিত্য নতুন কত কী প্রয়োজন।

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ খরিদ্দারদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে—
সবচেয়ে পাতলা কাগজ থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে পুরু বোর্ড
পর্যন্ত—বহু বিচিত্র ধরনের কাগজ আর বোর্ড তৈরি ক'রে থাকে।

ROHTAS

রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ডালমিয়ানগর (বিহার)

ডঃ সুকুমার সেনের

নট নাট্য নাটক ৪॥

বিখ্যাত অধ্যাপকের সাধনালব্ধ পুস্তক

শকুল চট্টোপাধ্যায়ের

তিন শতকের কলকাতা ৬৲

তিন শতাব্দী ধরিয়া কলিকাতার জীবন—তাহার নানা বিচিত্র কাহিনী

শম্ভু মহারাজের

হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী

গহন গিরি কন্দরে ৬৲

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

অবধূতের সমস্ত কীর্তির চেয়ে বৃহৎ এই সুবৃহৎ ভ্রমণ-কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলীর ২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা সহ

প্রবোধকুমার সান্যালের

নবতম হিমালয় ভ্রমণ

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

আশাপূর্ণা দেবীর

রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

শৈলজানন্দের

শ্রীমান শ্রীমতী ৭৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কয়েকটি বহু প্রশংসিত বই

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩·৭৫

আগুনের পরশ মণি (উপন্যাস) ... ৩·০০

পূর্বাশার (ছোট গল্প) ... ... ২·৫০

বিয়োগান্ত (ছোট গল্প) ... ... ২·৫০

যে মহাজীবন (মনীষীদের জীবনের গল্প) ... ৩·০০

নবরূপ রূপে (রহস্য কাহিনী) ... ৩·৫০

বীরবল রঙ্গ (কৌতুক কাহিনী) ... ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য কাহিনী) ... ২·৫০

তারকার দুষ্কৃত : কালরাত্রি (রহস্য কাহিনী) ২·০০

মায়াজাল : মরণাভিসার (") ২·০০

গুপ্তসর্প (নাটক) ... ... ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের : **মায়াবসান** (নাটক) ২·৫০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

: যন্ত্রস্থ :

চিরঞ্জীবিষু (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)

রহস্য পঞ্চক (পাঁচটি রহস্য উপন্যাসের ওমনিবাস)

লাশ চালা (রহস্য কাহিনী)

কোম্পানী আমলের কাহিনী (পুরনো কলকাতার স্মৃতিকথা)

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের **রাণা প্রতাপ** (নাটক)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে। যে-কোন বাংলা বই-এর জন্য পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আমাদের ফ্রী সার্ভিস বিভাগ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :

২১৯, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-৬

হাওয়ায় হাওয়ায় চলা

যেন মুক্ত হাওয়ায় পা ফেলে চলা। অবাধে চলা হাজার পথে।
চলার পথে তৃপ্তির ছোঁয়া আনতেই
তিনটি আপনি খুঁজে হবেন। পরাতে সাজতে পারবেন একের
বৈচিত্র্যে ভরা। এমন আরামদায়ক উপকরণে নির্মাণশৈলী আর ছোঁয়াচী
নকশায় সবাইকে খুশি ও তাক লাগাতে পারে। ফটোগুলোর মতোই বৈচিত্র্যে
একের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যে। যাতে সাজতাল পথে দিয়ে
আপনি হতে চান চলনে। পথ হাঁটা যাবে। নতুনের
মতো দীর্ঘদিন এর চিক থাকবার মেয়াদ।

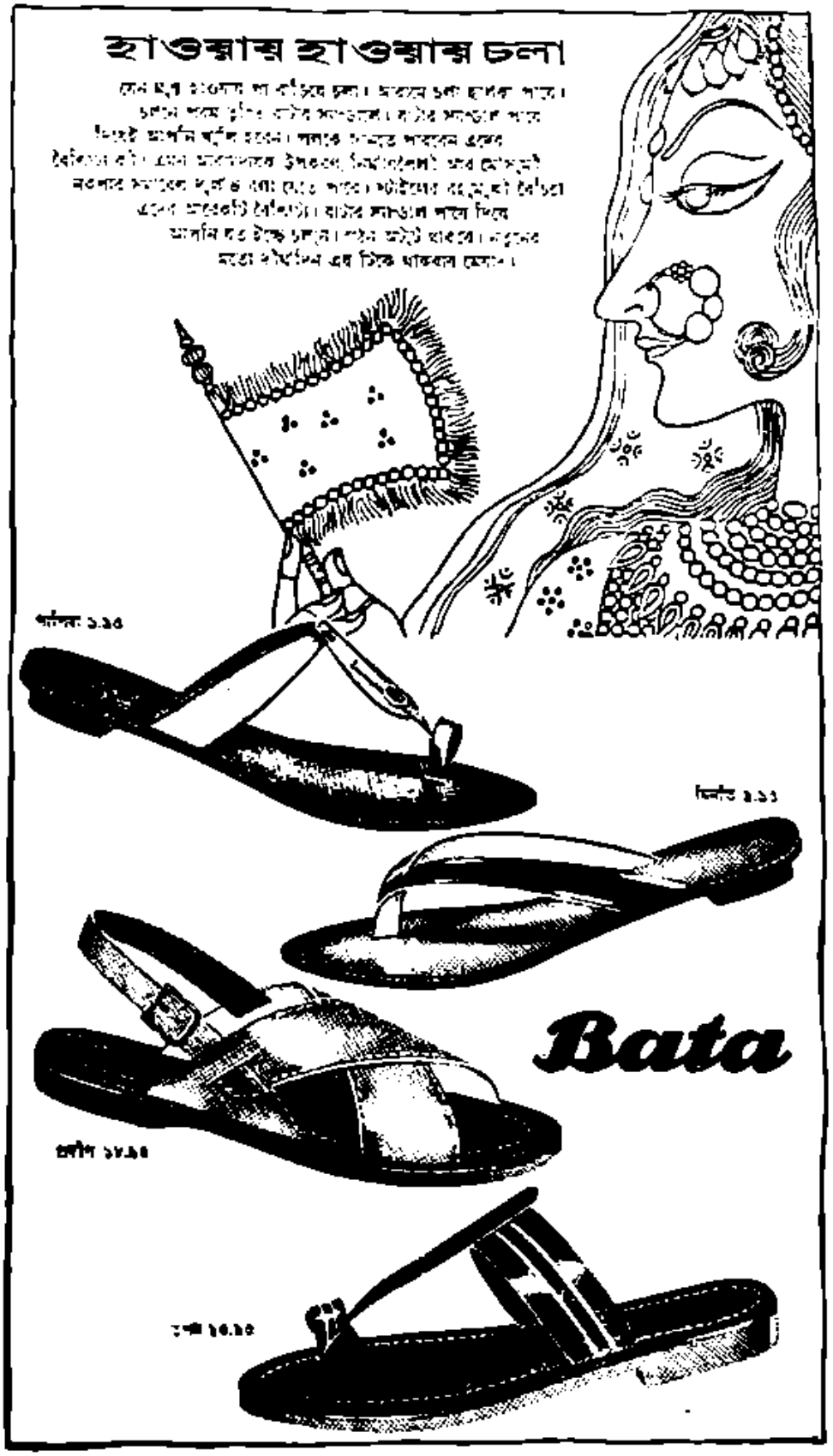

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

মাথাধরা, বাথা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এনসিড। এনসিড এটি কার্যকরী ঔষধের মিশ্রণে তৈরী যা মাথার উপশম দেয়, অস্বস্তাব কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এনসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান – সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

হাতের কাছে রাখুন

■ এনসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাক্রিমেণ্ট

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

SO BRIGHT, SO WHITE!

It is a real pleasure to wear clean and white clothes. Always wash your clothes with CHANDNI Washing Soap and feel the difference

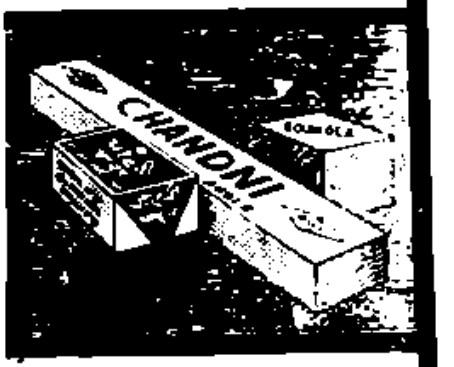

CHANDNI

Washing Soap

BERAR OIL INDUSTRIES,
Akola - Maharastra

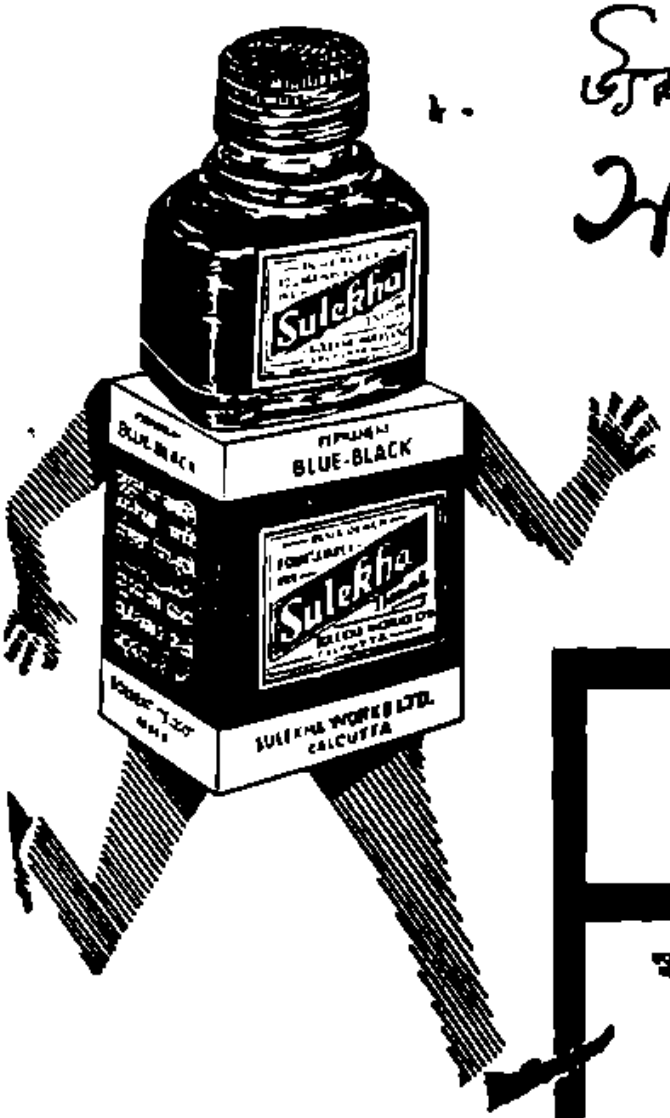

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি, এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭১২ এম.এল. সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

- প্রতি বছর মোট এপ্রিলে ৪% করমুক্ত সুদ জমা হয়।
- একক হিসেবে ২৫০০০ টাকা এবং যুগ্ম হিসেবে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখা যায়।
- যতবার খুশি, যত টাকা ইচ্ছা তোলা যায়।
- এমন কি একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কও হিসেব খুলতে পারে।
- মাত্র ২ টাকা জমা দিয়েই হিসেব খোলা যায়।
- অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিও কোন সাক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে পাশ বইয়ের কাজ চালাতে পারেন।
- মোটর গাড়ী কেনার জন্য পাশ বইয়ের যে টাকা জামিন রাখা হয় তাও অল্পও সুদ দেওয়া হয়।
- মনোনয়নের সুবিধেগুলি পাওয়া যায়।
- উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্র ছাড়াই ২০০০ টাকা পর্যন্ত দাবির মীমাংসা করে দেওয়া হয়।
- ৬৮০০০ অফিসের মাধ্যমে আপনার সেবা করে।

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ককেই আপনার ব্যাঙ্ক করবেন কেন

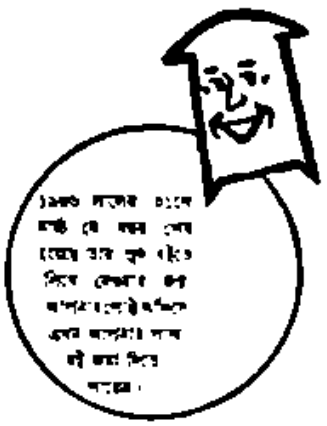

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 66/85 Bengali

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেস সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যান—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বাণীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ভাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, গান্ধালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণধীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল কাবরমল; বাঁচিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাবেওপ্রসাদ দয়ারাম কেত্রী; অরুক অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, পরশচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৪৬-২৯৮৩

জামশেদজী নসরওয়ানজী টাটা
৩রা মার্চ, ১৮৩৯—১৯শে মে, ১৯০৪

বিরাট পুরুষ

"জামশেদজী টাটার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ও তাঁহার কীর্তি অসীম। তাঁহার অদম্য মনোবল দিয়া তিনি তাঁহার সুবৃহৎ পরিকল্পনা-গুলিকে রূপদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে শিল্পপতি, দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি প্রাণ ঢালিয়া দেশের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।"

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস প্রণীত
জামশেদজী টাটার কীর্তি হইতে উদ্ধৃত

দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

CUTTACK UNIVERSITY

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ আঠারো ॥

পনেরোই…

দিন সাতেক ফকায়ার কোন সন্ধানই বলতে গেলে পাওয়া গেল না। লোকের মুখে মুখে জানা গেল যে, ও সদরের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে দেশসেবার কাজে। আমিও আমার ছবির কাজে মন দিলাম। মেহবুব জাতীয় কবি ছিলেন এবং সরকারি সাহিত্য আকাদেমিও শ্রীনগরে আছে, কিন্তু ওঁর জীবনের পুরো ইতিহাস আমাকেই খুঁজে নিতে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আর জান অজানা লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে। এরই মধ্যে যুদ্ধের খবর আসে, এটা ওটা। কখন লোক মুখে, কখন রেডিও মারফৎ।

এই ভাবেই জানা গেল দীন মহম্মদের কথা—যে ওদের আসার সংবাদ দিয়েছিল টানমার্গ থানায়। সৈনিক পেছু টাকার দিন মজুর ঐ দীন মহম্মদ চার শো টাকা পেয়েছিল গাইড সংগ্রহ করার জন্যে দারাকাসি গ্রামে। দারাকাসি হল উরি পুল-এর ওপারখানে পাকিস্তানি কাশ্মীরের প্রায় সাগোয়া এক ছোট্ট গ্রাম। সেখানে ওরা জড় হয় মাঝরাতে আর দীন মহম্মদকে ডেকে বের করে ওর ঘর থেকে। ও টাকা নেয় লোক জানাবে ব'লে আর টানমার্গে এসে পাঠিয়ে দেয় ভারতীয় সৈনিক।

ওরাজির মহম্মদও অমনি ধারা আরও একজন লোক মেন্ধার অঞ্চলে ওদহাটি গ্রামেরও ও-টাকা নিয়েছিল প্রাণের ভয়ে আর ওদের আসার সংবাদ দিয়েছিল দেশের টানে। এমনি ধারা নানান খবরে রেডিও উপ্‌ছে পড়ছে। সবই আমার দেশের জয়, আমার গ্রামীন ভাইদের বিজয়। ওরা আমাদের গর্ব। আমাদের গৌরব কিন্তু তবুও মনটাকে ওদের মধ্যে ছড়িয়ে রাখতে পারছি না। প্রবল বাধা হ'য়ে ফকায়া বার বারই সেটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি হল ওর? কি হ'তে পারে?

ভাবনার রেশ টুকরো টুকরো হয়ে গেল পুলিশ গাড়ীর সাইরেন শুনে। মার্শাল ল' বহু কালই উঠে গেছে এখন বাজি আটটা থেকে কারফ্যু। এর মধ্যে পুলিশ গাড়ী কেন? আবার কি তবে বিপদ এল একদম অতর্কিতে? কোথায়? কতজন? ছুটে গেলাম আমার ঘরের জানলায়। মাঠের পাশ দিয়ে একটা ট্রেশন ওয়াগন গেল আর চার সশস্ত্র সেপাই। বোঝা গেল বিপদ ঠিকই। কান পেতে রইলাম গুলির আওয়াজের জন্যে। আশ্চর্য্য কোন সাড়া শব্দ নেই। নিষুম রাত, অসীম নীরবতা। শব্দে আন্দাজ করা গেল, যে গাড়ীগুলো কাছেই কোথাও থেমেছে। বেরিয়ে গিয়ে দেখব, এমন উপায় নেই। প্রয়োজন হ'লে নেমে পড়া এক কথা কিন্তু অনেকখানি কৌতূহলের জন্যে এতটুকু ঝিক নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মিনিটের পর মিনিট গেল অধৈর্য্য প্রতীক্ষায়। ঘরটা বোধহয় বন্ধই হ'য়ে আসছে। গুলি যখন চলছে না তখন ওদেরও বোধহয় আমারই মতন অধৈর্য্য প্রতীক্ষা। ওরা তবু ভালো, শত্রুর মুখোমুখি না হ'লেও সামনে। আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। আমরা অজানা আতঙ্কের আড়ালে। এক সময় মনে হল এর চেয়ে গোলাগুলি চলা অনেক ভালো, তাতে তবু কিছু একটা ঘটনার জন্যে মনটাকে তৈরি করা যায়। এ যেন মিনিটে মিনিটে বার বার মরা।

প্রথম গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল রাত এগারোটায়, প্রায় চার ঘণ্টা ঐ ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকার পর ঠিক কানের কাছে। তারপর পর পর বহু কায়ার হল, সাইট মেশিন গানের। তারও পর এলো সঙ্গের ঘোষণা।

"যারা ভেতরে আছেন নেমে আসুন। আমরা গুলি ছোঁড়া বন্ধ করেছি দশ গুনবো বলে। দশ গোনার মধ্যে যদি না আসেন আমরা মেশিন গান দিয়ে বাড়ীটাই উড়িয়ে দেব। নেমে আসুন। বন্দুক ফেলে আসুন। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আসুন।

এক ..."

কথাগুলো দুবার বলা হল, একবার ইংরেজিতে একবার উর্দুতে তারপর আরম্ভ হল পলক গোনা।

"দুই..."

কাজেই। আমাদের মনে হল আমাদের বাড়ীর ঠিক পেছনে যে বাড়ীর লাইন, ঠিক তার পরেই নইলে অত জোর অত স্পষ্ট কথাগুলো কিছুতেই শোনা যেতো না।

"তিন..."

এক একটা পলক নয়, যেন এক এক যুগ। সামনের সব বাড়ীর আলো নেবানোই ছিল, কোণের বাড়ীর এ পাশের ঘরে আলো জ্বলল, বোধহয় একটা বাচ্চাও কেঁদে উঠল আতঙ্কে।

"চার..."

শুনছে না, গর্জন করছে? প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে, নীরবতার পাঁচিলে লেগে না দূর আকাশের বাজ খেয়ে কে জানে। কেউ একটা দেশলাই জ্বালল কোথাও, কেউ একজন কাশল অনেক কাছে। সত্যিই হয় নাকি ক্যান্সার খুব সিগারেট খেলে? বিমলদা কেমন আছেন কে জানে?...

"পাঁচ..."

কথায়ার আজ হল কি? ও এমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে এলোই বা কেন এই অসময়ে আর যাবেই বা কেন কামাদের কাছে ঐ অতদূর? যে মানুষটা স্বামী হওয়া সত্ত্বেও, দৈহিক ভাবে ওর জীবনে শেষ হ'য়ে গেছে দশ বছর, যার স্পর্শ পেলে ওর মনে পড়ে যায় বারামুলার সেই বিভৎস রাত্রে কুকুরের মুখ শিশুর শরীরের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া—তার কাছে যাওয়ার কি এমন তাগাদা? আমিই কি তার কারণ? বলবে, না কেন তাহ'লে? যদি···

"ছন্ন···"

কোথায় আমার নির্বিকল্প? কত বড় হল? ছ বছরে কত বড় হয়? পাঁচ বছর হল ওকে দেখিনি। পাঁচ নয়, তিন। মাঝে মাঝেই চ'লে যেতাম পার্কের ধারে আর ওকে খুঁজে বার করার খেলা খেলতাম ঐ বয়সেরই নানান শিশুর মধ্যে থেকে। সবসব রাস্তা শুনেছি কোন এক আমেরিকান লেখকেরই ছদ্মনাম। হ'ক, কিন্তু ব্যক্তিগত দায়িক আদান প্রদানের ব্যাপারে ভিক্টোরী আমাদের মনোবিস্তার অলোক সৃষ্টির ওর সে আবহণ আর ঐ ব্যাপারে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তা দিয়ে রাখার মতন। কাউকে কাছে পাওয়ার লক্ষ্যকে যদি অভিভাব করা যায় তাহ'লে অনেক মানুষও সেই অভিভাবকের গ্রাহী হ'য়ে ওঠে। প্রথম যেদিন ওকে চিনে নেওয়ার এই প্রথম করেছিলাম তখন হঠাৎ এক সময় রেলিংয়ের ধারে এসে আমার দিকে অপলক তাকিয়েছিল, হেসেছিল। শিশু নয়, দেবশিশু, পথ ভুলে এসে পড়েছে এ যুগের পঙ্কিল জীবনে। প্রকাণ্ড বড় টানাটানা চোখে যেন খাঁজার শেষ নেই। কাকে খোঁজে? ও কি বোঝে ও কাকে হারিয়েছে? আর সে ক্ষতির পরিমাণ কতখানি?

অভিভাবকের এই খেলায় আনন্দে ওখানে যাওয়াটা যেন আমার নেশার মতনই পেয়ে ব'সেছিল বেশ কিছুদিন। আমার যাওয়া আর ওর এসে দাঁড়ানো দুটোই যেন একাত্মবোধের আর সহজপ্রবৃত্তির সহজাত খেলা। সেই জন্যেই বাধ্য হ'য়ে ও খেলা আমায় বন্ধ করতে হল। ভুল করলাম কি ওকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে? কিন্তু বাদ তো নয়, চোখ বন্ধ ক'রে মনের আগাতে ওকে মেনে ব'রেছি। আমার দৈনন্দিন জীবনে ও একাত্মবোধে মিশে আছি। আসলে, ব্যবহারিক জীবনের আদান-প্রদান থেকে বাদ দিয়ে ওকে অন্তর্জাত পিতৃস্নেহের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করলেও তার সংকল্প থেকে ওকে মুক্তি দিয়েছি। যদি আমাদের অব্যক্ত আন্তরিকতার আবেশ সঞ্চার হ'য়ে উঠত, তাহ'লে যে পরিমাণ স্নেহ ভালোবাসা আমি ওকে দিতাম তা আর কেউ কখনই পারতো না। কেউই নয়। আমার সংবেদনী স্নেহ ভালোবাসার স্রোতে আমি ওকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম ওর আজকের বিকল্প বেইনী থেকে অনেক দূরে, অ-নে-ক দূরে আর ও পড়ে যেত, ছোটানার সংগ্রহে। ও ঠিকই ভাবতো এতোখানি ভালোবাসা যে মানুষটা দেয় সে শুধুই অযাচিত কেন? কেন তাকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না? সেটা হত ওর সুবোধী আত্মার অবদমন। অতটুকু মনে এতো বড় রহস্যের বোঝা কিছুতেই সইতো না। ওর মনটা যেন মরে জীবনটা হ'য়ে উঠত হীনতাভাবে অবনত।

তাই আমি নিজেকে সরিয়ে এনেছি অনেক দূরে, ওর নাগালের বাইরে, একদম অজানার অন্ধকারে, যাতে কোনদিনও আমায় জানতে না পারে, চিনতে না পারে, বুঝতেও না পারে। সবাই ওকে বলবে, ওকে বোঝাবে, আমি ক্রূর, আমি কঠিন, আমি কাপুরুষ, নইলে ওর জীবন থেকে আমি ধূমকেতুর মতন মিলিয়ে যাবো কেন? ও তখন আমায় ঘৃণা করবে। তাইই তো আমি চাই। আমি চাই ও আমায় ঘৃণা করুক, অবজ্ঞা করুক ও আমায় অপদার্থ জেনে ওর মন থেকে আমায় নিঃশেষে

ঘুছে ফেলুক—তবেই যদি ও পারে আমার এই অসীম অথচ অব্যক্ত সংবেদনশী ভালোবাসা উপেক্ষা ক'রে আর ওর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে আমার দুরাসন্ন দুঃখ উত্তীর্ণ হ'য়ে ওর অভিশপ্ত জীবনকে জয় করতে। বোঝবার যখন ওর বয়স হবে আর অতীতকে জানবার আগ্রহ তখন যদি ওর থাকে, তাহ'লে আপনিই ও একদিন আমায় জেনে নেবেই। জীবনের শাশ্বত সত্যকে উপেক্ষা ক'রে যারে এমন শক্তিমান তো ভগবানও নয়। প্রশ্ন শুধু সময়ের।

প্রতীক্ষার আরও একটা সীমা আমার জানা হল। তাই আজ আমি বাঁচতে চাই। নিজের জন্যে নয়, রুকায়ার জন্যে নয়, ওরই জন্যে। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই আমায় না জেনে ও কতখানি ঘৃণা করেছে। আরও জানতে চাই, কোন একদিন, আমায় জানবার পর, আমায় কতটুকু ও ক্ষমা করতে পেরেছে। ওকে জানাবারও কিছু আমার আছে। বেশী নয়, সামান্য। ও আমায় কাছে নেই ব'লে ভগবানও আমার অন্তরে আজ অসম্পূর্ণ। ওর ছুটির সাধনায় আমি ঘনায়মান ফাঁসির আগে ঘাতকের মতন একা।

মেশিনগান্ গর্জন ক'রে উঠল—একটা তলি। কিছু গোড়ানির আওয়াজ, কিছু সামরিক আদেশ, তারপরই গর্জন :

"হাত তুলে এসো!"

চমকে উঠলাম। কখনই বা গোণা শেষ হল, কখনই বা মেশিনগান্ চলল আর কখনই বা লোক বেরিয়ে এলো? কে ওরা? কোথায় ছিল। আর কখনই বা?

জানা গেল অল্প পরেই। খাকি-প্যাণ্ট পরা আমাদের ভাইয়াজী, লাঠি হাতে নিয়ে সব জেনে এসেছেন। ওরা একচল্লিশজন হানাদার, সঙ্গে ওদের পাকিস্তানি আর্মির ক্যাপ্টেন অসগর আলি। শ্রীনগর আক্রমণের হেড কোয়ার্টার ছিল ওদের ওয়াজির বাগে। বাড়ীটা রাজার আমলের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারির, তিনতলা, চুনকাম। বাইরে ঘরে গুরুকর্তার ছবি ছিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, জহরলালের সঙ্গে, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে, শেখ আবদুল্লাহ, বক্সি গুলাম মহম্মদ, আদলাই ষ্টিভেনশনের সঙ্গে। ওদের ওপর তার ছিল রেডিও কাশ্মীর থেকে, সামরিক সাহেবকে খবর আর সেক্রেটারিয়েট্ দখল। ওদের কার্যকলাপের কোড ছিল "মেহবুব"। আরও পরে জানা গেল এয়ারপোর্ট দখলের হানাদারি দলের ছিল বড়গামে আর তাদের কর্তা ছিল হাবিলদার ওসমান। কোড ছিল "বাটারফ্লাই"। এরা সবাই ছিল বারো এ কে ডিভিশনের লোক। কলকাতা শহরের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, তাহ'লে বলতে হয় রাইটার্স বিলডিং দখল করার জন্যে লোক বসেছে বহুবাবুর বাজারে কম ক'রে তিরিশ লরী গোলাবারুদ নিয়ে!

বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স্? কোথায় ছিল আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স্? কে বন্ধ ক'রেছিল তাদের চোখ, মুখ কান? শোনা যায় তারা বিরল এবং দয়াল মাফোওয়ারির দল। তাই কি?

ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকল রুকায়া। চুল উসকো খুসকো, একেবারে অন্য চেহারা। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম :

"হঠাৎ? এ সময়?"

"বলতে এলাম, কাল আমরা নওগাম যাবো।"

"কামালের সঙ্গে দেখা করবে ?"

"হাঁ।"

আরও অনেকখানি অবাক হলাম :

"এই সেদিন এসে তা'রে বললাম, তুমি রাজি হ'লে না আর…"

আমায় থামিয়ে দিয়ে ও বললে : "জানি। অ'জ হাওয়াটা আমারও প্রয়োজন!"

"কি হল ?"

ফকারা একটু বিরক্ত হ'য়েই বললে, "বললাম যে হ'য়েছে। যাবে কিনা তাই বল!"

ওর কথা বলার ভঙ্গিমায় আরও অনেকখানি অবাক হলাম। এ ভাবে আর এ ভাষায় ও কখন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। কিছুটা তাই আহতও হলাম।

"যাবো। ও কি জীপ পাঠাচ্ছে ?"

"না।"

"তাহ'লে ?"

"আমিই ব্যবস্থা করেছি।"

এবার আমার বোধহয় অবাক হওয়ার শক্তিও হারালো। বললাম :

"বল। কি হ'য়েছে বল তো ?"

ফকারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল :

"কিছু না!"

॥ উনিশ ॥

কামাল সাহেব

শ্রীনগর থেকে নওগাম প্রায় বাহান্ন মাইল পথ। পাকা রাস্তা আছে হাওওয়ারা পর্যন্ত, তারপরই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা, পাকা পাঁচ মাইল। মনের জোর থাকলে তবেই জীপ যায়। এই ভাবে কোন রকমে যদি সান্‌জিপুর পৌঁছোনো যায় তাহ'লে সেখান থেকে হাঁটা পথে দু'মাইল গেলে তবে নওগাম। পাকা রাস্তাটা জীপের পক্ষে যত ভালো, জীবনের পক্ষে ততই বিপজ্জনক। শ্রীনগর থেকে পাট্টান পর্যন্ত ভয় নেই, রাস্তার দুধারে খালি ক্ষেত। পাট্টান পেরুলেই পাহাড় আরম্ভ হল দুধারে। বাঁদিকে ওখান থেকে টানমার্গ পর্যন্ত এখনও হানাদারে ভরা। চিরুনি দিয়ে চুল পরিষ্কার করার মতন পাহাড় পরিষ্কার হচ্ছে। পথে যেতে যেতে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যায় আর কোন হানাদার যদি ছিটকে পথের ধারে এসে পড়ে তাহলে ধাইপিটে হয়।

পাট্টান থেকে মাইল দশেক যদি মৃত্যু এড়িয়ে আসা যায় তাহ'লে বাঁদিকের রাস্তাটা বারামুলায় যায়। চারিদিকে বড় বড় পাহাড়। নাংগা পর্বত, হরমুখ আর কোলাহাই। কোলোহাই পাহাড়টাই দেখবার মতন, ঠিক যেন এক বিশালাকায় সিংহী মুখের সামনে একটা ছোট্ট ভেড়া নিয়ে ব'সে

ভাবছে খাবে কি খাবে না। এদব অঞ্চলেও হানাদারদের ছড়াছড়ি। শ্রীনগর থেকে ওদের তাড়িয়ে আনা হ'য়েছে। ওরাই এদিকে এসেছে কারণ বেরিয়ে যেতে হলে এদিক দিয়েই সুবিধে। আমাদের আর্মড পুলিশ এদিক থেকে তাড়া দিয়েছে একদল, আর বারামুলা থেকে এদিকে তাড়িয়ে আনছে আর একদল। এইখানেই ওদের ঘিরে মারার বেশ বড় সড় ব্যবস্থা। এখানে সারাদিনরাতই প্রায় গোলাগুলি চলছে তবে পথের ধারে নয়, দূর দূর পাহাড়ে এই যা রক্ষা।

রুকসানার আসার কথা ছিল আটটার মধ্যে। ও আসতে এলো একটারও পর। গভীর চিন্তামগ্ন, অনেক প্রশ্ন করলে একটা উত্তর হয়ত পাওয়া যায়। জীবনটা আমার প্রতীক্ষা দিয়ে ঘেরা ব'লেই বোধ হয় সময়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখি। সকাল আটটায় তৈরি হয়েছিলাম কৌতূহলের কিছু খোরাক আর কৌতূহলের মন নিয়ে। মেজাজটা খারাপ হল দশটা নাগাদ আর একটার সময় যখন ছ'ইঞ্চায় এসে ডাক দিল তখন চাপা রাগের উত্তাপে অনুরাগের উচ্ছ্বাস পুড়ে বেশ কালো হ'য়ে গেছে। মহিলা গাড়ীর পেছনে মাথা হেলিয়ে, ছেঁড়া জীপ-ছাদের, ফোকর দিয়ে ময়লা দেখছিলেন। দেরির জন্যে কোন দুঃখ নেই, কৈফিয়তও নেই। শুধু বললে :

"দেরি হ'য়ে গেল।"

সারা সকাল ঘড়ি দেখে দেখে ওটা ফেলে দেওয়ার মতনই প্রায় পুরোনো হয়ে গেছে। আরও একবার দেখে বললাম :

"হ্যাঁ পাঁচ ঘণ্টা।"

মহিলা শুধু বললেন, "হুম্!"

এরপর আর কথা হয়নি কোন। দুই গাম্ভীর্য্যের এমন সংঘর্ষ আমুর লালবাহাদুরের মিটিংয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

দোপুরটাকে সহজ বলতেই হয় কারণ সিনেমা আছে অতএব আছে চায়ের দোকান। মন-কোজপরেশানের নিরালি নিরবতায় দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছিলাম আর আকাশ পাতাল ভাবছিলাম ব'লে সময়ের কোন আন্দাজ ছিল না। চা খাওয়ার জন্যে জীপ থামিয়ে দেখা গেল চারটে বাজে। ওখানে চা খেয়ে বাওয়ারাতে খোঁজ নিয়ে আর ছ মাইল পথ ছাড়া। গাড়ীর মতন ছটকাতে ছটকাতে যখন সানজিপুর পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ওখানে চারজন লোক ছিল আমাদের চৌকি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ও ব্যবস্থাটা শ্রীমতি আগেই ক'রে রেখেছিলেন। পাহাড় উঠতে উঠতে বললাম :

"আজ আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না?

আতোগুলো কথার ছোট্ট উত্তর এলো, "না!"

আর কথা নয়; এখনও ভাবনার বোঝার কথাগুলো ছোট, এরপর রাগের উত্তেজনায় ছোট কথা বলবে। তার চেয়ে আমাদের পাহারাদারদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম হানাদার সম্বন্ধে।

ওদের কাছ থেকেই জানা গেল যে খাওয়া করতে করতে ওরা শ' দুয়েক হানাদারকে কোণ ঠাসা করেছে কাছেই একটা পাহাড়ে। গতকাল পর্যন্ত ওরা ছিল সানজিপুর অঞ্চলে, রাত্রে সরে গেছে। আজ সারাদিন খোঁজ করার পর জানা গেছে ওরা আছে সামনের পাহাড়ে, নাম পুতর পাহাড়। ওটার ওপারেই পীরপঞ্জল। তার নিচেই পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের শুরু।

কাজেই এখন উদ্বেগ দাঁড়িয়ে গেছে শুধু পুরুর পাহাড়ই নয় পীরপঞ্জালের মাথায় ওঠা। তাহ'লে এই এলাকাটা পুরোপুরি আমাদের হাতে আসে আর হাজোরার আসার একটা বড় পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। আপাততঃ আমরা যেখানে আছি সেটা পুরুর পাহাড় থেকে চার মাইল এগোয়ে। আরও জানা গেল, আজ এবং কাল যে কোন একটি দিন বেশ জমাট যুদ্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কেন? ও বললে, আমাদের আন্দাজ ওরা পাহাড়ের ওপর আছে গ ছয়েক লোক আর পাহাড়ের ওপারটা ওদের আওতায় অতএব আরো লোক আসার যায় নেই। আমাদের এখান থেকে সরাতে না পারলে ওদের হামার যাবো খো লোক বেরিয়ে যাওয়ার পথ পাবে না। চারিদিকেই এই ঘিরে ফেলার খবর শুনে বোঝা গেল আমাদের প্ল্যান হল তাদের সমূলে ধ্বংস করা। লোকটা বললে, হাঁ। যারা এসেছে তারা আর যাবে না; থাকবে মতলব ক'রে যখন এসেছে এখন থাকবেই, সেটা মাটির ওপরে না নিচে সে কথা আলাদা।

আকাশে আলোর আভা আছে আর পায়ের কাছে জ্বালে কাগজ মোড়া টর্চ। এই সব অঞ্চলে একটা দেশলাইয়ের আলোও নাকি মাইল খানেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। হামাদার নেই কিন্তু স্নাইপিং-এর কথা কে বলতে পারে? ও প্রায়ই মাঝে মাঝে কয়।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে পথ চ'লেছি। পথের ধারে ধারে কাঠের ছোটখাটো বাড়ী, কোথাও একটা, কোথাও কাছাকাছি দুটো। এখানে চাষ আবাদ হয়, পাহাড়ের কোলে কোলে, তবে বেশীটাই কাঠের জঙ্গল। এই জঙ্গলের ঠিকাদারী শালাবাবুর বড় বন্ধু খানের সাহেবের। লোকটা বললে, সেই হল যত নষ্টের গোড়া। তারই জন্যে এখান দিয়ে লোক ঢুকছে হাজারে হাজারে।

পুরুর পাহাড় পরিষ্কার করার বেস ক্যাম্পে পৌঁছোনো গেল জমাট বাঁধা সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে। পাহাড়ের গায়ে, গাছের তলায় আর মাটিতে গর্ত ক'রে তার মধ্যে আমাদের ছেলেরা মৃত্যুর মুখোমুখি ব'সে আছে উদার আনন্দে। কামাল সাহেব ছিলেন ছোট্ট ক্যাম্পে ম্যাপ নিয়ে কি সব বোঝাচ্ছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখে ওঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর যেন হুংকারে কে নিবিয়ে দিল। মুখে মেখি ফকায়া এক দৃষ্টে ওঁর দিকে চেয়ে আছে।

ওঁর সহচর দুজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। হতবাক হ'য়ে দেখল, যারে না থাকলে বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না। উনি এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন, অপলক নিষ্পন্ধ। জমে আসা ঠাণ্ডাতেও ওর সার্টের বোতাম গলার কাছে খোলা, আস্তিন গুটোনো, চুল উসকো খুসকো, গভীর চিন্তায় কপালের দাগগুলো যেন ছুরি দিয়ে কেটে বসানো। চোখ দুটো নিষ্পলক, যেন জ্বলছে। হাতের পেনসিলটা মৃদু ঘোরাচ্ছিলেন। কেন জানিনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল লোকা ধরার আগে টিকটিকিদের ল্যাজের ডগাটা কেন নড়ে?

ফকায়া বোধহয় একটু হাসল।

প্রকাণ্ড টানা নিঃশ্বাস ফেললেন কামাল সাহেব। বললেন, "বসুন।"

আমি যন্ত্রমুগ্ধের মতন ব'সে পড়লাম। বসেই মনে হল, ফকায়ার হয়ত ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে, তাই বললাম:

"আমি একটু ঘুরে দেখে আসি আপনাদের জীবন প্রণালী।"

"বসুন। আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাবো।" ইঙ্গিতে ফকায়াকে দেখিয়ে বললেন, ওঁর সঙ্গে দুটো জরুরি কথা সেরে…"

ফকায়া হেসেই বলল, "আমারও কিছু কথা আছে···চল ···"

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় দেখলাম ওর হাতটা ফকায়ার কোমরে। ফকায়া কি শিউরে উঠল? বোধহয়।

গত মহাযুদ্ধে ফ্রন্ট দেখেছি। এটা একেবারে আলাদা। এটা আমার যুদ্ধ। যারা এই পাহাড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে তারা যে কেউ হতে পারত আমার ভাই, আমার ছেলে। আজ তারা আদি। ঘরে থাকা গেলো না। গাছের নিচে, পাহাড়ের গুহায়, মাটিতে গর্ত ক'রে তার মধ্যে ব'সে আছে ওরা, মৃত্যুকে মাথার কাছে নিয়ে। অবাক হ'তে হয় ওদের মনের শক্তি আর ধৈর্যের সীমা দেখে। যারা পাহারায় থাকে তারা হাজার মশায় কামড়ে একবার হাতও তোলেনা। যারা পাহারায় নেই তারা অ্যাকশনের অপেক্ষায় অধির। খাওয়ার সময় নেই, কাপড় ছাড়ার বালাই নেই, মাঝে নিশিদে, যদি সময় পায় তাহ'লে ছোট ছোট দলে গর্তের মধ্যে গিয়ে চোখ বোজে আর গর্তের ওপর মশারি টেকে দেওয়া হয়। চোখের দৃষ্টি সজাগ, বন্দুক ওদের কাঁধে আর হাসি ওদের মুখে। খবর নিয়ে জানলাম, তিনদিন আগে সময় পেয়েছিল দু'দণ্ড ব'সে খাবার। এখন যা হয় সব হাতে হাতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে। এরা একদল এসেছে আলিগড় থেকে ইউ পির আর্মড পুলিশ। মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসে এদিক ওদিক থেকে। তখন বি'বি'র ডাক থামে, এদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয় আর পাহারার লোকগুলো পাথর হ'য়ে যায়। হাবিলদার বললে: সাব, আমাদের অনন্ত প্রতীক্ষা—হয় মরবার আর না হয় মারবার। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। এখানে আমাদের দুটো জিনিষই হয়—হয় গুলি খাও, নয় গুলি চালাও।

"বাড়ীর কথা মনে হয় না?"

"হয় না? খুব হয়। আধ-মরা। কান্না নয়, শুধু হাসি, আনন্দ। ফেলে আসা দিন নয়, সামনের জীবন। আবার ফিরে যাওয়ার আকর্ষণ। তখনই হাতের নিশানা ঠিক হয়, এখানে, বাবু, সব চেয়ে সহজ মরা, সব চেয়ে শক্ত বাঁচা।"

মনে পড়ল আক্রামউল্লার কথা। ওরা এসেছিল ওরা সকালে। একটা দিন পেয়েছিল অবসর। চার তারিখে ভারতীয় ফলতরের ওপর গুলি চালায়। ও আহত হয়। ডান পায়ে ওর গুলি লাগে। আক্রাম জানতো ওর যখন পালাবার ক্ষমতা নেই তখন হানাদাররাই ওকে মারবে। তাই পায়ের জখম থেকে রক্ত নিয়ে ও বুকের কাপড়ে মাখিয়ে ফেলে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ও চোখ বুঁজে পড়েছিল জখম বন্ধ ক'রে আর মুখ গুঁজে। একজন পা দিয়ে ওকে উলটে বলল, "বুকে গুলি, মরছে।"

দলটা চ'লে গেল আর ও পড়ল ধরা। শ্রীনগর বন্দী ক্যাম্পে যখন ওকে বলা হল, ওর বাড়ীর ঠিকানা দিলে আর যদি কিছু বলার থাকে বললে রেডিও মারফৎ ওর বাড়ীতে সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, ও তখন ছেলেমানুষের মতন হাউ হাউ করে কেঁদে বললে, "দোহাই সাহেব, ছেলেমেয়েদের কথা বোল না। কত আশা ছিল মানুষ করব, ভালো করব আর কি হল? সব নষ্ট হ'য়ে গেল ওদের মিথ্যে কথায়। ওরা বলেছিল, কিছু হবে না খালি এলেই হবে।

নিস্তব্ধ রাত। সামনের পাহাড়টা বিরাট আকার দৈত্যের মতন ওৎপেতে ব'সে আছে।

সামনেই আমাদের সঙ্গীন প্রহরী, একটা গর্তে দাঁড়িয়ে আর সামনে একটা বড় পাথরের ওপর অটোমেটিক রাইফেলটি নিয়ে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। হাবিলদার বললে :

"ওর সামনে শত্রু আর পেছনে কি জানেন ?"

"কি ?"

"সারা ভারত ওর ছোট্ট সংসারের রূপ ধরে ছায়া মেলে আছে।" থেমে বললে, "তাদের কথা ভেবেই মারবে, তাদের কথা ভেবেই মরবে।"

আমি সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম, ও আমার হাতটা চেপে ধরল, বললে :

"সর্বনাশ। ঐ একটী কাঠিতে সারা পাহাড়ে আগুন জ্বলবে, এ পাহাড় ও পাহাড় !"

এখানে সিগারেট খাওয়া চলবে না, জোরে কথা বলা চলবে না, ব'সে খাওয়া চলবে না, পথ চেয়ে হাঁটা চলবে না, হাসা চলবে না, কাঁদাও চলবে না। এখানে চলবে খালি গুলি আর এগিয়ে চলবে মানুষ, যদি পারে। হাবিলদার বললে :

"রাত্তিরে তবু অনেক সুবিধে। একটু হাঁটা চলা যায়। সব সময় মনে হয়না যে কারো একটা বন্দুক আমার দিকে তাক করা আছে আর সে ভাবছে এইবার মারি। আর গন্ধটাও কম থাকে, মানে নোংরার। খাওয়া ছাড়া তো জল নেই। তাছাড়া একই কাপড় দিনের পর দিন যায়। ময়লা জমে, অনবরত ঘাম হয় আর পিঠেই শুকোয়। স্নানের তো বালাই নেই ! নিজের দুর্গন্ধ তবু সহ্য হয়, কিন্তু…" হেসে বলল, "ঐ যে সামনের পুকুর পাহাড় ওখানে আমরা যাবো আজ নয় কাল নয় পরশু। ভয় করছে। মৃত্যুর নয়। দুর্গন্ধের ! অন্যের ময়লা সহ্য হবেনা।"

কোথায় যেন চাপা শীষ দিল কেউ। হাবিলদার কথা থামিয়ে কান খাড়া করল। এদিক থেকে কেউ দিল। ওদিক থেকে আবার এলো। ও তখন ঘুরে শীষ দিল, দিকে দিকে তার প্রতিরূপ শোনা গেল। আমি ধনুবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"ভয় নেই কিছু," ও বললে, "কাউট দিয়েছে, সংবাদ আছে।"

"কাউট ?"

ও বললে, "হাঁ। যারা শত্রুর খোঁজ নিতে গিয়েছিল। এবার লোক যাবে রেকি করতে তারপর অ্যাটাক প্ল্যান হবে। চলুন !"

"কোথায় ?"

"সাহেবের ক্যাম্পে।"

ফিরে এসে দেখলাম কর্নেল কোণে বসে আছে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে একটা কাঠের বাক্সের ওপর আর কামাল রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছছে। চুলগুলো ওর বেসামাল, সাটের বুটা বোতাম ছেঁড়া। আমি ঘরে ঢুকতেই কামাল সাহেব মুখ তুলে তাকালেন কর্নেলের দিকে তারপর বাঁহাতের উল্টো দিকটা দিয়ে ঠোঁটটা পুঁছে বললেন :

"বসুন।"

বসবার আগেই হাবিলদার সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। উনি চোখ তুলে চাইলেন। হাবিলদার বললে :

"কাউট।"

"এখানে তা···" থেমে গিয়ে বললেন, "যাও আসছি।" হেসে আমায় বললেন, "যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কাউকেই বিশ্বাস করিনা।"

হেসে বললাম, "স্ত্রীর ব্যাপারে তো খুব করেন, দেখছি!"

"করি। কারণ ওখানে সবটাই ভাগ্য। আসছি।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। রুকায়া আমার দিকে তাকালো এবার। বোঝা গেল একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। চুলগুলো আলুথালু, একটা গোছা চোখের ওপরও পড়েছে। কামিজের কিছুটা ছেঁড়া। রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বললাম:

"সিগারেটটা মুছে নাও।"

রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে:

"অপমান কোর'না। এমনিতেই আমি নিজের কাছে অনেক ছোট হ'য়ে আছি।"

"কেন?"

"বললে আরও ছোট হ'য়ে যাবো।"

"শুনি।"

"আজ নয়।"

"কবে?"

"পরে···"

কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত দিতেই ও ছেলে মানুষের মতন কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি সিগারেট ধরালাম সন্তোষনে। এ একটা অদ্ভুত সমাবেশ। ভাবছি কামাল সাহেব এসে পড়লে কি ভাববেন আর আমিই বা কি বলব? তখনই বাধার এলো। আমি যেন বাঁচলাম, বললাম:

"দুজনের কেন?"

"সাহেব ওখানে খাবেন।"

"তাহ'লে আমিও।" ওরই সঙ্গে বেরিয়ে এলাম কথা না ব'লে। বলার উপায়ও ছিল না। লোকটাকে আসতে দেখে ও মুখ লুকিয়েছিল ইটুর মধ্যে।

বাইরে আসবার আগে লোকটা বলল, "সার, সিগরেট।" ফেলে দিলাম। বিপদের সঙ্গে বসবাস ক'রে ক'রে এরা সব আলাদা মানুষ। আমায় একটা গাছের তলায় বসিয়ে গেল, বড় সাহেবকে খবর দিতে।

সংক্ষেপে যেটুকু কামাল সাহেবের কাছ থেকে শোনা গেল তার মর্মার্থ যে আজ বোমবর্ষণ আর বেশী কিছু হওয়ার নয়। তার মানে ওঁদের আরও একদিন অধৈর্য্য প্রতীক্ষা। ফাউট সংবাদ এনেছে শত্রুপক্ষের লোক আছে আন্দাজ আড়াই শো। ওরা পাহাড়ের ওপর, সামনেটা ওদের সোজা গুলির রেঞ্জে, কাজেই সামনাসামনি আক্রমণ করা মানেই অবধারিত মৃত্যু। ওদের ডান দিকটা পেছনের সৈন্য কতার ক'রে রেখেছে ঠিক পেছনের ছোট পাহাড় থেকে, কাজেই সেদিক দিয়েও অ্যাটাক করা সম্ভব নয়। ওদের বাঁ দিকে খাড়া চড়াই, প্রায় তিনশো ফিট। গোলাবারুদ নিয়ে সে পথে ওপরে ওঠা সেপাইদের সাধ্য নয়। নিরুপায় হয়ে সাহেব লোক পাঠিয়েছেন গ্রামে, যদি তারা কিছু সাহায্য করতে পারে। চারজনের একটা ছোট্ট দল গেছে রেকি করতে, যদি কোন উপায় পাওয়া

যায় ওপরে উঠবার। কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়লাম ওঁর ক্যাম্পে। আধ-ঢাকা মোমবাতির আলোয় আবছায়া অন্ধকারে ফকারা শুয়ে আছে ছুটো পাকিং কেসের ওপর, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। উনি সন্তর্পণে ওঁর কোটটা ওর গায়ে চাপিয়ে এক পলক চেয়ে রইলেন। বোধহয় ওঁর ইচ্ছে হল চুলের গুচ্ছটা আলতো ভাবে সরিয়ে মুখখানা একবার দেখে নেন।

আবার আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে আর গিয়ে বসলাম বড় একটা পাথরের ধার ঘেঁসে।

"আপনাকে আসতে বলেছিলাম কিন্তু বাস্তবায় সে কথা আমার মনেই ছিল না।"

"আমার ছিল। আর আজ ওই আমায় জোর ক'রে টেনে নিয়ে এলো।"

ছোট্ট উত্তর দিলেন কামাল সাহেব, কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে:

"জানি। আমায় ব'লেছে।" হাতের ছড়িটা দিয়ে উনি পাথরটার ওপর ঘাস কাটতে কাটতে বললেন আবার :

"আমিই ওকে আসতে বলেছিলাম।"

এবার আমি ছোট্ট ক'রে বলি, "ও!"

হয়ত ভেবে নিলেন আমি আরও কিছু বলব, বল'ত দেখে নিলেন এরপর আর কিছু বলা ঠিক হবে কিনা, তারপর চ'লে গেলেন হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত; কিছু ভাবলেন এক পলক, তারপর বললেন :

"যে মানুষটা আজ এগারো বছর এক মিনিটের তরে আমায় কখন ছেড়ে যায়নি সে আজ বাট বাইশ ঘণ্টা ছুটে এসেছে। কেন জানেন?"

"আপনিই বলুন।"

মৃদু হাসলেন কামাল সাহেব, বললেন: "তার কারণ, ও আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে।" আমি চুপ ক'রে রইলাম, মুখে কথা জোগালো না।

"জানেন নিশ্চয়?"

জানতাম ঠিকই কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না, রাজ্যের জড়তা বাধা দিল। তাই উত্তরটা এড়িয়ে বললাম :

"আপনি ব'লে যান।"

"সেদিন এটা আমার আন্দাজ ছিল—আপনাকে না দেখেই।" থেমে কামাল সাহেব বলে গেলেন অল্প থেমে থেমে :

"যখন শুনলাম যে ষোল বছর পর ও কাশ্মীরি পোষাক নতুন ক'রে করিয়ে আবার প'রে বেরিয়েছে তখন মন বলল, ওকে হারাণো এবার আমার সম্পূর্ণ হল।" কামাল সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি বললাম, "সিগারেট?"

"ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। প্যাকেটটা আবার পকেটে পুরলেন। এবার আমার কিছু বলার পালা।

"আপনি তো আমায় চিনতেনও না, জানতেনও না।"

"প্রয়োজনও ছিল না।" সামনের পাহাড়ের দিকে আঙুল চালিয়ে উনি বললেন :

"ঐ যে সামনের পাহাড়টা দেখছেন, ওখানে আমার শত্রু আছে—কখন ওদের আমি দেখিনি কিন্তু ওরা কে তা জানি, ওদের কি করতে হবে তাও জানি, আর কেন, তাও জানি।" কামাল সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। তারপর বললেন :

"আমি যদি ওদের না মারি তো ওরা আমায় মারবে।" পকেট থেকে রিভলবারটা বার ক'রে ঘরে রেখে আবার বললেন :

শত্রু আমার সাধনা। তাদের মেরে আমি বাঁচি।" থেমে গেলেন এক মুহূর্ত। পাশেই ওঁর প্রকাইন। অন্ধকারেই দেখা গেল কানের পাশে চুলগুলোয় পাক ধ'রেছে। মাথাটা অল্প হেলিয়ে উনি পাথরে ভর দিয়ে বসলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, গাঢ় নীল আকাশের তারাগুলো ঝক্‌মক্ করছে। হঠাৎ উনি আবার বললেন :

"আপনাদের যখন একসঙ্গে দেখলাম তখনই বুঝলাম আমার মন ঠিকই বলেছে।"

"হুম্!"

"তাই আমি আপনাকে ডেকেছিলাম।"

"এবার বুঝতে পারছি।"

"কেন জানেন?"

হেসে বলি :

"কেন জানবোনা?" থেমে আবার বলি, "আপনি তো বুঝিয়েই দিয়েছেন।"

"না। আমার আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।"

অবাক হ'য়ে তাকাই কামাল সাহেবের দিকে। স্ত্রীর সাথর্ক্য বন্ধুর মুখোমুখি হ'লে এ অবস্থায় স্বামীরা যে কিভাবে আর প্রয়োজন হ'লে কি বলে তাতো আমার জানাই আছে। হয়, ওঁর মতন বন্দুক হাতে নিয়ে আর সামনের পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে যা বলেছেন, তাই বুঝিয়ে দেয় আর না হয় বলে, তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তো বিবাহ-বিচ্ছেদে আমার আপত্তি নেই। কামাল সাহেবের আসল কথাটা শোনার আগেই আমি মনে মনে আমার উত্তরটা ঠিক ক'রে নিয়ে বলি :

"বলুন শুনি।"

উনি আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে বললেন :

আমি আপনার কাছ থেকে ওকে ভিক্ষে চাই। "ধমিত বিস্ময়ে আমার ধম্ বন্ধ হ'য়ে এলো। বন্দুক বুঝি, বন্দেজও বুঝি, কিন্তু ভিক্ষা? অবাক হ'য়ে বলি :

"তার মানে?"

"ওর কাছে আমার অপরাধের বোঝা অনেক ভারি। যেদিন ওকে আমি কাছে টেনেছিলাম সেদিন ভালোবাসার ও কিছু বুঝত না আর আমিও কিছু জানতাম না। শুধু জানতাম আমার দেশ, আমার বন্দুক আর আমার নির্য্যাতিত দেশবাসী। ও যখন ভালোবাসা চেয়ে চেয়ে কেঁদে মরল, আমি তখন রইলাম নতুন স্বাধীনতার নেশায় উন্মত্ত হয়ে শেষ আবছায়ার পেছন পেছন। সে স্বপ্ন আমার যখন শেষ হল তখন ওর দিকে মন ঝুঁকিয়ে দেখলাম ওর দেহটা আছে মনটা মরেছে। মনে হল ঐ মানুষটাই বোধহয় অমনি ধারা, হিম শীতল, ঠাণ্ডা বরফ, একেবারে নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুল, তাই আবার ঘর ছেড়ে, বাইরের টানে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়লাম।"

আবার অখণ্ড নীরবতা। রাত বাড়ছে, চাঁদ উঠল, তারাগুলো নিষ্প্রভ হল। কোথাও, বহু দূরে একটা বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল, তারপর বহু বার। কামাল সাহেব সিগারেটটা তুলে নিতে নিতে কিছু শুনলেন, কিছু ভাবলেন তারপর বললেন :

"মাঝে মাঝে দেহের তাগিদে ওর দিকে তাকাতাম, কিন্তু তার বেশী নয়। একদিন দেখলাম ও অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে। সেবাপরা করতে করতে কলেজ পেরিয়ে গেছে, বন্দুক চালাতে চালাতে সুপটু সৈনিকদেরও ছাড়িয়ে গেছে। সমাজ সেবায় ও সবার সেরা, মেয়ে মহলের একেবারে মাথায় উঠে গেছে। বুঝলাম ও সব পারে, পারে না শুধু ভালোবাসতে। মনে হল ও মানুষ নয়, ওর মন নেই, ও একটা ধারালো মেশিন। আমার সে ধারণা আরও স্পষ্ট হল যেদিন কত ছেলে ওর কাছে ভিক্ষার ঝুলি পেতে ফিরে গেল ব্যর্থ মনোরথে।"

আবার এক ঝাঁক গুলির শব্দ, আরও দূরে। একবার আকাশে তাকিয়ে আবার আরম্ভ করলেন :

"তারপর এলেন আপনি। নাম জোহরার কথা শুনেই মন বললে, আমি ভুল করেছি। যা ভেবেছি ও ঠিক তা নয়। ওকে আপনার সঙ্গে এক পলক দেখেই আমার এক জীবনের ধারণা পাল্টে গেল। সন্দেহের অবকাশ আর বিন্দুমাত্র রইল না। আপনারা আমার চোখের সামনে আসার আগেই দেখলাম ওর ভালোবাসা সৌরভ ছড়াচ্ছে। ঈর্ষায় আগুন ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠল।"

হেসে বললাম, "বন্দুকটাতো হাতেই আপনার ছিল!"

উনিও হাসলেন, বললেন :

"তা ছিল।"

"তাহ'লে বলুন, বাধা কি ছিল?"

"ঐ যে বললাম ওর ভালোবাসার সৌরভ। তাই মনে মনে তখনই ঠিক করলাম, আমার আজকের শত্রু-সাধনা শেষ হ'লে, যদি বেঁচে থাকি তাহলে ওর সাধনায় আবার নতুন ক'রে মন দেব।"

কামাল সাহেব আবার পাথরটার ওপর দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার ডুব দিলেন। চাঁদটা আরও একটু ওপরে উঠেছে, পৃথিবীর ওপর নতুন রঙের যবনিকা উঠেছে ধোঁয়াটে নীল। একটা পাখি অনেক দূরে ডেকে উঠল, বোধ হয় এই নতুন আলোয় ঘুম ভেঙে। মনে হল অনেক কাছে একটা শব্দ শুনলাম, খুব চাপা ইশারার মতন। হয়ত ভুলই শুনলাম, কারণ কামাল সাহেব কান দিলেন না। আমায় বললেন :

"তারই ছিল আমার অস্থির প্রতীক্ষা। ইচ্ছে ছিল একটু সময় পেলেই আপনাকে সংবাদ দেব। কিন্তু আর দেরি সইল না কারণ পরশু একটা মৃত্যুর সমন এলো।"

"কি রকম?"

"জীপে ক'রে যাচ্ছিলাম আপনার কথা ভুলে ওর কথা ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ স্নাইপারের গুলিতে সামনের কাঁচটা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেল। বুঝলাম, আপনাকে অভিযে ওর কথা ভেবে আমি নিজের মৃত্যু ডাকছি আর দেশের ক্ষতি করছি। এই বিপদের সময় একজন অভিজ্ঞ সৈন্য যাওয়া মানেই অপরিমাণ ক্ষতি। তাই পরশুই ওকে খবর পাঠিয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে একবার আসতে। এখানে অ-সামরিক মানুষদের আসার নিয়ম নেই। কিন্তু জানেনই তো, যুদ্ধ আর ভালোবাসায় নিয়মের বালাই থাকে না।" আবার সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন কামাল সাহেব। আমাকেই আবার বলতে হল যে ও নিয়মটা অন্ততঃ মানতেই হবে। উনি হাসলেন, বললেন :

"আমারও তাই মনে হয়। আরও ভালভাবে যে ও না এলে আমার আজকের প্রতীক্ষা শেষও হবে না কোনদিন। তাই ওর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম একবার এসে একটি কথা আমায় শুনে যেতে। তাই ও এসেছে। আপনাকে ভালোবাসে বলে।" কামাল সাহেব উঠে চ'লে গেলেন আবার ঐ পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত। ওখান থেকেই বললেন :

"আমার অবহেলায় যে মন ওর নিঃশেষে হারিয়েছিল। আপনার মধ্যে সেই মনটা আবার ও খুঁজে পেয়েছে। তার চেয়ে অনেক বেশী।" থেমে বললেন, "এটা ওরই মনের কথা, মুখে বলা। আমার নয়।"

এবার উনি এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে, মুখোমুখি। ওঁর প্রকাণ্ড থাবার মতন হাত দুটো আমার দুই কাঁধে রেখে আর চোখের ওপর চোখ স্থির ক'রে বললেন :

"ওকে আপনি নতুন করে সৃষ্টি ক'রেছেন। সে ঋণ আমি কোনদিনই ভুলবো না। তাই আপনাকে ডেকেছিলাম আপনার কাছ থেকে ওকে ভিক্ষে চেয়ে নেব ব'লে।...আপনাকে ভালোবেসে ও মুগ্ধ হ'য়েছে বলেই হয়ত আমার প্রতীক্ষা সফল হবে... যদি...আপনি ভিক্ষে আমায় দেন।"

আমার কাঁধের ওপর ওঁর হাত দুটো চেপে ব'সে অস্পষ্ট বলি :

"কেন ও কথা বার বার ব'লে আমায় ছোট করছেন?"

আমার একটু ঝাঁকানি দিয়ে কামাল সাহেব বললেন :

"ছোট করছি না ভাইজান, ভুল বুঝবেন না।"

"তাহ'লে?"

"আপনাকে বোঝাতে চাইছি শুধু যে আপনার ভালোবাসার মধ্যেই আছে আমার মুক্তি।"

এবার ঠিকই শুনলাম। সন্ধ্যার সেই শীষ। উনি পেছন ফিরে তাকালেন তারপর আমায় একটা ক্যাম্প দেখিয়ে বললেন :

"এইটে আপনার আশ্রয়। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। কোন ভয় নেই।"

কামাল সাহেব ত্রস্তপদে চ'লে গেলেন। ক্যাম্পের তলায় একটা মানুষ প্রমাণ গর্ত, মুখটা মশারি দিয়ে ঢাকা। আমি শুয়ে পড়লাম তারই মধ্যে। শ্রান্তায় চোখে আমার জল এলো। এই আসল যোদ্ধা, খাঁটি মানুষ—জয় আর পরাজয় দুইই যার কাছে সমান, নির্মুক্ত মনের সাধনা। ওঁর কাছে হার নেই, জিৎ নেই, আছে কেবল সামনের দিকে শান্ত মনে এগিয়ে যাওয়া।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিই না।

॥ কুড়ি ॥

পুষ্কর পাহাড়

পাহাড়ের ভোর আর শিশুর ভালোবাসা বোধহয় একই জিনিষ। দুটোই ঐশ্বরিক আনন্দে মন ভ'রে দেয়। প্রত্যূষে, যখন নাম না জানা পাখী ডাকল আর নানান গাছের শিশির ভেজা পাতাগুলো আলোর আভাষ পেয়েই উচ্ছ্বসিত আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল তখন চোখ খুলেদেখি ঠিক

চারটে। কোন একদিন এমনি এক ঘোমে যাওয়া রাত আর উঠে আসা সূর্যের মিলন-বাসরে আমি পৃথিবীতে চোখ মেলেছিলাম। তাই বোধহয় এই সময়টা মন আমার শিশুর সরল আনন্দে আজও ভরে থাকে। সেই আবেশে বাইরে এসে আমি অবাক। কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল চারজন সশস্ত্র প্রহরী চার কোণে পাথরের মতন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছ থেকেই জানা গেল যে রাতারাতির অন্ধ পরেই সদলবলে সব বেরিয়ে গেছে নতুন অভিযানে। ওদের কাছ থেকেই পাওয়া গেল দু-তিন কথায় ছোট্ট চিঠি—"আবার দেখা হবে। কামাল।"

পাহাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম, পাহাড়ের কিনারায়। অল্প আলোয় ওড়না গায়ে পাহাড় এখনও আধ-ঘুমন্ত। কুয়াশার জাল বেছানো আছে সামনে, নিচে। সৈন্য নেই, কিন্তু ওদের স্মৃতির সৌধ হ'য়ে আছে কোথাও খালি সিগ'রেটের প্যাকেট, কোথাও ছেঁড়া চিঠি, পাথরের কাছে একটা ভাঙা চিরুনি। আরও আছে, দু চারটে আধ পোড়া বিড়ি, একটা গাছে ঝোলানো দেশলাই-র বাক্স। ওরা এখন কোথায় কে জানে? হয়ত কালকের হাবিলদার নেই, কিম্বা সেই লোকটা যে পাহারায় ছিল। হঠাৎ মনে হল তার মুখখানা জানিনা। কাল দেখিনি। না দেখার জন্য মনটায় একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। আরও খারাপ লাগলো যখন ঐ হাবিলদারের মুখটাও মনে করতে পারলাম না। থাকতে না পেরে, কোণের পাহারাদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলতে পারে কিনা। সে শুধুই হাসল। ভাবলো বোধহয় যে আমি পাগল।

আমাদের কথা শুনেই বোধহয়, কোণের ক্যাম্প ঢাকা পাহাড়ের গুহা থেকে রুকায়া বেরিয়ে এলো। হাসলাম। ওটাই অভ্যর্থনা; কালকের কথার পর এই ওর সঙ্গে প্রথম দেখা তাই ঠিক সহজ ভাবে কথাটা হঠাৎ জোগালো না।

ও হেসে বললে, "ঘুম হ'য়েছে?"

"খুব ভালো।" কামালের চিঠিখানা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

"প'ড়ে দেখ।"

ও হেসে বললে, "জানি। কামাল আমায় ব'লে গেছে।"

"কখন আমাদের যাওয়া?"

"যখন বলবে।"

"যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই তো ভালো," আমি বললাম, "বাসি কাপড়, মনটাও যেন নোংরা লাগছে।"

"দাঁড়াও তা হ'লে মুখে চোখে একটু জল দিয়ে আসি।"

ওর ইশারাটা বুঝলাম, বললাম:

"যাও। আমি ঠাণ্ডা সইতে পারি না। রোদ্দুর উঠুক তারপর যাবো।"

রুকায়া চ'লে গেল। আমি আবার আমার ভাবনার জালে জড়াতে আরম্ভ করলাম। তিন দিনের জন্যে এসেছিলাম, দেখতে দেখতে তৃতীয় সপ্তাহে পা দিলাম। এরই মধ্যে তিন জীবনের অভিজ্ঞতা। এসেছিলাম কাজের কোলাহলে। তারই উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়লাম মনের মায়া মিছিলে। সেকথা মনটা, হঠাৎ দেখা গেল, হ'য়ে উঠেছে গাঢ় লাল। কাল পর্যন্ত তাইই ছিল। একটা মানুষের একটা কথায় সমস্ত রংটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আজ আর

সেকথাও নয়, সাদাও নয়, ধবধবে সাদা। ভবিষ্যৎ তার ওপর কি দাগ কাটবে তা ভগবানই জানেন। কোথায় জানি প'ড়েছিলাম, বোধহয় হ্যাঁইয়ার বইতে, 'যে মানুষ একলা জীবন কাটায়, হয় সে শয়তান আর না হয় ভগবান।" আজ আমি মনে প্রাণে একলা নই অথচ একাকীত্ব আমার বোঝা। এখানে, এই কদিনের মধ্যে ওর কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছি যা জীবনে কখন পাইনি, আবার ওরই মধ্যে এমন কিছু হারালাম যা জীবনে আর কখনই আমার পাওয়া হবে না। ভগবান যদি হতাম, ওকে মনের মধ্যে নিয়ে বাকি জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সেটা যেন কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিনা। পারলে, কালই ওকে মুক্তি দিয়ে দিতাম। শয়তান যদি হতাম, এতক্ষণে কাগজের ছোট্ট চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো ক'রে মাটিতে ছড়িয়ে আমি দাড়িয়ে থেতাম। সেটাই বা পারলাম কোথায়? তাহ'লে আমি কি? কেই বা জানে।

রুকায়ার সঙ্গে কখন আমার কথার অভাব হয়নি। আজ আমরা দুজনেই নিঃস্ব, নিরবকাশ ভাবে নিস্তব্ধ। গভীর অবচেতনার নিভৃত কোণে কে যে কোথায় বিচরণ করছি হয়ত' তা নিজেরাই জানিনা। কখন ভবিষ্যতকে ভয় পেয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরছি, কখন আবার অতীতকে হারাবার ভয়ে ভবিষ্যতকে জয় করতে চাইছি। এরই মধ্যে ছোটখাটো কথা যে বলছি না তা নয়। কিন্তু সেগুলো নিতান্তই তুচ্ছ এবং অহেতুক। সেগুলো নীরবতাকে আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা যে আমাদের মনটাকে গোপন রাখার গভীর প্রচেষ্টা তা নয়। যে প্রশ্নটা প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন চিহ্নের মতন আমাদের দুজনেরই মনের মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেটা অবতারণারই এটা অক্ষমতা। বুঝতে পারছি দুজনেই বলি বলি করছি কিন্তু কোথায় যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। ওরও না, আমারও না। পাটন পেরিয়ে যখন আর পারা গেলো না তখন রুকায়াই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল।

"কিছু কি বুঝলে?"

"অনেকখানি।"

"কি?"

"ও তোমায় নিঃশেষে হারিয়েছিল। আজ নির্মল মনে ফিরে চাইছে।

রুকায়া ছোট্ট ক'রে উত্তর দিল, "জানি।"

শ্রীনগরের সান্ধ্য আকাশে অশান্ত মেঘের খেলা। শঙ্করাচার্যের চূড়োর ওপরে আলোটাও জ্বলে উঠল। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গেই। গাড়ী এসে থামল ওর দরজায়। ও নেমে যাওয়ার আগে বললাম,

"ও কেন ডেকেছিলো তা জানি। তুমি কেন গিয়েছিলে তা তো বললে না?"

রুকায়া একটা পা মাটিতে নামিয়েছিল। সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল অন্তরীন। তারপর ঘুরে বললে:

"যে কথা ওকে লুকিয়ে তোমায় বলা উচিত, সেই কথা তোমায় লুকিয়ে ওকে জানাতে গিয়াছিলাম।" ও চলে যাচ্ছিল, আমি হাতটা চেপে ধরলাম।

"কি ব'লেছ?"

"সব।"

"সব?"

"হ্যাঁ সব। সব। সব।" আর দাঁড়ালো না রুকায়া, প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে গেল।

আমাদের সব কথা জেনেও সে মানুষটা আমার কাছে অমন ভাবে ভিক্ষার ঝুলি পাতলো, তাকে কি বলব? ভগবান? নিজের কাছে নিজেকে আবার অনেকখানি ছোট মনে হল। নোংরা, একেবারে ঘৃণ্য। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম ওর তুলনায় আমি একেবারে তুচ্ছ। আমরা প্রেমে পড়ি আর অহঙ্কারের আগুনে পুড়ি। ওর প্রেম ওকে তুলে ধরেছে, নির্মুক্ত প্রাণের পুরাকাশে। ও আমার চির প্রণম্য।

বাড়ীতে পা দিতেই ভাইয়াজী লাফিয়ে এলেন। রেডিওতে খবর পাওয়া গেছে, পুকর পাহাড় আমাদের দখলে। ওখানে যে শ' দুয়েক পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, তাদের মধ্যে আঠারোজন মারা গেছেন। তেইশজন বন্দী আর বাকি পালিয়েছে। অসহায় অসহিষ্ণুতায় প্রশ্ন করি:

"আমাদের? আগে বলুন আমাদের কি হয়েছে?"

"সাতজন মারা গেছে!" আমি চেয়ারে বসে পড়লাম, হতবাক। ভাইয়াজী অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলেন:

"কি হল?"

"কিছু না।" ব'লে আমি ঘরে গিয়ে শুলাম। মনের কোন সূক্ষ্ম তারে যখন আঘাত লাগে তখন চোখে জল আসে। সেটাকে আমি কান্না বলি না। বহুকাল পর আজ ছেলেমানুষের মতন কান্নায় ভেঙে পড়লাম বিছানার ওপর। অসহায় নিবেদনে বার বার বললাম, "ও যেন না হয়… ঠাকুর, ও যেন না হয়!…কামাল ভাই যেন না হয়!…" নিজের অজ্ঞেও এভাবে কখন কিছু চাইনি ব'লেই বোধ হয়, আমার ঐ আকুল ক্রন্দনের সাড়া পাওয়া গেল। দু' দিন পর সংবাদ পাওয়া গেল, পুকর পাহাড়ের পরই আমরা পাকিস্তানি সৈন্য হাটিয়েছি পীর পঞ্জল পাস থেকে। এর ফলে ও পথে হানাদারের আসাই বন্ধ হল না, পাকিস্তানের অনেক রেজমেন্টই বন্ধ হ'য়ে গেল।

বহুদিন পর, ফেরার পথে শুনেছিলাম পুকর অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। গ্রামের পাঁচজন লোক নিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী নেমে চলে যায় পুকর পাহাড়ের ঠিক তলায় রাত তিনটের সময়। সেখানে গিয়ে ওরা দুদলে ভাগ হ'য়ে যায়। ঠিক হল, একদল ওদের সামনের দিকে থাকবে এবং এমন ভাবে হুল চালাবে যাতে মনে হয় যেন যে ওটা ওপরে উঠবারই জীবন বিপন্ন করা প্রস্তুতি। এই হুল আরম্ভ হবে ঠিক যখন অন্য দল বাঁদিক দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওরাই আগে প্রস্তুত হ'য়ে নেবে আর তারপরই এরা হুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওপরে ওঠা দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গ্রামের লোক, নিঃশব্দে. নিঃসাড়ে। ওরা এ ওয়াটে থাকে ব'লে প্রত্যেকটি ঘাঁটি ঘাট জানা আছে। ওরা সেপাইদের নিয়ে বাঁদিকে এমন এক জায়গায় গেল সেখান থেকে ওপরে ওঠা যতখানি শক্ত, উঠতে পারলে হানাদারদের আক্রমণ করা ততখানি সহজ। আন্দাজ ক'রে দেখা গেল, পাঁচিলের মতন খাড়া পাহাড় উঠতে হবে প্রায় দুশো ফিট। মাঝে মাঝে খাঁজ আছে, বেরিয়ে আসা পাথরও আছে তবে পুরো পাহাড়টা গা বেয়ে উঠতে হবে, হেঁটে ওঠার উপায় নেই।

নিস্তব্ধ রাত। অতএব সামান্য শব্দ করাও চলবে না। অসাবধানে যদি একটা ছোট্ট পাথরও গড়িয়ে পড়ে তাহ'লে ওপরে ওরা জানতে পারবে আর মৃত্যু অবধারিত—একজন নয়, যে কজন আছে সকলের। আলো জ্বালাও চলবে না, যেখানে দেশলাইর আলো দুমাইল দূর থেকে

দেখা যায় সেখানে পথ দেখা আলো যানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আর সব চেয়ে বিপদ—প্রথমেই দেওয়ালের মতন সোজা পাহাড় প্রায় কুড়ি ফুট। সেটা উঠলে তবে অন্য কথা। সাধারণ নিয়মে এই ধরণের পাহাড় চড়া হয় বঁড়শির মতন লোহার কাঁটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপরে ফেলে দিয়ে। সেটা যখন শক্ত ভাবে আটকে যায়, পাথরের খাঁজে কি পাহাড়ের কোন খাঁজে তখন দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। এখানে এবং এখন সে পথ বন্ধ। আর এমনি উঠলেই চলবে না। পিঠে আছে জিনিষ, জলের বাধন', অস্ত্র বাবার। কোমরে আছে জড়ানো দড়ি আর সঙ্গে আছে বন্দুক আর হাতবোমা। এইসব নিয়ে অতি সন্তর্পনে উঠতে হবে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়।

সবাই ইশারায় বোঝালো এ অসম্ভব, কারো ক্ষমতা নেই এ অসাধ্য সাধন করে। ইউ পি আর্মড পুলিশে ট্রেনিং, এমন ভাবে পাহাড়ে চড়া কখন শেখানো হয়নি। দরকার হয়নি কখন, হওয়ার কথাও নয়। গ্রামের লোকগুলো তখন এগিয়ে এলো, বললে, প্রথম কুড়ি ফিট তো পাঁচ মানুষের কাজ, ওরাই কাঁধে ক'রে দিতে পারবে। ব্যস্, বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজনের কাঁধে আর একজন তার কাঁধে আরও একজন—এই ভাবে কাঁধে কাঁধে পর পর পাঁচজন দাঁড়িয়ে পড়ল আর তাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, পুলিশ দলের বাইশজন।

দেশ-সেবাটা একবার নেশা যে একবার মনের মতন স্থান পেলে আর পেছিয়ে আসা যায় না। টাকার মায়ায় যেমন কংগ্রেসি কমিরা গদিতে আটকে গেছেন, তেমনি ঐ নির্জন রাত্রের নিমুক্ত সাধনায় ওরাও আটকে গেল নিঃশেষে আর ওরা নামতেই চায় না। এমনি ক'রে প্রায় একশো ফুট উঠে গেল ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যে। তখন ওদের আপশোস হল আর একটু আগে আসেনি কেন? এলে ওরা সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারত বিনা বাধায়—ও দলের সৈন্যদের আর মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হত না পাকিস্তানের সোজা নিশানার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। গেল ওয়ারলেস মেসেজ আর আরম্ভ হল পুরুর যুদ্ধের শেষ অঙ্ক।

ওদিকে চলল গুলি বন্দুক, ব্রেনগান, লাইট মেশিন গান আর এদিকে এরা উঠে গেল ওপরে, কাঁধের ওপর দাঁড়ানো মানুষদের সিড়ি বেয়ে। এরা যখন ওপরে উঠে হাতবোমা ফেলল ওদের বাঙ্কারে একেবারে সাত ফুটের মধ্যে গিয়ে তখন দুজন মেশিনগান চালাচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে আর চারজন ব'সে চা খাচ্ছে। এমন নিরাপদ জায়গায় ছিল এরা যে বুট প'রে আর চা খেতে খেতেই চালিয়ে যাচ্ছিল বুট, নিচের প্রায় পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে। দেখতে দেখতে হৈ হৈ প'ড়ে গেল, ওদের বাঙ্কারে বাঙ্কারে আর বাইট সুট পরা অধিনায়ক সমেত প্রায় বেড়শো লোক পালালো উর্ধ্বশ্বাসে নিচের দিকে। ওরা পাহাড়ের মধ্যে সুরঙ্গ কেটে যেন সহর গড়েছিল ভেতরে ভেতরেই।

হাবিলদার বললে, "এমন ভাবে পৌঁছে যাবো আমরা, স্বপ্নেও ভাবিনি কখন। তাজ্জব ওদের বোশ—ঐ গ্রামবাসীদের—একবার ভাবলো না ওরা কোথায় যাচ্ছে অমন ক'রে।" থেমে হয়ত ভেবে নিল সেই অসম্ভব দিনটির কথা, তারপর বললে:

"সাতজন গেলো বাবুসাব, চারজন নিচে আর তিনজন ওপরে।" থেমে আবার বললে, "আর অথম হল এলারো।"

"তারা কেমন আছে?" বিড়িতে মুঁ দিতে দিতে বললে:

"ভালো!"

বাস চলেছে নৃত্য করতে করতে আর খালি সিটের কুসন পড়তে পড়তে। সারা বাসে যাত্রী আমরা ছজন। তার মধ্যে ওরা তিনজন, যাচ্ছে ছুটিতে—দশ দিনের। প্রশ্ন করি:

"যারা এইভাবে যায়, দুঃখ হয়না তোমাদের? মনে পড়ে না তাদের কথা?"

হাসল হাবিলদার, বললে:

"দুঃখ হয় না বাবুসাব, হিংসে হয়। যারা ভীরু তারা মরে হাজারবার, যারা বীর তারা মরে একবার, ঐ ভাবে। তবে—" একটা টানা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, "দুঃখ হয় লখনিয়ার জন্যে। সে ঐ পাহাড়ের ওপর মরল নিজের থেকে আমাদেরই কারোর হাতের গুলি খেয়ে।"

"সে কি!"

"হাঁ সাব। ওরা ফ্ল্যাগ ওড়াবে তবে তো বন্ধ করব গুলি। ওরা এতো খুশী হয়েছিল যে ফ্ল্যাগ ওড়াতেই ভুলে গিয়েছিল!" থেমে আবার বললে, "অ বাবু সাব, আরে লখনিয়াকে তো আপনি দেখেছেন!"

"আমি?"

"হাঁ! হাঁ!···সেই যে পাহাড়ের ধারে পাহারা দিচ্ছিল আর আমি বললাম···"

"মনে পড়েছে···"

আমারও মনে পড়ল সেদিনকার অপোয়াস্তির কথা—ওর মুখটা দেখা হয়নি বলে। আজ নতুন ক'রে মনটা বেদনায় আর অপোয়াস্তিতে ভরে উঠল। কেন সেদিন ওর মুখটা আমি দেখিনি। কাপুরুষ দেখেছি—হানাদার। সাধারণ পুরুষ দেখেছি—নিজেকে। বীরপুরুষ দেখেছি—কাসাল সাহেব কিন্তু হতভাগ্যের চেহারা কেমন হয়?

"বড় ভালো লোক ছিল লখনিয়া। বীর। আর স্বভাব কি, যেন জল—কিন্তু বড় বদ নসীব বাবুসাব, বড় বদ নসীব···"

॥ একুশ ॥

আরম্ভের শেষ

পীর-পঞ্জল আর হাজিপীর যেই হাতে এলো তখনই সব দর ফেলে বাঁচল। "নতুন হানাদার আসা বন্ধ, যারা এসেছে তাদের বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ।" বলা বাহুল্য, এটা আমাদের সরকারের ঘোষণা। সংবাদটা সুখের এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার মতনই, সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। এই দুটো জায়গা দিয়েই যদি যাতায়াতের পথ হয় এবং আমরা সেটা বড় গলায় বলার মতন ক'রেই জানি তাহ'লে আগে থেকে সাবধান হয়নি কেন? আর এটাও যখন জানি যে বেশী লোক এসেছে এইবার দিয়ে তখন পাহারা সত্ত্বেও কি ক'রে তারা এলো তাও নিশ্চয় জানি। সেটা কি? দোষ কারই বা?

সবাই জানে দোষ কার—শুধু সরকারই জানেন না। আর নয়ত জানেন, বলেন না। সাধারণ লোক সারা দেশে যা বলে সেটা অবশ্য সেগুলো আলোচনা করা মানে মুখ উঁচু ক'রে থুথু ফেলা।

কাশ্মীরের কিছু লোক নিশ্চয় ছিল—যখন যারা কুইসলিং সব দেশেই থাকে, কিন্তু তারা ঐ শেখ আবদুল্লাহ, বকশি গুলাম মহম্মদ, ঐ পালাবাবু···ওরা তো আর হানাদারদের হাত ধ'রে বর্ডার পার করিয়ে আনেন নি। সেটা সম্ভব হ'য়েছে যারা বর্ডারে ছিল তাদের অপরাধে কিন্তু তাদের অপরাধ সময়মত জানা যায়নি, কেন? এ ব্যাপারে বড় বড় ভারতীয় এবং অ-মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের নামও যে শোনা যায় না তা নয়। সাতজন ব্রিগেডিয়ার আর বারোজন কর্ণেলের নাম তো প্রায় প্রত্যেকের মুখেই শুনেছি। শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব কেশরী নাকি পাকিস্তানে পালিয়েছেন, একজনকে সাধারণ জোয়ান, কুকুরের মতন গুলি করে মেরেছেন পীর-পঞ্জল পাহাড়ে এবং বাকিরা নাকি ধামা চাপা আছেন। এঁদের, কথা সরকার অথবা সৈন্য দপ্তর কোনদিনই প্রকাশ করবেন না, তবু আমাদের জেনে রাখা দরকার, নাহ'লে বুঝব কি ক'রে যে কংগ্রেসী নেতাদের দুর্নীতির জাত-ব্যবসা স্বাধীনতার পর আমাদের সারা জাতটাকে কোথায় নামিয়েছে!

এইসব নানান আলোচনায় দিন যায়। হানাদারি খবর মাঝে মাঝে আসে তবে সবই সীমান্ত ঘেঁষে। শ্রীনগরের তিরিশ মাইলের মধ্যে সব শান্ত কখন যে কিছু হ'য়েছে বোঝবারই উপায় নেই। তবে কিছু হানাদার যে সহরের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে সে বিষয় কারো কোন সন্দেহ নেই। সব ব্রীজেই সশস্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে শহর প্রদক্ষিণ, সংকারি দপ্তরে আর সাহেব সাহেবের বাড়ীতে সাংঘাতিকের মার নেই। তারই মধ্যে শোনা যায় এখানে লোক ধ'রেছে ওখানে লোক ধ'রেছে—কাউকে সন্দেহে, কাউকে সপ্রমাণে। সারাদিন এই ভাবে জীবন চ'লে—ঐ বরফাকড়ের কেউ তোয়াক্কাই করে না। দোকানপাট সব খোলা, ফুল স-জলরবে জীবন্ত, বাজারে সেই দর দস্তুর কিকি কিনি। কেবল আটটা বাজলেই সব অন্ধকার, কারণ সাড়ে আটটা থেকে কারফ্যু। তখন পথে ঘোরে পুলিশ আর ধারণ করা সত্ত্বেও আমাদের কালা ভাইয়াজী। ধরা যে পড়েন না মাঝে মাঝে তা নয়, কিন্তু ওঁর নাকি 'ট্রিক' আছে। সেটা অবশ্য কিছুই নয়, ধরলেই বলেন, উনি সি আই ডি আর ওঁর এক কলেজের চাকরি আছে সেটা স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দেন! আমি বলি, যদি কেউ প'ড়ে ফেলে? উনি হেসেই আর বাঁচেন না, বলেন, সেই আদ্যিকালের মিশনারী কলেজের চাকরি। লেখা যা আছে তা ল্যাটিন ভাষায়। সেই উনিশ শো এগারো থেকে এই পঁয়ষট্টি পর্যন্ত বহু চেষ্টা ক'রে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারলাম না তা ঐ নেংটি পরা পুলিশ···নাও, চা খাও!

এই করি আর করি ফকারার অপেক্ষা। যদি সে আসে। সেই যে নেমে গেলো সেদিন তারপর থেকে ওর আর প্রায় দেখাই নেই। মাঝে মাঝে হয়ত দেখা হ'য়ে যায় এদিক ওদিক কি এখানে সেখানে, তখনই ও অদ্ভুতাতের ঝড় তোলে আর বলে একাজ, ও কাজ, সে কাজ। কাজ অবশ্যই ও অনেক করছে তবে এটাও বুঝি সে সময় ক'রে সেই আগের ধারায় আসতে না পারার মতন নয়। আমি জোর করি না। মনের মতন কারণ না থাকলে এতোখানি অকরুণ হওয়ার মতন মেয়ে ও নয়। নিজের ইচ্ছেয় যেমন একদিন ও এসেছিল, তেমনিই একদিন ও আবার আসুক আর আমি আমার বলার কথাগুলো ওকে গুছিয়ে বলে দিই—এইটাই আমার অবচেতনার নিবিড় আশা। সেই আশা নিয়েই ওর আসার প্রতীক্ষা করি।

এমনি ধারা নানান চিন্তার ভার নিয়ে একদিন দাঁড়িয়েছিলাম জানলায়—তখন বোধহয় হবে রাত দশটা, হঠাৎ একটা জীপ আসার শব্দ এলো কানে। কারফ্যু দিয়ে মোড়া ঘুমন্ত সহরে জীপের

আওয়াজটা প্রথমে ত্রাসেরই সঞ্চার করে, তাই কৌতূহলটা একটু বেশীই হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম জীপটা যেন আমাদের বাড়ীর দিকেই এলো। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তাই। ঘাড় বের ক'রে ফকারা বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, বোধহয় ভাবল আসবে কি আসবে না, তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে চ'লে গেল। দুদিন পর পর ঠিক একই ব্যাপার হল।

তখন অপেক্ষায় রইলাম, এবার যদি আসে তো ধরব কিন্তু আর ও এলো না। তারপর দু-তিন দিন ওর কাজের জায়গায় সন্ধান নিলাম। হয়ত ওর ফিরতে অনেক রাত হয় বলে ওপরে আসতে দ্বিধা হয় তাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমি জেগেই থাকি। কিন্তু সেখানেও ওর কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। এই লুকোচুরি খেলায় সাতদিন কাটলো—রবিবার থেকে রবিবার—মানে আটদিন। আর থাকা যায় না—হয়ত এবার একদিন হঠাৎ চলে যেতে হবে প্রেম সাহিব খুললেই তখন কথাগুলো অ-বলাই থেকে যাবে, তাই রবিবার বিকেলে পৌঁছে গেলাম ওর বাড়ীতে। মায়োজান বললে, ও পাহাড়ের ওপর গেছে।

উঠে গেলাম ওপরে। গিয়ে দেখি ওর 'মাটির মায়া' সিংহাসনের ওপর পা তুলে আর হাঁটুতে মাথা এলিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। একবার মনে হল ফিরেই যাই—ওর সব গোপনতার দেখে আমি পরদেশীর ঠৈলপাশে আর কাজ নেই—কিন্তু ওকে ঐ অসহায়ের মতন ব'সে থাকতে দেখে মনের চেয়ে মায়াটাই বড় হ'য়ে উঠল।

আমায় দেখে ও একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। যেন পাথর। অপলক চেয়ে রইল এমনভাবে যেন জীবনে কখন ও পলক ফেলা শেখেই নি। হেসে বললাম :

"পরদেশীকে বলবে বলতে হয়।" তখন যেন ও প্রাণ পেল, বললে :

"বস।"

আমি গিয়ে বসলাম ওর সিংহাসনে ঠেলান দিয়ে, মাটিতে।

"কি ব্যাপার?" হাসতে হাসতে বললাম, "তুমি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছ!"

"না না···মানে আমার এতো কাজ।"

"জানি। সোমবার আর মঙ্গলবার রাত দশটায় ফিরেছ জীপে ক'রে—সোমবার ছিল শালোওয়ার পরা আর মঙ্গলবার ঐ নীল শাড়ীটা···"

"দেখেছ বুঝি?"

"দুদিনই।"

"কোথায়?···আমি তো সারাদিন বাড়ীর বাইরে যাইনি।"

"গিয়েছিলে। অনেক রাত্রে।"

"তুমি কোথায় ছিলে?"

"বারান্দায়।"

"ও।" একটা শ্বাসের আশা ছিঁড়ে, সেইটা দেখতে দেখতে ও বললে :

"হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

এক চোখ দেখে ও একটা কথাই ছোট্ট ক'রে বললে :

"এমনি।"

হেসেই আবার বলি :

"দরজায় যখন গেলেই, দেখা দিলে না কেন?"

আবার ও ছোট্ট ক'রে উত্তর দিল—

"এমনি।"

এরপর আর কথা চ'লে না। বাধ্য হ'য়ে চুপ ক'রে বসে চীর্ণ মেঘের চির নতুন খেলা দেখি। কাশ্মীরের এই আকাশ জোড়া সৌন্দর্য্য জীবনেরই প্রস্থিপ্ত প্রতিরূপ কখন সাদা, কখন নীল, কখন মেঘে ঢাকা আবার কখন রঙের মেলায় মত্ত! বাদলের আসা যাওয়ায় বদলের শেষ নেই। হঠাৎ এক সময় সুর বদলে রুকায়া বললে :

"কি ভাবছ?"

"ভাবছিলাম, হেলেই যখন দেখা করলে না কেন?"

"তোমার কাছে গিয়েও সরে আসাটা সইয়ে নিচ্ছিলাম। তুমি এসেছ, কারণ আমার চেয়ে তোমার মনের জোর অনেক বেশী।"

হেসেই বললাম : "কামালের তুলনায় কিছুই নয়।"

"ওর কথা থাক।"

"কেন? এখানেও তো এসেছ ওরই কথা ভাবতে।"

ও ছোট্ট ক'রে বললে, একবার অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে :

"হ্যাঁ।"

"আমিও এসেছিলাম ওর কথা তোমায় কিছু বলতে।"

"বল।"

মনে মনে আরও একবার কামালের নির্মুক্ত মুখখানা স্মরণ করি। কিছুতেই তা মনে পড়ল না, কেবল চোখের যে দৃষ্টি দিয়ে ও আমার কাছে দয়া ভিক্ষা ক'রেছিল তারই কিছু ছায়া অন্তর থেকে হৃদয় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে রইল। আমার ভালোবাসার মধ্যে ও শুধু মুক্তি চেয়েছে। রবি ঠাকুরের অমিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাই চেয়েছিল। আমি চাইলাম আরও একটু ভালোবাসা, দেহের সীমানা ছড়িয়ে যেটা দৈবত। আজ যেমন ক'রে পারি রুকায়ার এই সব-পেয়েছির দেশে কামালকে আমি পৌঁছে দেবই দেব। আমার পায়ের কাছে ছড়ানো অশান্ত কাশ্মীর, অসহায় শিশুর মতন মনের কোল জুড়ে বসল। বললাম :

"কি জানো রুকায়া, ওকে তুমি বোধহয় কোনদিনই ঠিক বোঝোনি। সাধারণ মানুষ ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তার একটা স্পষ্ট সীমানা হল দেহ। ও যা বোঝে তার অনৈক্য রূপ হল দেহ। সেদিন আফরাণ কেতে ও তোমায় চায়নি, তোমার মধ্যে ওর কাশ্মীরের প্রতিরূপ চেয়েছিল। তুমি যা ওকে দিয়েছিলে ও চেয়েছিল ওর দেহপ্রেমের সাথে সেটা জুড়ে নিতে। তুমি তা বোঝোনি। হয়ত ওই সেটা তোমায় বোঝাতে পারেনি। এটা হল মনের দিক। রইল দেহ। তোমায় ও একদিন কাঠের পুতুল বলেছিল। কেন জানো?"

গাছে হেলান দিয়ে রুকায়া অসহায়ের মতন ব'সে কথাগুলো শুনছিল। অস্পষ্ট বললে :

"কেন ?'

"কারণ, তোমার দেহ কোনদিনই ওর প্রাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেনি। পারবেও না কখন। ওর কামনা তো দেহের নয় দেহীর। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে কামনার নিবীড় পূর্তি সম্ভব নয়। ওর দাবী দেহ কখন মেটাতে পারবেই না। তার জন্যে চাই দেশের মাটি—যে প্রেমের পরিবর্তে চায় প্রাণ।...সেই জন্যেই সংসার ওকে বাঁধতে পারেনি, শক্ত পেছনে বাওয়া ক'রে ও ছুটে বেড়ায়।

"কিছুটা বুঝলাম," হাতের চুড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ফকায়া আমার দিকে না তাকিয়েই বললে:

"বেশীটা মনে হল অতি সূক্ষ্ম। অত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবন চলে না!"

হেসে ফেললাম:

"অসাধারণ হওয়ার এইই বিপদ। দৈনন্দিনের মাপকাটিতে তাদের বোঝা যায় না ব'লে, সবাই ভাবে তারা অমানুষ। থেমে বলি, "ক্ষতি নেই তোমাদের ভাষাতেই বলি:

"আজ দেশের কাছে ওর অনেক দাম। যদি পারো, পঁয়তাল্লিশ কোটির মুখ চেয়ে তুমি ওকে কাছে ডেকে নাও। একজনের মুগ্ধ ভালোবাসায় ওকে তুমি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দিও না। আমার কাছে আমার মূল্য যতই হক, দেহের মাপকাটিতে আমি পঁয়তাল্লিশ কোটির মধ্যে একজন, ও একেবারে আলাদা। অদৃশ্য মৃত্যুর ভীড় ঠেলে যেদিন তোমার কাছে এসে ও দাঁড়াবে, শুধু একটা কথাই তুমি ওকে দিও—'ভালোবাসি।"

ফকায়া চুপ ক'রে শুনতে থাকে, ঐ প্রকাণ্ড হরি পর্বতের মতন শুব্ধ আবেশে। আমি কাছে এসে ওর হাতটা ধ'রে বলি:

"আমি নিজে কখন দেশের কথা ভাবিনি। স্বার্থের অন্ধকারেই আমার বেলা গেছে। যেদিন ছোট্ট ক'রে একটুখানি ভাবতে ব'সেছিলাম চাকরি ছাড়ার পর সেদিন আমার অনেক কাছের মানুষরা জীবনের এমন যুদ্ধ শুরু ক'রে দিল যে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। আজ মনে হচ্ছে বাঁচার হয়ত কিছু সার্থকতা পাবো যদি ওকে তোমার জগতে আবার আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। আমার দেশের স্বার্থান্ধ মানুষরা কাশ্মীরের যে ক্ষতি করেছে, আমার দিক থেকে এইটাই তার প্রায়শ্চিত্ত।"

ও আস্তে ক'রে বলল:

"আমিও যদি জীবনের যুদ্ধ শুরু ক'রে দি ?"

"তাহ'লে মানুষ পাবে, মন পাবে না। দেহ পাবে কিন্তু শ্রদ্ধা পাবে না"

"কেন ?"

"প্রেমের আসল সাধনা হল ত্যাগের সাধনা। সেইখানেই তুমি হেরে যাবে।"

"তুমি কি চাও ?" ওর কাঁধের ওপর আমার হাত দুটো কাঙালের মতন অসহায় ভাবে রেখে বলি:

"ভিক্ষে। তোমার অকুণ্ঠ ভালোবাসার এই ঐকান্তিক দান।"

ফকায়া চুপ ক'রে থাকে। পৃথিবীটাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক নিচের ধান ক্ষেতে মেয়েরা গান গাইতে গাইতে কাজ করছিল। হাওয়া বাদুনের গানের দুটো লাইন কানে এলো।

"ভালোবাসে ব'লেই চাঁদ
পৃথিবীতে নেমে আসে না।

ভালোবাসে ব'লেই কান্নারা ঘুম
আকাশে উড়ে যায় না···"

ওর উত্তর শুনবার আমার আর সাহস নেই। তাই চ'লে যাবো ব'লে হাতটা নামাতে যাচ্ছিলাম ও হাত দুটো কাঁধের ওপরই চেপে ধরল, বললে :

"আর কি কখন আমাদের দেখা হবে না?"

"হবে।" আমি বললাম, "নিশ্চয় হবে। রোজ হবে। তুমি থাকবে আমার মেকরা পরা মনের অনেক আদরের গ্রন্থি। দৈনন্দিনের এতটুকু ক্লেদ কখন তাতে লাগবে না।"

হেসে রুকায়া বললে :

"চল, তোমায় কফি খাওয়াবো। বিলেতি নয়। খাঁটি মাদ্রাজি।"

ছেলে ওর মহানন্দে পা ছড়িয়ে ব'সে খবরের কাগজ কাটছিল।

"সর্বনাশ!" রুকায়া বললে, "ওটা যে আজকের কাগজ! আমায় এখনও পড়া হয়নি!" ও হেসে আর হাত বাড়িয়ে এক কালি কাটা কাগজ দেখিয়ে বললে :

"আমার বাবার ছবি!" মাকে বললে, "এটা কিন্তু কাঁচের ফ্রেমে আমি বাঁধিয়ে রাখব!"

রুকায়া আমার দিকে তাকালো, কিছু বলল না। ছেলে চ'লে গেল বাবার ছবিটা বুকের ওপর চেপে ধ'রে। রুকায়া পেছন পেছন গেল, কফির ব্যবস্থা করতে। আমি ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম, নিখিলেশ কত বড় হল? ছ বছর, এবার বোধহয় সাতে পা দিল।' সে তার বাবার ছবি কাগজে দেখলে কি করে? চেনে কি? জানে কি? বোঝে কিছু? বলে কি? জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে পৃথিবী বোবা বেদনায় নিথর। পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের মুখ চেয়ে কামালকে বাঁচিয়েছি। ঐ আবছোটা শিশুর কথা ভেবে নিজেকে বাঁচাবো। আরো ভাবতে থাকি, দুনিয়া-শুদ্ধ লোককে আমি নাটক দেখিয়ে বেড়াই অথচ যে নাটকটা আমার জীবন উবছে পড়ছে, সেইটাই দেখবার লোক নেই, কাউকে দেখাবার সাহসও নেই। আর লবনিয়ার মুখটা না দেখার জন্যে দুঃখ নেই। নিজেরটাই আমার দেখা আছে। কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেললাম। কফির ট্রে নিয়ে রুকায়া ঘরে ঢুকে বললে :

"হাসছ যে?"

অস্পষ্ট জবাব দিলাম :

"কাঁদবো না ব'লে।"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আমার সোনার বাংলা

প্রকৃতির চিরহরিৎ ভূমিকা, ষড়ঋতুর লীলাবর্তে গরবিনী, গ্রামে গাঁথা বাংলা। উত্তরে শৈলশিখরে শুকতারা-শুভ্র চিরতুষার মুকুট, দক্ষিণে প্রভাত সন্ধ্যার রাগ-রঞ্জিত নীল সিন্ধুজল। নদীভরা জলে, মাঠভরা ফসলে এ এক রূপকথারই দেশ: শ্যামলে শ্যামল, নীলিমায় নীল। শতেক যুগের শতেক কবিরা মিলে বঙ্গজননীর বন্দনাগানে উজ্জ্বল রূপের বন্দনা ক'রে গেছেন। আজকের দিবা-বিভক্ত, দ্বেষ-মলিন, নিরন্ন দেশের সঙ্গে সেদিনের সুফলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার কোনো মিলই যেন নেই।

অথচ একদিন ছিলো তার রাজপাট, রাজ-সওদাগর, কবি, ভাস্কর, ধর্মপ্রচারক—বিচিত্র কীর্তি। দীর্ঘকাল তাম্রলিপ্ত ছিলো সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বিখ্যাত বন্দর। এ-দেশের শিল্পীদের হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখের কাজ, সোনারূপোর তারের কাজ য়ুরোপের বাজারে তখন বিক্রি হতো। এ-দেশের সওদাগরেরা সেদিন শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নয়, তুরস্ক, আরব, পারস্য, তিব্বত ইত্যাদি বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও। যে-দেশের মাটিতে যুঁথী, মালতী, কেতকী, কদম্ব, পলাশ, কাঞ্চন, চাঁপা, বাসবী, বকুল আর শেফালীর সত্তা, পুলিনচরের চেতনা সে-দেশেই সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। আর শিতল কাঁসার থালা-বাসন, বৃৎশিল্প, বেতশিল্প, শোলার কাজ—ইত্যাদি কুটীর শিল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাঙালীর শিল্পতৃষ্ণা তৃপ্ত হতো, তেমনি তার অন্ন-সংস্থানও হতো। সন্তানের পরিতৃপ্ত কলকণ্ঠে মুখরিত থাকতো মায়ের ঘাট-ঘাট-বাট। তাই তখন শোনা যেতো আগমনী আর বিজয়ার গান, মন উদাস-করা বাউল, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, ভাটিয়ালী গান! আর

তখন ছিলো বারো মাসে তেরো পার্বন—ধর্মপ্রাণ বাঙালীর আনন্দের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। সমৃদ্ধ বাংলার ভুবনমোহিনী রূপ বিধৃত হয়ে আছে তার কবি-সাহিত্যিকদের মৃত্যুত্তীর্ণ রচনায়।

আজ যাঁ মনে হোক, 'সোনার বাংলা' নামের সার্থকতা একদিন সত্যিই ছিলো। অতীতের সেই বাংলায় প্রাচুর্য ছিলো, জীবন ছিলো, আনন্দ ছিলো, অবকাশ ছিলো, নবীনতা ছিলো, স্নেহ-প্রীতি

ছিলো, আতিথেয়তা ছিলো, গান ছিলো, মানুষের মন ছিলো, মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ছিলো। নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং রীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সবই তখন হিল্লোলিত হয়ে সকলকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ বিকশিত ক'রে তুলতো। বিগতদিনের বাংলার সেই সমৃদ্ধি, সেই প্রাচুর্যের সামান্য পরিচয় দেবার জন্য, বিস্মৃত বাংলার সেই গরিমাময় রূপ আবার স্মৃতিপথে সজীব করবার আশায় বাংলার কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের রচনার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি আর কিছু চিত্র পরিবেশন করা হলো। প্রাচীন, সমৃদ্ধ বাংলার তুলনায় বর্তমান বাংলার দুরবস্থার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তেই তা উপলব্ধি করছি,—তার ভিতরেই আমরা রয়েছি। যে অতীতের বাংলা আজ আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে, আমাদের স্বপ্নলোকের সমার্থক, প্রায় বিস্মৃত তার কথাই আজ আমরা বলবো। বাংলার সেই মহিমাময়ী রূপই নতুন বাংলা গঠনে, আবার তাকে সমৃদ্ধ, গরিয়সী ক'রে তুলতে প্রেরণা দেবে। যে নদী তার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তার জীবন ধারা ক্রমে-ক্রমে শুকিয়ে আসে। যে জাতি বা দেশ নিজের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে তারও প্রাণ-ধারা নিঃশেষিত হতে বাধ্য। তা যাতে না হয় তার জন্যই আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে উৎসে, স্মরণ করতে হবে জননী জন্মভূমির অতীত মূর্তি।

আমার সোনার বাংলা

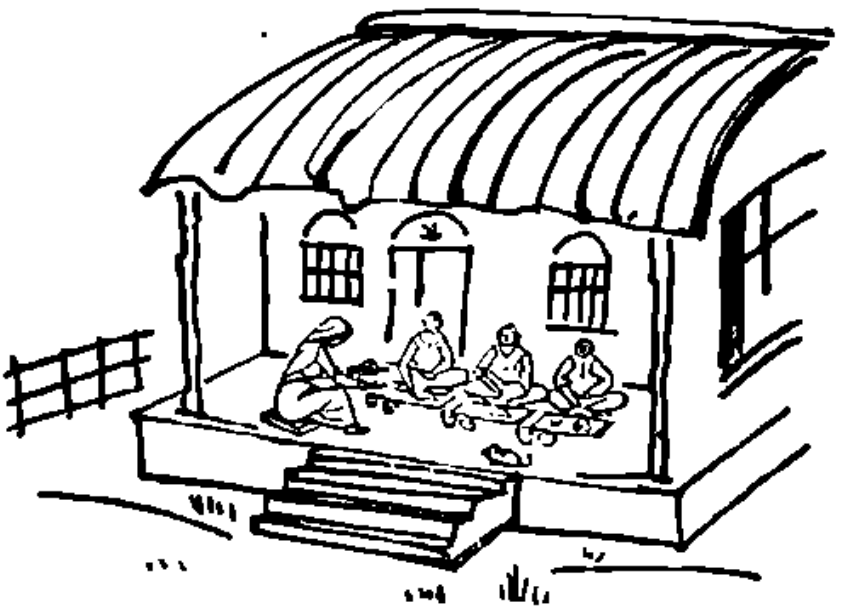

ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভম পত্তা গাইক ঘিত্তা দুধ সজুত্তা
মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা বা (ই) পুন্নবন্তা।

(কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতাশাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান।)

প্রাকৃতপৈঙ্গল (হাজার বছরেরও আগেকার রচনা)

শালিচ্ছেদসমুদ্ধচালিবসুহাঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল—
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোল্লসাঃ।
মোদন্তে পরিপুরুষেয়নমুখস্বাপাঃপলাশৈর্ন বৈঃ
সংপক্কযবনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ॥

(চাষীদের গৃহে ধান্যরূপ ঐশ্বর্য জ্ঞাপন করছে, নীলোৎপলের সংযোগে নব-প্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রের সীমাকে দীর্ঘায়িত করেছে, গোরু ষাঁড় ছাগল ঘরে ফিরে এসে নতুন খড় খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে : গ্রাম সব হয়েছে আখমাড়াই কলের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আকুল।)

এক অজ্ঞাতনামা কবি (হাজার বছর আগেকার)

লোকশিক্ষা

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাতুস নুতুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের ব্রতাব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহে যুধিষ্ঠির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সখ্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটুয়া কাটে যে ভাত পায় না পায়, সেও শিক্ষিত—শিক্ষিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষ। গুলকি কাওয়ালী শুনার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওয়ালীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অন্ধ ইংরাজীতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপী, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং
বন্দেমাতরং

—বঙ্কিমচন্দ্র

সেকালের ব্রাহ্মণ কায়স্থ গৃহস্থ কখনই বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া খাইতেন না। সকলেরই জমি জমা ছিল, ধান আসিত, মাবাইতরা ধান থাকিত : প্রায় সকল বাড়ীতেই ঢেঁকি থাকিত,

গোহালঘরও থাকিত। দুধ কিনিয়াও কেহ খাইত না। বিদেশী কেহ আসিলেই গ্রামের হাট বাজার হইতে চাউল, ডাল, ঘৃত, দুগ্ধ কিনিয়া খাইত। গ্রামস্থ কেহই লক্ষ্মী কিনিয়া খাইতেন না। যে গৃহস্থ উঠনা খাইত, অর্থাৎ প্রত্যহ দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া খাইত, তাহাকে লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলিত, সমাজে তাহার বেজায় নিন্দা হইত।

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

জননি তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।

ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা :
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা :
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

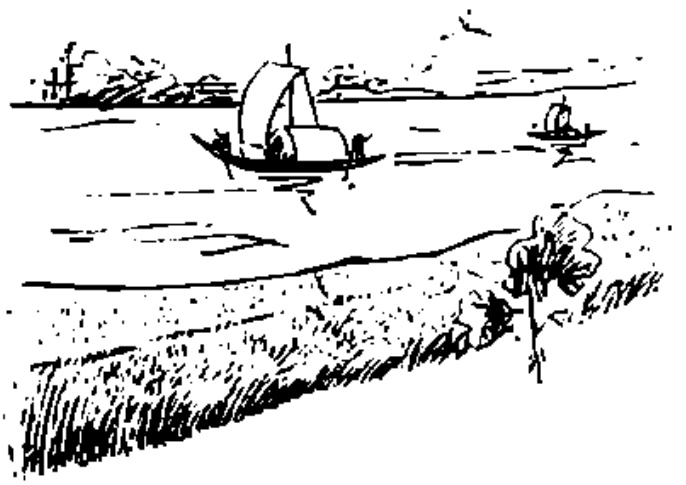

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!

স্বদেশ আমার! নাহি করি রতন,
তোমা সম বসু ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রাম গুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে—ঘেরা সহস্র কুটিরে,
মোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে ঘাসল-দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—

• • •

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।

• • •

বহিছে প্রখর শিশির সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা, কত আয়োজন—
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
তাকাবে তব মুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।

• • •

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,

—রবীন্দ্রনাথ

• • •

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় বাঁধি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তি-ধারা ;
আছে কই, এমন ভাষা
এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা।

—অতুলপ্রসাদ সেন

কলিকাতা হইতে মহুয়া আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ডিয়ান চড়াইয়াছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কাঙালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ওধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য্য ধান ঝাড়িয়া পাঁট করিয়া গাদা করিতেছিল—সে দিকে অনেকেক লোক খাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া বাহুল্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল। ... ...

প্রতি বৎসর মহা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভুষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণবাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারেও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজ সরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমী-পূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

—শরৎচন্দ্র

কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে!

নারিকেলের গোপন কোষে
অমৃতপানী জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে,
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

রসের ভিয়ান চড়িয়েছে যে নতুন বা'নেতে :
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মিঠায় ! মিঠা ! তাতারসি তুমি কি মিষ্টি !
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি :
প্রথম শীতের রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত
মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-বৃষ্টি !
লোভের জিনিস ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ আদিম সত্য দেশ,
'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ :
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
বঙ্গ হ'ল মিশর,—ওরে !
সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাস্তদি বঙ্গভূমি !
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।

তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পতর পদ্ম তোমার জোগায় কাপাস দিন রাতি,

ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবি, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল্ তোর মত ?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় খিতিয়ে রয়,
ছুটবে কে পারস্য সাগর ? মুক্তা সে তোর বিলেই হয় :

দুধের ভিতর পীযূষ তোমার জমছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-কটি তোর পথিকজনে সাধছে গো !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান,
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশীতে ঘুমিয়ে আসন যান।
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর
মোরে মোরে মরে বিদায়-বিধুর!
যান ভান বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে যান!

—আর আজ?

ক্ষুধাতুর শিশু চায়না মরাল, চায় দুটো ভাত, একটু নুন
বেলা বয়ে যায়, মাঝনিক' বাড়া কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
আমরা তো জানি, মরাল আনিতে গোড়া বার্ডাকু এনেছি যাদ!
কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া প্রাণ
এল কোটী টাকা, এল না মরাল!
টাকা দিতে নারে দুখারী সমাজ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, ঘোরা বলি, বাঘ, খাও হে যাদ।
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা চেকে রেখে ঘরে ছেলের লাস।

মাটির টিবিতে দু'দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া
এ পেষণে তারি আসন ধসিয়া ঘটিছে গোরস্থান!
যে যত ভণ্ড বড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।

নজরুল

ঐ ব্রজ চক্রবর্ত্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন! পৌষপার্ব্বণের দিনও চৌকিশালে একমন চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাকরুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকৌশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রাম রাত্রি একদিন
আলপনায়, পটের ছবির মতো সুবাস্তা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায়: নিভে গেছে সব।"

জীবনানন্দ দাশ

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

টেলিফোনে

(সত্যি সত্যি শোনা)

অধ্যাপক শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়

—হ্যালো !

—বলুন।

—বলছি ত !

মেয়েটার গলা বেশ চড়া পর্দায় বাঁধা।

—কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আর একবার বলবেন কী ?

ছেলেটার গলায় নরম সুর। ঈষৎ কৌতুক মেশানো।

—বলছি, 'র' বাবুকে ডেকে দেবেন কী ?

আদি অক্ষর 'র'—এমন একটি নাম মেয়েটি বললো।

—আমার সেই 'র' বাবু !···বলেছি ত 'র' বাবু নেই।

(কৌতুকের সুর)

—'র' বাবু নেই ? (বিস্ময়ের সুর)

টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর 'ডায়াল' করার আগেই কানে এলো দুটি কণ্ঠ, একটি মেয়ের আর একটি ছেলের। বুঝলাম cross connection, যা প্রায়ই হয়ে থাকে। রেখে দিতে যাচ্ছি এমন সময় মেয়েটি বলে :

—আপনি 'গুল' দিচ্ছেন !

ব্যস ! সব গুলিয়ে গেল। রিসিভার রাখা হোলো না। মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপলো। আড়ি পেতে পরের কথা শোনা নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। কিন্তু ছঁয় বড়ই দুর্ব্বল। একটি মেয়ে বলছে অপরিচিত একটি ছেলেকে—'আপনি 'গুল' দিচ্ছেন !' "আ-মরি বাঙলা ভাষা। মোদের সরব মোদের আশা !" বিভোপদেশকে দূরে সরিয়ে হাতের রিসিভার শক্ত করে চেপে ধরলুম। নিজের একটা জরুরী টেলিফোন করার ছিল। করা হলো না। কানে এলো, ছেলেটি বলছে :

—বাঃ ! গুল দেবো কেন ?

—কেন দেবেন তা আপনিই জানেন। কিন্তু দিচ্ছেন। সত্যি বলছেন 'র' বাবু নেই ?

ছেলেটী।—'র' বাবু বলে কেউ এখানে থাকে না।

মেয়েটী।—থাকে না !···আপনার নম্বর কত ?

ছেলেটী।—আপনার কত?

মেয়েটী।—আমার নম্বরে আপনার কী দরকার?

ছেলেটী।—আমার নম্বরেই বা আপনার কী দরকার?

মেয়েটী।—আমার দরকার 'র' বাবুকে, আপনাকেও নয়, আপনার নম্বরও নয়।

ছেলেটী।—বহুম ত 'র' বাবু নেই।

মেয়েটী।—যা-রে! (বেশ টেনে বললো 'যা-রে' কথাটী)

ছেলেটী।—কেন?

মেয়েটী।—একবার বলছেন 'র' বাবু বলে কেউ এখানে থাকে না। আবার বলছেন 'র' বাবু নেই। দু'টোর দু'রকম মানে হয়। কোনটা ঠিক বলে ধরবো?

ছেলেটী।—যেটা ইচ্ছে।

মেয়েটী।—আপনি কী আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

ছেলেটী।—(অল্প হেসে) ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই। রসিকতা করা সোজা জিনিষ নয়।

মেয়েটী।—বেশ ত কথা বলতে পারেন দেখছি।

ছেলেটী।—তাই নাকি?…জেনে খুসী হলুম।

মেয়েটী।—আপনাকে খুসী করার জন্যে ও-কথা বলা হয় নি।

ছেলেটী।—জেনে দুঃখিত হলুম।

মেয়েটী।—তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই।…এখন দয়া করে একটা কাজ করবেন?

ছেলেটী।—বলুন।

মেয়েটী।—'মী' কে একটু ডেকে দেবেন?

আদি অক্ষর 'মী', এমন একটী মেয়ের নাম বললো মেয়েটী।

ছেলেটী।—'মী', নেই।

মেয়েটী।—সে কী…'মী'ও নেই! 'মী' কোথা গেছে?

ছেলেটী।—তা ত জানিনা।

মেয়েটী।—আচ্ছা 'শি'?

আর একটী মেয়ের নাম, 'শি' দিয়ে শুরু।

মেয়েটী।—'শি' আছে ত?

ছেলেটী।—না।

মেয়েটী।—'শি' কী কলেজ গেছে?

ছেলেটী।—তা ত বলতে পারি না।

মেয়েটী।—আচ্ছা থাক্! …'মী'র মাকে একবার ডেকে দেবেন?

ছেলেটী।—তিনিও নেই।

মেয়েটী।—'মী'র মা-ও নেই?

ছেলেটী।—না।

মেয়েটী।—আপনি একটী মস্ত গুলবাজ।

ছেলেটী ॥—কেন ?

মেয়েটী ॥—কারণ যাদের নাম বলুম তারা কেউ-ই ঐ ঠিকানায় থাকে না। তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। ওরা সবাই আমার কল্পনা। অথচ আপনি জিজ্ঞি বলে গেলেন—'ওরা বাড়ীতে নেই'।

ছেলেটী ॥—নেই-ই ত। আপনিই ত বলেছেন 'নেই'। আমিও ত 'আছে' বলি নি! তা যদি না হয় আপনি আমাকে গুলবাজ বলতে পারতেন—

মেয়েটী ॥—আপনি ত দেখছি খুব চালাক!

ছেলেটী ॥—তাই না কী ?

মেয়েটী ॥—কোন্ কলেজে পড়েছেন ?

ছেলেটী একটী কলেজের নাম বললো। কোলকাতার একটি নামকরা কলেজ।

মেয়েটী ॥—কখনো নয়। আবার গুল দিচ্ছেন ?

ছেলেটী ॥—কেন ?

মেয়েটী ॥—ও কলেজের ছেলেরা আপনার মত হয় না।

ছেলেটী ॥—তাই নাকি ? তাদের বুঝি কিছু বৈচিত্র্য থাকে ?

মেয়েটী ॥—বৈচিত্র্য না থাকলেও বৈশিষ্ট্য থাকে।

ছেলেটী ॥—বাঃ! আপনি ত বেশ ছন্দ, অনুপ্রাস দিয়ে কথা বলতে পারেন। সাহিত্যের ছাত্রী নিশ্চয়ই—

মেয়েটী ॥—মোটেই নয়। আমি ছাত্রীই নই।

ছেলেটী ॥—তাই নাকি! আপনার কথা শুনে কিন্তু আপনাকে ছাত্রী-ছাত্রী মনে হচ্ছিল—

মেয়েটী ॥—অনেককাল আগে ছাত্রী ছিলাম।

ছেলেটী ॥—অনেককাল আগে ? আপনার বয়স এখন কত ?

মেয়েটী ॥—আমার বয়সে আপনার কী দরকার ?

ছেলেটী ॥—দরকার কিছু নেই। কৌতূহল মাত্র।

মেয়েটী ॥—আমার অনেক বয়েস···আপনার চেয়ে বেশী।

ছেলেটী ॥—আমার বয়স আপনি জানলেন কী করে ?

মেয়েটী ॥—আপনার কথা শুনে।···আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ—

ছেলেটী ॥—সে কথা ঠিক। আমি ছেলেও বটে, মানুষও বটে, তবে ছেলেমানুষ নয়। ৬১ সালে কলেজ থেকে বেরিয়েছি—

মেয়েটী ॥—নিজেই বেরিয়েছেন, না কলেজ থেকে আপনাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ?

ছেলেটী ॥—তার মানে ?

মেয়েটি ॥—এর মানে আর বুঝতে পারলেন না ?···আপনি দেখছি একটি আস্ত গাঁধার।···

ছেলেটী ॥—ধন্যবাদ। আমরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরদের বংশধর। আপনিও তাই···

মেয়েটী ॥—আপনার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! একটী অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় জানেন না ? ঐ কলেজে কবে পড়ছিলেন ? (কলেজের নাম বললো মেয়েটী)

ছেলেটী ॥—অনেকদিন আগে।

মেয়েটী ঃ—কতদিন ? লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর আমলে ?

ছেলেটি ঃ —লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে কোলকাতায় কলেজ ছিল ?

মেয়েটী ঃ—কী করে জানবো বলুন ? ইতিহাস ত পড়িনি।

ছেলেটী ঃ—কী পড়েছেন তবে ?

মেয়েটী ঃ—আমি Science এর student ·

ছেলেটী ঃ—বাক্ ! বোঝা গেল আপনার বয়স বেশী নয়।

মেয়েটী ঃ—Physics-এ অনার্স···

ছেলেটী ঃ—পেয়েছিলেন ? না পড়াই সার ?

মেয়েটী ঃ—আপনার অত খোঁজে কী দরকার ?

ছেলেটী ঃ—আপনি রেগে যাচ্ছেন।

মেয়েটী ঃ—যাচ্ছিই ত—

ছেলেটী ঃ—কিন্তু কেন ? মিছিমিছি রাগারাগি করা কী ভালো ?

মেয়েটী ঃ—কে বললে আমি রেগেছি ?

ছেলেটী ঃ—বাঃ ! আপনিই ত বললেন !

মেয়েটী ঃ—মেয়েরা যা বলে সব সময় কী সেটাই ঠিক বলে ধরে নাকি ?

ছেলেটী ঃ—ওঃ ! তাই বুঝি ? বেশী মেয়েদের সঙ্গে ত মিশিনি, তাই এ খবর জানতুম না।

মেয়েটী ঃ—এখন জানলেন ত !···এবার দয়া করে টেলিফোনটা রেখে দেবেন কী ?

ছেলেটী ঃ—কেন ? আমার সঙ্গে কথা কইতে বুঝি ভালো লাগছে না ? ··

মেয়েটী ঃ—আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি টেলিফোন করছি না।

ছেলেটী ঃ—তা আমি জানি। আপনি 'র' বাবুকে চান তো ?

মেয়েটী ঃ—হাঁ।

ছেলেটী ঃ—আচ্ছা, আপনার নামটী জানতে পারি ?

মেয়েটী ঃ—আমার নাম আপনাকে বলবো কেন ?

ছেলেটী ঃ—'র' বাবু এলে বলতে হবে ত কে টেলিফোন করেছিল—

মেয়েটী ঃ—তবে যে কিছুক্ষণ আগে বল্লেন 'র' বাবু বলে কেউ ওখানে থাকে না ? আপনি ভীষণ ভদ্রলোক।

ছেলেটী ঃ—কী রকম ?

মেয়েটী ঃ—কী রকম শুনবেন ?

ছেলেটী ঃ—যদি দয়া করে বলেন।

মেয়েটী ঃ—তাহলে শুনুন। 'র' বাবু বলে কেউ নেই ঐ নম্বরে। আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। আপনি বরাবর শুধু চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছেলেটী ঃ—আপনি আমাকে যা-তা বলছেন। আপনাকে যদি সামনে পেতুম···

মেয়েটী ঃ—পেলে কী করতেন ?

ছেলেটী ঃ—কী করতুম তা এখন ঠিক করে বলতে পারছি না। সামনে দেখলে কী করতে ইচ্ছে করতো সেটা দূর থেকে কী করে বলি বলুন ?

মেয়েটী ঃ—সামনে থেকে দেখলেই পারেন, কেউ ত বারণ করে নি···

ছেলেটী ঃ—বারণ ত করেনি ! কিন্তু যে নামই বলছে না সে কী আর সামনে দেখা দেবে ?

মেয়েটী ঃ—মনে করুন আমার কোনো নাম নেই।

ছেলেটী ঃ—তা কী করে হয়। নাম একটা নিশ্চয় আছে, তবে সে নাম আপনার হয় ত পছন্দ নয় তাই বলছেন না। যেমন ধরুন, মাতঙ্গিনী।

মেয়েটী ঃ—আমার কথা শুনে কী আমার 'মাতঙ্গিনী' বলে মনে হচ্ছে ?

ছেলেটী ঃ—তা নয়। তবে হলেও আপত্তি ছিল না। নাম একটা নাম-ই। বাপ-মা যখন নাম দেন তখন কী আর অত ভেবে দেন ?···

মেয়েটী ঃ—ঠিক তাই। জানেন, আমার নাম পদ্মলোচনা, অথচ আমি চোখে দেখতেই পাই না।

ছেলেটী ঃ—মানে, এখন আমায় দেখতে পাচ্ছেন না, এই ত ?

মেয়েটী ঃ—আপনি ভীষণ চালাক !

ছেলেটী ঃ—এখন বিশ্বাস হচ্ছে কী যে আমি ঐ কলেজে (নাম বললো) পড়েছি—

মেয়েটী ঃ—এক একবার হচ্ছে···। তাই ভাবছি যদি একবার আপনাকে দেখতে পেতুম··· কিন্তু তাত হবার নয়। আমি পদ্মলোচনা হয়েও চোখে দেখতে পাই না—

ছেলেটী ঃ—ও-টা সত্যি কথা নয়।

মেয়েটী ঃ—কী করে জানলেন ?

ছেলেটী ঃ—আপনি একটু আগে বলেছেন যে মেয়েদের সব কথা সব সময় ঠিক বলে ধরতে নেই।

মেয়েটী ঃ—বলেছি বুঝি ? হতেও পারে।·· তাহলে আমাকে কী রকম মনে হচ্ছে ?

ছেলেটী ঃ—মনে হচ্ছে আপনি বিধাতার একটি অপূর্ব সৃষ্টি···ভারী সুন্দর, আর মিষ্টি।

মেয়েটী ঃ—ইস্।

ছেলেটী ঃ—ইস্!...'র' বাবু যে এতক্ষণ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তা দেখতেই পাইনি। শুনছেন ? 'র' বাবু এসে গেছেন···ওঁকে দিচ্ছি··

মেয়েটী ঃ—তাই নাকি ?

ছেলেটী ঃ—হ্যাঁ, ওঁরা সবাই এসে গেছেন ··'মী' 'শি', 'মী'র মা···

মেয়েটী ঃ—আবার ওল দিচ্ছেন ?

ছেলেটী ঃ—ঠিক ধরেছেন। ওরা কেউ আসেনি।

মেয়েটী ঃ—ওদের আমার দরকারই বা কী ?

ছেলেটী ঃ—সত্যিই ত। আমি ভীড় মোটে পছন্দ করি না।

মেয়েটী ঃ—আমিও না।

ছেলেটী ঃ—তা হলে দুজনেই ভালো, কী বলেন ?

মেয়েটী ঃ—আমার ত তাই মনে হয়।

ছেলেটী ঃ—কিন্তু দুজনে তার থাকা চাই।

মেয়েটী ॥—মাঝে মাঝে একটু ঝগড়া না হলে জমে না—

ছেলেটী ॥—সেটা কিন্তু ভাবের পর। আগে ভাব, পরে ঝগড়া।

মেয়েটী ॥—তাহলে তাই হোক…

ছেলেটী ॥ ভাব কী শুধু টেলিফোনেই…

মেয়েটী ॥—কে বলেছে ?

ছেলেটী ॥—তা হলে ?

মেয়েটী ॥—টেলিফোন ভবনের সামনেও ত হতে পারে। সন্ধে সাতটা।

ছেলেটী ॥—খুব ভালো ! কিন্তু চিনবো কী করে ?

মেয়েটী ॥—পদ্মলোচন হয়ে এসো…

ছেলেটী ॥—মানে ?

মেয়েটী ॥—চোখে গগলস্ লাগিয়ো। চিনে নেবো।

ছেলেটী ॥—সন্ধ্যে বেলা গগলস্ ?

মেয়েটী ॥—ওতেই ত চিনবো ! আর ওতেই…আমায় দেখতে পাবে।…রঙীন কাঁচ চোখে লাগিয়ে রেখো। আমার খোঁপায় থাকবে বকুলফুলের মালা ! চিনে নিও।… পারবে ত ?

ছেলেটী ॥—দেখে নিও।…তা না পারলে ঐ কলেজে পড়াই মিথ্যে…

মেয়েটী ॥—দেখা যাবে। এখন তাহলে এই পর্যন্ত…

সাতটার অনেক আগে থেকেই ওখানটায় ঘোরাঘুরি সুরু করেছিলাম। কৌতূহল ! জি, পি, ও'র ঘড়িতে আট-টা বাজলো।

কোথায় গগলস্ আর কোথায়ই বা বকুলফুলের মালা ? চিনে যাবার শেষ খোসাটা ছুঁড়ে হাত থেকে উড়িয়ে দিতে দিতে ভাবলুম : ওরা দুজনে দুজনকে ঠিকই চিনেছে। আমি ওদের কাউকেই চিনতে পারিনি।

নিষিদ্ধ শহর, ভুতুড়ে শহর

গৌরীশংকর দে

নাবিক জাহাজের কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়র, রাঁধুনী, খালাসী—যারাই আসছে তাদের কাছ থেকে একটা খবর শোনা যাচ্ছে। ঘনীভূত হয়ে উঠছে রহস্য। ঘনিকার অন্তরালে কিসের ষড়যন্ত্র? আন্দাজ করাও যেন অসম্ভব। কিন্তু যাকেই জিগেস করা যায় সে-ই এককথা বলে। তার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না। করকোরানের মতো ধুরন্ধর ব্যক্তির কাছেও ব্যাপারটা রীতিমতো দুর্বোধ্য।

খবরটা হলো: স্টেটিন নামে একটা জায়গা থেকে রোজ কয়েক হাজার ছোট নৌকা যাচ্ছে, যাট মাইল উত্তর-পূবে। নৌকাগুলোতে কারা যাচ্ছে, যা কী জিনিস যাচ্ছে, কেনই বা যাচ্ছে কেউ বলতে পারে না। তবে নৌকা যাচ্ছে। কয়েক হাজার। এবং রোজই। স্টেটিন থেকে এক অজানা গন্তব্যস্থলের দিকে। কিন্তু কোথায়?

করকোরানের ব্যক্তিগত কক্ষে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলে। টেবিলের উপরে মানচিত্র বিছিয়ে তিনি পাগলের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কী যে খোঁজেন তিনিই জানেন। না। অনেক খুঁজেও নির্দিষ্ট এলাকার কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহর তার নজরে পড়লো না।

তবে হ্যাঁ। একটা রহস্যময় শহরের কথা তাঁর কানে এসেছে বটে। শহরটার নাম পীনেমুণ্ডে। শহরটার সঠিক অবস্থান মানচিত্রের কোথায় তা দেখিয়ে দেবার জন্য করকোরান বন্ধুদের অনুরোধ করলেন।

নানারকম কথা শোনা যাচ্ছিলো। শহরটাকে ঘিরে নাকি ঘন কাঁটা-তারের বেড়া। মজুররা একবার তার ভিতরে গেলে আর কখনো বেরিয়ে আসার অনুমতি পায় না। বাইরের দর্শকদের তো ভিতরে ঢুকবার উপায় একেবারেই নেই।

কয়েক হাজার নৌকো যে রোজ যাচ্ছে তা কি ওই নিষিদ্ধ শহরটারই দিকে!

ছুঁচুড়ে শহর পীনেমুণ্ডের রহস্য জানবার জন্য করকোরান উন্মাদ।

বার্লিন আর স্টেটিনে বোমা ফেলতে যাচ্ছে এই অছিলায় পীনেমুণ্ডের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত উড়ে যেতে লাগলো মিত্রপক্ষের বিমানগুলি। আকাশ থেকে তুলে নিতে লাগলো নিচের শহরটার ফটো। অবশ্য বার্লিন আর স্টেটিনে তারা বোমা ফেলছিলো ঠিকই।

নাৎসীরা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলো, পীনেমুণ্ডের কথা কেউ জানে না, ওই শহরের তাৎপর্যও সকলের অজ্ঞাত। শহরটা যাতে সবার অগোচরে থাকে সেইজন্য সাধ্যমতো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তারা নিয়েছিলো। আর, বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ঘন বনই তো জগতের দৃষ্টি থেকে পীনেমুণ্ডে শহরকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে রেখেছিলো।

মিত্রপক্ষের বিমান আকাশপথে উড়ে যেতে যেতে শহরটার আরো বহু ফোটো নিলো। সেদিক থেকে তো বনের বাধা নেই।

ওই অঞ্চল থেকে আগত নাবিকদের কাছ থেকে ক্রমশ খবর আসছিলো: পীনেমুণ্ডে শহরে পুরোদমে কাজ চলেছে। কী যে সেই কাজ ঈশ্বর জানেন।

তারপর এলো ১৯৪০ সালের সতরোই আগস্টের স্মরণীয় রাত্রি। আর. এ. এফ-এর ৬০০ খানা ভারী বৈশ বোমারু বিমান আকাশের তারা দীপগুলিকে মেঘের মতো আড়াল ক'রে রওনা হলো পীনেমুণ্ডের উদ্দেশে। তাদের পথে সচকিত হয়ে উঠলো রাত্রির আকাশ; নীড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত পাখিরা। বাসি ফুলের মালার মতো পুরুষের কণ্ঠে শিথিল হলো শয্যা-সঙ্গিনীর বাহু। ঘুম-ভাঙা শিশু মাতাকে উঠে জড়িয়ে ধরলো মাকে। গ্রাম-নগর-মাঠ-ঘাট-নদীর সুপ্তি ভঙ্গ ক'রে রহস্যময় একটা ছোট শহরের দিকে ছুটে চললো হ' শ বিমান। বিমান তো নয়, যেন এক ঝাঁক গজপাল।

নাৎসীরা এবারও নিশ্চিন্ত মনে ভাবলো ওই বিমানগুলির লক্ষ্য নিশ্চয়ই বার্লিন কিংবা স্টেটিন। শহর দুটির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে তারা বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলে না।

তাদের ধারণা যে ভুল একটু পরেই তা স্পষ্ট হলো। আকাশের ওই আর্মাডা, ওই বিপুল বিমান বহর জার্মানীর দিকে কিন্তু গেলো না। তাদের দৃষ্টি অন্যত্র।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে, হ্যাঁ মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে, বয়েল এয়ার ফোর্সের প্রথম বোমা-বর্ষণে ছাতু-ছাতু হ'য়ে উড়ে গেলো রহস্যময়, নিষিদ্ধ, ছুঁচুড়ে শহর পীনেমুণ্ডে। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অরণ্য তাকে শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে রাখতে পারে নি।

ওই চল্লিশ মিনিট ধরে শহরটার বুকে যেন শুরু হলো বজ্র-বিদ্যুতের তাণ্ডব। পীনেমুণ্ডে তখন জীবন্ত নরক। আগুনের সেই লেলিহান সমুদ্রের তুলনায় মানুষের নরকও বোধ হয় স্বর্গের নন্দনকানন। বিপুলায়তন চল্লিশটি কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, ধ্বংস হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো পঞ্চাশখানা অট্টালিকা। যে সাত হাজার বিজ্ঞানী ওই শহরে গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাঁদের পাঁচ হাজার বৈজ্ঞানিকই সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন। নিহতদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি: কারখানা ও গবেষণাগারের প্রধান, মেজর জেনারেল চ্যাম্পিয়ন—ক্লিনেজকি, জেনারেল ডেক্সনেক, জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈমানিক জেনারেল এনস্ট উদেত।

ফিরে যাবার পথে মিত্রপক্ষের ৬০০টি বিমানের মধ্যে একচল্লিশখানা শত্রু-পক্ষের আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু জার্মানীর যে ক্ষতি তারা করে এসেছে তার তুলনায় ওই ক্ষয় নিতান্তই নগণ্য।

জার্মান যুদ্ধ-পরিকল্পনার এক নূল স্তম্ভ ছিলো পীনেমুণ্ডে। হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো ওখানে যে-সব ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি হচ্ছে তার সাহায্যে মাত্র চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। ওই সব অস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একবার ত্যাগ করার শুধু অপেক্ষা। ব্যস, তাহলেই বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়বে মিত্রশক্তির সব প্রতিরোধ, হুমড়ের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে সমস্ত জগৎ। বড়ো-বড়ো সম্রাট, দিগ্বিজয়ী অনেক জন্মেছেন কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে কি কেউ আজ অবধি পদানত করতে পেরেছেন? না। না চেঙ্গিজ খাঁন, আলেকজাণ্ডার, না নেপোলিয়ন। তাঁরা যা পারেন নি তা এবার সম্ভব হবে। অমোঘ অস্ত্রের সাহায্যে। মনে-মনে বিশ্ব-জয়ের এই স্বপ্নই সম্ভবত দেখে চলেছিলেন হিটলার। মনে-মনে এঁকে চলেছিলেন নিজের ভুবন-বিজয়ী রূপ।

১৯৪৩ সালের সতেরোই আগস্টের রাত্রি। শুধু পীনেমুণ্ডের বুকে নয়, হিটলারের পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন-ভূমিতেও বোমা-বর্ষিত হলো। বলদর্পীর দর্প মুহূর্তের মধ্যে হলো চূর্ণ-বিচূর্ণ। আধুনিক বিশ্বের সবচাইতে পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ীর দিবা-স্বপ্নের ঘটলো সমাধি। সতেরোই আগস্টের রাতে। সমস্ত য়ুরোপকে পদানত করার পরেও ব্রিটেন জয় করতে পারেননি নেপোলিয়ন। হিটলার শুধু দিন গুণছিলেন কবে ব্রিটেনকে উড়িয়ে দেবেন; পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেবেন ব্রিটেনের অস্তিত্ব। তাঁর সেই আশা ঝলমল তানা ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সতেরোই আগস্টের রাতে।

চার্চিলের মতে পীনেমুণ্ডের ধ্বংসেই মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আসলে ওই শহরটা ছিলো রোবট বোমার, স্বয়ংচালিত বোমার ঘাঁটি। ওটা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন লণ্ডন শহর বেঁচে গিয়েছিলো, তেমনি রক্ষা পেয়েছিলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূল। তা না হলে হিটলারের ক্ষেপনাস্ত্রের মুখে প'ড়ে তাদের চেহারা হতো শ্মশানের চাইতেও ভয়াবহ।

যে আমেরিকান ভদ্রলোকের গোপন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আর. এ. এফ. পীনেমুণ্ডে ধ্বংস করে, যাঁর অনুসন্ধানের ফলে লণ্ডন শহর রক্ষা পায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি হিটলারের বিপক্ষে আর মিত্রশক্তির পক্ষে চলে যায় ওই ঘটনার অল্পকাল পরেই কৃতজ্ঞ ইংল্যাণ্ড তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করে। যেদিন তাঁকে সম্মানিত করা হয় সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, রূপসী ব্রিটিশ স্ত্রী-র আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিলো না। পৃথিবীর অন্য কোনো নারী কি সেদিন স্বামীর কৃতিত্বে অতখানি গর্ববোধ করেছিলো? বোধহয় না। অথচ মজার কথা, এত সব কাণ্ড-কারখানার পরও আমেরিকান করকোরাণ্ট তখনো জানতেন না কী অসাধারণ কাজ তিনি করেছেন। কৈতো খুঁড়তে গিয়ে যে মারাত্মক সাপ বের ক'রে ফেলেছেন, জার্মানীর সাধারণ অস্ত্রের ঘাঁটি বা সমর-শিবির নয়, যা তখনো প্রায় অপরিচিত সেই স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপনাস্ত্রের ঘাঁটি বের ক'রে ফেলেছেন করকোরাণ্ট স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। পরে সব কথা জানতে পেরে তিনিও বোধহয় অন্য আর সবার মতোই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আগের থেকে জানুন আর নাই জানুন করকোরাণ্ট সেদিন হিটলারের রক্ত-চোখ থেকে বহু দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন; বপন করেছিলেন তাঁর ধ্বংসের অমোঘ বীজ।

———

সাতশো বছর পরে সুবিচার

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

ইতালীর তথা সারা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে আলিঘেরীর সাতশোতম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হচ্ছে দেশবিদেশের নানা স্থানে।

এই সূত্রে তাঁকে নিয়ে সম্প্রতি ইতালীতে যে বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বড় কৌতুকপ্রদ।

দান্তের জীবদ্দশায় তাঁর শত্রুরা গোপের সহায়তায় দল পাকিয়ে দান্তেকে ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত করেছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দান্তের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে এক আদালত বসিয়ে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। দান্তের শেষ জীবন নির্বাসনেই কেটেছিল।

তাঁর সপ্তশততম জন্মবার্ষিকীতে সেই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অনুরাগীরা ইতালীর সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করেন এবং তদনুসারে পুনর্বিচার হয়। বহু সাক্ষী এজাহার দেন। তাঁদের বিশদ ভাবে পরীক্ষা এবং জেরা করা হয়। তারপর জুরীদের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে বিচারক দান্তেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে রায় প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয় যে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল।

দান্তের কথা বলতে গেলেই মনে আসে তাঁর সেই বিয়াত্রিচ-এর কথা, তাঁর জীবনের সেই সবচেয়ে বড় ঘটনা, তাঁর প্রেম, রূপকের মতো দুর্জ্ঞেয়, দুরবগাহ আর অপ্রাথিব প্রেম। বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রণয় নিবেদন সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক, কবি আর শিল্পীদের যুগে যুগে প্রেরণা জুগিয়েছে।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দান্তের জন্ম। দরিদ্রের সন্তান ছিলেন তিনি, তা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় অল্প বয়সেই ভার্জিল, হোরেস এবং ওভিডের বই প'ড়ে শেষ করেছিলেন। জ্ঞান-স্পৃহা ছিল অদম্য। দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

তাঁর যখন ন'বছর মাত্র বয়স, সেই সময় তিনি বিয়াত্রিচ-কে প্রথম দেখেন এবং প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। ফ্লোরেন্সের বিশেষ গণ্যমান্য নাগরিক ফোলকো পার্টিনারির গৃহে অনুষ্ঠিত এক উৎসব সভায় দু'জনের দেখা হয়। গৃহস্বামীর কন্যারূপে বিয়াত্রিচ সকলের সঙ্গেই আলাপ করছিলেন। দান্তের সামনে এসে তাঁকেও মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন। সেই মুহূর্তে আকাশে বুঝি হাজার শঙ্খ একসঙ্গে বেজে উঠল, দান্তের চোখের সুমুখে বিশ্বসংসার অবলুপ্ত হল, তিনি দেখলেন, গাঢ় গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক অলৌকিক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি, শরীরিণী কবিতা, মানস প্রতিমা মূর্তিমতী। চোখের পলক পড়ে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বিয়াত্রিচের অপসৃয়মান দেহ-রেখা ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল, তবুও দান্তের ধ্যান ভাঙল না। তাকেই সারাজীবনে।

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শত বার
যুগে যুগে অনিবার।"—

সারাজীবন ধরে বিয়াত্রিচের সম্বন্ধে এই কথাটি বললেন তিনি মাসাছন্দে মাসাভাবে। সেই ছন্দ আর আর সেই ভাব আজ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয়বার দান্তে বিয়াত্রিচেকে দেখলেন ন'বছর পরে। স্বপ্ন-বিহারিণী সঙ্গীত কল্পনা। আবার অন্তর্হিত হলেন। ঘরে ফিরে বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে লিখলেন তাঁর প্রথম অপূর্ব সনেট, তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রথম প্রকাশ।

সে-সময় দান্তের দেশে প্রণয়ীদের মধ্যে এক মজার রেওয়াজ ছিল। প্রেমিকার উদ্দেশে কবিতা রচনা করে তারা সেই কবিতা পাঠাতো বন্ধুস্থানীয় অন্য প্রণয়ীর কাছে। এমনি ধারা কবিতার আদানে প্রদানের মধ্য দিয়ে একদল কবি তখনকার দিনে অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা প্রদানত লিখত সনেট, তাই তাদের ইংরাজীতে বলা হত 'সনেটিয়ার'।

দান্তে তাঁর প্রথম সনেট পাঠালেন তাঁর কবি বন্ধু গীতো কাভালকান্তির কাছে। কবি কাভালকান্তি সেই সনেট প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে দান্তেকে তাঁদের দলভুক্ত ক'রে নিলেন।

অন্যান্য কবিরা বিভিন্ন নায়িকার উদ্দেশে কবিতা রচনা করতেন কিন্তু দান্তের জীবনের একমাত্র নারী ছিলেন বিয়াত্রিচ। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি একমাত্র বিয়াত্রিচের স্মরণেই তাঁর কবি-মানসকে নিয়ন্ত্রিত রেখেছিলেন।

বিয়াত্রিচকে দান্তে পূজা করতেন দেবীর মত, দূর থেকে সসম্ভ্রমে তাঁর মানস-প্রতিমার প্রতি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করতেন, কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতে চাইতেন না। বিয়াত্রিচকে সামনে দেখলে দান্তে এমন বিহ্বল হয়ে পড়তেন যে তাঁর মুখে কোন কথা জোগাতো না; তিনি মূক এবং নিষ্পন্দ হ'য়ে পড়তেন। অথচ অন্য মেয়েদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে তিনি অসুবিধা বোধ করতেন না এবং তাদের কাছে সুযোগ পেলেই বিয়াত্রিচের গুণগান ক'রে মনের ভার লাঘব করতেন। এর ফল কিন্তু বড় মর্মান্তিক হল। দান্তেকে ভুল বুঝলেন বিয়াত্রিচ। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি মিশছেন, হেসে কথা বলছেন, রহস্য-রসিকতা করছেন;...তাহলে বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর ভালবাসা আন্তরিক নয়, তিনি অন্তঃসারশূন্য, ছল ও কপট। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বিয়াত্রিচ দান্তের প্রতি ঘোর অবিচার করলেন। একদিন স্পষ্টই তাঁর মুখের উপর বলে দিলেন যে, দান্তেকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এই কথা শুনে কবি দান্তে এমনই মুহ্যমান হয়েছিলেন যে দু'তিন দিন অনাহারে থেকে তিনি দারুণ অসুখে পড়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এক ধনী সওদাগরের সঙ্গে বিয়াত্রিচের বিবাহ হয়ে গেল এবং মনের দুঃখ ভোলবার জন্যে দান্তে যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত মনে হতে লাগল, বিয়াত্রিচ হয়ত সুখী হননি, হয়ত তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেননা। অস্থিরচিত্তে রণক্ষেত্রে থেকে কবি ঘরে ফিরলেন। তাঁর মনের আশঙ্কা সত্যিই বাস্তবে পরিণত হল। অল্পদিনের মধ্যেই মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচ দারুণ অসুখে ভুগে মারা গেলেন।

যদিও এই ঘটনার দু'বছর পরে দান্তে বিবাহ করেছিলেন, তাহলেও বিয়াত্রিচের প্রতি রূপক-কাব্যের মতো তাঁর অনির্বচনীয় প্রেম সারা জীবনের প্রেরণা স্বরূপ তাঁর কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীতে তাঁর জীবনযাপন একটি অবিচ্ছিন্ন তীর্থ যাত্রা, তিনি নিজে একজন ভ্রান্ত পথিক এবং প্রতিপদে তাঁর সকল ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন হচ্ছে একমাত্র বিয়াত্রিচের অনৈসর্গিক প্রভাবে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সৃষ্টি 'দি ডিভাইন কমেডির' এই হল মূল সুর।

দান্তের রণ-নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে সুপরিচালিত করবার জন্যে যে নূতন সংসদ গঠিত হল তাঁর বিধি? সভ্যপদে তিনি মনোনীত হলেন এবং সেই থেকেই আরম্ভ হ'ল তাঁর জীবনের দুর্বিপাক। ঈর্ষাকাতর শত্রুর সৃষ্টি হল চারিদিকে। এমন কি, পোপ বনিফেস্‌ও একটা ব্যাপারে তাঁর প্রতি ভিতরে ভিতরে বিরূপ হলেন। পোপ বনিফেসের একদল শত্রু ছিল। তাদের জব্দ করবার জন্যে ফ্লোরেন্স শাসন সংসদের কাছে তিনি একশত অশ্বারোহী সেনা চাইলেন। অন্য কারুর আপত্তি ছিল না, একমাত্র দান্তে প্রবল যুক্তি তর্কের সাহায্যে ওজোস্বিনী ভাষায় পোপ বনিফেসের দাবীকে অন্যায় ও অসঙ্গত প্রতিপন্ন করলেন। ফলে সাহায্য পেলেন না পোপ বনিফেস।

সেই ঘটনায় অপূর্ব চরিত্রবল ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন দান্তে। পোপের বিরুদ্ধে কথা বলা তত সহজ কথা ছিল না। অবশ্য তার ফলে দান্তেকে নেমেই চরম বিপদের সম্মুখীন হ'তে হল। শত্রুদের ষড়যন্ত্রে নগরের নানাস্থানে রীতিমতো হাঙ্গামা আর অরাজকতার সৃষ্টি হল। নাগরিকদের মধ্যে দুটো দল গজিয়ে উঠল। একদলের নাম 'কালা দল', অপরদলের নাম 'ধলা দল'। কালা আর ধলার মধ্যে প্রত্যেকদিন লাঠালাঠি আর মাথা ফাটাফাটি চলল। প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। একদিন একদলের এক গুণ্ডা-ভাইপো বিপক্ষদলের খুড়োকে রাজ-রাস্তায় খুন ক'রে ফেললে। শহরের চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি হল।

শত্রুদের চক্রান্তে দান্তের উপর সেই অরাজকতা বন্ধ করবার ভার পড়ল। অসাধ্য কাজ। যেখানে শাসন-বিভাগের সদস্যরাই গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যেখানে একপক্ষ গোপনে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাতে ব্যস্ত, সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব। তবু দান্তে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না এবং তাঁর নির্ভীক আর সুদক্ষ ব্যবস্থায় অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধপক্ষও নিশ্চেষ্ট ছিলনা। দান্তে শুনলেন যে, কর্সো ডোনাটি নামে তাঁর এক কুটুম্ব প্রকাশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছে এবং এক প্রতিনিধি-দল নিয়ে পোপ বনিফেসের কাছে গিয়ে দান্তের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পেশ করবার উদ্যোগ করেছে। খবর শুনে চিন্তিত হলেন দান্তে। তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, এ-ক্ষেত্রে দান্তেরও একটি ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে পোপের কাছে যাওয়া এবং প্রকৃত ঘটনার কথা জানানো কর্তব্য। সেই পরামর্শ অনুসারে দান্তে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে ফ্লোরেন্স ত্যাগ ক'রে রোম অভিমুখে রওনা হলেন। তখন কি তিনি জানতেন যে, এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, নিজের চিটায় আর কোনদিন তিনি ফিরতে পারবেন না?

তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশের ধর্মগুরু এবং নিজের কুটুম্ব তাঁর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করলে তার ফলে পড়ে দান্তের শেষ জীবন এক করুণ ট্রাজেডির মধ্যে শেষ হল। ফ্লোরেন্সে বিচার সভা বসল এবং সেই বিচারে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল। ঘোষণা করা হল বিচারকের রায় অমান্য করে তিনি যদি দেশে ফেরেন তাহলে তাঁকে ধরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে।

ঘৃণার হুতাশায় বেদনায় মহাকবি আর দেশে ফিরলেন না। বিদেশ বিভুঁই-এর পথে পথে কাটল তাঁর শেষ জীবন।

১৩২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সুদূর পরবাসে এক অনুরাগী ভক্তের গৃহে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করলেন।

আধুনিক পশুশালার জনক কার্ল হেগেনবেক

গৌরীশঙ্কর দে

অবহীন কোলাহল, ভিড়, আর নানা নাগরিক সমস্যায় পীড়িত মানুষ মাঝে মাঝে অনুভব করে একটু অবসর আর নতুন প্রেরণার প্রয়োজন। এরি জন্য সে ছুটে বেরোয় অজানা, দুর্গম পথে, নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আবিষ্কার ক'রে নিতে চায় নিজেকে। এরি জন্য শহরের মানুষ ছুটির দিনে ভিড় করে চাড়ঘরে, ময়দানে। যারা দূরের প্রকৃতির কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে না, তারা নিজের পক্ষে হাজির হয় কাছাকাছি কোনো পশুশালায়। মানুষের হাতে-গড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে বিচিত্র জীবজন্তুর চলাফেরা দেখে বিপুল আনন্দ উপলব্ধি করে।

আগেকার দিনের পশুশালার সামনে দাঁড়ালে কিন্তু নিজেকে ক্লান্তই লাগত। তখন চিড়িয়াখানা ছিল ইটের দেয়াল আর লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা নিতান্তই কয়েদখানা। বনে যারা সুন্দর, স্বাধীন, তাদের বাধ্য করা হত এখানে দিনের পর দিন নিরানন্দ, বিরস জীবন কাটাতে। দর্শকরা এদের দেখে তেমন মজা পেত না। জানোয়ারগুলি যেন আফিমের নেশায় ঝুঁদ হয়ে ঝিমুচ্ছে। বনের সম্রাট থেকে শুরু ক'রে সাধারণ পশু-পাখি সবার একরকম হাল।

আজকাল অধিকাংশ সভ্যদেশে চিড়িয়াখানার চেহারা কিন্তু একেবারে আলাদা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গাছপালা, ছোট-খাট পাহাড়, জলাশয়। ঠিক যেন বন্য পরিবেশ। গভীর অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়ালে বুঝি জীবজন্তুদের এমনি স্বাভাবিক চেহারা আর গতিবিধি দেখা যায়। যিনি প্রথম পুরোপুরি দিনের চিড়িয়াখানাকে কয়েদখানা থেকে পশুদের মনোরম বাসস্থানে পরিণত করেছিলেন তিনি জার্মানীর কার্ল হেগেনবেক। বন্দী জীব-জন্তুদের প্রতি গভীর মমতাবোধ থেকে তিনি পত্তন করেন আধুনিক পশুশালার।

কার্ল হেগেনবেকের বাবা ছিলেন মৎস্য ব্যবসায়ী। কার্লের বয়েস যখন মাত্র দু বছর, তখনই সে গোটা আটেক ইঁদুর ধরে এনে ছোট-খাট একটা পশুশালা গ'ড়ে তুলেছিল।

মা কিন্তু ঘুর ঘুর ক'রে সেগুলি ফেলে দিলেন। ছেলেও কম যায় না। কিছুতেই শান্ত হয় না। বাবা ক'য়েকটা সিনিপিগ এনে দেন তবে ছেলে ঠাণ্ডা হয়।

কার্লের বয়েস যখন একুশ তখন একদিন বাবা শুধোলেন: কার্ল কি মাছের ব্যবসাই করবে? না কি জীবজন্তু সংগ্রাহকের কাজ নেবে? দ্বিতীয় কাজটিই কার্লের পছন্দ হল। সেকালে ওই

ব্যবসাই মোটেই লাভের ছিল না। বিশ শতক শুরু হতে কিন্তু দেখা গেল জার্মানীর হ্যামবুর্গ শহরটি পৃথিবীর ভেতরেই পশু ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে। হ্যামবুর্গ-এর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পশু-বিক্রেতা কার্লের খ্যাতি। জার্মানী আর অষ্ট্রিয়ার সম্রাট থেকে শুরু ক'রে রাশিয়ার জার, জাপানের মিকাডো, মরক্কোর সুলতান সবাই লোক মারফৎ তাঁর কাছ থেকে কিনে নিতে শুরু করলেন নানা জীবজন্তু।

উপার্জনের টাকাতে কার্ল একটা সার্কাসই খুলে বসলেন ১৮৮৭ সালে। সেটা দেখাতে লাগলেন বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে। সর্বশ্রেণীর আর সর্বস্তরের নরনারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হল বনের বাসিন্দাদের প্রতি কৌতূহল। কলকাতায়ও এসেছিলেন সার্কাস দেখাতে ১৯০৬ সালে।

১৮৯৬ সালে বার্লিনের টার্পারিয়েন পেটেন্ট অফিস "খোলামেলা জায়গায় পশুদের পার্কের" পেটেন্ট দিল কার্লকে। হেগেনবেক সংকীর্ণ খাঁচা থেকে আগেই মুক্তি দিয়েছিলেন পশু-পাখিদের। এবার স্থাপন করলেন আধুনিক চিড়িয়াখানা। জীব-জন্তুদের ভেতরে কে কতদূর লাফ দিয়ে যেতে পারে এসব বিষয় এখন তাঁর নখদর্পণে। সেই মাপ অনুসারে দর্শকদের দাঁড়াবার জায়গা আর পশুদের বিচরণ ক্ষেত্রের মাঝখানে তৈরী হল পরিখা। ১৮৯৭ সালে পশুদের যে পার্ক তৈরী করলেন তাই পরে 'হেগেনবেক পশুশালা' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯০৭ সালে সেখানে যখন প্রথম বাঘ আর সিংহদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল তখন চারদিকে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। কারণ দৃশ্যটি সত্যি অভূতপূর্ব। খাঁচার ভেতরে নয়, খোলামেলা জায়গায় হিংস্র জন্তুরাও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন পশুশালা সে-যুগে এই প্রথম। মাঝখানের পরিখাটা আবার লুকিয়ে আছে ঝোপ-ঝাড় আর কৃত্রিম পাহাড়-পর্বতের আড়ালে। দর্শকদের মনে হল স্বাভাবিক পরিবেশে বনের অধিবাসীদের দেখবার সুযোগ পশুশালায় এই প্রথম তারা পেয়েছে। সেই মনোরম অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বহু সম্রাট এবং রাষ্ট্রের প্রধানগণও হাজির হতে লাগলেন হেগেনবেক-এর পশুশালায়। সেখানকার গেষ্ট বুক-এর পাতা ওল্টালে আজো চোখে পড়বে সেই সময়কার নায়করা লোকদের নাম। এরা সবাই এক বা একাধিকবার এসেছিলেন এখানে।

জীবজন্তুদের দোষ মানাতে হ'লে ওদের জানা দরকার, ওদের ভালোবাসতে পারা চাই—এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন হেগেনবেক।

একবার কার্ল খেলা দেখাচ্ছিলেন একপাল হাতি নিয়ে। আসরে এসে সেগুলি কিন্তু খাবারের জন্য চিৎকার শুরু করল। কার্ল সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সেগুলিকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। 'অব এনিমেলস আণ্ড মেন' বইতে হেগেনবেক লিখেছেন : "আগেকার দিনে মারধোর ক'রে আর তপ্ত লোহার শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে পশুদের শোষ মানানো হত। ফলে, ওই অত্যাচারের যন্ত্রগুলি দেখা মাত্রই জানোয়ারগুলি ভয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত, টপকে যেতে চাইত মাঝখানের সবরকম বাধা। বছর কয়েক আগে আমি যখন গ্রেটব্রিটেনে যাই তখন চারটে 'ভগ্নকথিত' সোষা সিংহ দেখেছিলুম। বেচারাদের গোঁফ বলতে আর কিছু নেই, সব পুঁড়ে গেছে, মুখের ভেতরে ঘসঘসে ঘা।"

শিকারী জন্তুর সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করতে হবে—এই যেন সেকালের পশুশালার পরিচালকদের মনোভাব ছিল। হেগেনবেক প্রথম উপলব্ধি করলেন সদয় আচরণের প্রয়োজনীয়তা।

তিনি বললেন, প্রত্যেক জন্তুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আছে বোধ শক্তির তারতম্য। সেই সব বৈশিষ্ট্য অনুসারে পশুদের শ্রেণীবিভাগ ক'রে, ভালোবাসা দিয়ে সেবা যাওয়ার চেষ্টা করলে যে সাফল্য পাওয়া যায় বল প্রয়োগের দ্বারা তা কখনোই পাওয়া যায় না', পাশবিক শক্তি নয়, মমতা দিয়ে সেবা যাওয়ানো দরকার—এই কথাটা লোককে বোঝাবার জন্য কার্লকে কম বেগ পেতে হয়নি। পশু-পক্ষিদের নিয়ে ব্যবসা ক'রে তিনি জীবনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন ব'লেই যে তিনি একথা বলেছিলেন তা নয়। পশুদের প্রতি তার প্রগাঢ় মমতাবোধ ছিল বলেই। তাদের নিগ্রহ দেখে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন ব'লেই। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সম্রাট অশোকের কথা, মানুষ এবং পশু দুয়ের ওপরই সমানভাবে যাঁর করুণা বর্ষিত হয়েছিল।

• • •

প্যারিসের একটা রেস্তোরাঁ। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক সেখানে বিষণ্ণ মুখে ব'সে আছেন। চোখে তাঁর অসহায় দৃষ্টি। পথ দিয়ে যেতে-যেতে এক ভদ্রলোক তাঁকে দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। বিশ্ববিখ্যাত মানুষটি ওখানে এমনভাবে কেন ব'সে আছেন? আগন্তুক সবিনয়ে জিগেস করলো: "কবে এলেন প্যারিসে কার জন্য অপেক্ষা করছেন?" উপবিষ্ট ভদ্রলোক যেন রক্ষা পেলেন। বললেন: "বড়ো বিপদে পড়েছি। যে হোটেলে এসে উঠেছি সেটা খুঁজে পাচ্ছি না; তার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। দয়া ক'রে যদি একটু খুঁজে দেন।"

আগন্তুক সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের কাছ থেকে তাঁর ঠিকানাটি জেনে এলো। আর জেনে তার বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো। কী কাণ্ড! রেস্তোরাঁয় ব'সে পথের ওপারের যে বড়ো বাড়িটার দিকে ভদ্রলোক অসহায় চোখে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন সেই হোটেলটাতে এসেই তো তিনি উঠেছেন। ওই শিশুর মতো সরল আপন-ভোলা মানুষটিই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইন স্টাইন।

[জ্যোতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

[১৮৮৭ সনে সঞ্জীব চন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিয়োগের পর চাকরিতে পাকা হইয়া, পুলিসের চাকরি কিভাবে নির্ব্বাহ করিবেন তাহার উপদেশ চাহিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে এক পত্র দিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত উপদেশ সম্বলিত পত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে লেখেন।]

প্রিয়তমে :—

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে। আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম এই সাতটি Golden rule বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটা। উহার অনুবর্ত্তী হইলে সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই বার হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ উপদেশ

I. প্রথম প্রয়োজনের কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে, অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না, কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

III. উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী, তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন, তর্ক করিও না।

IV. আপনার কাজের Rules and laws বিশেষরূপে অবগত হইবে।

V. কাহার উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা না হলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি, না চলে সেও ভাল ইহা নিজে কখনও করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI. সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়, তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

VII. নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে মতামত—

বঙ্গদর্শন ১৩২১, ভাদ্র "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ

(শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র Ex-Judge, Calcutta High Court)

১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারের রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি "সধবার একাদশীর" প্রথম অভিনয় দেখি। সেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটিতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলার নব্যরসের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা, সে দিন কবিবর "গিরিশ" স্বয়ং নিমচাঁদ। সধবার একাদশী পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নাম মাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রে নিমচাঁদের অভিনয় কখন ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল। অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চিরবন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাবুর সহিত সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু।

[Giris in the role of Mr. Wood, the Indigo Planter.]

The Native Performance at Town Hall.

On Saturday night, the members of the Calcutta National Theatre performed in the Town Hall the play of "Nildarpan" for benefit of the Native Hospital. It is a great pity that so short a notice was given, as on that account, very few Europeans were present. However, the native mustered very strongly on the occasion and testified by their repeated plandits how much they enjoyed the performance. The actiog was exceedingly good throughout. We hope the management will give another performance—[Englishman, Monday, 31st March 1873]

একটি পৃথিবীর মৃত্যু

মূল : হিলডেশিমার, অনুবাদ : সুপর্ণ রায়

মারচেলো মনটেট্রিস্তো-র শেষ সান্ধ্য আসর আমার মনে চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে আছে। এর কারণ ওই আসরের অসাধারণ সমাপ্তি। অন্য কারণেও ওই সন্ধ্যাটি অবিস্মরণীয়।

মারচেলো-র সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্তই দৈবাৎ। আমার এক বন্ধুর মারফৎ ওই মহিলার কাছে গ্রামের সেই গামলাটা বিক্রি করেছিলুম যার ভিতরে ম্যারাট খুন হয়েছিলেন। বিক্রী করার আগে পর্যন্ত খুব কম লোকই খবর রাখতো ওটা আমার কাছে আছে। ঋণের শোধ করবার জন্য বাধ্য হয়ে ওটা আমাকে বিক্রি করতে হয়।

অষ্টাদশ শতকে ব্যবহৃত গ্রামের বাসন-পত্র সংগ্রহ করছিলেন মারচেলো। কাজেই তার কাছেই আমি গিয়েছিলুম। এই ভাবেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। গ্রামের গামলা থেকে শুরু হ'লেও অল্প সময়ের মধ্যে আরো বড়ো বড়ো নন্দনতাত্ত্বিক আলাপে আমরা মেতে উঠছিলুম। লক্ষ্য করেছিলুম, একটা দুর্লভ বস্তুর আমি মালিক জেনে আমাকে তিনি বেশ সমীহ ক'রে কথা বলছিলেন। সান আমেরিগোর কৃত্রিম দ্বীপে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদে যে-সব বিখ্যাত আসর তিনি বসিয়ে থাকেন তার একটিতে উপস্থিত হবার জন্য আমাকে যখন নেমন্তন্ন করলেন অবাক হলুম না। মুরানো থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ পূবে মারচেলো ওই দ্বীপটি তৈরি করেছিলেন ; মূল ভূখণ্ডটিকে তিনি ঘৃণা করতেন। বলতেন, ওখানে থাকলে তার আধ্যাত্মিক প্রশান্তি বিচলিত হবে। আর, যে-সব দ্বীপ আগে থেকেই আছে সে-সব দ্বীপও তাঁর মনের উপযুক্ত ব'লে তিনি বোধ করছিলেন না। কাজেই কৃত্রিম দ্বীপে তিনি বাস করতে শুরু করলেন, যা-কিছু প্রাচীন, যা কিছু বিস্মৃত তারই ব্রতে উৎসর্গ করলেন জীবন। তার নিজের ভাষায় 'সত্য এবং চিরন্তন'-এর ব্রতে।

নিমন্ত্রণ চিঠি অনুসারে আসর বসবার কথা আটটায়। তার মানে আশা করা হচ্ছে অতিথিরা হাজির হবেন দশটায়। রীতিটা তাই। তাছাড়া চিঠিতে নির্দেশ রয়েছে অতিথিরা যেন গণ্ডোলাতে ক'রে দ্বীপে উপস্থিত হন। তাতে অবশ্য ঘণ্টা দুই লাগবে ; আরো অস্বস্তিকর এই কারণে যে ওখানে সমুদ্র বড়ো উত্তাল। কিন্তু অতিথিদের ওই সব অলিখিত নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে। না হলে তাদের মনে করা হবে অসভ্য। আর বর্বরদের তো ওই দ্বীপে নিমন্ত্রণ করাই হয় না।

প্রাসাদের জাঁক-জমক বর্ণনাতীত। ভিতরে এক-একটি কক্ষে এক এক যুগের আবহাওয়া সৃষ্টি

করা হয়েছে। গথিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। কোথাও খুঁত নেই ; এক যুগের রীতি কোথাও অন্য যুগের ঘাড়ে চাপেনি। আর তক্ষের সাজ-সজ্জা। রাজকীয় ভোজ-সভায় হাজির হবার সৌভাগ্য যার হয়েছে একমাত্র তিনিই সেই ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই বিলাসের বর্ণনা দেওয়া এখানে ঠিক হবে না, কারণ তাতে মারচেসা এবং তাঁর অতিথিদের প্রতি অবিচার করা হবে। সে-যুগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির পার্থিব শেষ প্রহরের বর্ণনা আমি দিতে চাই। যারা সেই দৃশ্য দেখেছিলো তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই এখনো জীবিত।

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য-সূচক কিছু কথা-বার্তা বলার পর আর পিত্তিনিজ যে সোফাটা ছেড়েছিলো একবারও তার পাশ ছেড়ে উঠে যায়নি তাকে একটুকাল আদর করার পর তিনি আমাকে ডনব্রোস্কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এই মহিলাটি দুই কারণে তখন বিখ্যাত। প্রথমতঃ, লুপ্তপ্রায় ছন্দের একটি নৃত্য-শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য ; দ্বিতীয়তঃ, 'যৌবনে ফিরে যাও' গ্রন্থের লেখিকা-রূপে। ওই গ্রন্থে তিনি নৃত্য-রীতিতে যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য বলেছেন। ওই গ্রন্থের পাঠিকা-পাঠক তখন দেশ-বিদেশে। আমরা যখন আলাপ করছিলুম তখন এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক এলেন। বন্ধুবেশী। তাঁর নাম গলচ (আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন এমন নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন যে তিনি বেশি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না)। ডনব্রোস্কা আমার পরিচয় ক'রে দিলেন এই ব'লে : "ইনিই লেবাল্ড, ম্যারাটের স্মরণের শ্রদ্ধাস্পদ ভূতপূর্ব্ব মালিক।" যাক, আমার খ্যাতি তাহলে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে।

সংস্কৃতির বিকাশদের সঙ্গে মেলা-মেশার যোগ্যতা আমি রাখি কিনা গলচ যাচাই ক'রে দেখছিলেন ব'লে আমার মনে হলো। জিগেস করলুম লুক্সেমবুর্গের সমসাময়িক চিত্রকলার প্রদর্শনীটি তার কেমন লেগেছে। অন্তত একরাত্রির জন্য ব'লে নিতে হবে, এখানে যাঁরা হাজির হয়েছেন তাঁরা সব দেখেছেন, সব প'ড়েছেন, শুনেছেন ; যা কিছু জগতের সেরা। আর সেইজন্যেই তো তাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু 'সমসাময়িক' শব্দটি উচ্চারণ ক'রে যে ভুল করেছি গলচ-এর মুখের ভাব দেখেই তা বুঝলুম। তাঁর চোখে আমি এক ধাপ নিচে নেমে গেছি। যাক শিক্ষা তো হলো।

আমরা ভোজসভায় হাজির হলুম। ওখানে দেখা হলো জ্যোতিষী সিনোরা গাম্বাতির সঙ্গে। এই মহিলাটির একটা বিয়োগী জন-মানসে সম্প্রতি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিয়োগীটা হলো : কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যফলই নয়, মানুষের চিন্তার ইতিহাস কোনদিকে চলেছে তাও নক্ষত্র-ফলক থেকে পাঠ করা সম্ভব। রাজনীতিক এবং রাজতন্ত্রের সমর্থক অধ্যাপক কুনৎস সারটরির সঙ্গে গাম্বাতি নিবিষ্টভাবে আলাপ করছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধ'রে সারটরি চেষ্টা করছেন সুইজার-ল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করতে।

ভোজ সমাধার পরে সকলে হাজির হলেন রঙমহল কক্ষে। আজ সন্ধ্যায় চরমতম আনন্দের আয়োজন ওখানেই করা হয়েছে। এক বিশেষ অনুষ্ঠানের। ওখানে পৃথিবীর অন্যতম দুটি শ্রেষ্ঠ সোনাটা বাঁশিতে বাজিয়ে শোনানো হবে। সোনাটার রচয়িতা আন্তোনিয়ো ভিভালদি ব্লক। রমুর সমসাময়িক এবং বন্ধু। তাঁকে আবিষ্কার করেছেন সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ ওয়েল্টি। ওয়েল্টিও আসরে উপস্থিত ছিলেন। বাজিয়ে শোনাবেন বাঁশরী-বাদক বেরেজার। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবেন মারচেসা নিজে হার্পিসকর্ড সহযোগে। সেলেস্টাইন রমু ওই হার্পিসকর্ডই তাঁর ছেলেকে সুরে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাঁশিটারও একটা ইতিহাস আছে, তবে আমি তা ভুলে গেছি। দুজন বাদক বিচিত্র

পোশাকে সজ্জিত হয়েছেন। অনুষ্ঠান চললো মোমের আলোতে। অমন অনুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক আলো সহ্য করার মতো লোক সেখানে একজনও ছিলো না। প্রথম সোনাটা শুনবার পর মারচেসার খেয়াল অনুযায়ী অতিথিরা দ্বিতীয় সোনাটা শুনবার জন্য রজত কক্ষ থেকে কণ্ঠকক্ষে হাজির হলেন। কারণ কোনো পর্দার সুরগুলি ওখানেই ভালো শোনাবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। পিয়ারবেতিস্তা ব্লক নামে কোনো লোক কোনো দিনই ছিলেন না। যা বাজানো হলো তার সুরকার সঙ্গীতের পণ্ডিত ওয়েন্টি নিজেই। অবশ্য এ-কথা জেনেছিলুম পরে। মারচেসা তার জীবনের শেষ মুহূর্তে যে স্বরলিপি সুরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে ওয়েন্টির জালিয়াতি কাজ করেছে জেনে মারচেসার প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করেছিলুম।

এক নাইনর সোনাটার দ্বিতীয় অংশ যখন বাজছে, দেখলুম একটা ইঁদুর দেয়ালের গায়ে হেঁটে যাচ্ছে। অবাক হয়ে গেলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম বাঁশির ধ্বনিতে মোহিত হয়ে বোধ হয় ওটা গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এ-রকম ব্যাপার ঘটে বলে তো শোনা যায়। কিন্তু ইঁদুরটা যে চলেছে বাদ্য-যন্ত্রের বিপরীত দিকে। প্রথমটার পিছে আরেকটা ইঁদুরও দেখা গেলো। অতিথিদের দিকে তাকালুম। তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই দুচোখ বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন যাতে দেহ-মন উন্মুখ ক'রে দিয়ে শুনতে পান ওয়েন্টির জালিয়াতি সুর। দূরাগত বজ্রধ্বনির মতো একটা শব্দ যেন শুনতে পেলুম। মেঝেটা কাঁপতে শুরু করেছে। অতিথিদের দিকে আবার তাকালুম। যদি তারা কিছু শুনে থাকেন—কিছু শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই—তাঁদের বলার ধরণ থেকে তা আন্দাজ করার উপায় ছিলো না। কিন্তু ওই ধরণের অদ্ভুত সব উপসর্গ দেখে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলুম।

একজন ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করলো। অন্যান্য অনুচরদের মতো তার পোশাক-পরিচ্ছদও অদ্ভুত ধরণের। ভৃত্যটিকে মনে হচ্ছিলো 'টার্ভা' নাটকের একটি চরিত্র। বাদকরা যেখানে সেখানে গিয়ে মারচেসার কানে কী যেন সে ফিসফাস ক'রে বললো। দেখলুম মহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মোমের আলোতে বেমানান লাগছিলো না। কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ ক'রে শান্তভাবে বিলম্বিত লয়ের সুরটি শেষ-পর্যন্ত বাজিয়ে গেলেন। তারপর বাঁশি-বাদকের দিকে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমবেত সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: "ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ। এইমাত্র খবর পেলুম এই দ্বীপ এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রাসাদের ভিত ধসে পড়ছে। সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া। এবিষয়ে আমরা বোধহয় সকলেই একমত।

মারচেসা আবার ব'সে পড়লেন; বাঁশিয়ে বেরেজারের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন; সেনেটার শেষ অংশ বাঁশির ধ্বনিতে জীবন্ত হয়ে উঠলো। আমি তখন জানতুম না সুরটা কার। তবে মনে হয়েছিলো ওই অসাধারণ মুহূর্তের সঙ্গে যেন সুরটা তেমন সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না।

পালিশ-করা মেঝেতে কয়েকটা ছোট-ছোট ফাটল দেখা দিয়েছিলো। গুম-গুম শব্দটা আরো জোরে, আরো কাছে শোনা যাচ্ছিলো। অধিকাংশ অতিথিই এখন গুম হয়ে বসেছিলেন; মোমের আলোতে তাদের মুখ ছাই-রঙা দেখাচ্ছিলো, যেন তারা বহু আগেই মারা গেছে। আমি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললুম: "চলে যাচ্ছি।" বাজিয়েরা বিরক্ত হতে পারেন ভেবে একটু নিচু গলাতেই বললুম। তবে ভয় পেয়েছি সে-কথা স্বীকার করার সাহস আমার আছে তা জানাবার মতো চড়া

গলায় নিশ্চয়ই। ঘরের সমস্ত মেঝেটা এখন জলের আবরণে ঢাকা। পা টিপে-টিপে এগুচ্ছিলুম ; তবু আমার পায়ে লেগে জল ছিটকে উঠলো, দু-একজনের সাদা পোশাক খানিকটা তাতে ভিজেও গেলো। কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছে তার তুলনায় আমি যেটুকু ক্ষতি করেছি তা নিতান্তই নগণ্য। কয়েকজন অতিথি আমাকে আড়চোখে দেখে নিলো। আমি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলুম না। বারান্দার ধারের দরজাটা একটানে খুলতেই এক ঢেউ জল ঘরের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেডি ফিৎজোন (কেল্টিক সংস্কৃতির ধারক) অত্যন্ত রগে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এখন অবশ্য এ-রকম করার কোনো অর্থই ছিলো না। পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দেবার আগে দেখলুম ফের জন পেরন (নব্য মিষ্টিক) ঘৃণা এবং বিষাদ ভরা চোখে আমার দিকে তাকালেন। হাঁটুজলের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। মারচেলার অবস্থাও তাই। হারপিসকর্ড বাজানো সম্ভব হচ্ছিলো না। ভেলো সোনাটা হ'লে সঙ্গীত অনুষ্ঠানটি বোধ হয় তক্ষুণি সঙ্গে হতো। কারণ জলের ভিতর থেকে তো আর ভেলোর আওয়াজ বেরুতো না। ওরকম মুহূর্তেও কী সব অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় এসেছিলো !

প্রাসাদে ঢুকবার বারোআটা এখন মনে হচ্ছিলো নিঃশব্দ গুহার মতো। কেবল দূরে কোথায় জলধারা প্রবেশের শব্দ কানে আসছে। গা থেকে কোট খুলে ফেলে নিমজ্জমান প্রাসাদের ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে চললুম তোরণের দিকে। দেয়াল আর স্তম্ভের গায়ে জল প্রতিহত হয়ে আমার সাঁতারের রহস্যময় প্রতিধ্বনি জেগে ওঠলো। একটি লোকও চোখে পড়লো না। বোঝা যাচ্ছে সব ভূতোরাই পলায়ন করেছে। কেনই বা তা করবে না ? সভ্যতা এবং শাশ্বত সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার দায় তো তাদের নেই। আর, প্রাসাদে যারা সমবেত, ভূতোর প্রয়োজন কোনোদিন আর তাদের হবে না।

বাইরে চাঁদ ঝলমল করছিলো, যেন কোনো কিছু ক্ষতি হয় না। তবু সমুদ্র-গর্ভে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিলো তো একটা পৃথিবী। মনে হলো অনেক দূর থেকে তখনো ভেসে আসছে মর্শিয়ে চেরেজার বাঁশির সুর।

পালিয়ে যাবার সময় চাকরেরা একটা গণ্ডোলা ফেলে গিয়েছিলো। আমি তাতে উঠে দড়ি খুলে দিলুম। ভেসে চললুম সাগর পানে। আমি যে জানালাগুলির পাশ দিয়ে বাইছিলুম সেগুলির ভিতর দিয়ে তখন হু-হু করে জল প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। দেখলুম অতিথিরা তাদের আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সোনাটা বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিলো, কারণ মাথার উপরে হাত তুলে তারা হাততালি দিচ্ছিলো। তাদের চিবুক পর্যন্ত এখন জল উঠেছে। মারচেলা এবং মর্শিয়ে বেরেজার উপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করছিলেন ; অবশ্য মাথা নত করে প্রত্যুত্তর দেয়া তাঁদের পক্ষে তখন সম্ভব ছিলো না।

জল এখন মোমবাতিগুলিকে ছুঁয়ে ফেলেছিলো। ধীরে ধীরে সেগুলি নিবে গেলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নৈঃশব্দ নেমে এলো। হাততালির শব্দ থেমে গেছে। হঠাৎ শুনতে পেলুম অট্টালিকা পতনের ভয়াবহ শব্দ। মারচেলার প্রাসাদ ডুবে যাচ্ছে। গণ্ডোলার মুখ তাড়াতাড়ি ফেরালুম সমুদ্রের দিকে। তা না হলে একখণ্ড পাথর যদি ছিটকে এসে লাগে তাহলে আর বাঁচবো না।

কয়েক শ গজ ঘুরে যাবার পর আবার ফিরে তাকালুম। চাঁদের আলোতে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, শান্ত ; যেন ওখানে কোনোদিন কোনো দ্বীপের অস্তিত্ব ছিলো না। কেবল জানের গ্রামদাটার জন্য দুঃখ হচ্ছিলো ; ওটা আর কোনোদিন পাবো না। সেই ক্ষতি অপূরণীয়। ওই মুহূর্তে এই ধরণের চিন্তা হয়তো খুবই নিষ্ঠুর মনে হবে, তবে কোনো ঘটনার পুরো তাৎপর্য তো সঙ্গে-সঙ্গেই উপলব্ধি করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন কালগত দূরত্বের।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

কার হাতে দীপ কে জ্বালে

নীলাদ্রি সোম

বেশির ভাগ জীবিকাতেই প্রবেশের জন্য আগে থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন সাহিত্য জগতে নেই। স্কুলমাস্টার, ডাক্তার, আইনজীবী, কেরানী, অভিনেতা, অল্পশিক্ষিত কৃষক, রাজনীতিক, এমন কি সাংঘাতিক অপরাধীরাও লেখক হবার জন্য চেষ্টা করেছেন, কিংবা বিখ্যাত লেখক হয়ে যশ ও অর্থ উপার্জন করেছেন। বিশ্বসাহিত্যকে তাঁরা সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। লেখক হবেন বলেই জন্মেছেন—এমনি ধারণা বোধ হয় খুব কম লেখকই তাঁদের সাহিত্য-জীবনের গোড়াতে মনে মনে লালন করেছেন। ফুল ফুটবার আগে গাছের মতো সাহিত্য সৃষ্টির আগে নিজেদের সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে এঁরা ছিলেন অচেতন। অনেক আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে তাঁরা একদিন সাহিত্যিক হবেন। নিজের মনের প্রবণতা কোন দিকে তা না জানার জন্য অনেকে এমন সব জীবিকা বা কাজে নিযুক্ত হয়েছেন যা সাহিত্য-কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। অন্য কাজের ফাঁকে হঠাৎ হয়তো একদিন নিতান্তই খেয়ালে হাত দিয়েছেন লেখায়। অবহেলা শেষে হ'য়ে উঠেছে সাধনা। নতুন নাম লেখা দিয়েছে আকাশে। নিজের প্রকৃত পরিচয় জেনে সমস্ত শক্তি, উদ্যম, আর স্বপ্ন তাঁরা তখন প্রয়োগ করেছেন সৃজনে; ছেড়ে দিয়েছেন আগেকার জীবিকা। অবশ্য এমন অনেক ভাগ্যবান সাধক লেখকও আছেন যাঁরা ছেলেবেলা থেকেই নিজেদের সাহিত্য-ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সৃষ্টি হবার পর থেকেই যেন তাঁরা জানতেন বিধাতা তাঁদের দিয়েছেন অলৌকিক আনন্দের ভার। সেই জন্য তাঁরা প্রাণপাত করেছেন লেখা, শুধু লেখার জন্য; অন্য কোনো জীবিকা স্বীকার ক'রে নেননি। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এই জন্য। মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে কঠিন দারিদ্র্য। তাদের সেই সাধনা যেন পাথরে মাথা কুটে ঝরনা খুলবার মতো, কিংবা কাঁটার বুক বিঁধিয়ে অকালে রক্ত গোলাপের উন্মেষণ।

ব্যালজাকের স্বপ্ন ছিলো সাহিত্যিক হবেন। অথচ তাঁর মা ছিলেন ওই স্বপ্নের ঘোরতর শত্রু। শেষ পর্যন্ত বাবার মধ্যস্থতায় মা ব্যালজাককে মাত্র দুবছর সময় দিলেন। ওই দু বছরের মধ্যে তাঁকে নিজে প্রমাণ করতে হবে যে সাহিত্যিক হবার যোগ্যতা তাঁর আছে। ব্যালজাক প্রথমেই একখানা

ট্রাজেডী লিখলেন। বোনের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওই ট্রাজেডীর পাণ্ডুলিপি। বাড়ির সবাইকে সেটি প'ড়ে শোনালেন। সবাই একবাক্যে মন্তব্য করলো 'ছাইভস্ম'। তখন ট্রাজেডীর পাণ্ডুলিপি পাঠানো হলো একজন অধ্যাপকের কাছে। তিনি প'ড়ে রায় দিলেন ব্যালজাক আর যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু লেখার দিকে হাত না দেন। ব্যালজাক কিন্তু আর কিছু না ক'রে লিখেই চললেন। আর সকলের মতের বিরুদ্ধে ওই একটুকু বজায় রেখেছিলেন বলেই না ফরাসী তথা বিশ্ব-সাহিত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়েছে।

'মবি ডিক'-এর প্রখ্যাত লেখক হার্মান মেলভিল জীবিকার প্রয়োজনে কত রকম কাজ যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নু-ইয়র্কের স্টেট ব্যাঙ্কে কেরানী থেকে শুরু ক'রে পশমের দোকানে সেলসম্যান, কাকার খামারে চাষী, স্কুল-মাস্টার কত কিছুই না তাঁকে হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শুরু করলেন সমুদ্র-বক্ষে জীবন। আর তখনি টের পেলেন তাঁর বুকের আঁধারে জ্বলছে সৃষ্টির মণি-দীপ। লিখলেন 'মবি ডিক'। জীবনের বহু বছর অপচয় করার পর নিজের পথ খুঁজে পেলেন।

কুলে কার্প-এর নাম আজ কে না জানেন! পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষাতেই তাঁর অমর গ্রন্থরাজী অনূদিত হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জের একজন দালাল। ওই সময়ই তিনি বিভিন্ন ফরাসী সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেও লিখতে শুরু করেন।

স্কুলমাস্টারদের মধ্য থেকে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে। কার্লাইল এবং ডি. এইচ. লরেন্সের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'দি গার্ডেন অব নাকাহরন'-এর লেখক মাকলিন এবং কবি রবার্ট ব্রুকও ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

কেরানীদের ভিতর থেকেও অনেক নাম-করা লেখক বেরিয়ে এসেছেন: চার্লস ল্যাম্ব, টি. এস. এলিয়ট, পি. জি. উডহাউস। স্বয়ং বার্নার্ড শ ডাবলিনে কিছুদিন কেরানীর কাজ করেছিলেন।

লেখক, সমারসেট মম, ডাক্তার আর্থার কোনান ডয়েল, অলিভার গোল্ডস্মিথ, কবি কীটস—প্রত্যেকেই চিকিৎসা-শাস্ত্রকে জীবিকা হিসেবে কোনো না কোনো সময়ে বা সারা জীবন গ্রহণ করেছিলেন।

এমন কি সাংঘাতিক অপরাধীদের মধ্যেও অনেকে সাহিত্য রচনা করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চেসম্যান আর বিল হাওস এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হরণ এবং বলাৎকারের দায়ে চেসম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে স্থির হয় যে তাঁকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। জেলে বসে তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে লিখতে শুরু করেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অনেকে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ রদ করবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন চলে দশ বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের আদেশই বলবৎ হয়।

কর্মমুখর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ডিজরেলী, উইনস্টন চার্চিল এবং আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু।

সাহিত্যের ফুল ফুটতে পারে যে-কোনো আবহায়; সাহিত্যিকের আবির্ভাব হতে পারে যে কোনো জীবিকার মানুষের মধ্য থেকে।

এসো এসো হে বৈশাখ

আতা পাকড়াশী

নব বৈশাখ এলো নববর্ষের সূচনা নিয়ে। আসুন আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই শুভ বৈশাখকে স্বাগতঃ জানাই। কিন্তু এই শুভ বৈশাখ কি সত্যিই শোভন? প্রাণান্তকর গরমের আভাস নেই কি ঐ কাল বৈশাখীর আড়ালে। তার জন্য আমাদের অভ্যাসেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনতে হবে বৈকি। তবেই আমরা সুস্থ শরীরে এই ঋতু পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারব।

স্বাস্থ্যই হল আসল সৌন্দর্য। যে কোন পোষাক যেমন করেই পরুন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে তা মানিয়ে যাবেই। একটি নিকষ কালো সাঁওতালী মেয়ে যখন তার ধপধপে সাদা খাটো শাড়াটি আঁটো করে জড়িয়ে পরে, মাথায় লাল ফুল দিয়ে হেঁটে চলে যায় তখন তার রূপ যেন উছলে পড়ে। কেন? কোন প্রসাধন তো তার দেহে নেই, তবে! আসলে স্বাস্থ? সুস্থ সবল স্বাস্থের অধিকারিনী মেয়েটি। প্রকৃতির উদার আবহাওয়া তাকে অমন সজীবতা দিয়েছে। ঐ দেহে তার মুখের অস্ফুট গানের কলি আর কারণে অকারণে ঐ উচ্ছল হাসি, এর আড়ালে রয়েছে তার মনের প্রশান্তি। এরই ছায়া ফুলছে তার সুস্থ নিটোল দেহে। সুন্দর সুস্থ মনই স্বাস্থ্য ভাল রাখার প্রধান চাবিকাটি। কিন্তু আমরা শহরের মেয়েরা অমন প্রকৃতির বদান্যতা পাব কোথায়? কিন্তু তবু পেতে হবে, নিজেকে একটু নির্লিপ্ত রেখে মনের প্রফুল্লতাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর ঐ প্রকৃতিরই কিছু কিছু অবদানকেই আমাদের রূপ ও শ্রী বজায় রাখার কাজেও লাগাতে হবে।

বাহ্যিক প্রলেপের চেয়েও আভ্যন্তরিণ শুশ্রূষা বেশী প্রয়োজনীয়। শরীরের ভেতরের সুস্থতাই ওপরের ত্বককে সহজে উজ্জ্বল করে। এই গরমের সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা সবচেয়ে দরকার। পেট পরিষ্কার না থাকার দরুণই অনেক সময়ে মুখে ছোট বড় সব ফুসকুড়ি বেরোয় বা ব্রণ হয়। শীতের শুকনো হাওয়া লেগে যেমন হয়, এই সময়েও সেই রকম গা হাত পা ফাটে। আবার অনেকে পিত্ত বৃদ্ধিতে ভোগেন। এর দরুণ হাত পায়ের তলা জ্বালা জ্বালা করে। হাত পা ঘামসে হয়ে যায়। চুল উঠতে শুরু করে। এছাড়া আছে চড়া রোদ্দুর। আজকাল আমাদের ঘরে বসে থাকলে বা দিবানিদ্রা দিলে তো চলবে না। কাজের জন্য বাইরে বেরোতেই হয়। তাই গায়ে রোদের তাতের ছাপ পড়ে, রংও কালো হয়ে যায়। এইবার এইগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দু'একটি প্রক্রিয়া বলি।

কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য রোজ নিয়ম করে একগ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে দু'চামচ চামচ ইসবগুলের ভূষি ও এক চামচ মধু দিয়ে ভোরবেলা খালি পেটে খেয়ে নিন। এতে বেড টি-র কাজও হবে আবার মধুতে ক্যাটও কমবে। কোষ্ঠও পরিষ্কার হবে। যাঁদের আমাশা আছে তাঁদের পক্ষে এটি খুব উপকারী। কোলাইটিস থাকলে পেটের গ্যাস কমে যাবে।

যদি লেবুর রস সহ্য হয়—মানে লেবু খেলে যাঁদের অম্বল না হয় তাঁরা আধগ্লাস গরম জলে আধখানা পাতি লেবুর রস নিয়ে রোজ ভোরে খালি পেটে খান। লেবুর রসে ত্বকও খুব ভাল থাকে। পেটও পরিষ্কার হয়।

যাঁদের দারুণ কোষ্ঠ-কাঠিন্য আছে তাঁরা ত্রিফলা ব্যবহার করুন। সঙ্গে ভিজে ছোলা খান। তাতে মুখের ভেতো কাটবে আবার শরীরে ভিটামিনও যাবে। ত্রিফলা মানে তিনটি ফল—আমলকী হর্তুকী, বহেরা। আমলকী আটটি বা দশটি, হর্তুকী দুটি, বহেরা একটি। হর্তুকী ও বহেরা জেঁচে বীচি বার করে নিন। এবার সবকটি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে রাত্রেই এক গ্লাস জলে সেদ্ধ করে রেখে দিন। পরদিন একটু গরম করুন বেশ করে চটকে নিন ফলগুলি। কাপড়ে ছাঁকুন। এবার জলটি খেয়ে নিয়ে ছোলা চিবোন। ভেতোও চলে যাবে। পিত্তও নাশ করবে এই ছোলা। ত্রিফলা একদিন বা দুদিন অন্তর খেলেই যথেষ্ট। যে কোন জোলাপই শেষে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু এগুলিতে সে ভয় নেই।

যাঁদের গায়ে রোদের ছাপ শীঘ্র ধরে ও পিত্তের ধাত বেশী তাঁরা রোজ ভোরবেলা খালি পেটে আধ গ্লাস কাঁচা দুধের সঙ্গে দু'চামচ করে কাঁচা হলুদের রস খান। সাতদিন খাবেন আবার সাতদিন বন্ধ দেবেন। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে, মুখে কোন রকম ব্রণ বা ফুসকুড়ি হলেও সেরে যায়।

আধগ্লাস ঠাণ্ডা জলে টেবিল চামচের এক চামচ তিনিগার দিয়ে সেই জল হাতে মুখে গলায় তুলো দিয়ে ঘষে ঘষে দিনের মধ্যে বার তিনেক অন্ততঃ মাখুন, এতেও রোদের ছাপ চলে যাবে।

শশার রসও রোদের ছাপ কাটাতে খুব উপকারী। শশা খেঁতো করে ন্যাকড়ায় করে চেপে রস বার করে নিন। হাতে গলায় মুখে মেখে মিনিট কুড়ি ধরে শুকিয়ে নিন, তারপর ধুয়ে ফেলুন। রংএও উজ্জ্বলতা আনবে; এতে ত্বকও মসৃণ হবে।

গরম দুধে একটু লেবুর রস দিয়ে সেই ফাটা দুধ গরম থাকতে থাকতেই হাতে মুখে গলায় মালিশ করুন। ত্বক তেলতেটের মত মোলায়েম হবে।

এই সময়ে ভেতো জিনিষ খাওয়া খুবই উপকারী। আগেকার কালে তো এই রকম গরমের দিনে প্রত্যেক দিন স্নান আর অম্বল খাওয়ার বিধিই ছিল। এখন সকলেরই সময়ের অভাব, তাই রান্নার মেহনতও সংক্ষিপ্ত। নিদেন পক্ষে উচ্ছে বা করোলা ভাতে দিয়েও খান। আর জলে তেঁতুল ভিজিয়ে গুড় বা চিনি দিয়ে মেখে খান। খাওয়াতেও রুচি আসবে। ভেতো আর টকে মিলে ত্বকও সুস্থ রাখবে। রক্ত পরিষ্কার থাকার দরুণ মুখে কোন রকম কোঁড়া বা ব্রণ হবে না।

হাত পা কাটার জন্য আর রং কর্সা করার জন্য রাত্রে শোবার আগে সর মেশান উষ্ণ উষ্ণ গরম দুধ মুখে হাতে পায়ে মাখুন। কিম্বা ঘুন না দেওয়া টাটকা মাখন ব্যবহার করুন। বেশ করে ঘষে ঘষে এটি মাখুন। মিনিট পনের পরে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত পা মুছে শুয়ে পড়ুন। সকালে যখন উঠবেন, দেখবেন আপনার সমস্ত অবয়বটি রুচি দুর্বার মত সুচিক্কণ হয়ে সতেজ একটি আভা ছড়াচ্ছে। এখন আপনার সুখ দেহটি আনন্দে স্বচ্ছন্দে গুরুরাজকে আবাহন জানাতে প্রস্তুত।

শুনুন, একটা অভিনব খাদ্যের কথা বলি

সুরঞ্জনা সেন

গ্রীষ্মে আর শীতে—দুই ঋতুতেই চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ ব্যাঙের ছাতা (ছত্রাক) চাষের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। অতীতে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সময় যখন দেশে খাদ্যের অনটন বিশেষভাবে দেখা দিতো, বিশেষ ক'রে মাংসের অভাব তখন ওই দেশের লোকেরা মাংসের পরিবর্তে ছত্রাকের ব্যবহার শুরু করে। অবশ্য, মাংসের বিকল্প খাদ্য ছত্রাক কখনোই হতে পারে না। তবে ভোজনের উপযোগী ছত্রাকে আছে প্রচুর বি ওয়ান, বি টু এবং ডি ভিটামিন, যা রিকেট রোগের প্রতিরোধক এবং ছত্রাক ছাড়া অন্য উদ্ভিদে দুর্লভ। এমন দিনও গেছে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকেরা শুধু ঘুঁই-ভোঁড় বা ছত্রাক খেয়েই দিন কাটিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই একটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ছত্রাক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রায় দেড় হাজার রকম ছত্রাক জন্মায়। এদের মধ্যে আশি রকম ছত্রাক বিষাক্ত। ষাট রকম ছত্রাক বেশ উপাদেয় এবং নিশ্চিন্তে খাওয়া চলে। বাকি সব ছত্রাক খেতে ব'সে একটু দেখে শুনে নিতে হয়। কোন ছত্রাক খাদ্য আর কোন ছত্রাক বিপজ্জনক তা নির্ণয় করার জন্য ওই দেশে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। তাছাড়া, ছত্রাক বাছাই করার সময় যে কথাটা মনে রাখা উচিত তা হলো যে ছত্রাকটি আপনার অপরিচিত এবং যার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন তা কক্ষনো খাবেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার বহু শহরে বাগান করার মতো ছত্রাকের চাষও অনেকের শখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির গায়ে একফালি জমি থাকলেই হলো; ওই জমিতে তারা চাষ করবেন ছত্রাক।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ রাস্তা-ঘাটে বা ট্রামে-বাসে চলতে গিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময়ও ছত্রাক-প্রসঙ্গের অবতারণা করে। যেমন: "তিনদিন ধ'রে তো বৃষ্টি হয়ে গেলো। গতরাতে বেশ গরম পড়েছিলো। অথচ বাতাস ছিলো না। ছত্রাকগুলো বোধহয় মাটি ফুঁড়ে ফনফন ক'রে উঠছে।" বেলা পড়ে এলে হয়তো দেখা যাবে এক ঝুড়ি চমৎকার ছত্রাক নিয়ে এক বুড়ো ট্রামে ক'রে বাড়ি ফিরছে। সেই ঝুড়ির দিকে ট্রাম-যাত্রীদের সপ্রশংস চোখ। অনেকের জিভে বোধ হয় জলও এসে গেছে। "মাফ করবেন, এমন সুন্দর ছত্রাক কোথায় পেলেন?" এই একই প্রশ্নের জবাব বুড়োকে অন্তত বার তিরিশেক দিতে হয়েছে। ওই দেশের লোকেরা রাতে যে বিচিত্র কার্পেটের স্বপ্ন দেখে তা হয়তো ছত্রাকের। ও-দেশের প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই যে দৃশ্য দেখে বহিরাগতরা অবাক হয়ে যান তা হলো প্রাটফর্মের এখানে-ওখানে বেতের বড়ো-বড়ো ঝুড়িতে নানা রঙের, নানা আকারের ছত্রাক।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে ভেজা ঘাসের উপরে ছত্রাকগুলি যেন উৎসুক মুখ বাড়িয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। সংগ্রাহকেরা টর্চের আলোর সাহায্যে তাদের খুঁজে বের করে এবং ঝুড়িতে তুলে নেয়। কোনো কোনো সংগ্রাহক ছত্রাকের সন্ধানে বনের মধ্যে দশ-পনেরো মাইলেও ঢুকে পড়ে। ক্লান্তি

বোধ করেন', কিংবা ছত্রাক তেমন পরিমাণে না পেলেও দুঃখিত হয় না। বাড়িতে ক'রে নিয়ে ছত্রাক ঝুলানো কিংবা শোকাবার সংগ্রাহকদের কাছ থেকে খুড়ি ক'রে কেনা তা নিজের আবিষ্কৃত ব'লে চালিয়ে দেয়া ওদেশে খুবই নিন্দা এবং লজ্জার বিষয়। পায়ে হেঁটে এবং কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করতে হবে তবেই না আনন্দ। সারাদিন সন্ধানের পর বিকেলে সংগ্রাহকেরা বাড়ি ফেরে। যে ছত্রাক সে সংগ্রহ করেছে তা নিজেদের জন্য কিছু রেখে বাকি সব আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে খুড়ি ভরে পাঠায়।

কোন মাটির নিচে ছত্রাক মাথা তুলবে ব'লে অপেক্ষা করছে, কোনটা খাদ্য আর কোনটা বিষাক্ত ইত্যাদি বিষয় বাড়ির বুড়ো-বুড়িরা অতি আগ্রহের সঙ্গে বাচ্চাদের শেখায়।

ওদেশের একজন অভিজ্ঞ সংগ্রাহক চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বসে এবং ত্রিশ গজ দূর থেকে চোখে দেখে ভোজনের উপযোগী ছত্রাক চিনে নিতে পারে; এমনকি তা সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে সেই ট্রেন হয়তো গাড়ি থামিয়েই বসে। ছত্রাক-সংগ্রাহকের স্বপ্নই হলো বিরাট আকারের ছত্রাক খুঁজে বের করা। সে-রকম ছত্রাক খুঁজে পাওয়া গেলে তা প্রদর্শনীতে দেয়া হয়, সংগ্রাহকের ছবি এবং তার সম্পর্কে লেখা বেরোয় দৈনিক সংবাদপত্রে।

ছত্রাক-চাষ ও ছত্রাক সংগ্রহ সম্পর্কে লোককে শিক্ষা ও নির্দেশ দেবার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াতে একটা সমিতি পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। এর সদস্য-সংখ্যা বর্তমানে চার হাজার।

ওদেশে ছত্রাক সংগ্রাহককে সকলেই সমীহ করে। ছত্রাক সম্পর্কে স্কুলে নানা কথা শেখানো হয়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।

আর ছত্রাক যখন রান্নাঘরে এসে হাজির হয় তখন তা থেকে যে কত রকম মুখরোচক খাবার তৈরী হয় তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশেও তো কেউ-কেউ ছত্রাক-ভোজী। এ-দেশে যে-রকম খাদ্যের অভাব তাতে ছত্রাকের চাষ ও খাবার হিসেবে তার ব্যবহার ব্যাপক হলে ভালোই হবে আশা করা যায়।

সুন্দর স্বাস্থ্যলাভের জন্য মাত্র ৫ মিনিট সময় দিন

শ্রীরেবা রায়

এক নম্বর ব্যায়াম

জানেন কি যেরদণ্ড সোজা রেখে পায়ের পাতার উপর ব'সে থাকাও একটা সুন্দর ব্যায়াম? হাত দু' খানি থাকবে আদু দুটির উপর। এই ভঙ্গিটি আদু সুগঠিত অথচ মেরুদণ্ডকে ঋজু রাখে। এই ভঙ্গিতে বসে তারপর শরীরের পশ্চাৎভাগ ধীরে ধীরে তুলুন, হাঁটুর নিচেকার পায়ের অংশটুকু মাটির সঙ্গে লেপটে থাকবে আর হাত দুখানি থাকবে দুই আদুর উপরে। এবার হাত দুটো ধীরে ধীরে মাথার উপরে সোজা ক'রে দিন। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ান।

দু নম্বর ব্যায়াম

এই সহজ ব্যায়ামটি কটি ও পশ্চাৎদেশ সুগঠিত করতে সাহায্য করবে। এমনভাবে দাঁড়ান যাতে দু পায়ের মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান থাকে। দু পা একটুও যেন না বেঁকে থাকে। মাথার

উপরে হাত দুটো সোজা ক'রে তুলে ধরুন, এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুল ধরে রাখুন। এবার কোমরের উর্ধ্বাংশ থেকে শরীর সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিন, হাত দুটো সোজা অবস্থায় সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়ে আনবেন এবং ডান পায়ের সামনেকার মাটিতে রাখবেন। ডান পা হাঁটুর কাছে সামান্য একটু বাঁকবে কিন্তু বাঁ পা যেন সোজা থাকে। শরীরের ওজন যেমন শরীরের ডান দিকে। এর পরে একই ভঙ্গিতে বাঁ হাটু বাঁকাবেন আর ডান হাঁটু তখন সোজা রাখবেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। এই ব্যায়ামটি ক্রমান্বয়ে বার দশেক করুন।

দুটি ব্যায়ামই সহজসাধ্য। খোলামেলা জায়গায়, মানে উঠোনে বা ছাদে, অভ্যাস করলে ভালো হয়।

ওষুধ বেশি খাবেন না

বেশি অসুখ হয়ে না পড়লে, বা তেমন দরকার না পড়লে ওষুধ খাবেন না। যখন-তখন আর খানিকটা অকারণে ওষুধ খেলে ওষুধই শেষ পর্যন্ত আপনাকে খেয়ে বসবে। অনেক বাড়ির টেবিলের ড্রয়ার বা আলমারী খুললে যে পরিমাণ পিল, টনিক, ভিটামিন বা হজমি বড়ি দেখা যায় তাতে সেগুলিকে ছোট-খাট ওষুধের দোকান ব'লেই মনে হয়। সত্যি, ওষুধ খাওয়া অনেকের এক অনর্থক নেশা। এতে শরীর এবং অর্থ দুইই নষ্ট হয়। মনে রাখবেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন শারীরিক সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আমাদের শরীরের ভিতরেই আছে রোগ-প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক শক্তি। সেই শক্তিকে আরো আগ্রহ থাকতে সহায়তা করুন, সেই শক্তির উপরে আস্থা রাখুন। মনে রাখবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধও শরীরের সেই সহজাত শক্তির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অকারণে ওষুধের নেশা ক'রে সেই স্বাভাবিক শক্তিকে হেলায় চিরতরে নষ্ট করবেন না। বাজারের কতগুলি ওষুধ বিষমিশ্রিত সেবনে তা নেশাতে দাঁড়িয়ে যাবেই। আর তাহলেই মহাবিপদ।

টনিকের কথাই ধরুন। কারুর পক্ষে তা হয়তো সত্যি দরকারী। কিন্তু অনেকেই হরদমারী টনিক সেবন করে নিতান্তই সখে পড়ে, এবং অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে। অনেকের নাকি জোলাপ ছাড়া কোষ্ঠ পরিষ্কারই হয় না। হবে কি করে! জোলাপ বেশি ব্যবহার করাতে শরীর তার স্বাভাবিক ক্রিয়া ভুলে গেছে যে। শরীরকে যত বেশি অন্যায় প্রশ্রয় দেয়া যায় ততই সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অনেক ওষুধ শরীরকে সাহায্য করে না, তাকে অকর্মণ্য হতেই সাহায্য করে।

ওষুধ কিনে-কিনে বাড়িটাকে হাসপাতাল বানিয়ে তুলবেন না। মনে রাখবেন, অকারণে যখন তখন ওষুধ ব্যবহারই একটা রোগ, একটা মানসিক ব্যাধি।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য লেখক দায়ী নন)

কূটনীতিতে, ছলকীতে, বেপরোয়া ভঙ্গীতে, চাতুর্যে এবং শঠতায় পাকিস্তানের জুড়ি নেই।

উপরে যদিও "সংগত" (?) শব্দটিই যে আজ পৃথিবীর বাজারে কাজ আদায়ের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ব্রেফ মারমার কাটকাট করে লাঠি ঘুরিয়ে পাকিস্তান আমেরিকার মত শক্তিধর রাষ্ট্রকে কূটনীতিতে কাবু করে ফেলেছে। অবশ্য এর মধ্যে ভারতের প্রতি আমেরিকার চিরাচরিত জুগুপ্সু মনোভাবও আছে।

তা না হলে লালচীন পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েও আমেরিকা কোথায় পাকিস্তানকে সাবেতা করবার চেষ্টা করবে, তা নয়, আমেরিকা বলছে পাছে, পাকিস্তান চীনের কোলে আরও চলে পড়ে তার নিবারণ কল্পে আমেরিকা পাকিস্তানকে আরও সামরিক সাহায্য দিয়ে নিজের কোলে টানবার চেষ্টা করুক!

পাকিস্তানের কি মজা।

ভারতের অবস্থাটা বুঝুন। তিন দিকেই প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য বিরোধ আর বিদ্বেষ। চীনারা পাকিস্তানকে শুধু সামরিক অস্ত্র দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যাতে চীনারা যেসব অস্ত্র দিতে পারছে না সেইসব বড় বড় প্রচণ্ড মারাত্মক অস্ত্র পাকিস্তান অন্য দেশ থেকে কিনতে পারে সেইজন্যে তারা পাকিস্তানকে ১০০ মিলিয়ান ডলার ঋণ দিয়েছে।

সেই টাকা দিয়ে ছাটো দেশগুলির মাধ্যমে পাকিস্তান বিনা বাধায় মার্কিন সমরসম্ভার ক্রয় করবে।

এতেই পাকিস্তান ক্ষান্ত নয়। সে এখন সরাসরি মার্কিন সামরিক সাহায্য চায়। এবং সে জন্যে সে প্রকাশ্যে দরবার শুরু করেছে। এবং আমরা জানি তার আর্জি মঞ্জুর হবে।

অতএব আমরা এক অদ্ভুত এবং অকল্পনীয় দৃশ্য দেখছি এবং আরও দেখব—সারা পৃথিবীর লোক অবাক বিস্ময়ে সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখবে—দুই চিরশত্রু আমেরিকা ও চীনকে একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে পাকিস্তানকে বরণডালে সজ্জিত করছে ভারতের বিরুদ্ধে।

• • •

এক রাজ্যের ভাষা যাতে অন্য রাজ্যে প্রসার লাভ করে সেজন্যে অনেকগুলি রাজ্যসরকারই আজকাল সচেষ্ট। সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল ভাষায় একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার জন্যে টাকা দিয়েছেন। বাঙালীর ছেলেরা তামিল শিখুক, তাতে আপত্তি নেই। বরং তার দ্বারা উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে এবং ভাষার মধ্য দিয়ে ভাববিনিময়ের দ্বারা দুই প্রান্তের অধিবাসীরা মনের দিক থেকে আরও নিকটে আসবে, ভাল কথা, তবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে কলকাতায় যেমন তামিল শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, মাদ্রাজে তেমনি বাংলা শেখানোর জন্যে আমাদের তরফ থেকেও উদ্যোগী হওয়া কি উচিত নয়? আমাদের রাজ্যসরকার কৌশল করতেই ব্যস্ত। এসব বিষয়ে চিন্তা করবার মতো মস্তিষ্ক তাঁর হয়ত নেই, কিন্তু তাকে এবিষয়ে চেতনা দেবার প্রয়োজন আছে। এবং এ বিষয়ে আমাদের রাজ্যে যে সাহিত্য পরিষৎ আছে, যেসব সাহিত্য সম্মেলন আছে তাদের দায়দায়িত্ব কম নয়। বৎসরান্তে সভা ডেকে কয়েকদিন আমোদপ্রমোদ করেই অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। আমরা বিশেষভাবে তাঁদের উদ্দেশেই বলছি, তাঁরা যদি এবিষয়ে সচেষ্ট হন তাহলে রাজ্য-সরকারের আনুকূল্য পাওয়া অসম্ভব হবে না। তাঁরা প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং হাফ টিকিটে বিদেশ ভ্রমণের লোভে অনেকেই সেই সব সম্মেলনে গিয়ে আমোদ ফুর্তি করে আসেন, তাঁদের কী এবিষয়ে কিছুই করণীয় নেই? বাংলাদেশে বড় বড় লেখক সাহিত্যিক বিদ্বজ্জনের অভাব নেই। অভাব আছে সংগঠনের। একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণয়ন করে সকলের সহযোগিতায় যদি তাকে রূপদান করা যায় তাহলে বাংলার বাইরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসার সুনিশ্চিতরূপে বাড়বে।

• • • •

কাকোরকরের খেল। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে বেরুলো যে গোয়া কংগ্রেসের সভাপতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিন ধরে সে কি হৈ চৈ। রীতিমত রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা কাহিনীর মত লেখালেখি আর নানা সমাধানের ইঙ্গিত। তাঁকে কি গুম করা হয়েছে? অজানা আততায়ীর হাতে তিনি কি খুন হয়েছেন? এবং তাঁর লাশ কি লাউথ আফ্রিকায় পাচার করা হয়েছে? তিনি কি নাগাদের দলে ভিড়েছেন? তিনি কি হিমালয়ের চূড়ায় গিয়ে তপস্যায় বসেছেন? এইরকম হাজার প্রশ্ন। সরকারের লোকজন চতুর্দিকে তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহু টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর সহসা তিনি নিজেই তাঁর অস্তিত্বের কথা জনসাধারণকে জানালেন। তিনি বহাল তবিয়তে হৃষীকেশের এক সাধুর আশ্রমে আছেন। সাধন ভজন শিখছেন। তিনি শিগগীরই আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে যথাপূর্বং রাজনীতি করবেন। রীতিমত ভাঙ্গমতির খেল বলতে হবে

বৈকি। নিজের নামটাকে প্রচার করবার একটা নতুনতর প্যাঁচ। এমন প্যাঁচ, যাতে সরকারের বেশ কিছু টাকা গলে গেল।

• • • •

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এমন রেটে বাড়ছে যে একজন ভূবিজ্ঞানী গবেষণা করে বলেছেন যে; ভবিষ্যতে পৃথিবীময় মানুষ দাঁড়াবার বসবার জায়গা না পেয়ে ধাক্কাধাক্কি করবে। এবং সেই ধাক্কাধাক্কির ফলে সহস্র সহস্র মানুষ জলে গিয়ে পড়ে ডুবে মরবে। পৃথিবীর কথা থাক, ভারতের কথাই ধরুন। এখানকার অবস্থাও মোটেই সুবিধের নয়। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে. এল, রাও বলেছেন যে, ভারতে যেরকম ভীষণভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভারতে প্রত্যেক বছর অতিরিক্ত ২০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাঃ রাও লোকসভায় বলেন যে, ভারতে প্রত্যেক বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ করে লোকসংখ্যা বাড়ছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের প্রত্যেক নবজাত শিশুর জন্যে সেচ বাবদ একশ করে টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

• • •

পত্রিকার হেডলাইন সবচেয়ে বড় হরফে :

"পিণ্ডির মতি গতি বদলাতে হবে"।

উক্ত সংবাদের মর্মার্থ হল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের তাসখন্দ নস্যাৎ নীতিতে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং কী করে পাকিস্তানের মতিগতি পালটানো যায় তার উপায় চিন্তা করছেন।

৩৮ একর জমি আমরা যুদ্ধে জিতেও শত্রুকে ফেরত করে দিয়ে চলে এসেছি। আরও শত ছত্রিশ একর দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তবি তাতে ভুলবে না। বাঘ বরং নিরামিষ ধরতে পারে, সাপ ছোবল ভুলতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান ভারতবিদ্বেষ কোনদিন ভুলবে না। কারণ, সেই বিদ্বেষই যে তার জন্মদাতা!

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী শেষ চেষ্টা করতে পারেন – সরাসরি পিণ্ডি দিয়ে দেখতে পারেন, তাতে যদি পিণ্ডির—পিণ্ডির রং বদলায়!

• • •

"চাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে ওঠে
কী ভয়ানক লড়াই হল যা রে!
কতলোকের মুণ্ড পড়ল কাটা!"

কলকাতা শহরে আমরা শীঘ্রই এইরকম লড়াই দেখব। জোতদার আনাদার দাঁড়িয়ে ছেলেরা লড়াই দেখবে আর উক্ত লাইনগুলি আবৃত্তি করবে।

কলকাতায় হাঙ্গামা বাধলে অতঃপর পুলিশ চাল নিয়ে বেরুবে। কাগজে কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। তলোয়ারের কথাটা উহ্য আছে। বহড়া হয়েছে লাঠি নিয়ে। আসল লড়াই-এর সময় তলোয়ার না থাকলে মানানসই হবে কেন! এক হাতমে চাল, এক হাতমে তলোয়ার।

এই চাল নিয়ে খুব চলাচলি হয়েছে।

জোর মহড়া হয়েছে। একদল পুলিশ বাদাকারী সেজে বো বো শব্দে ইটপাটকেল ছুঁড়েছে। আর একদল বেতের আর লোহার চাল দিয়ে ইট রুখেছে। 'দাঙ্গাকারীরাই' মজা পেয়েছে বেশী। মনের আনন্দে ইট ছুঁড়েছে। চালওয়ালা বেচারারা অনেকেই বেদম জখম হয়েছে। চালের তলা দিয়ে ইট এসে অনেকের পা খোঁড়া করে দিয়েছে।

এখন চাল-তলোয়ারধারীদের পা কি করে বাঁচান যায় সেই ভাবনাই চলেছে। ইতিমধ্যে এক ঠিকাদার গুছিয়ে নিলেন। তিনি ১০০০ লোহার জালের চালের অর্ডার পেয়ে গেছেন।

* * *

কোনো বিশেষ কাজে কোন ব্যক্তি যখন বিস্ময়কর এবং অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন তখন যে প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা গোষ্ঠীর তরফে তিনি কাজ করেছিলেন তারা স্বভাবতঃই তাঁকে (অবসর নেবার দিন এলেও) ছাড়তে চায়না। হয় তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি করে, না হয় তাঁর জন্যে নতুন কোনো পদের সৃষ্টি করে ; অন্ততঃ উপদেষ্টা রূপে অন্ততঃ কাছে রাখবার চেষ্টা করে, যাতে প্রয়োজনের সময় অথবা সংকটকালে তাঁর সক্রিয় সহায়তা পাওয়া যায়। অপরাজিত জেনারেল অরুণ চৌধুরী তাঁর রণ-নৈপুণ্যে সারা জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। দু' মাস পরে তাঁর চাকরীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সারা ভারত, শুধু ভারত কেন, দুনিয়ার লোক আশা ও বিশ্বাস করেছিল, ভারতের এই আপৎকালে জেনারেল চৌধুরীকে কখনই সৈন্যবাহিনী থেকে চলে যেতে দেওয়া হবেনা। হয় তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি করা হবে, না হয় অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁকে সেনানায়করূপে রাখা হবে। আগামী কয়েক বছরের জন্যে তাঁর মত সমর বিশারদ যোদ্ধার প্রয়োজন ভারতের পক্ষে যে অপরিহার্য একথা বোধকরি ভারতের অতিবড় শত্রুও স্বীকার করবে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের মতিগতির ধারা কিছু বিচিত্র। শুধু বিচিত্র নয়, দুর্জ্ঞেয়। বারেবারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সংবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে এবারও পাওয়া গেল। প্রকাশ, জেনারেল চৌধুরীর কার্যকাল উত্তীর্ণ হলে তাঁকে একেবারে দেশের বাইরে চালান করে দেওয়া হবে, কানাডায় ভারতের রাষ্ট্রদূতরূপে। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময়ে (এবং খুব শিগগীরই সেই প্রয়োজন আসবে) তাঁর মত অভিজ্ঞ সমরকুশলীর পরামর্শটুকু পর্যন্ত থেকেও ভারতের সমর বিভাগ বঞ্চিত হবে।

আমাদের দেশের এক চিরস্মরণীয় কবির সম্বন্ধে এক অপবাদের প্রবাদ চলিত আছে। তিনি নাকি একবার বনে কাঠ কাটতে গিয়ে একটি উঁচু গাছের মগডালে উঠে যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালটি কেটে ফেলছিলেন। সেই অবিমৃষ্টকারিতার দোষে ভারতের বড় বড় মাথায় এখনো বাসা বেঁধে আছে। ও আর যাবার নয়।

* * *

গণসম্পত্তি রূপে গণ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ব্যাপারে মাঝে মাঝেই নানা মন্তব্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মহাজাতি সদনের ব্যাপার নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি। অন্য পত্র-পত্রিকাও মন্তব্য করেছে।

এইরকম আর একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইদানিং নানা অভিযোগ শুনছি। সে প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট। এর পরিচালক মণ্ডলীতে বড় বড় নামী লোক অনেক আছেন।

এই প্রতিষ্ঠান অধুনা যেন রীতিমত ব্যবসাদারি আখড়ায় পরিণত হয়েছে—চড়া ভাড়ায় হলটিকে ভাড়া খাটানো হচ্ছে, থিয়েটার বাড়ী রং-তামাশা লেগেই আছে। আগে ভাড়া ছিল ৫০৲ এখন মাসে ২৭৫৲. মাইকের জন্য আলাদা ৮০৲। তবুও ইতিমধ্যে ভাড়া বাকি আরও বেড়েছে।

কিন্তু এত টাকা ভাড়া দিয়ে সেখানে অভিনয় করতে গিয়ে নাট্যসংস্থাদের হাজারো অসুবিধা এবং অব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, এ অভিযোগ আমরা আগেও পেয়েছি, এবার সদ্য অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী এক নাট্যোৎসবে তার সাম্প্রতিতম প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বেহালার নাট্যসংস্থা 'শিল্পীদল' গত ৮, ৯, ১০ এপ্রিল ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা তাঁরা ইন্সটিটিউটের সেক্রেটারীকে এক পত্র লিখে জানিয়েছেন। সেই পত্রের একটি প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি। পানীয় জলের অব্যবস্থা, মকসজ্জাকরের গাফিলতি, সাজঘরে আলোর অভাব প্রভৃতি যেসব অসুবিধা তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে তা জানিয়েছেন শিল্পীদল তাঁদের সেই পত্রে এবং সেই সঙ্গে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

আমরা আশা করব ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সহৃদয়তার সঙ্গে শিল্পীদলের পত্রটি বিবেচনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

ইউ. ইন্সটিটিউটের মহান ঐতিহ্য পঞ্চাশের বহ্নি ঘরে ছাত্র সমাজ এবং বিদগ্ধজনকে আকৃষ্ট করেছে। স্যার আশুতোষ ও স্যার ব্রজদাসের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও বিকাশ। এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানী বাগ্মী শিক্ষাব্রতী দেশনেতা, তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান ধারণাকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। এরই মঞ্চে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের আবির্ভাব ও বিকাশ, এই মঞ্চেই তাঁর চাণক্য, রঘুবীর, জয়সিংহ, রঘুপতি, প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় দেখে বাংলা দেশের মনীষীকুল চমৎকৃত হয়েছেন। এরই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পাল দেশসেবার জন্য অকপটভাবে আহ্বান করে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দান করেছেন। স্যার আশুতোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র তখনকার দিনের রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বরেণ্য প্রায় সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিই এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের উপস্থিতি এবং ভাষণপ্রদানের দ্বারা সার্থকতা দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবসে কলিকাতা নাগরিকবৃন্দ-আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে বাংলার ছাত্ররা যে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেছিলেন তার উদ্বোধন এবং অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠান ইন্সটিটিউট মঞ্চে সম্পন্ন হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি স্মরণীয় ভাষণ দান করেছিলেন। আমরা আশা করব ইউ. ইন্সটিটিউটের এই গৌরবময় ঐতিহ্য শেষ পর্যন্ত নিছক ব্যবসাদারীতে পরিণত হবে না।

• • •

যে কথাটা আমরা মনে প্রাণে যেকোও প্রকারে বলতে ইতস্তত বা সঙ্কোচ বোধ করি সেই কথাটাই যখন অপরে বলে তখন সমস্বরে সবাই তাকে স্বীকার করি। ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তির অবশ্য কূটনীতির গুপ্ত পরিচয় ঘরে ঘরেই ধরা পড়েছে কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে বলতে তারতের নেতৃবর্গ দ্বিধা করেছেন। আমেরিকার সাহায্যের উপর নির্ভর করেই যে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছিল এই সত্য কথাটি এতদিন পরে ঘোষণা করেছেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর সততা

এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে কারুর কোনো সংশয় নেই। মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে এমনি দু'একজন সত্য উদ্‌ঘাটনে সাহসী মানুষের দেখা মিলেছে। ভারতের প্রাক্তন মার্কিন-রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন গালব্রেথ তাঁদের মধ্যে একজন। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র কমিটির বৈঠকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "পাকিস্তানকে মার্কিন সমর সম্ভার দেওয়ার ফলেই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামতে সাহসী হয়। মার্কিন সামরিক সাহায্য কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেল পাকিস্তান সেইসব অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করল। কাশ্মীর বিরোধের পক্ষে বা বিপক্ষে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমরা যদি অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ না করতাম তাহলে পাকিস্তান সামরিক সমাধানের চেষ্টা করত না। এইসব অস্ত্রশস্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্যেই দেওয়া। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে সেই সোভিয়েট ইউনিয়নই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে এই লড়াই-এর একটা ফয়সালা করে দিল এবং দুপক্ষই তাকে মেনে নিল।"

সেনেটরবৃন্দ মুখ কালো করে স্পষ্টবাদী অধ্যাপকের উক্তিগুলি হজম করেছিলেন। অবশ্য মানবহিতব্রতী অধ্যাপকের এই সত্যভাষণ অরণ্যে রোদন বৈ মার্কিন মহলে অন্য কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না।

ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে এনেছিল এক অপরূপ আশার আলো—সে তার নিজের ওপরে বিশ্বাস।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, প্যারিসের নোতরদাম্ গির্জায় এক বিচিত্র উৎসবের আয়োজন হোল—যুক্তি ও যুক্তির উৎসব।

যুক্তিদেবীরূপে সাজিয়ে বসানো হোল এক সুন্দরী মহিলাকে। সত্যের মন্দিরে চলল যুক্তির পূজা।

আদর্শবাদীর স্বপ্ন, মানুষের চিরকালের স্বাধীনতা পিপাসা ঐ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল আর তারপরেই নেমে এল অন্ধকার, এই আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করা হোল গিলোটিনে।

অশান্ত পৃথিবী

নলিনীরঞ্জন মিত্র

রোডেশিয়া :

কিছুদিন শান্ত থাকার পর রোডেশিয়া সমস্যা নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। মনে হয় অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে স্মিথ সাহেব কিছুটা শায়েস্তা হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা দমবার পাত্র নন। কয়েকদিন পূর্বে একটি গ্রীক ট্যাঙ্কার পোর্তুগীজ মোজাম্বিকের বেরা বন্দর হয়ে রোডেশিয়ায় তেল যোগাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মধ্যপথে ব্রিটিশ নেভী উক্ত ট্যাঙ্কারের গতিরোধ করে। ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব পাশ করে ব্রিটেনকে শক্তি প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ভারত ও ইথোপিয়া রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে শক্তি প্রয়োগ করার জন্যে অনুরোধ করেছে।

ব্রিটেনের টোরীপার্টি বল প্রয়োগের বিরোধী। মিঃ উইলসনও মনে হয় দোটানায় পড়েছেন। এমতাবস্থায় ব্রিটেনকে স্মরণ রাখতে হবে পৃথিবীর কাছে তারা অঙ্গিকার করেছে যে রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তন করবে। শুধু তাই নয় তাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ১৯৫৬ সালে মিশরের বিরুদ্ধে সুয়েজখালে তারা নৌবাহিনী পাঠিয়ে নাসেরকে জব্দ করতে চেয়েছিল। আজ বিশ্ব জনমত, বিশেষ করে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা সাগ্রহে ব্রিটেনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শুধু অর্থনৈতিক অবরোধ যথেষ্ট নয়। স্মিথ সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন বলপ্রয়োগ।

ভিয়েৎনাম :

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভিয়েৎনামের প্রতি পূর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দিয়েছে। তাদের পার্টি কংগ্রেসে যুক্তরাষ্ট্রকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে তারা অবিলম্বে ভিয়েৎনাম থেকে সরে যায়। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ ঘুরে থাক এখন উভয় পক্ষ পূর্বোদ্যমে যুদ্ধের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। এদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বৌদ্ধদের আন্দোলন বেশ

ধানা বেঁধে উঠেছিল। মার্কিন বিরোধী মনোভাবও বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। Ky সরকারে পতন আসন্ন-প্রায়। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদিই ক্ষমতায় বসাক না কেন বৌদ্ধ ও ক্যাথলিকদের প্রভাব অস্বীকার করলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে Ky সরকারের শুভবুদ্ধি উদয় হয়েছে। তারা আগামী তিন মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে বৌদ্ধরা আপাতত আন্দোলন বন্ধ করেছে। কিন্তু এভাবে জোড়াতালি দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে বেয়নেটের দ্বারা Ky সরকারকে বহাল ও অপর দিকে ভিয়েৎকং ও বৌদ্ধ-ক্যাথলিক আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রেঃ জনসনকে আরও র‍্যাশনাল হ'য়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। নইলে তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রবর্গ তাঁকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না। তাঁর দেশবাসীও ক্রমশ অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়া যদি সরাসরি উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্য করতে সুরু করে তা'হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

আরব দুনিয়া :

আর এক ভিয়েৎনাম সৃষ্টি হতে চলেছে আরব দুনিয়ায়। সেখানে ধর্মান্ধতা এখনও দূর হয়নি। প্রগতির নামে এখনও অনেক আরব প্রধান সিউরে ওঠেন। কয়েকটি আরব দেশের এই রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন। তাদেরই চক্রান্তে আরব দুনিয়ার ঐক্য নষ্ট হতে চলেছে। প্রগতিবাদী প্রেঃ নাসেরের বিরুদ্ধে কয়েকটি রক্ষণশীল গোষ্ঠী আরব দেশ জোট বাঁধবার চেষ্টা করছে। এদের নেতৃত্ব করছেন সৌদী আরবের রাজা ফৈসাল। তাঁর দোসর হচ্ছে পাকিস্তান ও ইরাণ। এরা ইসলামের ভিত্তির ওপর এক মুসলীম জোট তৈরী করবার চেষ্টা করছে। সিরিয়ার পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ডঃ দৌসিরীও এদের দলে যোগদান করেছেন। তিনি আবার কমিউনিষ্ট ভূতের ভয় দেখিয়ে মুসলীম ঐক্যের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। সর্বোপরী এর পেছনে ব্রিটেনের উস্কানী রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন চায় মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করে অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধা আদায় করতে। প্রেঃ নাসেরের বিরোধী দলকে শক্তিশালী করাও ব্রিটেনের আর এক উদ্দেশ্য। প্রেঃ নাসের কিন্তু এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি এই ধরণের ধর্মের ভিত্তিতে জোট বাঁধার ঘোর বিরোধী। ফলে ঐ গোষ্ঠী তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। রাজা ফৈসালের সাম্প্রতিক পাকিস্তান ভ্রমণ ভারতের দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জোটকে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। সুতরাং ভারতের উচিত কূটনৈতিক তৎপরতার দ্বারা এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করা। প্রেঃ নাসেরকে শক্তিশালী করাও ভারতের অন্যতম কর্তব্য।

নাগা-মিজো সমস্যা :

ভারতের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা বারবার ঐ অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছিল শান্ত। কিন্তু আজ সেই শান্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে। চীনা আক্রমণের পর আমাদের দৃষ্টি ওদিকে বেশী করে নিবদ্ধ হয়েছে।

নাগা সমস্যা আজকের নতুন নয়। গত আঠারো বছর ধরে এই সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে এক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তারা চায় স্বাধীন সার্বভৌম নাগা রাজ্য। শান্তির পথ ছেড়ে তারা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে। এর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে মিজো সমস্যা। নাগা সমস্যা নিয়ে যখন ভারত সরকার ব্যতিব্যস্ত ঠিক তখনই সশস্ত্র মিজো বিদ্রোহীরা আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে। তাদেরও দাবী স্বাধীন মিজো রাজ্য চাই।

সমস্যা যদি এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা'হলে হয়তো এর একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু ব্যাপার আরও অনেক দূর গড়িয়েছে। এদের পেছনে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের উস্কানী। একথা স্পষ্ট যে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা পাকিস্তানের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে। পাকিস্তানে তারা গুপ্তশিক্ষাও গ্রহণ করেছে। মিজো নেতা ইন্দোনেশিয়ার কাছেও সাহায্য চেয়ে পত্র দিয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় মিজো নেতা ও চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটেছে। নাগাভূমিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের ভূমিকাও খুব পরিষ্কার নয়। মিঃ ষ্টকের আচরণও সুখপ্রদ নয়। বর্তমানে নাগা ও মিজোদের নাশকতা মূলক কাজ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে লামডিং ও দিমু স্টেশনে ট্রেন বিস্ফোরণে বহু নিরীহ লোক প্রাণ হারিয়েছে। এই বিদ্রোহীরা টাইমবোম, মেসিনগান প্রভৃতি ব্যবহার করছে। ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির এই অবন্ধুজনোচিত ব্যবহারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত। এবং বিদ্রোহীদেরও কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন। নইলে অচিরেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বিদেশী ও বিদ্রোহীদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হতে পারে।

• • •

পৃথিবীর বইয়ের দোকানের রাজা এক এণ্ড জি ক্রেমেন্স্। কথায় কথায় বলি : যা নেই ভারতে তা নেই ভূ-ভারতে। একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, যে বই নেই ক্রেমেন্স্-এ তা নেই দুনিয়ায়। দুষ্প্রাপ্য সব এডিশন? তাও আবার নানা ডিজাইনে গাছের বাকল পশুর চামড়া, অদ্ভুত সব কাপড়ের ডিজাইনে বাঁধাইকরা হরেক রকম বই।

একদিন এক মাথা-পাগলা ধনী কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বললেন, "মশাই, মানুষের চাম দিয়ে বাঁধানো বই আমায় একখানা দিনতো!

যিনি কাউন্টারে বই বিক্রি করছিলেন, বিচিত্র লোকটির অদ্ভুত চাহিদা শুনলেন কিন্তু একটুও অবাক হলেন না, তাঁর মুখের একটি রেখাও বিকৃত হলো না। অর্ডার পেয়ে তিনি ভেতর থেকে ভদ্রলোকের চাহিদা অনুযায়ী একখানা বই নিয়ে এসে কাউন্টারে রাখলেন। বইখানা ফরাসী দেশে ছাপা। নাম 'Vignettes des Mysteres de Paris'। বইটি ছাপা হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। গ্রন্থকারের প্রেমিকার দেহের চাম দিয়ে বইখানা বাঁধানো। মরে যাওয়ার আগে মহিলাটি তার উইলে ওই ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। গ্রন্থকারও মৃতা প্রণয়িনীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

পাঠক পাঠিকার কলম

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা দেশের নাট্যজগতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার বলে মনে করি। একটি জাতির সর্বাঙ্গীন প্রগতির পথে নাটকের যে প্রধান অংশ আছে তা অনস্বীকার্য। কাব্য বা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের মধ্যে সেই দেশ এবং দেশবাসীর অবস্থা, মনের পরিচয় এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে, যথা শিল্পে সঙ্গীতে এবং বহুবিধ কারুকর্মে, তার অগ্রগতি ও উৎকর্ষের নিদর্শন অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সেই জন্যই বোধকরি ইংরাজীতে বলা হয়—A nation is known by its stage.

কিন্তু আমাদের দেশে এই থিয়েটার আজ জাতির ও দেশের অবস্থা, মনন এবং সমস্যাকে কতটুকু প্রতিফলিত করছে? দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের মালিকরা এই বিষয়ে তাঁদের চিন্তাশক্তি বা সৎপ্রচেষ্টার কোনো পরিচয়ই দিতে পারছেন না। জাতির বর্তমান সমস্যা, সর্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়, তার হতাশা, বেদনা ও বিক্ষোভ—যার প্রত্যক্ষ ছবি আমরা অহরহ দেখছি আমাদের আশেপাশে—তার কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকে। সেখানে সেই আদর্শহীন তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নাট্যরূপ, অথবা কোনো সৎ কাহিনীর বিকৃত কদর্য বাইশকোপ, অথবা কোনো স্থূল রসিকতা-বহুল কষ্ট-কল্পিত জগাখিচুড়ি, বা কোনো উগ্র মতবাদের অবান্তর চণ্ডনাটা কবিকা। আমাদের আজকের জীবনের সঙ্গে এইসব নাটকের বিষয়বস্তুর কোনো যোগ নেই।

সেদিক থেকে বরং কয়েকটি শক্তিশালী অপেশাদার নাট্যসংস্থার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও কেমাল এবং অনুবাদপ্রীতি এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের সূচনা

করছে বলে মনে করি। পরের কাছে টাকা ধার করে নিজের ব্যবসা চালানোর মধ্যে যে বিপদ আছে, অনবরত বিদেশী নাটকের বাংলা রূপান্তর অভিনয় করার মধ্যেও সেই বিপদ আছে।

কোথায় বাংলা দেশের সেই নাট্যকার যাঁর মহত্তম জীবন রসে ফুটে উঠবে আজকের অগণিত উদ্বাস্তু তাই বোমেরের হাজারো সমস্যা, সরকারী নীতির ব্যর্থতা ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে তাদের বাঁচবার জন্যে মরণপণ প্রচেষ্টা, ফুটে উঠবে আজকের সমাজের ছাত্র এবং তার শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে মনোবিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ চিত্র, হতাশাজর্জর ছাত্রদের বেপরোয়া আচরণ ও নীতিহীনের মনোবৃত্তি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভিতরে ভিতরে মূল্যক্ষয়, বিবেকশূন্য কালোবাজারীদের নৃশংসতা, নির্ধন বাঙালী ঘরের তরুণী কন্যাদের জীবন সংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনীসমূহ, ফুটে উঠবে এইসব অন্ধ কালিমার মধ্যেই সূর্যোদয়ের প্রতিশ্রুতি, নবজীবনের আশার আলোক, শোনা যাবে মনুষ্যত্বে উত্তরণের উদাত্ত আহ্বান!

আপনাদের আছে নিজস্ব আদর্শ, বলিষ্ঠ লেখনী। আপনাদের কাছে অনুরোধ, একটি স্বতন্ত্র বিভাগে প্রতি মাসে আপনারা বাংলাদেশের নাট্যজগৎ সম্বন্ধে সৃজনধর্মী আলোচনা করুন, বাংলা নাট্যজগতের অতীত দিনের মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে আজকের পাঠককে পরিচিত করান।

এ ধরণের আলোচনার প্রয়োজন আছে। বাঙালীর কাছে বাংলা নাটকের যে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা স্মরণ করবার, স্মরণ করিয়ে দেবার এবং তার ছলন, ভ্রান্তি আর স্বার্থান্ধ প্রবৃত্তিকে সংশোধিত করার আবশ্যকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই বলে মনে করি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ইংরাজ শাসকের রক্তচক্ষু আর দণ্ডাদেশকে অগ্রাহ্য করে বাংলার নাট্যশালা আর নাট্যকার যে উদ্দীপনা উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায় বাংলার জনমনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা আমরা কোনদিন ভুলব না। সেদিনের সেই কর্মশক্তি, সৃজনশক্তি ও আদর্শবাদ ফিরে আসুক বাংলার বর্তমান নাট্যজগতে। ইতি—

১লা মে,
১৯৬৬

অখিলচন্দ্র ঘোষাল
চৈতলপাড়া, বালী।

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

পঁচিশে বৈশাখ সমাগত প্রায়। বাঙালীর জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন বাঙালীর ঘরে জন্মেছিলেন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কবি শিক্ষাবিদ মানবকল্যাণব্রতী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অবিস্মরণীয় পুরুষ—রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ আশী বৎসর ধরে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন আমাদের জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় জ্ঞানভাণ্ডার। মানুষ কেমন করে তার মনুষ্যত্বে পৌঁছোতে পারে, কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষ কেমন করে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে, মানুষ তার জীবনকে কেমন করে সত্য ও সুন্দরের উপাসনার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে পারে, সংকটকালে মানুষ কেমন

ক'রে তার দীর্ঘ-দীর্ঘের-ধারা সেই সংকট পার হতে পারে, শত লাঞ্ছনা দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও মানুষ কেমন করে তার অপরাজেয় প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে পারে, এক কথায় মানুষ কেমন করে মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে, তার অজস্র নির্দেশ আর অভিব্যক্তি আছে ওঁর রচনায়। কিন্তু সে সব রচনা আমাদের কাছে বড় নীরস, বড় দুরূহ। তার চেয়ে তিনি যে গান লিখে গেছেন, সেই গান (তার অধ্যাত্মবাদ বাদ দিয়ে অবশ্য) আর তার সঙ্গে নাচ (তার ঈশ্বরাভিমুখী স্তোত্রনা বাদ দিয়ে অবশ্য)—তাই আজ আমাদের সম্বল হয়েছে।

আরো কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের অন্য সমস্ত সাহিত্যকর্ম বা জীবনধর্মের কথা যখন আমরা ভুলে যাব (ভুলে যাবই, কারণ কোন চর্চা তো আমাদের নেই এবং চর্চা যাতে হয় তার কোন চেষ্টাও নেই) তখন রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন ব্যবসাদারির মধ্যে দিয়ে আমরা বৎসারান্তে স্মরণ করব শুধু নাচগান জলসার মাধ্যমে, সেই সময় যদি কোন বিদেশী ভারত সফরে আসেন এবং ঐ সব অনুষ্ঠান দেখেন তাহলে তিনি মনে করবেন এবং দেশে ফিরে লিখবেন, ভারতে বিগত-যুগের একজন কবিয়াল এবং নৃত্য-পরিকল্পনা-বিশারদের কৃতকর্মের পরিচয় পেয়ে আনন্দলাভ করেছি—তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হায় রবীন্দ্রনাথ। ইতি—

১৫এ, রাজা রবীন্দ্ররোড় ভবদীয়
কলিকাতা-৩৭ সুধাংশুকুমার গুপ্ত

• • • •

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি (শ্রীঅরবিন্দ) আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতঃপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন।...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহদের এই বাণী অনুভব করেছেন, মুক্তাস্যনঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, এই অপেক্ষায় থাকবো। —রবীন্দ্রনাথ

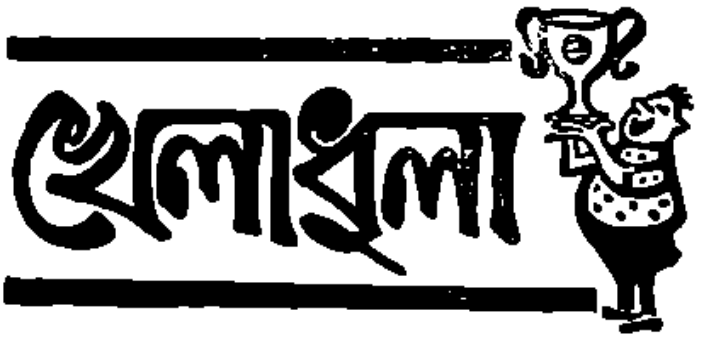

চৈত্র সংখ্যায় "একাদশ মহারথীর শেষ রথী" নামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা প'ড়ে বহু পাঠক আমাদের পত্র লিখে তাঁদের আনন্দ জ্ঞাপন করেছেন। সেই লেখায় সন্তরণবীর সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ের কিছু বিবরণ দিয়েছিলাম। আমাদের স্বল্পকার বিবরণ পড়ে অনেক ক্রীড়ারসিক অনুরোধ জানিয়েছেন, সেই খেলার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা যেন প্রকাশ করবার চেষ্টা করি।

কিন্তু ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই যে খেলা হয়েছিল এবং সেই খেলার যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, আজ ৫৫ বছর পরে সেই রিপোর্ট উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়। বলতে আনন্দ বোধ করছি, আমাদের অক্লান্তকর্মী প্রতিনিধি বহু শ্রম স্বীকার করে এবং বহু সময় ব্যয় করে তখনকার দিনের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রিকা থেকে সেই খেলার বর্ণাঢ্য রিপোর্টটি উদ্ধার করেছেন। রিপোর্টটি আমরা অত্যন্ত আনন্দ এবং সার্থকতাবোধের সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করলাম। রিপোর্টটির বঙ্গানুবাদ না করে, সেটির ইংরাজী ভাষাই ছাপা হল। ইংরাজীর মাধ্যমেই পাঠকবৃন্দ বিবরণের সজীবতা ও প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে সক্ষম হবেন। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় ইংরাজী কাগজে ক্রীড়া সাংবাদিকতার মান সম্বন্ধেও তারা একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

বহু যত্নে, আন্তরিকতায় এবং পরিশ্রমে আমরা যে একান্ত দুষ্প্রাপ্য বিবরণ পরিবেশন করলাম, আশা করি ক্রীড়ারসিক মাত্রেই তা পড়ে আনন্দবোধ করবেন।

Mohan Bagan's Victory

Mohan Bagan—2 East Yorks—1

Unprecedented Scene of Enthusiasm.

Universal jubilation.

At last dawned the day—the day that was to be marked as the red letter day in the annals of the Calcutta Football—the day for the arrival of which all sport loving people of the metropolis of British India were from sometime past patiently and anxiously waiting. It was the morning of the 29th day of July, a morning when the sun rose with all his glory. No speck of cloud was there in the sky which looked blue, and clear and serene; and this made the hearts of Calcutta sportsmen throb with delight. Their idols—the Mohan Bagans—were playing this day and they liked to be present and witness their gallant struggle against a crack British regiment that had come all their way from Fyzabad, for the possession of the blue ribbon of Calcutta Football. They would come in their thousands and tens of thausands be it wet or be it fine. They could not possibly miss such a golden opportunity—an opportunity which none can say when it will come again. The patter of the rain would not have damped their ardour, the howl of the wind might not have chilled their enthusiasm, but it could not be denied that their discomforts would have been many and great had the elements gone against them. The prospect that these discomforts would be conspicuous by their absence, the certain knowledge that the Mohan Baganites who are the flowers of Indian footballers would play much better when the turf under foot is solid and dry, and not yielding and slushy, made them wild with delight. When however, they opened the morning papers and came to know that all the available seats had been occupied and that hardly there was one single seat vacant they received their first disappointment. But they knew that "what can't be cured must be endured." They would leave their homes early, would secure a position of vantage and from there would witness the struggle—the struggle that completely changed the history of Calcutta Football.

In the Nineteenth century, the popular belief was that the Indians were no match for the Europeans in matters of foolball and the Trades Cup and the shield were close preserved for Europeans. This idea right or wrong—received a tremendous shock when in the year 1900, the National Association then the strongest Indian combination wrested the Trades Cup from off a large number of entrants. People said that it was a fluke but by winning the Cup again in 1902 the Nationals stamped their achievement with the seal of genuineness. From 1903 the Nationals began to decline but the Mohan Bagans stepped into their shoes and achieved a record which is to use a stereotyped phrase "better than the best." Not only did they win the Trades three years running but they entered for the Shield Competition winning the Shield in a brilliant fashion proving that they are better than the best amongst the Durand Cup winners.

"There was great rejoicing in the Mohan Bagan Camp," said an Anglo-Indian contemporary, when our champion Indian team beat the St. Xaviers, "but there would be bitter lamentations when they would meet the Rangers." I do not know exactly what the feelings of the prophet are now to-day. Not only was there no lamentation, but it was a series of glorious triumphs, each greater than and completely eclipsing the previous one. There are some who thought that the victory of the Mohan Bagans was in the nature of a fluke but they have now proved in a never-to-be-forgotten manner that there was absolutely no 'flukiness' in their victories. They won because they were infinitely superior to the teams they met.

Truth is stranger than fiction. It will look like fiction if it be said that from twelve noon people began to wend towards Calcutta ground the venue of the fight. There they stood exposed to the scorching rays of the sun for full five hours, patiently waiting for the game. By three O'clock there was hardly any room left.

Punctually to time the two teams took the field. East Yorks winning the toss selected the south end goal and Avilash started the leather. From this time the Indian team played an offensive game and J. Roy middled beautifully which Bhaduri missed by inches. S. Bhaduri was now very conspicuous. He gave a magnificent exhibition of dribble but his shot was erratic. Cressy was in splendid form and he saved a good many stinging shorts. With the score sheet blank the teams crossed over. After a little time of give and take game a free kick was awarded against Sengupta for hands. The "free" was taken from off twenty five yards and was taken successfully the ball being placed into the net. Nothing daunted, the Mohan Bagans played with double vigour and although the East Yorks forced two corners their opponent came again. S. Bhaduri now took possession of the leather and as he was running at full speed sent an angular short which was a treat to witness. Cressy was completely paralysed and beaten hollow. Cheers after cheers rang in the air and before their echoes had died away the ball was found in the net. The game soon after came to an end in favour of the Indian team by two goals to one. Thus establishing a record which was never broken and I do not know when it would again be broken. I take my hat off and pay my allegiance to the victorious team and pray that long may they continue to be the pride and glory of the Indian nation.

Mohan Bagan :	*East Yorks* :
Mookherjee,	Cressy,
Sukul, Chatterjee,	Scully, Whitby,
Mookherjee, Sengupta, Bhattacherjee,	Neil, Jackson, Martin,
Roy, Sircar, Ghose, S. Bhaduri,	Berch, Howard, Hayward, Grimshaw,
S. Bhaduri.	Clucai.

আউটডোর স্যুটিংএর সূত্রপাত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সিনেমার ইতিহাস বলছে—ইওরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই সিনেমার দুর্দিন একদিন এসেছিল। মন-মাতানো ছবি তৈরি করা সব সময় সম্ভব হয় না। তা সে আমাদের দেশেও যেমন, ওদের দেশেও তেমনি।

এ ব্যাপারে হলিউডই একমাত্র ব্যতিক্রম। ছবি তারা তৈরি করে ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি ভাষার চর্চা সব দেশেই একটু আধটু আছে। তাছাড়া সারা পৃথিবী ঘুরে তাদের কারবার। যে-কোনও ছবি—তা সে ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্—সারা পৃথিবীর সিনেমা-হাউসে হাউসে একবার ঘুরে এলেই প্রচুর লাভ নিয়ে সে ঘরে ঢোকে। তাদেই ছবির গুণাগুণ নিয়ে তাদের তত্তটা মাথা ঘামাতে হয় না। তারা যখন দেখে—ক্রমাগত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছবি বেরিয়ে আসছে প্রায় প্রত্যেকটি ষ্টুডিয়ো থেকে, তখন তারা ছবি তৈরির খরচের মাত্রাটা বেশ বাড়িয়ে। খরচের মাত্রা বাড়ানোর মানেই হচ্ছে—ক্যামেরার জাদু দিয়ে মানুষের চোখে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া।

সত্যিকারের স্রষ্টা শিল্পীর সংখ্যা কোনও সময়ে কোনও দেশেই কখনও অজস্র থাকে না। তা তিনি নটশিল্পীই হোন্, সুরশিল্পীই হোন্, কিংবা পরিচালকই হোন্। সেই সব ক্ষণজন্মা স্রষ্টাদের দিয়ে সব দেশই তাদের নিজস্ব ভাষার রসোত্তীর্ণ গল্প-উপন্যাসগুলিকে সিনেমার ছবিতে রূপান্তরিত করেও তারা দেখেছে—তাতেও সিনেমা-শিল্পের দুর্দিনের মেঘ কাটে না। ছবি ভাল হলে কোম্পানীর সুনাম হয়, মর্য্যাদা বাড়ে, কিন্তু ব্যবসাগত সাফল্যের দিক দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কারণ যে-ছবি দেখবার জন্য সব শ্রেণীর সব রকমের দর্শক ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই রকম ছবিই সব প্রডিউসারদের কাম্য।

সেরকম ছবি কদাচিৎ এক-আধটা হয়।

ভাষাগত বিভিন্নতার যেখানকার প্রদর্শনক্ষেত্র সীমিত, পৃথিবীর সেইরকম ছোট ছোট দেশগুলি সেই আশায় দিন গুণতে নারাজ। সুতরাং—

মানুষকে অতি সহজে আকর্ষণ করবার যে মূলমন্ত্রটি সকলেরই জানা আছে, ব্যবসার খাতিরে সিনেমা-শিল্প সেইদিকেই অনেকটা ঢলে পড়ে।

সেটি আর কিছু নয়, নরনারীর যৌন আবেদন।

কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

সেই সীমারেখার শেষ প্রান্তে গিয়ে যখন সিনেমা-শিল্পকে থমকে দাঁড়াতে হয় তখন তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রডিউসারদের চিন্তিত হতে হয়।

বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর এই শিল্পটি আবার তখন সেই যন্ত্রবিজ্ঞানীদের দরবারে তার আর্জি পেশ করে।

সারা পৃথিবী জুড়ে আবার চলতে থাকে নানান্ রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আবিষ্কৃত হলো টেলিভিশান্।

সিনেমা এসে গেল একেবারে হাতের কাছে। নিজের বাড়ীতেই রেডিয়ো-সেটের মতো।

কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত। সিনেমা-হাউসের বিক্রি কমে গেল। বাড়ীতে বসেই মানুষ সিনেমার ছবি দেখতে লাগলো।

তখন আবিষ্কৃত হলো 'সিনেরামা'। আবিষ্কৃত হলো সিনেমাস্কোপ। পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ফিল্ম হলো সত্তোর মিলিমিটার। সিনেমার ছবি দেখাবার পর্দা হলো দশগুণ বড়ো। তারপর হলো ভিষ্টাভিশান।

ফ্রান্স নাম দিলে—ডায়ালিস্কোপ। জাপান বললে—সোকোস্কোপ। কেউ বললে—উড্ আও। কেউ বললে—প্যানাভিশান্, কেউ বললে—টেক্‌নিরামা, কোথাও-বা হলো সুপার টেক্‌নিরামা ৭০।

খ্রীকৃষ্ণের শতনামের মতো। নানান্ নামে সেই একই বস্তু—আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল, আরও নয়নাভিরাম হয়ে মানুষের চোখে ধরা দিতে লাগলো।

চোখে ধরা দিতে লাগলো ছবি আর ছবির রং আর কানে ধরা দিলে শব্দ আর সুর।

মানুষের চোখ আর কান—এই দুটি ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের আর বাকি কিছু রইলো না।

এই সময় এক সুরসিক শিল্পী একদিন বললেন—'সবই হলো, অথচ কিছুই হলো না। আমার চোখ জুড়লো কিন্তু মন তো জুড়লো না। রসের পিপাসা আমার মিটলো কই?'

বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। ইওরোপের প্রতিটি দেশ তখন দুরবস্থার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেঙে চুরে তছ্‌নছ্ হয়ে গেছে মানুষের সমাজ সংসার। ঢাকবে বলবার মতো কোথাও কিছু নেই। বারুদ আর আগুনের তাণ্ডবলীলার সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন মানবসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে গেছে।

মানবসভ্যতার সেই ধ্বংসাবশেষের ওপরে দাঁড়িয়ে ইটালীয় সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন রসস্রষ্টা শিল্পী সিজারে জাভাটিনি বললেন—"এখন আর আমাদের শিল্প-বিলাসের কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা এখন নিঃস্ব নিঃসম্বল ভাগ্যবিড়ম্বিত গৃহহীন পথিক। সুতরাং নেমে এলো পথের ধুলায়। সেইখানেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের সাধনার স্বর্গ।"

জাভাটিনি ছিলেন ডি-সিকা আর রসোলিনীর চিত্রনাট্যকার। এবার স্বাধীনভাবে ছবি তৈরি করবেন তিনি। ছবির পরিচালক হবেন। বললেন—"Do away with the story".

বললেন—"তোমার কল্পনা দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে তৈরি করা গল্প চলবে না। গল্পের অনেক খোরাক্ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। ছড়িয়ে আছে ওই পথের ওপর।"

ষ্টুডিয়ো ছেড়ে ক্যামেরা নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। পথের মানুষ থেকে খুঁজে বের করলেন অভিনেতা অভিনেত্রী। বললেন—"একজন মানুষ নিজে যা নয় তাই সেজে আর-একজনের অভিনয় করবে, আর তাই দেখে আমরা হাততালি দেবো, বলবো মস্ত বড় অ'ভনেতা, তা হয় না কখনও। তাকে বলে ন্যাচিকেচার।"

এই মতবাদ নিয়ে সৃষ্টি হলো নিও-রিয়েলিজম্। নিউ ওয়েভ্।

জাতাটিনি এই নতুন পথের পথিকৃৎ হলেন সত্য, কিন্তু বড় বেশি গোঁড়ামি তাঁর সর্বনাশ করলে। সমালোচকেরা তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলে।

পথ দেখালেন ডি-সিকা আর রসোলিনী। তাঁদের 'ওপেন সিটি', 'সু-মাইন্', 'বাইসাইকেল্ থিভ্স্' আর 'পাইসা' দেখে মানুষ তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

ছবির পরিচালক হবার আগে ডি-সিকা ছিলেন অভিনেতা, তাই তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ের দিকটাতেই জোর দিয়েছিলেন বেশি।

'বাইসাইকেল থিভ্স্' ছবিতে বাপ আর ছেলে, 'টু উইমেন' ছবিতে সোফিয়া লোরেনের মা আর তার মেয়েকে দেখলেই সেকথা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু ডি-সিকা আর জাতাটিনি তাঁদের মতবাদ ঠিকই রাখলেন।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে তাঁদের এই নিও-রিয়েলিজম্-এর ঢেউ যখন সারা পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো, নানারকমের নতুন নতুন নাম দিয়ে সব দেশই যখন এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলো, তখনও কিন্তু তাঁদের নিজের দেশের সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি উৎসাহ তাঁরা পেলেন না। না পেলেন গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে, না পেলেন জনসাধারণের কাছ থেকে।

প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ নিয়ে ইটালীর জনসাধারণ ছবিগুলো দেখেছিল, তাদের নিজেদের যেন দেখতে পাচ্ছিল সিনেমার ছবিতে। কিন্তু শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য, আর নিরবচ্ছিন্ন অবসাদ আর অবসন্নতা তাদেরও যেন ভাল লাগলো না বেশিদিন। 'বাইসাইকেল থিভ্স্' না দেখে 'রিটা হেওয়ার্থ'কে দেখবার জন্যে সিনেমা হাউসের কাউণ্টারে লম্বা লম্বা কিউ পড়তে লাগলো।

ঠিক সেই সময়েই বাজিয়ে দিলে 'বিটার রাইস্'। ইটালীর ছবি 'বিটার রাইসে'র হিরোইন সিলভানা ম্যাঙ্গানো এক ছবিতেই জগৎ-জোড়া নাম কিনে নিলে। মালগাড়ীর খোলা খাটনার ওপর তার নাচ আর ধানের মাঠে একহাঁটু জলে কাদায় ধানের চারা পুঁতবার দৃশ্য কেউ আর ভুলতে পারলে না।

এঁদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন আমাদের দেশের সত্যজিৎ রায়। পথে ঘাটে ক্যামেরা বসিয়ে পথের ছবি তুললেন বলে ধরলেন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। সারা পৃথিবীর চোখে যে ইণ্ডিয়া ছিল অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত, সেই ইণ্ডিয়ার এই ছবিখানির দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সভ্যতা অভিমানী পৃথিবীর মানুষ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সিনেমা ছবির সর্বজনবরেণ্য পরিচালকের জয়মাল্য পরিয়ে দিলে সত্যজিৎ রায়ের কণ্ঠে।

শুধু একবার না—বারবার।

আন্তর্জাতিক চেক চলচ্চিত্র উৎসব

কার্লোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসব এবছর নানাদিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের আনুকূল্যে এই উৎসবের পঞ্চদশ অধিবেশন বসবে সুরম্য স্বাস্থ্য নিবাস কার্লোভি ভেরি নগরে।

প্রতিবছর এই চেক চলচ্চিত্র উৎসবে নানা দেশের নানা ছবি দেখানো হয়। ছোট বড়র তেমাতেদ করা হয় না। বড়বড় দেশের নামকরা চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আসেন চলচ্চিত্রে অনগ্রসর বহুদেশের চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের ছবি নিয়ে।

পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী এবং বুলগারিয়ার সিনেমা-শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই উৎসবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির নতুন নতুন ধ্যান ধারণার ফসল চিত্রায়িত হয় এই উৎসবের চলচ্চিত্র-মঞ্চে।

বছর বছর এখানে ভারতীয় চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উৎসবের গত দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ছবি সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করে।

প্রতিবছর নতুন নতুন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান এখানকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

১৯৫১ সালে ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে দশজন বিদেশী বিচারক নিয়ে সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ গঠিত হয়। সেই বিচার পরিষদ প্রতিযোগিতায় তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই উৎসবের ব্যবসায়িক দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রযোজক-এর সঙ্গে প্রদর্শকের যোগাযোগ ঘটে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বহু চিত্র পরিবেশক এখানে প্রতিবছর আসেন স্রেফ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। প্রতিবছর বহুদেশের চিত্রশিল্পীরা এই উৎসবে যোগদান করেন। যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম :—জিওভানা মলি, সারজেই বন্দারচক, পলবোবসম, রাজকাপুর, জাজকাপুর, হেনরি-কর্টা।

আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে কার্লোভি ভেরিতে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় কেবল মাত্র পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি দেখানো হবে এবং প্রতি দেশ একটি মাত্র ছবি দেখাতে পারবেন। অবশ্য উৎসবের সভাপতি যে কোনো দেশের যে কোনো ছবিকে প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এই উৎসবের কর্মসূচীতে যে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে বহু দেশের সিনেমা শিল্প-বিশারদ, সাংবাদিক এবং প্রযোজক যোগদান করবেন এবং নানা বিষয়ে তাঁদের এবং মতামতের আদান প্রদান করবেন। এবছরও একটি আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ (নবগঠিত) ছবির তথা-তথ্য বিচার করবেন এবং নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি দেবেন :—ক্রিস্টাল গ্লোব ও গ্র্যাণ্ড প্রাইজ—দুটি প্রধান পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার, এবং একটি বিশেষ পুরস্কার।

উৎসবে নানা প্রকারের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে একটি প্রদর্শনীও থাকবে।

বর্তমান চলচ্চিত্র জগতের একটি সর্বাধুনিক চিত্র উৎসবের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত করে অতিথি অভ্যাগতদের আনন্দ এবং তথ্য পরিবেশন করার জন্যে উদ্যোক্তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন।

———

চলতি দুনিয়া

অবিবাহিত মেয়েরা জীবন-শিল্পে শ্রেষ্ঠ শিল্পী

৬০৪টি তরুণীর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার পর সমাজ-বিজ্ঞানীরা একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রকাশ করেছেন। খবরটা কুমারীদের পক্ষে খুবই আনন্দের। বিবাহিত মেয়েদের চাইতে অবিবাহিতরাই নাকি জীবন-শিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কুমারী মেয়েদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস বিবাহিত মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিষয়েও তারা বেশি সচেতন। অবিবাহিতরা অধিক সামাজিক। কাজকর্ম এবং আমোদপ্রমোদ—এই দুয়েতেই কুমারীরা বেশী উৎসাহী। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে মনের দিক থেকে যারা যত অপরিণত এবং যাদের চরিত্রে যত সামঞ্জস্যের অভাব তারাই তত বিয়ে-পাগল। কুমারী জীবনের এত সব গুণ জানা সত্ত্বেও কিন্তু মেয়েরা বিয়ে না করা পর্যন্ত মনের শান্তি পায় না। একটি মেয়ে-কলেজের অধ্যক্ষা, তাঁর কলেজের মেয়েদের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে এই মন্তব্য করেছেন। কতক্ষণে কলেজ ছেড়ে স্বামীর ঘরে যাবে তার জন্যই যেন বেশির ভাগ মেয়ে ব্যাকুল। তাহলে কোনটি ঠিক?

• • •

মিসেস হেনরী ফোর্ডের ঘরে চুরি

নিউ ইয়র্কে এক চাঞ্চল্যকর চুরি হয়ে গেছে। ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ ডলার মূল্যের মণি-মুক্তা চোর বা চোরেরা যাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেছে, তিনি আর কেউ নন, বিশ্ববিখ্যাত মোটর-গাড়ি নির্মাতা হেনরী ফোর্ডের স্ত্রী। পার্ক এভিনিউর হোটেলে মিসেস ফোর্ড বহুদিন থেকেই আছেন। যে রাতে চুরি হয়, সেই রাতে তিনি বাইরে ছিলেন।

• • •

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা

সিনেমা অভিনেত্রী উর্সুলা এণ্ড্রেসের জন্ম সুইজারল্যাণ্ডে। 'ডাক্টার নো', 'শী', 'দি টেন্থ ভিক্টিম', 'নক অন এনি ডোর' ইত্যাদি প্রখ্যাত চিত্রে অভিনয় ক'রে তিনি অগণিত দর্শকদের মন জয় করেছেন। তাঁকে ত্যাগ করতে চাচ্ছেন পরিচালক, ফটোগ্রাফার এবং অভিনেতা জন ডেরেক।

উর্সুলার বয়েস এখন তিরিশ আর ডেরেকের চল্লিশ। গত বছর ডেরেকের ইচ্ছাক্রমে উর্সুলার নগ্ন-চিত্র একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তখন ডেরেক সাংবাদিকদের কাছে বলেন: "আমি এখনো তাকে ভালোবাসি; তবে এখন তাকে আর আমার স্ত্রী মনে হয় না, মনে হয় কামুক বোন।" বলিহারী পাশ্চাত্য সভ্যতা!

• • •

বিমানযাত্রীদের জন্য মুখোশ

ইউ. এস. এয়ারলাইনের পাইলটেরা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। সেই ব্যবস্থাটি আর কিছুই নয়, বক্ষবন্ধনী আর ধূমপ্রতিরোধক মুখোশের ব্যবহার। বিমান দুর্ঘটনাকালে এই মুখোশের সাহায্যে আত্মরক্ষা সম্ভব ব'লে তাঁরা মনে করেন।

• • •

নতুন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

নিউ ইয়র্কের আইন সভা তথাকথিত ১৭৯ বছরের পুরোনো বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটি নতুন ক'রে ঢেলে সাজিয়েছেন। আগে কেবল ব্যভিচারের অভিযোগেই সেখানে বিচ্ছেদ মঞ্জুর হতো। এখন স্বামী বা স্ত্রীর কোনো পক্ষের নিষ্ঠুরতা, কারাবাস বা দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নতাও বিবাহ-বিচ্ছেদের উপযুক্ত কারণ রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

• • •

পাঁচ বছরের মেয়ের কীর্তি

কায়রোর কাছে এক গ্রামের থানায় পাঁচ বছরের একটি মেয়ে হঠাৎ একদিন এসে হাজির। সঙ্গে কেউ নেই। দারোগাবাবুর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে মেয়েটি থানার লোকদের যে অনুরোধ করলো তা সত্যিই অস্বাভাবিক। একটি নতুন পোশাক তাকে যাতে তার বাবা কিনে দেন সেই জন্য বাবার উপর চাপ দেবার জন্য সে পুলিশের সাহায্য নিতে এসেছে। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি বললো: "বাবার তো টাকার অভাব নেই। তার ঘরে গাদা-গাদা নোট। রোজই যে সে নোট ছাপায়।" তার বাবার ছাপাখানার নিয়ে যাবার জন্য পুলিশ মেয়েটিকে বললো। সেখানে গিয়ে মেয়েটির বাবা এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে পুলিশ টাকা-জাল করার অপরাধে গ্রেপ্তার করলো। এখন তাদের বিচার চলেছে।

রমণীর আত্মহত্যা

তুরস্কে ১২০ বছর বয়সের এক মহিলা বহুকাল বেঁচেছেন তাই আর বাঁচা উচিত নয় এই মনে ক'রে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পিকাসোর গোপনে পুরস্কার গ্রহণ

বিশ্ববিশ্রুত চিত্রশিল্পী পিকাসো গোপনে সেদিন পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। তাঁর বয়েস বর্তমানে ৮৯ বছর। আরো সেরা পুরস্কার নিয়েছেন তিনি এক বছর আগে। তাঁকে পুরস্কার দেন প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ।

মাছ না মৃত্যু

বোম্বে শহরে ক্রালির জোসেফ নামে একটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তার মা বাজার থেকে এক ঝুড়ি মাছ কিনে এনে শিশুটির কাছে রেখেছিলো। মাছগুলো ছিলো জ্যান্ত। তাদের ভিতর থেকে হঠাৎ একটা মাছ লাফিয়ে উঠে শিশুর মুখে ঢুকে যায়। তার ফলে দম বন্ধ হয়ে শিশুটি মারা যায়।

দুর্ভিক্ষের সময় দীর্ঘ-নিদ্রা

শীতকালে সাপ, ব্যাং ইত্যাদি শীতল রক্ত প্রাণীরা কয়েকমাস ঘুমিয়ে কাটায়—একথা অনেকেরই জানা আছে। সম্প্রতি আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী—ডাক্তার আর. আর. চাপি একটি অভিনব পিল আবিষ্কার করেছেন। কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খাদ্য বা সাহায্য বাইরে থেকে না আসা পর্যন্ত যাতে ওই অঞ্চলের লোকেরা বেঁচে থাকতে এবং অপেক্ষা করতে পারে তার জন্যই এই পিলের ব্যবস্থা। এই পিল সেবনে প্রয়োজন মতো কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ঘুমিয়ে কাটানো সম্ভব হবে এবং তাতে শারীরিক কোন ক্ষতিও হবে না।

সোফিয়া লরেনের বিয়ে

প্রখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। তিনি বিয়ে করেছেন চিত্র-পরিচালক কার্লো পন্টিকে। ফ্রান্সের মঁতাঁবলে এক মেয়রের সামনে তাঁরা পরিণয়বদ্ধ হন। ১ই এপ্রিল তারিখে।

জুতো ছুঁড়বার দায়ে জরিমানা

অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে জুতো ছুঁড়বার দায়ে মিসেস জোয়ান গ্রাভিস ডেভিস নামে এক মহিলার ২০ শিলিং জরিমানা হয়।

সমুদ্র হাঙরহীন হয়ে যাচ্ছে

মেরু অঞ্চলের কাছে সমুদ্রে হাঙর ক্রমেই লোপ পাচ্ছে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কয়েকজন জাপানী হাঙর-শিকারী কয়েক হাজার মাইল সমুদ্র চষে মাত্র কয়েকটি হাঙর ধরতে পেরেছেন। হাঙর ধরতে গিয়ে তাদের খুবই লোকসান হয়েছে।

রাজকুমারীর নাক ভেঙেছে

কপাল নয়, নাক ভেঙেছে। যার তার নয়, রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ১৫ বছরের মেয়ের। গোটা কয়েক কুকুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো শিকার করতে। ফেরা ডিঙোতে গিয়ে তার ওই দুরবস্থা। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, তার নাক আর আস্ত নেই।

এরোপ্লেন চুরি

পূর্ব জেনেজুয়েলার এক বিমান বন্দর থেকে চুরিই কোম্পানীর একখানা বিমান চুরি হয়েছে। সন্দেহ করা হয়েছে এই চৌর্য-কীর্তির নায়ক দুজন আমেরিকান।

ভাবী শাশুড়ীর দুর্দশা

ব্রেজিলের এক সার্জেন্ট তার ভাবী শাশুড়ীকে কয়েকবার কামড়ে দিয়েছেন। তার মেয়ে প্রায় বছর পাঁচেক আগে থেকে সার্জেন্টের বাগদত্তা। তবু, সার্জেন্ট যখনই মেয়েটিকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চান তখনই তার মা আপত্তি তোলেন। তার ফলেই ভাবী জামাতার হাতে তার ওই দুর্দশা। মেয়ে যা'তে বাঁচাতে গেলে সার্জেন্ট তারও নাকে কামড়ে দেন। ফলে বিয়ের প্রস্তাব তখুনি হয়ে যায়।

মেয়েদের চোখে পুরুষ

মেয়েদের সমালোচনা পুরুষরা করে থাকেন কিন্তু মেয়েদের চোখে পুরুষেরা কেমন তার ঠিকমত হদিশ সবসময় মেলে না। একজন চিন্তাশীলা মহিলা এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন (an insight into men's character)। ওঁর মতে পুরুষরা বড় অস্থিরমতি: নারীদের সম্বন্ধে তাঁরা প্রথম প্রথম খুবই আগ্রহশীল কিন্তু কিছুদিন যাবার পরই উদাসীন হয়ে পড়ে।

নারী সৌন্দর্য্যের প্রধান অন্তরায় স্থূলত্ব

নারী সৌন্দর্য্যের প্রধান অন্তরায় স্থূলত্ব। অবশ্য পুরুষের পক্ষেও স্থূলত্ব যে হানিকর তাতে সন্দেহ নেই। মোটা স্ত্রীলোক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে বা নৃত্যে যোগ দিলে এক হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তারপর নিজের চলাফেরায়, কাজকর্ম কখনই সে আনন্দ পায় না। প্রায় সব সময়ই হাঁফিয়ে উঠে। স্থূলত্বকে কি করে স্বাভাবিক ও সুন্দর করা যায় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কয়েকটি নিয়ম বিশেষ করে পালন করতে বলেছেন :—

(১) মাছ, মাংস, পনীর, ডিম খাওয়া ভাল কিন্তু কোনও মিষ্টি জিনিষ একেবারেই খাওয়া উচিত নয়।

(২) সকালে এমন খাবার খেতে হবে যাতে করে অনেকক্ষণ ক্ষুধা শান্ত থাকে।

(৩) আলু, চকলেট, কেক্, পুডিং খাওয়া নিষেধ।

(৪) টোমাটো ও টাটকা শাক-সব্জি খাওয়া ভাল।

(৫) একেবারে খুব পেট ভরে না খেয়ে অল্প-অল্প করে অনেকবার খেলে শরীরের উপকার হয়।

(৬) সব সময়ে কাজে লেগে থাকতে হবে বা হালকা ধরণের ব্যায়াম করতে হবে প্রতিদিন।

(৭) বেশী ঘুম একেবারেই ভাল নয়।

(৮) মনকে দৃঢ় করতে হবে যাতে এই চিন্তা আসে যে, আমি আর মোটা কিছুতেই হব না। (I will never become plump again)

অগ্রীক্ষণ

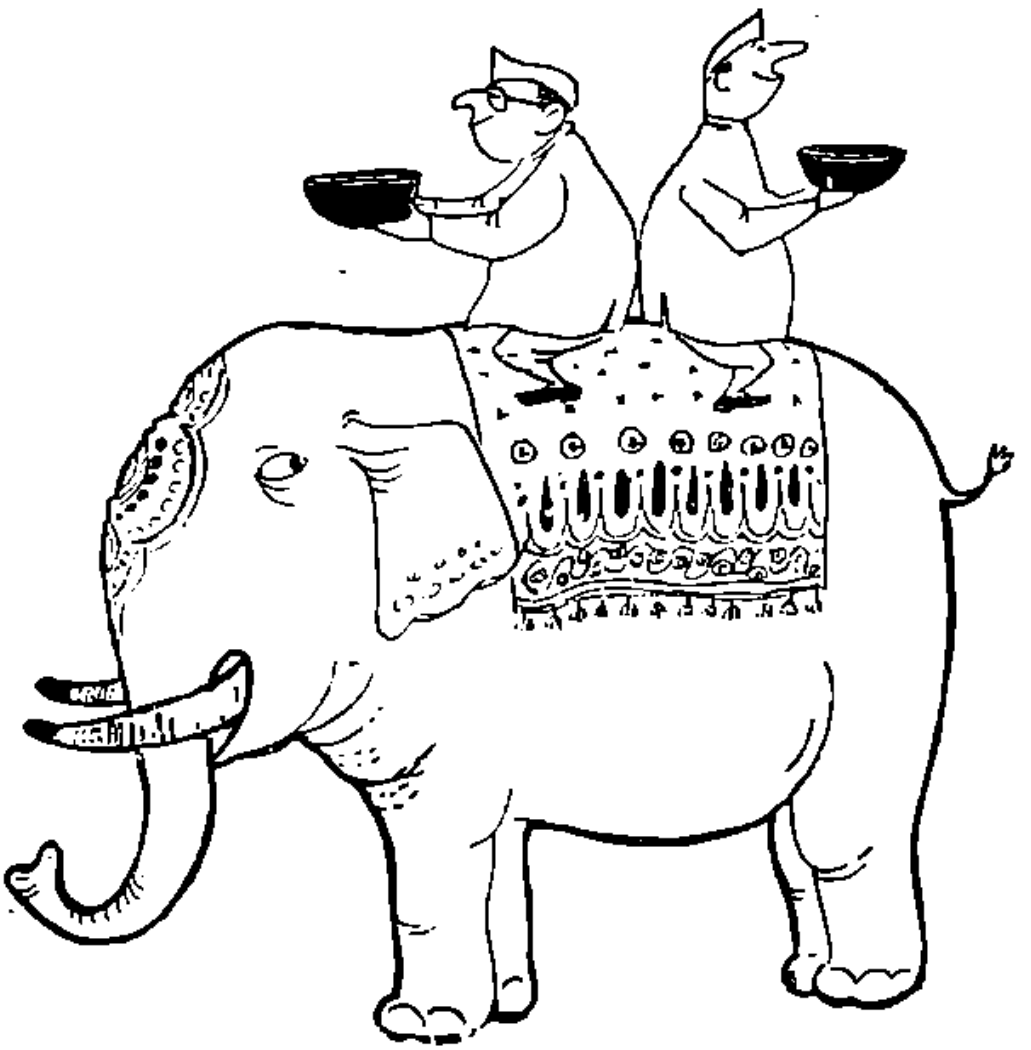

হাতীর মত খরচ

.....অথচ ভিক্ষা আর ভিক্ষা

এইতো মোদের দেশ.....

ব্যঙ্গচিত্র

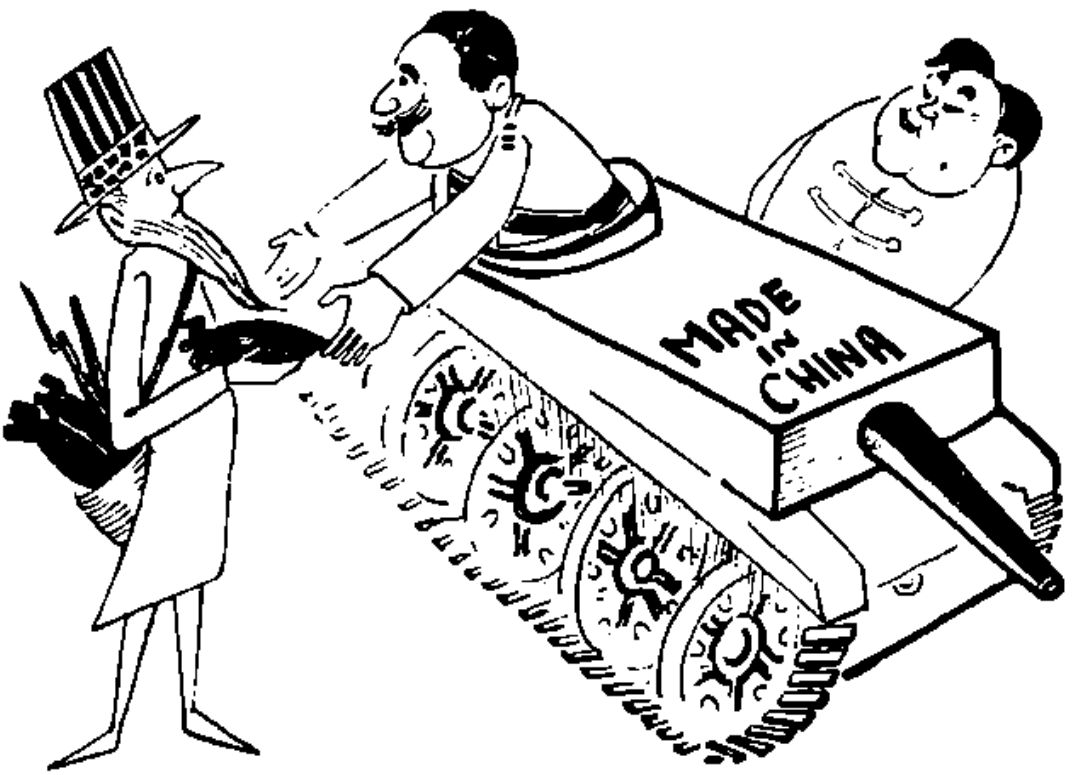

মার্কিন মুলুকের বদান্যতা.....

রবীন্দ্রনাথ

পুরানো স্মৃতির টুকরো : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমার বয়স যখন পাঁচ-ছ বছর, সেই সময় আমি প্রথম দেখি রবীন্দ্রনাথকে। তখনকার কলকাতায় তিনটি নাম ফিরত গুরুজনদের মুখে মুখে : সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, রোববাবু, আর অমনি বোস। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই রোববাবু আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বৌবাজারের কাছাকাছি সে-সময় একটা আর্ট স্কুল ছিল কোন আয়গায়। সেখানে এক দিন বক্তৃতা দিতে এলেন তিনি। বক্তৃতা কি, কেমন করে দেয় তা, সে-সব আমার বয়স নয় ওটা। বাবার সঙ্গে গেলাম শুধু বাবার আনন্দেই।

দেখলাম কাছ্‌থেকে রবীন্দ্রনাথকে। আগেই চোখে পড়ে মাথার অজস্র চুল আর মুখের অজস্র গোঁফ-দাড়ি। ছুঁয়েই গাঁক ধরেছে অল্প অল্প। গায়ে ঢিলে পেরিয়ে যাওয়া পাঞ্জাবী। চোখে স্প্রিং-এর চশমা, তা থেকে লম্বিত দীর্ঘ একটা কালো কার গলায় ঝোলানো রয়েছে। একতাড়া কাগজ হাতে নিয়ে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি।

কি অদ্ভুত সুন্দর গলা ওঁর! কোন মানুষের সঙ্গেই মেলে না যেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ পড়লেন। পড়া শেষ হতে চারদিক থেকে হাততালি পড়ল। তারই সঙ্গে আওয়াজ উঠল : গান, গান, একটা গান শুনব আমরা। মজা এই যে সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হলেন তিনি গাইতে।

কিন্তু আমার ভাগ্যে আর তা শোনা হল না। ভীড়ের ভেতর বাবার ট্যাক ঘড়িটা চুরি হয়ে গেল এবং মন খারাপ করে বাড়ী ফিরে এলেন তিনি। সঙ্গে আসতে হল আমাকেও। যদিও এই অল্পক্ষণের দেখাতেই রবীন্দ্রনাথের মনোরম মূর্তি মনে আঁকা হয়ে গেল।

এরপর আমার বয়স যখন তেরো-চোদ্দ, পড়ি হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে (এখনকার ক্লাস নাইন-এ), ছোট্ট একটু সুযোগ হল আবার রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করার। কেমন করে হল বলছি।

খবরের কাগজে দেখলাম, কোন্নগরের একটি স্কুলের ছাত্রী রবীন্দ্রনাথকে কবিতায় শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছে এবং তা পড়ে খুশী হয়ে কবিও জবাব দিয়েছেন তাকে, আর দিয়েছেন কবিতাতেই। দুটো কবিতাই ছাপা হয় পাশাপাশি।

দেখে মনে হল, আমিও ত একজন ছাত্র, যদি চিঠি লিখি কবিকে, তাহলে তার উত্তর পাব কি? কিন্তু কি লিখব? ছেলে বুদ্ধিতে হাতের কাছে পেলাম দুই বিঘা জমি কবিতার 'শুষ্ক অতল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ' লাইনটি। জানতে চাইলাম ঐ স্নেহ কথাটার তাৎপর্য কি ওখানে।

আশ্চর্য, দু দিন-রাতের মধ্যেই এল সুন্দর চৌকো খামে কবির আপন হাতে গোট গোট অক্ষরে লেখা উত্তর। উত্তরটি এই: কলিকাতা

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

নিশীথ রাত্রি গভীর দীঘির মতোই শুব্ধ নীরব গভীর স্নিগ্ধ কালো। শান্তির শীতল নিস্তব্ধিনীর গভীরতার মধ্যে যে বিরামদায়ী স্নেহ অনুভব করা যায়, বাংলা দেশের শুষ্ক গভীর শীতল দীঘির মধ্যে সেই স্নেহ কল্পনা করা হইয়াছে। ইতি—

২০শে আশ্বিন, ১৩৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন একটা উল্লাস আর উত্তেজনা চেপে বসল সারা দেহ-মনকে যে কয়েক দিন পর্যন্ত ভালো করে খেতে ও ঘুমুতেই পারলাম না। দিন-রাত্রি চিঠিখানা ঘুরতে লাগল আমার পকেটে পকেটে। ছবিতে দেখা ও বইয়ে পড়া রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম জীবন্ত হয়ে অধিকার করলেন আমার কিশোর চেতনাকে।

• • •

বছর দশেক পরে বয়স যখন সোটা-পঁচিশ, ছাপা হয়েছে দু-একখানা বই এবং লেখক বলে একটু পরিচয়ও হয়েছে দেশে, সেই সময় হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং তা থেকেই সুযোগ হল তাঁর কর্মী ও লেখক রূপে বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার।

বিশ্বভারতী প্রকাশ বিভাগের তখনকার কর্ণধার কিশোরী মোহন সাঁতরা ছিলেন আমার গুণগ্রাহী। একদিন তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তখন তিনি রয়েছেন চন্দননগরের কাছাকাছি কোন জায়গায় গঙ্গার ভাসানো হাউস বোটে। সেখানে যেতে হবে আমাকে কিশোরী মোহনের সঙ্গে।

অবাক হয়ে ভাবলাম, আমাকে কি দরকার হতে পারে রবীন্দ্রনাথের? আমার নাম কি জানেন তিনি? আমার কোন লেখা কোনদিন পড়েছে কি তাঁর চোখে? কিংবা সবটাই কিশোরী মোহনের কৌশল? বন্ধুতা হিসাবে আমাকে পরিচিত করাতে চাইছেন তিনি কবির সঙ্গে!

তখন প্রায় বিকেল। বোটের খোলা মুখটুকুর কাছে ইজি-চেয়ারে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। পাশে বেতের নীচু ডে-পায়া একখানা। তার ওপর কিছু বই-খাতা, এক শ্লেট কাটা ফল, এক গ্লাস সরবৎ ও ভাঁজ-করা তোয়ালে একখানা। আমনে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন।

ঝিলমিল করা ঘোমুরে ফিরে-ফিরে হাওয়া বওয়া গঙ্গার বুকে এই আমার প্রথম কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথকে। বোধহয় এত নিবিড় করে দেখার জন্যে দরকার ছিল এমনি একটা সুন্দর আবেষ্টনীর। ভারী ভালো লাগল কমলা লেবু রঙের আলখেল্লা গায়ে আকাশ ও গঙ্গার সবুজমেশানো ধ্যানমূর্তির মতো কবির এই বসে থাকাটি।

কিশোরীমোহন পরিচিত করালেন। কবি বললেন, তোমার নাম ও দেখার সঙ্গে কিছু চেনাশোনা হয়েছে পরিচয়ের পূর্বাহ্ণে। তোমাকে কেন স্মরণ করেছি জানো? রক্ষিণা চাই। চলো আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে। তখন আমি কালীঘাটে শিক্ষক। সে-কথার উল্লেখ করে বললেন, চেরদিন ত মায়ের থানে পাঁঠা বলি দিলে। এবার ছুটি নাও ও থেকে।

এরপরই আমি এলাম শান্তিনিকেতনে। একই সঙ্গে বলায় সাহিত্যের অধ্যাপক এবং কবির সাহিত্য বিষয়ক সহকারী, অর্থাৎ সিটেরারি সেক্রেটারী। তখন আমার পিতা জীবিত। তিনি বললেন, যে-ভাগ্য মানুষ তপস্যা করেও পায় না, তা উনি ডেকে হাতে তুলে দিচ্ছেন। এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

* *

প্রথম দিন আমার থাকার ব্যবস্থা হল পুরানো অতিথিশালায়। শালবীথি, আম্রকুঞ্জ ও আমলকী-চাতিমের মায়াময় অপূর্ব এই আবেষ্টনীতে গিয়ে পৌঁছলাম মধ্যাহ্নে। স্নানের পর আহারের আমন্ত্রণ এল উত্তরায়ণে, অর্থাৎ কবির নিজের বাড়ীতে। দ্বিতীয় দিনে বাসস্থান নির্ধারিত হল আমার চীনা ভবনে। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি আমার কেটেছে এখানেই। এই ভবনের অধ্যক্ষ ডঃ তানয়ুন সান লোকটি চমৎকার। কবি এবং প্রাচ্য বিদ্যাবিদ রূপে তখনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি এবং তাঁর পত্নী অমায়িক আন্তরিকতার অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। ডঃ তান বললেন, আমার নয় ভাইয়ের সংসারে আপনি হলেন দশম।

প্রথম দিনই আলাপ হল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, তাঁর সহধর্মিণী প্রতিমা দেবী, তাঁদের পালিতা কন্যা নন্দিনী এবং কবির জামাতা-কন্যা সুনন্দা দেবীর সঙ্গে। এরপর কিশোরীমোহন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরলেন বিশিষ্ট আশ্রমিকদের সঙ্গে পরিচিত করাতে।

কলা ভবনে বেঞ্চের মাদুর বিছিয়ে আচার্য নন্দলাল তাঁর শিল্প-শিক্ষার্থীদের নিয়ে অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, এসো। তুমি ত আমার মিতে হও। তার মানে আমাদের দুজনেরই নাম নন্দ। তাঁর আদেশে পারের উপাধিধারী অনেক ছাত্র এক টানে আমার একখানি স্কেচ এঁকে ফেললেন। কি সুন্দর হয়েছিল সে-ছবিখানা!

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে গেলাম কিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কাছে। গুরুপল্লীর সামনের মাঠে পায়চারি করছিলেন। বললেন, ভালো জিনিষ এখানে ঐ একটি···উত্তরায়ণের মাংসটি, আর কোনটা কতটুকু ভালো লাগাতে পারবে, তা নির্ভর করছে তোমার নিজের ওপর। কথায় একটু পূর্ববঙ্গীয় টান, কিন্তু আশ্চর্য রকম সরস বসনা।

তৃতীয় ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে আলাপ হল তিনি গুরুদয়াল মল্লিক, সংক্ষেপে মল্লিকজী। পূর্ণায়ত গৌফ-দাড়ির আড়ালে হাস্যোজ্জ্বল মুখ, বর্ষায় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। এক মুহূর্তেই অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। সস্নেহে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন, তখন শোনাবেন নাবকর্ণীর এবং গুরুদেবের। উত্তরায়ণে পুরনো বাড়ীটিতে থাকতেন এনড্রুজ সাহেব। আলাপ হল তাঁর সঙ্গেও। ধুতি-পাঞ্জাবী ও চটি জুতো পরা সৌম্যমূর্তি দৃঢ় গোত্তায় হিন্দীতে কথা সুরু করলেন। তিনিও বাংলা জানেন না,

আমিও হিন্দী জানি না, তাই শেষ পর্যন্ত দুজনকেই আসতে হল ইংরেজীতে। বললাম, আপনি জগতে বিখ্যাত রবীন্দ্র-সুহৃদ রূপে। তাঁর রচনা যদি আমাদের মাতৃভাষায় পড়তে পারতেন!

বুকে হাত রেখে বললেন তিনি, অনেক সাধই ত অপূর্ণ থাকে মানুষের। এই যেমন এটা হইল আমার। হিন্দু-প্রত্যয় অনুসারে বলতে পারো, রবীন্দ্র-রচনা পড়ার জন্যেই আবার আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন তিনি কথাটা। ভারী ভালো লাগল।

আরো একটি বন্ধুলাভ হল আমার ঐদিন, তিনি হচ্ছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তিনি ছিলেন কবির ব্যক্তিগত তদারকির ভারে। অদ্ভুত গল্পে লোক! রকমারি গল্পও তৈরি হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করে: যখন বাজি রেখে বাঘের মাংস খেয়েছেন! যখন এক এক করে মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম নিয়েছেন, আর ছেড়েছেন! হো-হো করে হাসেন, কথায় কথায় রঙ্গ করেন। শান্তিনিকেতনের পরিবেশে অভিনব মনে হল।

•
• •

আমার সঙ্গে একই দিনে নিযুক্ত হন বিনয়গোপাল রায়, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, এলেন এরেনসন। চারজন আমরা সমবয়সী, চারজনই ঈষৎ মার্কস-পন্থী এবং ঈশ্বর, আত্মা ও অবতারবাদে অবিশ্বাসী। অল্প দিনেই গড়ে উঠল ভাই আমাদের চার বোতের এক দল। শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শৈলেন চক্রবর্তী এসে একে করলেন বড়ানন বাহিনী।

শৈলজারঞ্জন ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওস্তাদই। শৈলেশ চক্রবর্তীর গলাতেও গান আসত, আসত আমার গলাতেও। পালা করে গান ধরতাম আমরা বিকালে খোয়াই বা গোয়ালপাড়ার পথে বেড়াতে বেরিয়ে। মাঝে মাঝে সুধীর করও আসতেন। তরাট ধারা-সম্পন্ন গলা তাঁর। অনুরোধ করলে গাইতেন, যদিও নিস্পৃহ নাছোড় ধরণের মানুষ ছিলেন তিনি। হৈ-চৈ বেশি পছন্দ করতেন না।

একজন বান্ধবীও লাভ করেছিলাম। তিনি হলেন মাদমোআজেল বোসানে। ছাত্রী-নিবাসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং ফরাসী শিক্ষাত্রিত্রী রূপে জনপ্রিয় ছিলেন। একটু-একটু বাংলা শিখতে চেষ্টা করেছিলেন আমার কাছে। বিনিময়ে ফরাসী শেখাতে চেয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু কোন পক্ষেরই বিদ্যালাভ বেশী দূর এগোয় নি।

একদিন মলেয়ার, রাসিন, ভার্লেন, বদলেয়ার, গ্রাবো প্রভৃতির লেখা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, ইংরেজদের বাজে অনুবাদ পড়ে পড়ে সময় নষ্ট করেছেন। আসুন, আপনাকে মূল পড়াতে সুরু করি কাল থেকে। আমি বললাম, ভাষা শিখতে যে-সময়টা যাবে, তাতে অনুবাদে আরো কিছু বই পড়ে ফেলতে পারি···সেটাই বেশী ভালো হবে না কি? চটে গিয়ে বললেন বোসানে, ইংরেজী আবার ভাষা? তাতে অনুবাদ হয় ফরাসীর? মংকীজ দোস্ত সির!

• •
•

কিন্তু শান্তিনিকেতনে আমি যোগ দিয়েছিলাম অন্য কোন আকর্ষণে নয় শুধু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকব এবং প্রতিদিনের জীবন ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর অন্তরের গভীর দিকটা দেখব ও বুঝব, এই আশায়। খুব বেশী দিনের জন্যে না হলেও এ-সুযোগ হয়েছিল আমার যথেষ্টই।

দিনের পর দিন তাঁর ঘরে তাঁর চোখের সামনে বসে কাজ করেছি। তাঁর লেখা-পড়ায় সহযোগিতা করেছি। তাঁকে দেখেছি সাহিত্য রচনা করতে। দেখেছি বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। দেখেছি খেতে, ঘুমুতে, অসুখ হতে, হাসতে, রাগতে। নানা টুকি-টাকি ব্যাপার যা তাঁর জীবনীতে কোনদিন লেখা হবে না, অথচ যা মানুষটিকে চিনতে ও জানতে প্রচুর সহায়তা করবে, এমন কত ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়েছে তাঁর চরিত্রের। কত মহত্ত্বের ঘটনাও আবার নিঃশব্দে ঘটতে দেখেছি, যার গুরুত্ব আশ-পাশের মানুষরা হয়ত খেয়াল করে দেখেন নি!

অনেকে হয়ত বলবেন, এ-সব আর কি এমন মূল্যবান জিনিষ? এগুলে আমার দ্বারা খুব কি সুবিধা হয় আমাদের রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তর্লোকে পৌঁছতে? একথা হয়ত ঠিক নয়। আমার ধারণা-প্রতিভার শিকড় মানুষের ঘরোয়া জীবনের মাটিতেই প্রোথিত। তাই মানুষটিকে কাছ থেকে জানলে, প্রতিভার অন্বয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। অন্তত কিছুটা সহায়তা যে হয়, তাতে আর সন্দেহ নেই।

• • •

লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে, বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার ভানে সম্মুখে পাতিয়া, সুসজ্জিত মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস কালোকষ্টক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেম প্রবাহ, ঋষিচীর আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদালঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ—সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত যে, ধর্ম নিত্য ধর্মদেব, যে আত্মাবেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন, করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ-পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য। —বঙ্কিমচন্দ্র

মহামানবের সান্নিধ্যে

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরুকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, যতদূর মনে হয় ১৯২১ সালে, তৎকালীন কলিকাতার বিখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠান 'সংগীত সঙ্ঘে'র বার্ষিক উৎসবে কবিগুরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনকালে। আমি তখন বর্তমান রাজকুমার পড়ি, প্রবেশিকা পাঠক্রমের First Class-এ অর্থাৎ বর্তমান School Final-এর Class Ten। তার পূর্বে কবির ছবি দেখেছি, তাঁর লেখা কবিতা পড়েছি, তিনি দেশ বিদেশ হতে কত সম্মান পেয়েছেন সে সব খবরের কাগজে পড়েছি। পিতার মুখে তাঁর কথা শুনেছি শান্তি-নিকেতনের কথা, তাঁর সহিত আলাপ আলোচনার কথা, গানের এবং নানা প্রসঙ্গের কথা। পিতার সহিত কবিগুরুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, পিতা কবিগুরুর পরম স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁর গানের ভক্ত ছিলেন। কলকাতা কিংবা শান্তি-নিকেতন থেকে বর্ধমানে ফিরে এসে যে সব গল্প করতেন আমি অতি আগ্রহ সহকারে শুনতাম। মনে মনে মহামানবকে প্রণাম জানাতাম। তাঁর গানগুলি বড় সহকারে শিখতাম এবং গাহিতাম। কবিকে দেখবার ইচ্ছা মনে জাগল। সংগীত সঙ্ঘের উৎসবে উপস্থিত হলাম। সংগীত সঙ্ঘ বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী এবং তাঁর স্বামী বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এই বিদ্যালয়টি শুধু বাংলার নয় সারা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃত। দেশের বড় বড় গুণী এই বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সে কালের অভিজাত এবং শিক্ষিত সমাজের পুত্র-কন্যাগণ সেখানে সংগীত শিক্ষা লাভ করতেন। আমার পিতা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার পিতা ও পিতৃব্য ঠাকুর পরিবারের অনেককে সংগীত শিক্ষাদান করেন এবং তাঁরা ঠাকুর পরিবারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাদাম্বীচরণ সেনের স্বরসংগীত প্রকাশের পর (ঐ গ্রন্থে বহু রবীন্দ্রসংগীত (পূজা পর্যায়ের) সন্নিবেশিত ছিল) আমার কাকা প্রথম গীতাঞ্জলির গান এবং অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি দ্বারা 'গীতলিপি' ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। এরূপ নানাদিক দিয়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ ছিল। সেদিন 'সংগীত-সঙ্ঘের' বলবর সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সংগীত রসিক দ্বারা পূর্ণ ছিল। কবিকে দেখতে, তাঁকে এত নিকটে পাবার আগ্রহ সকলেরই। জগত-পূজ্য কবির দর্শনলাভ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কবিকে দেখে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা মিটল। সংগীত-মুখর উৎসবের মধ্যে কবি বসেছিলেন ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায়। রবীন্দ্রনাথ সুরেরও কবি ; তিনি সুরস্রষ্টা, তাঁর কথার ইন্দ্রজাল, সারা পৃথিবীর লোককে যেমন অভিভূত করেছে, সুরও তেমনি সংগীত জগতে এক অভিনব মাধুর্যরসের সন্ধান দিয়েছে। কবির সুললিত কণ্ঠে ভাষণ শুনলাম। তখন আমার পক্ষে তাঁর ভাষণের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা অন্তরকে স্পর্শ

করল। তাঁর ভাষণের কয়েকটি লাইন যা আমার মনে গেঁথে রইল, সেই কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করলাম। "বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান, এইজন্যেই তাদের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না— এই জন্যে বাংলা দেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।"

বাংলা গানের মধ্যে সুরভাব ও কাব্যভাবের পূর্ণ মিলন। বাংলার গান সার্থক হয়ে উঠেছে কথা ও সুরের সমন্বয়ে। বাংলার অমূল্য সংগীত সম্পদের ওপর আমার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও দরদ আছে তার মূল কারণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি। বাংলার গানের গবেষণা ও অনুশীলনের স্পৃহা আমার জেগে ওঠে কবির ঐ বাণী শুনে ও পড়ে।

কলিকাতায় থাকাকালীন, আমার পিতা, প্রায় কবি দর্শনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ, আমার পিতার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন এবং সাক্ষাৎকালীন সংগীতাদি শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা হত। ঠিক স্মরণ নেই ১৯২৬।২৭ সালের মধ্যে আমি পিতার সহিত কবিগুরুর দর্শনাভিলাষে বিচিত্রা ভবনে আসি। প্রথম দিনে আমার পরিচয় পেয়ে, তিনি আমার গান শোনবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর সম্মতি গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তাঁরই রচিত দু খানি গান শোনাই। 'প্রভাতে বিমল আনন্দে' ও 'স্বপন যদি ভাঙিলে'। এরূপ শ্রোতা পূর্বই ভাগ্যের কথা। সম্মুখে উপবিষ্ট ধ্যান গম্ভীর মূর্তি দেখে মন ভরে উঠল। গান শুনে তিনি খুশী হলেন এবং স্বরলিপি সম্বন্ধে আমার শিক্ষা বিষয় প্রশ্ন করলেন। স্বরলিপি লিখন ও পঠন সংগীত শিক্ষার যে বিশেষ উপযোগী, তা তিনি মনে করতেন। স্বরলিপি প্রবর্তনে ও প্রকাশে ঠাকুর বাড়ির বিশেষ অবদান আছে। গানের পর কিছু আলোচনা চলেছে এমন সময় কয়েকজন সাহিত্যিক এলেন কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের মধ্যে সকলেই কবির কাছ থেকে লেখা নেবার জন্য এসেছিলেন। বসুমতীর সম্পাদক, সতীশ মুখোপাধ্যায় কবিকে লেখার জন্য অনুরোধ জানালে, তিনি বললেন "ঝুলঝুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।" তাঁর এই উক্তি সকলেই উপভোগ করলেন।

কবির ৭০ বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি। ১৩৩১ সাল ২৬শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউট হলে গীতোৎসব হয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন ঢংয়ের গান ধারাবাহিক রূপে এই প্রথম পরিবেশিত হয়। সভায় কবি উপস্থিত ছিলেন এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই গীতোৎসবের রিহার্সল বিচিত্রা ভবনে হত। দীনেন্দ্রনাথ তাঁর দলবলসহ এসরাজ নিয়ে বসতেন, খুব সকালবেলা রিহার্সল চলত। আমার কাকা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন; এই সভায় আমার পিতা প্রমুখ কয়েকজন স্বনামধন্য শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন। এরূপ সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর সভা আমার চোখে আর পড়ে নি। আমি ঐ সভায় "কার মিলন লাগি বিরহী" এবং "স্বপন যদি ভাঙিলে" এই দু'টো গান গেয়েছিলাম। তৎপরে সাহিত্য পরিষদে কবিগুরুর সম্বর্ধনাতেও আমার গানের আয়োজন হয়। ঐ সভাতেও আমি গান গেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। 'গঙ্গাপুজি গঙ্গাজলে' কবিগুরুর রচিত গান গেয়েই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম। এইরূপ ভাবেই, গানের মাধ্যমে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ, তাঁর চরণ স্পর্শ করার এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

বিচিত্রা ও রবীন্দ্রনাথ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'বিচিত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের যে অপূর্ব সাহিত্যের-রস মধুর বৈঠকের সুমিষ্ট সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে কলিকাতার সাহিত্য-রসপিপাসুগণ মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে দলে দলে এসে জুটত তার জীবনী-শক্তি সে সময়ে স্তম্ভিত। বিদায়োন্মুখ বিচিত্রা বৈঠকে যাবার কালে যদি তার নামের উত্তরীয়টা নবজাতকের অঙ্কে ফেলে দিয়ে যায়, তা হ'লে বাংলা দেশের বহু সাহিত্যিকের স্মৃতির মধ্যে অন্তত কিছুকাল যাবৎ সে বেঁচে থাকতে পারে। 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রিকাও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা বৈঠকের উত্তরাধিকারী হয়ে সৌরবান্বিতই বোধ করবে।

তা ছাড়াও 'বিচিত্রা' নামটাও আমাদের সকলের এত ভাল লাগল যে আকাশের সবিতাকে তৎক্ষণাৎ আকাশে পুনঃস্থাপিত ক'রে 'বিচিত্রা'র বৈচিত্রের স্বপ্নে আমরা মগ্ন হলাম। 'বিচিত্রা' নামের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বত্ব সংরক্ষণের মতো অবশ্য কিছু ছিল না, তথাপি 'বিচিত্রা' নাম রাখবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণ করা আমরা সমীচীন মনে করলাম।

আমাদের আবেদনে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। কবি কান্তিচন্দ্রের এই সময়োচিত হিতকারী খেয়ালটুকুর জন্য এখনো আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর রচনা সম্ভার 'নিঃস্বকরা দানে' 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় 'নিঃশেষিয়া' দিয়েছিলেন, তার হেতু-মূলে আর যাই কিছু হোক না কেন, 'বিচিত্রা' নামের প্রেরণাও যে বেশ খানিকটা ছিল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমাদের মাসিকের নাম 'সবিতা'ই যদি থাকত তা হ'লেও সেই মাসিকের সর্ব প্রথম বিষয়বস্তু স্বরূপ অনুরোধ উপরোধের দ্বারা কবিকে দিয়ে হয়তো 'সবিতা' নামে একটি কবিতা লিখিয়ে নেওয়া অসম্ভব হত না; কিন্তু সে কবিতা নিশ্চয়ই সে বস্তু হতে পারত না, যা হয়েছিল 'বিচিত্রার' প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় ব্লকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে মুদ্রিত "বিচিত্রা" নামক কবিতা। উক্ত কবিতার শেষ স্তবকে লক্ষ্য করলে একথার প্রতীতি জন্মাতে বিলম্ব হবে না। শেষ স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।—

বুকের শিরা ছিঁড়ে ক'রে
জীবন পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শত দলে,—
বিচিত্রা হে বিচিত্রা
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

কমল যত উঠেছে ফুটি'
বক্ষ বিভেদিয়া।
কণা-কণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে?
নিঃশেষিয়া নিবে কি তরি
নিঃস্ব করা দানে?"

শেষ চার পংক্তির কথা কবি হয়তো তাঁর মানসী বিচিত্রাকে লক্ষ্য ক'রেই বলেছিলেন, কিন্তু মাসিক 'বিচিত্রা'র পক্ষেও একথা ঠিক একই ভাবে প্রযোজ্য ব'লে মনে হত। প্রার্থনার ডালি নিয়ে আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম, তিনি তাঁর থলি উজাড় ক'রে আমাদের ডালি ভ'রে দিয়ে নিঃস্ব হতেন। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রাবলী, স্বরলিপিতে 'বিচিত্রা'র ডালি সভাই বিচিত্র হয়ে উঠত। কোনো মাসিক পত্রের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা। আমরা এক একবারে পাঁচটা ছটা, এমন কি কখনো-কখনো আটটা নটা কবিতা নিয়ে ফিরতাম।

কিন্তু এই অপর্যাপ্ত প্রাপ্তিকে সামলে পরিপাক করার মধ্যে সময়ে সময়ে বেশ একটু কৌতুকাবহ সঙ্কটও ভোগ করতে হ'ত। হয়তো রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোটা ছয়েক কবিতা দিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত ক'রে আরম্ভ হলাম যে, প্রতি সংখ্যা একটি কবিতা দিয়ে আরম্ভ করলে মাস ছয়েকের জন্য এখন নিশ্চিন্ত। এর মধ্যে কোনো সংখ্যায় রবীন্দ্রকাব্যহীন হয়ে প্রকাশিত হবার দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হবে না।

সেই মতলব ক'রে পরবর্তী সংখ্যায় একটিমাত্র কবিতা প্রকাশিত করলাম। হাতে রাখলাম পাঁচটি।

'বিচিত্রা'র জন্য রবীন্দ্রনাথ একটু ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা ক'রে থাকতেন। তিনি কলিকাতায় থাকলে 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হওয়া মাত্র আমি নিজে গিয়ে তাঁকে কাগজ দিয়ে আসতাম। তদনুসারে 'বিচিত্রা' নিয়ে গিয়েছি। আমার হাত থেকে 'বিচিত্রা' নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে দেখলেন, তাঁর ছটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁর অপরাপর লেখাগুলির প্রতি মনোযোগী হলেন।

পরের সংখ্যাতেও সেই একই কাহিনী। বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখে রবীন্দ্রনাথ তুললেন তখনো আমার হাতে তাঁর খান চারেক কবিতা মজুত; প্রথম বিষয়বস্তু হিসাবে সেবারে 'বিচিত্রা'য় মাত্র একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

এবার আর রবীন্দ্রনাথ অপরাধ ক্ষমা ক'রে নীরবে থাকলেন না; কুঞ্চিতাস্থিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "দেখ উপেন, কৃপণতা কোনো ক্ষেত্রেই ভাল নয়; কবিতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও নয়। আচ্ছা, তুমি কি মনে করেছ আমার কাব্যের উৎস শুকিয়ে গেছে, তাই একটি একটি ক'রে কবিতা ছাপছ?

ভাল! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! পরের বারে একেবারে ছটো কবিতা হয় তো বা গোটা তিনেকই

ধার ক'রে নিলাম। কাগজ পেয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পুনরায় সেই কুঞ্চিত চক্ষের হাসি।—"ওহে উপেন, প্রাচুর্যের দিনে পেটভরে খাচ্ছ, অনটনের দিনে কিন্তু অনাহারে শুকোতে হবে। তুমি কি মনে কর, আমি পাকা ফলের গাছ যে, নাড়া দিলেই ফল পড়বে?" মনে মনে বললাম, "দশার এগোশেও আপনার যে কথা পেছলেও তাই এখন যাই কোন্ দিকে বলুন তো?" মুখে কিন্তু কোনো কথা না ব'লে শুধু একটু হাসলাম।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উক্তি দুটিই বিশুদ্ধ কৌতুকরস প্রণোদিত। তা হ'লেও আমার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে এবার অসঙ্কোচে বলতে পারি, বোটের উপর লেখা প্রকাশিত হলেই তিনি খুশি হতেন। লেখা শেষ ক'রে বাক্সয় বন্দী ক'রে রাখা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কারণ, তিনি লিখতেন দুটি পৃথক পক্ষকে আনন্দ দান করবার উদ্দেশ্যে। প্রথম পক্ষ অবশ্য একমাত্র তিনি নিজে; দ্বিতীয় পক্ষ নিজেকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-মানব সমাজ। নিজেকে আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকত লেখার সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু লেখা শেষ হ'লে রবীন্দ্রনাথ যে লেখা দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিশ্ব-মানবের দরবারে ছড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন, যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিকশিত হওয়া মাত্র গাছের ফুল আকাশের দরবারে গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্যে। দিন ও সময় স্থির ক'রে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগী পাঠকবর্গকে পারিবারিক বৈঠকে আহ্বান ক'রে এনে তাঁর সদ্যোজাত রচনা পাঠ করে শোনাতেন। তারপর সাধারণ সমাজে বিতরিত হবার জন্য পাঠিয়ে দিতেন ছাপাখানায়।

ফুলের গন্ধের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার তুলনা করেছি। কিন্তু এই দুই বস্তুর প্রকাশ প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিল। ফুল প্রস্ফুটিত হলে তার ভিতর হতে গন্ধ স্বতঃই নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে—কারো কাছ থেকে তাকে মজুরি নিয়ে আসতে হয় না। রবীন্দ্র রচনায় কিন্তু সে উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিবাসী কড়া যাচাইকারের কাছে শ্রেষ্ঠতার ছাড়পত্র পেলে তবেই সে রচনা বহির্জগতে আত্ম-প্রকাশ করতে সক্ষম হ'ত। রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, 'আর সেই কঠোর যাচাইকার সে লেখা কেটে-কুটে ছেঁটে-ছুটে কমিয়ে বাড়িয়ে একশা ক'রে দিত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি দেখবার যাদের সুযোগ হয়েছে তাঁদের কাছে যাচাইকারের এই কাটাকাটির কীর্তি অবিদিত নেই।

কিন্তু এরপরও সব সময় তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, সময়ে সময়ে মনের মধ্যে সংশয়ের পীড়া অনুভব করতেন। আমি এক-আধবার তার 'প্রমাণ' পেয়েছিলাম।

হিবার্ট লেকচার দিতে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যাবেন,—তখন 'বিচিত্রায়' তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস "যোগাযোগ" মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাকে চিঠি লিখলেন, "যোগাযোগের" ধারাবাহিকতা 'বিচিত্রায়' নষ্ট হয়, তা আমি চাইনে। আমি উপন্যাসের অনেকখানি লিখে ফেলেছি, তুমি একজন লেখক নিয়ে এখানে চ'লে এসে কপি করিয়ে নাও। তাতে কয়েক মাস চলবে। তারপর আমি পথ থেকে ও বিদেশ থেকে লিখে লিখে পাঠাব।" চিঠি পাওয়া মাত্র আমি বিনোদবিহারী গুপ্ত নামে আমাদের একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলাম। বিনোদবাবু 'পুরাতন প্রসঙ্গের' লেখক অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ঘাড় গুঁজে নিবিষ্ট চিত্তে বিনোদবাবু 'যোগাযোগ' নকল করে চলেন, আমি ঘুরে ফিরে বেড়াই। কখনো বিনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) গৃহে আড্ডা জমাই, কখনো চিত্রশালায় গিয়ে ছবি দেখি, কখনো

যা শুরুপল্লীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল বসুর গৃহে উপস্থিত হয়ে চিত্রশিল্প বিষয়ে বিতর্ক তুলি। তা ছাড়া প্রধান কার্য হ'ল সকাল সন্ধ্যা উত্তরায়ণে গিয়ে কবিগুরুর সভায় হাজিরা দেওয়া এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তাঁর সহিত আহার করা।

গেষ্ট হাউসে একটি আরামদায়ক কামরা দখল ক'রে আছি। প্রত্যূষে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা-পান ক'রে উত্তরায়ণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ততক্ষণে কাজ-পাগলা বিনোদবাবু টেবিলের উপর ঝাড়ুকুঁকে 'যোগাযোগ' কপি করতে ব'সে গেছেন। কানে তব শোনেন, সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে কম কথাবার্তা কওয়া আরামদায়ক। তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ি। খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে উত্তরায়ণে যখন উপস্থিত হই তখন কবির দরবার পুরোদমে চলছে।

আমি ছাড়া প্রায় সকলেই স্থানীয় অধিবাসী, সুতরাং সকলেরই কাজকর্ম আছে, বেলা নটা সাড়ে নটা বাজতে সবাই উঠে পড়েন। আমি তখন জাঁকিয়ে বসি। বাল্যকাল থেকে চিরটাকাল আড্ডা দেওয়ার সাধনা করেছি, সুতরাং আড্ডা দেওয়ার সুষ্ঠু প্রণালী কতকটা জানা আছে আর রবীন্দ্রনাথের কোন্ প্রণালী যে অজানা আছে তা তো জানি নে। কথায় কথায় আড্ডা জমে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওহে একটা কবিতা লিখেছি। পড়ে দেখ তো কেমন হয়েছে?" ব'লে কবিতাটি আমার হাতে দেন।

আগ্রহ সহকারে আমি কবিতা পাঠ করতে থাকি; আর কবিতা আমার ভাল লাগছে অথবা লাগছে না অনুমান করবার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সহকারে রবীন্দ্রনাথ আমার মুখের রেখা পাঠ করতে থাকেন। অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে মাঝে মাঝে আমি তা দেখতে পাই। পড়া শেষ হলে উৎসুক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, "কিহে কেমন হয়েছে? চলবে তো?"

রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতা ফিরিয়ে দিয়ে বলি, "চমৎকার হয়েছে।"

কোনো দিন বা ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে বলি, "খাসা হয়েছে।"

একদিন কিন্তু ঐ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে কৌতুকের বশবর্তী হয়ে ব'লে ফেললাম, "আজ্ঞে না, চলবে না। এ একদম অচল।"

রবীন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিতেন না, শুধু নিঃশব্দ হাস্যে তাঁর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠত। এরপরও তিনি আমাকে কবিতা পড়তে দিতেন, কিন্তু পাছে আবার বলি একদম অচল—সেই ভয়ে সচল অচলের প্রশ্ন আর তুলতেন না।

নিজের সৃষ্টির বিষয়ে এই যে সংশয় বস্তুত এ কোনো স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টতর ক'রে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটা যে অনিবার্য ব্যাকুলতা ছিল, এ তারই একদিকের বহিঃ প্রতিক্রিয়া মাত্র। নিজের যাচাই শেষ হওয়ার পরও অপরকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবার আগ্রহ।

বিনোদবাবুর নিকট হতে 'যোগাযোগের' কপি নিয়ে দেখতাম, জায়গায় জায়গায় রবীন্দ্রনাথ পাতার পর পাতা কেটে বাদ দিয়েছেন। বৃহৎ আকারের পাতা লাইনে লাইনে অক্ষরে অক্ষরে কাটা সম্ভব নয়, নীচে দীর্ঘ লাইন চালিয়ে কেটেছেন। প'ড়ে দেখতাম, একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। এতখানি উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে আমার 'বিচিত্রা' বঞ্চিত হচ্ছে দেখে মনটা 'হায় হায়' ক'রে উঠত। রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করতাম। তিনি হেসে বলতেন, "নাহে, ও ঠিকই করেছি। পরে বুঝতে পারবে।"

———

আমার সর্বান্তঃকরণে বাংলার ছাত্রদের কল্যাণকামনা করি। তাদের সাধনা সফল হোক, চরিত্রবলে তারা মনুষ্যত্বের সিদ্ধিলাভ করুক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছু লোকের ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথ বরাবর শান্তিনিকেতনে থাকতেন, শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই তাঁর দিন কেটেছে, তাই কলকাতা তথা বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ স্থাপিত হয়নি এবং বাংলাদেশের ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন।

ধারণাটা সর্বৈব ভুল।

কলকাতার ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে থাকলেও বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজ তাঁর প্রিয় ছিল, তাদের সান্নিধ্যে আসতে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। ছাত্রদের আহ্বান তিনি কখনো উপেক্ষা করেননি।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে তিনি একাধিকবার এসেছেন, ফেডারেশন হলে ছাত্র-সভায় ভাষণ দিয়েছেন, তাঁর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীতে কলকাতার অমল হোম মহাশয়ের প্রচেষ্টায় যে বিরাট অনুষ্ঠান হয়েছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলকাতার ছাত্র সমাজ যে স্বতন্ত্র উৎসবের আয়োজন করেছিল সে উৎসবে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু যোগ দেওয়াই নয়, ছাত্র উৎসবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণরূপে গণ্য হয়েছে। আরো, বড়দের উৎসবে পুরনো নৃত্যনাট্য নটীর পূজা অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু ছাত্র উৎসবের জন্যে তিনি নতুন পালা রচনা করে দিয়েছিলেন—"শাপমোচন"। জোড়াসাঁকো ভবনে সেই ছাত্র-উৎসবে শাপ মোচনের প্রথম অভিনয় হয়।

তারও আগেকার কথা। ১৯২৮ সাল। বাংলা দেশে সে সময় ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার এসেছে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এক বিরাট ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

বাগবাজারে বসার পশুপতি বসুর বাড়ির প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানে ৬ই মার্চ সেই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ভারতের নানা স্থান থেকে বহু ছাত্রনেতা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

সভানেত্রী হয়েছিলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন মাদ্রাজ-নেতা সি, আর, রেড্ডি।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ৺শৈলেন্দ্র মিত্র, ৺শচীন মিত্র, প্রমোদ ঘোষাল, অবিনাশ ভট্টাচার্য, জগদ্ধাত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল গাঙ্গুলী প্রমুখ তখনকার দিনের অনেক নামকরা ছাত্রনেতা।

সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে এমন সময় উদ্যোক্তারা স্থির করলেন, রবীন্দ্রনাথকে সেই সম্মেলনের উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্যে আহ্বান জানাতে হবে।

কবি তখন শান্তিনিকেতনে।

স্থির হল আমরা ক'জনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাবো।

সম্মেলনের দিন তিনেক আগে তিন সতীর্থ সমেত পৌঁছোলাম শান্তিনিকেতনে অপরাহ্ণ বেলায়।

অতিথিদের ভার যাঁর উপর থাকতো সেই সর্বজনপ্রিয় গাঙ্গুলী মশায় কপাল চাপড়ে বললেন, বিনা নোটিশে এসেছেন। কষ্টের পরিসীমা থাকবে না। দেখি কি করতে পারি।

"গান্ধশালায়" আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল।

সময় হাতে বেশি নেই। অতএব সেইদিনই বিকালে কবির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু যা শুনলাম তাতে মন দমে গেল। শুনলাম কোন বিশেষ কারণে তিনি সেদিন অত্যন্ত উত্যক্ত, কারুর সঙ্গে আপাতত দেখা করবেন না।

বন্ধু শ্রীকালিপদ রায়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায় মশায় কবিকে আমাদের কথা আগেই বলে রেখেছিলেন। নেপালবাবুকে আমরা পূর্বাহ্ণে খবর দিয়ে রেখেছিলাম যে আমরা যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেষ্টায় পৌঁছোলাম কবির কাছে।

তারপর সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ··

নির্দেশমত উত্তরায়ণের দোতলায় উঠে একটি ঘরে আমরা ঢুকলাম।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। বুক কাঁপছে রীতিমত। এই প্রথম হিমালয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

ঘরের মধ্যে একটি ইজিচেয়ারে তিনি বসে আছেন। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। কপালের রেখা কুঞ্চিত। দুচোখে ভ্রূকুটি।

আমরা একে একে প্রণাম করলাম।

তারপর আমরা কোন কথা বলবার আগেই তিনি বলে উঠলেন—আমায় মাপ করতে হবে। আমি যেতে পারবো না। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? যখন সময় ছিল তখন কি কিছুই করিনি? আজকের এই হট্টগোলে যদি সইতে না পারি সে কি আমার ফাঁসীর তুল্য অপরাধ!

আমরা তো স্তম্ভিত। হঠাৎ এমন সুরে এমনধারা কথা শুনবো তা কল্পনা করিনি।

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা।

অমিয় চক্রবর্তী মশায় ছিলেন, রথীবাবুও ছিলেন। আর কে কে ছিলেন মনে নেই।

তীক্ষ্ণকণ্ঠ তীব্রভেজে আবার ধ্বনিত হল—তোমাদের বক্তব্য এঁরা আমাকে আগেই জানিয়েছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এখন কলকাতা যাওয়া অসম্ভব। আমি কি এখন আর ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারি? আমার কি শান্তি আর অবকাশের প্রয়োজন নেই? এ কী অবরদস্তি। আশা করি তোমরা অবরদস্তি করবে না।

নরম হল গলার স্বর।

দাঁড়িয়ে ছিলাম কাঠ হয়ে। এবার ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। বললাম—আপনার কাছে অবরদস্তি করব এমনধারা বদ ছাত্র আমরা নই। আমরা এসেছিলাম আপনার আশীর্বাদ নিতে।

মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, ছাত্রদের আমি নিয়ত আশীর্বাদ করি। ছাত্ররা আমার প্রিয়।

মনের ভয় তখন অনেকটা কেটেছে। কথা খুঁজে পাচ্ছি। বললাম, আজকের দিনে বাংলা-দেশের ছাত্ররা যে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে, যে নতুন প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার মূলে আছে আপনার প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভক্তি। আপনার কাছ থেকে তারা জীবনে নতুন আলো আর নতুন ভাষা পেয়েছে। তাই তারা একজোট হয়ে আপনাকে কাছে পেতে চেয়েছিল। আপনাকে তাদের সমবেত প্রণাম জানাতে চেয়েছিল। আপনার কাছে আসার সৌভাগ্য তো তাদের সকলের হয় না।

কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হল। চোখের দৃষ্টিতে কোমল ভাব আভাস। একবার চারিদিকে তাকালেন ঘাড় তুলে। মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটে উঠল। বললেন, তাদের কাছে যেতে পারি না, তাদের সকলকে কাছে আনতে পারি না বলে যে বাংলা দেশের ছাত্ররা আমার আশীর্বাদ পায় না, তা নয়। আমার 'পরে তাদের সে দাবী সর্বদা আছে এবং থাকবেও।

বললাম, এই আশীর্বাদের বাণীটি যদি পাই তাহলে আমাদের উৎসাহ অনেক বাড়বে।

সেই আশীর্বাণীটি এই নিবন্ধের সঙ্গে ছাপা হল।

এবার আসল কথাটা বলি।

কবিগুরুর সামনে পৌঁছে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর যে রুদ্রমূর্তি দেখেছিলাম এবং যে রুদ্রভাষণ শুনেছিলাম তার পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস ছিল।

সেই দিনই সকালে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন তখনকার দিনের এক নামকরা বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক নেত্রী। সকাল গড়িয়ে যাবার পর তিনি কবির সঙ্গে দেখা করেন এবং দুপুর পর্যন্ত তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য তাগাদা জানাতে থাকেন। শুধু তাই না, কবিগুরু রাজনীতির আসরে নামছেন না বলে সেই মহিলা অনুযোগ করেছিলেন, তর্ক করেছিলেন অবিরাম।

যাঁরা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, ভদ্রমহিলার সেই প্রগলভতার সামনে অদ্ভুতভাবে চুপ করে বসেছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে ক্ষীণকণ্ঠে দু'একটি কথা বলেছিলেন, শুধু সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল আর কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়েছিল।

মহিলাটি চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। তারপরেই তাঁর কাছে খবর যায় যে কলকাতা থেকে আমরা গিয়েছি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বুঝলাম, ভদ্রমহিলার সামনে তিনি মুখ খুলতে পারেন নি, পাছে কোন রকম অসৌজন্য প্রকাশ পায়। অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে আমাদের সামনে পেয়ে তাই বোধহয় মনের ভার কিছুটা লাঘব করেছিলেন।

সেদিন রাত্রে নেপালবাবু এবং গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে জেনেছিলাম, আমাদের সে রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা এবং আহারাদির আয়োজন ঠিকমত হল কি না, সে সম্বন্ধে তিনি বারংবার তাঁদের কাছে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

"তোমাদের সমস্ত কথা আমি শুনেছি; কিন্তু আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেই কারণে তোমাদের সম্মেলনে আমি যেতে পারবো না।

সব কাজেরই সময় আছে, আমারও যখন সময় ছিল কাজ করেছি। এখন আমার কর্মক্ষেত্রে একটা সীমানার দাগ টেনে দিতে হচ্ছে।

আমি যে এখনো আছি এই আশ্চর্য। বাংলাদেশের পরমায়ুর তুলনায় আমার আরো বেঁচে থাকা অসঙ্গত, কিন্তু সেজন্যে আমি দায়ী নই।

মনুসংহিতার একটা বিধান আমি মানি। বয়স অনুসারে কর্মের বিভাগ এবং পরিশেষ আছে।

তোমাদের কাছে যেতে পারলুম না বলে মাপ ক'রো।

তোমাদের ছাত্র-সম্প্রদায়কে আমি আশীর্বাদ করি। ছাত্ররা আমার প্রিয়। আমার এখানে যারা আছে আমার শুভ ইচ্ছার প'রে তাদের যতখানি দাবী, এর বাইরে যারা আছে তাদেরও দাবী তার চেয়ে কম হবে কেন। বাইরের দিকে এখানে তাদের সকলের স্থান থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু এই আশ্রমেরই একটি অন্তরের দিক আছে সেখানে তাদের সকলের অধিকার।

আমি সর্বান্তঃকরণে বাংলার ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করি। তাদের সাধনা মহৎ হোক, দুর্গমপথে তারা মনুষ্যত্বের সিদ্ধিলাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ও
শিল্পাচার্য নন্দলাল

আশপাশের গ্রামের দরিদ্র সাঁওতাল, ডোম, বাউরি, প্রতিবেশীদের দাসবাদী তাঁর কাছে বিনামূল্যে ওষুধ নিয়ে যেত। নিজে যেখানে কারো সেবার দায়িত্ব নিতে পারতেন না, সেখানে শিষ্য বা বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগাতেন, উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতেন। ছাত্র, সিংহল ভূমিকম্পের সেবাকার্যে গিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে, এক কথায় একশ টাকা পাঠিয়েছেন মণিঅর্ডারে, তখন তাঁর নিজের বেতন মাত্র দু'শ টাকা।

সাঁওতাল গ্রামে সরীর দোসলা নামি মেনিঞ্জাইটিসে আক্রান্ত, ডাক্তারেরা হাল ছেড়েছেন। মাস্টার মশাই দুশ্চিন্তায় আকুল, দুটি ছাত্রকে পাঠালেন বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স, পথ্য, স্টোভ, গরম জলের ব্যাগ প্রভৃতি সঙ্গে দিয়ে: তারা দু'দিন দু'রাত অক্লান্ত সেবা এবং চিকিৎসায় বেচারাকে বাঁচিয়ে তুলল।

বুধবারের মন্দিরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ধর্মব্যাখ্যা করছেন, আশ্রমবাসী স্ত্রী পুরুষ শিক্ষক ছাত্র নিঃশব্দে শুনছে তন্ময় হ'য়ে, হঠাৎ চং চং ক'রে বিপদ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল, কাছেই কোথায় আগুন লেগেছে নিশ্চয়। সকলেরই মন চঞ্চল, কিন্তু কেউ উঠতে সাহস করছে না, পাছে উঠে গেলে মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ হয়, গুরুদেবের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। সবার আগে উঠে পড়লেন নন্দলাল, তাঁর দেখাদেখি শিক্ষক ও ছাত্রের দল ঘর খালি ক'রে বেরিয়ে পড়ল। ভুবনডাঙার আগুন লেগেছিল, তালপুকুর থেকে এবং বিভিন্ন কুয়া থেকে সারি দিয়ে ছেলে মেয়েরা দাঁড়াল, হাতে হাতে মতি বালতি এবং কলসীতে জল যেতে লাগল অগ্নিনির্বাণের কাজে, খালি কলসী এবং বালতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে হাতে ফিরে আসতে লাগল। মাস্টার মশাই তখন আগুনের কেন্দ্রস্থলে; কখনও চালার উঠে জলন্ত বাঁশ কাটছেন, খড় ছড়িয়ে ফেলছেন, কখনও আশপাশের বাড়ীর খড়ের চালে ভিজে কাঁথা কম্বল চাপাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আগুন নিভল, আমরা সবাই কৃতিত্বের গর্বে উচ্ছ্বসিত, মাস্টার মশাইকে আর দেখা গেল না।

আর একদিনের কথা চিরজীবন আমার মনে থাকবে। মন্দিরে সেদিন ব্রহ্মের বিশেষণ শান্তী মশাই উপাসনা করছেন। মন্ত্রপাঠ এবং সঙ্গীতের পর ভাষণ আরম্ভ হওয়ার আগে যথারীতি শিশু বিভাগের ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মন্দিরের বাইরে কাঁটাল গাছে ছিল একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী মৌমাছির চাক, একটি দুষ্টু ছেলে তাতে কখন এসে খেলার ছলে ঢিল মেরেছে।

হঠাৎ শোনা গেল একটা আর্ত চীৎকার, দেখা গেল বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে আসা সূর্য-কিরণরেখার মতো একটা ক্রন্দস্ফীত কালোরেখা এসে পড়েছে কাঁটাল গাছ থেকে ছেলেটির উপর, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে। এদিনও সবার আগে উঠে ছুটে গেলেন আমাদের মাস্টার মশাই, নন্দলালবাবু; আমরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লুম মন্দির থেকে। নিমেষমধ্যে ছেলেটাকে পাঁজা-কোলা করে বুকের উপর তুলে নিলেন তিনি, তারপর ছুটলেন আমাদের পুরাণো অতিথিশালা অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের সবচেয়ে প্রাচীন দোতলা বাড়ীটির দিকে। চোখের উপর দেখলুম মৌমাছির ঝাঁক নামল তাঁর উপর, ক্রুদ্ধ গুঞ্জনে আকাশ ভরিয়ে তাঁর সাদা পাঞ্জাবীটা দেখতে দেখতে কালো কোটে পরিণত হয়ে গেল। নিমেষ মধ্যে অতিথিশালার দ্বার পথে তিনি অদৃশ্য হলেন, তাঁর পিছনে গেলেন ব্রহ্মের শিক্ষক আর্যনায়কম। আর কেউ কাছে যাবার আগেই অতিথিশালার অন্যান্য

নিচের তলার সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমাদের তখন শোচনীয় অবস্থা, প্রত্যেকের হাতে পায়ে মুখে নাকে ঝাঁকে ঝাঁকে জীবন্ত বুলেট এসে পড়ছে, জামার কাপড়ে ঢুকছে, যেখানে বসছে সেখান থেকে আর উঠছে না। বিষের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলছে, নিজের যন্ত্রণায় অন্যের কথা মনে নেই কারও। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে যে যেদিকে পারে ছুটেছে, কেউ লাফাচ্ছে, কেউ কাঁদছে। জোতলার জানালা দিয়ে মৌমাছির দল ঢুকছিল বলে সেগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে। বহু আবেদন নিবেদনে এক বিদেশী অতিথি শিহম দিকের দরজা খুলে আমাদের কয়েকজনকে ঢুকতে দিলেন।

জোতলায় গিয়ে দেখি অচৈতন্য ছেলেটিকে তোষক চাপা দিয়ে রেখে মাস্টারমশাই এবং আরিয়ামদা কাঁটা দিয়ে পিটিয়ে পরস্পরের গায়ের মৌমাছি মারছেন। অবস্থা আরও খানিকটা শান্ত হ'তে আরও অনেকে এলো। মাস্টার মশায়ের পা এবং মাথা থেকে মৌমাছির মতো বড়ো হুল চোঙা ইতি করে খুঁটে তোলা হল। তারপর প্রবল জ্বর, দারুণ ব্যথা। জিজ্ঞেস করলুম, "আমরা তো পারলুম না, আপনি পারলেন কি ক'রে?" বললেন, "না পেরে যে উপায় ছিল না। খড়্গপুরে দেখেছি রাস্তা দিয়ে একজন ঘোড় সওয়ার যাচ্ছিল, একটা দুষ্টু ছেলে মৌচাকে ঢিল মেরে সরে পড়ল, মানুষটা ঘোড়াশুদ্ধ ছটফট করে মরে গেল মৌমাছির কামড়ে। ছেলেটাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে হবে এই কথাই কেবল মনে ছিল, নিজের কথা কি মনে ছিল তখন।"

অপরকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছেন একথা কখন ভুলতে পারে? যাঁরা পারেন তাঁদের আদর্শ ই আজ দুর্ভাগা দেশের ঘনায়মান অন্ধকারে আমাদের একতারা।

শুধু দুর্দিনে নয়, প্রতিদিনের জীবনেও নিজেকে ভুলে থাকা ছিল নন্দলালের বৈশিষ্ট্য। বন-ভোজনে বা দেশ ভ্রমণে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কাঠ কাটতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে তাঁর আলস্য দেখা যেত না, আহারে শয়নে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা তাঁর জন্য হবার উপায় ছিল না। পৌষের মেলায় উৎসব প্রাঙ্গণ সাজাতেনও তিনি, আবার আশ্রম পরিচ্ছন্নতার ভার নিতেন তিনি, মাথায় পাগড়ী বেঁধে ঝুড়ি কোদাল ঝাঁটা নিয়ে পথে পথে যখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে ঘুরতেন জঞ্জাল সাফ ক'রে তখন তার সাথী বলবে তিনি আশ্রমের মধ্যমণি ভারত বিখ্যাত শিল্পী।

সমাজের সবার নিচের তলায় যারা বাস করে তাদের প্রতি সমবেদনা ছিল তাঁর অকৃত্রিম, তাদের দুঃখের ভাগ নিতে, তাদের নিরানন্দ মুখে আনন্দ বিতরণ করতে তিনি ছিলেন সতত উৎসুক। সরীষ মানুষ সস্তায় কিনতে পারবে বলে তিনি এক সময়ে দু'চার পয়সা দামে পট এঁকে বিক্রি করেছেন, কার্ডে ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন মেলার সময়। তাঁর বেশে-বাসে, গৃহ-সজ্জায় তাঁর মত সর্বজনগ্রাহ্য শিল্পীর উপযুক্ত আভিজাত্যের কোনো নিদর্শন দেখা যায়নি।

মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল সাজাতে গিয়ে তিনি বাঁশের খড়ের তোরণ নির্মাণ প্রবর্তন করেছেন, গরুরগাড়ীকে অলঙ্কৃত করে সভাপতির রথ বানিয়েছেন। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে কি সুন্দর প্রসাধন হতে পারে তা তিনি শুধু মুখে ব'লে নয়—কাজে ক'রে দেখিয়েছেন।

ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রথম জীবনে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাঁর প্রিয় ছিল, পরবর্তী জীবনে অর্জুন, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান প্রভৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের ছবি, ছাগল, ঘোড়ার পালিশ, কড়িয়ের ছবি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি অজস্র এঁকেছেন সমান আনন্দে।

টিনের টবে ফুল গাছ রেখে কাঁচের গ্লাসে ফুল সাজিয়ে, ঝুড়ির ওপর কোট পরে আমরা যে রুচিহীনতার পরিচয় দিই তাতে তাঁর দৃষ্টি পীড়িত হত। ভারতবর্ষের মানুষ উপকরণের দৈন্য সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পূজা করতে জানত, আজ ভুলে যেতে বসেছে, তাই তার দারিদ্র্যে হীনতাবোধ এসেছে। মাস্টার মশাই-এর ব্রত ছিল এই হীনতা থেকে দারিদ্র্যকে মুক্তি দেওয়া। ঘরের বাইরে দুটি ফুল গাছ ঘরের মধ্যে সুবিন্যস্ত দুচারটি আসবাব এবং তৈজসপত্র, ঘরের দেয়ালে বা মেঝের একটু আলপনা এতেই গৃহকে সুন্দর করা যায়। লাউয়ের খোলা, নারকেলমালা, বেলের খোলা প্রভৃতি থেকে সুন্দর সুন্দর পাত্র করেছেন তিনি, প্রকৃতি থেকে নব নব রূপ আহরণ করে অলঙ্করণশিল্পকে আলপনা, বাটিক ও ফুলকারীকে নব জীবন দান করেছেন। প্রসাধনের এবং মেয়েদের বেশবাসের সুরুচিসম্মত আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন।

প্রাক্তন ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ করে চাকরীর চেষ্টায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় দেশের কারুশিল্পের উন্নতিবিধান আর

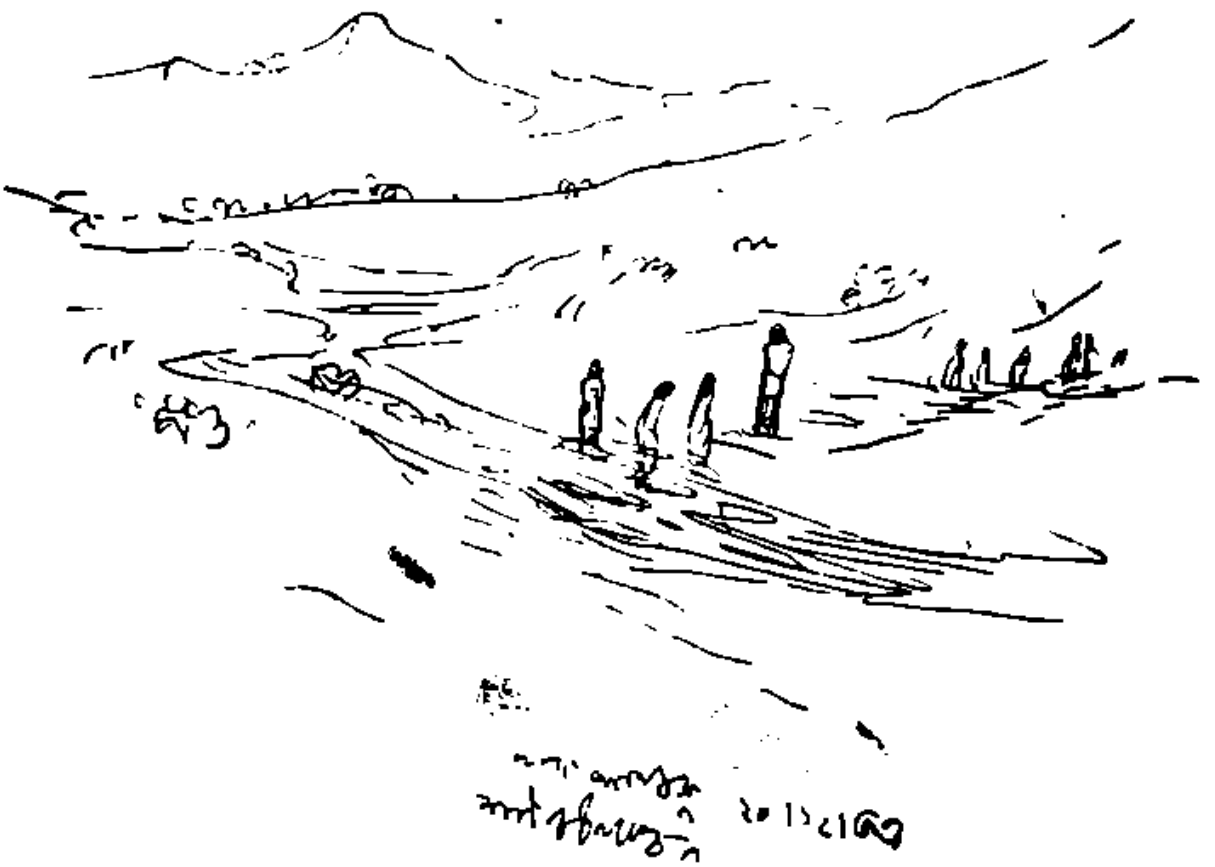

সেই সঙ্গে তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করার সঙ্কল্প ছিল তাঁর, সেজন্য অনেক ছাত্রের সহায়তায় জমি কিনে কারুসংঘ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সম্পাদক স্থান ত্যাগ করায় ও অন্য সহকর্মীরা বেশীদিন আর আশ্রমে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে একে একে অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে যেতে থাকায় বৎসর খানেক পরেই কারুসংঘ ভেঙে যায়।

গুরু অবনীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, প্রথম পরিচয়ে তিনি নন্দলালকে কিছু ছবি এঁকে এনে দেখাতে বলেন, নন্দলাল এঁকে এনেছিলেন ক্ষুদিরামের ফাঁসির দৃশ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসি যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর নিজের হয়নি, সেজন্য যে কেউ স্বাধীনতাযুদ্ধে মৃত্যুবরণ ক'রে এগিয়ে যেত তাকেই তিনি আপনজন ব'লে জ্ঞান করতেন। প্রথম যৌবনে ভগিনী নিবেদিতার স্নেহলাভ করেছিলেন তিনি, বিপ্লবী দলের অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অল্প বয়সে গুরুজনেরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, সংসারের দায়িত্ব পড়েছিল ঘাড়ে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধনা—তাঁর জীবনের ব্রতরূপে ছিল চোখের সামনে তাই বোমা বন্দুক নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেননি তিনি, কিন্তু বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা, অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়নি। দেশের অতীতকে, দেশের মানুষকে, মাটিকে তিনি সমস্ত-অন্তর দিয়ে ভালো বেসেছিলেন, বিদেশীর শাসন এবং শোষণ জ্বালা ধরিয়ে ছিল তাঁর দেহে মনে। সেইজন্যেই করতলগত সরকারী চাকরী তিনি উপেক্ষা করে পড়ে থেকেছেন অভাবের মধ্যে।

বলতে বাধা নেই, নিজেদের রঙ ময়লা হলেও ফরসা রঙের প্রতি আমাদের সকলেরই পক্ষপাত আছে, সচেতন বা অবচেতন মনে নিজেদের কালিমার জন্য একটু কুণ্ঠাবোধ আছে, এই প্রথম একটি মানুষকে দেখলুম যে নিজের কালো রঙের জন্য গর্বিত, সাদা চামড়া দেখলে যার নাড়ি রক্ত গরম হয়ে ওঠে। পরিহাসচ্ছলে বলতেন, "ঈশ্বর তার রঙের বাক্সখানি উজাড় করে ঢেলেছেন আমাদের গায়ে, ওদের ভাগ্যে কিছু জোটেনি তাই সাদাই রয়ে গেছে ওরা।" বলতেন, "আমাদের দেশের মানুষ কালো, দেশের দেবতা কালো (কৃষ্ণ, কালি), দেশের মাটি কালো, কটা রঙ এখানে মানায় না।"

মহাত্মাজী যখন স্বদেশের মুক্তিসাধনার নূতন পথের সন্ধান দিলেন তখন মাস্টার মশায় সে পথের পথিক না হয়েও যারা পথে বেরিয়েছে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। বিদেশী বর্জন করেছেন এবং করিয়েছেন, সুতো কেটেছেন এবং কাটিয়েছেন, দেশী রঙে ছবি এঁকেছেন এবং আঁকিয়েছেন। বন্ধু এবং শিষ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তিনি দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ শিবিরে গেছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করতে সোদপুর আশ্রমে গেছেন, আলিপুর জেলে গেছেন মিষ্টান্ন নিয়ে।

মহিষবাথানে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলেছে, মাস্টার মশায় বড়ো বড়ো পোস্টার এঁকে দিয়েছেন আমাদের, সেগুলি লিনোতে কেটে হাতে ছেপে আমরা নগরে গ্রামে দেয়ালে দেয়ালে এঁটে এসেছি।

কলকাতা কংগ্রেসের সময় তাঁর 'ভাঙা উঠা রথে হামারা' প্রচারিত হয়েছিল দু'রঙে ছেপে, মানুষের মাথা দিয়ে গড়া তাতে দুদিক থেকে দু'জন মেয়ে পুরুষ হাত বাড়িয়ে একটা পতাকা তুলে ধরেছে আর মাঝখানে একটা শিশু পতাকাদণ্ডটা ধরে আছে। আর একটা বিরাট পোস্টার ছিল 'লাগ লাগ ভেলকী লাগ।' ছবির মাঝখানে জন বুল দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে ছুরছুরি বাজাচ্ছে, আর এক হাতে চাবুক ঘোরাচ্ছে, ছবির উপরে নিচে দুটি করে এবং দুপাশে দু'টি মোট দু'টি বৃত্তের মধ্যে ইংরেজের ভেদনীতির দু'টি দৃশ্য : যথা, হিন্দু সৈনিক দেশোদ্ধারীদের উপর গুলি চালাচ্ছে, মন্দিরের দরজায় পশুর মাথা বাঁধা, মসজিদের চুড়োয় গুয়ারের মাথা আটকানো, হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ছুরি ও লাঠি মারছে ইত্যাদি। 'ইতিহাস কহতা হ্যায়', নামক আর একটি পোস্টারে মোটাসোটা এক ইংরেজ বাস' মুখ বেঁকিয়ে বলছে 'আনপ্রেটহুল বীট'। তার পায়ের কাছে একটা বেতের ঝুড়িতে রোগা ছেলে ভারতবর্ষ হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে, কারণ তার মুখে কীডিং বট্‌লের উল্টো দিকটা ধরিয়ে

দিয়ে সামনের দিকে লম্বা নল লাগিয়ে ঝুঁকে আছে তার ধাত্রী। সামনে তাকের ওপর আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেলগাড়ী এই রকম টুকিটাকি খেলনা সাজানো। আর একখানা পোষ্টারে মহাত্মাজী একটা দুর্গের উপরে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে বলছেন ফিরে যেতে, দুর্গের নিচে সমুদ্র, তাতে ইংরেজ পিঠে পণ্যদ্রব্যের বোঝা বেঁধে সাঁতরে আসতে আসতে ডুবে মরবার উপক্রম করছে।

এই রকম অনেক ছবিই তিনি এঁকে দিয়েছিলেন, আজ তাদের চিহ্নমাত্রও নেই, (যদি কারও কাছে কিছু থাকে তবে সন্ধান পেলে কৃতজ্ঞ থাকব) যাঁরা সে সব ছবি দেখেছেন তাঁদের শতকরা নিরানব্বই জন জানতেন না চিত্রকরের নাম, আজও অনেকে জানেন না সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পাচার্যের এই সহযোগিতার কথা।

• • •

মহাশিল্পী বার্ণার্ড শ'। শিল্পের জন্য তিনি কঠোর সাধনা করেছেন সারাজীবন। শিল্পের নামে তিনি প্রবঞ্চনা সইতে পারতেন না? তাঁর আশঙ্কা ছিল চলচ্চিত্র প্রযোজকদের হাতে পড়ে তাঁর নাটকের শিল্পবস্তু যাবে হারিয়ে।

নাটকের ফিল্ম রাইট পাবার জন্যে একবার এক চিত্র প্রযোজক এসেছেন শ'এর কাছে। লোকটিকে তাড়াবার জন্যে শ' এক অসম্ভব মূল্য দাবী করে বসলেন।

তখন প্রযোজক শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন, থিয়েটারে কজন যেতে পারে, চিন্তা করে দেখুন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আপনার অমূল্য শিল্পসৃষ্টি অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছবে।

ওইখানেই তো তফাত আমাদের মধ্যে, মাথা নেড়ে বললেন শ', আপনি শিল্প ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করছেন না আর আমি টাকা ছাড়া অন্য কিছুই দেখছি না।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

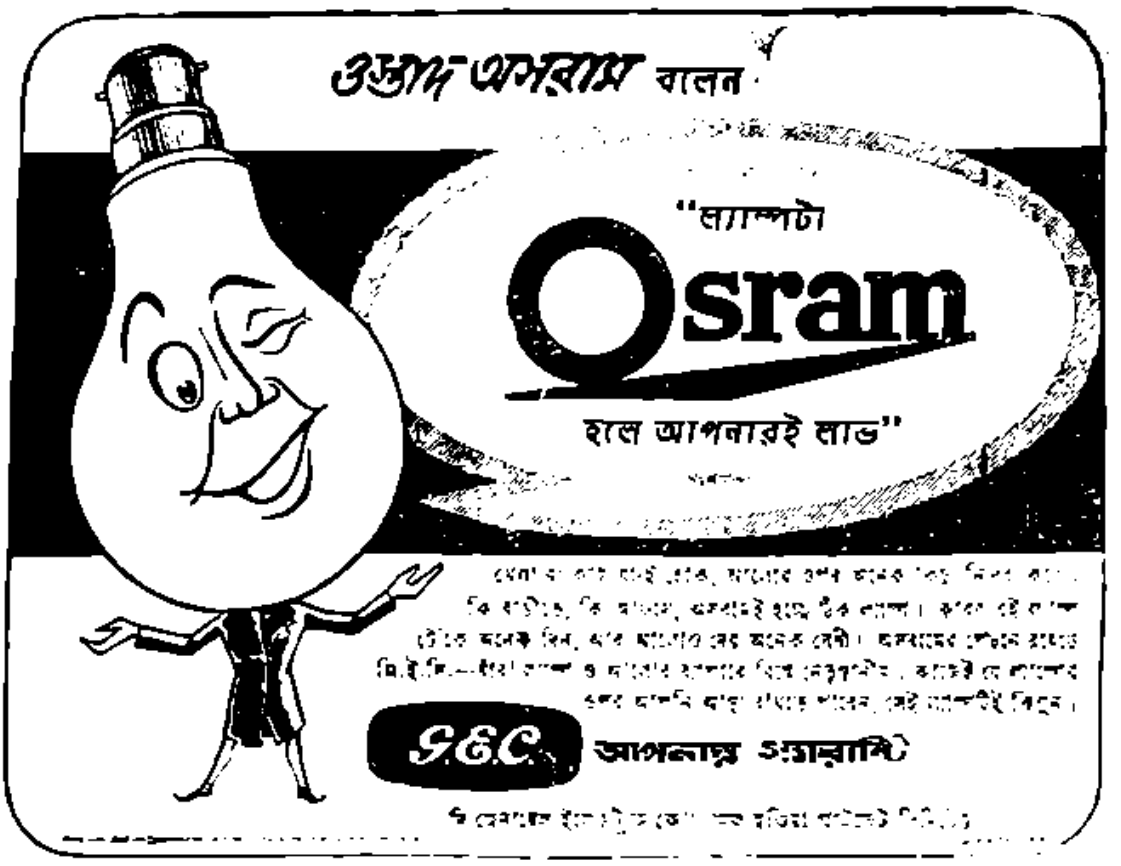
ওস্রাম অসরাম বলুন
"ল্যাম্পটা
Osram
হলে আপনারই লাভ"
G.E.C.

Dalima
BISCUITS & TOFFEE
GLUCOSE &
ORANGE CREAM
Our Specialities
PATIALA BISCUIT MFG (P) LTD.
CALCUTTA OFFICE
10. Bentinck St., (2nd floor)
PHONE : 23-9373

প্রতিদিনের *প্রতিটি প্রহর প্রতিটি মুহূর্ত*

ভারতীয় রেলপথ অব্যাহত-গতি। প্রতিদিন চব্বিশঘণ্টা ১২,০০০ ইঞ্জিন, ৩১,০০০ যাত্রীবাহী কামরা এবং ৩,৫৫,০০০ মালগাড়ী নিয়ে প্রায় ১০,০০০ ট্রেন সৌহবর্ত্মের সুবিস্তৃত ও জটিল রেখা-জালের ওপর দিয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি পরিক্রমারত।

ভারতীয় রেলপথ দেশের বৃহত্তম জাতীয় সংস্থাগুলির অন্যতম। তার সুবিস্তৃত রেলপথ, স্টেশন, কারখানা, ইঞ্জিন, গাড়ী ইত্যাদিতে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৩,০০০ কোটি। প্রগতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং এক সংহত সমাজের সংযোগ সাধনের জন্যেই এই বিনিয়োগ।

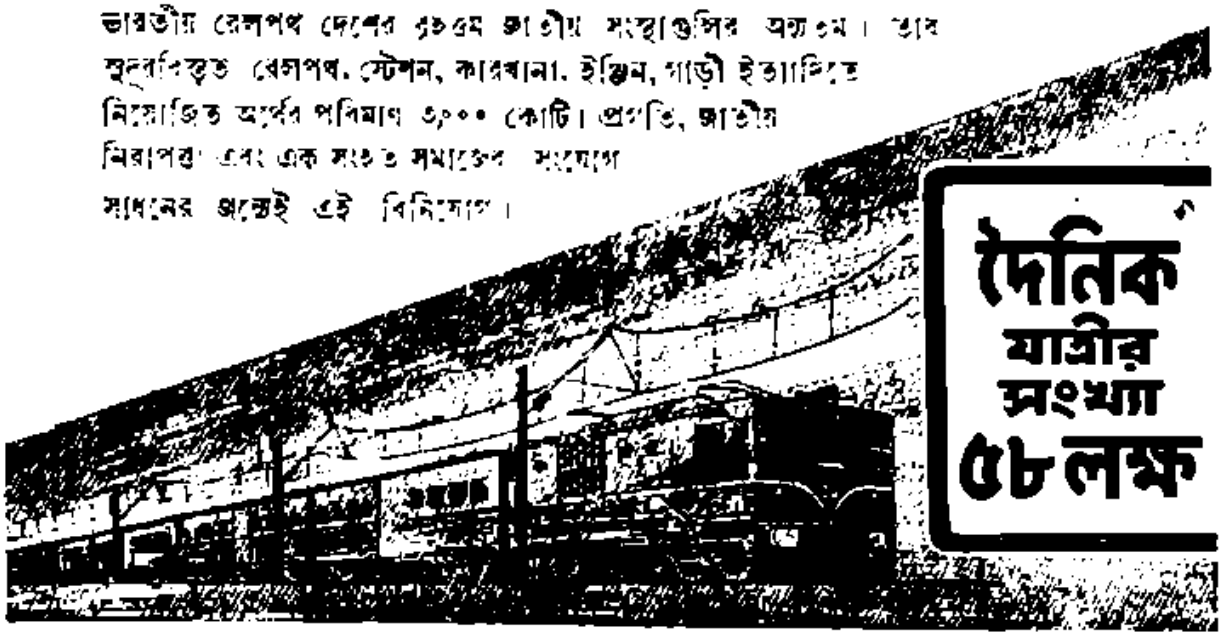

দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ

মাল পরিবহণ

১৯৫০-৫১ সালে পরিবাহিত মালের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে তার বর্দ্ধিত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টন-এ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে চাহিদার তুলনায় রেলের মাল পরিবহণ ক্ষমতা অনেক বেশী।

যাত্রী

১৯৫০-৫১ সালের ১১৮ কোটি ৪০ লক্ষ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ২১০ কোটিতে পৌঁছেছে।

প্রতিরক্ষা

দেশের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় রেলপথ তার দায়িত্বটি আশাতিরিক্তভাবে প্রমাণ করেছে। যেমন ১৯৬২-তে তেমনি ১৯৬৫-তেও রেলকর্মীরা প্রতিরক্ষার সময় পরিবহণ প্রয়োজন উৎসাহব্যঞ্জক ও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করেছে।

ভারতীয় রেলপথ

জাতির সেবায় ১১৩ বছর

IRF-308-66

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

Head Office : **Mahatma Gandhi Road,**
BOMBAY-1.

FIGURES THAT TELL

Authorised Capital	...	**Rs. 10,00,00,000/-**
Paid-up Capital	...	**Rs. 4,71,61,325/-**
Reserve Funds	...	**Rs. 6, 34,55,589/-**
Deposits as at 30.6.1965	...	**Rs. 2,98,36,59,799/-**

Sir Homi Mody, K. B. E.
Chairman

F. C Cooper.
General Manager

B. C. Sarbadhikari
CHIEF AGENT, CALCUTTA.

যে কয়েকটি নামকরা চুলের তেল আছে
তার মধ্যে কেয়ো-কার্পিন তেলেই
এই দুর্লভ গুণ গুলি বর্ত্তমান
যা সব মহিলাদেরই পছন্দ

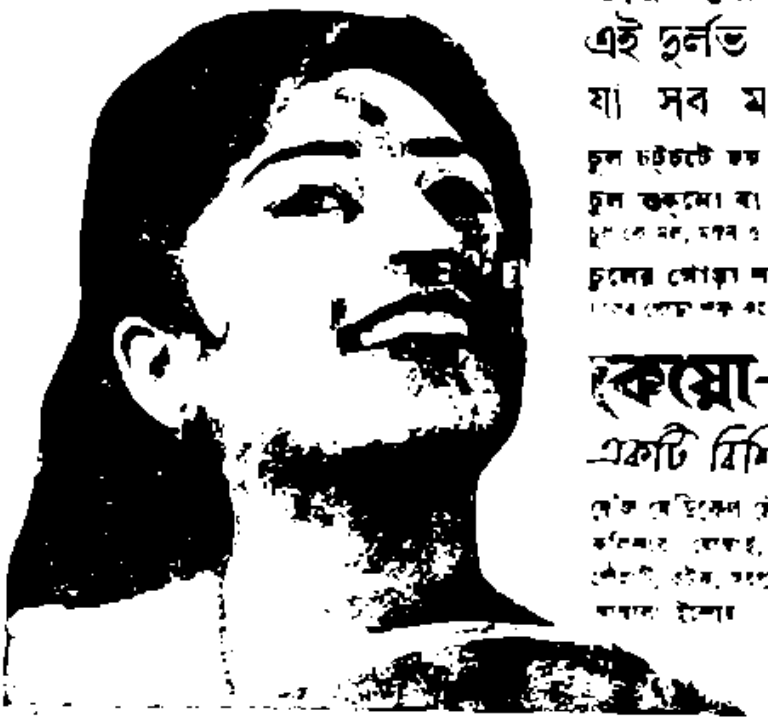

চুল চট্‌চটে হয় না বা ধুলো-বালি আকর্ষণ করে

চুল রুক্ষ বা রুক্ষ দেখায় না—সহজেই চুল বেঁধে মনের মতন করা যায়

চুলের গোড়া শক্ত করে—টাক ও পাকিতে রোধ করে চুল ঘন ও কালো রাখে।

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

কেয়ো কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, লাহোর,
সেকেন্দ্রাবাদ, পাটনা, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গালোর,
আমেদাবাদ ইন্দোর

Keya

PK-CKMC/6.19

নিউট্রন রিলায়েন্স—টি. এন. টি—৮৫৪
পৃথিবীর যে কোন ষ্টেশনের বেতার অনুষ্ঠান শুনুন।
৯ ট্রানজিস্টর এবং ডায়ডস্। ৩ ব্যাণ্ড,
৫ পুশ বাটন। টেবিল মডেল

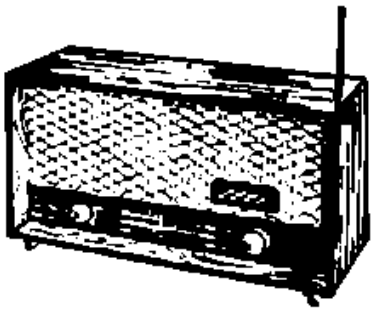

অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুমধুর স্বর।
মূল্য—৩২৮৲ (উৎপাদন কর নহ), অন্যান্য কর স্বতন্ত্র।
এ ছাড়া মডেল :
ডেনাস—৩১৫৲, এপোলো—৩১৫৲, জিপসী—৩৪০৲

Neutron

পরিবেশক :
নান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১

ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ
সৌন্দর্য্যের
প্রকাশে
কুসুম
পেন্সী

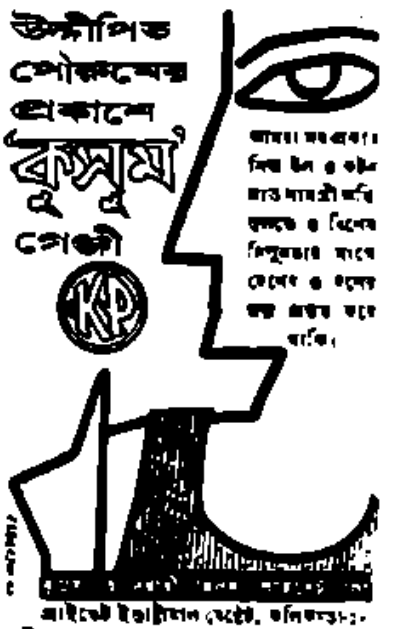

KP

আমরা ব্যবহার করি
নিম্ন উল্লিখিত ৩টি
প্রসাধন সামগ্রী আমাদের
ত্বককে ও বিশেষ
লিপষ্টিকের রংকে
ফোটাতে ও গভীর
করে প্রকাশ করে
থাকে।

আইডেল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট, কলিকাতা-১৩

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ. কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

Regd. No. C3643

লক্ষ্মী ঘি

একটি সুবিখ্যাত নাম

বিশুদ্ধতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

-8 JUL '966

[illegible]-পঞ্চাশত্তম বর্ষ ।
দ্বাদশ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ । ১৩৭৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পরিচয়

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কাশ্মীর রণরঙ্গ
[illegible]
মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের প্রতিক্রিয়া
চাষির ছবিতে সোফিয়া লরেন
গুপ্তচর কাহিনী
ব্যাপার যা চলেছে
চলতি দুনিয়া
বিশ্ব-সাহিত্য
অন্তরাঙ্গে

গল্প-ভারতী আষাঢ়ে ২২ বছরে পড়বে

নতুন বছর থেকে বহু নতুন ধরণের সময়োপযোগী রচনা, আধুনিক জীবনধর্মী গল্প, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের একটি নূতন ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রতি মাসে একটি করে উপন্যাসোপম বড় গল্প, একটি মূল্যবান প্রবন্ধ, অনেক অভিনব ফীচার, রম্য রচনা পরিবেশন করা হবে।

এই সংখ্যা থেকেই চারটি নতুন আকর্ষণীয় বিভাগ শুরু হবে :—

নাটমঞ্চ :—এই বিভাগে নাট্যবিশারদ গুণীজনের নাট্যচিন্তা, নাটকের কথা, বাংলা ও বাংলার বাহিরে যে সব নাট্য সংস্থা নিয়মিত নাট্যচর্চায় নিযুক্ত তাঁদের কার্যকলাপের পরিচিতি ও বিশ্বের নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা।

ছায়াবাণী :—বিশ্বের ছায়াচিত্র জগতের অভিনব ও আকর্ষণীয় সচিত্র সংবাদ ও কাহিনী।

অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ :—অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা।

আপনি পড়েছেন কি ? দেশী ও বিদেশী পুস্তকের সুষ্ঠু সমালোচনা।

তা ভিন্ন নিয়মিত ফীচার :—

গুপ্তচর কাহিনী, বিশ্বসাহিত্য, ব্যাপার যা চলছে, মেয়ে মজলিশ, চলতি দুনিয়া, অন্তরীক্ষে, অশান্ত পৃথিবী, শেষ মুহূর্ত, পুরাতন পাতা, আজও যা ভুলিনি, খেলাধূলা, বিচিত্রা, বিশ্ববাতায়ন (চিত্রে বিশ্বের সংবাদ), এই প্রথম প্রভৃতি।

নতুন বছর থেকে গল্প-ভারতীকে আরো আকর্ষণীয় ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা হবে—ভারতের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে যা কখনও সম্ভব হয়নি।

বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প-ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প-ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প-ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প-ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প-ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে।

গল্প-ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প-ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প-ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প-ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প-ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হোন

বার্ষিক চাঁদা—ভারতে সডাক—১৫৲

ভারতের বাহিরে—সডাক—২৩৲

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-০১৯৪ গ্রাম : গল্প-কথা

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, JUNE 1966

সম্পাদক : কালিদাস নাগ
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক চাঁদা—সডাক পনের টাকা

সুখী মা

হ্যাঁ, উনি আজ খুব খুশী আর গর্বিত। আজ হবেন নাই বা কেন—ওঁর ছেলে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। তবে ওঁর সঞ্চয়কে ধন্যবাদ। তিনি জানেন ওঁর একমাত্র ছেলের পড়াশুনার জন্য কোন দিন ভাবতে হবেনা, কারণ ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিওতে ওঁর সেভিংস একাউন্ট আছে।

ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া যতসামান্য ব্যাপার। কিন্তু এর জন্য আপনাকে ভাবতে হবেনা যদি আপনি সময় মত সঞ্চয় করতে শুরু করেন। আর সঞ্চয় করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিওতে একটি সেভিংস একাউন্ট খোলা। আজ ৫১ টাকা দিয়ে আপনি আজই একটা সেভিংস একাউন্ট খুলতে পারেন। এই ব্যাঙ্কের মহিলা সহকারীরা চিরন্তন জাপানী রীতিতে গৃহিণী-দের অভ্যর্থনা জানাতে সব সময় প্রস্তুত।

ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও আপনার সঞ্চয় সুরক্ষা করে।

দি
ব্যাঙ্ক অফ্ টোকিও

(বৈদেশিক ব্যাঙ্কিং জাপানে সমিতিবদ্ধ)

২, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা-১ • ফোন: ২২-০৯২১-২৪

Kalpana.BT-2

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের শিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রচুর হাওয়া নিখুঁত স্টাইল

G.E.C. এভারেস্ট

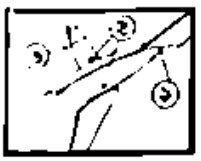

১ ব্লেডগুলি সঠিক মাপে বসানো
২ বেয়ারিংগুলি একই খোপে থাকে
—ঘূর্ণায়মান অংশগুলি শক্তভাবে আঁটা
৩ ঝুলাবার দণ্ড খুবই মজবুত
৪ নিখুঁত ও নিরবচ্ছিন্ন গতি

G.E.C.
আপনার
গ্যারান্টি

যে কয়েকটি নামকরা চুলের তেল আছে
তার মধ্যে কেয়ো-কার্পিন তেলেই এই দুর্লভ গুণ গুলি বর্ত্তমান যা সব মহিলাদেরই পছন্দ

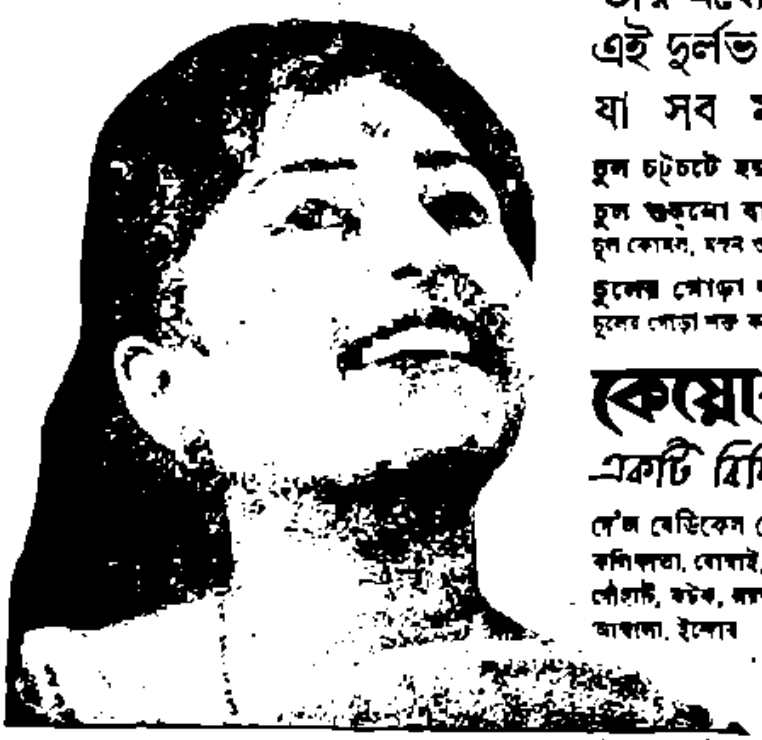

চুল চট্‌চটে হয় না বা শুধু কেয়োকার্পিনেই সম্ভব
চুল শুকনো বা রুক্ষ দেখায় না-সারাদিন
চুল কোমল, মসৃণ ও পরিপাটি থাকে
চুলের গোড়া শক্ত করে-খুশকি ও পাকার রোধে
চুলের গোড়া শক্ত করে।

কেয়ো-কার্পিন

একটি রিমিষ্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা,
গৌহাটি, কটক, নাগপুর, কানপুর, হায়দ্রাবাদ,
আহমেদাবাদ, ইন্দোর

Dey's

PK-DMK/5-18

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটি ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল
কেমিক্যালের

ক্যাম্ফারাইডিন
হেয়ার অয়েল

ক্যাম্ফারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
চুল বাড়ে—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে।
এই কেশ তৈলে ক্যাম্ফারাইডিনের
এসেন্স থাকায় চুলের স্বাস্থ্য
বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ১০৯৫

গুপ্তচর কাহিনী—

কেঁচো খুঁড়তে সাপ—সুপর্ণ রায় ১১১২

কোম্পানী আমলের কাহিনী—

দারোগার বিবৃতি : শতবর্ষ পূর্বের কথা—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১১৫

বিদেশী সাহিত্য—

স্কাল স্কেরী—মূল : জন বুচান : অনুবাদ—গৌরীশঙ্কর দে ১১১৯

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রবমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেস সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই দেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; মেসার্স—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চীনাঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এস, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ নিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল কাবরদল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ ধরারাম ক্ষেত্রী; জয়কৃষ্ণ অগ্রোয়া; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—যে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

এই সংখ্যায়

এই প্রথম—

মানুষ তিনি—সুমিতা সেনগুপ্তা ১১৫১

চলতি দুনিয়া— ১১৫৬

মেয়ে মজলিশ—

কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী—মাতা পাতড়াশ্র ১১৪০

তন্বী দেহের সন্ধানে—সুরঞ্জনা সেন ১১৯২

মায়ের রোমাঞ্চকর রূপান্তর—নীলিমা চে ১১৯৭

শুধু মায়ের কথা বলেও ফুরোয়না—ছায়া দেবী ১১৪৭

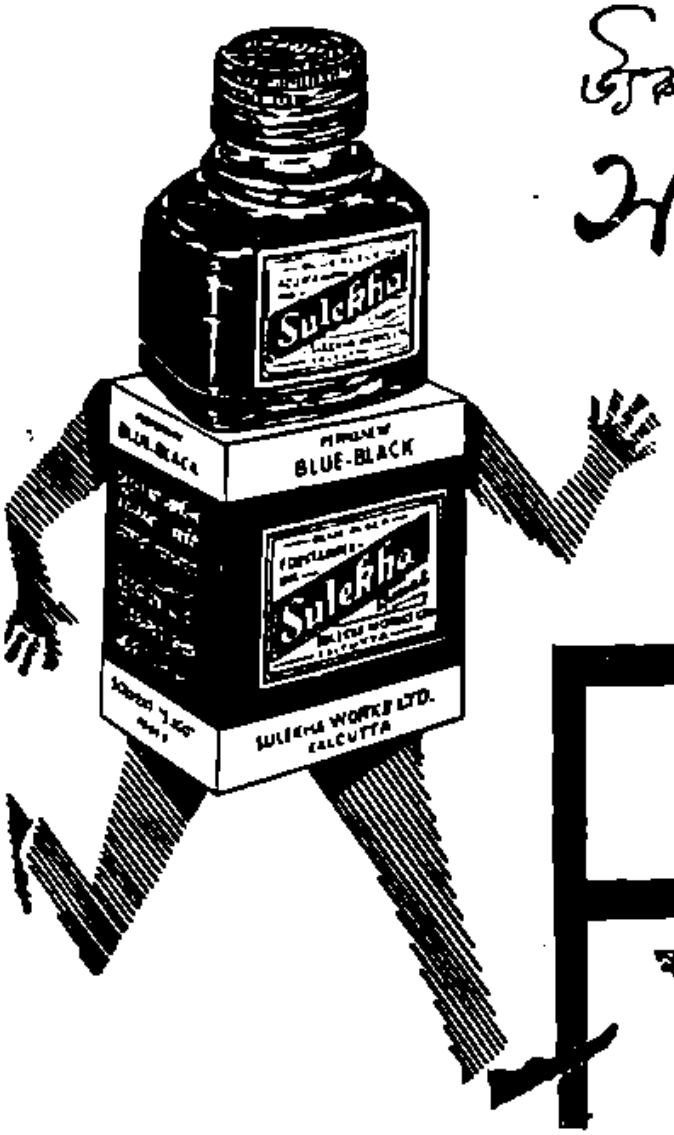

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের :

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০, ৫১২ এম.এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

SWD/DM—13

এই সংখ্যায়

মন্ত্র শক্তি—উষ্টর মতিলাল দাশ ১১৫০

ভারতের জাতীয় সংহতি ও স্যার আশুতোষ—[illegible] ১১১৫

অশান্ত পৃথিবী—নলিনীরঞ্জন মিত্র ১১৫৯

মায়াপুরী ডিজনেল্যাণ্ড—নীলাদ্রি সোম ১১৬২

পাঠক পাঠিকার কলম ১১৬৫

চার্লির ছবিতে সোফিয়া লোরেন ১১৬৬

খেলাধূলা ১১৬৮

ব্যাপার যা চলছে ১১৭১

টাকার মূল্য হ্রাস ও তার প্রতিক্রিয়া

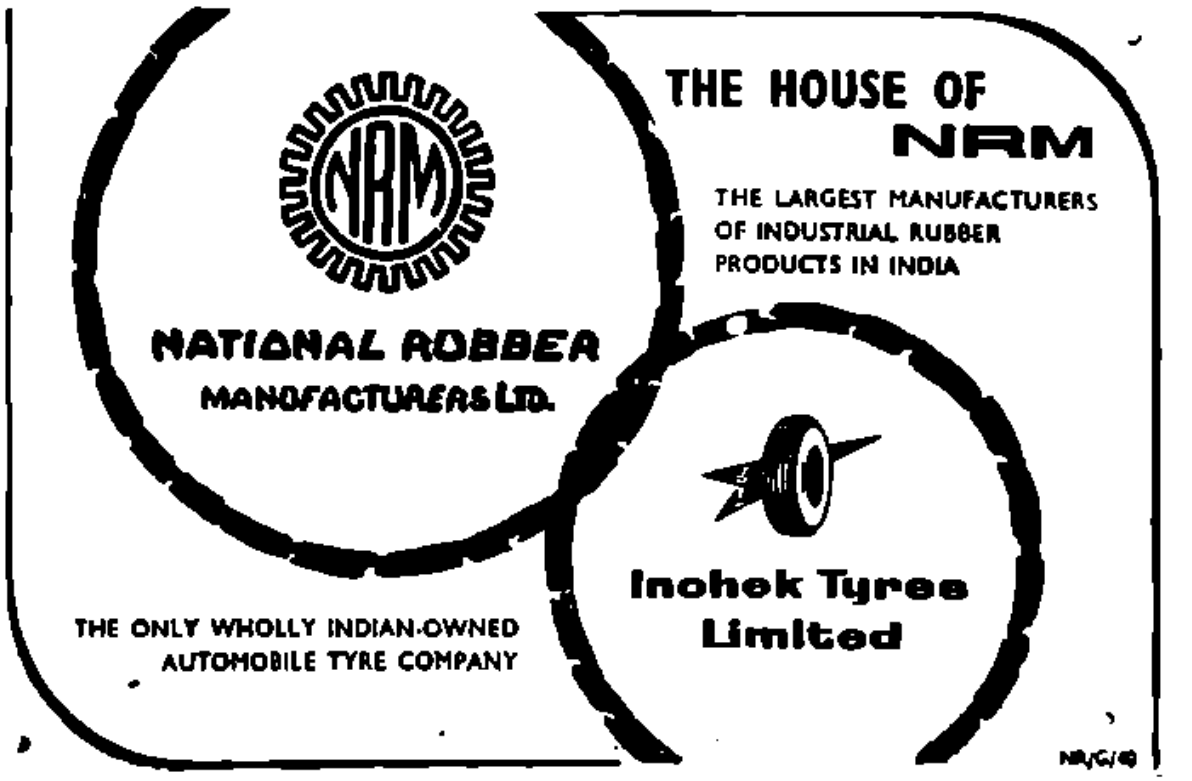

গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয়

ব্যথাবেদনা, ব্যথা ও বেদনা, দন্তিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে নিরাপদ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের জন্য এলসিড। এলসিড একটি কার্বজনী ঔষধের বিশেষ তৈরী যা ব্যথার উপশম দেয়, অস্বস্তি কমায় এবং অবসন্নতা দূর করে স্ফূর্তি আনে। এলসিড মাত্র দুটি বড়িতেই কাজ দেয়।

এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান – সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক এন্টিসেপ্টিক অয়েন্টমেন্ট। ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগে না।

■ এলসিড ■ এ্যান্টল ■ এ্যাড্রিমেন্ট

হাতের কাছে রাখুন

• বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

BBL

ওকে হাতে-নাতে ধরুন !
ও জন-সাধারণের শত্রু !

বিপদ শৃঙ্খল হ'ল জরুরী ব্যবস্থা; একমাত্র অপরিহার্য্য কারণেই ব্যবহারের জন্য—খেয়ালখুশি মতো বা তুচ্ছ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়।

বিপদ শৃঙ্খলের ব্যবহারে দেশের চলাচল ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায় এবং প্রায়ই সামগ্রিকভাবে বিপুল ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বিপদ শৃঙ্খলের অপব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকা শুধু নয়; জাতির স্বার্থে, এই অপব্যবহাররোধে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য প্রত্যেকে সক্রিয় হোন।

পূর্ব রেলওয়ে

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

UNIVERSITY.

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়

কাশ্মীর রণরঙ্গ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ বাইশ ॥

পাকিস্তানের কবর

অপারেশনের পেছনে পুরো দলেই আমার অন্তর্দহন আরম্ভ হয়। তার কারণ, এটা ঘরে ফেরার সময় অথচ ঐকান্তিক আগ্রহে ঘর বাঁধতে গিয়েও সেটা আমার কোনদিনই হ'য়ে উঠল না। আসলে ঘরটা বোধহয় আমার জন্যে নয়। আমি কি? আজকের সমাজে আমি একটা অপ্রতিহত অসহযোগ আন্দোলন। নিয়মটা আমার কাছে আদতের নির্মোক। নির্বীর মানুষরাই অনবরত নিয়মের আকিং খায়। মনে পড়ে গেল, আমার প্রথম চাকরি জীবনে একদল শিল্পীকে ষ্টুডিও থেকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তারা আমাকে "এখনকার প্রচলিত নিয়ম"-এর হুমকি দিয়েছিল ব'লে। সেই নিয়ে অ্যাসেমব্লিতে প্রশ্নও উঠেছিল। তখন প্রধান অধিকর্তা স্যাণ্ডমেন ফিলডেন্ আমায় বলেছিলেন, সমাজ আর সরকার দুটোই পাথরের প্রাচীর। বিদ্রোহের মাথা ঠুকলে, মাথাটাই যাবে, দেওয়ালটার কিছুই হবে না। দুটোই ভাই। মাথাটাই সারা জীবন ঠুকে মরলাম। সরকারের কিছু হয়নি, সমাজেরও না।

তারপর আমি মস্ত একটা পায়ে চলা মানুষ। হিসেব ক'রে দেখলে আন্দেকের ওপর কাটিয়ে দিয়েছি পথে পথে। বাকিটাও পায়ে পায়েই ঘুইয়ে দেব। অনন্ত পথচলা কবে কেন আর কেমন ক'রে আরম্ভ হল আজ অনেক ভাবলেও অস্পষ্টও মনে পড়ে না। জীবনের প্রথম পদক্ষেপে মনে ধরেছিল কোন একদিন আমার সারা জগৎ অনুরণন প্রাণ-স্পন্দনে মেতে উঠবে। যা দেখছি, যা শুনছি, যা চাইছি তাইই শুধু নয়, যা কিছু আমার গভীরতম অবচেতনায়, আশা আর আকাঙ্ক্ষার অন্ধকারে লুকিয়ে আছে তাও। বস্তুতান্ত্রিক জগতে যারা বাস করে তারা বাসি ফুলের মতন জিজ্ঞাসাহীন, একটু আঘাতেই ঝরে পড়ে। তাই ও জগতটা

কোন দিনই আমার মনে হয়নি। যাঁরা বড় কিছুর লোভে বৈরাগ্যের সাধনা করেন, আমার কাছে তাঁরাও অবান্তর। আমি মাস্তখানের পথ নিতে গিয়েই বোধহয় বার বার মার খেয়েছি। আজকের দুনিয়ায় আনন্দে বাঁচতে গেলে হয় মানুষকে হ'তে হয় পুরোপুরি সাধু আর নয় নির্লজ্জ, নির্মম শয়তান। শেষের সংখ্যাটি বেশী। সৌন্দর্য্য, মন, ভালোবাসা এসবই পাগলের প্রলাপ। পাহাড়ের শিখর, অন্ধকার বিপদ, যুদ্ধের আলোড়ন এসব আমার ভালো লাগে অথচ আর্ত, দীন দরিদ্রের অন্তে চোখে জল আসে। রায়টের তরা দুপুরে আমি বুলেটের সামনে বুক পেতেছি, আবার দুদুরের ক'না শুনে ঘরকে দাঁড়িয়েওছি। দুটোই সমানভাবে। ঘর যেমন নিঃশেষ আন্তরিকতায় আঁকড়েও ধরেছি তেমনি অকরুণ অবজ্ঞায় সেটা ছেড়েও এসেছি। যখন ছিলাম, সামনে তাকাইনি; যখন ছেড়েছি পেছনে তাকাইনি। যাদের এক মুহূর্ত্ত না দেখলে আমার চলতো না, তাদের বছরের পর বছর দেখিনা। নিজেকে নিঃস্ব ক'রে দান করার আনন্দও যেমন আমার, যার কাছে নিজেকে দান ক'রেছি তাকেই আবার নিশ্চিহ্ন ক'রে জীবন থেকে মুছে ফেলাও তেমনি আমারই। এই যে পরস্পর বিরোধী মন ও মতের সমন্বয় আমার কাছাকাছি কোন মানুষই এটা কখন বোঝেনি। তার জন্য আমার দুঃখ নেই; তাদের জন্য আমার দয়া আছে।

আমার আরও একটা বড় অপরাধ, আমি নিজের দিকে নির্দয় ভাবে তাকাতে পারি। সেটা পারি কারণ অন্যের দিকেও সেই ভাবেই তাকাই। কাল আমি কাশ্মালের কাছে হেরেছি। আজ আমি রুকাম্বাকে জয় ক'রে এসেছি। এ দুটোই আমার কাছে সমান গর্ব্বের। এই যে নিজের দিকে না তাকিয়ে আর ভালো মন্দের বিচারে ওজন না ক'রে দুটোকেই সমানভাবে গ্রহণ করা এটাও কেউ বোঝে না বোধহয় আজকের জীবনে এটা অচল ব'লে। এটা অচল নয়, আজকের জীবনটাই অচল। আসলে আমরা কেউ জীবিত নই, সবাই জড় পদার্থ।

কারণ, এটা হল জড়তার যুগ। এগিও না। সব সময় জানাও আর নিজেকে জাহির কর। কেবল বল 'আমি'। বিরাট আমি। বিশাল আমি। ব্যাপ্ত আমি। আর কিছু চাই না, ব্যক্তিগত মতামত না, অনুভূতি না, ভালো মন্দের মূল্যবোধ না। ধরা নয়, ছাড়া নয়, মমতা, কৃপা, ভালোবাসা কিছু নয়। শুধু থাকবে টাকা, যেমন ক'রে পারো আনো। আর থাকবে নাম, যেখান থেকে পারো কেনো। যেটা সহজে বোঝা যায় সেটা সাধারণ, যাকে সহজে জানা যায় সে অপদার্থ, যা সহজে পাওয়া যায় সেটা মূল্যহীন। এটা হল দুর্বোধ্য শিল্পের যুগ। ব্লীচিত বিজ্ঞাপনের যুগ, দুরুহ কবিতার যুগ।

কখন যে বাড়ী এসে পড়েছি টের পাইনি। বুকলাম যখন ভাইরাজী গেট খুলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে:

"শুনেছেন?"

"কি?"

"পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। মাহির মতন ট্যাঙ্ক আসছে।"

"কোথায়?"

"হাম্বর-এ" বলে উনি আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বললেন:

"শিগ্‌গীর চলুন।"

"কোথায় ?"

"খাওয়ার টেবিলে। আলোচনা করতে হবে। অনেক কিছু ভাববার আছে।"

গোল টেবিল ইতিমধ্যেই বসে গেছে। বিচের তলার বাবু এবং মেয়াই বাড়ীর দুজন; বলরাজ, মেহরুর সাহেবের ছেলে আমিন সাহেব আর পুরোহস্তর অবসরপ্রাপ্ত চল বুড়ো চাকর। বলাবাহুল্য, প্রধান বক্তা বলরাজ। জানা গেল, আক্রমণ শুরু হয়েছে ভোর রাতে আর পাকিস্তানের পুরো আর্মার্ড ডিভিশন এসে পড়েছে। প্রথম আক্রমণে এসেছে পঁচাশিটা আর পেছনে আছে নাকি ষোলশো। ছামব অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভের প্রথম লক্ষ্য আখনুর, অর্থাৎ আর পাঠানকোট এই অঞ্চলটি অধিকার করা আর প্রধান উদ্দেশ্য কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। পাঠানকোট থেকে যে রাস্তাটা জম্মু হ'য়ে কাশ্মীর গেছে, সেই রাস্তাটা কেটে দিতে পারলে সৈন্য সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে যায় আর সাগ্রাই যাওয়াও সম্ভব নয়। এই রাস্তাটা কোন কোন জায়গায় ভারত-পাক সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইলেরও কম। অথচ, আজ আঠারো বছরের মধ্যেও অন্য একটা রাস্তা পুরোপুরি তৈরি হলনা। খবরে আরও জানা গেল যে, যেখান থেকে আক্রমণ শুরু করা হ'য়েছে সেখান থেকে জম্মু আখনুর তিরিশ মাইল। প্যাটন ট্যাঙ্কের গতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল। পথে যদি বাধাও পায় কিছু তাহলেও, ঐ প্রায় পঞ্চাশটন চলন্ত লৌহ বিভীষিকার আসতে লাগবে খুব বেশী হ'লে চার ঘণ্টা। মার্কিন যুদ্ধ বিশারদদের মতে ওটা অভেদ্য, অজেয়। গত মহাযুদ্ধের প্রায় শেষাশেষি ওটা তৈরি হয়। রাশিয়া তখন মৈত্রী দলে আর জার্মানীর দম ফুরিয়ে গেছে অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে ওর চরমত পরীক্ষা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা নিজে নানান ভাবে পরীক্ষা ক'রে প্রচার ক'রেছিল যে, ওটা অজেয় এবং সারা পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রায় সব দেশেই ওরা ওদের ঐ অজেয় ট্যাঙ্ক মুঠো মুঠো ছড়িয়েছে। আন্দাজ করা যায় যে ওদের দৌলতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার ট্যাঙ্ক আমেরিকার বাইরে দেওয়া আছে। এই সব তথ্য শোনার পর আমাদের গোল টেবিলে এইটাই প্রায় স্থির হ'য়ে গেল যে কাশ্মীর আর আমাদের রইলো না।

বুড়ো চাকরটা দুই হাঁটুর ওপর থুৎনি রেখে অবাক জল পান করছিল হতবাক হ'য়ে। এই সব প্যাটন, সিরাটো আর স্যাটো কিছুই ওর বোঝবার কথা নয়। আমাদের ব্যাপ্ত নিরাশায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে ও একটা ছোট্ট মন্তব্য করল,

"ভগবান আছেন।"

ভগবান আছেন কিনা আমার জানা নেই কিন্তু কংগ্রেসের ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে মানুষ আছে তা প্রমাণ ক'রে দিল আমাদের জোয়ানরা। প্রথম আক্রমণে আমাদের সৈন্যরা পেছিয়ে আসতে বাধ্য হল প্রায় পনেরো মাইল। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ও অঞ্চলে প্যাটন আসবে তা আন্দাজ করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ আমুর ওগুলো এনেছিলেন রাতারাতি; সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের প্রস্তুতি ছিল শুধু পাঠানকোট রাস্তা আগলাবার—যেখানে সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল। তাছাড়া, তিরিশ মাইল পথ এসে পাঁচ মাইল আগলাবোর চেয়ে পাঁচ মাইল পথ গিয়ে তিরিশ মাইল আটকানো অনেক সোজা এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

এই যুদ্ধে আমুরের হাতে টেক্কা ছিল সাড়ে তিনখানা: প্যাটন ট্যাঙ্ক, সেবার জেট, চীনের বন্ধুত্ব আর কাশ্মীরে ভারতের ব্যস্ততা। প্ল্যানও ছিল সাড়ে তিনটে: (১) প্যাটন দিয়ে সাপ্লাই রুট

বন্ধ করে কাশ্মীর অবরোধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সিলহিট, বালটিস্তান আর লাদাকের মধ্যে দিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে ত্রস্কিলা আর লোজিলা পাস আক্রমণ করা। বিকল্প যুদ্ধবিদ হিসেবে উনি জানতেন যে কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যদি সাড়াই না আসে তাহ'লে ঐ পাহাড়ের ওপর পাকিস্তান সৈন্যকে আটকে রাখা ভারতের পক্ষে দশ পনেরো দিনের বেশী সম্ভব নয়। এই ভাবে যেহ যদি পাওয়া যায় তাহ'লে কাশ্মীর পুরোপুরি বিনা খেলা হয়।] (২) দেবার মেট দিয়ে বিয়াস নদীর ওপর ব্রীজগুলো উড়িয়ে দিয়ে আখনুর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত দখল করে বিয়াসের পারে এসে বসা। (৩) ওদিক থেকে চীনকে দিয়ে ভারত আক্রমণ এবং (৪) দিল্লীর ওপর অনবরত ইঙ্গ-আমেরিকান চাপ দেওয়া। এ সবই জহরলালের জীবিত কালেও সম্ভব ছিল কিন্তু তখন আয়ুব কিছুই করেন নি কারণ জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে আয়ুবের মনে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তিনি জানতেন জহরলালের একটা ডাকে সারা দেশ এক হ'য়ে উঠে দাঁড়াবে।

পাঁচ ফিট আর (বোধহয়) পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের ঐ ছোট্ট খাটো মানুষটি যখন গদিতে বসলেন আয়ুব তখন হাতে হাত ঘষে 'কাচ' পরীক্ষার নেমে পড়লেন আমেরিকা এবং বৃটেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে, লাল বাহাদুরের বুকের জোর যাচাই করবার জন্যে। ওখানে পাকিস্তানের লোভনীয় কিছু নেই, ওটা ছিল পুরোপুরি লালবাহাদুরের বল পরীক্ষা। আগেই ঠিক ছিল পরীক্ষা শেষ হ'লেই বৃটেন হাত বাড়িয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। প্যাটনের ওটা ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অভিযান—দুটো কারণে—প্রথমত পরখ ক'রে দেখে নেওয়া মালটা কি; আর দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বুঝে নেওয়া দরকার ছিল সে ভারতের বিরুদ্ধে ওগুলো ব্যবহার করলে ভারত ঠিক কি করবে। মোটামুটি দেখা গেল লালবাহাদুর গুটিসুটি হ'য়ে যুদ্ধটা থামাবার চেষ্টা করছেন, যুদ্ধ দিয়ে অথাব দিচ্ছেনা আরও দেখা গেল, প্যাটন একেবারে অচেল, দরকার হ'লে সোজা দিল্লি চালিয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে এবং প্যাটন ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই ভারত খেমে গেল। আয়ুব মহা আনন্দে গোঁকে তা দিলেন।

অনুপাত যতই বড় হক সোজাসুজি সীমান্ত পেরিয়ে আসা আজকের দিনে পাকিস্তানের পক্ষেও সম্ভব নয়। অতএব আয়ুব পাঠালেন হানাদার। যদি ওতেই কাজ হ'য়ে যায় তো মন্দ কি? আর যদি কোন কারণে না হয় তাহ'লে ঐ গোলাবারুদের মধ্যে প্যাটন চালিয়ে দিলে ভারত হাঁ হাঁ করার আগেই পাকিস্তানের কাজ হাসিল হ'য়ে যাবে! এ বিষয় ওঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভারত যে মনে প্রাণে যুদ্ধ চায়না তা ওঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানেনা। জহরলাল ত' সেই সাতচল্লিশ থেকে কম ক'রে সাতশো বার সেই কথাই প্রমান ক'র গেছেন। তাই আয়ুবের একটা আন্দাজ ছিল যে ভারত কোপ্‌নী বাঁধতে বাঁধতে উনি বেল্লাটা কতে ক'রে ফেলবেন।

প্রথমদিন হলও তাই। প্যাটন পৌঁছে গেল পুরো পনেরো মাইল ভেতরে—অমৃত পনেরো মাইলের মধ্যে। দ্বিতীয় দিন এলো কম—ছ মাইল। ব্যস্ ঐ খানেই আটকালো। কি ক'রে আটকালো? সেটা পুরোপুরি আমাদের জোয়ানদের আত্মবিশ্বাস আর সারা পৃথিবীর বিস্ময়। জোয়ান আমাদের প্যাটন আটকালো—সারমান দিয়ে নয়, সেঞ্চুরিয়ান দিয়েও নয়—জীপ দিয়ে আর বুক দিয়ে।

প্যাটন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে ওটা প্রায় ন ইঞ্চি মোটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি; ওতে আছে চারটে কামান, ভিতরে থাকে চারজন লোক আর বাইরেটা এমনভাবে তৈরি যে গুলি লাগলে

সেটা শিহরণে যাবেই। শত্রুকে দেখে যেমন বোঝা যায়না তার দেহের দুর্বল জায়গা কোনখানে, ওরও তেমনি কিছু বুঝি থাকলে মানুষ পারেনা কি? জোয়ানরা দেখে নিল কোথায় ওর দুর্বলতা, আর বুঝে নিল, যে প্যাটনের একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গিয়ে যদি সেই জায়গায় আক্রমণ চালানো যায় তাহলে প্যাটনকে অবশ করা সহজ এবং অন্তও করা যায়। প্রথম দিনে তাই শোধ মরল অনেক কিন্তু লক্ষ্য ঠিক হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে সেটা পরীক্ষাও হ'য়ে গেল। এবং তৃতীয় দিন থেকে সেটা হল পুরোপুরি চালু।

কি ক'রে কি হয় তা আমার জানার কথা নয়, যা শুনেছি তাই বলতে পারি। সেটাও কম কিছু নয়। পুরোণো ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা হল দেখে কামান দাগার। প্যাটনের আধুনিকতম ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখার দরকার হয়না। সে কাজটা করে দেয় যন্ত্র। অপারেটর কল টিপে কটো ইলেকট্রিক ওয়েভস্ চালিয়ে দেয়। সেই ওয়েভ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসে সামনে যে ইস্পাত পায় তার গায়ে লেগে—যে ভাবে বাদুড়, চামচিকে জিনিষ দেখে, অথবা সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সাধারণতঃ ট্যাঙ্কের সামনে থাকে ইস্পাতের বড়সড় ট্যাঙ্ক। কাজেই ইস্পাতের অভাব ঘটে না আর প্রতিধ্বনিও খুব স্পষ্ট ভাবে দূরত্বটা নির্ণয় ক'রে দেয়। সেই অনুযায়ী মেশিনের কাঁটা ঘুরিয়ে কামান চালালেই কেল্লা ফতে। চোখে দেখা আর দরকারই হয়না।

একটা সাবমেন কি সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের তুলনায় সামান্য একটু জীপে আর কতটুকু ইস্পাত? যে যন্ত্র ট্যাঙ্কের গায়ে লেগে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি মাপার জন্য তৈরি সে যন্ত্রে জীপের সামান্য ইস্পাতের প্রতিধ্বনি মাপাই যাবে না। অতএব জোয়ানরা জীপে ক'রে প্যাটন মারার সহজ উপায়টা ঠিক ক'রে নিল। ওরা জীপ নিয়ে থাকত, বড় গাছের আড়ালে কি গাছের এ ধারে আর সীমানার মধ্যে এসেই সাবড়ে দিতো প্যাটনের দুর্বল জায়গায় গুলি চালিয়ে।

আবদুল হামিদ আরও ভয়ঙ্কর। ও বলল, জীপে তবু সামান্য হলেও ইস্পাত আছে, মানুষের গায়ে তাও নেই। অতএব সোজাসুজি সামনে গিয়ে আক্রমণ করায় ক্ষতি কি? ও এই ভাবেই নষ্ট করতে পেরেছিল তিনটে প্যাটন।

এইভাবে প্যাটনের একটা আক্রমণ আটকানো যায়, দুটোও হয়ত যায় কিন্তু দিনের পর দিন অনন্তকাল ধ'রে যায়না। ওদিকে পাকিস্তান প্রথমতঃ ভাবতেই পারেনি যে প্যাটন আটকে যাবে। নষ্ট হবে সেতো স্বপ্নেরও অগোচর। ওরা পাঁচ তারিখে ঠিক করল, আরো শ খানেক প্যাটন পাঠাবে ছাম্বে আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যত জেট আছে সব এক সঙ্গে বোমা ভরে ভরে পাঠিয়ে আখনুর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত একদিনে ধ্বংস ক'রে দেবে। দলে দলে যদি দশটা ক'রেও সেবার জেট আসে তাহ'লে দুশোটা সেবার আট শো বোমা ফেলতে পারে চার ঘণ্টার মধ্যে আর তার ফলে মধ্যে একশোও যদি জেট যায় তো ক্ষতি কি? কাশ্মীর তো পাওয়া যাবেই। সেইটাই বড় কথা।

এদিকে ভারত ভাবছিল কি করবে? এই নতুন আক্রমণের গুপ্ত সংবাদ পেয়ে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার যখন সবই ঠিক তখন আমরাই বা আগে খুলবোনা কেন? যদি এমন কোন জায়গায় ওদের যা দেওয়া যায় যেখানে ওদের সর্বশক্তি ক'রে লড়তে হবে তাহ'লে পাকিস্তান নতুন ক'রে আর প্যাটন পাঠাবে না। তাই আগের ফ্রন্ট খুললে প্যাটন না হয় আটকানো যাবে কিন্তু আকাশ আক্রমণ? পাঁচই মার্চ রাতে সংবাদ পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডির দিক থেকে

শিয়ালকোট লাহোরের দিকে পুরো মালগাড়ী বোঝাই বোমা আসছে আক্রমণের জন্যে। তারই ওপর তো আকাশ আক্রমণ ? হাত ওটাকেই শেষ ক'রে যাতে নতুন স্টক খোলা পর্যন্ত ওদের আটকানো যায়। একবার যদি লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায় তাহ'লে ঘর সামলাতেই ওরা এতো ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে যে আক্রমণের কথা ভাবার সময়ই পাবে না। অতএব রাতারাতি ঐ পুরো ট্রেনটা হল জব্দ আর ছয়ই সকালে আমাদের সৈন্য গেল, লাহোর অভিমুখে। সেই কথাই আয়ুব সাহেব রহমাল্লাহ-র নাম ক'রে বললেন ছ' তারিখ বেলা একটায় ওঁর যুদ্ধ ঘোষণায়।

উনি যে কতটা বিচলিত হ'য়েছিলেন ভারতের এই পাল্টা আক্রমণে তা সেদিনই বোঝা গিয়েছিল ওঁর বেতার বক্তৃতায়। বেলা এগারোটায় ছিল ওঁর বলবার ঘোষিত সময়। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সেইটা পেছুতে পেছুতে গিয়ে পড়ল পাকিস্তান টাইম বেলটায়। সাণ্ডহার্স্টের মত ওঁদেরও ঐ যুদ্ধবিদ্ রহমাল্লাহর নাম ক'রে আরম্ভ করলেন ওঁর বক্তৃতা—যা তিনি ওঁর প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবারের বক্তৃতায় কখন করেননি এবং ওঁর গলার কাঁপুনি দেখে মনে হল বুঝি একগলা বরফের মধ্যে বসে কথা বলছেন। ঘড়ি ধ'রে উনি বললেন ঠিক সাড়ে ছ' মিনিট—যদিও সাধারণতঃ উনি বলে থাকেন দশ মিনিট। আমি সুদীর্ঘ পনেরো বছর রেডিওতে কাজ ক'রেছি বলেই বুঝলাম ওঁর মানসিক অবস্থার কথা। অত্যন্ত নার্ভাস না হ'লে কোন বক্তা কখন ওঁর মতন ৬ মিনিটের বক্তৃতায় চারবার আটকায় না, আর বার চারেক তোতলায় না। আমাদের গত যুদ্ধে নেতাদের মধ্যে যে কজন বলেছেন ওদিককার আয়ুব থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত, লালবাহাদুর শাস্ত্রীই ওঁদের সকলের চেয়ে সেরা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেতার বক্তা চার্চিলের চাইতে লালবাহাদুর কোন অংশে কম নন। ওঁর বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশী থাকে বিশ্বাসের দীপ্তি নিজের ওপর এবং যাঁদের বলছেন তাঁদের ওপর। আর থাকে সত্যের ঔজ্জ্বল্য। যা উনি বলতে চান না তা বলেনই না ; অন্যরা নানান রকম কথার জাল বিছিয়ে সত্যকে গোপন করেন বা ঘুলিয়ে দেন। আর থাকে নিষ্ঠা যার ফলে ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আমার আন্দাজ, যদি উনি কখন খুব বড় কোন পরাজয়ের কথাও বলেন তাহ'লেও ওঁর বেতার বক্তৃতা সমান ভাবেই শ্রুতি প্রাহ্য হবে।

ছ তারিখ সন্ধ্যার কাছা খুবা সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সৈন্য ইছাগোল ক্যানেল পেরিয়ে লাহোর অবরোধ ক'রেছে। এটার আভাষ পাওয়া গেল লাহোর রেডিও ষ্টেশন যখন তিনটের সময় বন্ধ হ'য়ে গেল আর ছটায় চালু হল নতুন ওয়েভ লেনথে। লাহোর ষ্টেশনে আমি কাজ ক'রেছি আর ওর ট্রান্সমিটার কোথায় আছে আমার জানা। বোঝা গেল আমাদের এক অভিযানের ধাক্কায় লাহোর রেডিও ছিটকে পড়েছে রাওলপিণ্ডির পথে। মুখে মুখে সংবাদ আসছে নানান রকম। কেউ বলছে বুকির পতন হ'য়েছে, কেউ বলছে ইছাগোল পার হ'য়ে গেছি। কেউ বলছে লরেন্স গার্ডেন পৌঁছে গিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধেই নেমে পড়েছি। সারা সন্ধ্যা কেটে গেল এই আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে। রাত্রে বলরাজ খবর আনল রফিক সাহেবের মারফৎ যে আমাদের সেনাবাহিনী সত্যিই ইছাগোলের ওপারে পৌঁছে গেছে সরাসরি লাহোরের সদর দরজায়। আরও জানালো যে সহরের ভেতরে ঢোকা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কারণটা যা বলল, তা প্রণিধানযোগ্য। সহর অধিকার করা মানে প্রথমতঃ পাকিস্তানের প্রাণোৎসর্গ প্রচেষ্টার মুখোমুখি দাঁড়ান। এটা একটা যে কোন দেশের, যে কোন সহরের প্রশ্ন নয়, পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রেসটিজের প্রশ্ন। এখানে পাকিস্তান লড়বে মরিয়া হ'য়ে। মাঠে, পাহাড়ে

যুদ্ধ এক জিনিষ, সহরের পথে গলিতে যুদ্ধ আর এক জিনিষ। ওরা বাড়ীতে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালাবে আর সামনে রাখবে যে-সামরিক জনতা। আমাদের তখন বাধ্য হ'য়ে যে-সামরিক জনতাকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিতে হবে, ফলে অসহায় নির্দোষ প্রাণহানী হবে। এতে আমাদের ক্ষয় ক'রে দু ডিভিশন সৈন্য ওখানে অথবা আটকে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যদি সহরটা দখল করাই হয় তাহলে সহরের পুরো ভার নিতে হবে আর কম ক'রে দশ বারো লক্ষ লোকের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ ওদের পরিখা যুদ্ধের পাল্টা অবাধ সামলাতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আজ অধিকার করলেও একদিন ছাড়তেই হবে। তাহ'লে কি দরকার এই অথবা দু'পক্ষের প্রাণহানীর? তবে, আনন্দে অধীর হ'য়েই ও বলল, লাহোর এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

আনন্দের সংবাদ, সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক পর মুহূর্তেই ওর মনটা যেন ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। ওর মনে পড়ে গেল ছয়মাস আগে ওর পাকিস্তান ভ্রমণের কথা—ওর ছেলেবেলাকার এলাহাবাদ ছড়ানো স্মৃতির উজাড় করা আনন্দ। সত্যি, ও বলল, বৃটেন এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে আমাদের দুই দেশকে জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছে। যার সঙ্গে সুখে দুঃখে মানুষ হয়েছি, আনন্দে হেসেছি, দুঃখে চোখের জলে ভেসেছি আজ তাকেই আমাকে মারতে হচ্ছে আজ তারই জীবন বিপন্ন করে আমরা আনন্দ করছি। যুদ্ধের রীতি পাল্টে দেওয়া উচিত। টেনিসের ডেভিস কাপের মতন উচিত সৈন্যদের মধ্যে থেকে বাছা বাছা কিছু লোক নিয়ে কম্পিটেশন করা—ওয়ার অলিম্পিক। যে দেশ সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তারাই পৃথিবী চালাবে পাঁচ বছর। আমরা টিকিট কিনে সৈন্য অলিম্পিক দেখব। আর না হয় করা উচিত আমুদে লালবাহাদুর, কলিগিন, উইলসন প্রমুখ নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—যেমন কে কত মিথ্যে কথা বলতে পারে (উইলসন), অথবা কে কত গালাগাল দিতে পারে (ভুট্টো), কিম্বা কে কত লম্বা চওড়া মিথ্যা হুমকি দিতে পারে (চাউ-এন-লাই) ইত্যাদি…

ঠাট্টা যতই করি যুদ্ধ যুদ্ধই। তিনদিন পর আবার কানে কানে খবর এলো আমাদের সৈন্য লাহোর সেক্টার থেকে স'রে আসতে বাধ্য হ'য়েছে। কারণটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যেটুকু শোনা গেছে তাতে জানা যায় যে আমাদের লাহোর অভিযান হ'য়েছিল তিন দিক থেকে আর ঠিক ছিল চক্রাকারে লাহোর অবরোধ করা হবে—তার মানে, ডাইনে আর বাঁয়ের যে সৈন্যদল তারা একটু বেশী এগুবে আর মাঝখানের দল কিছু কম। শোনা যায় মাঝখানের অধিনায়ক জেনারেল নিরঞ্জন প্রসাদ নাকি কিছুটা হামবড়াই করে অন্য দুদলকে পিছিয়ে রেখে সোজা এগিয়ে গেলেন লাহোর পর্যন্ত। ফলে, ওঁদের ডাইনে ও বাঁয়ে কোন আক্রমণ একবার ব্যবস্থা রইলনা আর ওরা হলেন বিপন্ন। ওঁদের ঘিরে ফেলেছিল পাকিস্তান দুদিক থেকে আর আমাদের নাকি হ'য়েছিল মারাত্মক অবস্থা যা না জানাই ভালো। একজন সেনানায়কের কিছুটা ভুলের জন্যে এবং বেশীটা অহংকারের কারণে অথবা আমাদের অনর্থক জোয়ান প্রাণ দিল।

এই ভুলেরই নাটক হল শিয়ালকোটে। ওখানেও হল তিন দিক থেকে আক্রমণ আর যে ভুলটা লাহোরে হয়েছিল অর্থাৎ মাঝখানের দল আগে ভাগে এগিয়ে যাওয়া সেইটাই আবার অনুষ্ঠিত হল, কেবল, এবার দল রীতিমত প্ল্যান করে আর ঠিক হল, পাল্টা আক্রমণ হ'লেই ওরা পিছিয়ে আসবে বেশ কয়েক মাইল। হলও তাই। পাল্টা আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাঝখানের দল এলো

পিছিয়ে আর বিস্ময়ের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পাকিস্তান সৈন্য তাদের ধাওয়া ক'রে এলো এগিয়ে বেশ কিছুটা। যখন ওরা এসেছে এই ভাবে তখন আমাদের ডাইনে বাঁয়ের দল ওদের ঘিরে ফেলে অবাধ দিল লাহোরের আর বন্দী করল, রক্তিমটা ব্যবহার উপযোগী প্যাটন।

এই যে প্যাটন ধরা হল শনিবার, এগুলো আবার উল্টে নিয়ে কাজে লাগাতে হ'লে চাই গোলাগুলি। অতএব, শনিবারই নমুনা গেল, আমাদের কারখানায়, আর তিন দিনের মধ্যে এলো একেবারে নতুন ধরণের গুলি। পরের বুধবার থেকে অর্থাৎ প্যাটন ধরার পাঁচদিনের মধ্যেই ওদেরই প্যাটন লাগানো হল ওদেরই সঙ্গে যুদ্ধে। এই অসাধ্য সাধন করে আমাদের দেশেরই সাধারণ মানুষ। পেন্টাগন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

স্থলপথে যখন এইভাবে চলেছে আমাদের বিজয় অভিযান তখন আকাশ পথে সৃষ্টি হ'চ্ছে আর এক বিস্ময়কর অধ্যায়। জেটের সঙ্গে ন্যাটের যুদ্ধ। সেবার জেট আমেরিকার প্রেসটিজ প্রডাক্সান আর ন্যাট বিলেতের বাতিল করা বিমান। এই ন্যাট যখন প্রথম বাজারে বের হল বিলেতে তখন ন্যাটো আর বৃটিশ বিমানবাহিনী এটা একবার পরীক্ষা ক'রেই যুদ্ধে অচল ব'লে নাকচ ক'রে দিল। সেই সময় ওখানকার বিমান বাহিনীতে টেস্ট পাইলট ছিলেন বিচারপতি এস. আর. দাসের ছেলে সুরঞ্জন দাস। উনি ভারতে ফিরে আসার পর যখন এ দেশে বিমান তৈরির কথা উঠল, তখন জোয়াহ্লান লীডার সুরঞ্জন দাস জোর দিয়ে বললেন 'ন্যাট'। কৃষ্ণমেনন তখন আত্মরক্ষা মন্ত্রী এবং তার কিছুকাল আগেই বিলেত থেকে কীপ কেনা নিয়ে বেশ একটা বড় ধরণের কেলেঙ্কারি ক'রে ব'সে আছেন। উনি বাধা দিলেন কিন্তু সুরঞ্জনের এক সুর—ন্যাট। বাতিল করা বিমান, বিলেত বেচল, এই সুবিধা ওরাও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরল, "নিতে হয় তো ছাট নাও সস্তায় পাবে।"

বাংলোরে আরম্ভ হল ন্যাট তৈরির কারখানা আর সুরঞ্জন দাস হলেন ওখানকার চীফ টেষ্ট পাইলট হ'য়ে। কামালের মতন উনিও ঘর ভাঙ্গানো মানুষ তাই প্রাণের মায়া অল্প। নানান রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে ন্যাট উনি বের করলেন তার চেহারা দেখে বিলেত হেসেই অস্থির। সুরঞ্জনও হাসলেন, তবে মনে মনে। উনি জানতেন যে কোন একদিন ওঁর ধারণার ধার পরীক্ষা করার সুযোগ আসবেই। যুদ্ধের জন্য এই বিমানকে তৈরি করার মূলে আছে ওঁর সাধনা আর দুজন অকুতোভয় সাহসী পাইলটের মৃত্যু—জোয়াহ্লান লীডার সুধাকরণ আর জোয়াহ্লান লীডার মুনীর। ওঁরাও ছিলেন সুরঞ্জনের মতনই ন্যাটের ভক্ত। ওরা ন্যাটের টেষ্টে প্রাণ দিলেন আর সুরঞ্জন করলেন সেই প্রাণত্যাগকে সার্থক সেবর জেটকে জয় ক'রে। এরও পেছনে আছে ছোট একটা তথ্যের বিরাট আবিষ্কার। সুরঞ্জন দাস জানতেন যে চল্লিশ হাজার ফিট ওপরে উঠতে সেবর জেটের লাগে ৬ মিনিট। উনি ন্যাটটাকে এমন ভাবে তৈরি করালেন যাতে এটা সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারে আর সময় লাগে চারমিনিট। জেটের সঙ্গে ন্যাটের যুদ্ধ পদ্ধতিটাও উনি জানিয়ে দিলেন। চলে যাও সেবার জেটের নিচে। মারবার শোট সামলাতে না পেরে সেবার জেট ডাইভ মেরে আসবেই নেমে আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা উঠে যাও ওপরে। সেবার জেট যতক্ষণে ডাইভ সামলে আবার উঠবে ওপরে ততক্ষণে ন্যাট ওপরে ডিগবাজি খেয়ে নেমে আসতে পারবে সেবার জেটের ঠিক ওপরে, ব্যস তা'হলেই সেবার জেট কাবু!

এমনি ধারা আরও একটা আমাদের নতুন বিমান, হল এইচ. এম. ২৪। এই বিমানটার ব্র

প্রিন্ট তৈরি করেছেন জার্মানীর ডঃ টাপ্ত। যেদিন প্রথম এটম বোমা ফাটানো হয় সেদিন টেট পাইলট কোয়ান্টন লীভার সুখি বললেন 'অচল, এ প্লেন আকাশে উঠবেই না জমি ছেড়ে।' সেই প্লেন নিয়েই সুরঞ্জন দাস উঠে গেলেন হিমালয়ের হাজার মিটার উঁচুতে।

বলছিলাম ন্যাটোর কথা। ন্যাটোর সঙ্গে সেয়াটো জোটের যুক্ত হয়ে অস্ত্রের দ্বিতীয় টেক্কাও বরবাদ হ'য়ে গেল। আরখানা তো আগেই গিয়েছিল কাশ্মীরে। রইল খালি একটা টেক্কা চীন বন্ধুদের। সে টেক্কাটাও যে কেন বরবাদ হল অর্থাৎ লম্বা চওড়া হুমকি দিয়েও চীন কেন তীব্রুর মতন ভেড়ার দাবীতে নেমে এলো এটা বুঝতে হ'লে হিমালয়ের ম্যাপ নিয়ে একটু আলোচনা ক'রে দু চারটে জিনিষ ভালো ক'রে জানা দরকার।

সবার আগে জানতে হবে কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের এই অসীম দুর্বলতা কেন? কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ সন্দেহ নেই কিন্তু ওটা আসল কারণ নয়। ওটা আসলে মস্ত এক সুবিধাজনক অজুহাত। তার বেশী নয়। রমণীয় জায়গা তাতেও কোন সন্দেহ নেই আর ইতিহাস পর্যটও প্রচুর আছে ঠিকই কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস থেকে এবং কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা থেকে আমরা অনস্বীকার্য ভাবেই জানি যে দেশটা অত্যন্ত গরীব এবং প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। কাশ্মীরিদের যদি পশুরও অধম ক'রে রাখা হয় তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা কিন্তু ওদের মুক্তির ভাবে মানুষের মতন বাঁচবার অধিকার এবং সুযোগ দিতে গেলেই দরকার অজস্র টাকা। অতএব ও দেশটা একটা মস্ত বড় দায়।

বৃটেন যতদিন এ দেশে ছিল ততদিন গরমের সময় ও দেশে হোমের হাওয়া খেতে গেলেও, দেশটা নিয়ে কখনই ওরা মাথা ঘামায়নি। জালিয়াতি ক'রে যখন ওরা ও দেশটা সাময়িক ভাবে অধিকার ক'রেছিল তখন আসল জায়গায় ওরা বেশ একটা বড় ধরণের ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছিল। সেটা শ্রীনগর নয়, জম্মু নয়, সেটা হল এশিয়ার অন্যতম কেন্দ্র গিলগিট। রাশিয়াকে সায়েস্তা রাখার জন্যে এবং প্রয়োজনবোধে চীনের মধ্যে দিয়ে কম্যুনিজম আসাটা বন্ধ করার জন্যে বৃটেন এবং আমেরিকা দুই বাহিনীরই ঐ জায়গায় একটা পাকা ঘুনিয়াদের বিশেষ দরকার ছিল।

যে কোন ম্যাপ দেখলেই গিলগিটের প্রাধান্য বোঝা যাবে। এই গিলগিটকে ঘিরে মিশেছে তিন রাজ্যের সীমান্ত। একদিকে আফগানিস্থান, একদিকে ভারত আর একদিকে রাশিয়া। এই গিলগিটই ছিল পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। পাকিস্তান চেয়েছিল কাশ্মীরের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে এবং তার মধ্যে দিয়ে আফগানিস্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে। বৃটেন এবং আমেরিকা মিয়াকে বুঝিয়েছিলেন (কেন তা পরে আলোচনা করব) যে (১) কাশ্মীর মহারাজার যখন ইচ্ছে তখন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেই; (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য আছে ফতিয়ার গাফ্ফার জন্যে এবং তারা কাশ্মীরের সঙ্গে সীমানায় যুক্ত আছে ব'লে ভারতের দিকে তার পাল্লা ঝুঁকতে পারে। (৩) যদি তাই হয় তাহ'লে পাখতুনিস্থান অনিবার্য; (৪) পাখতুনিস্থান হ'লে আফগানিস্থান তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য এবং এর ফলে (৫) পাকিস্তানের মাথার ওপর থাকবে ভারত-পাখতুনিস্থান-আফগানিস্থানের মিলিত শক্তি। এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গিলগিট দখল করা।

বৃটেন-আমেরিকারও প্রয়োজন গিলগিট কারণ (১) ওটা হল রাশিয়ার সীমানা এবং কম্যুনিষ্ট

প্রভাব আটকাবার পক্ষে ওটা এশিয়ার বড় ঘাঁটি ; (২) সিলগিটের মধ্যে দিয়ে ভারত যে কোন সময় রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসা যাওয়ার পথ করতে পারে আর তা যদি ক'রেই বসে তাহলে এশিয়ার কম্যুনিজম্ পাকাপোক্ত ভিৎ গেড়ে বসল। সেটা আমেরিকার বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম্ বিরোধিতার পটভূমিকায় একটা অসামান্য ক্ষতি। (৩) সিলগিট ভারতের কাছে থাকলে এখানে আমেরিকার বেস্ করা সম্ভব নয়। আর সিলগিটের সঙ্গে যদি কাশ্মীরও পাওয়া যায় তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা—কাশ্মীরকে সহজেই করা যায় সাপ্লাই-র বেস্। এমনিতেই পাকিস্তানকে হাতে রাখবার জন্যে আমেরিকার চেষ্টা আর সাহায্যের ত্রুটি নেই, তার ওপর যদি সিলগিট আর সঙ্গে কাশ্মীরও ওদের হাতে তুলে দিতে পারে তাহ'লে পাকিস্তান হ'য়ে যায় ঘর-দুয়োরের দেশ—এশিয়ার দ্বিতীয় আমেরিকা। আধিপত্য বাড়ানোর লোভ সব দেশেরই আছে। ব্যক্তিগত ভাবে জিন্নার তো সীমাই ছিল না আর তার ওপর ছিল বৃটেন আমেরিকার উস্কানি। অতএব পাকিস্তান অজুহাতের হাত বাড়িয়ে লাগিয়ে দিল যুদ্ধ।

যে যে কারণে বৃটেন আমেরিকার লোভ সিলগিটের ওপর, ঠিক সেই সেই কারণেই রাশিয়ারও ইচ্ছে যে সিলগিট এবং কাশ্মীর ভারতের হাতেই থাকুক। রাশিয়া স্থির বিশ্বাসে জানে যে (১) কাশ্মীর আর সিলগিট ভারতের হাতে থাকলে আমেরিকার পক্ষে ওখানে ঘাঁটি করা সম্ভব নয় ; (২) পাকিস্তানের হাতে গেলে তা হবেই আর (৩) চীন ওটার ধারে লাদাকের ওপর লোলুপ দৃষ্টি হানবেই। এই সব কারণেই রাশিয়া স্পষ্টই জানিয়ে দিল, কাশ্মীর হল ভারতের অপরিহার্য অংশ। ওখানে আর সন্দেহের অবকাশটুকুও নেই।

অকস্মাৎ আক্রমণে আর পণ্ডিতজীর "যে ক'রে হক শান্তি বজায় রাখো" নীতির ফলে সিলগিট আমাদের হাত থেকে চ'লে গেল। শুধু সিলগিটই নয়, সঙ্গে গেল বালটিস্তান আর লাদাকের কিছু অংশ। আরো বড় সর্বনাশ হ'য়েছিল দুটো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা ওদের হাতে গিয়ে—ক্রজিলা আর যোজিলা পাস। এ সবই যদি ওদের হাতে থাকত বা তখন ছিল, তাহ'লে একটু সুযোগ পেলেই সৈন্য দিয়ে সারা কাশ্মীর ছেয়ে ফেলা পাকিস্তানের পক্ষে হত ছেলেখেলা। পাকিস্তানের সে সুবিধা সমূলে ধ্বংস ক'রে দিলেন জেনারেল থিমায়া (যাঁকে পণ্ডিতজী নাকি ব'লেছিলেন "যুদ্ধ আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি !!)। শীতকালে হিমালয়ের ঐ উচ্চ জায়গাগুলি যখন বরফে ঢাকা এবং পাস দুটো পুরোপুরি বন্ধ তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে (শুধু পাকিস্তানের গুপ্তচরদের নয়, ভারতবাসীদেরও !) ছোট ছোট ট্যাঙ্ক ১৩০০০ ফিট ওপরে তুলে নিয়ে গেলেন জেনারেল থিমায়া আর হঠাৎ একদিন আক্রমণ ক'রে বসলেন যোজিলা'। শুধু পাকিস্তানই নয় পৃথিবীর কোন যুদ্ধবিদই ভাবতে পারেন নি যে ঐ উঁচু পাহাড়ে আর ঐ জমাট বাঁধা বরফে ট্যাঙ্ক যেতে পারে অথবা ট্যাঙ্ক দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব! জেনারেল থিমায়া সেটা শুধু সম্ভবই করলেন না, যোজিলা পাসটা জয় করলেন আর পাসের ওপারে কার্গিলও অধিকার ক'রে নিলেন। লেহ আমাদের রাখতে গেলে কার্গিলটা দরকার।

পাসটা এলো হাতে, কাশ্মীর বাঁচল আর লেহ আমাদের রইল ব'লে পাকিস্তানের পক্ষে রাহুল আর কুলুর মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব আর পশ্চিম ও কিস্তওয়ারের মধ্যে দিয়ে জম্মু যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে গেল। এসবই হল, কিন্তু সিলগিট, বালটিস্তান আর লাদাকের কিছু অংশ ওদের হাতে থাকার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ হ'য়ে গেল সিনকিয়াং প্রদেশের মধ্যে দিয়ে।

ঘরে সাহেব লাগা বাড়ীতে থাকলে সুখ দুঃখের কথা হওয়া মানুষের মতন জাতিরও স্বভাব। হলও তাই। তিব্বত অধিকার করার পরই চীন চাইল, লাদাকের কিছু অংশ। ফলে হল মৈত্রী। আলোচ্য নিবন্ধটি হল কাশ্মীর ভাগ ঘাঁটোয়ারার ব্যবস্থা ক'রে। চীন পেলে লদাক আর পাকিস্তান পেলে কাশ্মীর। সঙ্গে সিকিমটা তো রইলই। বলা বাহুল্য যে এই মৈত্রীর মূলে আছেন রঞ্জিত রমনী লক্ষ্মীবাঈয়ের পুত্র জনাব ঝুট্টো।

এই জনাব ঝুট্টো হ'লেন ঝুনাগড়ের স্যার শাহ নওয়াজ ঝুট্টোর ছেলে। স্যার শাহ নওয়াজের প্রথমা পত্নী মারা যাওয়ার পর স্যার শাহনওয়াজ বিয়ে করেন বিলাতফেরতা বাড়ীতে ওঁর আলাপ হল লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে। লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন জয়পালজীদের রাজপুত ঘরানার (মার্চেন্ট—বোম্বের মার্চেন্ট কথাটারই অপভ্রংশ) মেয়ে। স্যার শাহ ওঁকে নিয়ে উধাও হলেন আর বম্বেতে বাসা বাঁধলেন। জনাব ঝুট্টো সাহেব বম্বেতেই মানুষ এবং মেহবুব খাঁ সাহেব যখন রাজকাপুর দিলীপকুমার আর নার্গিসকে নিয়ে ছবি করছিলেন 'আন্দাজ' তখন তরুণ জনাব ঝুট্টো (পুঃ) প্রতিদিন ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ইুডিওর দরজায় নার্গিসকে দেওয়ার জন্যে। নার্গিস বিরক্ত হ'য়ে একদিন মেহবুব খাঁ সাহেবকে করলেন নালিশ। তার পরদিন জনাব সাহেব যখন এলেন আবার ইুডিওতে মেহবুব সাহেবের মেজাজ খারাপ করার জন্যে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন রাজপথে। বম্বে হাইকোর্টের নথীপত্তর ঘাঁটলে দেখা যাবে যে পার্টিশানের পর থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ঝুট্টো সাহেব এখানে কেস্ করেছেন যাতে ওঁর বাবার সম্পত্তি ইভাকুয়ী প্রপার্টি ঘোষিত না হয় আবার ঐ একই সময় কলকাতায় কেস্ করেছেন যাতে ওর বাবার সম্পত্তির বিনিময়ে ওঁকে কমপেনসেসন দেওয়া হয়।

এ হেন জনাব সাহেবের সঙ্গে আয়ুব সাহেবের সাময়িক প্রীতি হলেও স্থায়ী চুক্তি হওয়া সম্ভব নয় কারণ আয়ুব সাহেব মাইক সাহেব, সাউথহাস্টে পড়া আর সাহেব-ঘেঁষা। আয়ুব যখন সিংকিয়াং-এর মধ্যে দিয়ে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ স্থাপন ক'রে দিলেন আর চীন যখন তিব্বত অধিকার করার পর লাদাকের দিকে নোংরা দৃষ্টি দিল, জনাব সাহেব তখন আয়ুবের আমেরিকা প্রীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীন মৈত্রী ঝ'রে তুললেন। এই হল মোটামুটি ইতিহাস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে চীনকে।

ঘটনাবলীর ধারা একটু ঘাঁটলেই দেখা যাবে যে, গত যুদ্ধে যে সময় চীন আমাদের ওপর নোটিশ জারি করেছিল তার আগে ওদের কূটনৈতিক ব্যবহারে তৃতীয় স্তরের বক্তিমুলভ বাচালতা থাকলেও যুদ্ধের ঝোঁক ঠিক ছিল না। ওটা আরম্ভ হল যখন ভারতীয় সৈন্য লাহোর আর শিয়ালকোট অবরোধ ক'রে পাকিস্তানের কান কেটে দিল। অতএব এটা পাকা বুদ্ধি জনাব সাহেবেরই কারসাজি। পাকিস্তান হিন্দুস্থান যুদ্ধে কি হবে সেটা জনাব সাহেবের ঠিক মতন জানা ছিলো না। উনি ভেবে দেখলেন যদি পাকিস্তান হারার দিকে যায় তো ভারতকে বিব্রত করার জন্য চীন আছে আর যুদ্ধ থামাবার জন্যে আয়ুব সাহেবের আমেরিকা আছে আর যদি ভারত হারার দিকে যায় তো লাদাক নেওয়ার জন্যে চীন আছে। চীন কিন্তু চায়নি এবং ভাবতেও পারেনি যে পাকিস্তান যদি হারার দিকে যায় তাহ'লে আমেরিকার সাহায্য ওরা ঠিক বা দেবে। সময় মত নোটিশ জারি ক'রেই চীন দেখল, পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে (ঝুঁকবে নাইবা কেন? আমেরিকা ওদের ডলার দিয়েছে, প্যাটন দিয়েছে, স্যাবার জেট দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং

ভারতকে কিছু না দেওয়ার অঙ্গীকারও দিয়েছে। চীন দিয়েছে কিছু ফিউজ আর ল্যানটর্ণ এবং টর্চ ও কাউকেন পেন!) কাজেই চীনের মেজাজ গেল বিগড়ে, ফলে চীন পড়ল, ঝি'মরে। আর ওদের বক্তা শেষ করল রাশিয়া ছোট্ট দু চারটে কথায়। তাছাড়া কাশ্মীর সম্বন্ধে রাশিয়ার যে কোথায় দুর্বলতা তাও চীন ভালো ক'রে জানে। অতএব কাশ্মীর নিয়ে কোন গণ্ডগোলে যদি চীন যোগ দেয় তাহ'লে রাশিয়া পিছিয়ে থাকবে না। বাধ্য হ'য়ে চীনকেই পড়তে হল পিছিয়ে।]

আয়ুব সাহেবের সাড়ে তিনখানা টেক্কা এইভাবে ব্যর্থ হল। ভারতের হাতে চারটের মধ্যে বাকি যে আধখানা টেক্কা, ছিল সেটা ছিল প্রত্যেকটি ভারতবাসীর সব হারানো আর প্রত্যেকটি ভারতীয় সৈন্যের শেষ দেখার পণ ও প্রস্তুতি। লালবাহাদুর সেই আধখানা টেক্কা নিয়ে এমন চাল চাললেন যে সারা পৃথিবী হতবাক হ'য়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল। উইলসন্ সাহেব যুদ্ধ লাগানোর জন্যে ভারতকে যে দোষারোপ ক'রেছিলেন সেটা পাল্টি মেরে ক'রে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন, ঔ ধাক্কার শান্তি প্রস্তাবে আয়ুব সাহেব যে তিনটে সর্ত ক'রেছিলেন সেগুলো ভুলে মেরে দিলেন আর জনাব সাহেব হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যে বিরাট হুমকি দিয়েছিলেন তা বেমালুম হজম ক'রে ফেললেন। জনসন্ সাহেব চালাক মানুষ উনি চুপ ক'রে চোখ বুঁজে রইলেন।

কাশ্মীরের হালাদারি যুদ্ধ ছিল হাতের কাছে। কান পাতলে গুলির শব্দই শোনা যেত, সংবাদের তো কথাই নেই। যুদ্ধ যখন স'রে গেল লাহোর আর শিয়ালকোট সেক্টরে তখন সংবাদের জন্যে রইল রেডিও আর রফিক সাহেব। ইছাগোলে ভারত সৈন্যের প্রথম আক্রমণের সংবাদ রেডিও দিল, তার ফলাফল উনি জানালেন সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায়। কাশ্মীরে আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স ফেল করেছিল যতখানি, ওরই সুবাদে জানা গেল, যুদ্ধ সীমানার ওপারে তাদের সেই অনুপাতে সাফল্যের কথা। অন্যান্য সূত্র ধ'রে জানা গেল, একটি বিমান অভিযানে চল্লিশজন পাকিস্তানি পাইলটকে একই বাড়ীতে মারার কথা, সারগোধা এয়ারপোর্টে আত্মহত্যা অভিযানে রাস্তার ভেতে তছনছ করার বীর কাহিনী। ভারতীয় হিসেবে নিজেকে সার্থক মনে হল যেদিন শুনলাম ইছাগোল ক্যানালের ধারে আমাদের সৈন্যরা একের পেছনে আর একজন ক'রে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের কনক্রিটের বাঙ্কার অধিকার করার অবিশ্বাস্য বিবরণ। কামান দিয়ে যে আঠারো ইঞ্চি চওড়া কনক্রিটের দেওয়াল দেওয়া বাঙ্কার ভাঙা সম্ভব হয়নি, সেই বাঙ্কার অধিকার করার একটি মাত্র উপায় ছিল ব্যক্তিগত ভাবে বাঙ্কার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে খোলা ঘুলঘুলির মধ্যে হাত বোমা ফেলা। সে পর্যন্ত যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল মেশিনগনের অগ্নীবর্ষণের মধ্যে দিয়ে। আমাদের জোয়ানরা ভেবে এক উপায় বের করলেন। পাশাপাশি গেলে মৃত্যু অনিবার্য। তার চেয়ে যদি একজনের পেছনে আর একজন ক'রে যাওয়া যায় তাহলে সামনের কিছু লোক মরলেও পেছনের লোক পৌঁছে যাবেই। এই ভাবেই ওরা অধিকার ক'রেছিলেন পাকিস্তানের অন্য বাঙ্কার।

এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল কলাইকুণ্ডা এয়ারপোর্টের কলঙ্ক কাহিনী। সিক্সটিনথ স্কোয়াড্রনের একজন বোমারু ফিরছিলেন পাকিস্তানি বিমান তাড়িয়ে। আমাদের এই স্কোয়াড্রনের আদেক ছিল কলাইকুণ্ডায় আর বাকি আদেক ছিল বেরেলিতে। আমাদের বিমান যখন ফিরল, অভিযানের পর তখন উইং কমাণ্ডার উইলসন ফিরে এলেন কলাইকুণ্ডায় কিন্তু নামতে চাইলেন না ওখানে, কারণ উনি বললেন পেছনে ওর পাকিস্তানি বোমারু বিমান আসছে তাড়া ক'রে, অতএব

ওর বেরিলি যাওয়াই ঠিক হবে। কলাইকুণ্ডা থেকে উইলসনকে হুকুম দেওয়া হল ঐখানেই নামতে। উনি বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ওঁকে ঐখানে নামতে বাধ্য করা হল। ওঁর নামবার তিন মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি বিমান এসে আমাদের সাতটা বিমান ধ্বংস ক'রে গেল। অতি লোভে যখন ওরা দ্বিতীয়বার এলো আক্রমণ চালাতে তখন ওদের দুটো বিমান ধ্বংস করা হল। উইলসনকে যদি ওখানে নামতে বাধ্য না করা হত তাহ'লে ঐ এয়ারপোর্টে আমাদের অতোখানি ক্ষতি যে হত না তা বলাই বাহুল্য।

আর খারাপ লাগল, ৩৪ স্কোয়াড্রনের নায়ক উইং কমাণ্ডার বক্সির কথা শুনতে। উনি গিয়েছিলেন হল নিয়ে করাচি এয়ারপোর্টের যাতে পাকিস্তানের সোলাবাক্সদের গুদাম ধ্বংস করার শুভ দায়িত্ব নিয়ে। আমাদের যে পাইলটরা রাতের অন্ধকারে একটা ছোট্ট বাড়ী খুঁজে বের ক'রে চল্লীশজন পাইলট সমেত সেটাকে ধ্বংস ক'রে আসতে পারে, সেই পাইলটরাই না কি বারোটা বড় বড় গোদাম খুঁজেই পেলেন না, দিন দুপুরে। পরদিন যখন অন্যরা গিয়ে পেলো তখন দেখা গেল সেখানে জোর পাহারা ব'সে গেছে। যে কাজটা বক্সি সাহেব এক মুৎকায় ক'রে আসতে পারতেন সেটা সহজ সাধ্য হল না। কেন হল না? লোকে বলে ঘুষের জন্যে।

সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন অম্বু অঞ্চলে সাতেরোজন ভারতীয় শিখ এবং হিন্দু ধরা পড়ল পাকিস্তানি প্যারাট্রুপার এবং গুপ্তচরদের আশ্রয়ই শুধু নয় ওঁদের লুকিয়ে রাখার অপরাধে। যে দেশে রাত দুটোর সময় বারো তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের দেখেছি হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে রেল লাইন আর রাস্তা পাহারা দিতে প্যারাট্রুপার নামার পর সেই দেশে এই ধরণের মানুষ থাকে কি ক'রে ভাবতে বসলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। উচিত ছিল ঐ সাতরোজন লোককে প্রকাশ্য রাজপথে পাগলা কুকুরের মতন গুলি করে মারা। কে জানে, একটু তলিয়ে খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়ত ওদের পেছনে আছে কোন বিরল মাড়োয়ারি আর নয় সাদা টুপি পরা কোন কালোবাজারি মন্ত্রী।

কংগ্রেসি মন্ত্রীরা যদি আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন ওঁদের নিজেদের কলঙ্কিত চরিত্রের কালো আঁচড় দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর হিজিবিজি কেটে। একদিন যে দেশের মানুষ ছুন তৈরি ক'রে খেল খেটেছে আজ সেই দেশেরই মানুষ নয়াপয়সার জন্য দেশ বিকিয়ে দেয়, মরা ছেলের পেট চীরে তার ভেতরে সোনা পুরে কাস্টমস্ ফাঁকি দেয়, স্কুলে দরিদ্র শিশুদের মিল্ক পাউডার বিক্রি ক'রে নারীর বেসাতি করে। কুড়ি বছরের মধ্যে এই কলঙ্কিত অধঃপতন কি ক'রে ঘটল? যারা ঘটিয়েছে, বলরাজের মতন আমারও ইচ্ছে করল, সেই সব হতভাগাদের টেনে বের ক'রে আনি তাদের বড় বড় রাজপ্রাসাদ থেকে আর দেখাই যুদ্ধ কালীন পাঠানকোট, জলন্ধর, অমৃতসর প্রভৃতি সহরে, আশপাশের গ্রামে, পথে ঘাটে গ্রামীন দীন দরিদ্র মানুষদের দেশপ্রেম আর আত্মোৎসর্গেরই অক্ষয় কীর্তি। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে ট্রেনে ট্রেনে দেখেছি আমাদের জোয়ানদের আদর; বিনামূল্যে তাদের ফল, দুধ, সিগারেট, পান, চা, লুচি তরকারি শুধু দেওয়াই নয়, নিতে না চাইলে, জোর ক'রে হাতে গুঁজে দেওয়া এবং বিনে কৃতজ্ঞতায় গুইয়ে পড়া। এ কাজ ব্ল্যাক মার্কেটের টাকাওয়ালা বড় বড় ব্যবসাদাররা করেনি, করেছে জীর্ণ বস্ত্র পরা, অনাহার ক্লিষ্ট, অভাবে জর্জরিত গ্রামের চাষা, সহরের কুলি, হাটের মজুর আর গরীব মেয়েরা। আরও দেখেছি মধ্যরাত্রের গভীর অন্ধকারে গ্রামের লোক লাঠি আর লণ্ঠন হাতে বন্দুকধারী প্যারাট্রুপার খুঁজে

বেড়াচ্ছে আখের ক্ষেতে, নালার ধারে উলু ঘাসতার জঙ্গলে। জম্মু থেকে ছম্ব রণাঙ্গনে যাওয়ার পথে সত্তর-বর্ষীয়া বিধবা বুড়াকে দেখেছি কটির কুঁড়ি মাথায় আর জলের হাঁড়ি হাতে "মেরে লাল" দের খাওয়াবার জন্যে রণাঙ্গণের দিকে সাত মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে। পাঠানকোটের জনাকীর্ণ পথ হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি সাত আট বছরের শিশুরা তাদের যুদ্ধ জয়ের অভিযান চালিয়েছে পথের মোড়ে মোড়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোয়ানদের জুতো পালিশ ক'রে আর বুড়োরা তাদের জল সরবৎ চা বিতরণ ক'রে। অমৃতসর ষ্টেশনের বাইরে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের দেখেছি প্যাকেট প্যাকেট পোষ্ট কার্ড নিয়ে ব'সে জোয়ানদের জবানি চিঠি লিখতে আর পাঠানকোট ষ্টেশনে দেখেছি চিকণি হাতে বৃদ্ধা, জোয়ানদের আদর ক'রে চুল আঁচড়ে দিতে। আরও দেখেছি কাশ্মীরে ঘুইক হাঁকিয়ে এসে সৈনিক শিবির থেকে বড়লোক ব্যবসাদারকে অল্প মূল্যে মদের বোতল কিনতে!

এই সব দেখা আর শোনার মধ্যেও যুদ্ধের উন্মাদনা আর আমার ছবির কাজের উত্তেজনার মাঝে মাঝেই রুকায়ার সন্ধান নিই আর সময় পেলেই ওর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হই। সেদিনের ঐ সব কথার পর প্রত্যক্ষ ব্যবহারটা যতই আমাদের সহজ হক, গভীর অবচেতনায় একটা কিছু অস্বস্তি যেন কাঁটার মতন বিঁধে আছে দুজনেরই মনে। আদর্শের শক্ত সম্বল দিয়ে মনটাকে—বেঁধেছি ঠিকই কিন্তু মন থেকে এই নতুন পরিস্থিতি কোনমতেই যেন মেনে নিতে আমরা পারছিনা। হয়ত কখন এমন পরিনির্বানীয় আনন্দে কিছু পাইনি ব'লে কিম্বা হয়ত, যা পেয়েছি তা হারাতে চাই না বলেই এমন হত। আরও একটা কারণ ছিল রুকায়া নিজে। সহজ আর সম্মিত কথার মাঝখানে কোন এক মুহূর্তে ও হঠাৎ থমকে গিয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে যেন প্রথম মিলনের প্রথম মুহূর্তটিতেই ও এখনও নিবদ্ধ আছে—যেমন থাকে রাগিণীর শেষ সুরে প্রথম পর্যায় মূর্ছনা। তখন আমার মনে হত আমার সেকেলে বসন পরা মনটা মিথ্যে, একেবারে নির্জলা আর নির্লজ্জ। মনে হত হয়ত আমি নিজের কাছে নিজেই মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস আর ঐ সব বড় বড় কথা বোধ হয় সত্যি আমার আদর্শের আড়ালে যার নেশায় নিজের কাছেই আমি নিজেকে বড় ব'লে আড়ির করার অযথা প্রচেষ্টা করি। আমার এই সব নানান প্রশ্নের জবাব নিজের মনে জানা প্রয়োজন ব'লে, ওকে যখন প্রশ্ন করলাম, ও বললে:

"তোমার কথা তুমিই জানো, আমার কিন্তু যখনই মনে পড়ে পাকিস্তানের কথা তখনই মনটা জলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়।"

"পাকিস্তান কেন?"

"তাছাড়া কি?" সহসা উত্তেজনায় রুকায়া কেটে প'ড়ে বলতে থাকে "পাকিস্তান যদি না আসতো সেই সাতচল্লিশে তো সারা জীবন থাকতাম আমি বোর্ধায় আড়ালে আর পেতাম না এদেশের মেয়েরা চিরকাল পেয়ে এসেছে। ছোট্ট পরিমিত জীবন, সুখ দুঃখের সংসার, ছোট্ট চাহিদার পরিপূর্ণ পূরণ যেমন পেয়েছিল আমার মা তারও আগে আমার ঠাকুমা, দিদিমা।

থেমে যায় রুকায়া অন্য কিছু ভাবার জন্যে, বলে "ঐ পাকিস্তানের জন্যেই হারিয়েছি আমি কামালকে। তুমিও গেছো আমার জীবন থেকে-ঐ পাকিস্তানের কথা ভেবে আর পঁয়তাল্লিশ কোটির মোহাই দিয়ে!"

ছোট্ট ক'রে আমি বলি : "কৈ আমি তো যাইনি।"

"সেই', কিন্তু কি ক'রে তা বলব না।"

হেসে ফেলি, বলি "না বললেও বোঝা যায়।"

"তাহলে ?"

এইবার আমার প্রসঙ্গে এসে পড়ে বলি, "দৈহিক ভাবে পাওয়াই কি সব পাওয়া ?"

"সব নয় হয়ত, তবে অনেকখানি।"

"আচ্ছা ভেবে নাও" গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি মনের কথাগুলো "এমন একটা সভ্যতা যেখানে সামাজিক বাঁধন নেই, স্বাধীন ইচ্ছার বাধা নেই সয়ালটির বালাই নেই। যেচ্ছাচারিতা ব'লে কিছু নেই, অবাধ মেলামেশায় বয়সামের লেশ নেই আর নেই সংযমের কোন মূল্য। বিটনিক্ বাঙীয় আধুনিকতম সম্প্রদায়ের এই আদীম প্রথাগুলোর যদি সত্যিই আবার প্রচলন হয়, আর জীবনে মূল্যবোধের যদি বালাই চোকে তাহ'লে কি হয় ? মন কি খুশী হবে ? মানুষ কি সুখী হবে ? তাতেই কি মানুষের পাওয়ার তৃষ্ণা মিটবে ?"

রুকায়া কোন জবাব দেয়না চুপ ক'রে ভাবতে থাকে, বোধহয় কল্পনা করতে থাকে অমনি ধারা জীবন।

"কৈ বললে না ?"

"জানিনা। তুমিই বল।"

"আমিও ঠিক জানিনা। তবে বোধহয় না। আমার মূল্যবোধে, দেহের সুধাটা কেবল দেহের নয়, দেহটা শুধু প্রকাশের ভঙ্গিমা, ভাষাও বলতে পারো। আসলে ওটা মনের। মন যদি এই সব মূল্য-বোধকে সেলামি না দিয়েই দেহের ওপর ভর করে তাহ'লে ও চাওয়া হয় লালসা আর ও পাওয়াটা হয় ব্যর্থ। যব তুমি আর আমি। আজ আমরা যাই বলিনা কেন আর যাই করিনা কেন, কামাল আমাদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘনীয় অন্তরায় হ'য়ে অনবরত ঐ সব সামাজিক আর চারিত্রিক বিধি নিয়মের দিকে আঙুল দেখাবেই। আর আমরা যে চোখ বুজে থাকব তারও উপায় নেই কারণ শিক্ষা আর সংস্কৃতি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। আজ যদি তুমি আর আমি আমাদের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার বন্যায় ভেসে যাই অবাধ স্বাধীনতায় তাহ'লে বলবার কেউ নেই, কেবল আমাদের মন ছাড়া। তার অপমৃত্যু অনিবার্য্য। তাই আমার মনে হয়, ঐগুলো সব আছে ব'লেই ভালোবাসা সার্থক।"

রুকায়া ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করল :

"কোনগুলো ?"

"যে সব মূল্যবোধগুলো বাদ দিয়ে আমি জীবনটাকে ভাবতে বললাম। সামাজিক বাঁধন, সয়ালটি, অন্যের ইচ্ছা, সংযম, দেহের মর্য্যাদা, মনের মূল্যবোধ। এইগুলো যদি জীবনে পরিপূর্ণ ক'রে তবে ভালোবাসা যায়, চাওয়াটা তবেই হয় পবিত্র, পাওয়াটা তখনই হয় সার্থক আর ঐটেই হয় পরিনির্বাণীয় আনন্দে পরিপূর্ণ যখন ঐ চাওয়ার মূলে থাকে সন্তান সম্ভবার সাধনা। তার চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে আর কিছু নেই এইটাই আমার ধারণা।"

কিছু একটা ভেবে নিয়ে রুকায়া বললে : "আর একটা কথা বল।"

"কি ?"

"সত্যি করে বলবে কিন্তু।"

"বলব।"

"কখন কি ইচ্ছে করেনা তোমার, আবার আমাদের দুজনের ঐ ছোট্ট ইতিহাসের পাতা আর একবার ওলটাতে ?"

ওর দিকে তাকাই বটে অপলক কিন্তু সেটা আমার অজ্ঞাত। নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখি ভালো ক'রে, বলি :

"করেনা যদি বলি তাহ'লে মিথ্যে বলা হবে। করে ঠিকই কিন্তু ওটা করণীয় নয়। ও ইচ্ছেটাকে আমি আমল দিই না।"

"কেন ? দুর্নামের ভয় ?"

হেসে ফেললাম : "সুনামের মোহ নেই তাই দুর্নামের ভয়ও আমার নেই !'

"তাহ'লে ?"

"আমার মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষ আছে মাঝে মাঝেই তাকে দেখতে আমার মন চায়। আরও একটা কারণ হল আমার মনের মূল্যবোধ !

"এটা তোমার মিথ্যে অহংকার ."

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি : "হতেও পারে। তবে আত্মত্যাগও বটে। জীবনের এই জটিলতায় তোমাকে আমি বড় ক'রে দেখছি, সেটা তো আমার আত্মত্যাগই।"

"তাহ'লে আর একটা কথা বল।"

"কি ?"

"আজ তুমি আমায় কি চোখে দেখ ?"

হেসেই বলি, "দু চোখ ভ'রে। যেমন তোমায় প্রথম দিন আমি প্রথম সাক্ষাতে দেখেছিলাম।" থেমে আবার বলি, "চোখ ভ'রে তো দেখিই। মন ভ'রেও।"

হেসে নিল একটা লজ্জা ভঙ্গিমায়, বললে :

"জানা হল। এবার বল তুমি যাচ্ছ কবে ? টিকিট পেলে ?"

"টিকিট তো আছে। প্লেন নেই। তাই ভাবছি রাস্তা ধরব।"

"কবে ?"

"গেলেই হল। আজ। কাল। পরশু। কেন ?"

"তুমি যে ব'লেছিলে তুমি মরুদ্যানে যাবে।"

মনে পড়ে গেল কবীর মহম্মদের আত্মত্যাগের কথা, ওর মৃত্যুর করুণ কাহিনী। বললাম : "যাবো। পাকিস্তানের কবরস্থান না দেখে ফেরাই যাবে না !"

"কবে যাবে ?"

"যেদিন তোমার সময় হবে।"

বালিকটা অধির চাপল্যে ও উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানলার চৌকাঠ ধরে ; বাইরের বেলাশেষ বেলা যাওয়া অন্ধকারে, বোধহয়, মনের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে। তারপর ফিরে বলল :

"কালই ?"

"যাবো। কিন্তু এতো তাড়া কেন ?"

জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ও বললে :

"মনের তাগাদা।" থেমে আবার বললে, "কবে তুমি চ'লে যাবে ঠিক তো নেই। তাছাড়া, কামাল ফিরে এলে আর যে তুমি আসবে না তাও আমি জানি।"

ওকে বাধা দিয়ে বলি : "ওটা তোমার ভুল ধারণা।"

অবাক হল ; প্রশ্ন করলো : "আসবে ?"

"বোধ। যদি থাকি। অবাক হ'লে ?"

"কিছুটা।"

"কেন ?"

"বোধ হয় তোমায় ঠিক বুঝিনা বলে।"

"না বোঝার তো কিছু নেই। কামালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমায় আমি ভালোবাসি। এ দুটোর কোনটাই লুকোবার জিনিষ নয়।"

ফকায়া হেসে বলল, "সভ্য সমাজের এটা কিন্তু নিয়ম নয়!"

আমিও হেসেই জবাব দি :

"জানি। আমার অতীতে তার বহু প্রমাণ আছে। আমি না থাকলে তারা কুকুরের মতন চুপি চুপি আসত আর আমায় দেখলেই চোরের মতন পালাতো।"

"মানলাম" ফকায়া বললে, "তুমি আসবে কিন্তু তার আগে চ'লেও তো যেতে পারো!"

"তা পারি।"

"তাই ইচ্ছে করছে, তার আগে তোমার সঙ্গে প্রকৃতির পরম সৌন্দর্যকে আর একবার প্রণাম জানিয়ে আসি।"

"আমার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ।" ফকায়া বললে, "প্রকৃতির আমরা অতেক অংশ তাই আলাদা ক'রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কখন দেখতে জানতাম না। ওটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য যে এমন নিঃসীম তা তোমারই শিক্ষা।"

ভালো লাগল, ওর মুখে আমার মনের এই কথাগুলো। প্রকৃতিকে আমি বিশুদ্ধ মনে ভালোবাসি ব'লেই জীবনের জঞ্জাল আমায় নৈরাশ্যের আঁধারে আজও জড়াতে পারেনি। অর্থ আর খ্যাতির মোহে যখন অনর্থ ঘটেছে, স্বার্থের হানাহানিতে যখন সংসার ভেঙেছে আর মানসিক সংঘাতে যখন সন্তানদের হারিয়েছি তখন প্রকৃতির কোলে চোখ মেলেই পেয়েছি আমি চৈত্তিক সান্ত্বনা। প্রকৃতিই আমার প্রজ্ঞা পারমিতা। তাই সানন্দে সম্মতি দিলাম :

"বেশ, তাহ'লে কালই চল।"

উঠে দাঁড়ালাম। অনেক দূরের কিছু পথ হেঁটে যাবো, বাকি যেতে হবে টাঙা হাঁকিয়ে। ওদিকে ভারহ্রাস সময়ও আসন্ন। আরও মনে ছিল, সূর্যাস্তের প্রথম প্রহরে আমার গৃহহীনতার গভীর বেদনা হয়ত ওর চোখে ধরা পড়ে গিয়ে ওর মনে বেদনার ছায়া ফেলবে। সেটা অনুচিত

এবং কাশ্মীরকে নিয়ে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত লম্বরের অন্তরায়। সাধনীর কাছ থেকে সমবেদনার সান্ত্বনা শুনতে খারাপ লাগেনা ঠিকই কিন্তু সম্পর্কটা যদি প্রেম ভালোবাসার হয় তাহ'লে সমবেদনার মধ্যে খুব বেশী স্পর্শের ভাগ্যারা থাকে। আসন্ন সন্ধ্যা আর একলা ঘরে সেটা মনকে বড্ড বেশী অসহায় ক'রে দেয়। দরজার কাছে ও বললে :

"যাবো তো, যদি আর না ফিরি ?"

হেসে বলি : "ভয় নেই। আমি ফিরিয়ে আনব। কাশ্মীরের বৈধব্য জীবনে তোমায় পৌঁছে দিয়ে তবেই তো আমার ছুটি !"

ও ঠাট্টা ক'রে বলল, : "পঁয়তাল্লিশ কোটি ?"

সেই পঁয়তাল্লিশ কোটি আজও ঠিক আগের মতনই আছে। কাশ্মীরও আছে। আমিও আছি। রুকাইয়ার স্মৃতিও আছে। ওই শুধু নেই।

তারপর যা হয় মানুষ মরলে তাই হল। ওর গুণগানে কাশ্মীর ভরে উঠল। ওর সাহসের তালিকা ছড়ালো সৌরভময় বাতাসের মতন। গান হল, লেকচার হল, শ্লোকিকতাও হল। ওর সমাধিতে সবাই ফুল দিল। ছবিতে মালা পরালো। একবাক্যে সবাই বলল, কি সুন্দর জীবন ছিল ওর—সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরপুর। আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। সাকিসাহেব কাশ্মীরের ক্যাশনেল ব্যবসাদার আর অক্সর ডন ফুরান। স্মৃতিসভা থেকে উনি আমায় ধ'রে নিয়ে গেলেন সালিমার বাগানে। হুইস্কির গ্লাসটা মুখে পুরে উনি বললেন, মেয়েটার, বুঝলেন, সব ভালো ছিল, শুধু ভালোবাসা যে কি তা জানতো না। ওর পেছন পেছন আমি পৃথিবী ঘুরেছি—লণ্ডন, আমেরিকা, জর্মানী, জাপান। টাকা উড়িয়েছি দু হাতে, আর জীবন দিয়েছি ওর পায়ে বিছিয়ে কিন্তু মনই যার নেই এ সবের মূল্য সে বুঝবে কি ? সাকি সাহেব সারা সন্ধ্যা এমনি ধারা কত কথা ব'লেছিলেন আজ তার কিছুই আমার মনে নেই। ঐ সন্ধ্যার একটা কথা শুধু মনে আছে। ওঁর সঙ্গে আমি সমান তালে মদ খেয়েছিলাম কিন্তু মাতাল হইনি।

বলরাজের বাগানে চৌকিদারের চিলতে বারান্দায় ব'সে মোমবাতির আলোয় মনটাকে আজ উলটে পালটে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। সারা পৃথিবীময় সমস্ত জীবন জোড়া ব্যর্থ খোঁজার পর যখন নিজেকে হারাতে এলাম কাজের অজুহাতে তখনই হল আমার সার্থক পাওয়া। শিল্প সাধনা আর সৌন্দর্য সৃষ্টির শান্ত পরিবেশে সেটা সহজ মনে পাওয়ার কথা, সেটা আমার পাওয়া হল মৃত্যু আর জীবনের মধ্যের মধুচন্দ্র মুহূর্তায়। এইখানেই এক অতর্কিত সন্ধ্যায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম পাখীর ছোট্ট তুলোটে পালকের মতন মধুর ভালোবাসা। সারা জীবনের বিস্মৃতিতে তার মেয়াদ এক পলকের বেশী নয়। মৃত্যুর ঝড়ে সেটা উড়ে চলে গেল, কেন জানিনা, কোথায় তাও জানিনা। আমার জীবনজোড়া প্রতীক্ষার এইটাই শেষ না এইখান থেকেই আবার নতুন ক'রে আরম্ভ তাই বা কে জানে ?

কিন্তু স্থির বিশ্বাসে একটা কথা আমি ঠিক জানি। সে জানার আমার শেষ নেই। রুকাইয়ার যদিনি ভালোবাসার মনের অনেক ক্লেদ আমার মুছে গেছে, অনেক কালিমা মুছে গেছে, শূন্যতার হাহাকার শেষ হয়েছে। জীবনের ওপর যে খুব অভিমান আমার জমা হ'য়েছিল, নিজের প্রতি যে

গভীর অবিশ্বাস আমার গলা টিপে মারছিল আর সংসারের ওপর যে অমন ঘৃণা জীবনকে ক্লেদাক্ত করেছিল সে সব থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি আর নির্মুক্ত মনে বাঁচার আনন্দও আমি জেনে নিয়েছি।

নিঃসীম আবেগে ভালোবাসার আখ্যান আর নৈকট্য আনন্দে ত্যাগের তৃপ্তি আর এই দুই সীমানার মাঝখানে আমার মধ্যেকার সত্তিকারের মানুষটাকে পর্যবসিত করার জন্যেই যে আমার অতীতের চক্রবাল বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন ছিল সেটা আমার মনে আজ আলোর মতন উজ্জ্বল বলেই অন্তহীন জীবন থেকে জীবের আয়ু পরমায়ুর বাকী আমি সর্বান্তকরণে ক্ষমা ক'রে দিতে পারছি। আমার মন থেকে আজ সব তিক্ততা সরে গিয়ে তিতিক্ষার স্থান ক'রে নিয়েছে। রুকায়া আমার জীবনে সার্থকতার প্রমাণ, মহত্ত্বের প্রতীক।

পঁয়তাল্লিশ কোটির জন্যে ও জীবনকে মেনে নিয়েছিল। ওর জন্যে আমি আজ অপরিমিত আনন্দে সবাইকে ক্ষমা করতে পারি, সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যত কলঙ্ক, অর্থের মোহ, খ্যাতির আকর্ষণ, লোভ, রাগ, দ্বেষ, জৈবিক চাওয়া পাওয়ার দম্ভ সব আমার শেষ হয়েছে রুকায়ার 'সব পেয়েছির' রাজত্ব থেকে জগতকে জেনে। তাই জীবনটা আজ থেকে আর রৌরব নয় অনির্বাণ গৌরব।

রুকায়া তার জীবনের জ্যোতি ছড়িয়ে আর মৃত্যুর মাধুরী মিশিয়ে আমার প্রতীক্ষার সীমানা বাড়িয়েছে কি কমিয়েছে তা জানিনা কিন্তু অনেক জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়ে গেছে—কেবল একটা সমস্যার সমাধান সে করতে পারেনি। সে হল আমার নির্বিশেষ। অনেক ভেবেও ও আমার বোঝাতে পারেনি ঠিক কোথায় আমার নির্বিশেষ। সে কি আমার বাস্তবের শেষে, না আমার স্বপ্নের আরম্ভে?

কে জানে?

॥ শেষ ॥

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

স্বপর্ণ রায়

শীষ করতে-করতে মস্ত বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো চৌদ্দ বছরের ছেলে জিমি বোজার্ট। খবরের কাগজ বিক্রি করাই ওর পেশা। গিয়েছিলো খদ্দেরদের কাছ থেকে কাগজের দাম আদায় করতে। ভাঙানি হাতে নিয়ে ঝনঝন করতে-করতে নামছিলো। হঠাৎ পা ফসকে ওর গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হলো। রেলিং ধ'রে কোনো রকমে টাল সামলালো বটে কিন্তু সমস্ত পয়সা গড়িয়ে প'ড়ে গেলো নিচে। তাতে কিন্তু ওর মেজাজ একটুও খারাপ হলো না। ধীরে-সুস্থে নেমে আবার কুড়িয়ে নিলো পয়সা। তবে একটা মুদ্রা ওর কাছে সব চাইতে আকর্ষণীয় মনে হলো। সেটা একটা কাইত সেন্ট। প'ড়ে গিয়ে দুভাগ হয়ে গেছে। জিমি অবাক হয়ে দেখলো ওই মুদ্রাটার ভিতরে কী একটা ছোট জিনিস গোঁজা।

ওটা কুড়িয়ে নিয়ে জিমি ওর বাবাকে দেখালো। দেখে বাবারও তাক লেগে গেলো। তিনি বললেন, জিনিসটা পুলিশে জমা দেয়া উচিত।

জিমির এক সহপাঠীর বাবা পুলিশে কাজ করেন। ফ্রাঙ্ক মিলির কাছে ওই দু-ভাগ হওয়া পয়সাটা জিমি জমা দিলে।

এর চার বছর পরে, ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে, আমেরিকার একটি জেলা আদালতে অতি সাধারণ চেহারার একজন লোককে বিচারের জন্য হাজির করা হলো। লোকটার চোখ ফ্যাকাশে নীল, চুল কোঁকড়ানো। চেহারায় সাধারণ হ'লেও লোকটি অসাধারণ—আমেরিকায় এ-যাবৎ যেসব সোবিয়েত গুপ্তচর ধরা পড়েছে তাদের একজন চাই।

জিমি বোজার্টের আবিষ্কার আর রুডলফ ইভানোভিচ অ্যাবেলের গ্রেপ্তার—এই দুইয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? নিশ্চয়ই আছে। তবে, সেই যোগাযোগ কতখানি এখনো স্পষ্ট ক'রে জানার সময় আসেনি। আরো কাগজ-পত্র যখন হাতে আসবে তখন নিশ্চয়ই জানা যাবে।

এই টুকু জানা যায় পুলিশের লোক মিলি ওই নিকেলের মুদ্রাটা দিয়েছিলো এফ, বি, আই-এর

লোকদের কাছে। ওই বিভাগের টেকনিশিয়ানরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন মুদ্রার ভিতরকার জিনিসটা হলো ছ'টি সংখ্যা যুক্ত একখানা কার্ডের একটি মাইক্রোফিল্ম বা একরত্তি প্রতিলিপি।

জিমির বয়েস তখন আঠারো। কলেজে পড়ে। কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে রাখলো কর্ণেল অ্যাবেলের বিচারের সময় দরকার হ'লে তাকে আদালতে হাজির হতে হবে।

গুপ্তচরবৃত্তির জন্য কর্ণেল অ্যাবেলের মৃত্যুদণ্ডই স্বাভাবিক ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের আইনই তাই। তবু কঠোরতম দণ্ড না দিয়ে তাকে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলো।

কর্ণেল অ্যাবেলকে গ্রেপ্তার করার জন্য কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি। তার তিনজন সাকরেদের নাম ধাম জানা সত্ত্বেও তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি আমেরিকার পুলিশ। তারা স'রে পড়েছিলো রাশিয়ায়। ধরা পড়বার পর কর্ণেল অ্যাবেল সম্পর্কে যে-সব কথা জানা গেলো তা কেবল গল্প উপন্যাসেই সম্ভব।

ম্যানহাটানের একটা ছোট হোটেলে তিনি থাকতেন। সবাই জানতো তাকে ভালো ফোটোগ্রাফার ব'লে। ব্রুকলিনে ২৫২ ফুলটন স্ট্রীটের একটা বাড়ির একেবারে উপরের তলায় ছিলো তার স্টুডিয়ো। ওখান থেকেই তিনি খবর পাঠাতেন।

টেক্সাসের গোয়েন্দারা যখন অ্যাবেলকে জেরা করছে ঠিক সেই সময়েই মার্কিন পুলিশ খাঁতি-পাতি ক'রে খুঁজছে তার স্টুডিয়ো ঘর। খানাতল্লাস চ'লিয়ে যে সব জিনিস পাওয়া গেলো তা পরীক্ষা ক'রে অ্যাবেলের গুপ্ত ভূমিকা সম্পর্কে আর সন্দেহ রইলো না।

ফুলটন স্ট্রীটের বাসিন্দারা জানতো তার নাম এমিল গোল্ডফাস। বেশ ভালো লোক। তার পেশা ফোটোগ্রাফি, আর নেশা ছবি আঁকা। তার ছবির হাত বেশ ভালো। একজন শিল্পী তার ছবি দেখে ভবিষ্যৎবাণী করলেন: 'পাঁচ বছরের মধ্যে ইনি বড় আঁকিয়ে হবেন।'

তিনি এসেছিলেন ১৯৪৮ সালে। কিছুদিনের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো। পোশাক-পরিচ্ছদ তার সাদাসিধে। মাস পড়তে না পড়তেই ভাড়া মিটিয়ে দেন। ওই এলাকার দোকানীদের মিষ্টার না ব'লে ডাকেন না। সবাই তার উপরে সন্তুষ্ট। এমন লোক এখন আর হয় না।

সেই নিরীহ লোকটির স্টুডিয়োতে হানা দিয়ে কিনা ক্যামেরা, আলো, এবং অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পাওয়া গেলো সর্ট ওয়েভ রেডিয়ো রিসিভার! ফোটোগ্রাফির মতো পেশার সঙ্গে তো তার কোনো যোগ নেই।

ফুলটন স্ট্রীটের স্টুডিয়ো থেকে প্রায় ১২৬ রকম জিনিস আবিষ্কৃত হলো। ব্লোটর্চ, কাচ-কাটার যন্ত্র, ব্যাটারী, দলিল-পত্র, শক্তিশালী লেনস, মূর্তি কিল্মস, আরো কত কী। এমন সব যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে মাইক্রোডট মারফৎ খবর পাঠানো যায়। মানে পিনের ডগার মতো একটু খালি জায়গায় যেকোনো দলিলের ছবি ধরানো যায়। ফুলটন স্ট্রীটের সঙ্গ বিবাহিতা এক মহিলার কাছ-থেকে আসা একখানা চিঠিও ছিলো কাগজ-পত্রের মধ্যে। নতুন তথ্য উদ্ধারের আশায় পুলিশ তাদের কাছেও গেলো। তাদের বিয়েতে এমিল গোল্ডফাস উপহার পাঠিয়েছিলেন। তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা চিঠি দিয়েছে। ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী গোল্ডফাস আসলে রুশ গুপ্তচর বিভাগের কর্ণেল অ্যাবেল—পুলিশের কাছ থেকে এ-কথা শুনে ওরা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

স্টুডিয়ো থেকে কতগুলি চিঠি পাওয়া গেলো যা রীতিমতো সন্দেহজনক। একটা চিঠির

তাহা এ-রকম: "পরবর্তী জাহাজ, বুইন এলিআর-এর জন্য একটা টিকেট কিনেছি। পরের বেল্জিয়ামের জন্য। তিনজন লোক আমার পিছু নিয়েছে তাই যেতে পারলুম না।"

জানা গেলো আমেরিকায় রুশ গুপ্তচর বৃত্তির প্রধান গুরু ছিলেন কর্ণেল অ্যাবেল। তাঁরই নির্দেশে অন্য রুশ গুপ্তচররা ও দেশে তৎপরতা চালাতো। কর্ণেল অ্যাবেল মস্কো থেকে শর্ট ওয়েভে বার্তা পেতেন এবং সেই মতো অধীনস্থ গুপ্তচরদের কাজের নির্দেশ দিতেন। তারপর বিশদ সংকেত লিপির মারফৎ সোবিয়েত হেডকোয়ার্টারে কর্ণেল কাজের ফলাফল জানিয়ে দিতেন। মুদ্রা, সোনা-রূপোর সরলা, ইত্যাদির মধ্যে খুদে আসবাবে আনা হলিস পুরে রাশিয়ায় পাঠানো হতো। কখনো সে-গুলি যেতো পশ্চিম ইয়োরোপ ঘুরে, কখনো সোজাসুজি।

প্রায় তিরিশ বছর গুপ্তচরবৃত্তি করার পর কর্ণেল অ্যাবেল ধরা পড়লেন। ধরা পড়লেন এক বালকের অসাবধানতায়। বিদেশে রাশিয়ার হয়ে যারা গুপ্তচরের কাজ করেছেন তিনি বোধ হয় তাদের মধ্যে সব চাইতে দুর্ধর্ষ। ছবি তুলতে এবং গুপ্তলিপি পাঠাতে তো ওস্তাদ ছিলেনই, কর্ণেল অ্যাবেল সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনীয়রও ছিলেন। ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। রিউ-স্ত্রিয়ার সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনর্গল কথা ব'লে যেতে পারতেন।

কর্ণেল অ্যাবেল যখন ধরা পড়েন, তার বিচার চলে, রুশ সরকার একটি কথাও বলেন নি। তার বিচারের রায় বেরুবার একদিন পরে মস্কোর একটি সাহিত্য-পত্রে অ্যাবেলের নাম উল্লেখ না ক'রে ছোট একটা খবর বেরুলো: আমেরিকার এফ. বি. আই.-এর লোকেরা নিজেদের কুকীর্তি ঢাকবার জন্য গোল্ডফাস নামে একজন ওস্তাদ ফোটোগ্রাফারকে গ্রেপ্তার করেছে ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে কঠোর সাজা দিয়েছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় রুশ সাহিত্য-পত্রটি এমন করে খবরটা ছেপেছিলো যেন কর্ণেল অ্যাবেল নামে কোনো লোকের অস্তিত্বই নেই।

• •

"বাজে বাজে রণ্যবীণা বাজে"

এখন কেবল এই কথা মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই, ঢিল দিলেই ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে—তার ওপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে আর প্রতিদিন তার পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো—হে আমার গুরু, তুমি আমায় বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও। —রবীন্দ্রনাথ

কোম্পানী আমলের কাহিনী

দারোগার বিবৃতি ঃ শতবর্ষ পূর্বের কথা

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে তখনকার দিনের কুশলী পুলিশ অফিসার রামাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জবানীতে সেই সময়কার চুরি ডাকাতির কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে। এই সংখ্যায় তাঁর আর একটি কাহিনী দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করে দেওয়া হল।

'চোর এবং ডাকাতরা অনেক রকম চালাকি করিত। অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা পুলিশকে ফাঁকি দিত। বুদ্ধির দৌড়ে পুলিশের লোকজন তাহাদের সহিত পাল্লা দিতে পারিত না।

মুরাদনগর থানার দারোগা একদিন সকালে পথে বেড়াইতেছিল এমন সময় এক দীর্ঘাকার পুরুষ তাহার কাছে আসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ও হতচেতন হইল।

দারোগা তাহা দেখিয়া উহার মুখে জল দিল ও বাতাস করিল। লোকটির পরনের কাপড়খানি ভিজা।

চেতনা পাইয়া সে বলিল, সে ভীষণ লাঠির আঘাত পাইয়াছে। মাথায় গায়ে অনেকগুলি লাঠি মারার চিহ্ন দেখা গেল।

কিছু আহার করিয়া সুস্থ হইয়া সে নিম্নরূপ বলিল :—

"আমার কাপড়ের ব্যবসা আছে। পূর্বদিনে হাটে কাপড় বেচিয়া অপরাহ্নে আপন নৌকায় আসিতেছিলাম। রাত্রি ৩।৪ দণ্ড সময়ে মেঘনা ও পদ্মার মোহানায় আমার নৌকায় ডাকাইতি হয়। আমি এবং একজন বলবান দাঁড়ি ডাকাইতদিগের সঙ্গে খানিকক্ষণ লাঠালাঠি করিয়াছিলাম। ডাকাইতেরা লাঠির চোটে দাঁড়িকে নদীতে ফেলিয়া দেয়। বোধহয় সে মরিয়াছে। আমি নৌকায়

কাতর হইয়া পড়ি। ডাকাইতেরা আমার নৌকা হইতে কাপড়ের বস্তা টাকা পয়সার থলে আপনাদের নৌকায় লয় এবং আমায় ঠেলিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। তাহারা কোথায় কিরূপে আসিয়াছি ঠিকানা নাই। নৌকায় যে অপর দুইটি লোক ছিল তাহাদের কি দশা হইয়াছে জানিনা।"

যে স্থানে ডাকাইতি হওয়ার কথা প্রকাশ, ঐ স্থান ঢাকার অন্তর্গত হইতে পারে। লোকটা ভাসিয়া ত্রিপুরার এলাকায় পৌঁছিয়াছিল। অতি কাতর দেখিয়া দারোগা উহাকে ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে উহার এজেহার সহ পাঠাইয়া দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশক্রমে চিকিৎসা নিমিত্ত লোকটাকে হাসপাতালে এবং তাহার এজেহারখানি অপর এক ব্রাহ্মণ দারোগার নিকটে তদন্ত নিমিত্ত পাঠান হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই ব্রাহ্মণ দারোগাকে বিচক্ষণ বলিয়া জানিতেন। এই দারোগা তখন একটি খুনী মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া ব্যস্ত ছিল। সে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে জানাইল—অনেক যত্নের পরে খুনী-মোকদ্দমার কিনারা হইতেছে এমত সময়ে এখন পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কি অপরের হস্তে দিলে এইটি নষ্ট হইবে, প্রেরিত নৌকায় ডাকাইতির এজেহার অতি অসম্পূর্ণ, ইহাতেও যে বিশেষ আশা আছে এমত বোধহয় না। যাহা হউক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে কিছু আরোগ্যলাভ করিবার পরে তাহার নিকটে পাঠাইবার প্রার্থনাও করিল। কয়েকদিন বাদে আহত ব্যক্তিকে দারোগার নিকটে পাঠান হইল। দারোগা এই ডাকাইতির তদন্তে প্রবৃত্ত হইল।

কাপড়ের মহাজন স্বয়ং মোকদ্দমার কিনারা হইতে পারে এমত একটিও সন্ধান দিতে সমর্থ হইল না। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে যাহা কিছু বলিল তন্মধ্যে ২।৩টি কথার উপরে নির্ভর করিয়া দারোগার উদ্‌যোগ। আহত ও ঐঁড়া খান কাপড় ব্যতীত একখানি পাতলা রকমের পুরান শতরঞ্চ; আড়াই হাত লম্বা একটি ময়লা কাপড়ের থলে তাহার মুখে কতকটা লাল চিহ্ন এবং তাহার মধ্যে ৩৯/০ টাকা ও পয়সা ছিল; কোরা লংক্লথ কাপড়ের একটি সিরাণ ছিল। সে বলিল, "হাটের শেষে আপন নৌকায় টাকা পয়সা চালিয়া গণিয়াছিলাম, তখন নিকটে অপর হাটুয়ারা আপন আপন নৌকায় আসিতেছিল; নৌকা সকল তখন ঘাটে বাঁধা ছিল, ঘাটে অপর লোকও ছিল। সঙ্গে নৌকা বাহিবার সময়ে অপর এক নৌকার লোকেরা আমাদের নৌকা ধরিয়া দুই তিনবার আগুন চাইয়া লইয়াছিল। তাহাদিগের কাহাকেও না কাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিব। ঐ নৌকা হাটুয়া নৌকা বলিয়া বোধহয় নাই। আগুন লওয়া সময়ে আমি কাপড়ের মোটের উপরে সিরাণটি মেলিয়া দিয়া নিকটে বসিয়াছিলাম ও কখন শুইয়াছিলাম। টাকা পয়সার থলে কাপড়ের বস্তার ছিল।"

দারোগা আপন নৌকা দূরে রাখিয়া অপর এক নৌকায় মহাজনকে সঙ্গে লইয়া হাটের স্থান দেখিয়া আসিল। দেখিল এক চরের মধ্যে হাট বসিয়া থাকে। তাহা একটি ছোট দ্বীপের মত। পশ্চিমে বড়গাঙ; অপর তিনদিকে ছোট গাঙ; চরের মধ্যে কতক লোকের বাস, ছোট গাঙের মধ্যে নৌকায় কতকগুলি বেদেদিগের বাস। এই সকল দেখিয়া দারোগা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়া লইল এবং আপন নৌকায় ফিরিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগের কাছারী হইতে কয়েকজন পেয়াদার সাহায্য এবং আর ৩ খানি নৌকার যোগাড় করিল। প্রত্যেক নৌকায় এক একটা ডিগডিগি অথবা নাগারা দেওয়া হইল। এই প্রদেশে পুলিশ বা হাকিমের নৌকায় ডিগডিগি থাকে সকলে অবগত আছে। একরাত্রি শেষে চরের নিকটবর্ত্তী বড় গাঙে পৌঁছিয়া দারোগা আপন দল-বল তিনভাগে বিভক্ত করিল। প্রত্যেক নৌকায় এক এক পুলিস অফিসর এবং কয়েকজন জমিদারের

পেয়াদা দিয়া দুইখানা নৌকা বাঁশের দক্ষিণে ছোট গাঙের মুখে এবং অপর দুইখানা নৌকা উত্তরের ছোট গাঙের মুখে রাখা হইল, সূর্য উদয়ের পূর্বে তাহার শিঙার শব্দ শুনিলেই উভয় তরফ হইতেই সমকালের নাগারা বাজাইতে হইবে বলিয়া উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল। কয়েকজন বলবান পেয়াদা ও পুলিসের লোককে ঘাটের আশেপাশে রাখিয়া দারোগা স্বয়ং কাপড়ের মহাজনকে সঙ্গে লইয়া গাঙের ধারে ধারে বেড়াইতে থাকিল। নাগারার শব্দ শুনিবার পরে যে নৌকা হইতে কোন ব্যক্তি ঘাট হইয়া, কিসের ডিগডিগি, কি হইয়াছে, পুলিসের নৌকা নাকি, দারোগা কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, ঐ নৌকার উপরে সকলের দৃষ্টি রাখিবে এবং সঙ্কেত মতে সাহায্য করিবে বলিয়া সকলকে উপদেশ দেওয়া হইল। সূর্য্য উদয়ের আগে পূর্বদিগ কর্সা হইলে দারোগা শিঙা বাজাইল, অমনি উভয় পার্শ্ব হইতে নাগারা সকল বাজিয়া উঠিল।

পাঁচ ছয় মিনিট বাদে সঙ্কেত মত আবার নাগারার ডঙ্কা পড়িল। উভয় বারেই দক্ষিণ পূর্ব কোণের এক নৌকা হইতে এক ব্যক্তি পূর্ব কথিত মত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন দারোগা বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ নৌকা এবং ঐ প্রশ্নকর্তা লোকের উপরে লক্ষ্য রাখিতে এবং উহাকে চিনিতে পারে কিনা বলিয়া মহাজনকে জিজ্ঞাসিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিবার সময়ে তাহার সমস্ত শরীর ভালরূপে দেখা যাইতেছিল। মহাজন বলিল, তাহার নৌকা হইতে আগুন লওয়ার সময়ে ঐ ব্যক্তি আপনাদের নৌকার গলুইতে বসিয়া দাঁড় ধরিয়াছিল বেশ স্মরণ হইতেছে। এই সময় ঐ লোকটা আবার জিজ্ঞাসিল—হ্যাঁ গো! এখানে ডাকাইতি, না চুরি হয়েছে? পুলিশের নৌকা কেন? তখন দারোগা ঐ লোকটাকে নৌকা হইতে নামাইয়া আনিবার নিমিত্ত আপন লোকদিগকে আদেশ দিল। সে আসিতে নিতান্ত নারাজ। এই সময়ে আর এক যুবা ছোকরা ঐ নৌকার ধারে পূর্বমুখে মুখ ঘুরাইতে বলিল। তাহাকে দেখিবামাত্র মহাজন বলিয়া উঠিল ঐ ছোকরাই বারবার তাহার নৌকায় আসিয়া হাঁড়ি হইতে আগুন লইয়াছিল ঠিক স্মরণ হইতেছে। দারোগা ঐ যুবাকেও পাড়ে আনিতে বলিল। ইহাতে একটী স্ত্রীলোক ঐ নৌকার ছয়রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গালাগালি দিতে ও গোল করিতে লাগিল। অপরাপর নৌকার লোকেরাও আসিয়া আপন নৌকায় দাঁড়াইল। তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করে দেখিবার নিমিত্ত মহাজনকে উপদেশ দিয়া দারোগা আপনার লোকদিগকে প্রথম নৌকাখানা কিনারায় টানিতে বলিল। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ নৌকার মধ্যে ঠকাঠক শব্দ আরম্ভ হইল। টানটান বলিয়া হুকুম দিতে দিতে দারোগা স্বয়ং জলে নামিয়া ঐ নৌকাখানা টানিয়া সবলে জলে স্থলে কাদায় আনিয়া ফেলিল। দেখা গেল একটা করাল মূর্তি লম্বা পুরুষ নৌকার খোলে উবুড় হইয়া শুয়ে, বক্ষস্থলে শক্তরফ জড়ান একটা পোঁটলা রেখে, এক হাতে বাটালি এবং অপর হাতে এক মুগুর ধরে নৌকার তলা ছেঁদা করিতেছে। ছিদ্র সম্পূর্ণ হইলেই ঐ শক্তরফ সহ পুটুলীটি জলে ফেলিয়া এই ইচ্ছা প্রতীয়মান হইল। মহাজনের শক্তরফ, তাহার মধ্যে উহার পিয়াদ এবং টাকা পয়সার লম্বা থলে ছিল। ঐ লোকটাকে নৌকা হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। এক কৌপীন মাত্র পরিধান ছিল, টানাটানিতে তাহাও কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল। সমস্ত শরীর স্যাটো বলিয়া আরও তাহাকে লম্বা দেখাইতেছিল। কাদায় ও মাটিতে যেমন পা পড়িল, অমনি লোকটা উভয় বাহু প্রসারণ পূর্বক একটি পাক মারিল, আর আশেপাশে যে যে পেয়াদারা ধরিয়াছিল তাহারা খোলা কুচির মত ছরছর শব্দে চারিদিকে পড়িয়া গেল। লোকটা জলে ঝাঁপ দিয়া সাতারে গাঙ পেরুবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দারোগাও

দাঁতারিরা উহার লম্বা কেশগুচ্ছ ধরিল। জলে বুদ্ধ সময়ে লোকটা দারোগাকে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিল। অন্যান্য পুলিশের লোক, ও পেয়াদারা কেহ কেহ জলে পড়িয়া, কেহ কেহ নৌকা লইয়া সাহায্য করিল, বাঁশ দিয়া উহাকে মারিয়া এবং কাবু করিয়া নৌকায় টানিয়া তুলিল। দারোগাও দীর্ঘাকার এবং বিলক্ষণ বলবান পুরুষ। নচেৎ লোকটা হাতছাড়া হইত। স্ত্রীলোকটি কাল ভৈরব পুরুষের পত্নী। যুবাপুরুষটি উহার লম্বটী, এবং অপর লম্বা পুরুষটি উহার খুড়তুতো ভাই। নৌকায় কয়েকটি লম্বা লাঠি ছিল। অপরাপর বেদেদিগের নৌকায় নূতন থান ভাঁড়া কাপড় পাওয়া গেল সত্য কিন্তু তাহা মহাজনের কাপড় বলিয়া নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ হইল না। দারোগা ঐ কাটা নৌকা সমেত তিনজন পুরুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরে মহাজনের নিজের নৌকার সন্ধান হইল। লম্বা কাল ভৈরব পুরুষটি পুরাণ ক.. ' খালাসি বলিয়া জানা গেল। তাহার বাম হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের অংশ ছিল না। পূর্ব্বে এক রাত্রিতে বাম হাতে এক নৌকার হাড় ধরিয়া উহার খোল হইতে বাদন চুরি করিতেছিল, এই সময়ে চড়ন্দার কাটারির চোট মারায় কথিত দুই অঙ্গুলির কতক অংশ কাটা গিয়াছিল প্রকাশ হইল

যাহা হউক ব্রাহ্মণ দারোগার বুদ্ধির দৌড় ও সূক্ষ্ম নজর সকল সন্ধানের মূল।

* * *

নিউ ইয়র্কের বুক চিরে সমান্তরাল যে রাস্তাগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে তার একটিতে একদিন খুব ভোরে মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন এক সুপুরুষ যুবক।

হঠাৎ দেখা গেল পাশাপাশি আর একখানি মোটরে চলেছেন এক সুন্দরী যুবতী, যুবতীর পাশে হলিউডের বিখ্যাত ছায়াচিত্র পরিচালক হার্মে ভিক্। যুবতী মোটর চালাচ্ছিলেন।

পরিচালকের মনে অস্বস্তি। তাঁর একখানি নূতন বইয়ের জন্য অতি সুপুরুষ একজন অভিনেতা দরকার। যুবতীটি হলেন সেই ছায়াচিত্রের নায়িকা।

কিন্তু যুবকটির দিকে চেয়ে যুবতীর হাতের ষ্টীয়ারিং একটু বেঁকে গেল। পরিচালক লক্ষ্য করলেন সে ব্যাপার। তিনি তখনি যুবকটির মোটরের নম্বর নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। এইভাবে ছায়াচিত্রে আবির্ভূত হলেন রুডলফ ভ্যালেনটিন।

স্কাল স্কেরী

মূল : জন বুচান

অনুবাদ : গৌরীশঙ্কর দে

[জন বুচান খুব বেশী পরিচিত লেখক নন। রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচনায় কিন্তু তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। উত্তর মহাসাগরের মাঝখানে জনমানবহীন দ্বীপে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার সঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের প্রাণপণ সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক মনের জয়—এই কাহিনী পাঠকের মন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চুম্বকের মতো টেনে রাখবে।]

বহু বছর আগেকার কথা। আমি তখন রীতিমতো যুবক। এখনকার মতো সেই সময়ে ঠাণ্ডা বৈজ্ঞানিক ছিলুম না। পাখি যে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিলো এর কারণ ওরা আমার কল্পনাকে বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত করতো। আমাকে মুগ্ধ করতো। আমার মনে হতো পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সব চাইতে বিশুদ্ধ সত্ত্বা একমাত্র পাখিদের—যারা অমন ছোট আর যাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১২৫°। ভাবুন! শিমের মতো একরত্তি যার পেট সেই গোল্ডক্রেস্ট পাখি উড়ে যায় উত্তর মহাসাগরের উপর দিয়ে। কালিউ স্যাণ্ডপাইপার পাখি এত উত্তরে জন্মায় যে এ-যাবৎ পৃথিবীর মাত্র তিনজন লোক তাদের বাসা দেখতে পেয়েছে। ওই পাখিরা ছুটির দিন কাটাতে যায় তাসমানিয়ায়।

এইসব কারণে যখনই পাখি-শিকারে যেতুম আমার মনে দেখা দিতো এক অদ্ভুত প্রত্যাশা, দেহে আনে রোমাঞ্চ। যেন মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ কোনো দেশের সীমান্তে উপস্থিত হয়েছি। বিশেষ করে পাখিদের দেশান্তর যাত্রার শুরুতে এ-রকম মনে হতো। ওরা যে কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ছোট-ছোট ওই জীবগুলিকে আমার মনে হতো রহস্যের প্রতিমূর্তি। আমার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অন্য কোটির বাসিন্দা ওরা। নিজেই জানতুম না কিসের প্রতীক্ষা

করছি। তবু প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষায় থাকতুম। প্রথম প্রেমে-পড়া মেয়ের মতো। পরের ঘটনাগুলি বুঝতে গেলে আমার মনের এই অনুভূতি একটু বোঝা দরকার।

বসন্তে পাখিরা যখন ফেরে, বহু দূরে যাত্রা করে এক বছর পেলুম নরম্যাণ্ডি দ্বীপপুঞ্জে। অনেক লোকই ওই সময়ে যায় কিন্তু তাদের থেকে আমার উদ্দেশ্য ছিলো স্বতন্ত্র। আমার মাথায় তখন ঘুরছিলো একটা তত্ত্ব: যাযাবর পাখিরা উত্তরে এবং দক্ষিণে যায় সরু পথরেখা ধ'রে। আমাদের সড়কের মতো আকাশে আছে পাখিদেরও পথ। পাখিরা খুবই রক্ষণশীল, নির্দিষ্ট পথের স্মৃতি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে।

ফ্লু-ব্যাঙ্ক, ফুল, হালমারসনেস কিংবা অন্য কোনো দ্যাত অকল, যেখানে পাখিরা প্রথম অবতরণ করে সেখানে কিন্তু আমি যাইনি। পৌরাণিক কাহিনীগুলি প্রায় সব প'ড়ে ফেলেছি। ডুবার অকলের ভাষাও শিখেছি।

আর্লা পাগা বা আর্লসের সাগার একটি অংশ, আর্ল স্কালি-র সাগাতে লেখা আছে ফটল দ্বীপপুঞ্জে স্কালি যখন জমিদারী পত্তন করেন তখন পাখির দ্বীপ ব'লে একটা জায়গার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নানা আখ্যানে অকলটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে। উপাখ্যানকার সেখানকার পাখিদের বিচিত্র এবং বিস্ময়কর সম্মেলনের কথা বিশদভাবে বলেছেন। দ্বীপটি পাখির সাধারণ আড্ডা নয় তা স্পষ্ট। কারণ উত্তর দেশের লোকেরা পাখি খেয়ে এমন অভ্যস্ত যে সাধারণ আস্তানা হ'লে তার উল্লেখ মোটেই তারা করতো না।

আমার মাথায় চট ক'রে একটা চিন্তা এলো: দ্বীপটা নিশ্চয়ই পাখিদের একটি বিশিষ্ট অবতরণ স্থান। তাই যদি হয় তবে এগারো শতকের মতোই এখনো বেশ সরগরম। উপাখ্যান অনুসারে দ্বীপটি হালমারসনেসের কাছে, উনা দ্বীপের পশ্চিমে। স্থির করলুম উনাতে যাবো। আমার মগজে তখন কেবল পাখির দ্বীপ ঘুরছে। হালমারসনেস সংঘের অনেকগুলি দ্বীপের ভিতরে যে-কোনোটি সেই দ্বীপ হতে পারে। মানচিত্র দেখে তাই মনে হলো।

যাত্রার আগে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমার বহু প্রহর কাটলো। উত্তর দেশের ওই অকলের তথ্য উদ্ধারের চেষ্টায়। কিন্তু সামান্য তথ্যই উদ্ধার করা সম্ভব হলো। জানা গেলো—ষোড়শ শ্রেমেন-এর আমল থেকে—ওই দ্বীপে বহু সাধু-সন্ত পরম্পরাক্রমে বাস ক'রে গেছেন। আর্ল রোজন ভাল-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ওখানে একটা গির্জাও নির্মিত হয়েছিলো। স্ট্রাথার্ন ম্যালিসের সময় তা নষ্ট হয়ে যায়। জায়গাটার নাম উল্লেখ ক'রেই ঐতিহাসিক ক্ষান্ত হয়েছেন; কিন্তু লাতিন ভাষায় দ্বীপটা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন।

তার কী অর্থ বুঝতে পারলুম না। ভৌগোলিক অর্থে পাখির সেই দ্বীপ নিশ্চয়ই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত নয়; নরম্যাণ্ডস-এর উত্তরতম কিংবা পশ্চিমতম প্রান্ত নয়। আর গহ্বর বলতেই বা কিসের কথা বলা হয়েছে? সাধুদের ব্যবহৃত লাতিন ভাষায় গহ্বর মানে তো নরক—যুনিয়নের অন্তর্লাভ ধাম—কখনো কবর। কিন্তু সমুদ্রের একটা সাধারণ দ্বীপের বেলায় এই দু-রকম অর্থের কোনোটাই তো প্রয়োগ করা চলে না।

যে মাসের এক সন্ধ্যায় আটটা নাগাদ উনাতে গিয়ে হাজির হলুম। ভস থেকে নৌকায়

ক'রে। শান্ত সন্ধ্যা। একটুও মেঘ নেই। তবু আকাশ এত বর্ণহীন যে প্রায় ধূসর। তবু সেই রং মনে হলো পরিবর্তনশীল। দূরদেখা মনে হচ্ছিলো কঠিন ধূসর বাদামী রঙের মিশ্রণ। দূরদেখাকে বিভক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ঝলমলে সাদা বাতিঘর।

উত্তর অঞ্চলের অদ্ভুত আলোর বর্ণনা দিতে পারি এমন ভাষা আমার নেই। কখনো মনে হয় গভীর জলের মধ্য থেকে পৃথিবী দেখছি। কার্কহ্যারসন এই আলোর রংকে বলেছেন 'ধূসরঙ্গ'। এখানে এসে তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করলুম। কখনো মনে হচ্ছিলো আলো নয়, আলোর নির্যাস, শীতল তরল, বিশুদ্ধ; যেন হিমানী থেকে বিকীরিত। কোনো রং নেই। ছায়া পর্যন্ত ছায়া।

অনেককে এই আলো ভীষণ বিষণ্ণ ক'রে দেয়। কার্কহ্যারসন বলেছেন এই আলো নাকি তাকে মনে করিয়ে দেয় সকালবেলার নির্জীব কথা যার উঠোনে তাঁর সমস্ত বন্ধুরা সমাহিত রয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে ওই আলো মনে হলো স্বাস্থ্য ও আনন্দের উৎস। কিন্তু মনে হচ্ছিলো আমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে হাজির হয়েছি।

সরাইখানা নেই; তাই ডাকঘরে গিয়ে উঠেছিলুম। একখানি সমুদ্র আর একটা হ্রদের মাঝখানে ডাকঘরটা, তাই দু-রকম জলহাওয়াই চোখে পড়ে। পরদিন ভোরে রওনা দিলুম হালমারসনেসের দিকে। আরো পাঁচ মাইল পশ্চিমে। ছোট-ছোট হ্রদে ভরা জলা অঞ্চল। তবে যতখানি জল ঠিক ততখানি স্থল। শেষে হাজির হলুম একটা বড়ো হ্রদের ধারে। তার পরেই হালমারসনেস। একসারি টিলার মাঝখানে একটুখানি ফাঁক। তার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ছে আটলান্টিক। তার বুকে যে দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে তা দেখেই মন ব'লে উঠলো ওই তো আমার সেই দ্বীপ। সমুদ্র এক মাইলেরও কম। প্রায় সমতল; কেবল উত্তরে চোখে পড়ছে ঘাসে ঢাকা মস্ত ঢিবি; সমুদ্রের নাগালের বাইরে। কোনো-কোনো জায়গায় দ্বীপটা মাত্র কয়েক গজ চওড়া; তার দক্ষিণ দিক এত নিচু মনে হয় প্রায়ই জোয়ারের জলে ডুবে যায়। তবু দ্বীপ। মনে হলো সমুদ্রের বালুচরের খানিকটাও দেখতে পাচ্ছি। হালমারসনেসের চূড়ায় উঠলুম। আমার মাথার চারদিকে চক্কর দিতে লাগলো গোটা কয়েক রাশি ঝুরা পাখি। ওদের বাসা যে কাছেই। ওই উঁচু জায়গা থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

ওই আমার দ্বীপ। কারণ বাকি দ্বীপগুলি যে নিতান্তই সাধারণ। মূল ভূখণ্ডের পাহাড়ের চূড়ায় শিকারী পাখিদের বাসা; ওরা হিংসুটে, ঘুরাগত ক্লান্ত পাখিদের নিজেদের এলাকায় নামতে দিতে ওরা একান্তই নারাজ। তাই ওই দ্বীপটিই হতে পারে যাযাবর পাখিদের বিশ্রাম-স্থান।

০০০ ফুট উঁচু বাসাল্ট পাথরের টিলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম আধমাইল দূরের দ্বীপটার দিকে। আমার এবং গ্রীনল্যাণ্ডের মাঝখানে ওই হলো শেষ ভূমিখণ্ড। গ্রীনল্যাণ্ডের সমুদ্র প্রায়ই ক্ষুব্ধ থাকে। এখন কিন্তু শান্ত। তবে দ্বীপগুলি ঘিরে যে-সব ঢেউ উঠছে সেগুলির প্রান্তরেখা ভুবার-শুভ্র। বোধহয় জোয়ার আসছে।

আরো মাইল দুই দক্ষিণে চোখে পড়েছিলো বিখ্যাত উনা ক্লেটের প্রবেশপথ। সেখানে জোয়ার এবং বাতাস যখন একত্র হয় তখন বাড়ির মতো এমন এক ঢেউ দেখা দেয় যে তা অতিক্রম ক'রে যাওয়া ছোট স্টীমারগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষের বাসস্থান বলতে ক্লেটের দিকে নিচু জায়গায় ধূসর রঙের ছোট একটা খামার বাড়ি। ওখানে যে লোক থাকে তার যথেষ্ট প্রমাণ

চোখে পড়ছিলো—বরফাচ্ছাদের একপাশে টাটুঘোড়া, মালিকের নাম তাদের গায়ে লেখা, ওই অঞ্চলেরই একপাল ভেড়া, টিলার উপর থেকে ঝুলে-পড়া ভাঙাচোরা কাঁটা তারের বেড়া।

টেলিগ্রাফ আপিস থেকে এক ঘণ্টার হাঁটা-পথ। ওই গ্রামে খবর কাগজ পৌঁছাতে দিন তিনেকের বেশি দেরি হয় না। বসন্তের চমৎকার দুপুর। শূন্য উজ্জ্বল অঞ্চলটার কোথাও এতটুকু ছায়া নেই।

শুধু দেখে-শুনে মনে হলো দ্বীপটা যে উপাখ্যান রচয়িতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো, এবং সাধুসন্তরা যে একে পবিত্র বলেছেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো খালি দেখালেও এর কোথায় যেন কী লুকিয়ে আছে। দ্বীপটা যেন অনধিকার প্রবেশকারী। চতুর্দিকের দৃশ্যাবলীর মাঝখানে একটা অসঙ্গতি। এখানে একে বসিয়ে রেখে গেছে কেবল খেয়াল। স্থির করলুম ওখানেই তাঁবু ফেলবো। কেন জানিনা সেই ইচ্ছাটা দুঃসাহসের মতো মনে হলো।

দুপুরের আহারের পর জন রোনাল্ডসনের সঙ্গে কথা ব'লে জানলুম তারও একই মত। জন হলো পোষ্টমিস্ট্রেসের ছেলে।

ছেলে হিসেবে তার দক্ষতা বলার অপেক্ষা রাখে না। নর্থম্যাণ্ডের অন্য সব যুবকের মতো সে-ও দক্ষ নাবিক। পশ্চিম উপকূলের নাড়ি-নক্ষত্র-তার নখ-দর্পণে। আমার পরিকল্পনা বুঝতে সময় নিলো। শেষে, কোন দ্বীপটির কথা বলছি তা জানতে পেরে ঘোর আপত্তি তুলে বললো: "নিশ্চয়ই স্কাল স্কেরী-র কথা বলছেন না? ওখানে যাবেন কী করে? হালয়ারসনেসেই তো কত পাখি। স্কেরীতে গেলে বাতাসের ঝাপ্টাতেই আপনি উড়ে যাবেন।"

যুক্তি দিয়ে আমার উদ্দেশ্য তাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিলুম। বললুম বাতাসের ভয়ও তার অমূলক। যে-দিক থেকে বাতাস বইছে সে-দিকে দ্বীপটিকে আড়াল করে রেখেছে টিলা। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম আর পশ্চিম থেকে কেবল বাতাসের ভয়। কিন্তু মে মাসে তো ওই দিকগুলি থেকে বাতাস আসে না।

জন জানালো: "ঠাণ্ডা পড়লো ব'লে। জোয়ার আসছে।"

জবাবে তাঁবুটা দেখিয়ে দিয়ে জানালুম তাঁবুতে থাকতে আমি অভ্যস্ত।

"না খেতে পেয়ে মরবেন।" তাকে খাদ্য-সংগ্রহের উপায়টা জানালুম।

"ওই দ্বীপে যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক।" খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সে স্বীকার করলো স্বাভাবিক অবস্থায় জোয়ার খুব ভয়াবহ নয়। যে খামার বাড়িটা দেখেছি সেখান থেকে একটা নৌকাও ভাড়া পেতে পারি। তবু সব কথা বলার পরও সে আপত্তি তুললো। তখন তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলুম স্কাল স্কেরীর রহস্যটা কী!

কর্কশ গলায় সে বললো: "ওখানে কোনো মানুষ যায় না।"

বললুম: "কেনই বা যাবে। আমিই কি যেতুম। যাচ্ছি পাখি দেখতে।"

তবু, ওখানে যে লোক যায় না এ-কথাটা তার গলায় যেন আটকে রইলো। একটু অবাক হলুম। শেষপর্যন্ত সে ব'লেই ফেললো: "জায়গাটার দুর্নাম আছে।"

পীড়াপীড়ি করতে সে স্বীকার করলো কোনো জাহাজডুবি কিংবা দুর্ঘটনা ঘটেছে ব'লে জায়গাটার দুর্নাম নয়। স্কাল স্কেরী শব্দটা সে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করলো; যেন শব্দটা তার মোটেই ভালো লাগছে না।

"লোক ওর ধারে কাছেও যায় না। জায়গাটার দুর্নাম আছে। ঠাকুর্দা বলতেন দ্বীপটা ভূতুড়ে।"

নরম্যাণ্ডের লোকেরা মোটেই কেল্টদের মতো নয়। কর্নিশম্যানদের থেকে ব্রিটনিয়ানরা যে-রকম স্বতন্ত্র, হেব্রিডিয়ানদের থেকে সে-রকম এরা। এরা সচ্চরিত্র, বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন জাতি। এদের দেহে ক্যাভিনেভিয়ান জাতির বিশুদ্ধ রক্ত। কিন্তু ম্যানচেস্টারের চরমপন্থীদের মতো এদের ভিতরেও কবিতার খুবই অভাব। কুসংস্কার এদের মধ্যে একেবারেই নেই। এই অঞ্চলের বহু দ্বীপে ঘুরেছি, কিন্তু কোনো লৌকিক গল্প, এমনকি ঐতিহাসিক আখ্যানেরও সন্ধান পাইনি।

আর তাদেরই মধ্যে একজন, বহু কড়-খাপটা সহ্য করে যার মুখ আর চিবুক এখন শক্ত, চতুর চোখ দুটি যার নীল, সে-ই কিনা একটা নির্জন দ্বীপ সম্পর্কে বলছিলো ওটা ভূতুড়ে; তার কাছে যেতেও ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছিলো!

আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। দ্বীপটার নাম স্কাল স্কেরী। তার মানে নামটা এসেছে আর্স ভাষা থেকে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে আমি সাগা, স্নেয়েন-এর আদম, এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তা তো এই দ্বীপটি সম্পর্কেই।

পরদিন ভোরে নৌকোয় ক'রে আমাকে ওই দ্বীপে পৌঁছে দিতে জন শেষপর্যন্ত স্বীকার পেলো। দিনের বাকি সময়টা কেটে গেলো তল্পি-তল্পা বাঁধতে। আমার ছিলো ছোট একটা তাঁবু, খান দু-সাতেক কম্বল। টিনে ভরা কিছু খাবার আমার সময় দোকান থেকে কিনে এনেছিলুম। দরকার ছিলো শুধু কিছু ময়দা, আর মুদীর দোকানের কয়েকটা ছোট-খাট জিনিস। শুনলুম দ্বীপে একটা কুয়ো আছে, আছে প্রচুর জ্বালানী কাঠ। তবু নিশ্চিন্ত থাকবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেলুম কিছু কয়লা, আর তেল।

পরদিন জনের নৌকোয় চ'ড়ে রওনা দিলুম। জোয়ারের সময় বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে গেলুম উনাক্সের মধ্য দিয়ে। উপকূল ধ'রে চ'লে বিকেলে হাজির হলুম স্কেরীতে।

পরিষ্কার বুঝতে পারলুম জন দ্বীপটাকে ঘৃণা করে। পুব দিকে একটা খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। এমন ভাবে তীরে সে নৌকা ভিড়ালো যেন সে ভয় পাচ্ছিলো। কেউ তাকে তীরে ভিড়াতে বাধা দেবে। সব-সময় ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলো। টিলায় নেমে একটা গর্তমতো জায়গায় আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সময়ও তার চোখে মুখে ছিলো সেই সন্ত্রস্ত ভাব।

রমণীয় দ্বীপটি আমার চোখে মনে হলো শান্তিনিকেতন। ঢেউ এসে আলগোছে লুটিয়ে পড়ছে টিলার গায়ে, উপল-উপকূলে। শুধু সায়রের ডাক মাঝে-মাঝে স্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে।

চ'লে যাবার জন্য জন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তবে কর্তব্য কাজে অবহেলা করেনি। তাঁবু খাটাতে সাহায্য করলো, রান্না রাখার জায়গা ক'রে দিলো, কুয়ো দেখিয়ে দিলো, বালতি ভ'রে জল রাখলো, অ্যাটলান্টিকের দিকে থেকে বাতাস এসে যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য পাথর দিয়ে পাঁচিল তুললো। আমরা সঙ্গে একটা ডিঙিও নিয়ে এসেছিলুম। ঠিক হলো সেটা আমার হেফাজতেই থাকবে, যাতে দরকার মতো এখান থেকে চ'লে যেতে পারি। তারপর টিলার মাথায় একটা পুরোনো কাপড় মেলে গোটা দুই পাথর দিয়ে তা চাপা দিয়ে রাখলো। সেই কাপড়টার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে তেলের গাঁদ। প্রয়োজনের সময়ে ওটা বাতিঘরের কাজ করবে।

"হয়তো আপনি এখান থেকে পালাতে চাইবেন। অথচ নৌকা থাকবে না। তখন ক্যাপ্টেনে আগুন ধরিয়ে দেবেন। তাহলেই আমি খবর পাবো। ডেকীতে মাকস ব্ল্যাক সিগ্নী নিয়ে এলেও আপনাকে উদ্ধার করতে আসবো।" তারপর চারদিকে তাকিয়ে বাতাস শুঁকে বললো: "আকাশের চেহারাটা ভালো লাগছেনা। আবহাওয়া খুবই খারাপ। আগামী চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় হবে।"

এই ব'লে সে পাল তুলে রওনা দিলো। একটু পরেই কুয়াশার কাছে সমুদ্রের মাঝখানে তাকে মনে হলো একটা বিন্দু। তাড়াহুড়ো করার দরকার তার ছিলোনা। কারণ সমুদ্র স্থির হয়ে উঠেছে। রাত পেরুবার আগে তাকে এ-দিকেই অন্তত ঘণ্টা তিনেক আটকা পড়তে হবে। কিন্তু লোকটা যাবার জন্য যেন পাগল হয়ে উঠেছিলো।

ও চ'লে যাওয়াতে নির্জনতা আমার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। মনে দেখা দিলো সীমন্ত প্রত্যাশা। আমার সঙ্গী এখন শুধু সমুদ্র আর পাখি। অন্যের মতো জোয়ান লোকের মধ্যেও কুসংস্কার আছে ভেবে আমার হাসি পেলো। যেমন সে, তেমন তার মাকস ব্ল্যাক সিগ্নী! উত্তরদেশের প্রাচীন কাহিনী আমি জানি। তাতে আছে সমুদ্রের গভীরে যেসব প্রেত বাস করে, সেই কিনরা প্রয়োজনমতো সীলমাছের চামড়ার গা ঢেকে মানুষের সর্বনাশ করতে উপকূলে উঠে আসে।

কিন্তু সেই কুহকের দেশ আর আমার এই দ্বীপের মাঝখানে আসমান জমিন ফারাক।

ওপাল রঙের জোয়ারে কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকে, ম্লান মেঘে রচিত অযোরা বোরিয়ালিসের মতো দীপ্তিহরা আকাশের নিচে সূর্য ডুবে গেলো। মনে হলো হঠাৎ এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে প্রকৃতি স্বেচ্ছায় খুলে দেয় তার রহস্য-দ্বার। আলো ম'রে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো অতিকায় কোনো নেবুলা-বৃক্ষের ডালপালা আর শিকড়ে ভ'রে গেছে আকাশ। জন রোনাল্ডসন্ ঠিকই বলেছিলো: আবহাওয়া খারাপ।

আগুন ধরিয়ে রান্নার আয়োজন করলুম। রাত্রিবেলা যাতে কষ্ট পড়তে না হয় তার দামামতো ব্যবস্থা করা গেলো। যাযাবর পাখিদের সম্পর্কে আমার অনুমানই ঠিক। আগুন নিবে গেলো। ঘুমোতে যাবার আগে আরাম করে পাইপ টানছি, রাত দশটা নাগাদ পাখিরা নামতে শুরু করলো।

ডেকীর দক্ষিণ অংশে এসে আলগোছে নামলো একঝাঁক ফ্লেমব্যাক পাখি। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত টিঁকে রইলো সামান্য আলো। তবে ছোট-ছোট ওই পাখিগুলোর চেহারা ভালো ক'রে দেখার উপায় ছিলোনা। আমি যে আছি তা ওরা টের পেয়েছিলো। আমার বারো গজের ভিতরেও আসছিলো না। তবু মনে হলো ওই পাখিদের ভিতরে রয়েছে গ্রীনল্যাণ্ড পুইটায়, আকলপাইন, স্যাণ্ডারলিং ইত্যাদি পাখি। ডাক শুনে বুঝলুম ওদের ভিতরে কানিউ স্যাণ্ডপাইপার, আর হুইম্ব্রেল পাখিও আছে। দারুণ উত্তেজিত অবস্থায় ঘুমুতে গেলুম। আগামী কাল যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে তার জন্য ওই আনন্দ।

ভালো ঘুম হলো না। খোলা-মেলা জায়গায় প্রথম রাত্রি কাটাতে এসে এ-রকম অনেকেরই হয়। চমকে-চমকে বহুবার জেগে উঠলুম; মনে হলো-যেন নৌকোতে ব'সে বেগে জোয়ারের সঙ্গে ভেসে

চলেছি। যতবার জেগে উঠলুম ততবারই শুনতে পেলুম বিচিত্র পাখির পাখার ঝাপট। যেন শুক-কাঠের মেঝেতে কেউ ধীরে নিজের পর্দা টেনে নিচ্ছে। শেষে গভীর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো। যখন চোখ মেললুম তখন রীতিমতো দিন।

জেগেই মনে হলো ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। পুব দিকের আকাশ ঘটিকা-লাল। উত্তরে পশমের মতো মেঘ জমেই ঘন হয়ে উঠছে। অসাড় আঙুলে আগুন ধরিয়ে তাড়াতাড়ি চা ক'রে নিলুম।

হালমারসনেদের মাথায় বর্ষণমেঘের মতো সিন্ধুপক্ষির দল। কিন্তু আমার দ্বীপটিতে মাত্র একটি পাখি। তার বিভক্ত পুচ্ছ দেখে অনুমান করলুম ওটা নিশ্চয়ই সেবাইনের সারস হবে। দূরবীন বের করবার আগেই ওটা উত্তরের আকাশে মিলিয়ে গেলো। এ দৃশ্য আমাকে আনন্দিত এবং উত্তেজিত ক'রে তুললো। বেশ মেজাজে সকালের খাবার তৈরি করলুম।

আমার কাছে ওই পাখিটাই শেষ এসেছিলো। অবশ্য সাধারণ কয়েকটা সারস আর কয়েকরোস্ট পাখিকে বাদ দিয়ে বলছি। তারা তো হালমারসনেদের সর্বত্র বাসা বাঁধে। (দ্বীপে পাখির বাসা একটাও নেই। যেখানে যাযাবর পাখিরা বিশ্রাম নিতে আসে সেই সব জায়গাতেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়)। ওই আকাশযাত্রীরা নিশ্চয়ই আসন্ন ঝড়ের খবর পেয়ে থাকবে। তাই ওরা দক্ষিণে কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করছে।

নটা নাগাদ বাতাস বইতে শুরু করলো। ঈশ্বর। সে কি বাতাস। বাতাস কি জিনিস জানতে হলে নরল্যাণ্ডে যাওয়া চাইই চাই। মনে হলো যেন পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি; বাতাসকে বাধা দেবার মতো কোনো আড়ালই সামনে নেই। বৃষ্টি নেই; কিন্তু চটগুলি টিলার গায়ে ধাক্কা লেগে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে তারপর বৃষ্টির মতো নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে স্কেরীর পাদদেশ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হালমারসনেদ ঢাকা প'ড়ে গেলো। মনে হলো দাঁড়িয়ে আছি জলাবর্তের মাঝখানে। চারদিক থেকে জলকণা ছুটে আসছে। আমার শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হলো।

তক্ষুণি আমার তাঁবুটা হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো। পাগল ক্যানভাসটার সঙ্গে লড়াই করছি। বাঁশের খোঁচা লেগে চোখ ফুলে উঠলো। জন যে পাথরের জোয়ালটা বানিয়েছিলো তার কাছে তাঁবুটা টেনে নিয়ে গেলুম। চাপা দিয়ে রাখলুম কয়েক খণ্ড বড়ো পাথর দিয়ে। তবু, তাঁবুটা পাখা ঝটপট করতে থাকলো কুদ্ধ অ্যালবেট্রস পাখির মতো। আমার খাবারের বাক্সে জল ঢুকলো, আগুনটা নিভিয়ে দিলো, ভিজিয়ে দিলো আমার পোশাকের প্রতিটি ইঞ্চি।

গত রাতে প্রত্যাশা ছিলো সামনে আসছে শান্ত দিন। সব দেখতে পাবো, ধ্যান করতে পারবো। নিতে পারবো নোট। তার পরিবর্তে সকালটা কাটাতে হলো রাগার ক্রুমের মতো। ও-রকম না ভিজলে, ঠাণ্ডা হয়ে না গেলে, এবং টিন থেকে চটচটে খাবার খেতে না হ'লে হয়তো ওই আবহাওয়া উপভোগই করতুম।

অনেকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করেই বলেন বেপরোয়া "উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো কথাটা সত্য, একেবারে খাঁটি সত্য। সড়াতে সড়াতে গিয়ে কেনিল সমুদ্রের মধ্যে পড়বো এই ভয়ে, প্রাণের ভয়ে কয়েকবার তো পাথর আঁকড়েই প'ড়ে রইলুম।

বেলা ছুটো নাগাদ ঝড়ের বেগ অনেকখানি কমে এলো। এই প্রথম মনে পড়লো ডিঙিটার কথা। যে খাঁড়ির ভিতরে ওটাকে রেখে এসেছিলুম ধড়ফড় বুকে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। বহু

উঁচুতে, বড়ো পাথরের সঙ্গে ওটা আটকে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু এখন একটা ছেঁড়া দড়ি ছাড়া আশেপাশে কোথাও তার চিহ্নও ছিলো না। জোয়ারের জল সেই উঁচু পর্যন্ত উঠে এসেছে। জোয়ার এবং বাতাস মিলে ভেঙে ফেলেছে জীর্ণ কাঠ। বাকি কাঠ বোধ হয় এখন আন্দোলিত হচ্ছে জলের তলে।

পরদিন আমার সঙ্গে জনের দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু সামনে যে আরো চব্বিশ ঘণ্টার দিন-প্রহর। অবশ্য অগ্নি-সংকেতের উপায়ও সে রেখে গেছে। কিন্তু তা ব্যবহার করার ইচ্ছা তখনও আমার জন্মে না। তা হবে স্পঞ্জ ছুঁড়ে ফেলার সামিল এবং তার ফলে আমার অভিযান একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কষ্ট হচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু ক্লেশও চেপে গিয়েছিলো। আবহাওয়া যখন একটু শান্ত হয়ে আসছে তখন দেখাই যাক না কী করা যায়। আমার ক্যাম্পটা যেখানে ভেঙে চুরে প'ড়ে আছে সেখানে গিয়ে ওটাকে আবার দাঁড় করাবার চেষ্টা করলুম।

বাতাস এখনো তাঁবুর ক্ষতি করতে পারে। তবে প্রচণ্ডতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন বিছানা পত্র এবং জিনিসগুলি একটু শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে। প্যাক থেকে নতুন পোশাক বের করলুম। জেলেদের বুট আর চামড়ার পোশাক প'রে মনে হলো একটু ভালো লাগছে। পাইপও ধরানো গেলো। টিলার নিচে পাওয়া গেলো একটা আশ্রয়। তামাকু সেবন করতে করতে চিন্তায় ডুবে গেলুম।

বিকেল তিনটের সময় বাতাস একেবারে ম'রে গেলো। সেটা আমার খারাপ লাগলো। কারণ নরনারীতে বাতাসের একেবারে বিরতি নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস। একেবারে বাতাস নেই এরকম অবস্থা এর আগে আমার চোখে পড়েনি। শুনেছি যখন এরকম হয় তখন লোক বাইরে বেরিয়ে এসে জিগেস করে 'ব্যাপার কী!' বাতাস বলতে সত্যি কিছু ছিলো না।

সমুদ্র যেমন হিংস্র, তেমনি উর্মিল। অসম্ভব বেগে ছুটে চলেছে স্রোত। হালযারসনেস একেবারে আড়ালে চ'লে গেছে। একতালি ঘুসর জল ছাড়া সেদিকে আর কিছুই নজরে পড়ছে না। ঝড়ের হৈ-হল্লোড় একেবারে থেমে যাওয়ায় চারদিকে এখন ভৌতিক স্তব্ধতা। তোরের তর্জন-গর্জনের তুলনায় এখনকার সমুদ্রের শব্দ ঝিরঝির বকুনি, তোরের প্রতিধ্বনি।

ওখানে ব'সে থাকতে-থাকতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। মনে হলো আমি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি; শুধু আমার পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে নয়, মানুষের বাসভূমি পৃথিবী থেকেই আমি আলাদা হয়ে পড়েছি। আর ফিরে যাবার উপায় নেই। যেন অ্যাটল্যান্টিকের মাঝখানে একটা ছোট নৌকায় ভেসে চলেছি। আমি যে অবস্থায় আছি তার চাইতে সেও বোধ হয় ভালো হতো; কারণ যতই নির্জন হোক তবু ওই সমুদ্র ঘিরে আছে তো মানুষের কত কীর্তি। আর আমি যেন এখন মানুষের আওতার বাইরে এসে পড়েছি। যে জগতে শুধুই শূন্য তারই একেবারে পাশে যে জগতে আছে জীবন, যে জগতে ছিলো জীবন, তার শেষ সীমান্তে আমি কী ক'রে হাজির হয়েছি।

প্রথম দিকে এই বোধের ভিতরে ভয় একেবারেই ছিলো না। ছিলো শুধু বিস্ময়। যে বিস্ময় উদ্বেলিত না করেও আতঙ্কের শিহরণ জাগায়। ওই বোধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। হাত-পা ছড়াবার জায়গা অবশ্য তেমন একটা ছিলো না। অসাড় পা নিয়ে খাঁড়ির

পাড়ে চলতে গিয়ে পা পিছলে জলে প'ড়ে গেলুম। হাত দুটো ভিজে গেলো। অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডা লাগছে —যেন অক্ষাংশের দূরত্বের চূড়ান্ত-শীতলতা। মনে হলো এই দিয়ে গায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়বে, যা হবে।

সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হলো আমার জীবনের সব চাইতে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। হঠাৎ হতাশায় মন একেবারে অবশ হয়ে গেলো। চোখের সামনে জ্বলে উঠলো ভয়ের প্রচণ্ড আলো। কিন্তু সেই ভয়ে অসাড়তা নেই। আমার মস্তিষ্ক তখনো সচেতন, সক্রিয়। মন বলছিলো চা বানাতে হবে, কিন্তু আগুনই যে নেভা। তার চাইতে কাপে ব্রাণ্ডি ঢেলে চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলেই ভালো হবে। তাতেও আমার ঠাণ্ডা শরীর গরম হলো না। আমি সংযত চরিত্রের লোক ব'লে তাতে চিন্তা প্রসারিত না হয়ে বরং আরো থেকে গেলো। পিতার মতো আতংক আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। স্কাল স্কেরীর নামের তাৎপর্য তখন আমার কাছে স্পষ্ট। প্রকৃতির কোনো আহ্বানে, কী আমার পক্ষে অনুমান করা দুঃসাধ্য, এই দ্বীপটা পড়েছে এমন এক পথে যার ভিতর দিয়ে উত্তরমেরু তার প্রভাব বিস্তার করে। নির্ঘাত হিমপ্রবাহের এই সড়ক। সেই সড়কে মানুষের উপস্থিতি সম্ভব, কিন্তু সেই প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তাকে রোধার ক্ষমতা মানুষের নেই।

অক্ষাংশ এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তবু মহাকাশের রয়েছে তীক্ষ্ণ এবং খাঁজ, যেন এই দ্বীপই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত। পাখিরা তা জানতো, জানতো উত্তরের লোকেরা। তারাও যে পাখিদেরই মতো আদিম। তাই এই দ্বীপটির ওই নামকরণ। পুরোণো সত্তরা জানতেন, তাই নির্জা তৈরি করে অন্ধকারের দানবী শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা তারা করেছিলেন। অবাক হয়ে ভাবছিলুম আমি যেখানে ব'সে ভয়ে কাঁপছি তার কাছেই তো সত্তরের আস্তানা ছিলো, এখান থেকে তারা শীতের গোধূলিতে কী চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন কে জানে।

খালি পেটে ব্রাণ্ডি পড়ার ফলই হোক, আর ভয়ংকর ঠাণ্ডার জন্যই হোক, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার মগজে তখন যেন ডিনামাইট কাজ করছিলো। আমার তখনকার অনুভূতি বুঝিয়ে বলা শক্ত। মনে হলো আমি যেন দুই ব্যক্তি—একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ, মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার এবং অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য চেষ্টা করছে। তবু-একটা আদিম শক্তি মাথা তুলতে চাইলো। আমার দ্বিতীয় সত্তাই যেন প্রবল হয়ে উঠলো।

আমি বুঝি জাহাজ থেকে ছিটকে দিশাহারা সমুদ্রে প'ড়ে গেছি। সভ্যতা থেকে ছিটকে পড়েছি বাইরের জগতে; সে জগতের প্রভাবই এখন আমার উপরে।

চিন্তা করার ক্ষমতা আর নেই। তবে স্মৃতিশক্তি তখনো হারাইনি। নর্স অভিযাত্রীদের সম্পর্কে যে-সব কথা পড়েছিলুম সব মনে এলো। মনে করতে বাধ্য হলুম। তারা নানা রকম আতংকের মুখোমুখী হয়েছিলো—পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সামুদ্রিক প্রাচীর, আর অদ্ভুত জীবজন্তুতে ভরা কার্ডলেস সমুদ্র। আমাদের মতো স্টীমারে ক'রে, বাবার-বাবার আধুনিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে, তারা উত্তরের দিকে পাড়ি দিতো না। তাদের সঙ্গে অসংখ্য নাবিকও থাকতো না। তবুও মৌকোয় চ'ড়ে তারা পাড়ি দিয়েছে একা। তারা যা জেনেছে আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব হবে না আর কোনোদিন।

তবুও একটা ভয়ংকর কথা মনে এলো। একটা গন্ধের জন্য হাতড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ তা পেয়ে গেলুম। এই দ্বীপটা গহ্বরের পাশে। আর সেই গহ্বরটা হলো উত্তরের সেই প্রাচীর, প্রাণকে অস্বীকার ক'রে যার অস্তিত্ব।

সেই শোচনীয় স্মৃতি মনে আসা মাত্র উটের পিঠে শেষ খড়ের বোঝা পড়লো। মনে পড়ছে জোর ক'রে উঠে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কাঠ একেবারে ভেজা। আতংকিত হয়ে আবিষ্কার করলুম আমার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা দেশলাই কাঠি আছে। বাকি বাক্সগুলি সকালেই নষ্ট হয়ে গেছে।

উলটে-উলটে চোখে পড়লো জনের সেই কাপড়ের পুটুলিটা। তাতে আগুন ধরাতে গিয়েও ফিরে এলুম। আমার মধ্যেকার মনুষ্যত্বই আমাকে বাধা দিলো। ছেলেমানুষের মতো পরাজয় স্বীকার করতে তো পারি না। পরদিন ভোরে জন রোনাল্ডসন না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। এক ঢোক ব্রাণ্ডি গলায় ঢাললুম, আর পাটা কয়েক ছাতানো বিস্কুট। কিন্তু গলা দিয়ে নামছিলো না। মারকীয় শীতলতা ক্ষুধা তীব্র করে তোলার পরিবর্তে জাগিয়ে তুলেছে দারুণ তৃষ্ণা।

সমুদ্র পেছন ক'রে ব'সে রইলুম। যত মুহূর্ত যাচ্ছে, তত যেন আমি আরো শিশু হয়ে পড়ছি। মনে হলো—উত্তরের সেই অদৃশ্য সড়ক দিয়ে অপরিচিত ভয়াবহ কী যেন আসছে। আমার স্নায়বিক পরিস্থিতি বোধ হয় তখন খুবই খারাপ ছিলো। কারণ শরীর স্থির, শুষ্ক এবং ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও শারীরিক কষ্ট বোধ করছিলুম না। ভয়ার্ত বালকের মতো বুকটা কেবল ধড়ফড় করছিলো। কিন্তু সমস্ত সময় আমার ভিতরের দ্বিতীয় মানুষটি দূরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করছিলো আমার নির্বুদ্ধিতাকে।

আমি এক ঝাঁক পাখির পাখার খসখসানি শুনতে পেলেও আমি মৃদু নিশ্বাস ফিরে পেলুম। কিন্তু সে-রকম পাখি সারাদিনে একটাও কাছে এলো না। আমি যে জগতে এসে পড়েছি তা জীবন-বিনাশক, তা হলো মৃত্যুছায়ার উপত্যকা।

উত্তরের দীর্ঘস্থায়ী গোধূলির আলোও কুয়াশায় ঢাকা প'ড়ে গেলো। চারদিক প্রায় অন্ধকার। প্রথমটায় মনে হলো এতে আমার সুবিধাই হবে। খানকয়েক আধা শুকনো কম্বল দিয়ে বিছানা করলুম।

ঘুমুতে পারলুম না। দাঁত ঠক-ঠক করে গেলেও নতুন একটা নির্বোধ চিন্তা আমাকে আক্রমণ করলো। জন রোনাল্ডসন যাবার সময় যে কথাগুলি ব'লে গিয়েছিলো সে-কথা মনে করেই চিন্তাটা এলো। ব্ল্যাক সিল্কী সম্পর্কে সে কী বলেছিলো? যে জিন গভীর সমুদ্র থেকে এই দ্বীপে উঠে আসে তার সম্পর্কে? নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে এ-সব কথা ভাবছি। কিন্তু যখন ঠাণ্ডা চেউ আমার চারদিকে আছড়ে পড়ছে, ঘনিয়ে আসছে রাত্রি তখন জনমানবহীন এই দ্বীপে একা ব'সে কোনো কিছুই কি অবিশ্বাস করা কি সম্ভব?

তবু সেই নির্বোধ চিন্তা করতে গিয়ে মনে অন্য একটা প্রতিক্রিয়াও হলো। নিজের মূর্খতাকে ধিক্কার দিলুম। যুক্তি দিয়ে নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুঝলুম আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। যে প্রাকৃতিক কারণ পুরোপুরি এখনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তারই প্রভাবে আমার এই শারীরিক প্রতিক্রিয়া। আমার দুই বন্ধুর এ রকম হয়েছিলো শুনেছি।

এই চিন্তা ক'রে মনে একটু বল পেলুম। প্রাকৃতিক কারণই যদি আমার দুর্গতির কারণ হয় তবে তার জন্য প্রতিকার চাওয়াতে কোনো লজ্জা নেই। ঈশ্বরের পবিত্র ভূমি থেকে নির্বাসিত এই দ্বীপ আমাকে অবিলম্বে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে।

কাপড়ের পুটুলিটাতে আগুন ধরাতে কোনো অসুবিধা হলো না। কারণ ওটা ছিলো খুবই উঁচুতে এবং দাহ্যবস্তুতে ভরা। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তার গায়ে ধরতেই দপ করে আকাশে তার লেলিহান শিখা উঠলো।

আলো-অন্ধকার যদি অপার্থিব মনে হয়ে থাকে তবে এই উজ্জ্বলতা আরো বেশি অপার্থিব মনে হলো। ওই দীপ্তি মুহূর্তের জন্য আমার মনে আস্থা ফিরিয়ে আনলো, কিন্তু যখন ভয়ংকর আলোকিত, গোলাকার, গতিহীন জলের উপরে আমার চোখ পড়লো তখন আগেকার ভয় আবার ফিরে এলো। জলের এখানে আসতে কতক্ষণ লাগবে? যাদের সে পাহারায় রেখেছে তারা আলো দেখতে পেলেই তাকে খবর দেবে। জন একটুও সময় নষ্ট করবে না। সে তো আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলো। এখানে পৌঁছাতে তার এক ঘণ্টা, বড়ো জোর দু ঘণ্টা লাগবে।

ইচ্ছা থাকলেও জল থেকে চোখ ফিরাতে পারলুম না। যেন বেগে প্রবাহিত হয়ে আসছে উত্তর থেকে, মুসসুরাহের বরফের হ্রদের মতো কালো, তামার মতো অপ্রতিরোধ্য, নরকের মতো নিষ্ঠুর। সেই জলে অদ্ভুত সব মূর্তি সাঁতরে বেড়াচ্ছে ব'লে মনে হলো। অন্ততঃ আগুনের কাঁপা শিখার ছায়া ওগুলি নয়। মৃত্যু নদী থেকে যে কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর কিছু উঠে আসবে। আমার হাঁটু ভেঙে এলো, হৃৎপিণ্ডটা কুঁকড়ে গেলো শিমের মতো। দেখলুম সত্যি কী যেন উঠে আসছে।

সমুদ্র তোলপাড় করে উঠে আসছে। একটুখানি ডুবে গিয়ে সেটা আবার মাথা তুললো। আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে। আমার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো। টিলার চূড়ায় আগুনটা নিবে আসছে। শেষবারের মতো দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। আর তাতে মনে হলো সেই ভয়াবহ জিনিসটার যেন চোখে ধাঁধা লেগেছে।

দেখলুম ষাঁড়ের মাথার মতো মস্ত একটা কালো মাথা—বাঁকানো কুঁকড়ানো প্রাচীন মুখ—তাতে বিরাট দাঁত—ঝুলে পড়েছে দাড়ি—ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবদের থেকে একেবারে আলাদা। গলার তান দিকে মস্ত একটা লাল ক্ষত। মনে হলো ওটা বিলাপ করছে। বলতে পারবোনা রাগি গর্জন না যন্ত্রণার কাঁতড়ানি, শুনতে পেলুম নিপীড়িত শয়তানের চিৎকার।

আমার আর সহ্য করার ক্ষমতা ছিলো না। মূর্চ্ছার মধ্যেই যেন সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম। একটা পাথরে মাথা ঠুকে গেলো। সেই অবস্থায় ঘণ্টা তিনেক পরে জন রোবাল্ডসন আমাকে খুঁজে পেলো।

সুরারোভোতে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। পরদিন জ্ঞান থেকে ডাক্তার এসে আমার মাথায় একটা পটি বেঁধে দিলেন; আর দিলেন ঘুমের ওষুধ। বললেন ভয়ের কারণ নেই। খোলা জায়গায় থাকার জন্য ঠাণ্ডা লেগেছে। প্রতিশ্রুতি দিলেন এক সপ্তাহের ভিতরেই আমার চলৎশক্তি ফিরিয়ে দেবেন।

তিনদিন ভীষণ কষ্ট পেলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি কথাও বললুম না। ঠাণ্ডা এবং ক্ষুধাই যে আমার কষ্টের কারণ এবং নৌকা হারিয়ে যাওয়ার জন্যই আলোর সংকেত পাঠিয়েছিলুম, উদ্ধারকারীদের এ-রকম বুঝবারই সুযোগ দিলুম। কিন্তু ওই কটা দিন খুবই সংকটে কাটলো। জানতুম আমার শারীরিক ক্ষতি কিছুই হয়নি; উদ্বেগ হলো মনের জন্য।

কারণ, যা দেখেছি তা যদি আমার মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয় তবে আমাকে উন্মাদ ব'লে গণ্য করাই সঙ্গত হবে। হাজির পটে যে-রকম স্পষ্টভাবে জিনিসটাকে আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছি তা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর যা দেখেছি তা যদি সত্যি হয় তবে তা প্রাকৃতিক নিয়ম—বহির্ভূত। তাহলে তো আমার বুদ্ধির জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আমি একজন বিজ্ঞানী। অতি-প্রাকৃতকে স্বীকার করা বিজ্ঞানীর উচিত নয়। আমি ব্রিটেন যে মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, সাধুসন্তেরা যার অশুভ শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন, চক্ষুর নরনারায়ণটির কাছে যে তয়াল স্ল্যাক বিষ্ঠা, তাকে যদি আমি চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে থাকি তা হলে এ-যাবৎ যা পড়েছি আমার সেই সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলা এবং মত পরিবর্তনই সঙ্গত হবে। তাহলে আর বিজ্ঞানে ফিরে না গিয়ে কবিতা আর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কাটানোই আমার উচিত।

তৃতীয় দিন বিকেলে বিশ্রাম করছিলুম। চোখ বন্ধ করতেই আমার মস্তিষ্কে যে ছবিগুলি বারবার এসে হানা দিচ্ছিল, চেষ্টা করছিলুম সেগুলিকে তাড়িয়ে দিতে। রান্নাঘরের দরজার সোড়ায় দাঁড়িয়ে জন হোনাল্ডসন এবং একজন কুষক কথা বলছিলো। দ্বিতীয় ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে জন বললো: "জানো ওটা একটা সিন্ধুঘোটক। খুব ক'রে উঠে এসেছিলো মুপ বেয়ে। তাই ক্রেনার ওটার চামড়া পেয়েছে। ওটাকে সে মৃত অবস্থাতেই দেখতে পেয়েছিলো; তবে বেশিক্ষণ আগে মরা নয়। ওটার গলায় ঘা ছিলো। কোথায় চোট পেয়েছিলো কে জানে। আমার ঠাকুরদার আমলে এসেছিলো আর উনাতে এই এলো সিন্ধুঘোটক।"

আমি জেনালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। কারণ আমি জেনেছি আমার মন বেশ সুস্থই রয়েছে। আর, বিজ্ঞান ত্যাগ করবো কোন দুঃখে?

* * *

বিখ্যাত অভিনেতা মরিস শেভেলিয়ার প্রথম জীবনে ছিলেন সামান্য ফিরিওয়ালা, রাস্তায় রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে মাল ফেরী করে বেড়াতেন।

কিন্তু বিক্রী করবার পদ্ধতিটি ছিল চমৎকার। শিশুমহলে নানারকম মুখভঙ্গি করে ও মজার গান গেয়ে তিনি বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন বৃষ্টির সময়ে তিনি জিনিস বিক্রীর আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁর ঠেলাগাড়ীটি নিয়ে এক হোটেলের বারান্দায় একটু আশ্রয় নিয়েছিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, তাঁকে দেখতে পেয়ে জলবৃষ্টি তুচ্ছ করে শিশুর দল ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। সকলেরই হাসিমুখ।

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক দেখলেন এ দৃশ্য। চমকে উঠলেন তিনি। সত্যিই ত এ এক নূতন আবিষ্কার।

তারপরে ছায়াচিত্রে নামতে বোলো তাঁকে। অবশ্য মোটা টাকার চুক্তিতে।

॥ এই কথা ॥

মানুষ তিনি

সুমিতা সেন গুপ্তা

বীথিদি যেদিন প্রথম শিক্ষিকা হয়ে স্কুলে যোগদান করলেন সেদিন থেকেই স্কুলে যেন বিস্ময় শুরু হলো। দীর্ঘকায়া সুন্দরী অনধিক বয়স্কা বীথিদির সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কিন্তু তিনি কোনদিকে তাকালেন না, কথা কইলেন না কারো সঙ্গে। গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ক্লাস শুরু করলেনও অতি গম্ভীর মুখে। মেয়েরা কানাকানি করলো "বাব্বাঃ! যেন ভীমা ভয়ঙ্করী।"

কিছুদিন পুরোনো হলেও দেখলাম বীথিদির প্রকৃতি যেন রহস্যের বর্মে আবৃত। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত রূঢ় ও তীক্ষ্ণ। দূরের থেকে দেখে যেমন অসংখ্য বোতলের কাছের থেকে দেখে তেমনি মনে হয় দুর্জ্ঞেয় এবং অসরল। মোটকথা রহস্যপূর্ণ এবং আপত্তির কারণ প্রথম থেকেই হয়ে রইলেন তিনি।

মনে মনে অপছন্দ করতে লাগলাম ছাত্রীর দল। কাছে ঘেঁসতেন না টিচারেরা লক্ষ্য করে দেখেছি। বীথিদি ক্লাস নিতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। পড়া না পারলে রেগে উঠে কটূক্তি করতেন, "বাপের অন্ন ধ্বংস না করে ঘাস খেলেই পার? বুড়োধাড়ী মেয়েরা পড়া পার না,—লজ্জা করে না? ছিঃ ছিঃ!"

আমাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলে উঠতেন "এরাই হবে নাকি আবার মানুষের মত মানুষ!" দারুণ চটে থাকতাম আমরা। তিরস্কার কক্ষন ভাল কথা,—সে আমাদের মঙ্গলের জন্যই জানি কিন্তু তাঁর কটূক্তি ব্যবহারের উগ্রতা অসহ্য বোধ হতো। তবু মুখে প্রতিবাদ করার সাহস আমাদের কক্ষণো হতো না।

কারও সঙ্গে মেশামেশা করতেন না। মুখে হাসি নেই। বয়স বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হিংস্র একটুখানি স্পর্শ যেন সে মুখে সর্বদাই লেগে থাকতো বলে মনে হতো আমাদের। চালচলন সবই

অস্বাভাবিক। অদ্ভুত মানুষ। সবাই কানাকানি করে। সে-সব সমালোচনা শুনে বীথিদিকে কেন্দ্র করে—"আমরা বড়দির একেবারে বিপরীত ইনি।" সবাই স্বীকার করে একবাক্যে। এজন্য আমাদের দুঃখের সীমা ছিল না।

আগেই বলেছি বীথিদির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্কুলের বিধাতা বদলিয়ে এলো। এলেই অনেকখানি অবরোধের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শিক্ষিকারা বা ছাত্রীরা কেউ যাতে এক মুহূর্তও ফাঁকি না দিতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখতে লাগলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন স্কুলের পুওর ফাণ্ডের টাকায় অনেক 'পুওরেরাই নাকি ফাঁকে পড়ে যায়'। সাহায্য লুটে যারা একটু অবস্থাপন্ন অধিকাংশ তারা। ইলপেক্টার এলে বীথিদি শক্তমুখে এ অন্যায় আর চলবে না বলে দিলেন। ফাণ্ডের একটি পয়সারও অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখলেন। উদ্বৃত্ত যা থাকবে তা সাহায্য স্বরূপ নাকি দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠাবার নতুন নিয়ম হলো রাতারাতি এ যেন নতুন নিয়ম কানুনে গোটা স্কুলে প্রবল আলোড়ন সুরু হয়ে গেল, অসন্তুষ্ট হলেন সহ প্রধানা শিক্ষিকা রমাদি, সে সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষিকারাও। সেক্রেটারী মহাশয়ও গম্ভীর মুখে মিটিং এটেণ্ড করে চলে যান। কথায় বলা মতৈক্য চলতে লাগলো স্কুলের গভর্ণিংবেডির সঙ্গে বীথিদির। স্কুলের টাকা খরচ করে কোন কারণে কেউ বীথিদি তা পছন্দ করতেন না। কঠিন স্বরে বলেছেন অর্থ অপব্যয় করা চলবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ অনাথ আতুরাশ্রমে সাহায্য করলে পুণ্য হবে, মেয়েরা খেলাধুলা করুক কিন্তু শিক্ষামিক, পুজো কিম্বা অন্যান্য আমোদ আহ্লাদে তাঁর সমর্থন ছিল না। সরস্বতী পূজার চাঁদা চাইতে গেলে রুক্ষকণ্ঠে বলেন মনে নেই কারও একফোঁটা ভক্তিশ্রদ্ধা, করবে পুজো। যত ভণ্ডামী।' একটু পরে মুখ তুলে তেমনি করেই বলেন 'বালিশের তলায় মানিব্যাগ আছে একটা টাকা নিয়ে যাও। ওর বেশী এক পয়সাও দেবো না।' বলেই কাগজে কি লিখে চলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করলেন 'জাকামী করে করেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল। চাঁদা তুলবে পুজোর নামে, করবে শুধু হৈ-চৈ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ঝগড়া এরাই নাকি তৈরী হচ্ছে সব দেশের ভবিষ্যৎ, প্রকৃত মানুষ!' রাগে অপমানে মা জ্ঞানে ম'চ্ছিল আমাদের। মুখে কিছু না বলে ফিরে চলে এসেছিলাম। আমাদের কাছে ঐ রিপোর্ট শুনে পুজো কমিটির সেক্রেটারী শিপ্রাদি তো মারমুখী হয়ে উঠলো। বল্লে 'চলো তো, দেখে আসি গিয়ে উনি কতবড় একজন গার্গী, মৈত্রেয়ী না তরী নিবেদিতা? সবাই চুপ করে থাকো বলেই পেয়ে বসেছে। সামান্য ভদ্রতা জ্ঞানও যার নেই তার আবার মনুষ্যত্বের বড়াই?' রাগে গরগর করলে অন্যান্য শিক্ষিকারাও। রমাদি মৃদু হেসে টিপ্পনী কাটলেন উনি শুধু একজন বিখ্যাত বিদুষীই নন, বুঝি অধিতীয় মহামানবীও বটে। এরপর থেকে বীথিদির কাছে কোন কথা নিয়ে আমরা যেতাম না।

অবাক হয়ে আমরা ভাবতাম বীথিদির কি কেউ নেই? কখনো কেউ আসেনি। একখানা চিঠি পর্যন্ত না। তবে গোড়ার দিকে ডাকযোগে অনেকগুলি রসিদ আসতো, বোধহয় টাকা প্রাপ্তীর স্বীকৃতি। কোথা থেকে কে পাঠাতো হদিশ মিলতোনা। এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন খুব। নিজে পোষ্টাফিসে নিয়মিতভাবে যেতেন আসতেন। তাছাড়া নিজের ঘরের দরজায় আলাদা লেটার বক্স ছিল।

স্কুল ক্রমশঃ কায়েমী বেড়েই চল্লো। তারজন্য বীথিদিই প্রধানতঃ দায়ী সবাই বুঝলো, জানলো। যত সংক্ষিপ্ত বাক্যেই তিনি ব্যবহার করুন না কেন শেষটায় প্রায়শঃই ব্যবহার করতে

শুনেছি "হায়রে, এরাই নাকি আবার মানুষ।" কথার সঙ্গে যে ঘৃণা মুখে ফুটে উঠতো আমরা অনেক সময়ই অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে তা দেখেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অমানুষত্বই দেখে, সে নিজে কি একজন প্রকৃত মানুষ! এ প্রশ্ন তাকে কে করবে? উত্তরই বা কি হতে পারে? উত্তর শুধু তাঁর বাণী, কর্ম এবং ব্যবহার।

হঠাৎই বীথিদি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কোথায় গেলেন। ঠিকানা জানলো না কেউ। কিছু জিনিষপত্র ও একটি ট্রাঙ্ক রেখে গেলেন নিজের ঘরে তালাবন্ধ অবস্থায়। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, কিছুদিনের জন্য তো রেহাই। মন্তব্য নিয়ে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ আর শিস্ দীর শুনতে হবে না। শিক্ষয়িত্রীরা কেউ কেউ বাঙ্গ করে বলেন 'প্রকৃত মানুষ খুঁজতে বেরোলেন বোধহয়।' মেয়েরা নিচু গলায় বলাবলি করলাম 'অমানুষের মধ্যে কতদিন আর টিকতে পারে।' ফিরে এসে এই অমানুষদের আর ঘৃণা না করলেই বাঁচি। অনেকদিন পর প্রাণ খুলে সবাই হেসেছিলাম। চড়া গলায় কথা বলে গল্প করেছিলাম।

ছুটি বাড়ালেন বীথিদি। চিঠি এলো কোন এক অজ পাড়াগাঁ থেকে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ নিয়ে, উনি না এলেই আমরা খুশী এবং নিশ্চিন্ত।

একেবারে নিশ্চিন্ত বীথিদি আমাদের করেছিলেন। আর ফেরেননি। ফিরে আসার পথ বন্ধ। পরপারে যে যায় সে ইহকালে আর ফেরে না। কিন্তু বীথিদিকে নিয়ে আমাদের এত জল্পনা কল্পনার অবসান এতেও হলো না। তালাবন্ধ ঘর খুলে নূতন শিক্ষয়িত্রীর জায়গা দেওয়া হলো। ট্রাঙ্কটি দেওয়ালিপত্রভাবে পড়ে রইলো কিছুদিন। এরপর হঠাৎই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো।

এক বৃদ্ধ এসে বীথিদির ট্রাঙ্কের মালিকানার দাবী করে বল্লে 'এ আমারই অমূল্যধন।' চোখ সজল হয়ে উঠলো বলতে বলতে। অনেকেই তাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। বৃদ্ধের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ধীরে ধীরে যা উত্তর দিলো, সংক্ষেপে তা এই— একদা যে ছিল বীথিদিদের চাকর সেই বৃদ্ধই নিঃস্বহারা বীথিদিকে প্রতিপালন করেছিলো বড় অসময়ে বাঁচিয়েছিলো অন্নবস্ত্র দিয়ে। মনিবের নূনের গুণ রাখতে তাকে, আরও কঠিন কর্তব্য করতে হয়েছিলো। অনেক চেষ্টায় বীথিদির লেখা পড়ার ব্যবস্থা সে-ই করে দেয়। প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার তপস্যাই নাকি ছিল বীথিদির অন্তরের একান্ত কামনা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে চুল চুল চোখে বৃদ্ধ বল্লে "বড়লোকের মেয়ে হয়ে জন্মেও সুখ ছিল না। পাকিস্তানে ওদের বাড়ী লুঠ করে বাপ মা ভাইবোনকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেয় অমানুষেরা ওরই চোখের সামনে। ওঃ। সে কি ভয়ঙ্কর দিন গেছে।" "বীথিদিকে ছেড়ে দিল কেন?"—প্রশ্ন করলেন রমাদি। মলিন হাসলো বৃদ্ধ—"ওকে পাচার করে দিলে লাভ হবে তাই।" পুলিশ এসে উদ্ধার করেছিলো ওদের দুজনকে। বিমূঢ়ভাবে চলে আসে এরপর। অনেক আত্মীয় অনাত্মীয়ের দুয়ারে ধর্না দিয়েছে বীথিদি। কেউ গ্রহণ করেনি, দয়া খোলেনি, চেনেনি পর্যন্ত। মুখের বিনবিনে হাসি বীথিদি ভুলে গেছিলো। মানুষ দেখলেই নাক কুঁচকে বলতো—"ধ্যেৎ এগুলি নাকি আবার মানুষ!" ইউরোপিয়ান কোন অনাথ আশ্রমে বীথিদি বড় হয়েছিলেন। মাদার খুব ভালবাসতেন ওকে। লেখাপড়ায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বরাবর। অর্থ যশ সবই পেলেন, কিন্তু মনের আনন্দ শান্তি আর ফিরলো না। বুকে বইতো সবাই যেন মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। মুখে ক্রুর অভিমানের ছায়া…।

বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। ফুপিয়ে ফুপিয়ে বল্লো "বীথিদা আমার সবসময় বলতো বংশীকাকা, এ পৃথিবীতে আমার কাজ শুধু হবে মানুষ তৈরী করা। ওপরে মনুষ্যত্বের ভড়ং আমি ভেঙে ফেলবো গুঁড়ো গুঁড়ো করে। যারা অসহায় নিরাশ্রয়কে স্থান দেয় না, একমুঠো ভাত দেয় না, একফোঁটা সহমর্মতা দেখাতে প্রাণ উড়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই আমার জীবনের ব্রত হবে।" বংশী ঘরময় চোখেমুখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। আমরাও তাই। হঠাৎই আমার মনে—"মহৎ প্রাণ ছিলো আমার বীথিদার। কত অনাথ গরীব দুঃস্থীকে নীরবে দান করেছে। মাইনের সমস্ত টাকা উজার করে দিয়ে ফেলেছে। মাস চলবে কি করে একবারও ভেবে দেখেনি। সমস্ত রসিদ আছে এই ট্রাঙ্কে।"

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব খুঁজে বেড়াতো বীথি রায়। অথচ তিক্তকটু অভদ্র ব্যবহারে বাক্যে সেই মানুষকেই ক্ষতবিক্ষত করার অনুচিত প্রয়াস কেউ কখনো করতে পারতো না কোনদিন যদি না জানতে পারতো তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী।

• • • •

১৯৪২ সনের এপ্রিল···ভয়াবহ মহাযুদ্ধ চলেছে পৃথিবীতে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট শত কর্মের মধ্যেও বিস্মৃত হলেন না একটি কর্তব্য পালন করতে। আমেরিকার পুস্তক বিক্রেতা সমিতির কাছে এক বাণী পাঠালেন : বই অগ্নিতে ভস্ম হবার নয়। মানুষ মরে যায় কিন্তু বই মরে না। কোন শক্তি বা মানুষ স্মৃতিকে বিনষ্ট করতে পারে না। আমরা জানি, এই যুদ্ধে বই হোল একটি অস্ত্র।

প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রেমিকের মনে সেদিন নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল এই কথায়।

চলতি দুনিয়া

চা-পানের রেকর্ড

অকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জর্জ হুইলার ৩০ মিনিটে ৩২ কাপ চা পান ক'রে বিশ্বে এক অভিনব নজীর সৃষ্টি করেছেন। চা-পান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন একজন পাবলিসিটি অফিসার। জর্জ হুইলারের আগে অনেক ব্যক্তি আধঘণ্টায় ২৬ কাপ চা-পান ক'রে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু হুইলারের রেকর্ড তা ম্লান ক'রে দিয়েছে।

মাছ খেয়ে আত্মহত্যা

জাপানে আঠারো বছরের এক তরুণী অভিনব উপায়ে আত্মহত্যা করেছে। মেয়েটির বাড়ি ছিলো শিকুকু দ্বীপে। সে মারা গেছে গ্রোবফিশ নামে এক রকমের মাছ খেয়ে। এমনিতে কিন্তু ওই মাছ বেশ সুস্বাদু, জাপানীদের বেশ প্রিয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই কেবল ওই মাছ খাবার উপযুক্ত ক'রে রান্না করতে পারে। আর তা পারে জাপানের মাত্র কয়েকটি রেঁস্তোরা। সে-ভাবে রান্না করা না হলে ওই মাছ খেয়ে বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারাবারই সম্ভাবনা।

জলের জন্য ট্রেন লুট

রয়ালসীমা নামে হায়দরাবাদের একটি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিলো। কিছুদিন থেকেই অনাবৃষ্টির ফলে আবহাওয়া হয়ে উঠেছিলো মরুভূমির মতো। গ্রামবাসীদের গলা শুকিয়ে কাঠ। এক ফোঁটা জলের জন্য ঘরে-ঘরে হাহাকার উঠেছে। মরিয়া গ্রামবাসীরা লাল বেঁধে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ট্রেনটা থামালে। ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে একটু ভুক্তার জল পাবার আশায়। ট্রেনের ড্রাইভার বাধ্য হলো জল দিতে। পরের ট্রেনগুলিতে কিন্তু লালপাগড়ির আবির্ভাব হলো। গ্রামবাসীরা যাতে আর ট্রেন থামাতে না পারে। কিন্তু পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে তো?

কম্পিউটার যন্ত্র সুন্দরী নির্বাচক

রয়টারের খবর থেকে জানা গেলো দাঁড়কাকের মতো কালো যার চুল এমন একটি মেয়েকে কম্পিউটার যন্ত্র ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রূপে নির্বাচন করে। যন্ত্রের এই অভ্রান্ত রায় দেবার ফলে যে সব তরুণীরা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলো তারা ক্ষিপ্ত হয়ে একযোগে যন্ত্রটাকে গালাগাল করতে শুরু করে। 'যন্ত্রটা ভীষণ পক্ষ-পাতিত্ব করছে,' 'ওটাকে ইচ্ছে ক'রে খারাপ ক'রে রাখা হয়েছে' মেয়েদের এমনি নানা মন্তব্যে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হয়। যন্ত্রটি নির্বিকার। ১৮ বছরের মেয়ে সোনিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়ে কিন্তু আহ্লাদে আটখানা। ব্রিটেনে কম্পিউটার যন্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রথম নির্বাচিত হওয়ার গৌরব সেই লাভ করেছে কি না। সোনিয়া দাঁতের ডাক্তারখানায় অভ্যর্থনাকারিনীর কাজ করে। তার মতে যন্ত্রের রায় নির্ভুলই হয়েছে।

হিরে ফুরিয়ে যাচ্ছে

দক্ষিণ আফ্রিকার খনী শিল্পপতি মিষ্টার হ্যারী ওপেনহাইমার জানিয়েছেন আর কুড়ি বছর পরে পৃথিবীতে নতুন ক'রে হিরে পাওয়া সম্ভব হবে না। সমস্ত হিরের খনি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। এর ফলে হিরের দাম ভয়ংকর বেড়ে যাবে।

যৌনশিক্ষা

ব্রিটেনের কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে আট বছরের ছেলে-মেয়েদের যৌনশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের উপযোগী ক'রে লেখা যৌনবিদ্যা বিষয়ে খানকয়েক বই পাঠ্য থাকবে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের গর্ভ-সঞ্চার বিষয়ে বিশেষ ক'রে সহজ তথ্য শিশুদের জানানো হবে।

সমুদ্র গর্ভ থেকে হাইড্রোজেন বোমা উদ্ধার

ভূমধ্য সাগরের গর্ভ থেকে একটি হাইড্রোজেন বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বোমাটির দৈর্ঘ্য ১০ ফুট, রং রুপোলী। ব্যাস ৩ ফুট। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকখানি জাহাজ বোমাটি পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়।

খুনী জ্যাকের পত্রাবলী প্রকাশিত

বহু হত্যাকাণ্ডের নায়ক জ্যাকের পত্রাবলী এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হতে চলেছে। বেরুবে মেডিকেল ছাত্রদের উদ্যোগে প্রকাশিত হাসপাতালের গেজেটে। জ্যাক ব্রিটেনের সব চাইতে কুখ্যাত খুনী। খুন করতে যাবার আগে সে পুলিশকে আগে থেকেই জানিয়ে যেতো। অথচ পুলিশ কোনো দিনই তাকে ধরতে পারেনি।

লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড এলাকায় জ্যাক পতিতাদের কেবল যে খুন করতো তা নয়, তাদের শরীর টুকরো-টুকরো ক'রে কাটতো। পুলিশকে সে আগে থেকে চিঠি দিতো খোঁকা দেবার জন্য। সে

যে-দিকে খুন করতে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে যাতে পুলিশ যায় তার জন্য। অ্যাকের চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। তরুণ এক পণ্ডিত লণ্ডনের এক হাসপাতালের কাগজ-পত্রের ভিতর থেকে ওই চিঠিগুলি আবিষ্কার করেছেন। শুধু চিঠি নয় অ্যাকের হাতে নিহত নারীদের কিছু ছবিও প্রকাশিত হবে।

পিল ব্যবহারের পরে

জন্ম-নিরোধক পিল ব্যবহারের ফলে ব্রিটেনের বধূদের যৌবন, সৌন্দর্য, আর মনের আনন্দ সবই যেন বেড়ে যাচ্ছে। এই তথ্য জানিয়েছেন সে দেশের একজন পরিবার-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। ৩০০০ হাজার স্ত্রীলোকের অবস্থা পরীক্ষা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে মেয়েদের দেহ-মনের স্বাস্থ্যের এই উন্নতির কারণ তারা গর্ভ-সঞ্চারের ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। বিয়ের পরে অনেক তরুণী ওই ভয়েই অর্ধমৃত অবস্থায় কাটান কি না। ফলে তখন মনের উপর চাপ পড়ে খুবই বেশি। শরীরও খারাপ হয়ে যায়।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর জিহ্বা কর্তন

সম্প্রতি রোমের হাসপাতালে ৭২ বছরের এক বৃদ্ধাকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বকর-বকর অত্যাচার ৭৪ বছরের স্বামীর অসহ্য মনে হয়। 'নার্ভের উপর অত্যাচার' আর সহ্য করতে না পেরে তিনি স্ত্রীর জিভ কেটে নিবারক করার ব্যবস্থা করেন। পুলিশও কিন্তু নীরব থাকেনি, স্বামীটিকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঘড়ির উপরে প্রেম

সার্কাসের বেজেরিয়ার নায়ক আর নায়িকা এক যুবক ও যুবতী সম্প্রতি মাটির থেকে ষাট ফুট উপরে বাগদত্ত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে তারা একটি ফায়ার ব্রিগেড এবং একজন পুরোহিতকে ডেকে এনেছিলো। এই অভিনব ঘটনাটি ঘটে বৈরাটের এক মেলা প্রাঙ্গণে। রাত্রিবেলা। ভাবী বর কারিয়া মিলারের বয়েস উনিশ আর তার ভাবী স্বামী সোথার ল্যাকের বয়েস ছাব্বিশ। গত ছ'বছর ধ'রে তারা একসঙ্গে ঘড়ির উপরে খেলা দেখিয়ে আসছে। সূত্রে জন্মেছে প্রেমের। এখন তারা পরস্পরকে পরিণয় রজ্জুতে বাঁধবে ব'লে স্থির করেছে।

আকাশপথে অভিনেত্রীর একাকী বিশ্ব-পরিক্রমা

৩৮ বৎসর বয়স্ক অভিনেত্রী মিস শীলা হট স্থির করেছেন ব্রিটেনের মেয়েদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম আকাশ পথে একাকী বিশ্ব-পরিক্রমা করবেন। সেই বিমান-যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি নিজের মূল্যবান অলঙ্কারগুলি বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন।

অবিবাহিতা লেখিকা

অবিবাহিতা লেখিকারা কি ভাল কবি বা ঔপন্যাসিক হন? এ প্রশ্নের উত্তরে সুবিখ্যাত লেখিকা Monica Dickens বলেন—"না, তা নয়।" বিবাহিতা লেখিকাদের মধ্যে পাইয়া জীবনের একটা আদর্শ থাকে। জীবনের একটা সুষমা দেখতে পাওয়া যায়। প্রেম কাহিনীর মধ্যে একটা সংবেদনশীলতা ও আচরণ একমাত্র বিবাহিতা লেখিকারাই আনতে পারেন। কাজেই সংসারে যতটুকু অবসর তাঁরা পান, তার মধ্যেই একটা পবিত্র ও আদর্শমূলক সাহিত্য-সৃষ্টি কেবলমাত্র বিবাহিতা লেখিকাদের দ্বারাই সম্ভব।

নারীর প্রণয়

নারীর প্রণয় কি শুধু বয়স বিচার করে চলে? তরুণীরা কি শুধুই তরুণদের প্রেমের ফাঁদে পড়ে? আধুনিকার মন এখন একথা ভাবতে সুরু করেছে। অনেক তরুণী এখন কল্পনা করেন বর্ষীয়ান পুরুষদের প্রেমে পড়ার জন্য। বিয়ে করলেও সে-বিয়ে আনন্দেরই হয় এই তাদের ধারণা। বয়সের অনেক পার্থক্য সব সময় বিবাহিত জীবনের আনন্দের পথে বিঘ্ন হয় না। সামাজিক পবিত্রতা বুঝি আর থাকে না। এই চিন্তাই সমাজ বিজ্ঞানীদের মনে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছে। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পবিত্র সম্বন্ধও বুঝি এবারে লোপ পায়। শাশুড়ীদের কথা বধূরা আর শোনে না, গ্রাহ্যও করে না। একজন শাশুড়ী তাই দুঃখ করে বলেছেন "When my son is away from house on business visits; I know my daughter-in-law has another man in the house and I am sure she is having an affair with him"। এর বিষয় ফলও ফলতে সুরু করেছে।

অভিনেত্রী হওয়ার প্রলোভনে

ওদেশে ছায়াচিত্রে অভিনেত্রী হওয়ার প্রলোভনে তরুণী কন্যাদের গৃহত্যাগ দিনদিন এত বেড়ে চলেছে যে এজন্য পিতামাতাদের ও অভিভাবকদের চিন্তার শেষ নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রলুব্ধকর বিজ্ঞাপন দিয়ে স্কুল কলেজের মেয়েদের ছায়াচিত্রে অভিনয়ের নামে অধঃপতনের গহ্বরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ও সচেষ্ট থাকলেও কোথা দিয়ে যে কি ঘটছে তা অনুমান করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। এর অন্তরালে প্রভাবশালী লোকদের পরিচালনা আছে এই অনেকের অনুমান।

বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা

প্রাচীন বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা কিছুদিন পূর্বেও পাশ্চাত্য জীবনের যে সুখশান্তি নিয়ে আসতো এখন তা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এখন তরুণ তরুণীদের কাছে বিবাহ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে (marriage almost impossible)। আজকালকার তরুণ তরুণীরা কথায় কথায় প্রেমে পড়তে চায় আর বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, মুক্ত বিহঙ্গের মত নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে আনন্দ পেতে চায়। চার্চে বিবাহ প্রায় উঠেই যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের এমন মতিগতি কেন হল তা চিন্তা করে পাশ্চাত্য মনীষীরা হতাশ হয়ে পড়ছেন।

আজকার সংসারে মেঘ দেখা দিচ্ছে কেন ?

পুরুষেরা চায় সুখ সুবিধা ও আরাম আর মেয়েরা চায় সাজ-পোষাকের নিত্য নূতনত্ব। এই নিয়ে অনেক সংসারে অশান্তি দেখা দিচ্ছে। মেয়েরা পুরুষদের স্বার্থপর বলছে আর পুরুষরা মেয়েদের অহেতুক বিলাসে প্রচুর অপব্যয়ের তালিকা দেখে বিব্রত হয়ে পড়ছে। সংসারের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই এসব আধুনিক সভ্যতার কুফল বলে মনে করেন। কিন্তু উপায় কি ?

মরা মানুষ বিয়ে করতে ফিরে এলো

জেনোয়া শহরে ৪৪ বৎসর বয়স্ক টিকানো মাক্রাডিসকে জানিয়ে দেয়া হলো তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। বিয়ের সব ঠিকঠাক আর তখন কি না···। ভদ্রলোকের তো আক্কেল গুড়ুম। কারণ ? কারণ জানতে চাইলেন তিনি। উত্তর এলো : আরে মশাই ! আপনি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীদের হাতে মারা গেছেন।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের জন্য জেনোয়ার রেজিষ্ট্রী আপিসে গিয়েছিলেন মাক্রাডিস। গিয়ে শুনলেন তার প্রথমা স্ত্রী (বর্তমানে মৃত) ১৯৫৪ সালে মাক্রাডিসকে মৃত ঘোষণা ক'রে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। কাজেই ভদ্রলোককে আবার বিয়ে করতে হ'লে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি জীবিত।

• • •

প্রেমিক ছেলের দল সাবধান

টেলিফোনে শুধু যে কাজের কথা হয়, তা'নয়, অনেক সময় তরুণ তরুণীরা টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেমের কথাও বলে থাকে। পরিচিতের মধ্যে এরকম প্রেমালাপ ততটা দোষের নয়, কিন্তু অপরিচিতার ফোন নম্বর জেনে নিয়ে তাকে প্রাণ ভরে প্রেমবাণী শোনানো যে কতটা দোষের তা বলে শেষ করা যায় না। সম্প্রতি ২১ বছর বয়সের এক তরুণ ২০ বছর বয়সের এক তরুণীকে প্রেমের গোপন বাণী শোনাতে গিয়ে গোয়েন্দার হাতে ধরা পড়েছে। এবং আদালতের বিচারে কঠোর শাস্তিভোগ করছে।

কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী

আভা পাকরাশি

নিজের চুলে কবরী বাঁধতে হলে প্রায় ঐ শবরীর প্রতি মরার মতই তিতিক্ষা চাই।

বলবেন সময় কই যে অতক্ষণ ধরে তেল মাখব তারপর চুল শুকোব! বেশ একটি বাদ দিলাম অন্তটি থাক।

তেল মাখার কাজটি রাত্রে সেরে রাখুন। রাত্রে শোবার আগে খানিকটা সময় হাতে থাকেই, ঐ সময় কিছুটা চুলের জন্য ব্যয় করুন। তবে তো চুল ওঠা কমবে! তখন তো আর চুলের 'শো'রও দরকার নেই! খানিকক্ষণ খুলে রাখুন চুল। আঁচড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিন। পারেন তো বেশ করে ব্রাশ করে ফেলুন। সারাদিনের সব ধুলো ময়লা বেরিয়ে যাক। মাথার ঘেত্তরের ঘাম শুকিয়ে যাক। একটু ঘুরে ফিরে বেড়ান নয়তো পাখার নীচে শুয়ে বই-টই পড়ুন। তারপর ঠিক শোবার আগে বেশ করে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় অল্প অল্প তেল দিন। সমস্ত কাজটি ম্যাসেজ করুন। এবার খুব ভাল করে চুল আঁচড়ান আর শক্ত করে একটি বিনুনী বাঁধুন। বালিশে একটি তোয়ালে দিয়ে শোবেন তাহলেই হল।

বাকি রইল চুল শুকোন। সকালে উঠেই স্নানটি সেরে নিন। কাজে বেরুবার আগেই চুল শুকিয়ে যাবে। এদিকে চুলের গোড়াও মজবুত হল, চুল ওঠাও কমল, আবার রাত্রে এভাবে তেল মাখার ফলে ভাল ঘুমও হল।

ছুটির দিনে শ্যাম্পু করুন। শ্যাম্পুর বিষয় তো আগেই কিছুটা বলেছি।

ভিজে চুল বাঁধা খুবই খারাপ। রোদ্দুরের সুবিধে না থাকে হাওয়ায় চুল শুকিয়ে নিন। তবে রোদ্দুর লাগালে চুলের গোড়া শক্ত হয়। বর্ষাকালে এমনিই কিছুটা চুল ওঠে। তবে চুল ওঠা বা চুল পাকার পেছনে থাকে অন্য কারণ। দুশ্চিন্তা বা পেটের গণ্ডগোল।

পেট পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার। এ ছাড়া আছে ভিটামিন-এর অভাব। টাটকা শাক শবজি বা দরকার পড়লে ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়া উচিত।

যাদের খুবই চুল উঠছে তাঁরা চুলে তেলার দিন। একটি বাসতিতে বেশ কিছুটা গরম জল নিন আর দুটি মাঝারি সাইজের তোয়ালে নিন। স্নানের কিছুক্ষণ আগে ওটি শুরু করুন। একটি তোয়ালে নিংড়ে তুলে পাগড়ীর মত করে সমস্ত চুল চেকে মাথায় টাইট করে জড়ান। সেটি ঠাণ্ডা হতে না হতেই খুলে ফেলে অন্যটি তুলে নিয়ে জড়ান। এইভাবে তোয়ালে বদলে বদলে মাথায় সেঁক দিন। রোজ নয় সপ্তাহে দুদিন বা একদিন করলেও নিশ্চয়ই উপকার পাবেন।

যাদের চুল উঠছে আবার পাকছেও তাঁরা আগে পেট ঠাণ্ডা করুন। মৌরী মিছরি একসাথে চিবিয়ে দুপুরের দিকে সেই জল ছেঁকে নিয়ে খান।

বাজার থেকে টাটকা কাল কেশুতে পাতা কিনে এনে শিলে বেটে তার রস বার করে নিয়ে মাথায় মাখুন। স্নানের এক ঘণ্টা আগে বেশ করে সমস্ত মাথায় মিনিট কুড়ি রসটি মাখবেন। তারপর স্নান করবেন। সপ্তাহে দুদিন বা রোজই মাখতে পারলে ভাল।

চুল ওঠায় আর একটি খুব ভাল ওষুধ হল এগ শ্যাম্পু। কিন্তু এটি আমাদের গরম দেশের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। চুল পেকে যাবার ভয় থাকে। তবে যাঁরা ঠাণ্ডা দেশে থাকেন তাঁরা এটি ব্যবহার করতে পারেন। বড় চুল হলে দুটি আর ছোট চুল হলে একটি ছোট ডিমের কুসুম নিন। আধ কাপ উষ্ণ উষ্ণ গরম জলে এ কুসুমটি ফেলে বেশ করে ফেঁটিয়ে নিন। সুন্দর ফেনা হবে। এইবার স্নানের অন্ততঃ আধঘণ্টা আগে ওটি চুলের মধ্যে ঘষে ঘষে মেখে নিন। এই ডিমের ভিটামিন চুলের গোড়ায় গিয়ে চুল ওঠা সহজে বন্ধ করবে। তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন। একটু কোন সুগন্ধি শ্যাম্পু দিয়ে আর একবার চুল ধুয়ে ফেলুন তাহলে মাথায় আর কোন রকম গন্ধই থাকবে না। চুলও সুন্দর পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করবে। কেনা এগ শ্যাম্পুও পাওয়া যায়; তবে তার চেয়ে নিজে তৈরী করে মাখুন।

পাঞ্জাবী মেয়েরা টক দই দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে। এতে চুলের গোড়ায় প্রচুর ভিটামিন যায়। তারপর স্নানের পর খাঁটি দুধ তেলের মত করে মাথায় মাখে, একটু পরে ধুয়েও ফেলে। দুধ মাখলে চুল খুব ঘন হয়। আর বহুদিন পর্যন্ত কালো থাকে।

চুল উঠে যাবার আর একটি ভাল ওষুধ হল ছোট ছোট পিঁয়াজের রস।

এরও সেই একই প্রক্রিয়া। স্নান করার বেশ কিছুক্ষণ আগে ওটি মাখতে হবে। পিঁয়াজ ছাড়িয়ে বেটে কাপড়ে ছেঁকে রস বার করে নেবেন। তারপর চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে মাখবেন।

তবে চুল ওঠা বা চুল পাকার সবচেয়ে প্রধান কারণ হল পেট গরম আর দুশ্চিন্তা। ছোট মেয়েদের পরীক্ষার আগে শরীর খারাপ হয়, চুল উঠতে থাকে। কেন? ঐ উদ্বেগের জন্য। এছাড়া যা দিনকাল পড়েছে তাতে কেই বা সুস্থ চিত্তে শান্তিতে বাস করতে পারে! তবু এরই মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। সকাল সন্ধ্যা যখন হোক খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ বেড়ান। প্রচুর জল খান। সবুজ শাকসবজি বেশী করে খান। সহজপাচ্য খাবার খান। দেখবেন চুল ওঠা, চুল পাকা কমে যাবেই। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? যতগুলি প্রক্রিয়া বললাম এর কোন না কোনটিতে আপনার উপকার হবেই। আর নানা ছাঁদে কবরী বেঁধে অন্যের নয়ন আর নিজের মনকে আপনি আনন্দ দিতে পারবেনই।

তন্বী দেহের সন্ধানে

সুরঞ্জনা সেন

সুগঠিত দেহ, সুষমামণ্ডিত ত্বক, রূপ ও শ্রী কে না পেতে চায়। বিশেষ ক'রে আমরা মেয়েরা এই বিষয়ে খুবই উৎসাহী তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও বা ইচ্ছা করলেও সব-সময় যে সব জিনিস হয় তাতো নয়। চেষ্টা ক'রেও অনেক জিনিস পাওয়া যায় না। দৈহিক সৌন্দর্য? সে তো ঈশ্বরের দান, তবে একটা ঠিক চেষ্টা করলে দেহের সুগঠন সুষমা লাভের স্বপ্ন অনেকখানি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব। আমরা মেয়েরা সবাই সুশ্রী বা সুন্দরী নই। আমাদের মধ্যে অনেকে ভীষণ রোগা, আবার অনেকে ভীষণ মোটা এই দুইই অস্বাভাবিক। আজকাল দেখা যায় অনেক সময়ই অল্প বয়েস থেকেই মেয়েরা স্থূলাঙ্গিনী হয়ে পড়েন। বড়লোকের ঘরের তো কথাই নেই—খাদ্যের সেখানে অভাব নেই। নানারকম খাবার নানারকম উপভোগ করার সুবিধা সবাই আছে। মেয়েদের কোন পরিশ্রমও করতে হয় না—দাসদাসীর অভাব নেই। আরামে খেয়ে-খেয়ে বসে-বসে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে থেকে দেহে মেদ-সঞ্চয় তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের ঘরেও অনেক ক্ষেত্রে দেহ স্থূল হওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। দেহে এই ধরণের মেদবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটা ব্যাধি। আর এই ব্যাধি শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। এই রকম বীভৎস স্থূলত্বের ফলে কোটি-কোটি নরনারীর জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে আজ। ইচ্ছা মতো চলাফেরা করা যায় না, রূপ থাকলেও তা নিষ্ফল হয়ে যায়, পথে বেরুলে লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ও হাসাহাসি করে। সহপাঠিনী, সহকর্মী, এমনকি আত্মীয়-স্বজনরাও দেখা হলেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসে। গ্রীষ্মের সময় অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় যে জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ে। সামাজিক উৎসবে, অনুষ্ঠানে কোথাও স্বাভাবিক মন নিয়ে যাবার উপায় থাকে না। এক কথায় স্থূলাঙ্গিনীর জীবন দুর্বহ; ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তাদের কষ্ট বুঝতে পারে না। অথচ স্থূলতা একটা ব্যাধি কাজেই স্থূলাঙ্গিনীরা বিদ্রূপের পাত্রী না হয়ে সকলের সহানুভূতির পাত্রী হওয়া উচিত।

দেহের অস্বাভাবিক স্থূলতা হ্রাসের জন্য বহু ওষুধ-পত্র এবং যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোটি কোটি টাকার এই সব জিনিস প্রতিদিন বিক্রিও হচ্ছে। অথচ ফল এমন কিছু হচ্ছে না। যা করে সব চাইতে ফল পাওয়া গেছে, মানে দেহের স্থূলতা হ্রাস পেয়েছে তা হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, নিদ্রা নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও সর্বোপরি স্থূল না হবার জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প। নিম্নে কয়েকটি সহজ ব্যায়ামের নির্দেশ দেওয়া হলো। ছেলেবেলা থেকে এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে ও সঙ্গে-সঙ্গে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও অতিরিক্ত নিদ্রা, দিবানিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করলে সুফল ফলবেই।

আমের রোমাঞ্চকর রূপান্তর

নীলিমা দে

ফলের রাজা আম। এমন স্বাস্থ্যপ্রদ, রুচিকর, সুস্বাদু ফল আর নেই। তাই এর অন্য নাম অমৃত। রসাল নামে এর পরিচয়। কাঁচা-কচি অবস্থায় আম গ্রীষ্মের অসহ্য দুপুরেও বালক-বালিকাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে নিজের কাছে টেনে আনে। ঝড়-বাদলের রাতে আম কুড়াতে যে কি মজা, গ্রাম-বাংলার বহু মানুষের শৈশব-স্মৃতি তার পরিচয়বাহী। আবার যখন তাম্রবর্ণ আম্রফলে কমল বর্ণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে সে আরেক শোভা। আমের বনে যখন বউল ধরেছিলো তখন নর-নারী পেয়েছিলো বসন্তের আগমন-লিপি। আর সোনায় বরণ ফল যখন বাতাসে নীল আকাশের গায়ে দুলতে শুরু করলো তখন প্রত্যাশিত আনন্দের সম্ভাবনায় সিক্ত হয়ে উঠলো সকলের রসনা। ল্যাংড়া, ফজলী, বোম্বাই, সিঁদুরে আম, কাঁচামিঠে, হিমসাগর, কত প্রাকৃত আর ক্রপদী নাম পরিচিত ফলটির। ঘরে আসার পরে আবার চেহারা পাল্টে ছেলে আচার, মোরব্বা ইত্যাদি নানারূপে রসনার নতুন আনন্দ হয়ে দেখা দেয় বাংলার ওই প্রিয়ফল।

মানুষ প্রতিটি জিনিষই সঞ্চয় করে ধ'রে রাখতে চায়, বিশেষ করে নারী বর্তমানের চাইতে ভবিষ্যত নিয়ে একটু বেশী মাথা ঘামায়। তাই প্রকৃতির জিনিষকে নানা উপকরণে সাজিয়ে সঞ্চয় করে আলমারিতে রাখে। সুনিপুণ শিল্পকৃতি ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে। তা যদি পরিচিত ও আত্মীয় মহলে কিছু আনন্দ দিতে পারে তবেই যথেষ্ট।

আমগাছে সোনালী বউলের আভাসে ভ'রে উঠে পথিকের মন, কবির কাব্যে, চিত্রকরের চিত্রে তারা পায় প্রবেশপত্র, আর বউলের পরবর্তী রূপান্তর আম, তা নিয়ে গৃহিনীরা গৃহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নানা পদ্ধতিতে সঞ্চিত করতে। কয়েকটি স্বল্পপরিশ্রম-সাধ্য আচারের কথা বলছি।

প্রথমেই আমের জেলি ও মোরব্বার কথা মনে আসছে।

(১) জেলি

এক কিলো আম খোসা সমেত মোটা অবস্থায় নরম ক'রে সিদ্ধ করে আমের সোনা রস বের করুন, আর যদি খোসা কিছুটা লেগে থাকে তাহলে চামচ দিয়ে চেঁছে নিন। তারপর

একটি এ্যালুমেনিয়ামের পাত্রে করে উনুনে বসান, তলায় যেন লেগে না যায়। তাতে ২৫ গ্রাম আদার রস বা তাজা আদার কুচি। আর সামান্য তিজানো ২৫ গ্রাম কিস্‌মিস্ ছেড়ে দিন, পরিমাণ মতো নুন দিতে ভুলবেন না কিন্তু, আর ৫০০ গ্রাম চিনি ঢেলে দিন, আমের টক্ বা মিষ্টি বুঝে চিনির পরিমাণ কমাবেন বা বাড়াবেন, এছাড়া মুখের রুচিতো আছেই, কেউ টক্ খেতে চান আবার কেউ মিষ্টি বেশী খেতে ভালবাসেন, সুতরাং প্রস্তুতকারিনী একটু চেখেও নিতে পারেন। তবে আঁশহীন আম হলে ভাল হয়। আর আঁশযুক্ত আম হলে চটুনি দিয়ে ছেঁচে নিন। আমের খোলা আগুনের তাপে যখন পুরু হয়ে আসবে তখন নামিয়ে রেখে ঠাণ্ডা হলে এর চামচ চিনিগুলা মিশিয়ে কাঁচের পাত্রে তুলে রাখুন, চিনিগুলা ঘরে না থাকলে তাজা পাঁচফোড়ন গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে দিন, পরে প্রয়োজন মতো আপনি রুটি, লুচি, বিস্কুট ও মুড়ির সঙ্গে ব্যবহার করুন, বেশ খাস পাবেন।

(২) ঝালঝাল টক্-টক্ আচার

খাওয়ার পেয়ে চাটনি বা দই না হলে তো চলে না। ঐ সব কাজের কাজে পাওয়া না গেলে এই জাতীয় আচার শেষ পাতে পড়লে বেশ একটু তৃপ্তি আসবে বৈকি।

সবে আঁটি হয়ে উঠছে এমন আম খোসা সমেত ৪ টুকরা করে নিন। প্রত্যেকটা টুকরোকে একটু কেটে নিন। তারপর পরিমাণ মতো নুন হলুদ মেখে তুলোতে ভিজে কলাইয়ের বালায় করে ২ দিন রোদে শুকিয়ে নিন। এবারে কড়াতে সরষের তেল চাপিয়ে ২।৩টি করে টুকরাগুলি বাদামী রং করে ভেজে তুলে রাখুন (১ কিলো আম ২।৩ চামচ সরষের গুঁড়ো লাগে) কিছু জিরে মৌরি ও সামান্য মেথী ভিন্ন ভিন্ন শুকনো ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে নিন, এবার ঐ আম এইসব মসলা দিয়ে মেখে নিয়ে ভাল করে তেলে ভিজিয়ে কোন কাচের পাত্রে তুলে রাখুন। এই আচার ভাত ও রুটির সঙ্গে খাওয়া যায়। শুধু খেতেও ভাল।

(৩) আমের মোরব্বা

সবে আঁটি হয়ে উঠেছে এমন আম হলে ভাল হয়। আমের খোসা ছাড়িয়ে ২ টুকরো করুন। তারপর সামান্য সময় রোদে দিয়ে ঘি দিয়ে ভিজে বাদামী রং করে প্রত্যেকটা আম ভাজুন। এবার কিলোপ্রতি আমে ১ কেজি চিনি দিন। সাধারণতঃ আরো বেশী লাগে। জল দিয়ে চিনির ঘন রস তৈরী করে ঐ আমটা ছেড়ে দিয়ে একটু নামিয়ে ফুটিয়ে নিন, দুই একদিন পরে রসটা যদি দেখেন যে পাতলা হয়ে গেছে (কারণ রসে আম দিলে জল ছেড়ে যায়) তাহ'লে আমটা নামিয়ে নিয়ে রসটা আবার ঘন করে নিন, তারপর কয়েকটি লবঙ্গ দারুচিনি একটু ভেজে নিয়ে কাঁচের পাত্রে রাখুন। বিকালের দিকে ও দুপুরে খেয়ে আনন্দ পাবেন।

(৪) আমের কাল

পিয়াজ কলির মতো সরু লম্বা করে আম কেটে নুন ও হলুদ মেখে রোদে রাখুন ১ দিন। রোদে যেন শুকিয়ে কাঠ-কাঠ না হয়ে যায়। তারপরে ১ কিলো আমের জন্য বড় কাপের এক কাপ

পরিমাণ সরষে বেটে নিন। (সরষে বাটার সময় একটুখানি হলুদ, চিনি ও নুন দিলে সরষে বাটা তিতো হয় না। রং ও স্বাদ দুই ভাল হয়)।

ওই রোদে-শুকনো আমের সঙ্গে সরষে বাটা দিয়ে ১০০ গ্রাম চিনি দিয়ে ভাল করে মাখবার সময় আড়াই শ গ্রাম সরষের তেল ওতে ঢেলে দিন। সুন্দর করে নেড়েচেড়ে মাখিয়ে কাঁচের পাত্রে করে রোদে পরপর কয়েকদিন রাখুন। ঠিক মাছকাসুন্দির মতো দেখতে হবে; ও ওরকম ঝোলটাও আমের গা মাখানো-মাখানো হবে। এই পদ্ধতিতে খাটুনি ও খরচ দুই অপেক্ষাকৃত কম। অথচ খেতে উপাদেয়। রুটি ও জল-চালা ভাতে খেতে মজা।

(৫) আমের চিল্‌কা

কচি আঁটিশুদ্ধ আমের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা পাশে কেটে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে আঁটিটা সব বের করে ফেলুন। অথচ আমটা টুকরো হবে না, গোটাই থাকবে। ওই আমগুলির গা একটু একটু কেটে নিন। লক্ষ্য রাখবেন আমগুলি যেন টুকরো টুকরো হয়ে না যায়। তারপর নুন ও হলুদ মেখে ২ দিন রোদে রাখুন।

এবার রসুন, পিঁয়াজ বেটে নিন। সরষে শুকনো লঙ্কা দিয়ে বেটে নিতে হবে। কড়াতে সামান্য সরষের তেল চাপিয়ে রসুন পিঁয়াজটা প্রথমে একটু ভাজিয়ে নিয়ে সরষে বাটা ওতে ঢেলে দিন। মাছের ঝোলের মশলা ভাজার মতো ভাজিয়ে নিয়ে নরম-নরম অবস্থায় একটি বাটিতে নামিয়ে রাখুন। উক্ত আমের আঁটির ফাঁকা জায়গায় ঐ মশলা দিয়ে ভর্তি করুন। সব আমে ওই মশলার পুর ভর্তি হয়ে গেলে কাঁচের পাত্রে তেলে ডুবিয়ে রেখে মাঝে-মাঝে রোদে দেবেন। পিঁয়াজ রসুনের ভক্তদের ভালই লাগবে। (আর রসুন না খেলে শুধু পিঁয়াজ দিতে পারেন। সরষে ও রসুন অপেক্ষা পিঁয়াজটা বেশী হলে ভাল হয়)।

(৬) শুকনো আম

যাদের হাতে একেবারে সময়ের অভাব, যারা সমস্ত খরচ করতেও বিমুখ তারা কাঁচা কিংবা পাকতে হয়ে ওঠা আম খোসা ছাড়িয়ে নুন, হলুদ ও শুকনা লঙ্কার গুড়ো মাখিয়ে রোদে ভাল করে শুকিয়ে মাটির হাড়ি কিংবা কাচের পাত্রে তুলে রেখে দিন। বর্ষার সময়ে কিংবা যেদিন বাজারে যাওয়া হলো না সেদিন চাটনী, টকের ডাল কিংবা ইলিশ মাছের কাঁটা, পুঁটি বা শুঁড়ো মাছ দিয়ে অল্প খরচে বাটা সহযোগে খুশী মতো খেতে পারেন।

যদি একটু কষ্ট করে সহজসাধ্য নিজের পছন্দসই আচার কিছু করে রাখেন, তবে আপনার একঘেয়ে খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আসবে। বাড়ীর আম দূরের প্রিয়জনের কাছে পৌঁছেও দিতে পারেন। আপনার বাগানের কিংবা নিকটবর্তী বাজারের আম নানা ভাবে রূপান্তরিত করে সাশ্রয় রাখুন।

সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ শিক্ষিতা মহিলারাও ইচ্ছা করলে বিভিন্ন আচার, মোরব্বা তৈরি ক'রে কিছু উপার্জনও করতে পারেন।

শুধু আমের কথা বলেও ফুরোয় না

জয়া দেবী

এই গরমের দিনে যদি বাড়ীতে কয়েক রকম টক মিষ্টি আচার তৈরী করে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বাদের বৈচিত্রে খুশী হবেন আর আপনার হাতের তৈরী জিনিষের কদর দেখে আপনিও আনন্দিত হবেন। চাটনী কিনতে যা খরচ পড়ে তার চেয়ে বাড়ীতে তৈরী করলে অনেক বেশী আয়ও হবে। শুধু চাটনী কেন অম্বলও গরমের সময় খুবই উপাদেয়। তাই আগে অম্বলের কথা বলে তারপর আবার চাটনীর কথা বলছি।

১। **আমের মিষ্টি অম্বল**

উপকরণ :—কষি ছাড়া ভাল বড় আম দুটি। গুড় বা চিনি দেড়শো গ্রাম। পাঁচফোড়ন আর সরষেতে বেশান আধ চামচ। একটু নুন। সামান্য হলুদ আর দেড় পলা তেল। একটি শুকনো লঙ্কা।

প্রণালী :—আম ছাড়িয়ে চার ফালি করে নিন কিংবা খোসা সুদ্ধও রাখতে পারেন। এবার কড়ায় তেল দিয়ে ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা দিন। হলুদ আর নুন দিন। আম ভেজে নিয়ে জল দিন। একটু পরে মিষ্টি দিন। জল কম রেখেন। চিনি বা গুড় গলে গেলেই নামিয়ে নিন। অম্বল হল।

২। **আমের টক অম্বল**

উপকরণ :—আম দশটি। মাঝারি সাইজের। নুন। আধ বাটি সরষে বাটা। পাঁচফোড়ন আধ চামচ, কাঁচা লঙ্কা চারটি। একটু হলুদ ও লঙ্কা বাটা তেল চার পলা।

প্রণালী :—আম ছাড়িয়ে ছোট করে কুটে নিন। সামান্য জল দিয়ে ভাপিয়ে নিয়ে জল ফেলে দিন। এবার কড়ায় দু'পলা তেল দিয়ে ফোড়ন দিন। আম ছেড়ে দিন তাতে লঙ্কা হলুদ সর্ষে বাটা দিন, নুনও দিয়ে দিন। বেশ মাখা মাখা হয়ে এলে বাকি তেল আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিন। এটি কয়েকদিন থাকেও। আর স্বাদ অনেকটা কাসুন্দির মত হয়।

ঝোল পাতলা করতে হলে রাই সরষের সঙ্গে এমনি সরষেও মিশিয়ে নিতে পারেন একটু। আর শুকনো ভাজা ভাজা করতে হলে মেশাবেন না।

এই তো গেল অম্বল। এবার আচার বলি।

যদি খুব শিগ্‌গির আচার করতে চান তাহলে আম কুরে নিন। তাতে তেলও কম লাগে।

৩। কোরা আমের আচার

উপকরণ :—বেশ বড় সাইজের কাঁচা আম পকাশটি। কালোজিরে, জিরে, মেথি, রাইসরষে, এমনি সরষে, সব মিশিয়ে আধ কাপ। সরষের ভাগ বেশী থাকবে। হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো বড় চামচের চার চামচ, নুন, একটু হিং, সরষের তেল এক পোয়া বা দেড় পোয়া আন্দাজ।

প্রণালী :—আম ছাড়িয়ে তারপর কুমড়ো কোরা কুরনীতে কুরে নিন। এবার একটি কাপড়ে শক্ত করে বেঁধে একটি অ্যালুমিনিয়াম বা পাথরের থালার উপর রেখে ভারি কিছু চাপা দিয়ে খানিকটা জল বের করে দিন। এবার নুন আর হলুদ মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। রোদে দিলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তুলে নেবেন কিন্তু। এখন মশলাগুলি শুকনো খোলায় ভাজুন, সরষের ভাগ যেন বেশী থাকে। আর ঝাল সহ্য হলে লঙ্কার ভাগও বেশী দেবেন। গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে ভাজবেন না। শুধু মশলা ভাজুন, হিংটি ঐ সঙ্গে দিন; বেশ গন্ধ বেরুলে নামিয়ে নিয়ে লঙ্কার গুঁড়ো মেশান এবং শিলে গুঁড়িয়ে নিন। বেশী মিহি করবেন না। এখন আমের সঙ্গে সমস্ত মশলা বেশ করে মিশিয়ে নিন। নুন দিন। তেল মেশান তারপরে বয়ামে ভরে দিন। একদিন পর ওপর থেকে আবার একটু তেল দেবেন। যেন আচার তেলে ডুবে থাকে। তাহলে শিগ্‌গীর নষ্ট হবে না আচার। একদিন বা দুদিন বয়ামের মুখে কাপড় বেঁধে আধঘণ্টা বা একঘণ্টা রোদে দেবেন তাহলেই দুদিনে আচার তৈরী হয়ে যাবে।

৪। কোরা আমের মিষ্টি আচার

উপকরণ :—বড় সাইজের কাঁচা আম পকাশটি। মেথি চায়ের চামচের দুচামচ, কালোজিরে দু চামচ, সরষে এক চামচ, জিরে দু চামচ হিং সামান্য, লঙ্কার গুঁড়ো দু চামচ। গুড় আমের ওজনে যতটা হয়, নুন, আস্ত ধনে একচামচ। এতে তেল লাগে না।

প্রণালী :—আমগুলি ছাড়িয়ে কুরে নিন। ঠিক ঐ টক আমের মতন করেই জল বার করে নুন হলুদ মাখিয়ে রোদে দিয়ে নিন। তারপর মশলাগুলি আর হিং ভেজে নিয়ে আধ গুঁড়া করে নিন। এবার লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে ওজন যাচাই করে একদিকে আম রাখুন অন্য দিকে গুড় রাখুন, তেলিগুড় হলেই ভাল হয়। এখন গুড়টি ভেঙে বেশ করে মিহি করে ঐ আমের সঙ্গে মিশিয়ে বয়ামে ভরে দিন। দিন দুয়েক রোদে দিন। চমৎকার স্বাদু আচার হবে। এই আচার সহজে নষ্ট হয় না। অনেক দিন থাকে।

৫। আমের মোরব্বা

উপকরণ :—বেশ বড় সাইজের কাঁচা আম পকাশটি। আমের ওজনে চিনি। রসুন চার পাঁচ কোয়া। আদা এক গাঁট। কিসমিস একশো গ্রাম। শুকনো লঙ্কা ছয়টি, জিরে পাঁচ ফোড়নে মেশান, টেবিল চামচের এক চামচ।

প্রণালী :—আম ছাড়িয়ে চার ফালা করে কাটুন। ভেতরে কসি হয়ে থাকলে ভালই। একটু শক্ত আমই দরকার। আম ছাড়িয়ে একটু নুণের জলে ভিজিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। এবার আম একদিকে আর চিনি একদিকে রেখে ওজন করে নিন। আম, চিনি, কিসমিস্, রসুন, চাকা চাকা করে আদা কাটা আর শুকনো লঙ্কা সব একসঙ্গে দিয়ে জালে চড়ান। বেশ চটচটে হয়ে এলে নামাবেন। দরকার হয় আরও চিনি দেবেন। আম চিনির রসে সলে খেটে গেলেই চিনি বেশী লাগে। এখন ঐ জিরে পাঁচ ফোড়ন সামান্য ভেজে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে জারে ভরুন।

৬। আমের চাটনী

উপকরণ :—অমনি কসি নুড় পকাশটি বড় আম। আমের ওজনে গুড়, হিং, জিরে, পাঁচ-ফোড়ন বড় চামচের এক চামচ। একটু নুণ আস্ত শুকনো লঙ্কা চারটি। একটু রসুন।

প্রণালী :—আম ছাড়িয়ে চার ফালা করে কাটুন। নুণ মাখিয়ে একটু ভাপিয়ে জল ফেলে দিন। এবার গুড় আর আম ওজন করুন। একসঙ্গে জালে চড়ান। রসুন দিন। লঙ্কাদিন। অমনি গাঢ় হয়ে এলে নামিয়ে হিং পাঁচ ফোড়ন জিরে ভেজে গুঁড়িয়ে দেবেন। ঠাণ্ডা হলে বয়ামে রাখবেন। এই হল চাটনী।

৭। কাঁচা আম আর জল পাই এর আচার

উপকরণ :—এক কিলো আম। এক কিলো জলপাই। টেবিল চামচের আট চামচ মেথি, চার চামচ লঙ্কা গুঁড়ো দুটো মিলিয়ে যতটা ওজন ততটা নুণ। সামান্য হলুদ। এগুলি ডুবে যাবার মত সর্ষের তেল চাই।

প্রণালী :—মেথি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিন। সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো মেশান। ঠিক অতটা নুণ নিন। হলুদের গুঁড়ো নিন সব একসঙ্গে মেশান। এবার আম চার ফালা করে কাটুন। জলপাই দুফালা করুন। ঐ মশলা দুভাগ করে নিন। অর্ধেক মশলা আমে মাখান আর বাকি অর্ধেক মশলা জলপাইতে মাখান। এবার একটি বড় মুখের জার নিন। তার মধ্যে আগে আম দিন এক পরত তারপর জলপাই দিন, আবার আম আবার জলপাই এমনি করে সাজিয়ে নিয়ে যখন সব শেষ হয়ে যাবে বয়ামের মুখে কাপড় বেঁধে দিনদুয়েক রোদে দিন তারপর ওপর থেকে সরষের তেল ঢেলে দিন। সব কিছু ডুবে যাবে তবুও ওপরে যেন আধইঞ্চি তেল থাকে। এটিও খুব সুন্দর একটি মুখোরোচক আচার।

আশাকরি এই জিনিষগুলি আপনার বাড়ীতে তৈরী করতে কোন অসুবিধা হবেনা। উপরন্তু আপনি প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করতে পেরে আনন্দিতই হবেন।

মন্ত্রের শক্তি

ডক্টর মতিলাল দাশ

উপসাগরের তীরে উচ্চাবচ পাহাড়ের উপর সান্তা-সলায় সানফ্রান্সিস্কো সহর। খুবই ভাল লেগেছিল নিসর্গ সুন্দর এই নগরটিকে। এখানে বিশ্বভারতী নামে একটি অতি ছোট বিশ্ববিদ্যালয়, জন পঞ্চাশ ছেলেমেয়ে পড়ে—অথচ এদের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি দেওয়ার সনদ আছে।

আমি গিয়েছিলাম অধ্যাপক হয়ে; বেদ আর হিন্দু আইন পড়াবো। কিন্তু অভাগা যন্ত্রপি চার সাগর শুকায়ে যায়—আমার ছাত্র জোটেনি, তাই মাসখানেক পরে এখান থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

এখানে একদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলাম—সেই বক্তৃতা শুনে একদিন দুটি মহিলা দেখা করতে এলেন। একজন বৃদ্ধা, এক সময় যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও দেখলে বোঝা যায়, অপর জন তরুণী—ফুটন্ত গোলাপের মত দেখতে। বৃদ্ধা বললেন—"চলুন, ডক্টর দাশ! আপনাকে আমাদের সহর দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

আমেরিকানদের উদারচিত্ততার অনেক গল্প শুনেছিলাম, কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছিলাম, তাই দ্বিধা না করে মহিলা দুজনের সঙ্গী হয়ে ভ্রমণে চললাম।

তরুণীটি মোটর গাড়ীটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে চলল—বৃদ্ধা পেছনে আমার পাশে বসে আলাপ করে চললেন।

বৃদ্ধা ও তরুণীর সাজ-সজ্জার চমক ছিল না—সাদাসিধা পোষাক। তার উপর দুজনের মুখে পোকাদোয়া একটি স্নাবিমা এনে দিয়েছিল। বৃদ্ধা বললেন—"আমার নাম মিসেস এডওয়ার্ডস—আমরা আয়ার থেকে এখানে এসেছি।"

"হাঁ, আমি আয়ারে গিয়েছি—কেলটিক জাতের সঙ্গে ভারতের এক নিবিড় যোগ রয়েছে উভয়েই অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস করে—"

বৃদ্ধা আমার কথা শুনে খুসি হলেন বললেন—"আপনার কাছে আমরা বিশেষ ঋণী হয়ে এসেছি—যদি....."

"নির্ভয়ে বলুন, আমার যদি সাধ্য হয়—"

এমন সময় তরুণী মুখ ফিরিয়ে বলল—"থাক না মা···" তার কথায় বিষাদের সুর ধ্বনিত হ'ল।

"থাকবে কেন, ডক্টর ঘোষের বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি, উনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন—"

তরুণী আর আপত্তি করল না, বৃদ্ধা বলতে লাগলেন—"আমার একমাত্র মেয়ে এটি ওর নাম নিনা—অর্জ নামের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম সে কিন্তু একান্ত বর্বর—মদ খেয়ে নিনাকে মারধর করে—ওর বাবা আর আমি ওকে বিবাহ-বিচ্ছেদের নালিশ করতে বলছি—কিন্তু ও কিছুতেই তা করবে না—যে মাতাল বদমায়েসের জন্ত ওর জীবনটা মাটি হয়ে যাচ্ছে—আমরাও একান্ত অসুখী কিন্তু মনে প্রাণে নিনা মাতালটিকে ভালবাসে—"

নিনার মোটর চালনা ক্রটিকের জন্ত বিরত হল সে কাঁদকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল—"মা!"

"না বাপু আমার অত চাক-চাক গুড়-গুড় ভাল লাগল না—কি জন্ত যে তুই ওই মাতালটাকে পছন্দ করিস ··"

সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছিলাম। কাছেই বনস্পতি বহুল একটি বনভূমি। সেই দিকে চেয়ে বললাম—"নিনা ঠিকই করছে, সতীত্বের আদর্শ ভারতবর্ষের বড় আদর্শ সীতা, সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি ভারতীয় নারীরা সতীত্বের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অতুলনীয় তাইত নিনাকে আমি সমর্থন করি—"

"না, না, বিচ্ছেদ ছাড়া কোনও উপায় নেই—"

"মা, অর্জ হয়ত আবার ভাল হতো—" তরুণীর লজ্জা মধুর কণ্ঠের প্রতিবাদ আমাকে পুলকিত করল।

আমি হেসে বললাম—"এ বিয়ে কলহ অকারণ—পুষ্পধন্বা যুক্তি মানেন না ভালবাসার সুর যেখানে বাজে, সে অকারণেই বাজে। সমুদ্রের ধারের রাজপথে গাড়ীটি রেখে, আমরা নিকটের পুষ্পলতা সঙ্কুল একটি পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম—নিনা তিন জনের জন্ত তিনটি কোকাকোলা নিয়ে এল।

বৃদ্ধা বললেন—"আপনি বশীকরণের মন্ত্র জানেন—"

"না, আমি যোগী নই—এসব বিদ্যা আমার নেই···"

স্মিতহাস্যে তরুণী এবার জবাব দিল—"মা কিন্তু জানেন আপনি যখন ধর্ম সম্বন্ধে এমন চমৎকার বলেন, তখন মন্ত্র-তন্ত্র সবই আপনার জানা ··"

"না আদৌ নয়, কিন্তু ভালবাসাই হল সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বশীকরণ···তুমি যখন অর্জকে ভাল বাস, তখন একদিন না একদিন সে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে···"

নিনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, ধীরে বলল—"সেই আশীর্বাদই করুন···"

"না ডক্টর ঘোষ এতে আমি ভুলব না—হয় ওকে একটা কিছু মন্ত্র দিন, ও নিত্যদিন জপ করবে না হয় কোনও ঔষধ—এর জন্ত যা খরচ করতে হবে তাতেই আমি রাজি···"

"কিন্তু আমি সত্য বলছি আমি এসবের কিছু জানিনা।"

বৃদ্ধা হতাশ হয়ে পড়লেন। তারাক্রান্ত হৃদয়ে মেয়েকে বললেন—"চল ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি·····"

(২)

এই ঘটনার পরে নিনা আর তার মায়ের কথা আদৌ ভাবিনি। সেদিন সন্ধ্যায় বার হয়নি—বাড়ী বসে একটি প্রবন্ধ লিখছি—নিনা এসে বাইরে যেতে অনুরোধ করল। আজ আমি তার পাশেই বসলাম—আলোছায়াময় প্রসারিত রাজপথ দিয়ে মোটর ছুটে চলল।

নিনা বলল—"আপনার কথাগুলি বড়ই সুন্দর লাগে, বলুন আমি কি করব?"

আমার মাঝে এল বক্তৃতার উচ্ছ্বাস। বললাম—"তুমি ভালভাবে থাক। ভালবাসা ছোট জিনিষ নয়। আমাদের শাস্ত্র বলেন, তুমি তোমার স্বামীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ মনে কর তাহলে দেখবে তোমার ভালবাসায় এসেছে পবিত্র এক সুরভি "

নিনা তার অনিন্দ্যসুন্দর নাবত দিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল—"আপনি এই রহস্যময় ভালবাসায় বিশ্বাস করেন?"

"করি নিনা—ভালবাসাই অমৃত……"

নিনার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—তার মুখে কাতর বিনম্র জিজ্ঞাসা। বললাম—"বিধাতার প্রকাশই ভালবাসায়—ভগবান জগতীত সত্তা ভালবাসা হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছেন—তাইত জগৎ অমৃতময়—সমস্ত ভয় ত্যাগ করে সেই মধুপান কর—"

নিনা চুপ করে খানিক কি ভাবল—তারপর বলল—"চলুন একটা রেস্তরাঁয় বসে কিছু খাবেন—"

প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়, কারণ তার কণ্ঠ মিনতির আবেগে উছল। নিনা খুব নামকরা রেস্তরাঁয় নিয়ে ভাল ভাল খাবারের আদেশ দিল—তারপর বলল "আমার মন সব সময় হাঁপিয়ে ওঠে—সাধারণের মত সুখের জীবন আমার নয়, তার পর মাও তাকে বকে অতিষ্ঠ করে তোলেন—"

আমি হাসতে হাসতে বললাম—"কিন্তু তুমি বড় ভুল করেছ—ভালবাসা নিয়ে বড় বড় কথা আমি যা বলছি তাতে তোমার জীবনের সমাধান হবে না…"

"কেন?"

"কারণ আমার ব্যক্তিগত জীবনে ভালবাসার কিছুই আমি জানিনি… পুঁথিপড়া বিদ্যায় এর হদিস মেলে না…"

এবার নিনাও হেসে কুটি কুটি হ'ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"আর কিছু নেবেন?"

"না, এই যা হয়েছে যথেষ্ট, বাসায় আজ আর ডিনার খেতে হবে না।"

ফিরবার পথে আলোছায়ার চলচ্চিত্র এক মায়ালোক সৃষ্টি করল। আমি দূর গৃহে বিরহিনী প্রিয়ার কথা স্মরণ করলাম—সে যদি নিনার সঙ্গে এই বৈশ অভিযাত্রার কথা শোনে, তাহলে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। অথচ নিনা কেমন সহজ কেমন নির্ভীক। তাঁর চোখে মুখে এক কলুষহীন দীপ্তি। বাসায় সময় সে বলল—"আমি এখন বুঝছি—আপনি যে সব সতীদের কথা বললেন—তাঁদের সেই প্রবল অনুরাগ নেই যে ভালবাসার সব অসুন্দর সুন্দর হয়ে দেখা দেয়, সে ভালবাসা আমার নেই।"

সোপান বেয়ে উঠতে উঠতে বললাম—"ঠিক বলছ তুমি, এই দীনতাই কিন্তু পূর্ণতা এনে দেয়—ভালবাস তাহলে সেই সাধনার পথেই আলো ফুটে উঠবে। আজো অঘটন ঘটে, প্রার্থনা করি তোমার জীবনে আশা আসুক, প্রাণ আসুক, আনন্দ আসুক "

নীল আকাশে তখন জ্যোৎস্না ভাসছে—ব্রডওয়ে রাস্তাটি বেশ পরিষ্কার, বিদ্যুতের আলো ছাপিয়ে সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সেই জ্যোৎস্নায় নিনাকে স্বর্গের অপ্সরী বলে মনে হল। নিনা ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করে বলল—"ডিয়ার ডক্টর দাশ! আপনার কথাই ঠিক—আমি ভালবাসার সাধনা করব—মার সাথে আমিও অনুরোধ করব—আপনি আমায় আত্মোপলব্ধি একটি মন্ত্র দিন—কিন্তু আজ নয়, আর একদিন আসব…"

(৩)

কয়েকদিন বাদের কাজে নিনাদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তবনের সেক্রেটারী মিস লিথ ডেকে পাঠিয়েছেন—আমার ফোন এসেছে—আমি আগন্তুক, আমি অপরিচিত, ফোনের আহ্বান স্বপ্নাতীত।

ফোনে নিনার গলা ভেসে আসল, বলল—"আজ সন্ধ্যায় আসুন আমাদের বাড়ী—এখানেই ডিনার খাবেন।"

"আর কেউ আছে নাকি?"

"হাঁ আপনার উপদেশ পালন করছি—অর্জকে ডেকেছি—তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে ভালবাসতে চেষ্টা করছি—আপনার কোনও অসুবিধা নেইত?"

"না, আমি ঠিক সময়ে যাব…"

প্রত্যুত্তরে নিনা আমাকে তাদের বাড়ীর নম্বর এবং যাতায়াতের ট্রেন ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

সন্ধ্যা আটটায় সাটার স্ট্রীটের বাড়ীতে যখন কলিংবেল বাজালাম, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তি দরজা খুলে দিল—সে হাসতে হাসতে আমায় করমর্দন করে বলল—"আমি অর্জ। হুইস্কি চলবে কি?"

"না, আমি মদ খাইনে…"

তাহলে দেখছি তুমি একেবারে অপদার্থ, মানব জন্ম পেলে অথচ অমৃত পান করলে না এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কি আছে? আমরা দুজন বলে আমি একটু অতিরিক্ত পান করি—কিন্তু পানীয়ের মদির স্পর্শ যদি না থাকল, তবে জীবনের কি তার থাকল?"

এমন সময় মিসেস এডওয়ার্ডস এলেন—তিনি অর্জকে ভালো করে বললেন—"তুমি আমার মনের খোলস খুলছ তোমায় বারন করিনি যে ডক্টর দাশের সামনে তুমি কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা করবে না…" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"সোফায় এসে বসুন ডক্টর দাশ. নিনা আসছে, তার সঙ্গে গল্পকরুন…আমার ডাইনিং টেবিলে একটু কাজ আছে…"

মিসেস এডওয়ার্ডস চলে গেলেন। অর্জ চুপ করে বসে বাকি পানীয়টুকু নিঃশেষ করল। এমন সময় নিনা এল।

নিনা আজ সেজেছে—আভরণে বাহুল্য নেই রয়েছে এক দিব্যজ্যোতি। নিনা এসেই অর্জকে সম্বোধন করে বলল—"অর্জ, ডক্টর দাশ আমাদের মন্ত্র দিচ্ছেন—তুমি দাশকে বসবার যাও…তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হচ্ছেন…"

আমার মনে এক আতঙ্ক। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি কি করব ভেবেই পাইনি। বিদেশে এসে এমন অভাবনীয় ভাবে গুরু সাজতে হবে একথা আদৌ ভাবিনি।

নিনা পুনরায় অর্জকে বলল—"এস মন্ত্রগ্রহণের পূর্বে আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে—আমি পিয়ানোতে একটি প্রার্থনার গান গাইছি তুমি চোখ বুজে শোনো।"

নিনা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে পিয়ানোতে গিয়ে বসল। তারকণ্ঠে এক অপূর্ব গান ধ্বনিত হয়ে উঠল। কিন্তু আমি অতিশয় বিপন্ন। এই তপস্বিনী সৌরীকে ফাঁকি দিতে মনে বাধল। আমিও ধ্যানস্থ হয়ে ভাবতে বসলাম।

অতি শৈশবের স্মৃতি আমার মনে অকারণে জেগে উঠল। আমার ভক্তিমতী ঠাকুরমা আপন বিপদে একটি সরল মন্ত্রে আমাদের ডাকতেন—"গুরু সত্য, আপদ মিথ্যা আপদ বালাই দূর হয়ে যা…"

পিয়ানোর গান শেষ হল। নিনা এইবার আকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—"এইবার মন্ত্রদিন আমাদের—"

আমিও ধ্যানাবিষ্ট চিত্তে গুরু ভজনের এই মন্ত্রটি অনুবাদ করে ওদের শুনিয়ে দিলাম কেবল গুরুর স্মরণ স্থলে ভগবানের স্মরণ করিয়া দিলাম। মিসেস এডওয়ার্ডস্ এসে তখন আহারের আহ্বান জানালেন। বিদায়ের সময় দেখলাম অর্জ বিমূঢ় হয়ে বসে আছে আর নিনার মুখে দেখলাম এক অপার্থিব আনন্দের আভাস।

(৪)

আর কিছু দিন পরেই আমি সানফ্রান্সিসকো ত্যাগ করে চিকাগোয় রওনা হই। উচ্চোক্তাদের বিশ্বপরিক্রমা টিকিট আমার—সুতরাং বিমানবন্দরে রওনা হলাম। বিলই শুধু আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল সে পি, এইচ, ডির ছাত্র অথচ বিশ্বভবনের পরিচারকের কাজ করে।

বিমান ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় মিসেস এডওয়ার্ডস এলেন হাতে তাঁর খাবারের ছোট একটা টুকরি আর খামের একখানি চিঠি। বিশেষ আলাপের সুযোগ হলনা কারণ বিমান একটু পরেই ছেড়ে দিল। বিমানে আরামে বসে খামের চিঠিখানি খুললাম।

নিনা লিখেছে ·· "ভাইয় দাশ, আপনি আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করেন। আপনার কথা আমার মনে দাগ কেটেছিল, অন্তরে যার ভালবাসা, তার আবার কিসের ভয়; তাই শঙ্কাহীন বিহ্বল অর্জকে জুলিকে ত্যাগ করতে বলি, শুনে আশ্চর্য হবেন আপনার মন্ত্রের অসামান্য শক্তি··· অর্জ জুলিকে ত্যাগ করেছে, আমরা দুজন এখন পরম সুখী, আমরা রোজ ভোরে প্রার্থনা করে আপনার মন্ত্র পাঠ করি, তার পরে সংসারের কাজে লাগি · তাই ভগবানের প্রণয় প্রেমাভা আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে রাখে।"

চিঠি নয়—এক দীর্ঘ ইতিহাস এদের জীবনের গভন বন্ধুর অত্যাশ্চর্যসুন্দর কাহিনী, কিন্তু সব কাহিনী অবান্তর। আমি শুধু বিমানে বসে ঠাকুরমার চরণে প্রণাম প্রণতি জানালাম।

আমি কৌতুক করিনি নিনাকে উপহার করিনি। একান্ত আন্তরিকতায় ঠাকুরমার গুরু মন্ত্রটি দিয়েছিলাম। আমি অবিশ্বাসী, আমি নাস্তিক কিন্তু পুণ্যবতী ঠাকুরমার তপোজ্জ্বল কণ্ঠের বাণী হয়তো এই অঘটন ঘটিয়েছিল।

ভারতের জাতীয় সংহতি ও স্যার আশুতোষ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ

সত্যিকারের প্রজ্ঞাদৃষ্টি সমসাময়িক কালের প্রাচীরে সীমাবদ্ধ থাকে না। সাম্প্রতিক কালের বন্যার জল যখন প্রশমিত হয়ে প্রশান্ত কালসমুদ্রে মিলিত হয়, তখনই প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি পেশানুরাগ সর্বক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটি সত্য বলে মনে করি। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাঁদের সম্পর্কেও কথাটা সত্য। তাই রামমোহনের প্রজ্ঞার আলোক আজো আমাদের পথ দেখায়, বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণতা আজো আমাদের উদ্বেলিত করে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম আজো আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে, বিবেকানন্দের মানব-প্রেম আজো আমাদের আলোকবর্তিকা। তেমনি পুরুষসিংহ আশুতোষ। তাঁর আবির্ভাবের একশো বছর পরেও বারবার এ কথাটাই মনে হচ্ছে যে, আশুতোষ তাঁর সমকালেই নিঃশেষিত হয়ে যাননি। তাঁর স্বপ্ন এবং সাধনা, তাঁর চিন্তা এবং কর্মধারা আজকের নবভারতের সমস্যার ক্ষেত্রেও সমাধানের ইঙ্গিত বহন করছে।

'বাঙালী আজ যা ভাবে, ভারতবাসী আগামীকাল তা ভাবে'—মহামতি গোখ্‌লের এই স্মরণীয় উক্তি উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কেই প্রযুক্ত সন্দেহ নেই; আর আশুতোষের মতো মনীষী ব্যক্তিরাই এই উক্তির উদ্দিষ্ট ছিলেন। গোখ্‌লে আশুতোষেরই সমসাময়িক ছিলেন এবং প্রায় অনুরূপ কল্যাণ-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। যাহোক, পুরুষসিংহ আশুতোষের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—জাতীয় সংহতি। এই গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল সমস্যাটি সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন, সমাধানের কী পথনির্দেশ করেছিলেন—তাই আমরা দেখবার চেষ্টা করবো এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে গুজরাট—এই বিস্তৃত ভূভাগের, এই বিরাট দেশের কোটি কোটি মানুষের বিচিত্র জীবনকে নিয়ে নবভারতের নূতন স্বপ্ন। এখানে ভাষা উপভাষা সংখ্যাহীন, আচার ব্যবহার বিচিত্র এমন কি পরস্পর বিরোধী, ধর্ম উপধর্মেরও শেষ নেই। আবার কোথাও রুক্ষ উষর মরুভূমি কোথাও বা সুজলা সুফলা স্নিগ্ধ-কোমলা প্রকৃতি। এই বহু বিচিত্র জীবন ধারার মধ্যে যে চিরন্তন ঐক্যের সুর নিহিত রয়েছে, কিরূপে তাকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করা যায়, জাতীয় সংহতিকে কিরূপে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়

তা-ই তো আজকের ভারতের একটি গুরুতর সমস্যা। 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যে মিলন সূত্রকে শক্ত সবল উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। এই মিলন সূত্রে গাঁথতে হবে, বিধৃত হবে নবভারতের জাতীয়তার মালা, যে মালার অঙ্গেক্ষ ভাবে শোভা পাবে বাঙালী, বিহারী, অন্ধরাজ, গুজরাটী, রাজপুত মারাঠী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, তামিল, পাঞ্জাবী এবং আর আর সব ভাষাভাষী ভারতবাসী। আজ যখন চীন আর পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ, যখন শত্রুরা নানারূপ কুমিকিকির ঝাঁটুছে, যখন নানারূপ অনৈক্য ভারতের ভিতরেও মাথা চাড়া দিচ্ছে, তখন ভারতের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠছে। কিন্তু শাসনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে কিংবা ভারতরক্ষা আইনের ধারা প্রয়োগ করে যথার্থ জাতীয় সংহতি স্থাপন সম্ভব নয়। সংহতির মূলভিত্তি মনের ভাব, মনের মিল। প্রত্যেকটি ভারতবাসী যখন ভৌগোলিক দূরত্ব, ধর্মমতের পার্থক্য, ভাষার ভিন্নতা এবং সামাজিক আচার আচরণগত বিভেদ সত্ত্বেও মনে প্রাণে পরস্পর পরস্পরকে এক বলে মনে করবে, আপাত অনৈক্য পার্থক্যের মধ্যে এক-ভারতীয়ত্ব উপলব্ধি করবে, সমসুখদুঃখে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন একপ্রাণ একতায় আবদ্ধ হবে তখনই তো সত্যিকারের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেই সংহতি, ঐক্যসূত্র গড়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র আমাদের মনের মিলনে, অন্তরের ভাবনা-সূত্রকে ভিত্তি করে। আশুতোষের ভূমিকা এই ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক মূল্যবান প্রবন্ধে আশুতোষের যে উদার ভাবকল্পনা ও মহতী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, সেখানেই ভারতের ভাবগত ঐক্য বা জাতীয় সংহতিমূলক ভাবধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। আশুতোষের বলিষ্ঠ-বিশাল স্বপ্ন এবং অটুট কর্মশক্তি শুধু বাংলা আর বাঙালীর কল্যাণ সাধনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর, মহত্তর কল্যাণ ব্রতেও তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে তিনি মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন বলেই সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীর প্রতিও তাঁর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। আশুতোষ ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এক গভীর একতার ভাব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল —'সেই এক সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন এক প্রাণ হইয়া গিয়াছিল।' বৈদিক যুগের সেই সাহিত্যিক একতাকে আধুনিক ভারতের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করার এক মহৎ আকাঙ্ক্ষা আশুতোষের জীবনে সঞ্চারিত হলো। সেই স্বপ্ন, সেই আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সারাজীবনের কর্ম প্রচেষ্টাকে প্রভাবান্বিত করুক। তিনি নির্দেশ করলেন—"আজ একবার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া একবার নর্মদা সিন্ধু কাবেরীর স্রোতে মানস স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্যবীর্যের সমাধি ক্ষেত্র রাজপুতানার গভীর মূর্তি দেখিতে হইবে।...বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে।" আজ যখন সমগ্র ভারত নানারূপ সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তখন আশুতোষের এই মহৎ ভাবাদর্শ সারা ভারতকে পথের ইঙ্গিত দিতে পারে। 'নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানস-স্নান', 'সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন' করতে না পারলে সত্যিকারের জাতীয় সংহতি আসতে পারে না। আশুতোষ এই ভারত-মানসিকতার উদ্গাতা।

ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ বা রাজ্য যদি আত্মকেন্দ্রিকতায় স্ফীত হয়ে অবশিষ্ট ভারতের কথা ভুলে

যায়, যদি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, যদি অন্য অংশের সঙ্গে তাদের বিনিময় না করতে পারে যদি অন্য প্রদেশের সুবিধা অসুবিধা বা ভাল মন্দের কথা চিন্তা না করে, অন্যের ভালকে নিজের ভাল বলে মনে না করতে পারে, তবে জাতীয় সংহতি কী করে আসবে? আশুতোষ তাই বললেন—"অন্যের যাহা ভাল তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে।...এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, বম্বে, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, পাঞ্জাব—সব একসূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাংলার ভাষা-সৌষ্ঠবের কুঞ্চনে রাজপুতানার মধুর কেকাধ্বনি বর্ধন করিবে, আবার পাঞ্জাবের ঝঙ্কারের সঙ্গে বাংলার সাহিত্য কুঞ্জ সরস হইবে।" ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোকের ভাবের আদান প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং আরো নানাবিধ উপকার করেছে। কিন্তু ভারতের অতি অল্প সংখ্যক লোকই ইংরেজী ভাষার অনুশীলন করে। "যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, সেই সাধারণ জনসমাজ এখনও ইংরেজীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় নাই।" আশুতোষের সাধনা ছিল এই বিপুল জনসংঘকে এক করিয়া তোলা এবং তা' জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে। আর এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের উপায় হবে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই ভারতের সাহিত্যিক একতার ভাবগত ঐক্যের ভূমিষ্ঠ রচনা করতে হবে। ইহাই ছিল আশুতোষের সারাজীবনের সাধনা। তিনি মনে করতেন—"যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে,—তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চা আপাততঃ উত্তেজনাজনক হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।" তাই তিনি রাজনীতি অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপরেই গুরুত্ব দিলেন সর্বাধিক। যাহার যাহা আছে তাহা বিসর্জন না দিয়া, কিরূপে ভারতে একতায়, এক চিন্তা, এক রাজনিকতা গড়ে তোলা যায় তাই ছিল আশুতোষের লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন "বাঙালী বাঙালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সুন্দর, নির্মল, মনোহর তাহা নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সঙ্গে যদি পারস্পরিক পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে তাহলেই ক্রমে ক্রমে ভিন্ন প্রদেশবাসী বা ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে আশুতোষ ভারতীয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাদীক্ষা মতিগতি ক্রমে একরূপ ধারণ করবে। মনে রাখতে হবে যখন আশুতোষ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সমূহের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তখন ভারতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জয়জয়কার। এই দুঃসাহসিক চিন্তা ও প্রচেষ্টার মূল্য আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। এ সম্পর্কে আশুতোষের চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী ছিল। তিনি বলেছিলেন "প্রথম কথা—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য।...দ্বিতীয় কথা—ইংরাজী ভাষা অর্থকরী

হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক তাহা জানেনা।...সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা।...তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে সকলকে এক, অখিণ্ডীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যে একতাবন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব-স্ব জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা দিয়া করিতে হইবে। ...যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের ধারা বহিবে।...'Unification of language না হউক, Unification of thought and culture নিশ্চয়ই হইবে।' বলাবাহুল্য, আজ আমরা যাকে National integration বা emotional integration বলি আশুতোষ কথিত Unification of thought and culture তারই নামান্তর।

আজ যখন সমভাষাভাষী ধর্মগত, ভাষা, প্রদেশগত সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা অনৈক্য ও বিভেদ থেকে মুক্তির সাধনায় তৎপর, অথচ নানারূপ অনৈক্য জাতীয় সংহতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে, আজ আসামে, কাল দক্ষিণ ভারতে নানারূপ অবাঞ্ছিত দুঃখজনক ব্যাপার ঘটছে, তখন আশুতোষের চিন্তাধারা, তাঁর মত ও পথ জাতীয় সংহতি সাধনে নূতন করে আমাদের পথের ইঙ্গিত দেবে। আজো শিক্ষিত ভারতবাসী যে পরিমাণে ইংরেজী সাহিত্যের খবর রাখে, সে তুলনায় প্রতিবেশী ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের কিছুই খবর রাখে না। আর তার জন্য কোন লজ্জাবোধও নেই। অথচ তেলেগু, তামিল, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, অসমীয়া, উড়িয়া এইসব ভাষা ও সাহিত্য কম সমৃদ্ধ নয়। ভারতের সংহতি তখনই সুদৃঢ় হতে পারবে যখন আমরা পরস্পরের ভাষাও সাহিত্য সম্পর্কে সুপরিচিত হবো। পরস্পরের ভাবের বিনিময় যখন ব্যাপক ও স্থায়ী হবে। মনীষী আশুতোষ প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এ-কথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সমগ্র শক্তি দিয়ে তাঁর এই ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। আশুতোষের জীবন কালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পঠন সুরু হয়েছিল এবং বলা বাহুল্য তা তাঁরই চেষ্টায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা বিশেষ হয়নি। তা যদি হতো তবে এতদিনে ভারতবাসীর ভাবগত ঐক্য বা মনের মিল অনেক বেশী হতো। ফলে জাতীয় সংহতি আরো সহজ ও স্বাভাবিক হতো। অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ চেষ্টা কিছু হচ্ছে।

আশুতোষের এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি, এই সুদূরদৃষ্টি, এই উদার ভাব কল্পনা তাঁর দেশাত্মবোধ ও মহৎ আদর্শের দ্বিনের নানা সঙ্কীর্ণতা বিভেদ অনৈক্য বর্জিত আমাদের জীবন মনকে সঞ্জীবিত করুক। তাঁর প্রদর্শিত পথে আমাদের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হোক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উক্তি স্মরণ করি—"তিনি (আশুতোষ) সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞান সম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যতকে এক আশ্রয় দেবার উদ্যোগ করেছিল।" ভারতের চিত্তমুক্তি এখনো অসমাপ্ত, সমস্ত দেশের এক আশ্রয় এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই কথা মনে রেখে আমরা যেন আশুতোষের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হই।

অশান্ত পৃথিবী

মলিনীরঞ্জন মিত্র

ভিয়েৎনাম :

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পরিস্থিতি আজ সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন যুদ্ধ এলাকা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিনী বোমাবর্ষণ পুরোদমে চলেছে। এদিকে বর্ষা আগতপ্রায় এবং এই সময়ে যুদ্ধ এক নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে। থাইল্যাণ্ড সরকার এই যুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে সাম্যবাদকে রুখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধের পরিধি বাড়বে তবু কমবে না। কম্বোডিয়াও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রতি চীন সরকার আক্রান্ত কম্বোডিয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। সুতরাং এশিয়ার এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের আশা সুদূর পরাহত।

উপরোক্ত যুদ্ধকাণ্ডের সঙ্গে আর এক নতুন সমস্যা জড়িত হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সরকার সমর্থক ও সরকার বিরোধী দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়েছে। Da Nang ও Hue অঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর জোর লড়াই চলেছে। কয়েকজন শান্তিকামী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা আমেরিকান যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাবছে এবং বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী প্রচার করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে Ky সরকার যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে একথা অনস্বীকার্য এবং জনগণের উপর যে তাঁর এতটুকু প্রভাব নেই সে কথাও জলের মত স্পষ্ট। তিনি যে শুধুমাত্র তাঁর মার্কিন বন্ধুর বদান্যতায় টিঁকে আছেন একথাও

মার্কিন বিরোধী মনোভাবও সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দানা বেঁধে উঠছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুগুলি যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী ধ্বনিতে মুখর। বৌদ্ধদের রাজনৈতিক অভিযোগগুলি দূর করবার কোন প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত হয় নি। এর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। খাদ্য সমস্যাও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। মার্কিন সৈন্যদের যথেচ্ছভাবে খরচ করবার জন্যে দেশে ইনফ্লেশান দেখা দিয়েছে। জিনিষের দাম অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই। শুধু তাই নয় আমেরিকান bossing ও তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখন তাদের ধ্বনি হচ্ছে—

Vietnam for Vietnamese.

Americans are not bosses.

ইন্দোনেশিয়া :

বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার তিন রাষ্ট্রনায়ক—জেঃ সুহার্তো, আদম মালিক ও হোমজাকার্তার সুলতান দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। তাদের মুখে সেই ভাব অনেকটা কমেছে। ভারত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহও দেখা গিয়েছে। যদিও চীন বিরোধী মনোভাব এখনও কমেনি। হয়তো তারা অদূর ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কছেদ করতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার আরও একটি বড় রকমের পরিবর্তন আসতে পারে। ডাঃ সুকর্ণের প্রেসিডেন্ট পদ চিরকালের জন্যে থাকবে না। সর্বত্র স্বাধীন নির্বাচনের জন্যে দাবী উঠেছে। সুতরাং হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রেঃ সুকর্ণের ক্ষমতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে যদিও মুখে তিনি এখনও আস্ফালন করে চলেছেন। কম্যুনিষ্ট নিধন যজ্ঞ এখনও শেষ হয়নি তবুও আশা করা যাচ্ছে যে বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি উদয় হবে এবং তারা ইন্দোনেশিয়াকে এশিয়ার একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।

আরব দুনিয়া :

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সৌদী আরবকে অস্ত্র সাহায্যের সংবাদে সমগ্র আরব দুনিয়ায় অসন্তোষের ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে প্রেঃ নাসের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে বেশ উষ্মা প্রকাশ করেছেন। সৌদী আরব এখনও মধ্যযুগের তন্দ্রা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারা এখনও মুসলীম সংঘের স্বপ্ন দেখছে এবং আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি এতটুকুও দরদ নেই। সম্প্রতি এই মুসলীম ভ্রাতৃত্বের সমর্থক লেবাননের একজন সাংবাদিক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। ইরাকের কুরদীন সমস্যা এখনও বেশ জটিল অবস্থায় রয়েছে। সিরিয়া ইসরাইল সীমান্তেও প্রায়ই গুলি বিনিময় হচ্ছে। বিশ্বর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কও ক্রমশ: জটিলতর হচ্ছে। ফলে আরব জগৎ ক্রমশ:ই অশান্ত হয়ে উঠছে।

মিজো-নাগা সমস্যা :

সম্প্রতি রেডারেণ্ড ষটকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ভারতের মাটিতে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ষটকে বহিষ্কার করলেই নাগা সমস্যার সমাধান হবে না। এই বিদ্রোহীদের পেছনে অস্ত্র যারা ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও ভারত সরকারকে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং খুব কঠোর হস্তে নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের দমন করে ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

আফ্রিকা :

নবজাগ্রত আফ্রিকার সর্বত্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চীন প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে দক্ষিণপন্থীগণ ক্রমশই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। একে একে ঘানা, কঙ্গো, আপার ভল্টা, নাইজিরিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানেও দক্ষিণপন্থীগণ সক্রিয় হয়ে উঠেছে ক্ষমতার লড়াইয়ে কেনিয়াট্টা জয়লাভ করেছেন এবং বিরোধীদের সরকারী উচ্চপদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছেন। উগাণ্ডাতে ও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। এদিকে কেনিয়া ও ইথোপিয়ার সঙ্গে সোমালিয়ার সীমান্ত সংঘর্ষ বেধেছে।

রোডেশিয়া :

উপরোক্ত অভ্যন্তরীন সমস্যা ছাড়াও সমগ্র আফ্রিকার স্বেতাঙ্গদের অত্যাচার আরও একটি বৃহৎ সমস্যা। রোডেশিয়ার স্মিথ সরকার এখনও পর্যন্ত বহাল তবিয়তে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বৃটিশ সরকার তার সঙ্গে আলোচনায় বসতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। আফ্রিকা বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেছিল যাতে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোরতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু মিঃ উইলসন তাতে কর্ণপাত করেননি। নিরাপত্তা পরিষদে ও উইলসনের নীতিকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে উগাণ্ডার প্রতিনিধি কয়েকটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন কেন স্মিথকে পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না? তিনি বলেছেন যে সমগ্র আফ্রিকাবাসী বৃটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাও পর্তুগাল সরকারের বিরুদ্ধেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ। নইলে স্মিথ সরকারকে কিছুতেই বশে আনা যাবে না।

মায়াপুরী ডিজনেল্যাণ্ড

নীলাদ্রি সোম

[কিন্ন দেখতে ভালোবাসেন, বিশেষ ক'রে ছোটদের জন্ত নির্মিত কিন্ম, তারা ওয়াল্ট ডিজনের কথা জানেন না এমন হতেই পারে না। ছোট-বড়ো সকলের কাছেই রূপকথার রচয়িতা হিসেবে হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের যে-রকম স্থান, শিশুদের চলচ্চিত্র-নির্মাতারূপে ওয়াল্ট ডিজনের তেমনি নাম। তাঁর তৈরী ডিজনেল্যাণ্ড শুধু শিশুদের মায়াপুরী নয়, তাদের তীর্থ। চিরকালের মতো ওখানে থমকে আছে আমাদের সকলের ছেলেবেলা।]

"অন্যের মতো আমিও আমার ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে পার্কে বেড়াতে যেতুম। বাচ্চারা খুব খুশী হতো। কিন্তু কয়েকটা বাজে ঝামেলা ব'লে আমার নিজের তীব্র বিশ্রী লাগতো। তখন প্রায়ই ভাবতুম, এ রকম একটা পার্ক কেন তৈরি হয় না যে খানে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মা-বাবারাও সমান আনন্দ পেতে পারেন?"

হাজার-হাজার মা-বাবা হয়তো এ কথাটি ভেবেছেন। ওয়াল্ট ডিজনে কিন্তু ভেবেই ক্ষান্ত হলেন না, সত্যি-সত্যি অমনি একটি পার্ক তৈরি করার পরিকল্পনা নিলেন, যেখানে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা, ঠাকুরমা ঠাকুরদা, সকলে সমান মজা পেতে পারে। ওয়াল্টের সেই স্বপ্নের রূপায়ণই হলো ডিজনেল্যাণ্ড।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যানাহেইমের কাছে অবস্থিত তাঁর যাদুপুরীতে প্রতি বছর অন্তত ক'য়েকলক্ষ দর্শকের আমদানী হয়।

অদ্বিতীয় পার্কটিতে বর্তমান ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু অতীত আশা-উজ্জ্বল আগামী এবং কালের অলৌকিক কীর্তি, বাস্তব অস্তিত্ব যার কোনোদিনই ছিলো না। শিশুদের গল্পের দুঃসাহসিক অভিযান, নিসর্গ-জগতের বিস্ময়, আগামী পৃথিবীর রূপ আর ইতিহাসের নানা অধ্যায় পাশাপাশি মিশে আছে ডিজনেল্যাণ্ডে।

ওয়াল্টের গড়া মায়াপুরীর চারটি প্রধান অঞ্চল: অ্যাডভেনচার ল্যাণ্ড, ফ্রন্টিয়ার ল্যাণ্ড ফ্যাণ্টাসি ল্যাণ্ড আর টুমরোল্যাণ্ড।

অ্যাডভেনচার ল্যাণ্ড-এ অমল ক্রুজ বা ছোট একটা মোটর লঞ্চ তাকে ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের নিয়ে পাড়ি দেয় কুমীর থৈ থৈ জলের ভেতর দিয়ে। তীরে তাছাড়া, শিশুদের অবাক ক'রে দেয় প্রায় ৭০ ফুট উঁচু সুইস ফ্যামিলি ট্রি হাউস। এনচ্যান্টেড টিকি রুম-এ পাখি আর ফুলগুলি গান গায়।

ফ্রন্টিয়ার বা সীমান্তরাজ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে 'মার্ক টোয়েন' নামধারী একটা স্টীমবোট, কল্পবিদ্যার অধিকল প্রতিরূপ, আমেরিকার সব ক'টি নাব্য নদী, টম সয়ের দ্বীপ, ঝুলুঝে প্রাসাদ, রেড ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম, প্রকৃতির মায়াধীরাজ্যের ভেতর দিয়ে সরু একটা রেলপথ।

ফ্যান্টাসি ল্যাণ্ড! স্লিপিং বিউটি ক্যাসল-র ভেতর দিয়ে একটা সেতু, সেতুটা চ'লে গেছে ম্যাড হ্যাটার-এর টি-পার্টির দিকে। উড়ন্ত হাতী ডাম্বো; অলরহ্যাদের জাহাজ; মার্কাস ট্রেন, গল্পের বইয়ের দেশের খালের নৌকো: হাইওয়ে রাইড; ম্যাটারহর্ণ পাহাড়। মনে হয় এদের প্রত্যেকটিই নেমে এসেছে কল্পনার মেঘরাজ্য থেকে।

টুমরোল্যাণ্ডের দ্রষ্টব্য স্থান: শূন্যে একটি মাত্র লাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ি, মিউজিয়ার সাবমেরিন, উড়ন্ত চাকতি, চন্দ্রযাত্রী একটি আশি ফুট রকেট; অটোপিয়ার উপর দিয়ে ঘুরে গাড়ি; একটি বিশেষ প্রদর্শনী: রূপসী আমেরিকা; আর্ট অব অ্যানিমেশন।

কল্পনার এক আশ্চর্য ঘুমোস ডিজনেল্যাণ্ড। হাতী সত্যি-সত্যি সেখানে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়, তার পিঠে ব'সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায় শিশুরা। এনচ্যান্টেড টিকি রুম-এ ব্যাঙ পাখি তথা ব'সে গান গায়। ছোক না ছোট, তবু তো গাছপালায় ঢাকা সত্যিকারের দ্বীপ! শিশুদের উত্তেজনার সীমা থাকে না। ক্যাটফিশ কোভ-এ ওরা সত্যিকারের মাছ ধরবার চেষ্টা করতে পারে, ঝুলন্ত সেতু ধ'রে লাফ দিয়ে পেরুতে পারে গিরিখাত, উঁকি দিয়ে দেখতে পায় গুহার অতল গহ্বর ওরা উঠতে পারে গাছের মাথায় টম আর হাকলের বাড়িতে। ডিজনেল্যাণ্ড শিশুদের সব-পেয়েছির দেশ। এখানে ওরাই রাজা, ওদেরই রাজত্ব।

ডিজনেল্যাণ্ডে সমস্তক্ষণ গ্রীষ্ম কিংবা বসন্ত। নদীগুলির দু-তীর রং-বেরঙের ফুলে বোঝাই। ৩০ জন মালী কাজ করে। ঝোপঝাড়, তরু, আর ফুলের গাছ ওখানে প্রায় সাত শো রকমের। এ ছাড়া আরো নানারকম ফুলের বৈচিত্র্য তো আছেই। ডিজনেল্যাণ্ড শুধু শিশুর দেশ নয়, এক আশ্চর্য উদ্ভিদ উদ্যানও। নকল ঝের, নীল, কালো, আর আমাজান নদীর ভেতর দিয়ে শিশুদের নিয়ে চলে শালোরঙের নৌকা। নদীর দুধারে সত্যিকারের রবারের গাছ, দৈত্যাকার বাঁশ, বিচিত্রবর্ণের উদ্ভিদ জবা। নদীর প্রতিটি বাঁকেই নানারকম বিপদের বন্দোবস্ত: নরখাদকদের বর্শার বিদ্ধিক, জলহস্তীর মত হাঁ, গরিলার বুক চাপড়ানি, পুরুষ হাতীর হাপাহাপি। সবে ব'সে শিশুরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। ওদের চোখের পলক পড়ে না। ওরা কান খাড়া ক'রে শুনে তীরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসা হাতীর ডাক।

দিনের মধ্যে বার আটেক পর্বত আরোহণের সুযোগ ম্যাটারহর্ণ পাহাড়ে। তার উপরটা আবার তুষারে ঢাকা। পাহাড়ের ভেতরে সুড়ঙ্গ। শিশুরা সেই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে পারে বরফেতে চ'ড়ে এতে ওরা ভয়ও পায়, আবার আনন্দও পায়।

ডিজনেল্যাণ্ডে বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝখানে সীমারেখা নেই। সত্যের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কখন যে অসত্যের দেশে তারা হাজির হয়েছে, দর্শকরা জানতেও পারে না। স্লিপিং বিউটি কাসলের ধারে যে রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলি সত্যিকারের নয় তা কি কেউ চোখে দেখে ঠিক করতে পারবে।

পৃথিবীর সবচাইতে বিস্ময়কর সাবমেরিনটিও আছে ডিজনেল্যাণ্ডেই। বন্দর ছেড়ে সাব-মেরিনটি জলের তলা দিয়ে চ'লে যায় মায়াত্মক প্রবাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চারদিকে খেলা করছে অসংখ্য মাছ, সামুদ্রিক ফুলে ফুলে গেছে বিরাট বিরাট কাছিম। সেইসবের ছায়ায় হাঙর এবং কয়েকটি রাক্ষুসে, হিংস্র মাছ। জলের অনেক নিচে ক'য়েকটি প্রাণীর শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে ঝলমলে আলো।

নিমজ্জিত জাহাজের খোলের ভেতর দিয়ে, ঝলমলে মণি-মুক্তায় বোঝাই রত্ন-সিন্দুক আর তুষার-শুভ্র রূপসী জলকন্যাদের পাশ দিয়ে চ'লে যায় সাবমেরিন। যেতে-যেতে চোখে পড়ে মৃত মহাদেশ অ্যাটলান্টিস এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক সর্প।

বিরার নদীর উপর দিয়ে যায় মাইন ট্রেন। যাত্রীরা দুধারের জলের দিকে তাকালেই দেখতে পায় বীবররা বাঁধ তৈরি করছে, ধূসরঙ্গ দুটি পুরুষ এক, পিলা মনস্টার এবং আরো নানা অদ্ভুত দর্শন জীবজন্তু। মাইন ট্রেনের যাত্রীদের বিস্ময় চরমে পৌঁছায় যখন ট্রেনটি ঢুকে পড়ে গ্রামবন্ধু-গুহার ভেতরে। চারদিক অন্ধকার ক'রে রেখেছে পাহাড়ের কালো দেয়াল। তলা থেকে উপরের দিকে ফলকস ক'রে উঠছে নানা রঙের ফোয়ারা।

দর্শকদের অনুরোধে ক্যামেরার সামনে হাজার রকম পোজ দেয় মিকি মাউস। এত ছবি তুলবার সৌভাগ্য তার যতো আর কারো হয়েছে কিনা সন্দেহ। কোনো ঘরে ঢুকি দিলে চমকে যেতে হয় প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহাবাসী মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কারিগররা খোকা হাতী পর্যন্ত তৈরি ক'রে রেখেছেন। তাকে জলদি দাঁড় করিয়ে দিলে জ্যান্ত মনে না করার উপায় থাকে না।

ডিজনেল্যাণ্ডের অন্যতম বিস্ময় এব্রোহাম লিঙ্কন। প্রথম দেখে দর্শকরা তো রীতিমতো চমকে ওঠেন। চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে অবিকল লিঙ্কন। দর্শকরা যেতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে করমর্দন করেন, এমনকি দুচারটে কথাবার্তা পর্যন্ত বলেন।

ডিজনেল্যাণ্ডের বর্ণনা অসম্ভব। নিজের চোখে ছাড়া ওই মায়াপুরী সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

১৯৫৪ সালে ওয়াল্ট ডিজনে বলেছেন: 'ডিজনেল্যাণ্ডের নির্মাণ কখনোই সম্পূর্ণ হবে না। যতদিন মানুষের কল্পনা নামক বস্তুটার অস্তিত্ব থাকবে সে-ও বাড়তেই থাকবে।' দর্শকরা তাঁর কথার সত্যতা নিজের চোখে দেখতে পায় প্রতিবছর। কেবলই সম্প্রসারণ চলেছে অধিতীয় মায়াপুরীর।

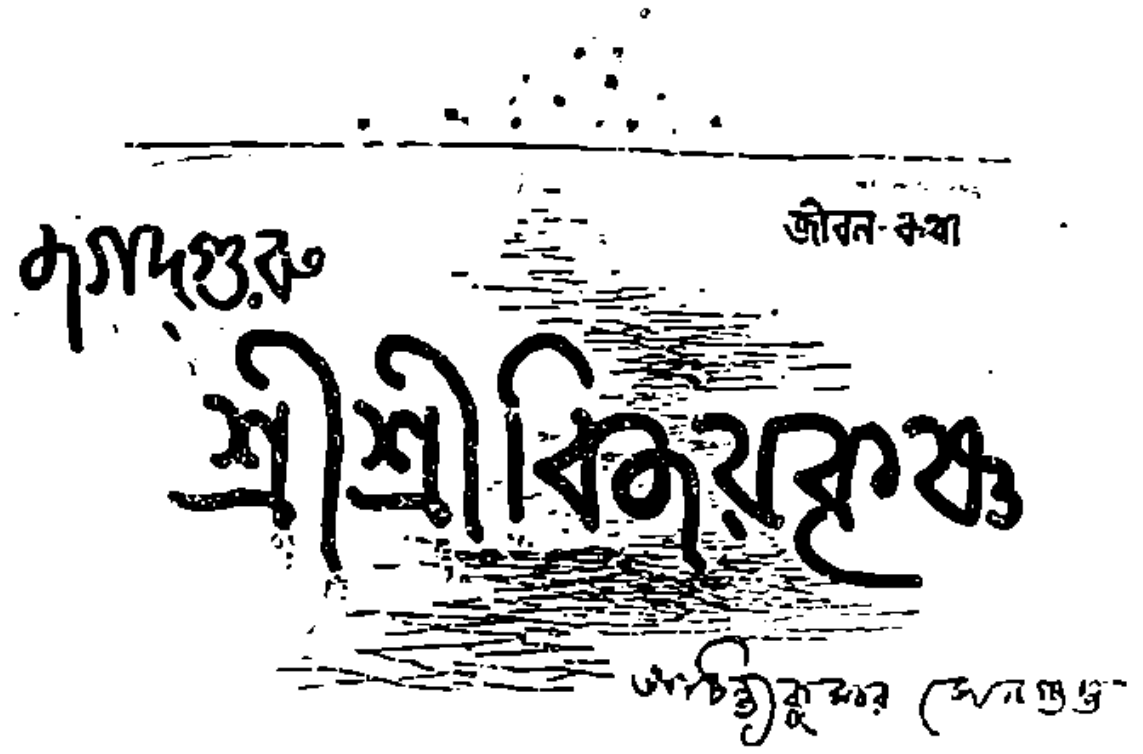

৩৯

গোঁসাইজি বললেন, দেবপ্রসাদ আসছে। ওর জন্যে পাশের ঘরখানা ঠিক করে রাখো।

স্বামী দেবপ্রসাদ।

পূর্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাড়ি চন্দননগর। আইন পরীক্ষা পাশ করলেও উকিল হননি। সন্ন্যাস নিয়েছে। বিদেহ-সন্ন্যাস।

স্ত্রী মারা যাবার পরই মন উঠে যায় সংসার থেকে। কিন্তু, না, একটি শিশু পুত্র রেখে গিয়েছে আর একটি টিয়ে পাখি, তাদের প্রতিপালন করতে হয়। ছেলে কোলে করে দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেওয়ান দেবেন। খিদে মিটে গেলেও ছেলে কাঁদে, মা-মা করে। বুকে যত মমতা আছে, চোখে যত আদর, ঘরে যত মধু, সমস্ত একত্র করে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়।

সেই ছেলেও চোখ বুজল।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দেবেন, কিন্তু টিয়ে পাখিটাকে ঘুচল না। কুম্ভমেলায় গিয়েছে সেখানেও সেই টিয়ে পাখি।

সবাই কটাক্ষ করল : এ আবার কোন মায়া।

প্রভু-অন্ত প্রাণ, আছেনও তাঁর আশ্রয়ে। দেবপ্রসাদ নামও তাঁরই দেওয়া। তিনি বললেন, 'আশ্রিতকে ত্যাগ করবে কী করে? আশ্রিতকে রক্ষা করাই তো ধর্ম।'

পাখি বলে উঠল, 'শিব, শিব।'

কুতুবুড়ি পাখিকে খেতে দেয় আর পাখি তাকে নাম শোনায়। সাধুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে পাখিও সাধু হয়ে উঠেছে।

একদিন কুতুবুড়ি বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : শোনো শোনো পাখি কী বলছে? কী বলছিস? সবাই ছুটে এল খাঁচার কাছে।

পাখি স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, 'কালী কহটক, শিব অসৎওক, শিব শিব, শিবরাম।'

সেই পাখিও আর থাকল না।

স্ত্রী আর ছেলের কিছু কাপড়চোপড় একটা পুঁটলিতে করে সঙ্গে-সঙ্গে রাখত স্বামীজি, এবার সেই পুঁটলিটাও উধাও হল।

এখন শুধু কমণ্ডলু আর ডোরকৌপীন।

পুরীতে এসে এখন তার কাজ নীরবে দাঁড়িয়ে প্রভুকে দেখা আর অশ্রু বিসর্জন করা আর সন্ধ্যায় প্রভুর ডান পাশে থানাসনে শান্ত হয়ে বসে থাকা। উদ্যম-নিয়ম দুই অবস্থাতেই প্রভুর মাঝে অগ্রাবণকেই অবলোকন।

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন কোথায় কী আছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সংকলন করে পাতি প্রস্তুত করার পণ্ডিতও এই দেবপ্রসাদ।

কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে যদি আসল বিদ্যা হরিভক্তি না থাকে? যদি না থাকে মহৎকুশলা বৈষ্ণবতা?

দেবপ্রসাদ মহোত্তম বিদ্বান-বৈষ্ণব। এক কথায় বৈষ্ণবতম।

কে বৈষ্ণবতম?

যাকে দেখা মাত্রই হরিনাম শুধু মনে পড়ে না মুখে আসে সেই বৈষ্ণবতম।

সেই দেবপ্রসাদকে মহোদধি টেনে নিল। স্নান করতে যে নামল আর উঠল না।

ক'দিন আগে থেকেই বলছিল, আমার এখানে থাকতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু কোথায় যে যাই তাও জানা নেই। এমন কেন হচ্ছে তা কে বলবে? নির্বাণ কি একেবারে নিবে যাওয়া, না, নিত্যের ঘরে জ্বলে ওঠা?

রোজকার মত সমুদ্র স্নান করতে এসেছে। তক্ষুনি-তক্ষুনি জলে না নেমে তীরে বসেছে স্থির হয়ে, চোখ বুজে। কেন এই তন্ময়তা তা কে বলবে?

সঙ্গে অশ্বিনী মিত্র ছিল, জিজ্ঞেস করলে, 'স্বামীজি, এভাবে রইলেন যে। স্নান করবেন না?'

'উঠে স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' স্বামীজি বললে, 'অন্তরীক্ষে গান শুনছি। অনেক বাজনা বাজছে, যেন থিয়েটারের কনসার্ট বসেছে। যেমন শুনলুম তেমনি মূর্ছনা।'

'আপনার বায়ু প্রবল হয়েছে। কাল সারারাত ঘুমোননি।' বললে অশ্বিনী, 'শুধু ভজন করেছেন। এ বিকার তারই ফল। চলুন স্নান করে নিলেই শরীর সুস্থ হবে। কানের মাঝে আর ঝিঁ-ঝিঁ ডাকবে না।'

'না হে, এ বিকার নয়, এ ঝিঁ-ঝিঁর ডাক নয়, এ এক অপার্থিব নৃত্যগীত।' স্বামীজি বললে বিষণ্ণের মত, 'আরো কিছুক্ষণ শুনতে দাও। বেশি দেরি নেই, নামছি স্নান করতে।'

নামবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমত্ত জোয়ার এল আর ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল চক্রতীর্থের দিকে, যে দিকে মহাপ্রভু ভেসেছিলেন। জল থেকে হাত তুলে স্বামীজি দেখাল, কোন এক অদৃশ্য হাত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে! শেষে তিন-তিনবার লাফ দিল ঢেউয়ের উপর, উচ্চারণ করল, জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু।

কুলদানন্দও ভেসেছিল সঙ্গে-সঙ্গে, সেই শুনল সেই গুরুধ্বনি।

কুলদানন্দ তাসল অন্য পথে, হরিদাসের সমাধির দিকে। দেখল চেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তলিয়ে গেল দেবপ্রসাদ।

স্বামীজি আর নেই—আশ্রমে খবর এসে পৌঁছুতেই ঠাকুর তিন-তিনবার শঙ্খ করে উঠলেন। বললেন, 'ভূতানন্দ স্বামীকে খবর দাও।'

জগন্নাথবল্লভ মঠের প্রাচীন মোহান্ত এই ভূতানন্দ। মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করেন। তা হলে তাঁর বয়েস দাঁড়ায় সাড়ে চারশো বছরেরও উপর। এই কল্পনাতীত দীর্ঘ জীবনেও তাঁর ব্রহ্মচর্যের ব্রতভঙ্গ হয়নি, মূর্তিমান অনলের মত তেজস্বী ছিলেন। কিন্তু এমনি নিয়তির পরিহাস, নরহত্যার দায়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের বিচারে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলেন বটে কিন্তু মোহান্তের পদ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটল। পড়লেন সমাধিমন্দির দু'নিমার মধ্যে। সোমাধীপ্রভু এসে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সবাইকে চেনালেন ভূতানন্দ কোন অভূতপূর্ব আনন্দের অধিকারী। বললেন, ওর সঙ্গ করব এই আশাও আমার পুরী আসার এক কারণ।

আর ভূতানন্দও চিনলেন একে দিব্যকলেবর! একদিন ঠাকুরের মুখোমুখি বসে স্থিরচক্ষে তাকিয়ে বলতে লাগলেন করজোড়ে : 'শ্রীপূর্ণ, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান।' বলেই বারবার নমস্কার করলেন।

ভূতানন্দ খবর পেয়ে বিধান দিলেন স্বামীজিকে সমাধি দিতে হবে। সন্ন্যাসীর তাতেই সদ্‌গতি।

বললেন, 'দেবলায় শ্রীমন্দিরে দেবপ্রসাদ জগন্নাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে। আপত্তি জানালায়। বললায়, আপনি সন্ন্যাসী, বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ করবেন কেন? সাষ্টাঙ্গ করে আপনি অপরাধী হয়েছেন। এক কথায় দেবপ্রসাদ পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল। বললে, আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার তো ঐ অবস্থা হয়নি, কেবল পথে প্রবেশ করেছি মাত্র। আমাকে আপনারা দেখান, কৃপা করুন। ভক্তিমান সন্ন্যাসীর সে কী বিনয়, সে কী সর্বসমর্পণ।'

মঙ্গলাঘাটে স্বামীজিকে সমাধিস্থ করা হল।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করল, 'স্নানের আগে তীরে বসে স্বামীজি গান শুনছিলেন বলেছিলেন—সেটা কী?'

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে যোগী সন্ন্যাসীদের প্রয়াণকালে স্বর্গের কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরীরা নৃত্যগীত করে আনন্দ-অভ্যর্থনার আয়োজন করে। ওসব গান শুনতে শুনতে যোগী সন্ন্যাসীরা অন্তর্ধান করেন। সন্দেহ কী, দেবপ্রসাদ মহাইতম পরম পদ লাভ করেছে।'

যারা বানরবধের পাণ্ডা ছিল তারা স্বামীজির মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করল। প্রচার করে বেড়াল, বানর না মারতে দেওয়ার দরুনই দেবপ্রসাদের অপঘাত মৃত্যু হল।

ঠাকুর বললেন, 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্র যাকে নিজে টেনে নিয়ে যায় তার আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তাঁর বাসনা কামনা সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যে কর্মও আর কিছু ছিল না। তাঁর নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়েছে। তিনি ক্ষেত্রবাসী জগন্নাথের নিত্য সহচর হয়ে থাকলেন।'

'এই নির্বাণ অবস্থাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণ।' যোগজীবন বললে।

'মহাপ্রভুকে যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বামীজিকেও সমুদ্র সেই দিকে নিয়েছে, মহাপ্রভু সমাধিস্থ ছিলেন বলে তাঁর মৃত্যু হয়নি।'

'শেষ সময়ে স্বামীজি তিনবার জয়গুরু বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন—'বললে তুলসী।

'তাই তো বলছি তিনি পরমগতি লাভ করেছেন।'

স্বামীজি কি-কি জিনিস রেখে গিয়েছেন ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হল। একখানি বইয়ের মধ্যে একটুকরো কাগজে একটা গান পাওয়া গেল—স্বামীজির হাতে লেখা। ঠাকুর নিজেই সুর সংযোগ করে গান করতে লাগলেন :

'কে সরলা ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমায় হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে, নির্হেতু যে জন ভাবে।
যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নির্হেতু ভালোবাসা
নিস্পৃহতার নেইক আশা সেই আশাতেই বসে রবে।'

আর কী জিনিস আছে?

ছোট একটি পুঁটলির মধ্যে একটি সিঁদুরের কৌটো।

'ওঁর স্ত্রীর যৌতুক।' বললে অশ্বিনী।

ঠাকুর বললেন, 'আহা, বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বরূপ। স্বয়ং মহাদেবও সতীদেহ নিয়ে দেশে-দেশে ফিরেছিলেন। যাক, সব এখন সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এস।'

কী ভেবে কে সিঁদুরের কৌটোটি খুলল। ও হরি, কৌটোর মধ্যে তিনখানি চিঠি। আর তিনখানিই ঠাকুরের লেখা।

প্রথম পত্রে ঠাকুর স্বামীজির তপস্যার কুশল প্রার্থনা করেছেন। লিখেছেন, যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে অর্থোপার্জন করবেন। কর্মধারাই কর্ম কেটে যাবে: আর যেখানেই থাকুন না কেন, প্রাণের যোগে কিছুই দূর নয়, সমস্ত নিকট।

দ্বিতীয় পত্রে সময়ের পরিপক্কতার বিষয় লিখেছেন। লিখেছেন, সকল বিষয়েই সময় আছে। সময় হলে ঘরে বসেই কাজ হবে। সময় না হলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হবে না। তবুও চেষ্টা করতে হয়, আর তার নামই কর্মভোগ। কর্মভোগ না করলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এটাই প্রকৃত লাভ। যত আত্মহারা হয়ে নির্ভর করবেন ততই উন্নতি।

তৃতীয় পত্রে শুধু নিষ্ঠার কথা। লিখেছেন, নিষ্ঠা করে সাধন করলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। তর্ক আর তখন কথার ব্যাপার থাকে না। কোনো বিষয় অনুধান করে নিতে হয় না। সমস্তই প্রত্যক্ষ।

ঠাকুর বললেন, 'মোক্ষের চারটি দ্বার। প্রথম, শম; দ্বিতীয়, বিচার; তৃতীয়, সন্তোষ; চতুর্থ সৎসঙ্গ।

যাই ঘটুক না কেন, তাতে অধীর না হওয়ার নাম শম। সরলতাতেই এ লাভ হয়। সংসারে কোন বস্তু নিত্য আর কোন বস্তু অনিত্য তার তুলনা করাই বিচার। যেদিন যা ঘটে তাতেই খুশি থাকার নাম সন্তোষ। কারু মনে উদ্বেগ না আনা, কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা আর ভগবানই পালনকর্তা এই বিশ্বাসই সন্তোষলাভের উপায়। সন্তোষই মোক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্বার, নিশ্চয়ের। সৎসঙ্গ অর্থ সাধুসঙ্গ। যাকে দেখলে ভগবানের নাম মুখে হয় সেই প্রকৃত সাধু।'

আবার বললেন, 'বাক্যসংযম করবে। কারু প্রতিবাদ করবে না। সত্যরক্ষা ও বীর্যধারণ

করবে। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখবে। খাসে প্রশ্বাসে নাম করবে। আমার দুটো কথা শুধু মনে থাকো, তাতেই সমস্ত সাঙ্গ হবে। ধীরধারণ আর সত্যকথা। সত্য বলতে হলেই বাক্যসংযম হয় আর পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি হলেই ধীর আপনা আপনি স্থির হয়ে আসে।'

স্বামীজির প্রয়াণে সবাই কাতর। যোগজীবন বললে, 'যেই একটা লোক তৈরি হচ্ছে ভগবান তাকে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বুকে বল থাকলে সহ্য হয়েই।' বললেন ঠাকুর, 'ডবে' আধার তৈরি হলে আর কি তা থাকে? চলে যায়।'

আশাবতীও যোগীবরকে এই কথা জিগগেস করেছিল: 'সময় হয়নি বা সময় হয়েছে এ কথার তাৎপর্য কি?'

যোগীবর বললেন, 'কৃষকেরা শস্য রোপণ করে শস্য না পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পাখি ডিম প্রসব করে তা দিতে থাকে। সময় না হলে ডিম ফোটায় না। অসময়ে ফোটালে ডিম কেঁচে যায়। তেমনি যার হৃদয়ে ধর্মের জন্যে আকুলতা হয়নি, অহঙ্কার নষ্ট হয়নি, তাকে ধর্মের উপদেশ দিলে তাতে উপকার না হয়ে অপকার হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'পৈতে ফেলে দিলাম, তাতে অভিমান গেল না। আরো বিগুণ বাড়ল। পৈতে ফেলে দিয়েছি তখন সেই অহঙ্কার। মূলসহ অভিমান সহজে যায় না। কাম ছাড়ব, ক্রোধ ছাড়ব, লোকে সাধু বলবে, এ অভিমান সকলের চেয়ে বড় শত্রু। বিদ্যার অহঙ্কারে বিদ্যার নাশ, পুত্রের অহঙ্কারে পুত্রের নাশ, মানের অহঙ্কারে মানের নাশ। আর ধনের অহঙ্কারে ধনের সর্বনাশ। আবার যে নির্ধন তার ধনীকে ঘৃণা করার অহঙ্কার, আর তাতে তারও সর্বনাশ। বাগানের কর্তা বাগানে এলে মালী যেমন ঘুরে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি দীনবন্ধু হৃদয় বাগানে এলে অহঙ্কার মালী করযোড়ে ঘুরে গিয়ে অবস্থান করে।'

সেদিন সন্ধ্যের আগে আশ্রমদ্বারে এক ক্ষুধার্ত ভিখিরি এসে উপস্থিত, আর তার কী মর্মভেদী কান্না: দ্যায় ক্ষুধা হুঁ, দ্যায় ক্ষুধা হুঁ।

আসনে ধ্যানস্থ ছিলেন প্রভু। কান্না শুনে চমকে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কে কোথায় আছ, শিগগির এই ভিক্ষুককে অন্ন দাও।'

কী ব্যাপার, সেবক ভক্তের দল ছুটে এল। দেখল প্রভু কাঁদছেন, বলছেন, 'আজ সমস্ত দিন জগন্নাথদেবের ভোগ হয়নি, তাই তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন।'

কই, কোথায় ভিক্ষুক? তাছাড়া জগন্নাথ তো ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, তাঁর আবার ভিক্ষে করে বেড়ানো কেন?

'তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত নন তা কে বলছে, কিন্তু যে সকল ভক্ত ভাঙা একমাত্র মহাপ্রসাদের উপর নির্ভর করে থাকে, তাদের ক্ষুধাই তাঁকে ক্লিষ্ট করছে। যাও, যাও, খোঁজ নাও গে।'

ততক্ষণ মন্দিরে গিয়ে খবর নিয়ে জানল পুরুষী পাণ্ডাদের মধ্যে কলহ ঘটেছে, তার ফলে জগন্নাথের ভোগ হয়নি এতক্ষণ। জগন্নাথের নালিশ শুনে গোস্বামী-প্রভু চকল হয়ে ওঠবার পরেই পাণ্ডাদের ঝগড়া মিটেছে। জগন্নাথের ভোগ হয়েছে, প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে কাঙালিরা। আর সেই আর্তনাদী ভিক্ষুকও অন্তর্হিত।

ভক্ত সতীশ মুখুজ্জেও এখানে দেহ রাখল।

বাড়ি চাকা বিক্রমপুরের বাঘড়া গ্রামে, ময়মনসিংহের জামালপুর হাই স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক। ঠাকুর যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিল তাঁর কাছে। যখন শুনল ঠাকুর পুরী যাচ্ছেন, ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সটান পায়ে হেঁটে চলে এল ময়মনসিং। পরনে কোট-পেন্টালুন, মানে স্কুলের পোশাক, ময়মনসিংহের সকলে তো অবাক। এ কী পাগলের মত অবস্থা! হ্যাঁ, ভাই, পাগল হতে আর বাকি নেই। কেন, কী হয়েছে? ঠাকুর পুরী চলেছেন। তা যান না যেখানে খুশি, তাতে তোমার কী। আমিও পুরী যাব। কলকাতায় টিকিট কেটেছি। এই পোশাকে? পোশাক দেখো না, প্রাণটাকে দেখ। স্কুলের চাকরি? ঠাকুর জানেন।

কলকাতায় এসে ঠাকুরের সঙ্গ ধরল। চলে এল পুরুষোত্তম।

সবাই পাগল বলে ডাকে।

জগন্নাথকে নারকেল-জল দান করেছে কিন্তু নারকেলটা সে খাবে। সে কি, জগন্নাথকে দান করবার পর খাওয়া চলবে না। কে বললে? আমি তো জগন্নাথকে জল দিয়েছি, শাঁস দিইনি। জগন্নাথ তাতে ভাগ চান কোন হিসেবে?

'সতীশ কেমন আছে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'গুরু যদি কৃপণ হন তবে আর আনন্দ কোথায়?'

ঠাকুর হাসলেন। এই হাসিটুকুই চেয়েছিল সতীশ। এই হাসিটুকুতেই সমস্ত দিন আলোকিত রইল। সারাদিনই সতীশের আনন্দে কাটল।

মহাপ্রসাদে তার কী বিদারুণ শ্রদ্ধা! বাসি হয়ে পোকা পড়ে পচে গেলেও তার কাছে তার সম্মান আছে। পোকা বেছেই খেতে লাগল তৃপ্ত মুখে, প্রতি গ্রাসে প্রণাম করে। বললে, 'মহাপ্রসাদে মন বড় প্রসন্ন হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'সতীশকে মহাপ্রসাদ কৃপা করেছেন।'

একদিন সরাসরি ঠাকুরকে বললে, 'দেখুন, আপনার স্বাস্থ্য সুবিধের নয়। কখন হঠাৎ আমাদের ছেড়ে যান তার ঠিক নেই। দেবপ্রসাদ স্বামীর পরম সৌভাগ্য, আপনার আগেই সে ধামের কৃপা পেয়েছে। আমাকেও সেই কৃপা পাইয়ে দিন।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ভয় নেই, জগন্নাথ তোমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

সামান্য দুদিনের জ্বরে সতীশ দেহ ছাড়ল।

সকলের এত প্রিয়, অথচ সতীশের মৃত্যুতে কারু শোক উপস্থিত হল না। বাসিয়ের এতটুকু ছায়া নেই কোথাও। সবাই বিমূঢ়, পরস্পর বলাবলি করছে, আমাদের কান্না পাচ্ছে না কেন? আমাদের সতীশ নেই, অথচ কান্না কী, তা আমরা ভুলে গেছি।

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে মৃত্যুর পর যার আত্মা সদ্গতি লাভ করে তার জন্যে কান্না শোক হয় না।'

যখন সতীশের দেহ মন্ত্রপূত করে হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল চিতাধূম থেকে সুগন্ধ উঠল। সবাই মোহিত হয়ে গেল। সাধারণ জ্বালানি কাঠের ধোঁয়ায় চন্দনের গন্ধ।

ঠাকুর বললেন, 'যাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন তাদের দাহকালে দেহ থেকে অমনি দিব্যগন্ধ

নির্গত হয়। কৃষ্ণ পুতনার স্তন স্পর্শ করেছিলেন, তাই তার দাহকালে 'চতুঃসনের' গন্ধ বেরিয়েছিল। সতীশ অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করেছে। বৃন্দাবনে রাসস্থলীতে তার পাকা বাসস্থান হল।'

ঠাকুরের জন্যে রেকাবে করে মহাপ্রসাদ নিয়ে যাচ্ছে, একটা লাড্ডু আর একখানা খাজা। লাড্ডুর মনে লাড্ডু রইল, খাজাখানা শূন্যে ছিটকে গিয়ে দুহাত দূরে গিয়ে পড়ল।

এ কী লৌকিক কাণ্ড! গোল লাড্ডু একটুও নড়ল না আর চ্যাপ্টা খাজা উড়ে গেল শূন্যে!

'না, এ কারু অসাবধানতার জন্যে নয়, সতীশ শূন্য থেকে খাজার খাবা মেরেছে।' বললেন ঠাকুর, 'ওর যে মহাপ্রসাদের জন্যে লালসা দুর্বাসা। এ মহাপ্রসাদের জন্যে শুধু সতীশ কেন, কত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লালায়িত। শোনো, কাল সমুদ্রে গিয়ে ঐ খাজাখানা সতীশকে স্মরণ করে উৎসর্গ করে দিও।'

সতীশই সার্থক সন্ন্যাসী, সার্থক সংসারত্যাগী। ঠাকুর বললেন, 'বাড়ি ঘর টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হলে সমস্ত বিড়ম্বনা। যতদিন মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে ততদিনই কর্ম থেকে যায়। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে কর্ম করে গেলে অচিরে সেই কর্মের অবসান হয়। সতীশের দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না, সেই প্রকৃত বৈরাগী।'

অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উৎসব করলেন ঠাকুর। মঠের বাবাজিরা এসে যোগ দিল। ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য করলেন। হঠাৎ কোত্থেকে এক রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে ঠাকুরের কোমর ধরে নাচতে লাগল। ঠাকুর যেন তার কতকালের অন্তরঙ্গ এমনি ভাবের সৃষ্টি করে সহসা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কে ইনি?' জিগগেস করল সহদেবনাথ। হাতে আবার ডমরু দেখলাম না?

'হ্যাঁ,' ঠাকুর বললেন, 'ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব। কী খেয়াল, ঐ বেশে এসেছিলেন।'

সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখলেন ঠাকুর। বাসায় ফিরছেন একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কালো ছেলে ঠাকুরের কাছে ঘুড়ি-চাদর চেয়ে বসল।

ঠাকুর বললেন, 'আমার সঙ্গে বাসায় চলো দেখি কী করতে পারি।'

রাত হয়ে আসছে, এখন আবার কী ঝামেলা, যোগজীবন ছেলেটিকে বাধা দিল। বললে, 'কাল এস।'

'কাল?' ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হল।

'হ্যাঁ, কাল সকালে এস। রাত্রে সুবিধে হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হবে।'

ছেলেটি চলে গেল।

আশ্রমের দরজায় এসে ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। সেই ছেলেটি কই?

'তাকে কাল আসতে বলে দিয়েছি।'

'সে কী, আমি তাকে আসতে বললাম আর তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিলে?' ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'যতক্ষণ ছেলেটিকে না আনবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ব না।'

তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল। ওরে দেখা দিয়ে আবার কোথায় পালালি! তোকে না পেলে যে ঠাকুর নড়বেন না, তাঁর দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একটা চালার মধ্যে বেড়ার আড়ালে ছেলেটা লুকিয়ে আছে। ধর ধর। তাকে সাক্ষাৎ ভগবান দর্শনলাভ। একেবারে হাতে ধরে টেনে আশ্রমে নিয়ে এল।

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুর বালকের পা টিপে দিতে লাগলেন।

দুধ আর চাষের সেবা হল। বালক উঠে দাঁড়িয়ে খুব তেজের সঙ্গে বললে, 'তোমাদের খুব পুণ্য হল।' বলে চলে গেল নিজের পথে।

বালকের মধ্যে ঠাকুর কী দেখলেন?

'দেখলাম বালকের মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি। তোমরা যখন তাকে তাড়িয়ে দিলে দেখলাম রথিকোটার জগন্নাথ ক্রুদ্ধ মূর্তি ধরেছেন। বজ্রমুষ্টি তুলে আমাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছেন। ছেলেটিকে খুঁজে পেলে, নিয়ে এলে আমার কাছে, দেখলাম জগন্নাথের মুষ্টি শিথিল হয়েছে, ভঙ্গিতে এসেছে কোমলতা। আর এখন দুধ-চাষের সেবার পর তিনি প্রসন্নমুখে কী সুমধুর হাসছেন।'

যেখানে সংকোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না, তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বৈকুণ্ঠ মানে কী? মানে যেখানে কুণ্ঠা নেই, শুধু ঋজুতা আর সরলতা। সম্মানের লোভত্যাগই প্রধান ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ করো, বিশ্বাস করো দেহের মধ্যেই সমস্ত আছে। পদধূলি সেবার উদ্দেশ্য বিনয় দেখানো নয়, শরীরে অপূর্ব শক্তি সঞ্চারের জন্যে। পদধূলির অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

আর হীনতা ভিক্ষুকের বস্ত্র। একবার হৃদয়ে এলে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঠাকুর বললেন, "একবার একটি মুসলমান মুটের পা ধরে সাষ্টাঙ্গ করেছিলাম, সে বাপ বাপ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, বললে, যিনি রাম তিনিই রহিম, তিনিই কৃষ্ণ।'

বারে বারে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলে ভগবানের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে বসে তাঁর নাম করো। নিজের কোনো ক্ষমতা নেই বুঝলে। তাঁর উপর নির্ভর না করে আর উপায় কী। মন খোলসা করে ফেলে, নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝে সরলভাবে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে যদি বলতে পারো', আমি আর পারলাম না, আমাকে রক্ষা করো, তিনি ঠিক রক্ষা করবেন। ভগবৎকৃপায় অন্তত ব্যাকুলতার প্রয়োজন। ভগবান যেমন সতীকে রক্ষা করেন তেমনি কুলটাকেও পালন করেন। বেশ: উপবাসী থাকলে তাকে উপপতি এনে দেন। ভগবানের মত বন্ধু আর কে আছে? একমাত্র ভগবানের কাছেই সরল হওয়া যায়। কোনো প্রকার সাধন ভজন না করে শুধু সরলতার প্রভাবেই মানুষ মুক্ত হতে পারে। সরল হৃদয়ই সর্বদা—সর্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সর্বদা অসত্য চর্বণ করে, অসত্য রোমন্থন করে। একমাত্র বন্ধুহীনতায়ই তার এই দুর্গতি।

করতালের ধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঠাকুর বলছেন: 'রথরিকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। রামেশ্বরধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। দ্বারকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। ইহকালবাসী নরকবাসী পাপী পুণ্যাত্মা সকলের চরণে নমস্কার। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সকলের চরণে নমস্কার।'

যে এই স্তুতিপাঠ শুনছে সেই অভীভূত হয়ে যাচ্ছে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

পাঠক পাঠিকার কলম

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যাপারে কাণ্ডকারখানা যা ঘটছে তাতে বাংলা দেশ থেকে লেখাপড়া লোপাট হতে আর বেশী দেরী নেই। একদিকে গোড়ার গলদ, অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা। একদিকে শিক্ষাকর্তাদের চিন্তাশক্তির অত্যাবশ্যিত অব্যবস্থা, প্রশ্নপত্র-রচয়িতাদের খামখেয়ালীপনা, অন্যদিকে ছাত্রদের অসহিষ্ণু মেজাজ এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে রীতিমত সমাজবিরোধী মনোভাব। এর মীটফল পরীক্ষা ভবনে প্রায়শই ধরফড়।

এক ভদ্রলোক বেশ বলেছেন সেদিন—"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-দপ্তরের কর্তারা কিভাবে দায়িত্ব পালন করেন তার একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। বি. এস. সি. পার্ট ওয়ান-এর রসায়ন পাশের ২য় পত্রের প্রশ্নপত্রের কোনো কোনোটিতে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর এবং কোনো কোনোটিতে ছটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। কেমন করে ঐ তারতম্য ব্যাপার ঘটলো তা জানিনা। পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত প্রশ্ন, প্রশ্নপত্রে প্রশ্নরচয়িতার পাণ্ডিত্যের ঘুলঘুলি, পরীক্ষার্থী জব্দ করা প্রশ্ন—এসবও আছে প্রচুর পরিমাণে। পরীক্ষার্থীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখা শক্ত বৈকি।"

কিন্তু তাই বলে, অজুহাত পেলেই ওভারি করে পরীক্ষা পণ্ড করা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই এই সব-ভণ্ড কাণ্ডের নায়কত্ব করে। এবং তাদের সেই বেপরোয়া হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার ঝুঁকি কেউ নিতে চান না। না অন্য ছাত্ররা, না পরিচালকরা। এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন ছাত্ররা জীবনে কোনোদিন কোন পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেনা, নিজেদের অপদার্থতা সম্বন্ধে তারা সম্যক সচেতন, তাই অপরের সাফল্যকে তারা ব্যাহত করবার চেষ্টা করে।

শিক্ষা-অধিকর্তাদের এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব আছে। অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে ভাল এবং সৎ ছাত্রছাত্রীরা নিগৃহীত হবে, পরীক্ষা দিতে পারবেনা—এ অবস্থা অসহনীয়। কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দিতে হবে। তা যদি তাঁরা না পারেন তাহলে পরীক্ষা বিলকুল বন্ধ রাখা উচিত।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে তিন তিনবার পরীক্ষা স্থগিত। এ বিষয়ে কলকাতার ছাত্ররা রেকর্ড সৃষ্টি করবার মনস্থ করেছে। কলকাতার অনেক নাম—'মিছিল নগরী' 'মৃত নগর', 'মোড়ের নগর' ইত্যাদি। এবার রেকর্ডে তার আর একটি নাম হবে—'পরীক্ষা স্থগিত নগর' অথবা 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার' নগর। এই নতুন দুর্নাম থেকে, এই কলঙ্ক থেকে কলকাতাকে বাঁচাবে কে? কোথায় সেই জননায়ক যাঁর কথা দেশের শুনবে, যাঁর নির্দেশ মানবে, যাঁর আদর্শে লোক অনুপ্রাণিত হবে?

বর্তমানের তথাকথিত দেশনায়কদের দেখলে হাসি পায়।

২৩৫, বি, টি রোড
কলকাতা-৩৮
১৮.৪.৬৮.

ইতি—
শ্রীহীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সিনেমার হলহাল কীভাবে আজ বাংলাদেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিপথগামী করছে তার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি, এবিষয়ে সিনেমা হাউস, প্রযোজক ও পরিবেশকও কম দায়ী নয়। যে ভাবে যে ভাষায় তাঁরা ছবির বিজ্ঞাপন দেন, পোস্টার মারেন, পুস্তিকা বিক্রি করেন তা দেখলে ও পড়লে যে কোন সুরুচি সুস্থ হতে বাধ্য।

আমি একজন শিক্ষক। আমার একটি কোচিং ক্লাস আছে। চার পাঁচটি ৭।৮ম শ্রেণীর ছাত্র সকালে পড়ে। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি চার পাঁচটি ছেলে সেদিনকার বাংলা দৈনিক পত্রিকার পাতা খুলে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে এবং একটি ছেলে বলছে—এ ছবিটা দেখতেই হবে, যেমন করে হোক।

তারা আমার আগমন টের পায়নি। বললাম, কি ছবি দেখবে হে তোমরা। বলতে বলতে কাগজখানা টেনে নিয়ে দেখলাম, সিনেমা-বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা এবং তার মাঝখানে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন যার প্রতি ছেলেরা আকৃষ্ট হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি এই :—

"হাতে নাতে ধরুন আমেরিকার রাত্রি—নৈশ মজলিশ—উন্নত যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা—বহু রকমের যৌন আকর্ষণের বাহার।"

AMERICA BY NIGHT

"কেবল প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য" (খুব ছোট অক্ষরে। কিন্তু মারাত্মক ওই কথাগুলো)।

কলকাতা পৌরসভা আছেন, সরকার আছেন, নীতিসংরক্ষণ সংঘও আছে বলেও শুনেছি। তাঁদের কি উচিত নয়, এধরণের যৌনপ্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন, চিত্র প্রভৃতির আমদানি বন্ধ করা?

বেহালা
হরিসভা রোড,
১১.৪.৬৮.

ইতি—
সুনির্মল রায়

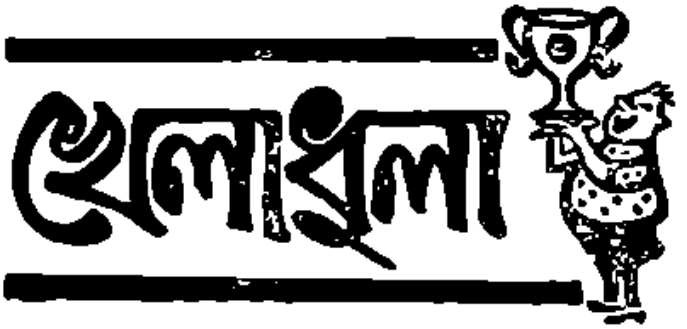

মোহনবাগান ক্লব নিজ মাঠে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলায় উয়াড়ীকে ৫-০ গোলে পরাজিত করেছে। কিন্তু খেলার আগে সরকারী অবহেলায় সাধারণ দর্শক গ্যালারী ভেঙে পড়ায় বহু দর্শক আহত হওয়ায় সমস্ত খেলাটির উপর বিষাদের ছায়া নেমে আসে। খেলার সময়ে তাল দিয়ে চলতে থাকে আহতদের শুশ্রূষা আর হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা।

ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ

আজ বিলাতের এফ. এ কাপ ফাইনেল খেলায় এষ্টনভিলা শেফিল্ডস ওয়েডনেসডেকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে শেফিল্ড দল ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

এশিয়ান যুব ফুটবল

এশিয়ান যুব ফুটবল ফাইনেল খেলায় ইস্রাইল ও বর্মা উভয়ে একটি করে গোল করায় খেলা ড্র হয়। অতিরিক্ত ৩০ মিনিট খেলান হয় কিন্তু আর গোল হয় না। তখন ইস্রাইল ও বর্মাকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খেলাটি ফিলিপাইনের রাজধানী মানিলা সহরে অনুষ্ঠিত হয়।

ইষ্টবেঙ্গলের শুভ সূচনা

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব নিজ মাঠে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের উদ্বোধনী খেলায় প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে মরশুমের শুভ সূচনা করেছে। এদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বিজয়ী দলের পরিমল দের "হ্যাট্রিক" লাভ। এটাই হল এবছরের প্রথম 'হ্যাট্রিক'।

দৌড়বীর হ্যারির শুভ পরিণয়

পৃথিবীর স্বল্পায়ু দৌড়ের দ্রুততম দৌড়বীর পশ্চিম জার্মানীর আমিন হ্যারি-লক্ষপতির ২৮ বৎসর বয়স্কা কন্যা ক্রিস্টিনা বাওমাটের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। গতমিটারে বিশ্ব রেকর্ডকারী অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয়ী হ্যারির (২৮) সঙ্গে ক্রিস্টিনার দু'বছর আটমাসের আলাপ শেষ পর্যন্ত শুভ পরিণয়ে পরিণতি পেল।

আজ লণ্ডনে এফ্ সি সিও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের তিন দিন ব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

মাইক স্মিথ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গত অষ্ট্রেলিয়াও নিউজিলাণ্ড সফরে মাইক স্মিথ ইংলণ্ডের নেতৃত্ব করেছিলেন।

২রা জুন ম্যানচেষ্টারে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হবে।

ফরাসী টেনিসে জয়দীপ মুখার্জি

ফরাসী আন্তর্জাতিক হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের জয়দীপ মুখার্জিকে সফলম বাছাইরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা ওরা জুন প্যারিসে আরম্ভ হবে।

লীগ ফুটবল

স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চার ম্যাচ প্রথায় না খেলা সত্ত্বেও সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে ইষ্টবেঙ্গল স্পোর্টিং ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যুদস্ত করে সাত গোলে জয়লাভ করেছে।

"নোবল"

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিতর্কমূলক বোলার চার্লি গ্রিফিথকে ন্যাজাপাড়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় আম্পায়ারদ্বয় যে সাতবার নোবল ডেকেছেন তার মধ্যে একবার হল ছুড়ে বল করার জন্য। ঐ খেলার অন্যতম আম্পায়ার ফ্রেডি অ্যাকসন একথা প্রকাশ করেছেন।

ক্লের বিশ্ববিজয়ী ঘোড়ার অসুখ

বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ বিজয়ী ক্যাসিয়াস্ ক্লে আজ তার বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরী কুপারের বিরুদ্ধে পনের রাউণ্ড ব্যাপী লড়াইয়ের ষষ্ঠ রাউণ্ডে নতুন নগরে বিজয়ী ঘোষিত হয়েছেন।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গডার্ড পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হয়েছিল। তিনি মোট আটটি টেষ্ট ম্যাচে খেলেন।

পরলোকে প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ দীনবন্ধু সেন

সর্বজনপ্রিয় ক্রীড়াবিদ মোহনবাগান ও আই-এফ্-এ সহ-সভাপতি সলিসিটার শ্রীদীনবন্ধু সেন (দাদাবাবু) ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা ও ক্লাবের প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাতি ও বাগবাজারের বিখ্যাত সেন পরিবারের সন্তান যৌবনে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ভারতীয় হকিদল

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ভারতীয় হকিদল জুন মাসের প্রথম দিকে বৃটেনে ৩টি হকি ম্যাচ খেলবে। ভারতীয় জিমখানা ক্লাবের অতিথি হিসাবে ভারতীয় দল লণ্ডনে যাবে।

আগামী ১লা জুন ভারতীয় হকি দলকে লণ্ডনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সম্বর্ধনা জানাবেন।

ভারত মারদেকা ফুটবলে খেলবে

ভারত এ বছরও মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে। আগামী ১৪ই থেকে ২৮শে আগষ্ট পর্যন্ত কুয়ালালামপুরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

কায়রোয় ক্লের বীরোচিত সম্বর্ধনা

কায়রো নগরীতে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলীকে বীরের সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

ইসলাম বিষয়ে সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক ভোজসভায় অতিথিরূপে আপ্যায়িত হওয়া উপলক্ষে ক্লে বলেন, প্রতিবার জয়লাভের পর তিনি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে আসবেন।

লণ্ডনে বৃটিশ হেভিওয়েট বিশ্বজয়ী হেনরী কুপারকে পরাজিত করবার পর ক্যাসিয়াস্ ক্লেকে ইসলাম পরিষদ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

ভোজসভায় ক্লেকে আরবী ও ইংরেজীতে প্রার্থনার রেকর্ড উপহার দেওয়া হয় এবং তাঁকে মুসলীম বীররূপে অভিনন্দন জানান হয়।

অধিনায়ক পদে জার্নেল সিং

ভারতের উনত্রিশ বছর বয়স্ক অলিম্পিক ফুটবলার জার্নেল সিং প্রথম এশীয় অল-ষ্টার ফুটবল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারত, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, বর্মা, তাইওয়ান ও সিংগাপুরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত অলষ্টার ফুটবল দল কুয়ালালামপুরে ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিসন লীগের ফুলহাম ও লেষ্টার ওয়েড্‌নেসডে দলের সঙ্গে আগামী মাসে তিনটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে।

অধিনায়ক নির্বাচনের সংবাদে জার্নেল সিং মন্তব্য করেন যে, এটা আমার জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এর আগে আমি আর কখনও ইংলিশ দলের বিরুদ্ধে খেলিনি। সুতরাং এই খেলা থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব।

জার্নেল এবং তার অন্যতম সহযোগী ইউসুফ খাঁ ইতিমধ্যেই কুয়ালালামপুরে এসে পৌঁছেছেন।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বিলাতে বর্ণবিদ্বেষ দিনদিন কী রকম ভয়াবহ আকার ধারণ করছে সে-সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা লিখেছি। সম্প্রতি এই বিদ্বেষ আরও বেড়েছে এবং সেখানে প্রায়শই ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করছেন। পার্লামেন্টে পর্যন্ত এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সত্যিই লণ্ডনে বর্ণবিদ্বেষের ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো অবস্থায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনটি ভারতীয় ছাত্রের যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার বাংলা অনুবাদ নীচে দিলাম। এই পত্র পড়ে পাঠকরা প্রকৃত ব্যাপার অনেকখানি আন্দাজ করতে পারবেন।

"মহাশয়,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা লণ্ডনে আফ্রো-এশীয় ছাত্রদের নিরাপত্তাহীনতা ও লাঞ্ছনার কিছু ঘটনা আপনার দৃষ্টিপথে আনতে ইচ্ছা করি। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ তারিখে আমরা যখন আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে কিংস ক্রস ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম (রাত ১১.১৫ নাগাদ) একদল শ্বেতাঙ্গ যুবক বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ আমাদের ওপর চড়াও হয়, আমাদের মারধোর করে এবং আমাদের দুজন সঙ্গিনীর (তাঁরা বিবাহিতা মহিলা এবং তাঁদের স্বামীরাও সঙ্গে ছিলেন) উদ্দেশে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। আমরা সংখ্যায় নিতান্তই কম ছিলাম, তাই তারা আমাদের কাবু করে ফেলে এবং আমাদের এক সঙ্গীর একটি দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমাদের মধ্যে দু'জন অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা সাহায্যের জন্যে চিৎকার করি। কিন্তু কেউই আমাদের সাহায্যে আসেন না। আমাদের মধ্যে একজন কোনক্রমে তাদের হাত থেকে পালিয়ে পুলিশের কাছে

সাহায্যের জন্যে ফোন করে। অনেকবার ফোন করার পর, আধ ঘণ্টার কিছু বাদে পুলিশ আসে। কিন্তু আমাদের সাহায্য করার পরিবর্তে তারা মন্তব্য করে—"তোমরা আমাদের দেখে সমস্যার সৃষ্টি করছ।" অতঃপর আমরা একটি ট্যাকসি ভাড়া করি এবং চিকিৎসার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হাসপাতালে যাই। এধরণের ঘটনা এই একটিই নয়, অনুরূপ একটি ঘটনা কয়েক মাস আগে কিংস ক্রস স্টেশনের সামনে ঘটেছিল। সেবার তিনজন ভারতীয় গবেষক ছাত্র বেদম প্রহৃত হয়েছিলেন। এই ধরণের অসংখ্য ঘটনা লণ্ডনের বিভিন্ন অংশে ঘটছে। আমরা উচ্চতর শিক্ষা ও পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে আন্তরিক আশা নিয়ে এদেশে এসেছি। আপনি বুঝতেই পারেন, যদি আমরা এই রকম অমানুষিক আচরণ সহ্য করতে থাকি তাহলে এই উচ্চতর শিক্ষার কি অর্থ আমাদের কাছে দাঁড়াবে এবং আমরা যখন দেশে ফিরে যাবো তখন কী স্মৃতি আমরা বহন করে নিয়ে যাবো। ক্রমাগত একটা নিরাপত্তাহীনতা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করছে।

পি, এল, এস রহমান
ট্রিনিটি হল, কেমব্রিজ
এইচ, সাহারায়
ইউনিভারসিটি কলেজ, লণ্ডন
পি, কে, ব্যানার্জি
স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লণ্ডন।

• • • •

এক কপি বইয়ের দাম এক লাখ টাকা!! চমকে ওঠবার মতো খবর বই কি! না, কোন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বা কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দলিল নয়—সদ্য ছাপা একটি বই! বইটির নাম "কাসানোভা"। কাসানোভার কাহিনী এককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সম্প্রতি প্যারিসের এক লৌবিন প্রকাশন-সংস্থা বইটির নতুন সংস্করণ বার করেছেন। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট হল,এর মধ্যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সালভাডর ডালির আঁকা পাঁচটি বহুবর্ণের অনবদ্য মূল ছবি থাকবে। সঙ্গে আরও পাঁচটি একরঙা থাকবে যেগুলি ছাপা হবে রেশমের ওপর। এই দশখানি ছবি ছাড়া থাকবে আরো ৩৫টি ছবি। বিশেষ ধরণের মোটা কাগজে বইটি ছাপা হয়েছে। এই সংস্করণের দাম এক লাখ টাকা। এই সংস্করণে এক কপি মাত্র বই ছাপা হয়েছে এবং বই যেকবার আগেই এক ধনিকার আগাম বায়না দিয়ে গেছেন।

অন্য একটি সংস্করণে হবে দুটি বই—যাতে ডালির আঁকা দুটি করে মূল ছবি থাকবে এবং তার সঙ্গে থাকবে রেশমের ওপর ছাপা ছবি। এই দু'খানির দাম একটু সস্তা—এক-একখানি পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঐ রকম আরও পাঁচখানি বই হচ্ছে যাতে ডালির আঁকা মূল ছবি একটি করে এবং রেশমের ওপর ছাপা কয়েকটি করে ছবি থাকবে। এদের দাম প্রতি কপি সাতাশ হাজার টাকা করে ধরা হয়েছে। এই সঙ্গে সাধারণ (!) ক্রেতার জন্যে সতেরোখানি বই হয়েছে। যাদের দাম প্রতি কপি সাড়ে সাত হাজার টাকা। এ ছাড়াও আরও তিন শ পঁয়ষট্টিখানা কপি ছাপা হয়েছে। এর এক-একখানার দাম মাত্র তিনহাজার টাকা!

সর্বশেষ খবর, নব সংস্করণের সব কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

• • • • •

আমাদের একটি নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসাটি তিনচার পুরুষ ধরে পড়ে তুলেছিলাম। সে ব্যবসায়ে কোন বিদেশী অর্থ সাহায্য নিইনি, কালোবাজারের চোরাগলে ঘুরিনি, তেজাল দেখাইনি। সম্মানের সঙ্গে সে ব্যবসায়ে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কিছু কিছু রোজগার করেছি, রাতারাতি ধনকুবের হবার ব্যবসা সে নয়, তাই চোরাকারবারেরলোভীরা সে ব্যবসায়ে ঘিরে ঘেঁসেনি। সম্মানের সঙ্গে সারা ভারতে সে ব্যবসাটি চলেছে। সেটি হচ্ছে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসা। এই সৎ স্বাধীন আত্ম-নির্ভরশীল ব্যবসাটি এবার যেতে বসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতিচ্ছন্নতায় আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল, এমন সুব্যবস্থা তাঁরা করেছেন যার ফলে এই ব্যবসাটি নির্ঘাৎ মারা পড়বে। ডলারের মোহিনী মায়ার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করেছি। আমাদের পরিত্রাণ নেই। বাংলা দেশের ব্যবসাটাই আগে মরবে। এই সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা কিছুদিন আগে শিক্ষাকমিশনের কাছে এক স্মারক লিপি পেশ করেছিলেন। সেই স্মারক লিপি থেকে কিয়দংশ হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। পাঠক তাই থেকে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবেন :—

আধিক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদেশী পাঠ্য-পুস্তক

মহোদয়গণ, সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত অপর একটি হানিকারক নীতির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতিকালে সস্তায় পাঠ্য-পুস্তক আমদানি, প্রকাশন ও বিক্রয়ের জন্য বিদেশী প্রকাশকদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। তাহার উপযোগী ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিয়া দিয়াছেন। এই কাজে এই সকল বিদেশী প্রকাশকগণ আবার তাঁহাদের স্বস্ব সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতেছেন। আমরা যতদূর জানি পৃথিবীর কোথাও দেশীয় ব্যবসায়ী-দিগকে উৎসাদিত করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীদিগকে শ্রীবৃদ্ধি হইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। স্বভাবতঃই এই সরকারী নীতির ফলে ভারতবর্ষের প্রকাশন শিল্প বর্তমানে সুদূরপ্রসারী পরিণতিসম্পন্ন এক বিপদের সম্মুখীন। একদিকে সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াকরণ এবং অপর দিকে উচ্চ পর্যায়ের পাঠ্য-পুস্তক বিদেশীদিগের হস্তে প্রদান করিলে ভারতীয় প্রকাশকগণের অস্তিত্বরক্ষায় রাখিবার মত কি থাকিবে?

বর্তমান ঘটনা ইহাও প্রমাণ করে যে, যখন বিদেশী সরকারগুলি অন্য দেশের বাজার দখল করিবার জন্য তাহাদের পুস্তক-ব্যবসায়কে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করিতেছে তখন আমাদের জাতীয় সরকার এই বিষম ও ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় পুস্তক-ব্যবসায়কে সংরক্ষিত করিতে মোটেই তৎপর নহে। বরং তাঁহারা ভারতীয় পুস্তকব্যবসায়ের অস্থিসাধন করিয়া ভারতের মাটিতে ছুলিয়া কাঁপিয়া উঠিবার জন্য বিদেশী প্রকাশকদিগকে আমন্ত্রণ জানাইতেছেন। তাহার ফলে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদেশী পুস্তকে দেশের গ্রন্থবাজার ভরে ছাইয়া যাইতেছে।

বিশ্বের ব্যবসায়ী চিন্তাবিদগণ ও পণ্ডিতবর্গ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শিল্প ও সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং শিল্পোন্নয়নে একটি দেশের অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় তাহার পুস্তক ব্যবসায় হইতে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, মিসর, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া বা অন্য কোন দেশের কোন জাতীয় সরকারই দেশীয় বাজার বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের হস্তে ছাড়িয়া দেয় নাই কিংবা দেশীয় পরিবেশকদিগকে ধ্বংস করিয়া দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও পাঠক জনসাধারণের নিকট আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদেশী গ্রন্থ পরিবেশনে অনুমতি প্রদান করে নাই। অথচ

এই দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে ও শিক্ষণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। এই বুদ্ধিহীন সরকারী নীতি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের পুস্তক-ব্যবসায়ের ক্ষতি আনয়ন করিয়া ব্যাপক বেকারিই সৃষ্টি করিবে না, ইহার ফলে ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যেরও মৃত্যুর পরম্পরা শুরু হইবে; পণ্ডিত ও গবেষণা-কর্মীরা তাঁহাদের চেনাবলী প্রকাশের সুযোগ পাইবেন না। ফলে ভারতীয় প্রতিভা পুষ্ট হইবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি পরামর্শ উপস্থিত করিতে চাই। বিদেশী প্রকাশকদের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকাশন দ্বারা ভারতীয় বাজার ছাইয়া ফেলিতে না দিয়া প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার পুস্তক প্রকাশনে সরকার ভারতীয় পুস্তক-ব্যবসায়কে উৎসাহিত করুন এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তাহাদের দিন।"

পাগল, না মাথা খারাপ! তোমাদের মতামত আমরা গ্রাহ্য করব, তোমাদের পরামর্শ শুনবো!! তোমাদের সুযোগ সুবিধা দেব!!! ভারতীয় বুরক্রেসিকে চেনোনি বন্ধু! ব্রিটিশ বুরক্রেসির বাবা!!

• • • •

আবার ক্রিকেট খেলা। ওরেই ইতিমধ্যে ভারত সফর নিয়ে আবার রাজা মহারাজা আর চোরাকারবারে ফেঁপে-ওঠা হঠাৎ নবাবদের মধ্যে তারাকাটি পড়ে গেছে। কেন? না, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নিবারণ করে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর উক্ত সফরের জন্যে চার লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে সম্মত হননি।

ঐ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেও লিখেছি। ভারতের অভ্যন্তরে যে বৈদেশিক মুদ্রা হাতে গ্রেফ কয়েকজন বিদেশী ভাবাপন্ন ভারতীয় অর্থকুম্ভীরদের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে এ ধরণের আমোদপ্রমোদ বন্ধ রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বলা হয়েছে, ওরেই ইতিমধ্যে এ সফর বাতিল হলে নাকি জগতের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হবে।

জগতের কাছে মাথা আমাদের কতই না উঁচু! ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত ধিক্কার আর কত টিটকারি শুনছি! জগতের কাছে আমাদের বড়াই করবার যে কি আছে তাও জানি না।

আছে। জগতের লোক ভারতবর্ষের আদি ঐতিহ্যকে আজও শ্রদ্ধা করে, ভারতের যেসব মৃত্যুঞ্জয়ী মানব-আত্মা পাশ্চাত্যদেশে ভারতের বাণী শুনিয়ে এসেছেন তাঁদের তারা শ্রদ্ধা করে—সে হল অন্য কথা। সে সব ক্ষেত্রে ভারত সারা জগৎকে নতুন তত্ত্ব শুনিয়ে, নতুন আদর্শ দেখিয়ে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

এখন ঐতিহ্য মেরেছে ক্রিকেট খেলায়। যা জগন্নাথ! তাও যা জোড় কত! মোবেড়ন মরে যাই প্রতিযোগিতায় যাদের কাছে, যাদের দাপটে আমাদের খেলোয়াড়রা মাঠ থেকে পালাই পালাই ডাক ছাড়ে, তারা ভারত সফরে না এলে নাকি ভারতের মান ইজ্জত যাবে।

রাজা মহারাজা আর কালোবাজারিদের আর কি! দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, খাবার জিনিষের দাম চারগুণ পাঁচগুণ বেড়ে গেছে, ফলে গৃহস্থ সাধারণের দুবেলা অন্নসংস্থান করতে জিভ বেরিয়ে পড়ছে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দিনদিন ভেঙে পড়ছে, প্রতিরাজ্যের ঘরে ঘরে পুঞ্জীভূত বেদনা আজ হতাশায় ক্রমেই বারুদের মত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে মনের অমিল, সহযোগিতার অভাব, অহি-নকুল সম্পর্ক দিনদিন বেড়েই চলেছে, রাজ্যে রাজ্যে শাসন ব্যবস্থায়

দুরদৃষ্টি সহযোগিতা এবং নিঃস্বার্থ কল্যাণসাধন ব্রতের অভাবের ফলে রাজনীতি মূল্যবোধের ধারণা মানুষের মন থেকে চলে যাচ্ছে, বেপরোয়া দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খলতা যুবজীবনকে বিপর্যস্ত করছে, তার উপর আছে বহিঃশত্রুর অবশ্যম্ভাবী পুনরাক্রমণের আশঙ্কা। ঘরের মধ্যেই শত্রুদের অনুচরবৃন্দ সক্রিয় হয়েছে, প্রতিদিন ট্রেন উল্টছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গুনব পোল ভেঙে পড়ছে, বড়বড় কারখানা বন্ধ হচ্ছে, আরও কতকি ! কিন্তু ঘরে বাইরের এসব সঙ্কটের জন্যে ঐসব কালোবাজারিক আর মহারাজাদের কতটুকুই বা মাথাব্যথা। তাঁদের ভাল মুরগীর রোগনজুস, ফরাসী মদ এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জা ব্যবস্থাই চিরকাল বহাল থাকবে। তেমন তেমন বুঝলে তাঁরা বিদেশে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পরম আরামে বাকী জীবন অতিবাহিত করবেন সে ব্যবস্থাও তাঁরা ইতিমধ্যেই করে রেখেছেন, বিদেশী ব্যাঙ্কে, প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তি বিশেষের কাছে তাঁরা টাকা গচ্ছিত রেখেছেন, বিদেশের নানাস্থানে জমি বাড়ী কিনে রেখেছেন, চাটারকরা প্লেন মজুত আছে, প্রয়োজন হলেই ফুরুৎ করে উড়বেন। তাঁরা চান, যতদিন পারা যায় মজুত নাচগান টেলিভিসন—এককথায় অব্যাহত বাদশাহী আমলের প্রমোদ-জীবন। তার মধ্যে আধুনিককালে এই ধরণের ক্রিকেট-সফর একটি প্রধান মজুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়বড় নামকরা বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড়রা এদেশে আসবে, ঐসব মহাজনদের কুবের-কন্যারা তাদের গলায় মালা দেবে, তাদের কাঁধ ধরে ঝুলে পড়বে, তাদের সঙ্গে বলনাচ করবে, সারারাত আমোদ আহ্লাদে ডুবে থাকবে—এরকম লোভনীয় আকর্ষণ অর্থমন্ত্রকের একজোড়া কাটা পড়বে। একি কম আকর্ষণের কথা। অর্থমন্ত্রী শ্রীষচীন চৌধুরীর কাছে ধাবড়ি খেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তা বরোদার মহারাজা ত গুমরায় ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলেছেন। তিনি চৌধুরী মশাইকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝালেন। কিন্তু চৌধুরী মশাই উত্তরে যে মোক্ষম কথাটি বললেন তার আর জবাব নেই। মহারাজ বললেন, হুজুর, নেমন্তন্ন করে ফেলেছি এখন সফর বাতিল করলে, সেযে বড় লজ্জার কথা হবে।

জবাবে অর্থমন্ত্রী বললেন—সঙ্কটকালে কোনো প্রতিষেধক ব্যবস্থাতে লজ্জার ঠাঁই নেই।

একটু থেমে তাঁর শেষ মোক্ষম টক্কিটি করলেন—মহারাজ, আপনার ঘরে যখন চাল বাড়ন্ত তখন লোক নেমন্তন্ন করেন কেন ?

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন আর বাইরে কোঁচার পত্তন।

"If you have no food in your house, why invite guests ?"

• • • •

এই শতকের শতেক হুজুগের মধ্যে সব-সেরা হুজুগ হল কবিতার হিড়িক। হঠাৎ অগণিত কবি যেন যেন ভীষণভাবে জেগে উঠেছেন এবং তাঁদের কবিতা নিয়ে যেন দেশের লোককে যেন তুলো ধুনছেন। কবিতা-পত্রিকার পত্রিকার ছয়লাপ। অকস্মাৎ দেখা যাচ্ছে বহু কবিতাপত্র বেরিয়েছে। কবিতা মাসিক, কবিতা পাক্ষিক, কবিতা-সাপ্তাহিক, কবিতা-অর্ধসাপ্তাহিক ; কবিতা-দৈনিক, কবিতা-ঘটিকী (ঘণ্টায় ঘণ্টায় যার প্রকাশ), কবিতা-মিনিটিকি. (মিনিটে মিনিটে যার প্রকাশ)। তাজ্জব ব্যাপার।

এই নিয়ে আমার গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ মনে উঠেছে কবিতা দৈনিক পৃথিবীতে এই প্রথম বেরোলো, এই শহর কলকাতায়, এই বাঙ্গল মাধবাদের দিনে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগর মনে করেছে, সেখান থেকে যেটি বেরিয়েছে সেটাই পৃথিবীতে প্রথম। তার পরেই গবেষকরা ইতিহাসের

জাঁড়ার উপুড় ক'রে বিশদভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, কবে কোথায় কোন দেশে প্রথম কবিতাপত্র বেরিয়েছিল। কদিন ধরে হৈচৈ কাণ্ড চলেছে কলকাতায়। কে এদেশে সব প্রথম কবিতাপত্র বের করেন। একজন জানিয়েছেন, ১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনের মেলায় একটি কবিতা-কারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে কয়েকজন কবি-শ্রমিক বন্দেমাতরম ঘড়ি চোখের নিমেষে কবিতা রচনা করে দিচ্ছিলেন উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

একজন জানিয়েছেন, ১৪১২০ বছর আগে বাপের পকেট মেরে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা যে কবিতাপত্র কয়েকদিনের জন্যে বার করেছিলেন, সেটাই পৃথিবীর প্রথম কবিতাপত্র।

আর একজনের দাবী সবচেয়ে জোরালো। তিনি জানাচ্ছেন, ৩০ বছর আগে তাঁর বাপের বিয়েতে ৭ দিন ধরে কবিতার যে ছাপ্পান্নটি বেরিয়েছিল, সপ্তাহব্যাপী সেই দৈনিকটিকে কেন পৃথিবীর প্রথম কবিতা দৈনিক হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে না?

শুধু পত্রিকা বের করেই কবিরা ক্ষান্ত নেই। তাঁরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা পথেপথে অভিযান আরম্ভ করে পথচারীদের বাধ্য করছেন তাঁদের কবিতা শোনবার জন্যে। আপনি সকালবেলা তাড়াতাড়ি বাজার করতে চলেছেন, রাস্তার মোড়টিতে পৌঁছেছেন, বাস আর এগোবার জো নেই, কবিগোষ্ঠীর সদস্যরা ওৎ পেতে অপেক্ষা করছেন, বললেন আপনাকে খপ্ করে, "কবিতা শুনে যান"। সঙ্গে সঙ্গে কবিতা পড়া শুরু হয়ে গেল। পড়া শেষ না হলে যাবার জো নেই। বাজারের দেরী, অফিসের দেরী। কিন্তু উপায় নেই। কবিতা শুনতেই হবে।

এই পথকবিদের শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্যে এবং সেই সঙ্গে পথগায়কদল তৈরী করবার জন্যে শুনছি বিলাত থেকে কতিপয় বিটল কলকাতায় আসছে তালিম দিতে। বাস। সোনায় সোহাগা। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, প্রাণ নেই, নেই মুক্তবায়ু, নেই আনন্দ উত্তপ্ত পরমায়ু, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া চারিদিকে, চারিদিকে হাহাকার, শত্রুর হুংহুঙ্কার আর কালোবাজারীদের বীভৎস ব্যাপার—এই ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কটের দিনে কবির দল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন, বেপরোয়া বিট-গায়কের দল রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন—এমন কল্পনা করেও রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

* * *

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত সফর সম্পর্কে পরবর্তী সংবাদে জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী এই সফর ছোট আকারে মঞ্জুর করেছেন।

* * *

সরকার যে কাজে হাত দেন সেই কাজেই ধ' পড়ে।

কলকাতার ফুটবল মাঠের কথাই ধরুন। এত দীর্ঘকাল ধরে ঠিকাদারের হাতে ছিল গ্যালারির ভার। কিন্তু কখনও এমন দুর্ঘটনা ঘটেনি যেমন ঘটে গেল কয়েকদিন আগে এক শনিবার বিকেলে ক্যালকাটা মোহনবাগান মাঠে। মোহনবাগানের খেলা। লোক হয়েছে প্রচুর। খেলা শুরু হবে এমন সময় সদ্য গ্যালারির একটা অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। বেশ ক'শো লোক আহত হল। কয়েকজন হয়ত মারা যাবে। সরকারী অব্যবস্থার ফলে নিরীহ জনসাধারণ মারা পড়ল। একের গাফিলতিতে অন্যের সর্বনাশ। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার নেই।

বাসা আছি আমরা।

ভারতের বিস্কুট-শিল্প আজ বিপন্ন

আমাদের পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ের বিপদের কথা এই সংখ্যাতেই আলোচনা করেছি। এখন আবার আর একটি সর্বনাশা পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তাহলে আমাদের দেশের একটি অন্যতম প্রধান শিল্প কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সুনিশ্চিত। সে শিল্পটি হল আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান বিস্কুট উৎপাদন শিল্প। সম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, এই শিল্পেও মার্কিন বেসরকারী পুঁজি ভারতে আসতে দেওয়া হচ্ছে। আজ বেসরকারী পুঁজি আসছে। কাল আসবে সরকারী পুঁজি। ব্যস! কোটী কোটী টাকা ঢালবে তারা। তাদের উৎপন্ন বিস্কুটে বাজার ছেয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে যাবে আমাদের দেশে তৈরী বিস্কুটগুলি। শোনা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সর্ববৃহৎ বিস্কুট কোম্পানীকে ভারতের একটি ময়দা কলের সঙ্গে বিস্কুট বানাবার সহযোগিতা করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে এদেশের বিস্কুট কারখানাগুলি কেবল যে দেশের চাহিদাই বেশ ভাল ভাবে পূরণ করছে তাই নয়, বেশকিছু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিস্কুট রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে। তার পরিমাণও নেহাৎ সামান্য নয়—বছরে ২৫ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া এদেশের তৈরী বিস্কুটের মান বিদেশী বিস্কুটের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে। এদেশের বিস্কুট-শিল্প শুধু যে দেশে অর্থ নৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করেছে তা নয়—একটি গৌরব করার মত শিল্প।

দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বুদ্ধির গোড়ায় ঘুণ ধরেছে, তা না হলে এমন একটি কথা তাঁরা ভাবলেন কি করে।

এই ব্যাপারে এদেশের বিস্কুট উৎপাদনকারীদের ও জনসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় সরকার অবিলম্বে এই মহা অকল্যাণকর ব্যবস্থা নাকচ করে দিন।

* * *

দিনের পর দিন রোগা ছেলেটি যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। চিকিৎসকেরা বললেন, এ রোগ সারাতে হলে চাই যথেষ্ট অর্থব্যয়। কিন্তু তার দরিদ্র পিতামাতার সে শক্তি নেই।

শেষে একজন বন্ধু বললেন,—"যাক্, আমার একটি ছেলের দরকার, যে প্রতিদিন একতলা থেকে তিনতলা আমাকে বই এনে দেবে আর একতলায় ফেরৎ দিয়ে আসবে। অবশ্য এর জন্যে সপ্তাহে তেরো শিলিং বেতন সে পাবে।

গরীব ঘরের রোগা ছেলেটি কাজে লেগে গেল। কি আশ্চর্য! এক মাসের মধ্যে তার শরীরের পরিবর্তন দেখা দিল।

উৎসাহ এল ছেলেটির মনে। তা' হলে ব্যায়াম করলে ত আমার স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে লেগে গেল সে।

তার পরের খবর সকলেই জানেন। ইউজিন স্যাণ্ডোর নাম বিশ্বের কাছে সুপরিচিত হয়ে আছে।

ভূমিকা

সমস্যা জর্জরিত পরিবার

প্রাক-নির্বাচনী পুরস্কার বিতরণ

অশ্রীমুখ

ছায়া-চিত্র জগতের জোর খবর !!

চার্লির ছবিতে সোফিয়া লোরেন

(লণ্ডনের বিশেষ প্রতিনিধি)

চার্লি চ্যাপলিন ৭৬ বছর বয়সে নতুন ছবি করছেন—এতো একটা মস্ত সংবাদ। দেশ বিদেশের চিত্রজগৎ এ খবরে তোলপাড়। শ'য়ে শ'য়ে সাংবাদিক ধাওয়া ক'রে আসছে তাঁর ষ্টুডিও অভিমুখে।

চমকাবার মতোই খবর বটে। তাঁর সেই ছবিতে নায়িকা কে? নায়িকা হচ্ছেন সোফিয়া লোরেন। বর্তমানে সারা চিত্রজগৎ যাঁর পদতলে, যাঁর তুলা জনপ্রিয়তা একমাত্র গ্রেটা গার্বো ছাড়া আর কেউ পায়নি, কিছুদিন আগে যিনি বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলে অভিহিত হয়েছেন, যাঁর একাধিক ফটোগ্রাফ (নানডঙ্গীর পিকাশো ত্রেনোয়া, মাতিস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবির পাশে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ণ আর্টের শিল্প প্রদর্শনীতে শোভা পাচ্ছে। সোফিয়া লোরেন। নামের মধ্যে যেন যাদু আছে। তার পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি টাঙিয়ে যে চিত্রগৃহ তার ছবি দেখাবার সুযোগ পায় তার দিন ফিরে যায়, বক্স অফিসে রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

সোফিয়া লোরেন

শুধু তাই নয়। এ ছবিতে সোফিয়ার সঙ্গে আছে এক বিশ্বজয়ী অভিনেতা, মার্লন ব্র্যাণ্ডো। সোফিয়া —মার্লন জুটি আজকের দিনে সবচেয়ে বড় অফিস রেকর্ড শঙ্কিকারী জুটি।

যে ছবি চার্লি তুলছেন তার নাম "এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং"। দুর্ধান্ত কমেডি। প্রচণ্ড হাসির ছবি। এটি চার্লির ৮১তম ছবি। প্রথম রঙীন ছবি। এবং এই প্রথম তাঁর ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বপ্রতিষ্ঠ দুই তারকাকে নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া এই প্রথম তিনি অনেক বছর বাদে নিজের কোম্পানীর তরফে ছবি না করে, অন্য কোম্পানীর তরফে কাজ করছেন। ইউনিভার্সাল পিকচার্স এই ছবির প্রযোজক। খরচ হবে আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ টাকা।

লণ্ডনের শহরতলীতে এক প্রকাণ্ড ষ্টুডিওয় এই ছবি তোলা হচ্ছে। ছবির কাহিনী অনেক দিন আগেই লেখা—১৯৪০ সালে। এতদিন মনের মতো শিল্পী পাননি চার্লি। "সত্যকাল, আজ এবং আগামীকাল" ছবিতে সোফিয়াকে দেখলেন। ভাল লাগল। লণ্ডনে গিয়ে তার আর একটি ছবি দেখলেন। ব্যস! মনস্থির করে ফেললেন। সোফিয়ার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করলেন। সোফিয়া তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজী—ইয়েস প্লীজ!

মার্লন তখন হলিউডে। লণ্ডন থেকে তাকে ফোন করলেন চার্লি। কী ছবি, কী রকম গল্প, কী ধরণের ভূমিকা, দু'জনের কেউ জানান না। তাতে কি! চার্লির ছবি। চার্লি চ্যাপলিনের পরিচালনাধীনে অভিনয় করা তো মহাভাগ্যের কথা। সোফিয়ার মত মার্লনও সম্মতি জানাল সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনের তাজ হোটেলে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন চার্লি। হুড়মুড় করে ১১৫ জন বিভিন্ন দেশের চিত্রসাংবাদিক আর ৬৮ জন ফটোগ্রাফার সেই সম্মেলনে ভেঙে পড়ল। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন:

বয়স তো হল ৭৮। এই বয়সে আবার চিত্রজগতে ফিরে আসা কেন?

উত্তরে বললেন চার্লি, আমি শিল্পের দাস। তার আহ্বান উপেক্ষা করবার সাধ্য নেই আমার। যখন শুনি, তুমি বুড়ো মনে যাচ্ছ, যাও কাজ কর, তখনই কাজে লেগে যাই। যেমন, এখন লেগেছি।

আমেরিকার সঙ্গে বিবাদ কি মিটে গেছে? তারা তো তাদের ধারাবাহিক তুলে নিয়েছে।

বিবাদ আমার কারুর সঙ্গে নেই। বললেন চার্লি।

আরও কত প্রশ্ন। কত উত্তর। কিন্তু চার্লিকে কাবু করতে পারে এমন সাংবাদিক এখনো জন্মায়নি।

• • •

ছবির রিহার্সাল এবং সেই সঙ্গে শুটিং চলেছে। কী কড়া পরিচালক আর কি তাঁর আঁট্‌ঘাট বাঁধবার শক্তি! এই মার্লনকে পাট বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এই সোফিয়াকে নিয়ে এধার থেকে ওধারে ছুটে যাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন তাকে, তোমায় মার্লন তাড়া করেছে আর তুমি আদুথালু বেশে ছুটছো? ছোট, এই রকম করে হোঁচট খেতে খেতে ছোট। বলে নিজেই বারবার হোঁচট খেয়ে দেখাচ্ছেন।

মার্লন বলেছে, যাদু, অনেক পরিচালকের অধীনেই অভিনয় করলাম কিন্তু এমন পরিচালক আর দেখলাম না। ওঁর কাছে আমরা সব যেন শিশু। যেন অ আ ক খ শিখছি—এমনি করেই আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পার্শিপক্ষার মত ভূমিকার সংলাপগুলো আমাদের দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন, চলাফেরা ওঠা-বসা খুঁটের তথী সব কিছু নিজে করে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

সোফিয়া মার্লনের কথার সায় দিয়ে বলেছে, আশ্চর্য মানুষ! একা সব ভূমিকাগুলোর অভিনয় করছেন, অর্থাৎ অভিনয় করে দেখিয়ে আমাদের শেখাচ্ছেন।

এই ছবিতে যাদের অংশ আছে তাদের প্রত্যেকদিন ১৪ ঘণ্টা কাজ। সোফিয়া থাকে প্রোডিউসার জোয়ার ক্ল্যাটে। পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সোজা চলে যায় ষ্টুডিওয়। ফেরে সন্ধ্যা সাতটায়। খেয়ে দেয়ে বিছানায় এবং ঘুম। আর কোন কাজ নয়।

মার্লনেরও সেই অবস্থা। তবে তারই মধ্যে সে কিছুক্ষণ বন্ধুজন করে অবশ্য নিজের ঘরে বসে। এবং নির্জনা।

সকাল ৯টা থেকে ষ্টুডিওর কাজ শুরু হয়। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, চার্লি একটি ছোট ভূমিকায় নেমে অভিনয় করতে শুরু করে দিয়েছেন। সকলে তো অবাক। স্ক্রিপ্ট-এ তো ছিল না। যা থাক! চার্লি—প্রতিভার ঐতাবেই তো প্রকাশ। এ ছবিতে তিনি জাহাজের এক পরিচারক। তার পদুত্রশীড়া হয়েছে—টলছে সে। মুখে অপ্রস্তুতের হাসি, সেই বিশ্ববিখ্যাত চিরসুসাক্ষিয়ের হাসি। সহকারী পরিচালক হাঁক দিল—অ্যাকশন! ছবি উঠতে লাগল। চার্লির ছোট্ট একটি মিনিট পাঁচ পেরুবার, ঐ একমুহূর্তের অভিনয়ের অন্তিম মুহূর্তে সকলকে অবাক ক'রে দিলে! উনা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। "কাট্" কথাটা শোনা যাবার পরেই এগিয়ে এসে স্বামীকে আদর করলেন। অস্ফুটে বললেন—ওআনডারফুল।

• • •

ছবিটির গল্প হল এই: এক ভূমিহীন বিত্তহীন অভিযাত্রী জাহাজে করে ইংলণ্ড থেকে আসছে। কাউন্টেসটির বাইরের চাকচিক্য আছে বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে দেউলিয়া। সেই জাহাজে রয়েছে এক ক্রোড়পতি মার্কিন কূটনীতিজ্ঞ। কাউন্টেসকে আমেরিকায় যেতেই হবে যে কোন রকমে হোক। তাই সে সেই ক্রোড়পতির কেবিনে গিয়ে উঠল। ক্রোড়পতি পড়ল বিপদে। সে কাউন্টেসকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। মধ্যে রয়েছে হাজার রকম কাণ্ডকারখানা। ছবিতে সোফিয়া, মার্লন ব্রাণ্ডো আর একজন তারকা হচ্ছে চার্লির মেজছেলে সিডনি। ছবিটি তোলা হচ্ছে লণ্ডনের পরবর্তীকালে পাইনউড ষ্টুডিওয়।

• • •

"ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ রবার্ট সুম্যান ছিলেন চিরকুমার। কেন তিনি বিবাহ করছেন না সে বিষয়ে তিনি বহু কারণ দেখাতেন।

একবার একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলে, আপনি কি কখনও আদর্শ নারীর জন্য অনুসন্ধান করেননি—নাকি কখনও তেমন নারী খুঁজেই পাননি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অনুসন্ধান করেছিলেম ও পেয়েও ছিলেম, রবার্ট সুম্যান উত্তর করলেন। কিন্তু সেই মহিলা আমায় জানালেন তিনিও একজন আদর্শ পুরুষের সন্ধান করছেন।

শ্রীরবীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও বসুমতী প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

Head Office : Mahatma Gandhi Road,
BOMBAY-1.

FIGURES THAT TELL

Authorised Capital	...	Rs. 10,00,00,000/-
Paid-up Capital	....	Rs. 4,71,61,335/-
Reserve Funds	....	Rs. 6,34,55,589/-
Deposits as at 30. 6. 1965	....	Rs. 2,98,36,59,799/-

Sir Homi Mody, K. B. E.,
Chairman

F. C. Cooper.
General Manager

B. C. Sarbadhikari
Chief Agent, CALCUTTA.

5000
INDIAN DESIGNS AND MOTIFS

IN THIS single volume 5000 Designs and Motifs have been collected representing decorative art of India since Mohenjo-Daro—an indispensable vade-mecum for industrial and art designers, Indian and foreign.

200 Plates : 28½ × 22½ cm : Deluxe Binding Rs. 40

PUBLISHED BY
THE INDIAN INSTITUTE OF ART IN INDUSTRY
CALCUTTA-16.

SOLE DISTRIBUTORS
SAHITYA SAMSAD
32A. ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD.
CALCUTTA-9.

সমঝদার লোকে জানেন
যে নতুন সাজে সিজার্সের স্বাদও নতুন

ইদানীং আপনি যদি
সিজার্স না খেয়ে থাকেন, একবার
ধরালেই বুঝবেন সিজার্সের তৃপ্তি এখন
অপূর্ব—টেনে সত্যিই আরাম।

সিজার্স নতুন সাজে, নতুন স্বাদে

টাকার মূল্য হ্রাস — ও তার প্রতিক্রিয়া

টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে টাকার বিনিময় মূল্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আজ রাত্রি ১১ ঘটিকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উহা ঘোষিত হয়।

টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এক মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৪.৭৬ টাকা। এখন থেকে এক ডলার ৭.৫০ টাকার সমান হবে। এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর বিনিময় হার ছিল ১৩.৩৩ টাকা। এখন থেকে ঐ হার হবে ২১ টাকা। রাশিয়ান এক রুবলের দাম হবে ৪.২১ টাকার জায়গায় ৮.৩০ টাকা।

আজ রাত্রে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হয়, সব দিক দিয়ে বিবেচনার পর ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের এ অবস্থায় দেশের অর্থনীতির স্বার্থে ঐ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

প্রেসনোটে আরও বলা হয়, টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছু বাড়বে। তবে আশা করা যায় যে, টাকার মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে জিনিসপত্রের দাম সে অনুপাতে বাড়বে না, কারণ সরবরাহের স্বল্পতার জন্য আমদানি করা পণ্যাদি ইতিমধ্যেই খুব চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

মুদ্রামূল্য হ্রাসে বৈদেশিক চাপ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী সোমবার নয়াদিল্লীতে এই মর্মে সাফাই গাহিয়াছিলেন যে, দেশের স্বার্থেই টাকার মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে ইহার পিছনে বিদেশের কোন হাত ছিল না। গতকল্যের অর্থাৎ সোমবারের মার্কিনী তথা বিলাতী পত্রিকাগুলিতে একবার চোখ বুলাইলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে কোথাকার জল কোথায় গাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন মুলুকে প্রতিটি সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রথম পাতায় ভালভাবে স্থান পাইয়াছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আই, এম, এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের চাপের ফলশ্রুতি। সংবাদপত্রটিতে বলা হইয়াছে যে, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীপিয়ের পল সুইৎজারের প্রয়াস নাকি উল্লেখের দাবী রাখে।

গ্রেট বৃটেনের সংবাদপত্রগুলিতেও ঐ কথাগুলি বলা হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ ইকনমিষ্ট পত্রিকাও গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে খোলাখুলিভাবে বলে যে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে টাকার বাট্টা হার হ্রাসের পরামর্শ দিয়াছে এবং এই ব্যাপারে শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

লণ্ডনের উক্ত পত্রিকাটির এই মন্তব্য সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য কি, তাহাও জনসাধারণ জানিতে চায়।

বসুমতী

ফল ভাল হবে না—কলকাতার প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার

টাকার মূল্যহ্রাসের খবর কলকাতায় এসে পৌঁছায় প্রায় মাঝরাতে। তবু ব্যবসায়ী মহলে শুরুন শোনা যায়, এর ফল খুব ভাল হবে না। অর্থনীতির একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মতে, বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে পড়ে রপ্তানী বাড়ানোর জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হল। কিন্তু এতে রপ্তানী বাড়বে বলে মনে হয় না। বরং পরিকল্পনার ব্যয় বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ী মহলের মতে দেশের বাজারে যদি মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ না করা হয়, তবে এই নীতি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

টাকার মূল্য হ্রাস-ব্যর্থতার স্বীকৃতি

অশোক সেন

নয়াদিল্লী, ৭ই জুন :—প্রাক্তন আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেন আজ এখানে বলেন যে, টাকার মূল্য হ্রাস চূড়ান্ত শোচনীয় ব্যবস্থা। আমরা যে পণ্যমূল্য হ্রাস করিতে পারি নাই এবং আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেও ব্যর্থ হইয়াছি ঐ ব্যবস্থায় তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

শ্রীসেন এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, দেশাভ্যন্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে রপ্তানী বৃদ্ধির সকল আশা ধূলিসাৎ হইবে। পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি শুরু হইয়া গিয়াছে। সব জিনিসের দাম—বস্ত্রপাতির তো বটেই,—বাড়িতে বাধ্য।

তিনি বলেন, আশা করি, টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে চক্রগতিতে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে না। সেরূপ ঘটিলে টাকার মূল্য আরও একদফা হ্রাস করিতে হইবে। বসুমতী

স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে মূল্য হ্রাস দরকার ছিল—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বোম্বাই ৬ই জুন (পি, টি, আই)—টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' তাঁদের বক্তব্য জানাবার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ব্যাঙ্কের জনৈক মুখপাত্র জানান, বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভরতা নির্বিশেষে ভারতীয় অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন, বর্তমানে রপ্তানী বাবদ যে আয় হয় তা আমদানি পণ্যের ব্যয় নির্বাহ এবং ঋণ পরিশোধের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া, দেশজাত পণ্যমূল্য এবং আমদানিকৃত পণ্যমূল্যের মধ্যে একটা সমতা সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল। এর ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় রপ্তানীকারকগণ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবেন। মুদ্রামূল্য হ্রাস এই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি পদক্ষেপ।

গোপন আয় হ্রাস পাবে

এ ছাড়া এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অদৃশ্য আয়ের ফাঁকির পথ বন্ধ করাও সম্ভব হবে। বস্তুতঃ অদৃশ্য আয় বলতে, সোনার ও অন্যান্য জিনিষের চোরাই চালানের কথাই ইঙ্গিতে বলা হয়েছিল। মুখপাত্রের মতে, অতঃপর এই ধরণের চোরাই চালানের ব্যবসা আর লাভজনক হবে না।

কিছুটা ত্যাগ করতে হবে

উক্ত মুখপাত্র অবশ্য বলেন, মূল্য হ্রাসের ফলে সাধারণ মানুষকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কারণ এর ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তবে সরকার চেষ্টা করছেন যাতে মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে। যেমন, সরকার জানিয়েছেন, খাদ্যশস্য আমদানি করা হলেও তার মূল্য বৃদ্ধি করা হবে না, যদিও আমদানি মূল্য বেশি পড়ছে।

পাট ও চা উৎপাদনকারীদের চিরাচরিত রপ্তানী ব্যবস্থা মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ব্যাহত হবে, ব্যাঙ্কের মুখপাত্র তা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তবে তিনি এ বিষয়ে একমত, স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই মুহূর্তে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার অসুবিধা রয়েছে। তবে কিছুদিন গেলে রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের অভ্যন্তরে পণ্যমূল্য বেশি হওয়ায় ব্যবসায়িগণ পাট রপ্তানীতে খুব বেশি উৎসাহ বোধ করেন না। কারণ তাঁরা দেশের ভেতর থেকেই ভাল মুনাফা কামান। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। প্রথমত: উৎপাদক ও রপ্তানীকারকগণ পণ্য রপ্তানী করে বেশি টাকা পাবেন। দ্বিতীয়ত: যদিও ১২টি পণ্যের ওপর রপ্তানী শুল্ক ধার্য করা হয়েছে এবং রপ্তানীতে উৎসাহদান পরিকল্পনা পরিত্যক্ত, তবু রপ্তানীকারকগণ আরও বেশি মুনাফা পাবেন।

মিহি বস্ত্রের দাম বাড়বে না

উক্ত মুখপাত্র একথাও বলেন যে, আমদানি তুলা থেকে যে কাপড় তৈরী হয়, তার মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। যুগান্তর

সিংহলে উদ্বেগ

কলম্বো, ৬ জুন—ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে উদ্ভূত গুরুতর পরিস্থিতি নিয়ে সিংহল মন্ত্রিসভা আজ সকালেও আবার আলোচনা করেন।

মুদ্রা মূল্যহ্রাসের সংবাদে সিংহলে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রিসভা গতকাল রাত্রে এক জরুরি বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা করেন, ভারতের পথ অনুসরণ করে সিংহলী টাকার বিনিময় হার হ্রাস করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

আজ রাত্রেও মন্ত্রিসভা এ নিয়ে আবার আলোচনা করবেন।

ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য মহলের অভিমত হচ্ছে, সিংহলের উচিত ভারতের পথ অনুসরণ করা।

বিকালে অর্থমন্ত্রী সিংহল পার্লামেন্টে বলেন, তিনি আগামীকাল সম্ভবত এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

সিংহলের ব্যাঙ্ক আজ বন্ধ ছিল, আগামীকালও বন্ধ থাকবে।

টাকার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্তে সিংহলে উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হবার কারণ এতে সিংহলের চা রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সিংহলের যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয় তার ৬৫ শতাংশ চা।

গত ১৯৬৫ সালে সিংহল ৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করে। এই চা-এর মূল্য ১২১ কোটি টাকা। ভারতীয় মুদ্রায় দাম।

আনন্দবাজার

সিংহলী টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে না

কলম্বো, ৭ই জুন :—সিংহলী টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে না।

আজ সকালে প্রতিনিধি পরিষদে অর্থমন্ত্রী শ্রীইউ বি ওয়ান্নিনায়ক সিংহল সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার রাত্রি হইতে মন্ত্রিসভার তিনবার বৈঠক হয় এবং তাহাতে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

—পি, টি, আই

টাকার মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

মাদ্রাজ ৬ই জুন (ইউ, এন, আই)—স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা শ্রীসি, রাজাগোপালাচারী বলেন, 'গত ১৫ বছর দেশ শাসনের (সকল স্তরে) অব্যবস্থার জন্যই আজ টাকার মূল্য হ্রাস করতে হয়েছে। আমাদের করবার কিছুই নেই।'

শ্রীরাঘবোপাদাচারী বলেন, 'আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে ভারতীয় টাকার দাম যে কমে গিয়েছিল, তা চাকা দেবার চেষ্টা করা নিরর্থক। সরকারীভাবে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে একাধিক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু করবার কিছু নেই।'

স্বতন্ত্র নেতা বলেন, 'যাঁরা কংগ্রেস পার্টিকে এতদিন কুশাসন করতে দিয়েছিল, তাঁদেরকে আজ কুশাসনের ফল ভোগ করতেই হবে।'

মূলধনী পণ্যের দাম বাড়বে

বোম্বাই, ৪ই জুন (পি, টি, আই)—শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদ শ্রীচুনীলাল বি মেটা (ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে) বলেছেন, এর ফলে দেশের শিল্পায়ন ব্যাহত হবে। আমদানীকৃত মূলধনী পণ্যের দাম প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। টাকার মূল্য হ্রাসে সাধারণত রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের (ভারতের) ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। কারণ ভারতের রপ্তানিযোগ্য খুব বেশী পণ্য নেই। পণ্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের পণ্যের দাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী এবং মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। কাজেই দেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়ি হবে।

আমদানীকৃত খাদ্যশস্য

আমেদাবাদ, ৪ই জুন (ইউ. এন, আই) আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা শ্রীএস আর বাসবদা আজ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, 'ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করার ফলে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য যাতে বৃদ্ধি না পায়, সরকার যেন সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

শ্রীবাসবদা বলেন, 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতের অর্থনীতির মূল্যায়নের ফলেই টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। নানা কারণে, আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্য কিছুদিন যাবৎ হ্রাস পেয়েছিল। সরকার এখন সেইটাই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন।'

শ্রীবাসবদা বলেন, 'টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু আমদানী শুল্কের রদবদলের পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত দাম কি পরিমাণ বাড়তে পারে, তার আন্দাজ করা যাবে না।'

শ্রীবাসবদা বলেন, 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করা খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাবে। জনসাধারণ যাতে বর্তমান দরেই আমদানীকৃত খাদ্যশস্য কিনতে পারে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

শ্রীবাসবদা বলেন, 'যাই ঘটুক না কেন, খাদ্যশস্যের দাম কোন মতেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে, বেতন ও মজুরীও বাড়াতে হবে। অন্যান্য জিনিষের দামও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। কাজেই মূল্য-বৃদ্ধি দুষ্টচক্র নতুন করে সুরু হবে।'

শ্রীবাসবদা বলেন, 'টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে মুদ্রাস্ফীতি কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তা নির্ভর করবে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী সাফল্যের ওপর।'

পার্লামেন্টের বৈঠক আহ্বানের দাবী

হায়দারাবাদ, ৪ই জুন—ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (দক্ষিণ) আজ টাকার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে ভারত সরকার স্বাধীনতার পর জাতীয় স্বার্থের প্রতি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা আর করেননি।

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ভারত সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের জরুরী অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন।

রাতারাতি বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, রাতারাতি বিদেশী ভোগ্য পণ্যের মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য শ্রীএস এম ব্যানার্জি বলেন যে, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত টেনলেস ষ্টীলের ব্লেডের প্যাকেটের দাম ৩৲ টাকা বেড়েছে। যে ব্লেডের দাম গতকাল ৫৲ টাকা ছিল আজ তার দাম ৮৲ টাকা হয়েছে। তিনি বলেন যে, অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের মূল্য এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

শ্রীব্যানার্জি ব্লেডের এই প্যাকেট নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

মদের মূল্য বৃদ্ধি

জনৈক বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, তাঁর 'প্রিয় পানীয়ের' মূল্য বাড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি গতকাল এক পেগ ব্রিন ৩ টাকা ৭৫ পয়সায় কিনেছিলেন কিন্তু আজ এজন্য ৫ টাকা ২৫ পয়সা দিতে হয়েছে।

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশী পর্যটকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কিনা তিনি অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন।

শ্রীচৌধুরী তখনই সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে জানান যে, তাঁর অভিযোগের কারণ সঙ্গত। তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করবেন।

শ্রীএ ডি মানি

নাগপুর, ৩ই জুন—পার্লামেন্ট সদস্য শ্রীএ ডি মানি বলেন যে, টাকার মূল্য হ্রাসে জনসাধারণ আকস্মিক আঘাত পেয়েছেন। বিদেশের বাজারে ভারতীয় টাকার মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় এর মূল্য হ্রাস ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ভারতের অর্থনীতির উপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা তিনি এখন বলতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণমেননের মন্তব্য

বোম্বাই, ৩ই জুন—শ্রীভি কে কৃষ্ণমেনন বলেন, 'টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের ভিতরে এবং বিদেশে প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও, এর ফলে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে। বিদেশের কাছে আমাদের দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।'

শ্রীকৃষ্ণমেনন আরও বলেন, 'বৈদেশিক সাহায্যের ওপর চোখ বুজে নির্ভর করে থাকা এবং পি এল ৪৮০ অনুসারে চালাওভাবে খাদ্যশস্য আমদানীর ফলেই এটা ঘটেছে।'

চা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্বেগ

এর্ণাকুলাম, ৩ই জুন—দক্ষিণ ভারতের ইউনাইটেড প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন, 'চায়ের রপ্তানী শুল্ক প্রতি কিলোগ্রামে দুই টাকা ধার্য করায় চা-শিল্পে 'প্রভূত ক্ষতি' হবে। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে, দামের দিক দিয়ে রপ্তানী বাণিজ্যে যে সুবিধা পাওয়া যেত, শুল্ক বৃদ্ধির ফলে তা নাকচ হয়ে যাবে এবং দেশের ভেতরে চায়ের দাম ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।'

ক্ষিপ্র ব্যবসায়ে অসুবিধা

মাদ্রাজ, ৩ই জুন—ভারতীয় ক্ষিপ্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এ এল শ্রীনিবাসন বলেন যে, টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে ক্ষিপ্র ব্যবসায়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তিনি বলেন, বিদেশী কাঁচা ক্ষিপ্রের দাম প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী

কটক, ৩ই জুন (ইউ, এন, আই)—লোকসভায় পি, এস, পি, দলের নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মিশ্র টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে আজ এখানে বলেন যে, লোকসভার অধিবেশন না থাকাকালীন অবস্থায় এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই আপত্তিকর পদ্ধতি।

তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী এবং এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

জনগণের কষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রকে ব্যাহত করবে।

শ্রীদ্বিবেদী বলেন যে, ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভারতের আর্থিক নীতির সুনিশ্চিত পরিবর্তন। আমাদের অর্থনীতি বিদেশী স্বার্থের ওপর কি রকম নির্ভরশীল এটা তারই প্রমাণ।

তিনি বলেন যে, লোকসভার অধিবেশনে পি, এস, পি, বহুবার এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল এবং অর্থ বিল আলোচনাকালে তিনি (শ্রীদ্বিবেদী) সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছিলেন। সরকার জনগণকে অন্ধকারে রেখেছিলেন, যদিও এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই নীতির জন্য গত কয়েক মাস যাবৎ সরকারী প্রস্তুতি চলেছে।

বিভিন্ন বণিক সভার মতামত

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি শ্রীএস এস কানোরিয়া প্রস্তাবিত পরিবর্তনকে দেশের অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব আনা এবং রপ্তানী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত 'বলিষ্ঠ ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন। তবে একমাত্র এই ব্যবস্থার সাহায্যেই ঐ লক্ষ্য পূর্ণ করা যাবে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আশা করেন যে, সরকার এর সঙ্গে সঙ্গে বহু বিধি-নিষেধের নিগড় থেকে শিল্পকে মুক্তি দেবেন এবং এই পরিবর্তনজনিত মূল্যস্ফীতি-রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনে তৎপর হবেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্নগণের মধ্যে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থাগুলি করা দরকার।

ভারত চেম্বার

ভারত চেম্বার অব কমার্সের কমিটি আজ একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করেন। কমিটি মনে করেন, জাতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্যোন্নতির মূল লক্ষ্য সফল করতে গেলে ঘোষিত পরিবর্তনের পর কতকগুলি "বলিষ্ঠ" ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এর মধ্যে আমদানী নির্ভর শিল্পগুলির শুল্ক হ্রাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার পথে ক্রমশঃ যে সব অসুবিধা দেখা দেবে সেগুলি দূর করার জন্যও সরকার যেন প্রস্তুত থাকেন।

মুদ্রা মূল্য হ্রাস সম্পর্কে মন্তব্য করব না

—শ্রীমোরারজী দেশাই

বাঙ্গালোর ১০ই জুন (পি টি আই)—মুদ্রা মূল্য হ্রাস সম্পর্কে ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, মূল্য হ্রাস হয়ে গেছে এখন আর করার কিছু নাই। কাজেই মরনা তদন্ত করে লাভ কি? শুধু তাই নয়, মরনা তদন্তের সময় এখনো আসেনি।

শ্রীদেশাই আরও বলেন, যদি তিনি মুদ্রা মূল্য হ্রাস সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন তবে নিশ্চয়ই কেউ তাঁর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আসবে না। কিন্তু তিনি এই মতামত প্রকাশ করে দেশের ভাল করলেন কি মন্দ করলেন—এই দ্বন্দ্বই তাঁকেই পীড়িত করবে।

কংগ্রেসের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের মধ্যে মূল্য হ্রাস সম্পর্কে মতভেদ আছে—এই বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন মতভেদ থাকতে বাধ্য। কাজেই এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কামাখের মন্তব্য

শ্রীকামাখ বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ফলাফল হল এই মুদ্রা মূল্য হ্রাস। তাঁর মতে এই সিদ্ধান্ত সরকারের পরাজয়ের স্বীকৃতি।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ইকনমিক এ্যাফেয়ার্স

নূতন ব্যবস্থার পরিণামে জনসাধারণের ঘাড়ের বোঝা আরও বাড়বে বলে কাউন্সিল আশঙ্কা করেন।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শ্রীএস সি রায় একটি বিবৃতিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমদানী বাণিজ্য হার পরিবর্তনের ফলে আমদানী হবে উঠবে সহায়। তাতে আমদানীর উপর নির্ভরশীল শিল্পজাত দ্রব্যগুলির দাম বেড়ে যাবে। এই উত্তাপে অন্যান্য দ্রব্যের বাজারও গরম হবে। যুগান্তর

Import licences will not be hit

NEW DELHI, June 6 : The devaluation of the rupee will not reduce the value of the import licences already issued, it was officially stated here to-day.

On all import licences issued to the extent to which any part of them remains unutilised at two a.m. today when devaluation came into effect, a corresponding increase in rupees would be made.

This was stated by Shri S. Bhoothalingam, Secretary, Department of Economic Affairs, at a Press conference today.

সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে খবরের কাগজের

বোম্বাই, ৭ই জুন—টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে এদেশে সবচেয়ে বড় চোট খাবে খবরের কাগজ ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো। আজ এখানে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন নাগপুর ও ভূপালের হিতবাদ পত্রিকার সম্পাদক এবং সংসদ সদস্য শ্রীএ ভি মানি। মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে আলোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শ্রীমানি তাঁর এই বিবৃতিতে বলেন, সংবাদপত্র শিল্পের অবস্থা আমার ভালই জানা আছে। তাই আমি বলতে পারি যে, টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে সংবাদপত্র আজ ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছে। সরকারী সাহায্য ছাড়া তাদের আর পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

তিনি বলেন, যে সব শিল্পকে বৈদেশিক পণ্যের দিকে সবচেয়ে বেশী তাকিয়ে থাকতে হয় খবরের কাগজ তার মধ্যে অন্যতম। খবরের কাগজ ছাপবার জন্যে যে পরিমাণ এবং যে জাতের কাগজ লাগে তা এদেশে তৈরী হয় খুবই সামান্য, তাই অধিকাংশ প্রয়োজনীয় কাগজই আনতে হয় বিদেশ থেকে।

শ্রীমানি বলেন, এখন বিদেশী নিউজ প্রিন্ট কিনতে হয় প্রতি টন ১৪০ থেকে ১৭৫ টাকা দরে। টাকার বিনিময় মূল্য কমাবার ফলে সেই দাম দাঁড়াবে ১৪০০ টাকায়। ভারতের খুব কম সংখ্যক খবরের কাগজই এই দামে নিউজ প্রিন্ট কিনে কাগজ চালাতে পারে। আর, খবরের কাগজ এমনই এক জাতের ব্যাবসা যে বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা চট করে ক্রেতাদের ঘাড়ে অথবা বিজ্ঞাপন-দাতাদের ঘাড়ে চাপানো তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। আরও আশঙ্কার কথা, মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে কাগজের বিজ্ঞাপন হ্রাস পাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। আনন্দবাজার

> Government is a contrivance of human wisdom to provide for human wants. Men have a right that these wants should be provided for by this wisdom.
>
> —EDMUND BURKE

বিমান ভাড়া শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি

(বিমানঘাটির রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৭ই জুন—ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিমান কোম্পানীগুলি শতকরা ৫৭ ভাগ বিমানভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। কলকাতা থেকে লণ্ডনের ভাড়া ছিল ২০৫৪ টাকা। বর্তমানে তা হলো ৩২৩৪ টাকা। কলকাতা থেকে টোকিওর ভাড়া ছিল ১৪৭৪ টাকা। তা বেড়ে হলো ২৩৭৮ টাকা। কলকাতা নিউইয়র্ক ভাড়া ছিল ২৯৫১ টাকা। তা বেড়ে হলো ৪৬৫৩ টাকা।

বিমান ভাড়া আজ থেকে বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। গত বছর ১১ হাজারের উপর লোক কলকাতা থেকে বিদেশে গিয়েছিলেন। এয়ার ইণ্ডিয়া এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার লোককে বিদেশে পাঠিয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন

ভারতীয় অর্থের মূল্য হ্রাস হওয়ায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, নেপাল ও পাকিস্তানের বিমান ভাড়া ও অতিরিক্ত জিনিষের মাশুল বর্ধিত করে দিলেন। আজ থেকে এই নূতন হার চালু হল। আনন্দবাজার পত্রিকা

মুদ্রামূল্য হ্রাসে ক্রিকেট বোর্ডের ২ লাখ টাকা দণ্ড

বোম্বাই, ৭ই জুন (ইউ.এন.আই.)—ভারতীয় টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড দু'লাখ টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ ক্রিকেট বোর্ডকে এক্সচেঞ্জ ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরের জন্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে এক লাখ টাকা বেশী দিতে হবে। সম্প্রতি ভারত সরকার সফরকারী দলকে গ্যারান্টি বাবদ দেয় আঠার হাজার পাউণ্ডের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেছেন। নতুন বিনিময় হার অনুসারে এই বাবদও ক্রিকেট বোর্ডের দেয় অর্থের পরিমাণ এক লাখ টাকা বেড়ে যাবে।

বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে হয়ত অনেক ক্ষেত্রের পক্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলার আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ, নতুন আর্থিক বন্দোবস্তের ফলে যে বাড়তি টাকার চাপ পড়বে, তারা তা বহন করতে পারবে না। যুগান্তর

সোনার অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি

বোম্বাই, ৬ই জুন, (পি. টি. আই)—টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে এখানকার বাজারে সোনা-রূপার যে দর বৃদ্ধি ঘটেছে তা সর্বকালের পক্ষেই অভূতপূর্ব।

গত সপ্তাহের শেষদিকে ১৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি ১০ গ্রাম ৭২৲ টাকা, তা আজ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১০০৲ টাকা।

প্রাথমিক সোনার দর যেখানে ছিল প্রতি ভরি ১৩০৲ টাকা, তা আজ ১৯৫ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—যুগান্তর

বাট্টা হ্রাস কি ও কেন?

নিতান্ত নিরুপায় বোধ না করলে কোন দেশই মুদ্রার বিনিময় মূল্য (বাট্টা হার) হ্রাস করে না। জাতীয় অর্থনীতিতে যে সব উপসর্গের চাপে পড়ে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ এবং বাট্টা হ্রাসের ফলাফল সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনই বাজারে দেনা বা বিল সময়মত শোধ করতে না পারলে সুনামের হানি ঘটে, ঋণ বা ধারদেন পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে—এবং স্থিতি পরিশোধের কিম্বা জরুরী খরচ মেটানোর জন্য লোকে লোকসান দিয়েও সাময়িক ফয়সালা করতে বাধ্য হয়। বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ কতকটা এ রকম অবস্থায় পড়ায় জন্যই সরকার দ্বিতীয়বার বাট্টা হ্রাস করেছেন।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে যে বিনিময় মূল্য (বাট্টা হার) বাঁধা আছে—তারই ভিত্তিতে পরস্পরের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা। নিট ঘাটতি স্বল্পস্থায়ী ও পরিমাণ সীমিত হলে আন্তর্জাতিক বাট্টা তহবিলের কাছে স্বদেশের মুদ্রা আপাত বিক্রী করে মহাজনের বাঞ্ছিত মুদ্রা দাদন পাওয়া যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের দ্বারা ঐ দাদন শোধ করতে হয়। কিন্তু, দীর্ঘকাল ঘাটতি চলতে থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ (অর্থাৎ আমদানী কমানো) কিম্বা রোজকার বাড়ানোই (অর্থাৎ রপ্তানী বৃদ্ধি) আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে সুনাম ফিরিয়ে

আনার উপায়। তবে, শুধু এ দুটি পন্থাই শেষ নয়। আমদানির দিয়ে মুদ্রিত আসানের জন্য রকমারি ব্যবস্থা হতে পারে। বিদেশ থেকে দাদন, কর্জ ও মূলধন পেলে তো সোনায় সোহাগা! তবে কর্জ শোধের সর্ত ও সুদের হার স্বাধ্য হওয়া দরকার; শোধের জন্য ভারতীয় এক টাকার বিনিময়ে মার্কিন ৩০'৪০ সেন্ট দেবে। প্রথমবার বাট্টা হ্রাসের পর ঘোষণা করেছিলাম যে, এক টাকার বিনিময়ে একুশ সেন্ট দিতে পারব। এবার বাট্টা হ্রাসের পর জানিয়েছি যে, এক টাকার বদলে সওয়া তেরো সেন্টের বেশী দিতে পারব না। অর্থাৎ প্রথমবার টাকার বৈদেশিক মূল্য কমানো হয়েছিল ৩০-৪ শতাংশ দফা বাট্টা হ্রাসের বাজার দুষ্প্রাপ্য ডলার এলাকা থেকে রপ্তানীর খরচ দাঁড়িয়েছে—গোড়ায় ১০০ টাকার স্থানে এখন ২১৩-৬ টাকা। বৈদেশিক লেন দেনের ব্যাপারে ক্রমাগত ঘাটতি এবং তা পূরণ করতে অক্ষমতা এই বিপত্তির মূলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাগজী মুদ্রার কোন স্থান নাই। হয় পণ্য—নতুবা সোনা-রূপা-হীরতাদি মূল্যবান ধাতু রপ্তানী দ্বারা নিট দায় শোধ করতে হয়। সে সুযোগ না থাকলে বিদেশ থেকে কর্জ, দাদন ও মূলধন—ফলে ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য এলাকা থেকে আমদানীর সংগ্রহ করাই মুদ্রিত আসানের পথ। কিন্তু, পণ্য রপ্তানী করতে হলে তার দরও প্রতিযোগিতা-মূলক হওয়া দরকার—নতুবা অন্যান্য দেশজাত মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, দীর্ঘকাল এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়তে থাকে এবং বিদেশী মহাজনদের পাওনা মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ রকম দুর্দৈব অবশ্য মিশ্র অর্থনীতিরই বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক, এমন কি ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতিতেও এর অব্যর্থ প্রতিকার আছে।

১৯৪৯ সালে বাট্টা হ্রাসের পর টাকার দর ২১ সেন্ট ধার্য হয়েছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তখন আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুসারে ঐ হারই ছিল স্বাভাবিক। অর্থাৎ ভারত থেকে রপ্তানী এক টাকার মাল মার্কিণ ২১ সেন্ট ধরে বিক্রী করলে কোন দেশই তার চেয়ে সস্তা দিতে পারত না। কিন্তু গত ষোল বছর ধরে ভারতে বাজার দর ক্রমশঃ চড়ে যাওয়ায় তখন এক টাকার মাল কিনতে এখন অন্ততঃ সওয়া দুই টাকা খরচ পড়ছে। তাই টাকার দর ৩০'৪ সেন্টের পরিবর্তে এখন ১৩'৩ সেন্ট ধার্য করলে প্রতিযোগিতায় বিদেশে বিক্রী করা সম্ভব। এটা অবশ্য সম্পূর্ণই অনুমানসাপেক্ষ এবং বাট্টা হ্রাসের সিদ্ধান্ত এই যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাজার দর চড়ার জন্য যেমন রপ্তানী বাড়াতে বাধা ঘটেছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে তেমনই মূলধনী সাজসরঞ্জাম ও শিল্পে কাঁচা মাল, উপকরণাদি আমদানীর প্রয়োজন অনেক বেড়েছে। ফলে বহি-র্বাণিজ্যের ঘাটতি ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে আংকের বাইরে চলে গেছে। ১৯৫০—৫১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৬ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার পূর্ববর্তী বছর থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত) বহির্বাণিজ্যে আয়, ব্যয় ও ঘাটতির হিসাব অন্যত্র প্রকাশ করা হল। তুলনা করলে দেখা যায়, নিট ঘাটতির পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ৪৯'৪৮ কোটি টাকা থেকে প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৬৪'৩৪ কোটি টাকায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে ৪১১'৪৫ কোটি টাকায় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ৪৪৮ কোটি টাকায় উঠেছে। পরপর তিনটি পরিকল্পনার আমলে নিট ঘাটতির বার্ষিক গড় যথাক্রমে ১১৪'৪৪ কোটি টাকা, ৩৬১'৩৭ কোটি টাকা এবং ৪৬২'০০ কোটি টাকা। আর এই পনর বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যে মোট ঘাটতি পড়েছে যবলক ৪৭০ কোটি টাকা।

বিদেশ থেকে কর্জ, দাদন ও মূলধন জোগাড় করে যে সব পণ্য আমদানী করা হয়—তার মূল্যও আমদানীর

হিসাবে ধরা আছে। ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৪ বছরে নিট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪১৪২ কোটি টাকা—আর খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণের এবং উন্নয়নের কার্যসূচী সম্পর্কে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বিদেশ থেকে শুধু সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ পাওয়া গিয়েছিল ৪১৫১ কোটি টাকা। তবে ওসব পণ্য আমদানীর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী; কিন্তু বিদেশী সরকারগুলির কাছ থেকে সবটা পাওয়া যায় নি—সমগ্র অনগ্রসর দুনিয়ার চাহিদা স্মরণ রাখলে তাদের সাধ্যও অবশ্য সীমাবদ্ধ। যাই হোক, খাদ্যশস্যের এবং মূলধনী সাজসরঞ্জাম আমদানীর প্রয়োজন না থাকলে চলতি চাহিদার জন্য ঘাটতি পড়ত না।

বৈদেশিক ঋণ ও ঋণপরিশোধের পরিমাণ

	মঞ্জুর	আদায়	কোটি টাকার সমষ্টিতে মেয়াদ অন্তে বকেয়া
প্রথম পরিকল্পনায়			
শেষ পর্যন্ত	৩৮১·৭	২০১·৭	১৮০·০
দ্বিতীয় পরিকল্পনায়	২৪৪২·১	১৪২৯·৮	১৩০২·৩
তৃতীয় পরিকল্পনায়			
প্রথম চার বছর	২৬৪১·৮৬	২৪১৯·৪৯	১৩৮৮·১০০
	৪২৭৪·৬	৪১৫০·৯৯	১৩৮৮·১০০

* ভূপচুক চাড়কাটের পর।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

বৎসর	আমদানী*	রপ্তানী*	কোটি টাকার সমষ্টিতে ঘাটতি
১৯৫০-৫১	৬৫০·২২	৬০০·৬৪	৪৯·৫৮
১৯৫১-৫২	১৯৩·১০	৭৩২·১৯	২১০·১৪
১৯৫২-৫৩	৬৬১·৮৮	৫৭৭·০৭	৯২·৫১
১৯৫৩-৫৪	৫৭১·৯০	৫৩০·৬২	৪১·০১
১৯৫৪-৫৫	৬৫৬·২৬	৫৯০·৫৪	৬২·৭২
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪·২৫	৬০৮·১০	১৬৫·০৫

প্রথম পরিকল্পনায়			
আসলে	৩৬১৫·৪৫	৩২৪৩·৪২	৪৭২·০৩
১৯৫৬-৫৭	৯০২·৯১	৬১৩·৬২	২৮৩·২৯
১৯৫৭-৫৮	১০৩৬·৪০	৬৩৪·১৪	৪০১·২৬
১৯৫৮-৫৯	৯০৩·৬৪	৪৭২·৬১	৩৩১·০৩
১৯৫৯-৬০	৯৬১·৪১	৬৩৯·৬৫	৩২১·৮০
১৯৬০-৬১	১১২১·৬২	৬৪২·০৭	৪৭৯·৫৫
দ্বিতীয় পরিকল্পনায়			
আসলে	৪৯২৬·০২	৩১০৯·১২	১৮১৬·৯০
১৯৬১-৬২	১০৯১·৬০	৬৬০·৫৮	৪৩১·০৫
১৯৬২-৬৩	১১৩১·৪৮	৬৮৫·৩২	৪৪৬·১৬
১৯৬৩-৬৪	১২২২·৮৫	৭৯৩·২৪	৪২৯·৬১
১৯৬৪-৬৫	১২৭০·৩৪	৮১৩·২৬	৪৫৭·০৮
১৯৬৫-৬৬*	১৩৫০·৪৫	৮০২·৮৪	৫৪৭·৬০
তৃতীয় পরিকল্পনায়			
আসলে	৬০৬৬·৭৫	৩৭৫৮·২৫	২৩১১·৫০

*মাশুল ও বীমার প্রিমিয়াম সমেত

+মাশুল ও বীমার প্রিমিয়াম ছাড়া

* চূড়ান্ত হিসাব সাপেক্ষ

(—তার চাপ যেন দাদন গ্রহণকারীর উপর অসহ্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়)।

সরকার বলেছেন যে, বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে নিট দায় শোধ করতে গুরুতর অসুবিধার জন্যই বাট্টা কমানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাট্টা তহবিলে যোগ দেওয়ার সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, বহির্বাণিজ্যে নিট দায় খরচ চড়েছিল ৪৪·২ শতাংশ। তারপর যে বাট্টা ছিল তার মধ্যেও ৩৮·৫ শতাংশ এবার হ্রাস করায় আমদানীর খরচ চড়েছে আরও ৫৭·৮ শতাংশ। টাকার দর দাঁড়িয়েছে এখন ১৯৪৯ আগষ্ট মাসে মার্কিন ৩০·৪ সেন্টের জায়গায় এখন ১৩·৩ সেন্ট—অর্থাৎ আসলের মাত্র ৪৪ শতাংশে।

মুদ্রান্তর

Who is this devaluation ?

CALCUTTA, June 6 : "Who is this devaluation ?" This query was made by a class IV employee of a bank to a colleague of his in a suburban train this morning, as soon as he heard that his office would remain closed for two consecutive days.

Being told that the closure was because of devaluation, the questioner reacted, "When a very big man dies, banks are closed only for a day. Since they would remain closed for two days this time, devalution must be a very great person. But who is he ?"

—Indian Express

Devalution, like sin, is first pleasing, then it grows easy, then delightful, and then frequent—Financial Editor of The Indian Express.

•

This could have been avoided if I had continued to be in power—Mr. T. T. Krishnamachari reported to The Hindu.

•

The people of India did not embark on a programme of planning so that a group of "leaders" who have no sense of economic independence can use the plans to make the nation an American satellite. —Patriot

Courageous Act by Mrs. Gandhi, Says 'C.R.'

MADRAS, June 7.—The Swatantra leader, Mr. C. Rajagopalachari, today praised Mrs. Indira Gandhi for what he described as the courageous act, deciding to devalue the rupee.

In a statement, Mr. Rajagopalachari said, devaluation in itself was in the nature of an "unabashed confession" and despite its adverse impact on the fortunes of the ruling party, the fact the Prime Minister had ordered it demonstrated her courage.

In an obvious reference to the reports that Mr. Kamaraj had opposed the devaluation decision, he said to postpone it—"as Congress carcerists would want it to be done"—would have been "criminal and sordid".

"There is a higher politics than party politics. It is time the Prime Minister disbands the crowd and calls a patriotic and wise group of men to run the affairs of the country. If she does this, she will have the support of the whole nation, barring those who talk of political wisdom, meaning only party politics."

—Indian Express

Ordinance To Hold Price ?

NEW DELHI, June 7.—The Government is likely to issue an Ordinance soon to maintain the price line and to deal firmly with black marketeers, hoarders and other anti-social elements.

The Ordinance will incorporate the powers available to the Government under the Defence of India Act and is aimed at enabling the State Government to act promptly under the Essential Commodities Act.

A decision to this effect is understood to have been taken at a high-level conference today at which the Ministers of Finance, Food, Planning and Irrigation and Power and senior Secretaries of the Government were present.

The consensus at the meeting was that all possible measures should be taken to hold the price line. Without it, the benefits of devaluation would be lost.

It was decided to establish a permanent watchdog committee to study the state of the economy closely and initiate remedial measures when called for. As a first step in this

direction, it was decided to send Mr. S. K. Patil, Railway Minister and some senior officials to Bombay and Mr. D. Sanjivayya, Industry Minister, to Calcutta. Mr. Patil and Mr. Sanjivayya will hold discussions with industrialists and the State Governments and emphasise on them the need to prevent a rise in the price of essential commodities.

The Finance Minister will hold similar discussions in Delhi.

It is understood that the Prime Minister is sending a letter to the State Chief Ministers in this connection. There is also a possibility of their being invited for talks in Delhi to consider various implications of devaluation and measures to be taken to hold the price-line—(U. N. I.).

Devaluation So This was Why

By SUNDER KABADI

LONDON, June 11—Devaluation of the Indian rupee was a condition for resumption of American aid.

This was stated today by the well-known British economist and editor of the Statist, Paul Bareau.

Bareau, who recently visited India and reported on India's economic situation, said, "It became evident after the visit of Mrs. Indira Gandhi to Washington that full resumption of American aid was conditional on devaluation of the rupee."

"The case for that devaluation became unanswerable. It was in every sense a 'shotgun' devaluation."

Bareau, whose economic opinions are highly respected, referred to the suspension of all American aid to India except for cereals against payament of rupees after the outbreak of war between India and Pakistan.

"It is extremely difficult to appreciate the logic behind the pressure that induced India to devalue." Bareau also said, "Never was devaluation more justified by orthodox evidence of the true value of the currency and yet more unjustified by common sense."

—Amrita Bazar Patrika

টাকার মূল্য হ্রাস আর সাধারণ মানুষ

দেশের যারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ তারা অর্থনীতি বা রাজনীতির ধার ধারেনা, তারা একান্তই জনসাধারণ। তারা 'ডি ভ্যালুয়েশন' বোঝে না। জানে না 'ডলার', 'ষ্টার্লিং',—'এক্সপোর্ট ইমপোর্ট'-এর মাহাত্ম্য। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর নামও তারা কখনও শোনেনি। তারা আশা করে দেশের সরকার তাদের আহারের জন্যে অন্তত দু'বেলা দুমুঠো অন্ন এবং পরণের জন্যে মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু উনিশ বছরের জাতীয় সরকারের রাজত্বে তাদের সে আশা ধূলিস্যাৎ হয়েছে। উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আজও তারা অনাহারক্লিষ্ট,—দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। এই অসহায় অবস্থায় যাকে সরকারের টাকার মূল্য হ্রাস নীতি 'গোদের ওপর বিষ-ফোড়ার সামিল।' টাকার দর কেন কমানোর দরকার হয়ে পড়ল, এবং এর দ্বারা দেশের কী মঙ্গল হবে তা বোঝবার ক্ষমতা দিন-আনা দিন-খাওয়া জনসাধারণের নেই।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে তারা ভেবেছিল তারা কত আনন্দেই না থাকতে পারবে; কিন্তু হায় অদৃষ্ট—তাদের অবস্থা হল ঠিক বিপরীত। নামতে নামতে কোন অতলে তারা যে নেমে যাচ্ছে—তা তাদের চেয়ে আর বেশি কে বুঝবে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে কেরোসিন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আধসেরটা খাবার জোগাড় করতে হয়। সবত্র পরিবারে অনাহারের আতঙ্ক। আকাশ ছোঁওয়া বাজার দর। পণ্য দ্রব্য চড়তে চড়তে আজ কোথায় উঠেছে; আর সাধারণ মানুষ কোথায় নেমেছে, এর হিসাব-নিকাশ তো নিত্যই চোখে দেখা।

তাই হঠাৎ 'বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত' টাকার মূল্য হ্রাসে দেশের সাধারণ মানুষের ভয় ও আশঙ্কার আর অন্ত নেই। এই টাকার মূল্য হ্রাসের ত্রাসে দরিদ্র ভারত-বাসীর কণ্ঠে আজ ত্রাহি ত্রাহি রব ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

লাইব্রেরীতে রাখার মতন বই।

সবেমাত্র প্রকাশিত।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

আধুনিকতম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

অর্চ্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

আধুনিক কবিতার আর একখানি

উল্লেখযোগ্য বই—

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

সাগর আকাশ

দাম—২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

নীহাররঞ্জন গুপ্তের দীর্ঘতম উপন্যাস

তালপাতার পুঁথি ১৫৲

ডঃ সুকুমার সেনের
নট নাট্য নাটক ৪৷৷০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
বড়বাবু ৭৲

শম্ভু মহারাজের হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী

গহন গিরি কন্দরে ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
জ্যোতিষী ৩৷৷০

সুরথনাথ ঘোষের
রোশনাই ৪৲

অবধূতের নবতম ভ্রমণ-কাহিনী

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮৷৷

সৈয়দ মুজতবা আলীর দীর্ঘ ভূমিকা সহ

স্বামী তত্ত্বানন্দের
তপস্বী ভারত ১০৲

স্বামী জগন্নাথানন্দের
শ্রীম-কথা ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
কলধ্বনি ৪৷৷০

মহাশ্বেতা দেবীর
অজানা ৪৷৷০

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের

তিন শতকের কলকাতা ৬৲

কলকাতার ইতিহাস ও সমাজচিত্র।
প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী সহ

অন্নদাশঙ্করের

পসারিণী ৪৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের
কয়েকটি বহুপ্রশংসিত বই

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩'৭৫
আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ... ৩'০০
পূর্বাপর (গল্প) ... ... ২'৫০
বিয়োগান্ত (গল্প) ... ... ২'৫০
যে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প) ... ৩'০০
নবরূপ রূপে (রম্য কাহিনী) ... ৩'৫০
বীরবল রঙ্গ (কৌতুক) ... ৩'০০
স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য) ... ২'৫০
তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (রহস্য) ... ২'০০
মায়াজাল ও মরণাভিসার (,) ... ২'০০
ভিন্নমর্গ (নাটক) ... ... ২'০০
নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের : **মায়াবসান** (নাটক) ২'৫০
Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫'০০

: যন্ত্রস্থ :

চিরঞ্জীবিষু (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)
রহস্য পঞ্চক (পাঁচটি রহস্য উপন্যাসের ওমনিবাস)
লাশ চালা (রহস্য কাহিনী)
কোম্পানী আমলের কাহিনী (পুরনো কলকাতার স্মৃতিকথা গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)
নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের **রাণা প্রতাপ** (নাটক)
Glimpses of the olden times
Echoes from Old Calcutta

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে। যে-কোন বাংলা বই-এর জন্য পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আমাদের ফ্রী সার্ভিস বিভাগ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :
২১২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-৬

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা
ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার
সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গল্প-ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ । সপ্তম সংখ্যা
পৌষ ১৩৭১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রসবের পূর্বে ও পরে
আদর্শ পথ্য
ও পানীয়

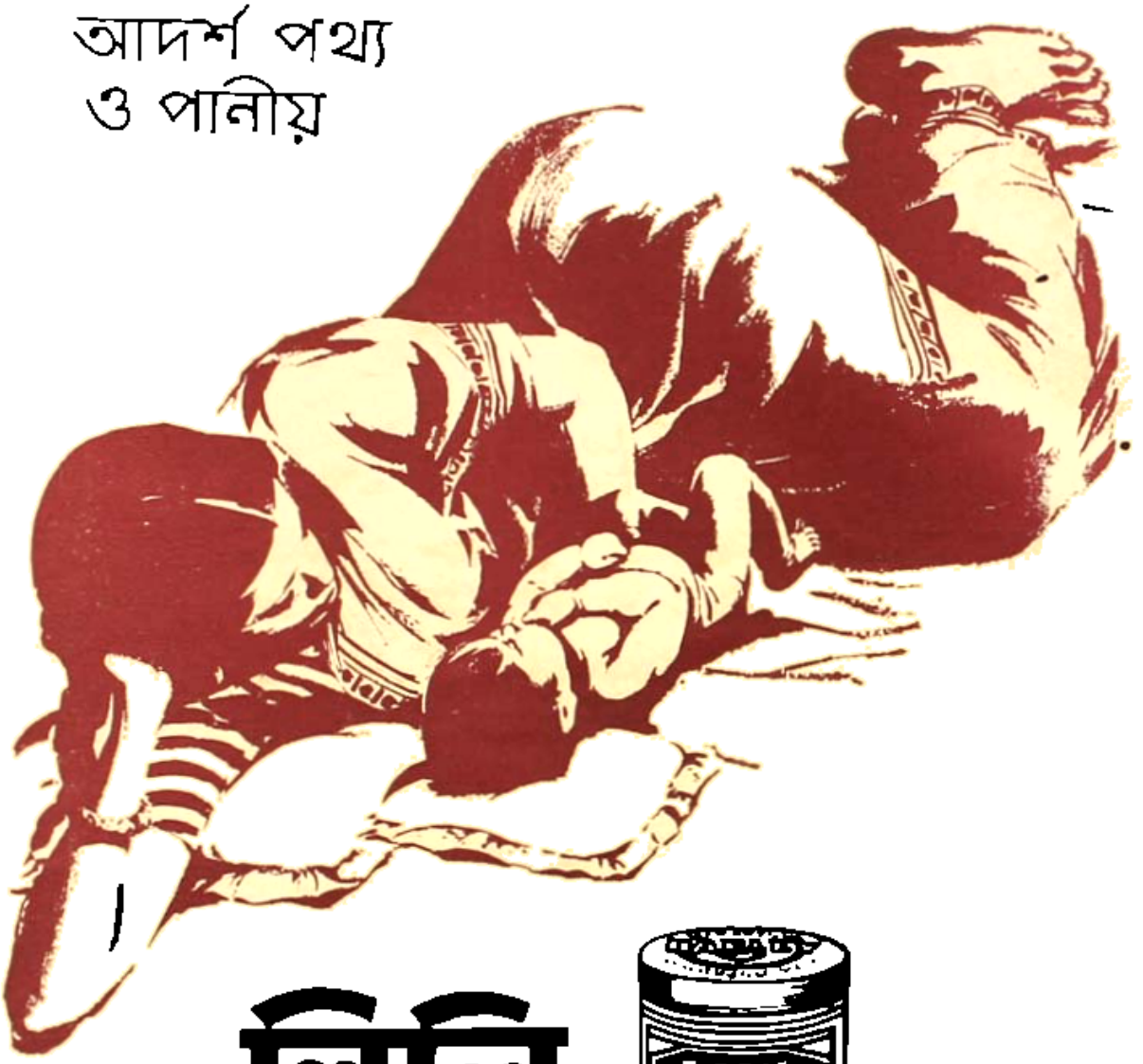

লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি

বিশুদ্ধ ও টাটকা

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত।

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সব্ব ঋতুতে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ

দিনে, রাত্রিতে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদে আমলালের কাজে কামাই বেই অবশ্য নামে কি এসে যায়। আমাদের শ্যামলাল ডাক পিওন হতে পারেন, টেলিগ্রাফ পিওন, লাইনম্যান, হেডের ডাকপাড়ায়ে চিঠি বাছাইকারী, টেলিফোন অপারেটার, টেলিগ্রাফিষ্ট, কেরাণী অথবা ডাক ও তার বিভাগের আরও চার লক্ষ কর্মীর যে কোন একজন হতে পারেন, তবে তাঁদের মতো অনেকেই ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ করেন।

২৪ হাজারেরও বেশী পোষ্ট অফিস, ৮০০০ টেলিগ্রাফ অফিস, ১,২০০ টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (৭.৬ লক্ষ টেলিফোন) এবং আরও অনেক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ জাতির সেবা করছে। প্রতিদিন যে কাজ চলে তা হ'ল ১৮০ লক্ষ চিঠি পত্র, পার্সেল, মনিঅর্ডার ইত্যাদি, ১.৩ লক্ষ টেলিগ্রাম এবং ১.৬ লক্ষ (দৈর্ঘ্যকরী) ট্রাঙ্ক কল এবং এছাড়াও আরও নানা রকম কাজ করতে হয়।

এগুলি সব দৈনন্দিন কাজ হলেও শ্যামলাল তাঁর কাজ বেশ যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সম্পর্কে শ্যামলাল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন; কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা ও সুচেষ্টা থাকলে এই কাজ আরও ভালোভাবে করা যায়।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন।

ডাক ও তার বিভাগ

শিশুদের শুধু লালন পালনই নয় তাদের শিক্ষার বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে সোভিয়েত সরকার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নার্সারি কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিশু শিক্ষালয়গুলিতে এখন ১১ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়াশুনো ও খেলাধুলো করে। বাপমায়েরা তাঁদের নিজেদের সুবিধের কথা বিবেচনা করে এবং আনন্দময় পরিবেশে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ছোলারজন্যে নিজেরাই শিশু-সন্তানদের শিশুশিক্ষালয়গুলিতে পাঠিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই অথচ কেউ এই শিশু শিক্ষার সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেন না।

তাসখন্দে সোভিয়েত শিশুদের সঙ্গে কোসিগিন ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

নার্সারী ও কিনডার-গার্টেনগুলিরব্যয়ভারপ্রধানতঃ বহনকরে রাষ্ট্র এবং প্রাতরাশে দৌধ খাবারগুলি। শিক্ষা-লয়গুলির সাজসরঞ্জাম ও রক্ষণাবেক্ষণ,শিক্ষক-শিক্ষিকা-দের ও চিকিৎসকদের বেতন এবং শিশুদের খাদ্য বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। এই ব্যয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ দিয়ে থাকেন বাপ-মায়েরা। এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাসে তিন থেকে সাড়ে বারোরুবল। বাপমায়েরা যে টাকা দেন তার পরিমাণ নির্ভর করে পরিবারের আয় এবং সন্তান সংখ্যার উপর।

অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে শিশুরা শিক্ষালাভ করে। চিকিৎসকেরা সদাসর্বদা নজর রাখেন তাদের উপর। শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ ও সুপারিশ যুক্তভাবে দিয়ে থাকেন শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদেমি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদেমি। রুগ্ন শিশুদের বিশেষ স্বাস্থ্যনিবাসে—তথা কিনডেরগার্টেনে রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরোগ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ছাড়া হয় না।

সারা বিশ্বে সোভিয়েত শিশুর মত এমন সুবিধাভোগী শ্রেণীর তুলনা মেলা ভার।

বিশ্ব-বাতায়ন

সোভিয়েত রাশিয়ায় ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু

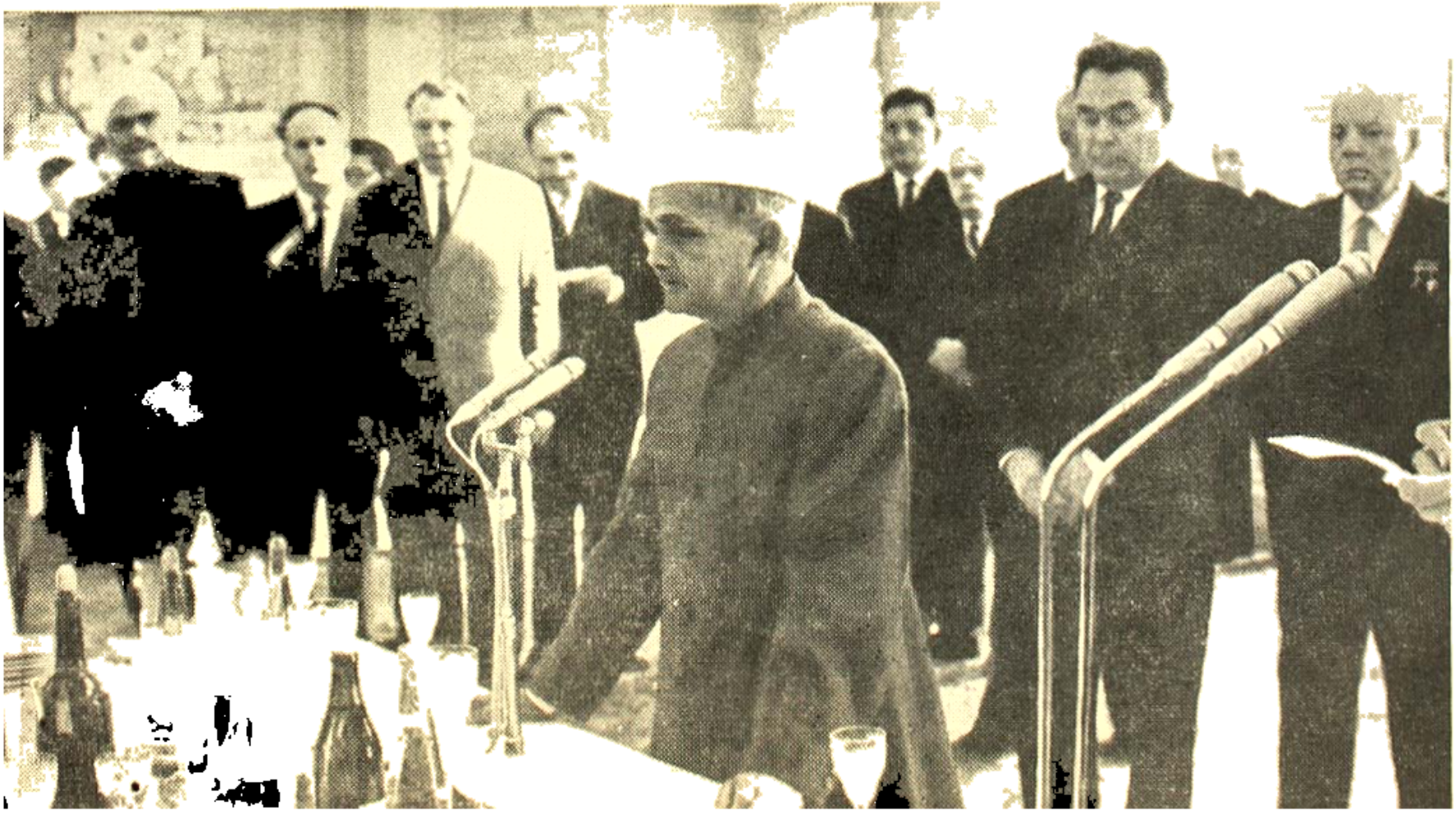

রামলীলা ময়দানের শোভাযাত্রায় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে
মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হিউবার্ট হামফ্রি

ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ইন্দিরা
ও মার্কিন প্রবাসী সচিব তাঁর সাথে।

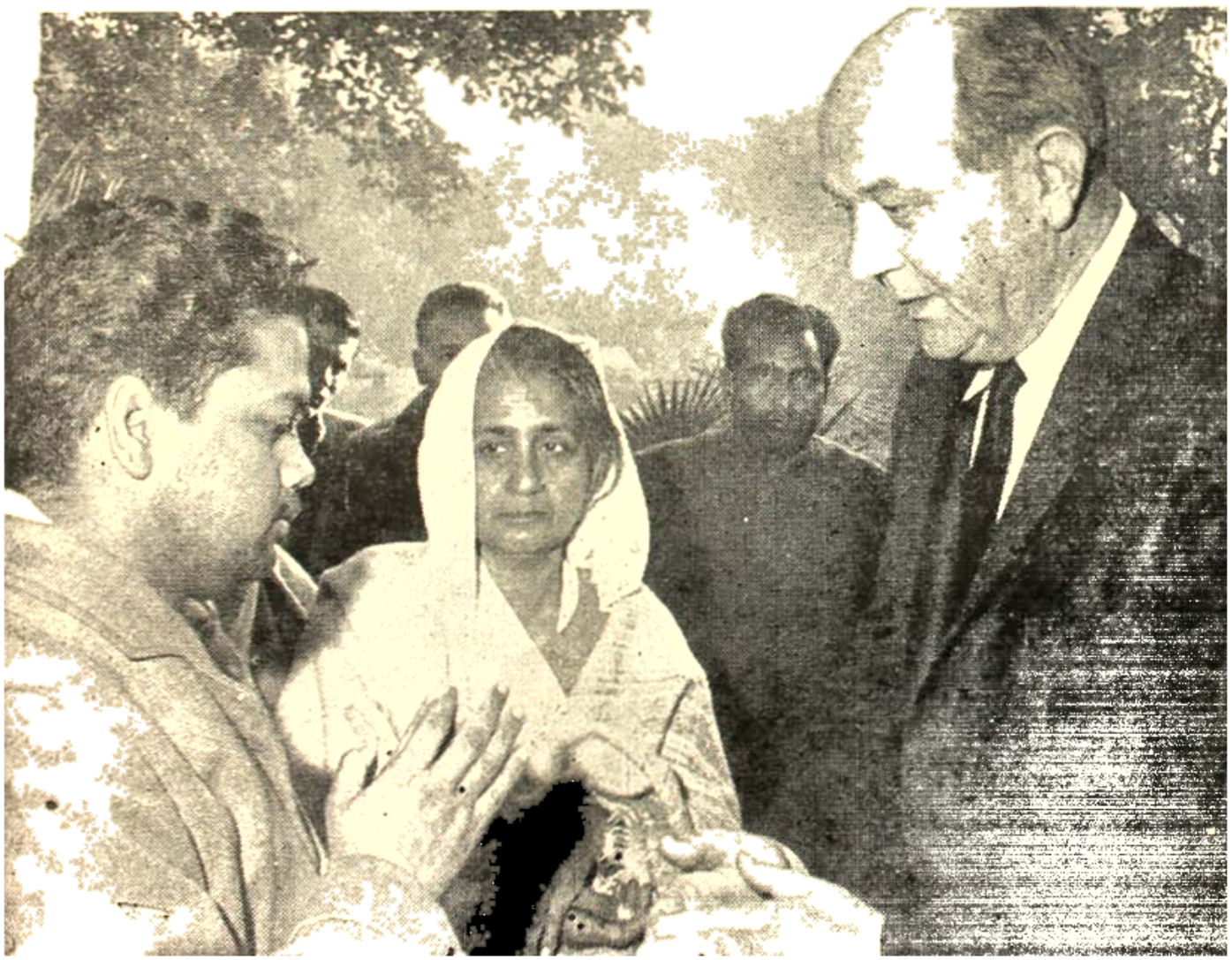

সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে শত্রুদের শেষ যাত্রা

তাসখন্দে স্মরণীয় শেষ সাক্ষাৎকার রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

মত স্পষ্ট যে, দেশবাসীর সমর্থন না পেলে তাদের পক্ষে শক্তিশালী মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে এশিয়ায়। শুধু তাই নয়, এশিয়ার সাম্যবাদকে ধ্বংস করবার পবিত্র দায়িত্বও যেন তার উপর ন্যস্ত হয়েছে।

এশিয়ার আর একটি দুষ্টগ্রহ লালচীন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পেছনে তার ভূমিকাও নগণ্য নয়। সব রকমের শান্তি প্রচেষ্টা বানচাল করে সে এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিপ্লবকে সার্থক করতে চায়। এইভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার নরনারী মার্কিন বোমার মুখে প্রাণ দিচ্ছে। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিন বোমাবর্ষণ সব রকম আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তারা ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভিয়েৎনামীকে হত্যা করেছে।

মস্কোয় ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে বিপুল বিক্ষোভ

এশিয়ার এই যুদ্ধে ভারত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সেজন্যে ভারত সরকারের নীতি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমরা যদি ভিয়েৎনাম সমস্যার এক শান্তিপূর্ণ পথ বাতলে দিতে পারি তাহলে পৃথিবীর বহু শান্তিকামী রাষ্ট্রের শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয় হবে। শুধু তাই নয়, এ হবে লালচীনের কূটনীতির এক বিরাট পরাজয়।

শান্তি আলোচনা চলতে পারে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা চুক্তি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে মেনে নেয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার কঠোর মনোভাব ডাঃ মীনকে আরও কঠোরতর করে তুলছে।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার রোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুন্দর, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩১, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৯৮

Cover printed by—
RASTICK ART PRESS, CALCUTTA 12.

গল্প-ভারতী

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

একবিংশতিতম বর্ষ । অষ্টম সংখ্যা
মাঘ ১৩৭২

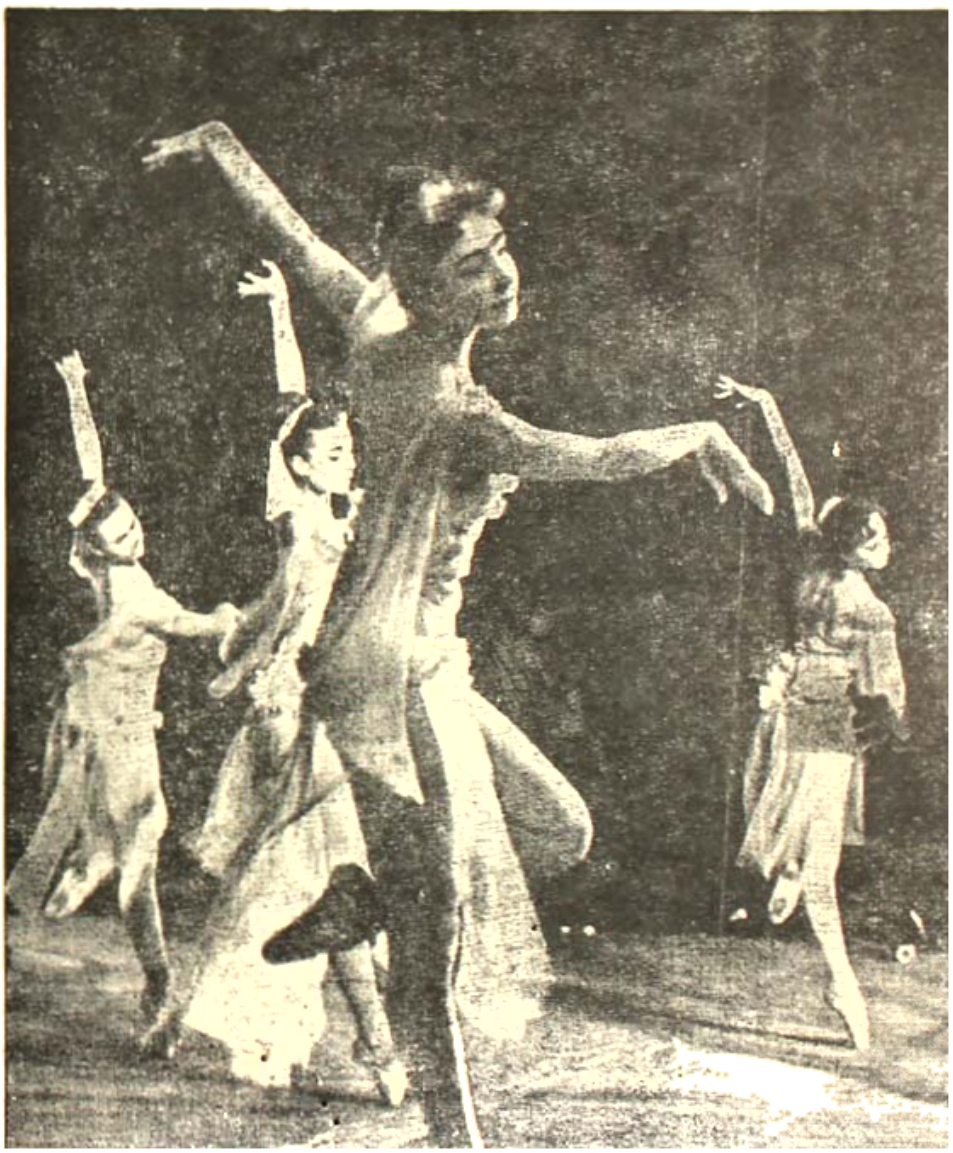

সকাল সন্ধ্যায়

লিলি
বিস্কুট
না হলেই নয়।

লিলি বিস্কুট কোঃ প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

ঐতিহাসিক বিখ্যাত শিকাগো শহরে সম্প্রতি ভারতের নূতন পর্যটক অফিসের উদ্বোধন করা হয়। এই শিকাগো শহরেই বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে প্রাচীন প্রথানুযায়ী শিখার প্রদীপ জ্বালান হয়।

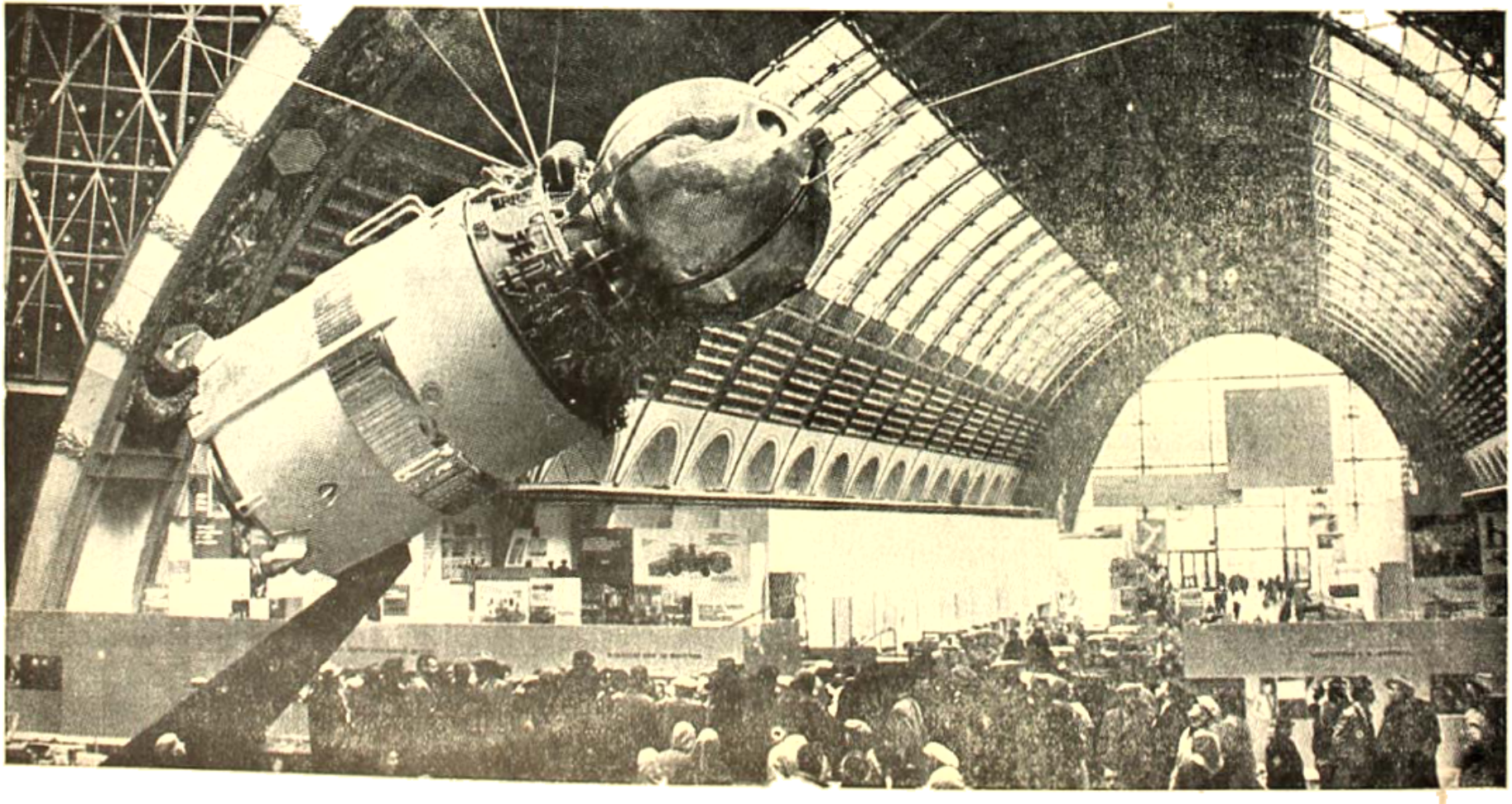

মস্কোর প্রদর্শনীতে সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত ভস্তোক মহাকাশযান।
এই মহাকাশযানই বিশ্বের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

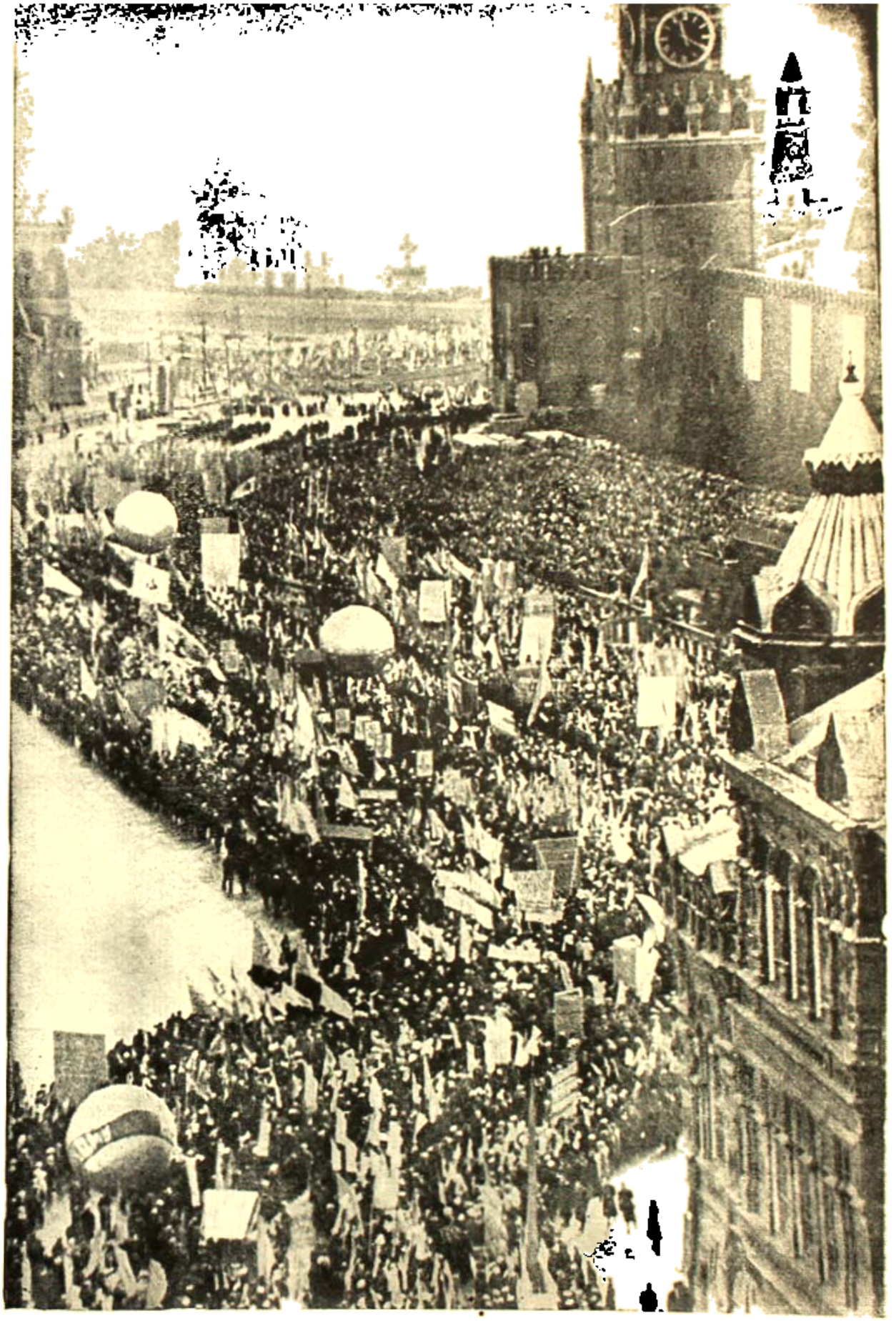

একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসন ও ভারতের রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহেরু।

। নববর্ষের দিনে ঘরকে চাকা থাকো ।

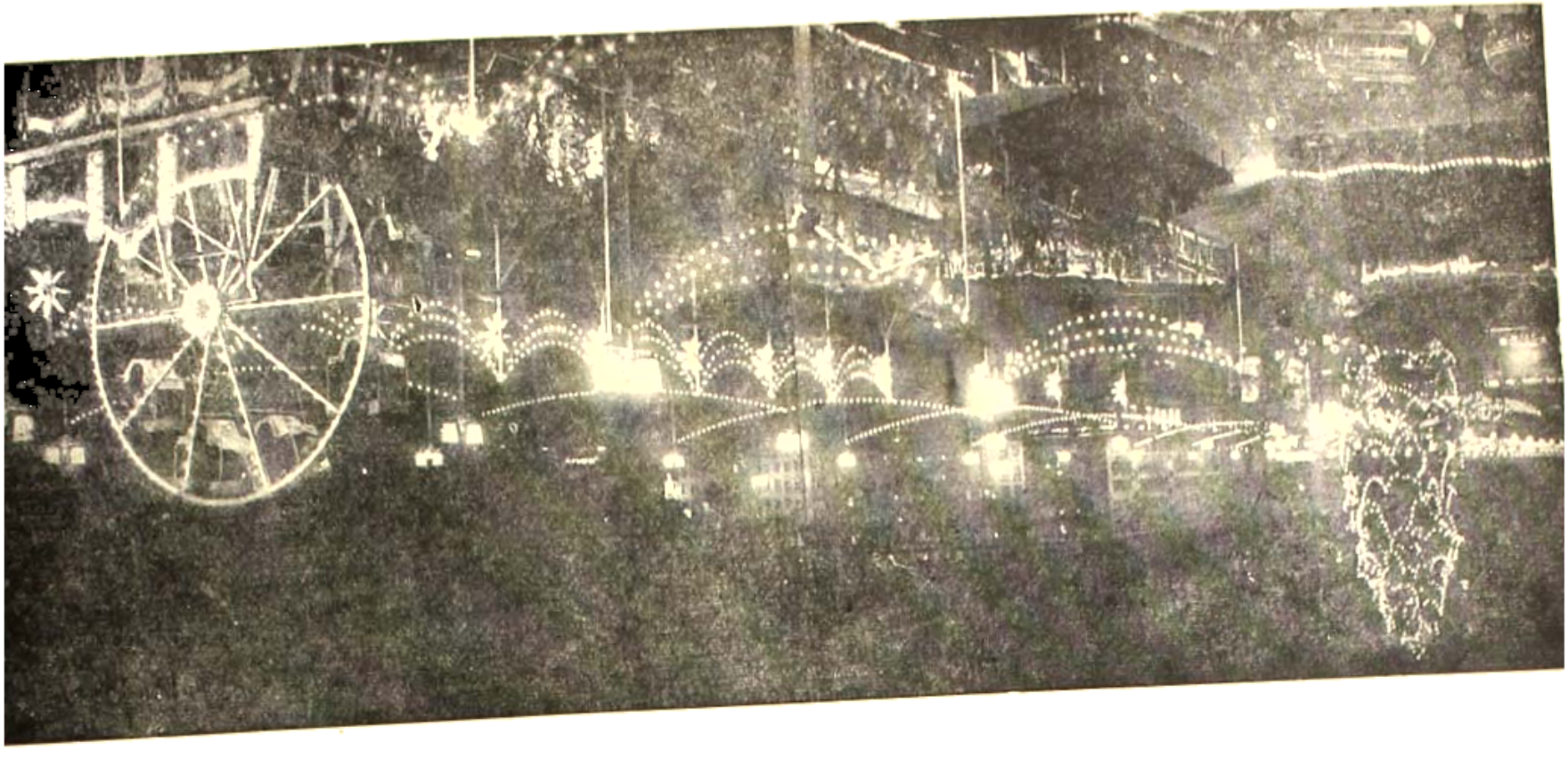

পরিবারের সবাই খুশী

যেসব গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার রক্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
বাঙ্গলা বাজার, কলিকাতা ৪৮

প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য্য, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এফ,সি, এস,(আমেরিকা), কলেজের ইনচার্জ পাতেয় কুলপতি অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ অমল চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

Cover printed by—
RAMTICK ART PRESS, CALCUTTA 12

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী

একবিংশতিতম বর্ষ । নবম সংখ্যা । ফাল্গুন ১৩৭২

গুপ্তচর কাহিনী

গত মহাযুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত গুপ্তচর
—অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক জীবন রহস্য

উৎপল ভাদুড়ী

জাপানের প্রবল পরাক্রান্ত জঙ্গী শাসকের সন্দাসতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে টোকিও থেকে যে গোপন বার্তাটি বেতার-তরঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই ছোট্ট বার্তাটি হল :

"জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করছে না—সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বপ্রান্ত আপাতঃ জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনামুক্ত।"

গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন—অসামান্য প্রতিভাধর সোভিয়েত ইনটেলিজেন্স অফিসার রিহার্ড জোর্গে।

২২শে জুন ১৯৪১ সাল। প্রায় গোটা ইওরোপ কয়েকটি ধাক্কায় দখল করে নিয়ে শক্তিমদমত্ত দুর্ধর্ষ নাৎসীবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে তারা রাজধানী মস্কোর দিকে এগিয়ে চলল।

অন্যদিকে নাৎসী জার্মানীর দোসর অন্যতম অক্ষশক্তি জঙ্গী জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে পূর্ব প্রান্তে সাইবেরিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

পাঁচমাসের মধ্যেই নাৎসীবাহিনী মস্কোর উপকণ্ঠে উপস্থিত হল। রাজধানী রক্ষার জন্য লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণের মৃত্যুপণ প্রতিরোধ সংগ্রামেও বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে টোকিও থেকে জোর্গের বার্তাটি এসে পৌঁছাল। এই

বিশ্ব-বাতায়ন

॥ লোকসঙ্গীত শিল্পীর শুভেচ্ছা সফর ॥

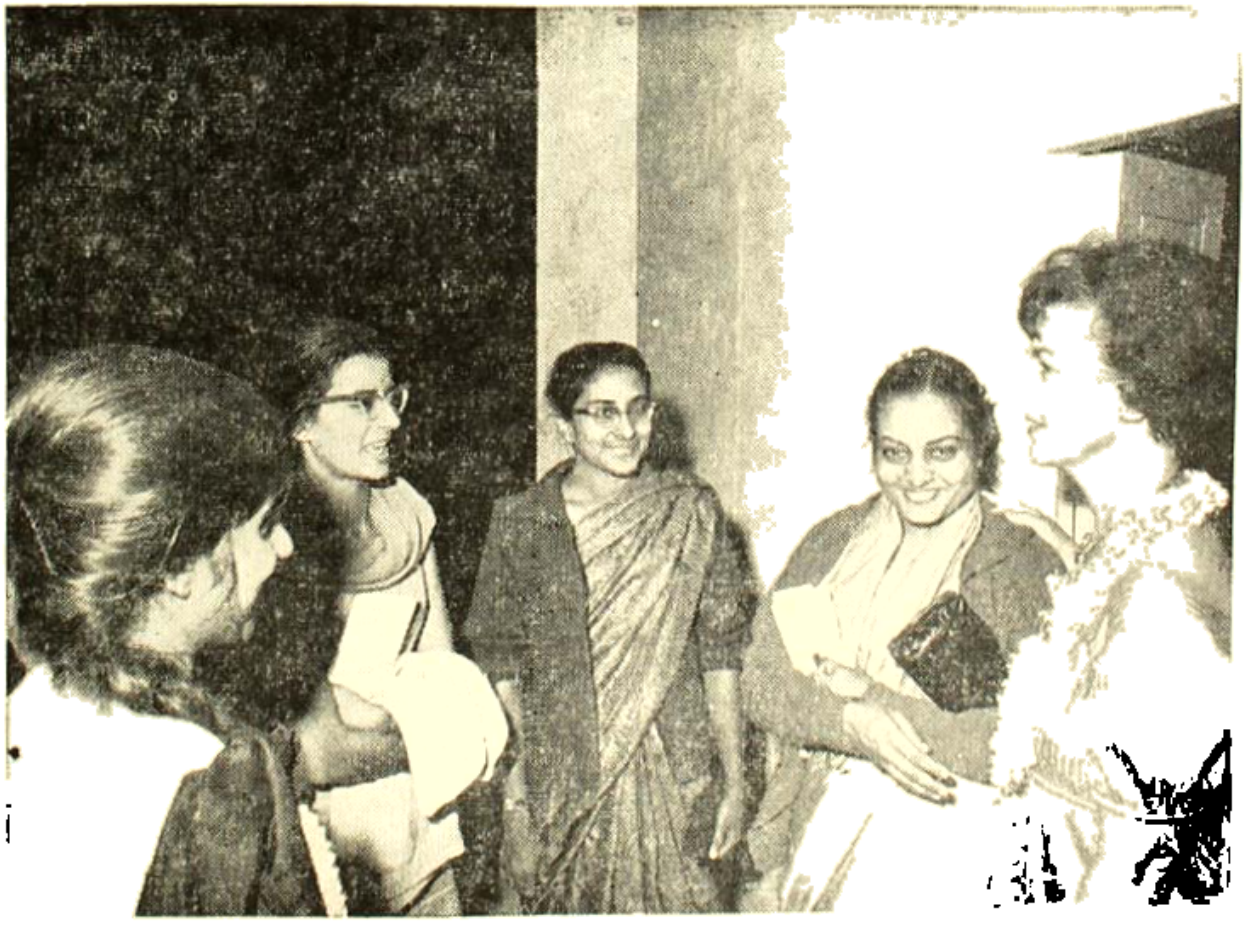

মার্কিন লোকগায়ক ও লোকসঙ্গীত শিল্পী মিস পিনা ডেভিস সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছেন। মিস ডেভিস ভারতের প্রধান শহরগুলি পরিদর্শন করবেন।

আধুনিক জার্মানীর মেয়েরা।

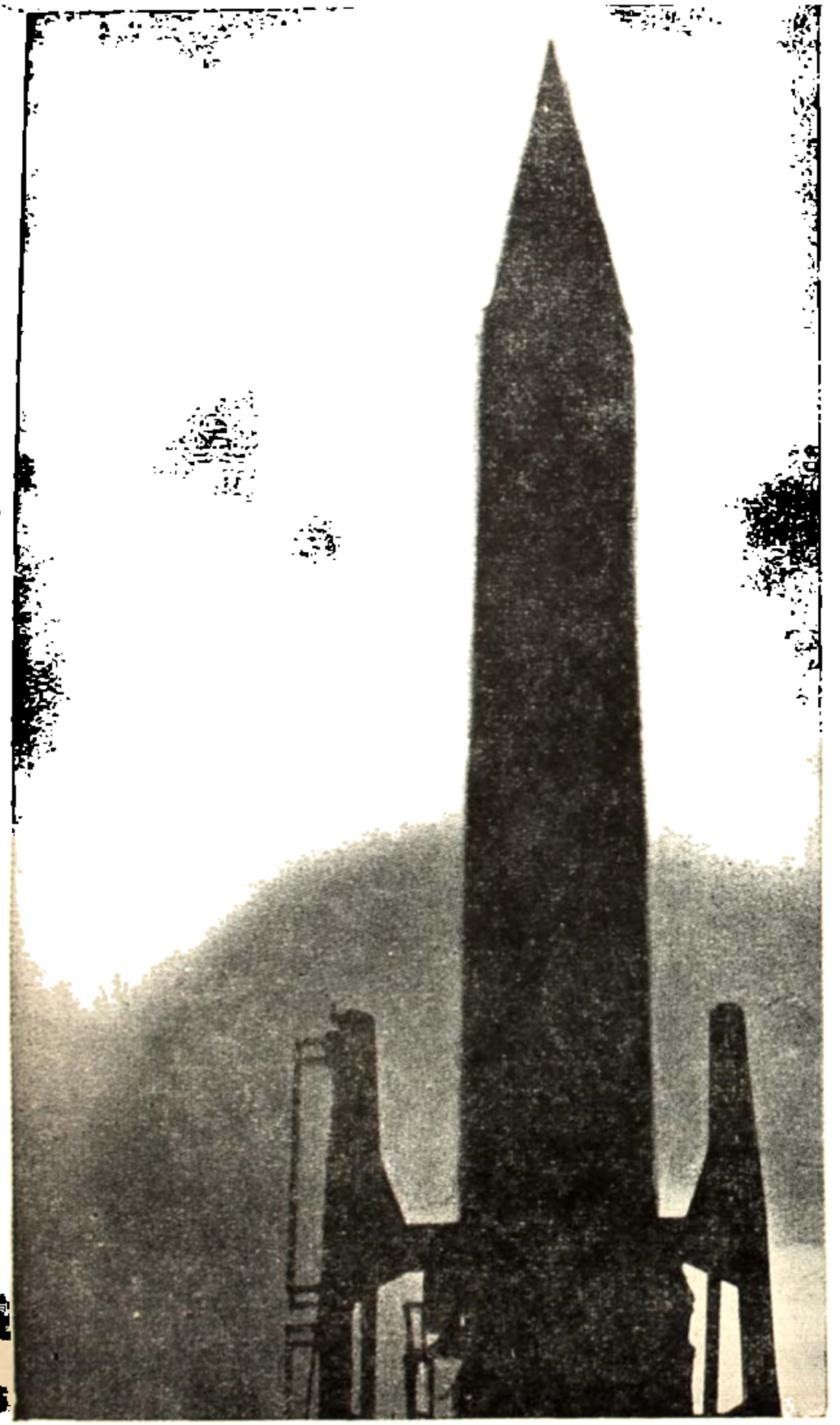

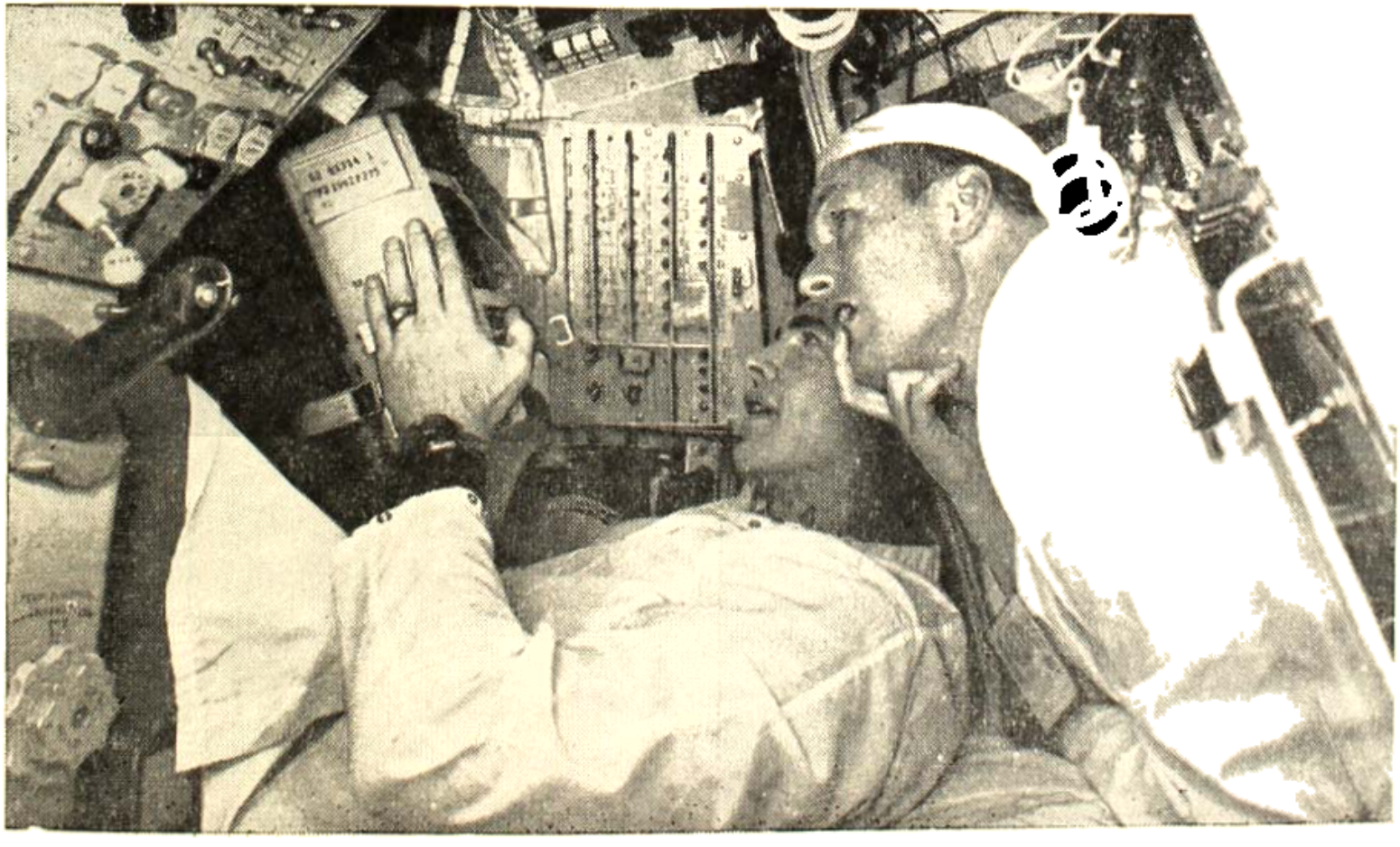

নভোচারী ডেভিড স্কট ও ওয়েলনীল আর্মষ্ট্রং মহাকাশ যাত্রার পূর্বে জেমিনির যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছেন।

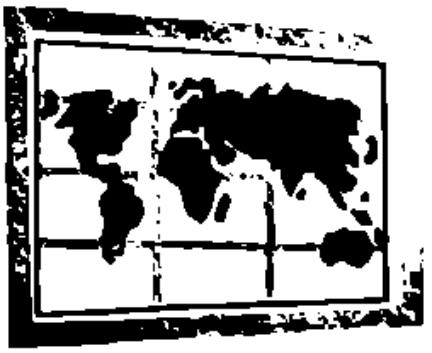

বিশ্ব-বাতায়ন

সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন লুনা ৯-এর চিত্রকল্প।

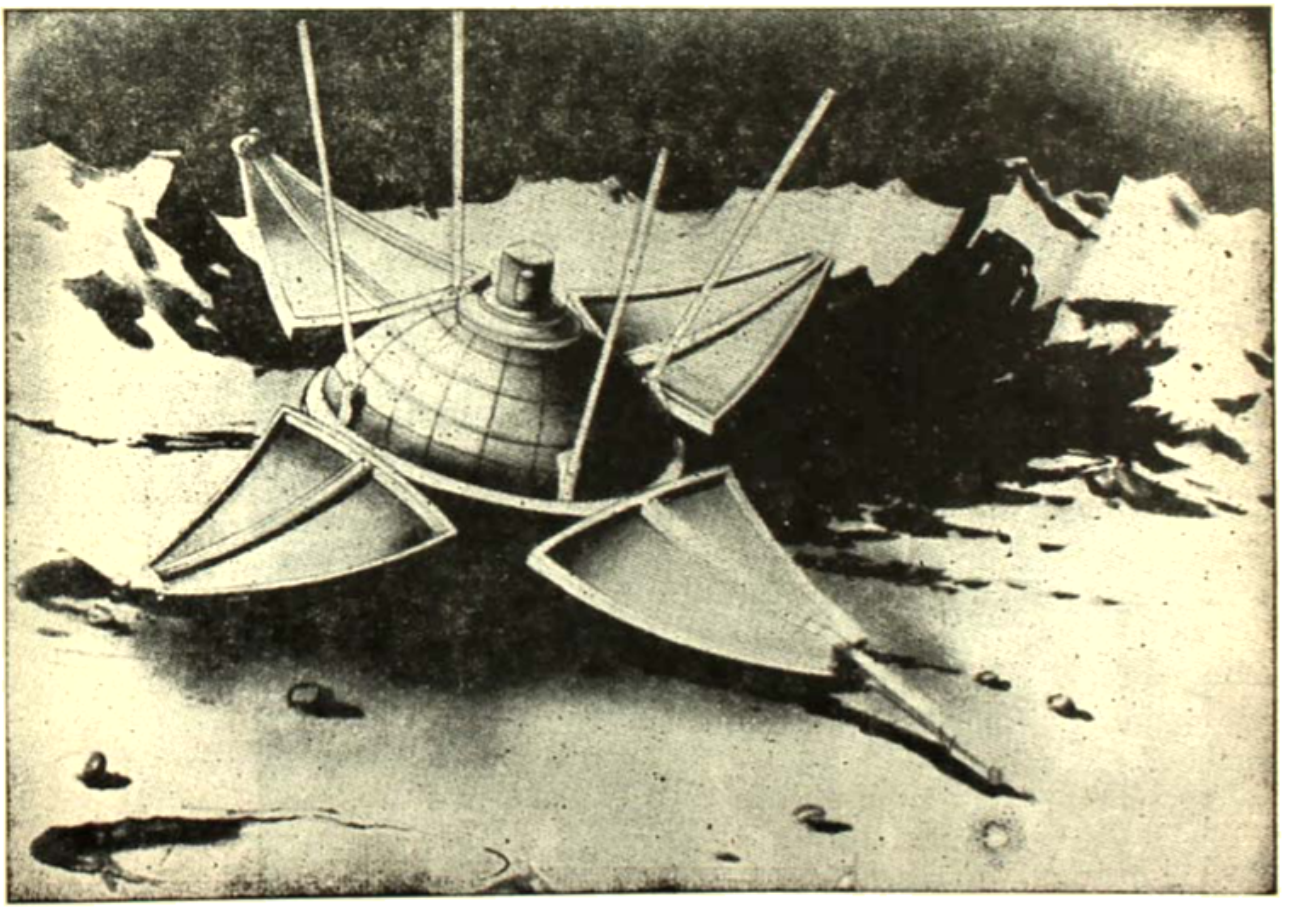

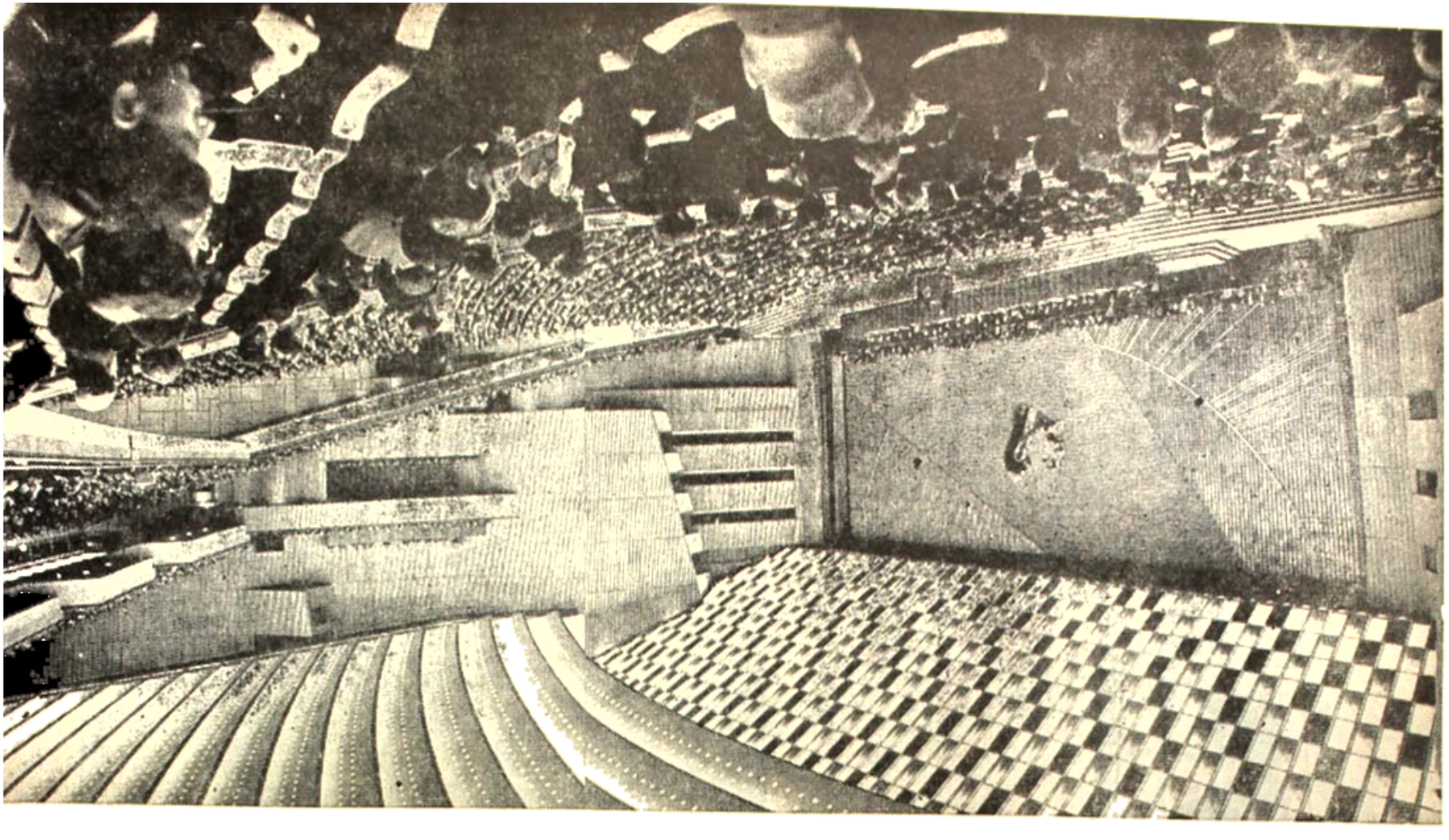

একটি স্মরণীয় সোভিয়েত চলচ্চিত্র :

বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক মিখাইল কোৎসুবিনস্কির কাহিনী অবলম্বনে রচিত, উক্রাইনিয়ান ফিল্ম ষ্টুডিওস্ কর্তৃক নির্মিত রোমান্টিক চলচ্চিত্র 'বিস্মৃত পূর্ব পুরুষদের-ছায়ায়' একটি বিশেষ দৃশ্য। ছবিতে নায়ক ইভান ও নায়িকা পালাগনার মধ্যে প্রথম দেখা হচ্ছে।

সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন লুনা-৯ কর্তৃক গৃহীত চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের একটি অংশের আলোকচিত্র। লম্ব রেখাটি ষ্টেশনের এ্যানটেনাকে দেখাচ্ছে। ডানদিকে রয়েছে বৃদ্ধিকে লম্বতল কাঁচ বিশিষ্ট একটি আয়না, তাতে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের একটি অংশ প্রতিফলিত হয়েছে।

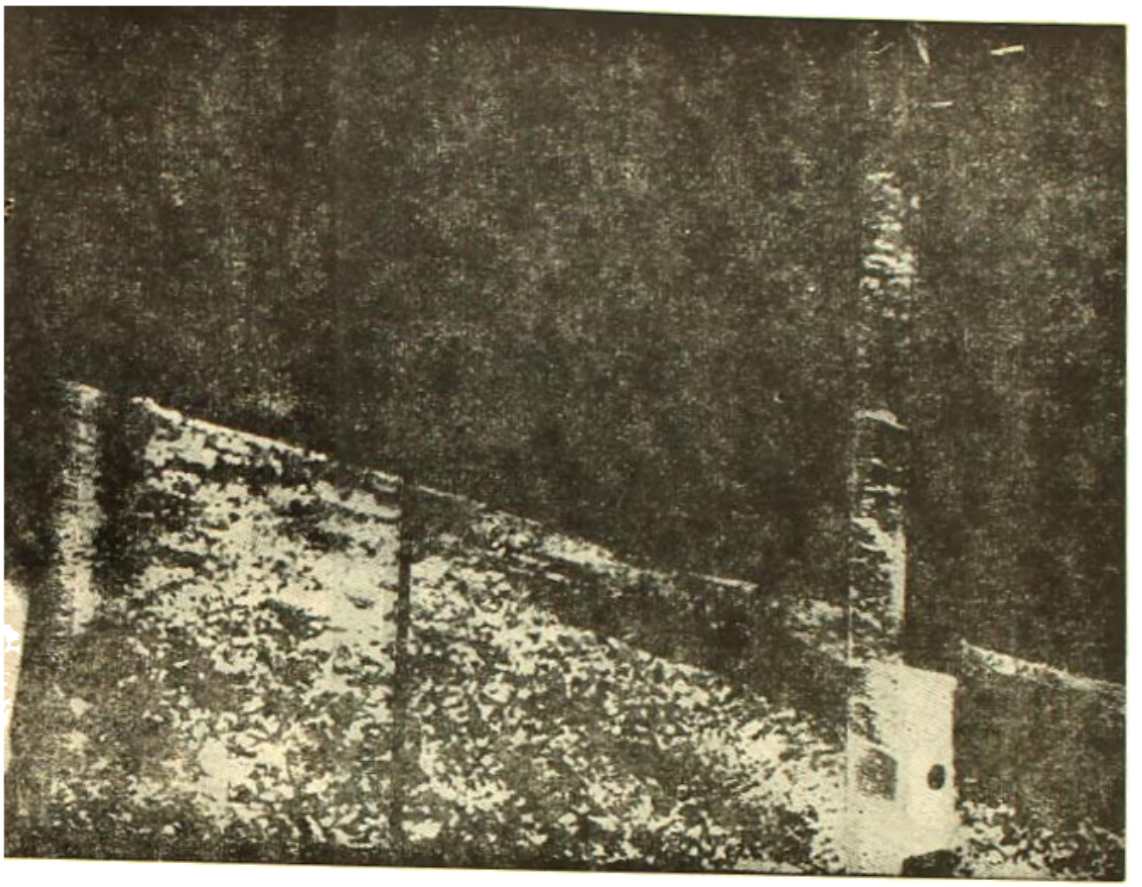

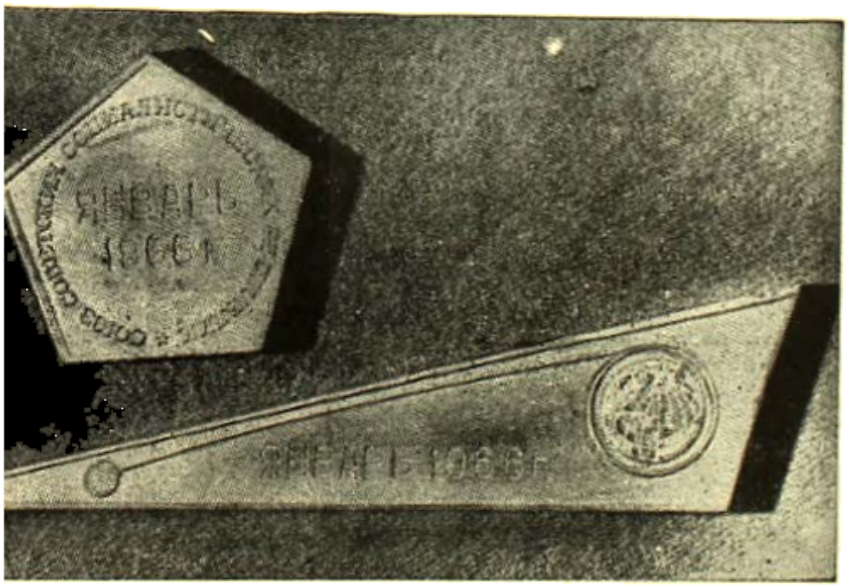

চাঁদে মানুষের পরিচয় পত্র। ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী লুনা-৯ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও ফলক চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে।

আলমা আতায় কাজাক আবাই পাঁভিনাট্য ও নৃত্যনাট্য থিয়েটারের শিল্পীদের
মধ্যে ভারতীয় কলাকেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ।

াত সোভিয়েত চলচ্চিত্র
চালিকা
ইৎলকা শেপিৎকো ও
। স্বামী এলেম ক্লিমোভ ·

লারিসা শেপিৎকো—সাম্প্রতিক
সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে।

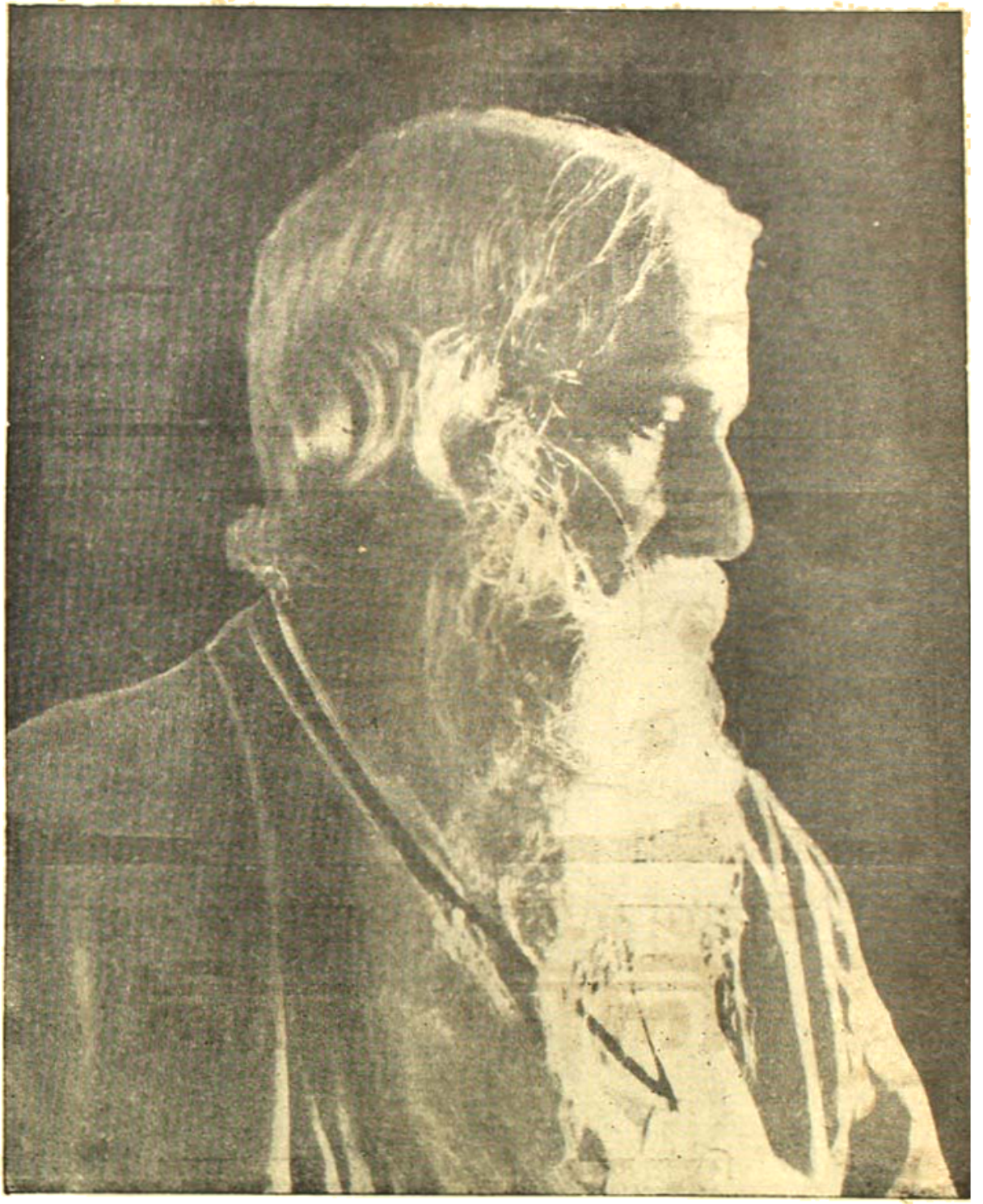

UNIVERSITY OF CALCUTTA

গল্প-ভারতী

একত্রিংশত্তিতম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৭৩

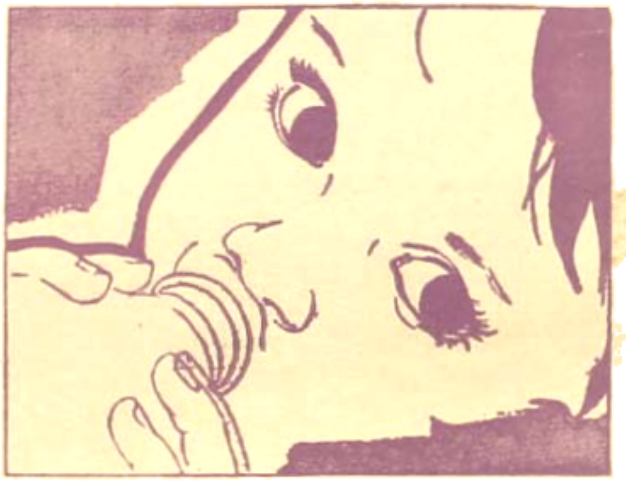

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি-বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

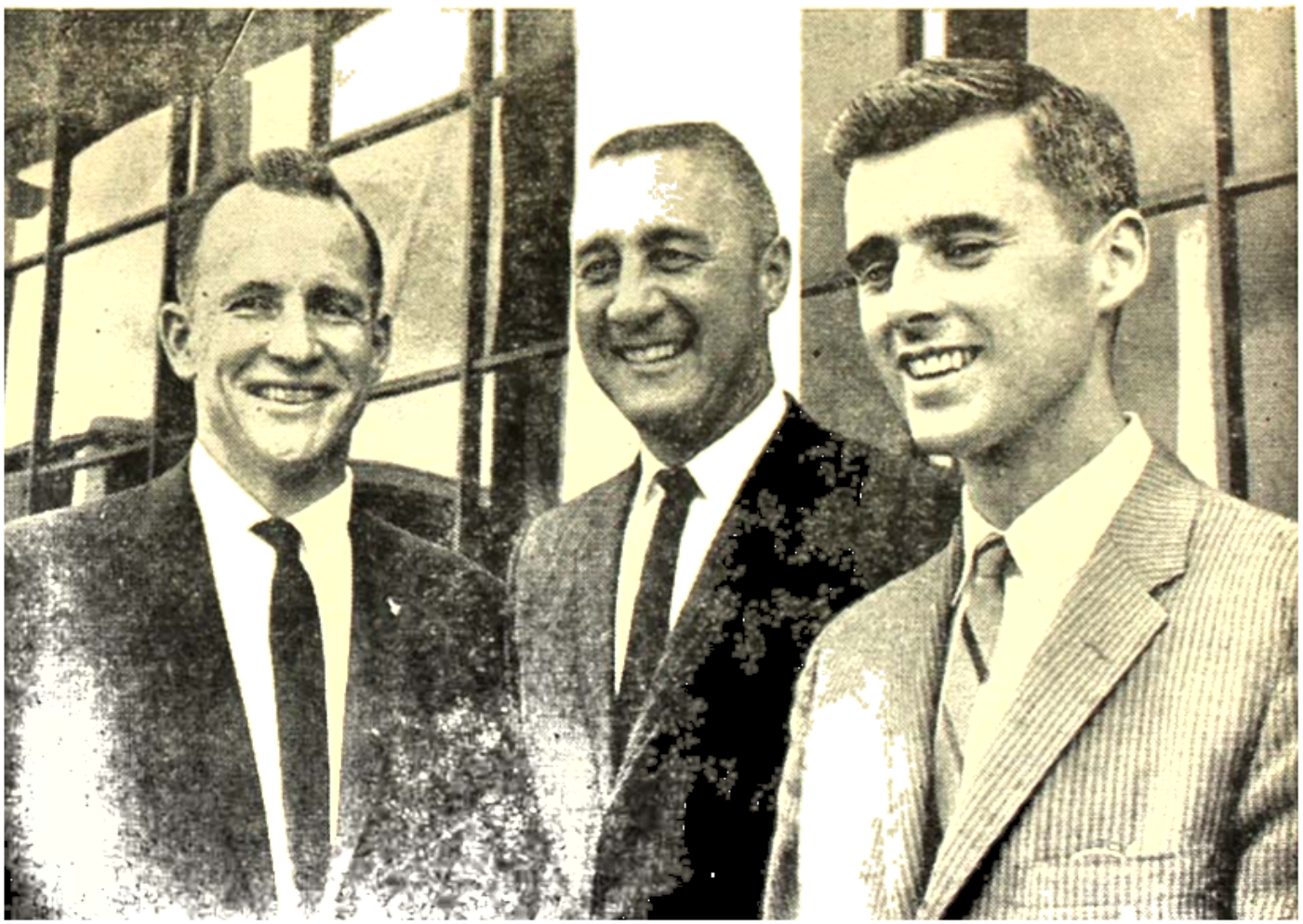

'উন্টার ডেন লিন্ডেন' হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

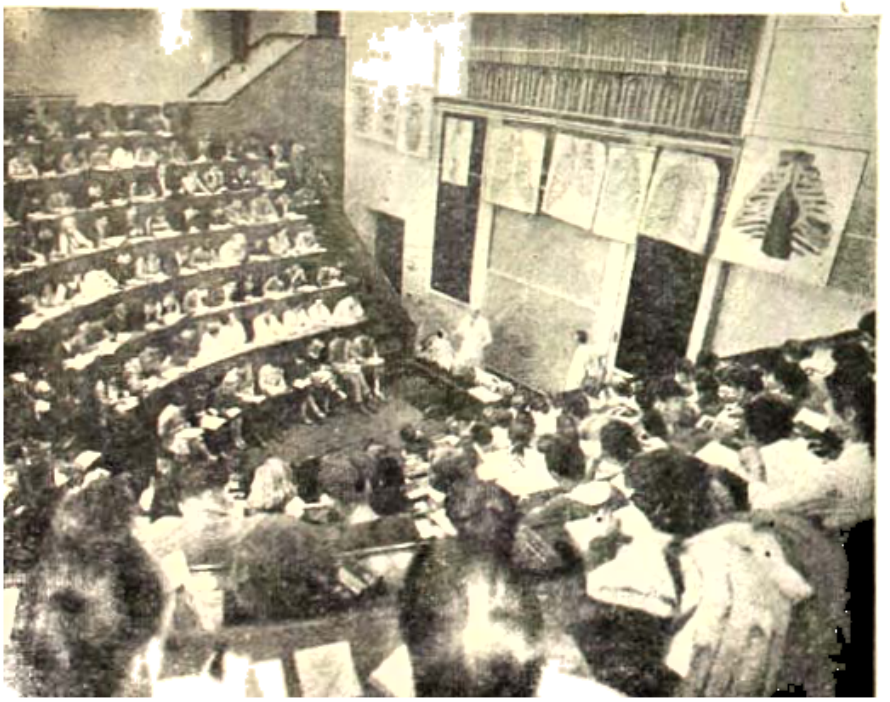

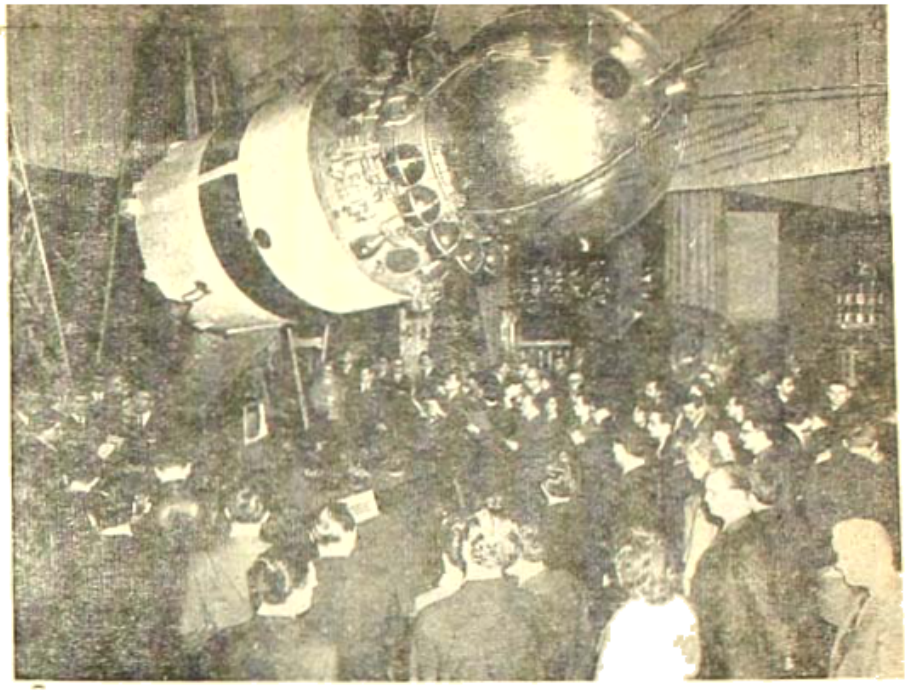

তোপক বোধিবানের মডেল।
লাইপৎসিক বসন্ত মেলার এবছরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল।

ভারতীয় প্রদর্শনীর একাংশ

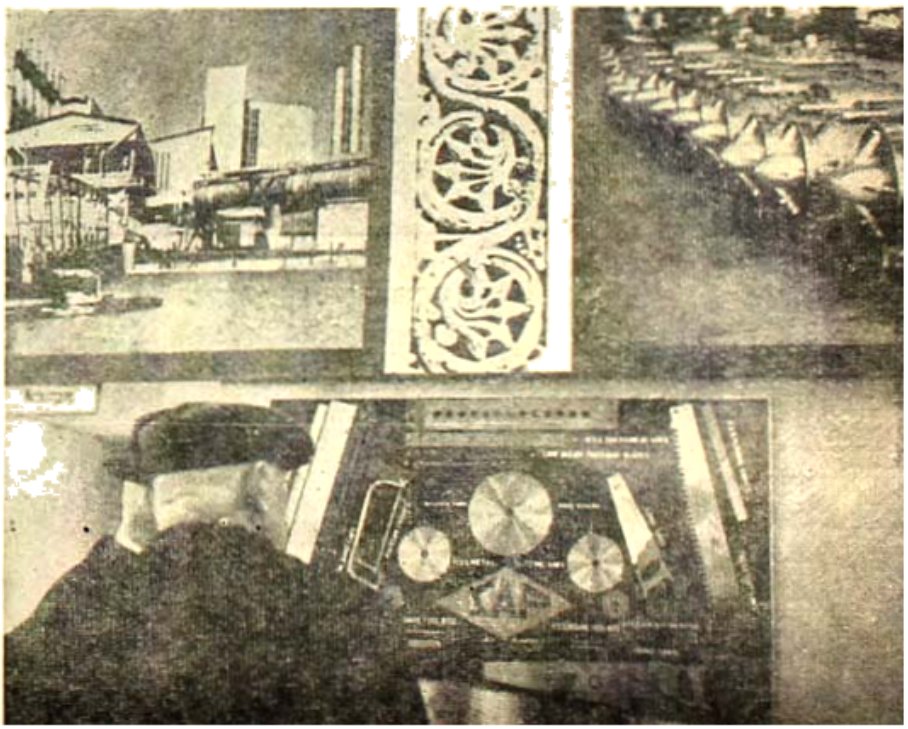

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ত ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

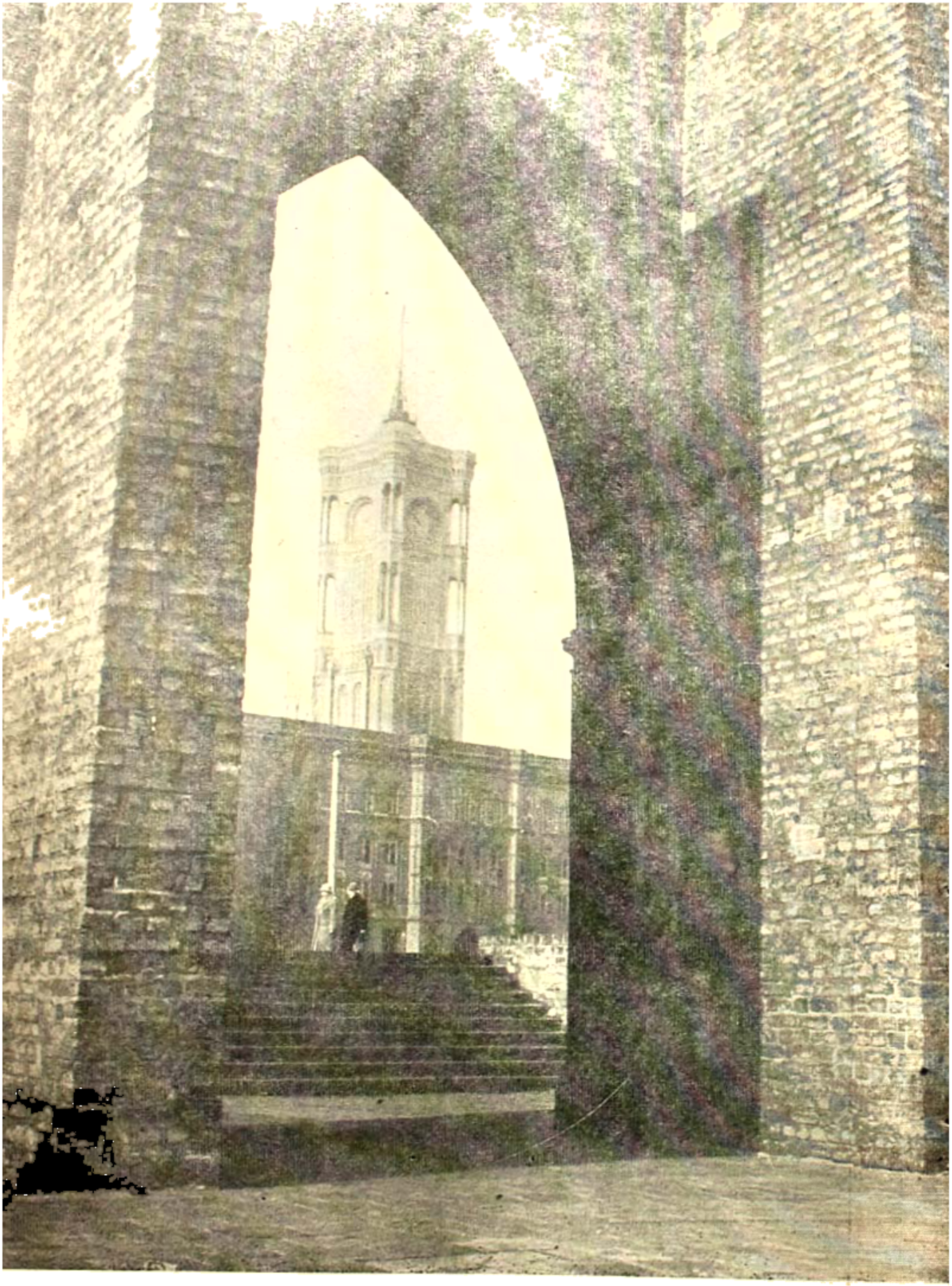

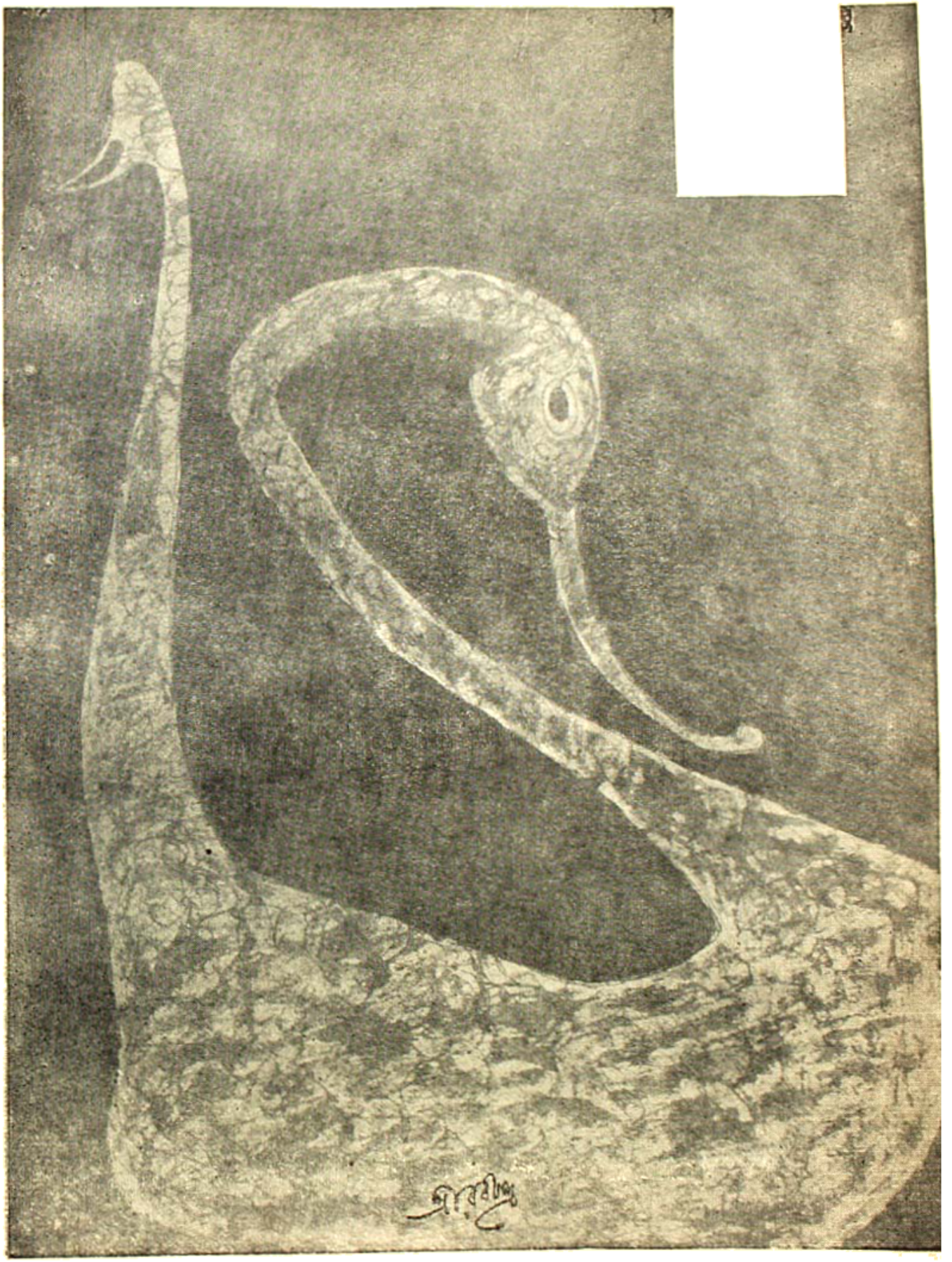

সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরকালে ভারতীয় নাগরিকদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

চার অধ্যায় রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৪)

"তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো—আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্হিত ভিতরকার কুশ্রী অসত্যটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোন বড় কাজ করতে পারা যায়।"

—চার অধ্যায়

ঘরে বাইরে রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ (১৯১৫)

"আমি বেশি সুখে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্য লোভ করব; আমি কিছু চাই বা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্য রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই, যাকে আমি মা বলব দেবী বলব, দুর্গা বলব।"

—ঘরে বাইরে

নন্দলাল

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ জীবনে শিল্পাচার্য নন্দলাল অনেক ছবি এঁকেছেন অনেক শৈলীর অঙ্কনভঙ্গী, অনেক জাতীয় বিষয়বস্তু এবং উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন এবং দিয়েছেন। বলাবাহুল্য সে সব নিয়ে—তার শিল্পকীর্তির গুণাগুণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবার জন্যে এ প্রবন্ধ নয়। আমি আজ মানুষ নন্দলাল বসুর সম্বন্ধে কেবল দু'চার কথা ব'লব, যে কথা খুব কাছের মানুষ ছাড়া, কেউ জানে না, অথচ যা জানা দেশবাসীর প্রয়োজন।

শিল্প-সাধনা ছিল নন্দলালের জীবন সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ভারত শিল্পের গৌরববৃদ্ধি তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন ছিল, তাঁর আঁকা ছবিগুলি তাঁর ঐকান্তিক স্বদেশ প্রেমের এবং আন্তরিক প্রকৃতি-প্রীতির আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিল্পের চেয়ে শিল্পী যে কত বড় ছিলেন তা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে জানবার উপায় ছিল না।

এমন একটি শুচিশুভ্র নির্লোভ নিরহঙ্কার জীবন আধুনিক কালে বিদগ্ধ সমাজে বেশী দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি, অর্থাভাবে চিরদিন কষ্ট পেয়েছেন অথচ অর্থের জন্য আত্মসম্মান বিক্রয় করেননি কোনোদিন। বন্ধুরা, ছাত্রেরা উচ্চপদ এবং রাজসম্মান নিয়ে সরে গেছেন, তিনি নীরবে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ স্বামী, স্নেহময় পিতা, সামাজিক জীবনে তিনি আদর্শ গুরু, অকৃত্রিম বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সদালাপী বয়স্য।

সভায় তিনি সকলের পিছনে লুকিয়ে বসতেন, যেখানে নিজের লোকের চক্ষে পড়বার বা সম্মান লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে সেখানে তিনি পারতপক্ষে যেতেন না। আবার বিপদের দিনে প্রয়োজনের কালে তিনি সবার আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতেন।

ছাত্রদের নিয়ে সভা সাজাতেন তিনি, নাটামঞ্চ সাজাতেন কিন্তু তারপর আর তাঁর সাক্ষাৎ মিলত না। বিপন্ন বন্ধুকে, শিল্পকে, পরলোকগত সতীর্থের বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতেন।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে দুর্বল দন্ত ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের এনামেল হয় দৃঢ়, চিকচিকে, দাঁত হয় সুন্দর ও ঝকঝকে। মুক্তো মুক্তো দাঁতে ফুটে সুন্দর হাসি। তাই আজই এক কৌটা দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করুন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
বাজা বাজার, ঢাকা-১১

আয়ুর্বেদ রত্ন মোহাম্মদ আলী মোল্লা, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম.বি.এস. (ঢাকা), এম.বি. এস. (আয়ুর্বেদিক), সাধনা ঔষধালয় চাকার পক্ষে কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা কেন্দ্র এর আয়ুর্বেদ রত্ন এম. এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

Cover printed by
EASTERN ART PRESS, CALCUTTA-12

লিলি
বিস্কুট
শুধু বড়দের নয়
ছেলেমেয়েদেরও প্রিয়

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বিশ্ব-বাতায়ন

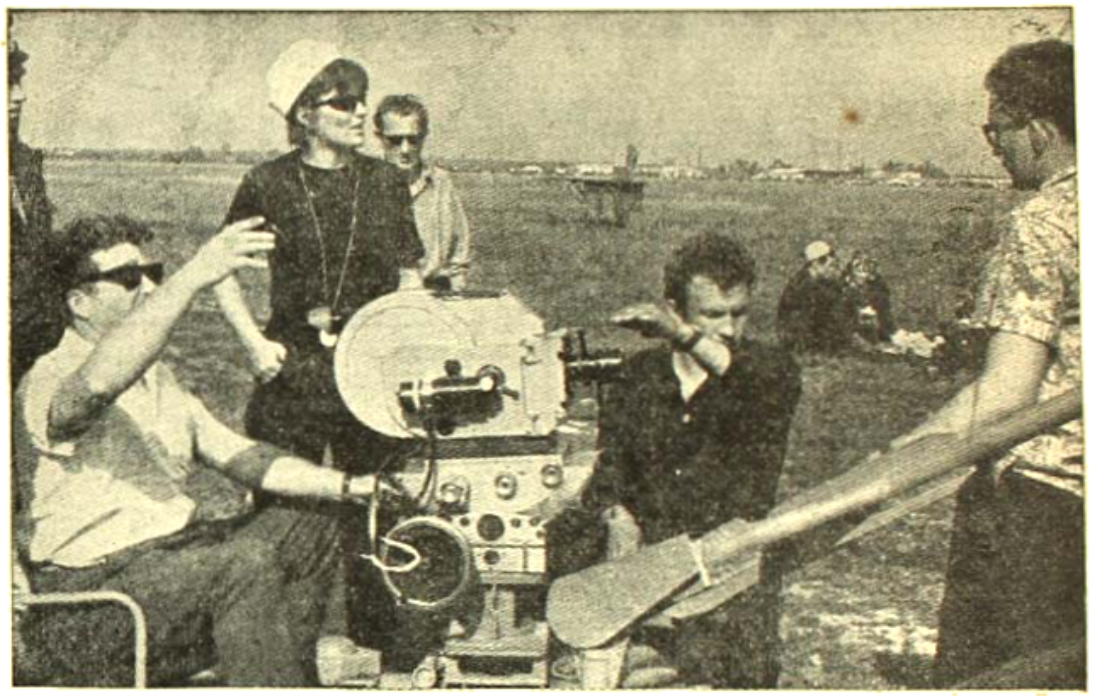

সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালিকা লারিসা শেপিৎকো

লেখকের ভূমিকায় প্রখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক চেরকাশভ। চেরকাশভ পুশকিন থিয়েটারে "A Nest of Gentle Folk" নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছেন। এই নাটকে তাঁর স্ত্রী নীনাও অভিনয় করছেন।

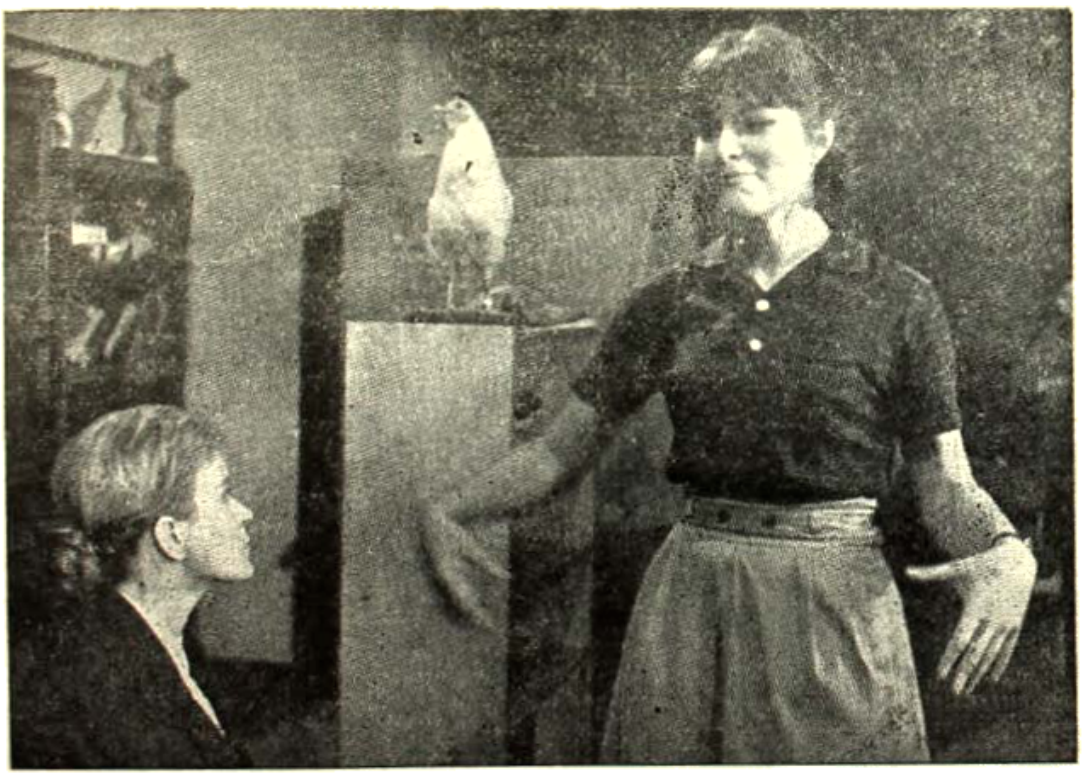

এযুগের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত মহিলা পরিচালিকা লারিসা শেপিৎকো
অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করছেন।

অক্টোবর মহাবিপ্লবের স্মরণে সোভিয়েতের চলচ্চিত্র শিল্পীরা 'চূড়ান্ত পদক্ষেপ' নামে একটি ঐতিহাসিক, বিপ্লবী চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করছেন। 'চূড়ান্ত পদক্ষেপের' একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যে মায়ক আন্দ্রিকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রখ্যাত সোভিয়েত অভিনেতা বি, আন্দ্রোনোভ।

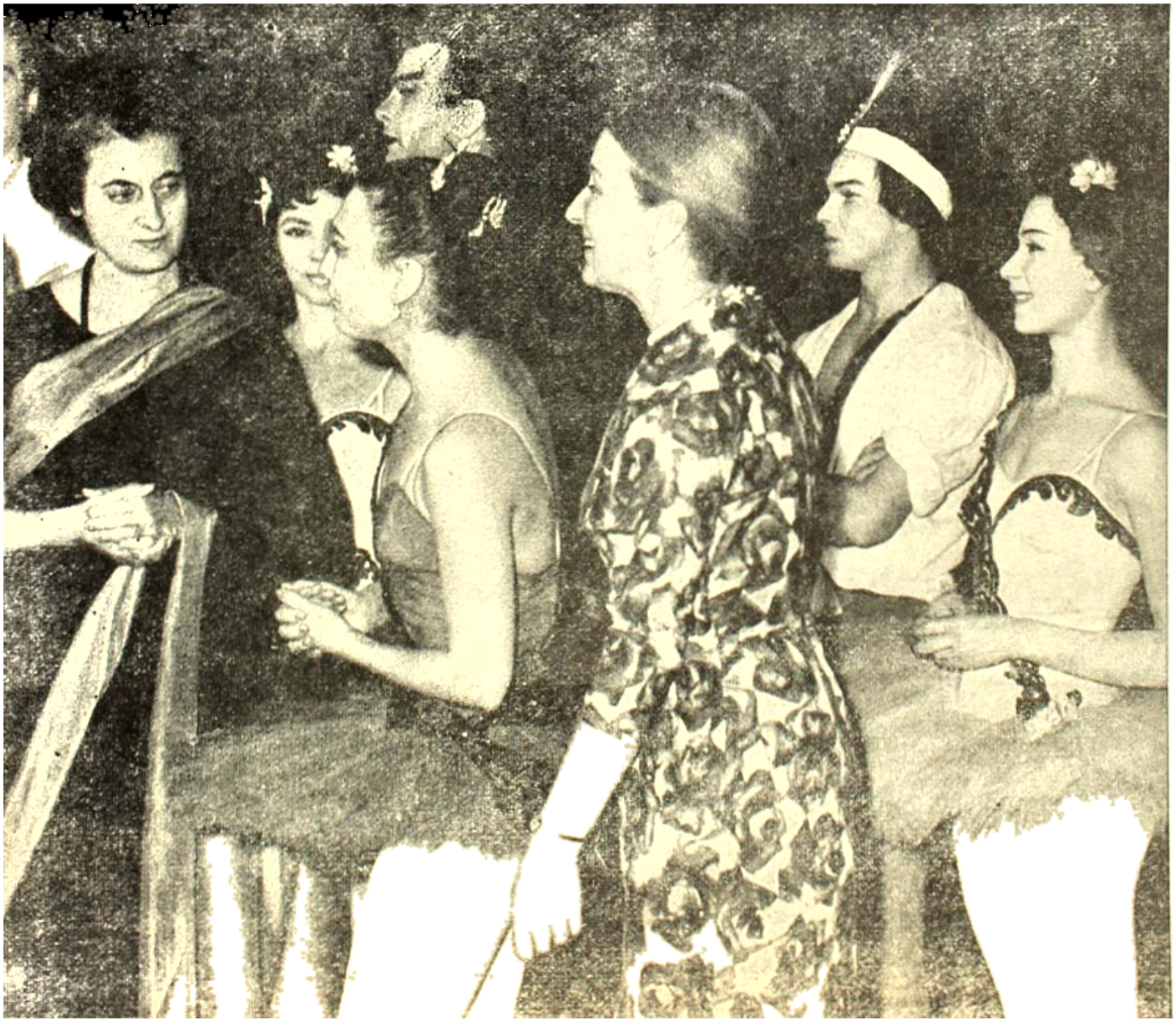

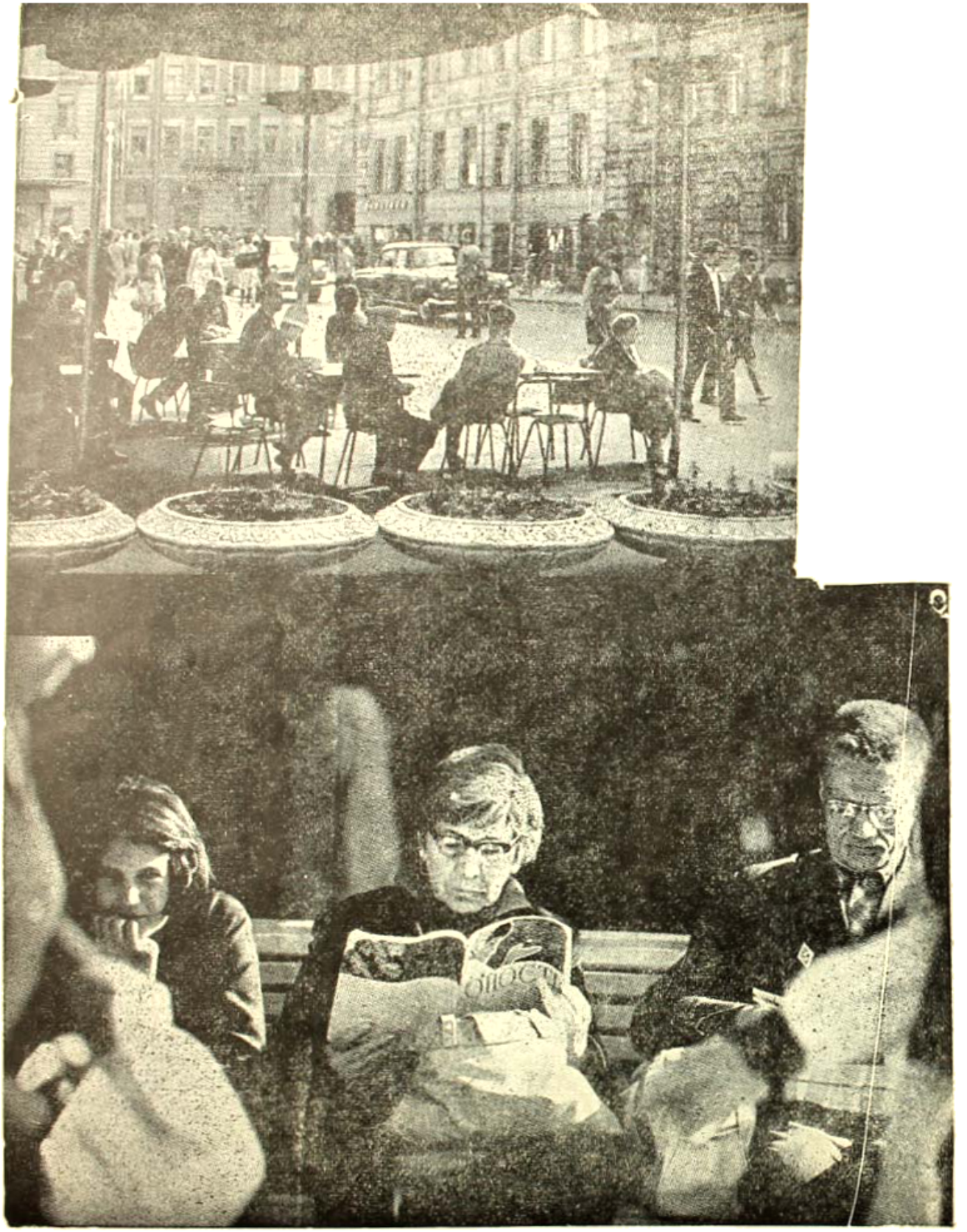

লেলিনগ্রাডের বিখ্যাত নেভেস্কি প্রসপেক্ট-এর উপরের পুস্তক ভবনটিতে সাহিত্য-সভা ও লেখক কবিদের সঙ্গে পাঠকদের প্রাণবন্ত আলোচনা-সভা

ভারত ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের হকি টীম :—

(বাঁদিক থেকে) দর্শন সিং, ইন্দর সিং, হরবিন্দর সিং, পিটার, যোগীন্দর সিং,

ম্যাক্স আরেন্স প্রভিজের ম্যাক্স হরম সিং ম্যানেজার ও গুরুবক্স।

দুই জার্মানির ঐতিহাসিক

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার রক্তযোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুন্দর, মজবুত ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
মাদ্রা নগর, কলিকাতা ৩৮

ডাক্তার ডঃ মোহন লাল সেন, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য, এফ,সি,এস, (লন্ডন), এফ,সি, এস,(আমেরিকা), অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাজকীয় আয়ুর্বেদীয় কলেজ পাতিয়ালা কর্তৃক প্রশংসিত।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ অব ইণ্ডিয়া ডঃ সেন, এফ-সি, সি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

Cover printed by
EASTICK ART PRESS, CALCUTTA 12.

Regd. No. C3643

লক্ষ্মী ঘি

একটি সুবিখ্যাত নাম

বিশুদ্ধতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

8 JUL 1968

LG 7/66